কোই হ্যায়?

পূর্ববঙ্গে ইংরেজ সিভিলিয়ান

মুনতাসীর মামুন

কোই হ্যায়?

পূর্ববঙ্গে ইংরেজ সিভিলিয়ান
(১৭৭২-১৯৪৭)

মুনতাসীর মামুন

কোই হ্যায়

মুনতাসীর মামুন

© লেখক

দ্বিতীয় মুদ্রণ : ১৪ এপ্রিল ২০১১
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০৮

সময়

সময় ৬২৮
প্রকাশক
ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
সময় কম্পিউটার্স
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
মৌমিতা প্রিন্টার্স, প্যারিদাস রোড, ঢাকা

মূল্য: ৬০০.০০ টাকা মাত্র

KOI HEY (English Civilions in East Bengal) by Muntassir Mamun. Somoy First Published: February 2008, 2nd Print in April 2011 by Farid Ahmed, Somoy Prakashan, 38/2Ka Banglabazar, Dhaka 1100.

Web: www.somoy.com E-mail: f.ahmed@somoy.com

Price Tk. 600.00 Only

ISBN 984-70114-0028-0 Code : 628

নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র : **'সময় . . .'** প্লাজা এ. আর (৪র্থ তলা), সড়ক ১৪ (নতুন) ধানমন্ডি (মিরপুর রোড, সোবহানবাগ মসজিদের পাশে), ঢাকা। ফোন: ৯১১৬৮৮৫

জনাব আহসানউল্লাহ
আমাদের প্রিয় বিয়ার ভাই
ও তাঁর যোগ্য সহধর্মিনী
ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীকে

ভূমিকা

উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের সমাজ নিয়ে অভিসন্দর্ভ রচনাকালে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের রচিত কিছু আত্মজীবনী চোখে পড়ে। সেই সব আত্মজীবনীর পূর্ববঙ্গ-সংক্রান্ত অধ্যায় নিয়ে দু'একটি প্রবন্ধও রচনা করি। তারপর সিদ্ধান্ত নিই এ সম্পর্কিত একটি গ্রন্থ রচনার।

সেই থেকে, গত একযুগেরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে সিভিলিয়ানদের আত্মজীবনীর খোঁজ নিতে থাকি। এর ভালো সংগ্রহ আছে ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে। এভাবে পূর্ববঙ্গ সম্পর্কিত মোট ১৮টি স্মৃতিকাহিনী যোগাড় করি। এর উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থ *কোই হ্যায়?*

গ্রন্থটি দুই পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্ব পূর্ববঙ্গে ইংরেজ সিভিলিয়ান। ইংরেজ বা ইউরোপিয়দের এ দেশে আগমন, ক্ষমতা দখল ও ঔপনিবেশিক শাসন বিস্তারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে এ পর্বে। গুরুত্ব আরোপ করেছি ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের বিকাশ, তাদের জীবন ও কর্মপদ্ধতি এবং আমলাতন্ত্রের বিভিন্ন কর্মের মাধ্যমে ঔপনিবেশিকতার প্রকাশ ও বীজ বপন ইত্যাদি। সমাজতত্ত্বের আলোকে তা বিশ্লেষণ করতে চেয়েছি। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমাকে বিপুলভাবে সহায়তা করেছে মওনিয়েরর গ্রন্থটি। এটি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কে এম সাদউদ্দিন। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

দ্বিতীয় পর্ব সিভিলিয়ানদের চোখে পূর্ববঙ্গ। সিভিলিয়ানদের রচিত পূর্ববঙ্গ সম্পর্কিত বিবরণ। কোনো কোনো গ্রন্থের বেশির ভাগ জুড়ে ছিল পূর্ববঙ্গ, কোনো কোনো গ্রন্থে মাত্র একটি অধ্যায়। যেখানে যা পেয়েছি তাই নিজের ভাষ্যে তুলে ধরেছি মূল ভাষ্য অনুসরণ করে। এই বিবরণগুলির কয়েকটি আগে প্রকাশিত হয়েছে।

এই গ্রন্থের নামটি ভারিক্কি হতে পারতো। কিন্তু আমি তা না করে রেখেছি *কোই হ্যায়?* এ শিরোনামে হয়ত অনেক সিরিয়াস গবেষকের ভ্রূ কুঁচকে যাবে।

কিন্তু, আমার মনে হয়েছে এই দুইটি হিন্দুস্তানী শব্দের মধ্যে নিহিত সিভিলিয়ান প্রত্যয়ের নির্যাস। এই শব্দ দু'টি এক দিকে তুলে ধরে ঔপনিবেশিক শাসকের ঔদ্ধত্য-প্রভুত্ব, অন্যদিকে দেশিয়দের অধস্থনতা। উপশিরোনাম পূর্ববঙ্গে ইংরেজ সিভিলিয়ান। কারণ, একদিকে বইটি পূর্ববঙ্গে যে সব সিভিলিয়ান কর্মজীবন কাটিয়েছেন তাদের জীবনেরই বিবরণ। গ্রন্থের সময়কাল ১৭৭২ থেকে ১৯৪৭। ১৭৭২ সাল বেছে নেয়ার কারণ, এই সময়ই রবার্ট লিন্ডসে কলকাতায় পা রাখেন সিভিলিয়ান হিসেবে। কোম্পানি শাসন তখন শুরু হয়েছে, আমলাতন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। খুব সম্ভব, পূর্ববঙ্গ বিষয়ক সিভিলিয়ানদের বিবরণ এটিই প্রথম। ১৯৪৭ সালে ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে। যে আমলাতন্ত্র তারা গড়ে তুলেছিলেন তা বিলুপ্ত হয়।

পরিশিষ্টে সিভিলিয়ান সম্পর্কিত একটি অসম্পূর্ণ গ্রন্থতালিকা সংকলন করা হয়েছে। সিভিলিয়ানদের আঁকা বেশ কিছু ছবির প্রতিলিপি আমি সংগ্রহ করেছি যা নিয়ে আলাদা একটি বই লেখার ইচ্ছে আছে। এখানে সেই সংগ্রহের কিছু প্রতিলিপি মুদ্রিত হলো। এর অধিকাংশই আছে সিভিলিয়ানদের রচিত উল্লিখিত গ্রন্থসমূহে অথবা ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে।

এই সব সিভিলিয়ানের বয়ান ঔপনিবেশিকতার যৌক্তিকতার প্রয়াস বলে উড়িয়ে দেয়া যায়, নানারকম সমালোচনা করা যায়। কিন্তু, নিছক বিবরণ হিসেবেও এসব বিচার করা যায়। এসব বিবরণে আমরা খুঁজে পাবো হারিয়ে যাওয়া এক পূর্ববঙ্গ, শাসক ও শাসিতের জীবন চর্যা। সামাজিক ইতিহাসের উপাদান হিসেবে তা বিবেচনা করলেও বা ক্ষতি কী?

এখানে পূর্ববঙ্গ বলতে বর্তমান বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানাকে বোঝানো হয়েছে। এতে অনেকে আপত্তি করতে পারেন। কেননা, উত্তরবঙ্গ বা মধ্যবঙ্গও অনেক সময় একক হিসেবে উল্লিখিত হয়। তবে সূক্ষ্ম যত বিচারই করি না কেনো পূর্ববঙ্গ বললে কমবেশি বর্তমান বাংলাদেশের সীমানাকেই বোঝানো হয়।

এই গ্রন্থের শব্দসূচি করে দিয়েছেন আমার প্রাক্তন ছাত্রী দিলরুবা বেগম (আলো)। ছবিগুলির আলোকচিত্র তৈরি করেছেন রিয়াজ আহমেদ। *সময় প্রকাশনের* ফরিদ আহমেদ দুমূর্ল্যের বাজারে বৃহদায়তন এ গ্রন্থ ছাপতে দ্বিধা করেননি। তাঁরা ধন্যবাদার্হ।

ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৪১৪/২০০৮

মুনতাসীর মামুন

সূচিপত্র

প্রথম পর্ব ১১–১৩১
পূর্ববঙ্গে ইংরেজ সিভিলিয়ান

দ্বিতীয় পর্ব ১৩৩–৪২৬
সিভিলিয়ানদের চোখে পূর্ববঙ্গ
লিন্ডসে সাহেবের সিলেট গমন ১৩৫
বুখাননের দক্ষিণ পূর্ব বাংলা ১৭২
রবারদিউর ময়মনসিংহ ১৯৪
পোগসনের চট্টগ্রাম যাত্রা ২১৪
কর্নেল ডেভিডসন যখন ঢাকায় ২২৬
পুরনো বাসিন্দার চোখে ময়মনসিংহ ২৪৪
সিভিলিয়ান ও শিকার ২৪৯
টেইলরের ময়মনসিংহ ২৫৬
গ্রাহাম সাহেবের পূর্ববঙ্গ ২৬৭
একজন কমপিটিশনওয়ালার জগৎ ২৮৮
উনিশ শতকের সত্তর দশকে গ্রামীণ বাংলা ৩১২
ভারতে এক তরুণ ভিক্টোরিয়ান ৩১৬
ভারতীয় এক জেলা অফিসারের ছোট পৃথিবী ৩৩৪
বিমস ও চট্টগ্রাম ৩৩৭
কোই হ্যায়? ৩৫২
ক্রীড়া, রাজনীতি ও বন্যা ৪১০
পূর্ববঙ্গে পুলিশি জীবন ৪১৫
একজন কমিউনিস্ট আইসিএস ৪২৩

তথ্য নির্দেশ **৪২৭**
পরিশিষ্ট–১
ভাগ্যবান এক ইংরেজের আত্মকাহিনী ৪৪৬
পরিশিষ্ট-২
সিভিলিয়ান সম্পর্কিত বই ৪৭২
গ্রন্থপঞ্জি **৪৮২**
শব্দসূচি **৪৮৭**
আলোকচিত্র

প্রথম পর্ব

পূর্ববঙ্গে ইংরেজ সিভিলিয়ান

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আদি ইতিহাস ছিল "অরাজকতা ও অর্থ লুণ্ঠনের অপ্রতিরোধ্য উদার অবকাশ।"[১] রবার্ট ক্লাইভ যিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেছিলেন ভারতবর্ষে, জানিয়েছিলেন, তিনি তো অনেক সম্পদ নিয়ে যেতে পারতেন নিজ দেশে। নেননি, সেটিইতো তার উদারতা।

মুঘলদের পতনের শুরুতে ভারতবর্ষে দেখা দেয় রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা, সংঘাত। বিদেশী বণিকদের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য, পরিস্থিতি আরো জটিল করে তোলে। "এ ছাড়াও ছিল বিদেশ থেকে আসা অগণিত অবাঞ্ছিত ভাগ্যান্বেষীর দল। লন্ডন ও প্যারিসের জুয়াখানার দুর্বৃত্ত, মাদাগাস্কার ও লোহিত সাগরের বেকার জলদস্যু, ব্রিটিশ এবং ফরাসি সেনাবাহিনীর ফেরারি ফৌজ, এই শ্রেণির এবং এই শ্রেণির বহু প্রকার বোম্বেটে যাদের পক্ষে ইউরোপে অবস্থান ছিল বিপজ্জনক, তারাও ইউরোপীয় সভ্যতা ও শিল্প প্রগতির প্রতিভূ রূপে ভারতীয় রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়, এবং বিবাদমান রাজন্যবর্গের বা বণিকদের আশ্রয়ে থেকে অগোচরে ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের গতি নিরূপণ করতে থাকে, নির্মাণ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইমারত।"[২]

সেই ৬৩৭ অব্দ থেকে বিদেশিরা ভারতে এসেছে। ৬৩৭ সালে মুম্বাইর থানে আক্রমণের মাধ্যমে আরবদের সঙ্গে ভারতের সংযোগ ঘটে। ভাস্কো দা গামা ১৪৯৮ সালে চারটি পর্তুগিজ জাহাজ নিয়ে কালিকট পৌঁছান। ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সমসাময়িক। ডাচ বা ওলন্দাজরা মশলা দ্বীপের সঙ্গে বাণিজ্যে উৎসাহী ছিল বেশি, ইংরেজরাও। তবে, ইংরেজরা আগে পৌঁছে ভারতে। ১৬০৭ সালে যাত্রা করে ১৬০৮ সালে ২৪ আগস্ট উইলিয়াম হকিন্সের 'হেকটর' এসে পৌঁছায় তাপ্তি নদীতে। ফরাসিরা আসে আরো পরে ১৬৬৮ সালে।

বিভিন্ন দেশের বণিকরা নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও কুঠি স্থাপন করে, নিজেদের আধিপত্য (উপনিবেশ) সৃষ্টি করে এবং বজায় রাখে। পর্তুগিজরা এ বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তারপর অন্যান্যরা। তবে, শেষ অব্দি পর্তুগিজরা গোয়া, দমন দিউ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। ওলন্দাজ, দিনেমাররা ছোট ছোট এলাকায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ইংরেজদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ফরাসিরা। কিন্তু তারাও

হটে যায়, চন্দননগর আর পন্ডিচেরি নিয়েই তারা সন্তুষ্ট থাকে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রথমে বাণিজ্য এবং তারপর রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। এবং অন্তিমে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। অবশ্য, তখন আর কোম্পানির অস্তিত্ব ছিল না।

ইংল্যাণ্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথ বাণিজ্য করার জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ৩১ ডিসেম্বর ১৬০০ সালে সনদ প্রদান করেন যার শিরোনাম ছিল–

'The Governor and merchant of London trading into the East Indies.' সনদ অনুযায়ী, কোম্পানিকে নিজ মতো ব্যবসা করার অনুমতি দেয়া হয়। পরবর্তীকালে আরেকটি নতুন কোম্পানিকে অনুমতি দেয়া হয়। ১৬৯৮ সালে পার্লামেন্টের আইনের অধীনে ঐ কোম্পানি নিবন্ধিত হয় যার শিরোনাম–

'The English compnay, trading to the East Indies.' দু'টি কোম্পানির প্রতিদ্বন্দ্বিতা নতুন জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। তবে সাত বছরের মাথায় দু'টি কোম্পানিই ব্যবসায়ী স্বার্থে এক হয়ে যায় এবং নতুন নাম হয় 'The united company of merchent of England trading to the East Indies.' সংক্ষেপে 'The East India Company' যা অনুমোদিত হয় ১৮৩৩ সালে।[৩]

কোম্পানির সদর দফতর যাকে উল্লেখ করা হয়েছিলো 'The grandest society of merchants in the universe' ছিল লণ্ডনের লিডেনহিল স্ট্রিটে। লন্ডনের আরো অনেক পাথুরে ইমারতের মতোই আকর্ষণীয় ছিল পাথুরে এই চারতলা। পরে, অবশ্য সময় সময় এর পরিবর্তন পরিবর্ধন করা হয়। ভেতরে গলি ঘুপচির মতো করিডোর, অন্ধকার ধোঁয়াটে ঘর। প্রখ্যাত লেখক চার্লস ল্যাম্ব ৩৩ বছর কাজ করেছিলেন কোম্পানির এই হিসাব বিভাগে। লিখেছিলেন, "বছরের অর্ধেক সূর্যরশ্মির বদলে মোমবাতিই ছিল আলোর উৎস।"[৪]

কোম্পানি প্রথম দিকে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য স্থাপনে উৎসাহী ছিল না। তারা উৎসাহী ছিল মশলা দ্বীপের সঙ্গে বাণিজ্য করতে। সুরাটে ১৬০৮ সালে পৌছলেও বাণিজ্যের সুবিধা করতে পারেনি ইংরেজরা পর্তুগিজদের বিরোধিতার জন্য। অনেক বাধা বিপত্তি এড়িয়ে সুরাটেই তারা প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে ১৬১৩ সালে। ১৬৩৩ সাল থেকে তৎকালীন বাংলার সঙ্গে বাণিজ্যের জন্য যোগাযোগ হয়। উড়িষ্যার হরিহরপুরে এ কারণে ১৬৩৩ সালে কোম্পানি একটি বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। সে বাণিজ্যেরও সুবিধা হয়নি। পরে, তারা বাংলার বাণিজ্যে মনোযোগী হয়ে ওঠে এবং ১৬৫১ সালে হুগলীতে স্থাপন করে বাণিজ্য কুঠি যাকে সুশীল চৌধুরী বলেছেন, বাংলার ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম মাইলফলক।[৫]

সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই কোম্পানির বাণিজ্য বিকশিত হতে থাকে। ১৬৪৭ সালে, সারাভারতে ইংরেজদের কুঠি ছিল ২৩টি আর কর্মচারির সংখ্যা

৯০। ১৬৮৭ সাল পর্যন্ত সুরাটই ছিল সদর দফতর। অবশ্য, কিছুদিনের মধ্যে মুম্বাই বা বোম্বাই এবং মাদ্রাজেও দৃঢ়ভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে ইংরেজরা।

বাংলার বাণিজ্যই অন্তিমে লাভজনক হয়ে দাঁড়ায়। কুঠিয়ালরা জানায় কোম্পানির পরিচালকদের, "বাংলাদেশ একটি সমৃদ্ধশালী প্রদেশ। এখানে কাঁচা রেশম, সূক্ষ্ম সূতীবস্ত্র, সোরা প্রচুর পাওয়া যায় এবং সস্তায় পাওয়া যায়। আমাদের ব্যবসা এখানে এত লাভজনকভাবে চলছে যে, অচিরেই আমাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ করার প্রয়োজন হবে এবং নতুন গুদামঘর স্থাপন করতে হবে।"[৬] এরপর ১৬৫৭ সালে, পরিচালকদের নির্দেশে মাদ্রাজ থেকে বাংলাকে আলাদা করে বাংলায় প্রথম এজেন্সি গঠন করা হয়।

বাণিজ্য বৃদ্ধি পেলে ১৬৫৮ সালে কাশিমবাজারে রেশম, ১৬৫৯ সালে পাটনায় সোরা, ১৬৬৮ সালে ঢাকায় মসলিন ও সূতি বস্ত্রের জন্য মালদহে ১৬৭৬ সালে কুঠি স্থাপিত হয়। ১৬৯০ সালে কলকাতায় স্থাপিত হয় বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র।[৭] জব চার্নক সুতানুটি, গোবিন্দপুর নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন কলকাতা।[৮] প্রথমে মুঘলদের অনুমতি নিয়ে বাণিজ্য করলেও পলাশীর যুদ্ধের পর পরিস্থিতি পাল্টে যায়। সেটি আমাদের জন্য খুব একটা প্রাসঙ্গিক নয়।

এর একশ বছরের মধ্যে কোম্পানি বাংলার প্রভু হয়ে বসে। ভারতবর্ষে মুঘলরা তখনও অধিপতি থাকলেও কার্যত তাদের নিয়ন্ত্রণ আর ছিল না। ছোট ছোট করদ রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছিল ভারত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো ফরাসিও ইংরেজ কোম্পানির বাণিজ্য নিয়ে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। ১৭৫৭ সালে রবার্ট ক্লাইভ পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করে কার্যত অধিপতি হয়ে বসেন বাংলা, বিহার আর উড়িষ্যার।[৯] কোম্পানি এরপর দখল করে মহিশূর, হায়দ্রাবাদ। মারাঠারা নতি স্বীকার করে লর্ড হেস্টিংসের সময় (১৮১৩-১৮২৩)। ১৮২৬ সালে আসাম, ১৮৪৩ সালে সিন্ধু, ১৮৪৯ সালে পাঞ্জাব এবং ১৮৫২ সালে নিম্ন বার্মা দখল করে নেয় কোম্পানি। ব্রিটিশ রাজের [সরকারের] প্রশাসনিক এজেন্সীতে পরিণত হয় কোম্পানি। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহও দেশীয়দের সহযোগিতায় দমন করে কোম্পানি 'রাজ'। ১৮৫৮ সালে লুপ্ত হয় কোম্পানি আর ব্রিটেনের রানী নিজের হাতে তুলে নেন ভারতবর্ষের শাসনভার। এর পরের ইতিহাস সবার জানা।[১০]

॥ ২॥

১৭৮৪ পর্যন্ত কোম্পানির প্রশাসন ছিল দু'ভাগে বিভক্ত। একটি হলো, মালিক বা স্টকের মালিক যার সংখ্যা একেক সময় স্বাভাবিকভাবে ছিল একেক রকম। যেমন, ১৮০০ সালে ছিল ২,১৬৩; ১৮৩১ সালে ২১৪০ জন। ২৪ জন ছিলেন ডিরেকটর

বা পরিচালক। মূলধনী স্টকে যিনি শেয়ার কিনতেন তিনিই পরিচিত হতেন মালিক হিসেবে। তাদের কিছু সুযোগ সুবিধা ছিল। তারা মিলিত হতেন 'জেনারেল কোর্ট অব প্রপ্রাইটার্স' এর সভায়। শেয়ার ভেদে নির্দিষ্ট হতো ভোটের সংখ্যা। মাত্র ৫০০ পাউন্ডের মালিকানা থাকলে হাত তুলে ভোট দেয়া যেতো, ১০০০ পাউণ্ড হলে ব্যালটে, ৩০০০ হলে ২ ভোট ৬০০০ হলে ৩ আর ১০,০০০ বা তার ওপরে হলে ৪টি ভোট দেয়া যেতো। বিনিয়োগকারিরা বাৎসরিক ৮ ভাগ ডিভিডেণ্ড সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। এর পর এসব পর্যায়ে অদল বদল হয়েছে কিন্তু মূল কাঠামো একই থেকেছে যার বিস্তারিত বিবরণ এখানে প্রাসঙ্গিক নয়।[১১]

কোম্পানির প্রথম ১৫০ বছর ছিল বাণিজ্যের বিকাশ ও সংহতকরণ এবং সে দিকেই পরিচালকরা মন দিতে চেয়েছেন। এ জন্য বিদেশে তাদের বাণিজ্যও কুঠি রক্ষায় যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই কাজই করেছে। যেমন, কুঠি রক্ষা, নিজেদের রক্ষার জন্য ছোট বাহিনী রাখা ইত্যাদি। প্রাচ্যে ব্যবসায়ের জন্য পরিচালকরা যাদের প্রেরণ করতে চাইতেন তাদের মধ্যে ব্যবসায়িক গুণাবলিই খুঁজতেন, যেমন, বাস্তব ও হিসাব জ্ঞান [হিসাবের নথিপত্র ঠিক রাখা] বিদেশী ভাষা জানা। কর্মঠ ও সচ্চরিত্র। পরিচালকরা নিজেরা বাছাই করে এসব নিয়োগ দিতেন।[১২]

বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতে যারা কর্মরত তাদের একটি প্রশাসনিক কাঠামোর দরকার ছিল, সপ্তদশ শতক থেকে তা ধীরে ধীরে পূর্ণতা পেয়েছে। ১৬৩৮ সালে সুরাটে প্রথম কুঠি বা ফ্যাক্টরি স্থাপন করে কোম্পানির বণিকরা। ১৬৪৩ সালের মধ্যে কুঠি স্থাপিত হয় মসুলিপট্টমে। পরবর্তীকালে, অর্থাৎ সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি, লিজ, ক্রয়, উপহার ইত্যাদির মারফত তারা তাদের জমি [সম্পত্তি] বাড়াতে থাকে এবং দেখা যায় তিনটি এলাকায় তা নির্দিষ্ট রূপ পাচ্ছে। এগুলি হলো মাদ্রাজ বা চেন্নাই, বোম্বাই বা মুম্বাই ও কলকাতা। এখানে নির্মিত হয় কুঠি বা সদর দফতর। তা সুরক্ষিত করার জন্য গ্রহণ করা হয় নানা ব্যবস্থা। এবং তখনিই সুবিন্যস্ত একটি প্রশাসনিক কাঠামোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ কাঠামো একদিনে নয়, ধীরে ধীরে একটি সুসংহত আমলা কাঠামো হয়ে দাঁড়ায় যা উপমহাদেশের প্রায় সব কটি অঞ্চলে এখনও বিদ্যমান।

কোম্পানির আদি 'রিক্রুট'দের অনেকে ছিলেন অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী এবং কোম্পানির চাকরিতে ঢোকার আগে তাদের বেতন আলোচনার মাধ্যমে স্থির হতো। ১৬৭৪ সাল থেকে পরিচালকরা একটি বেতন কাঠামো গড়ায় মন দিলেন। প্রথম নিয়োগ ছিল নবীশ বা এপ্রেনটিস যার বেতন ছিল ৫ পাউন্ড তারপর রাইটার বা লেখক [নকল নবিশ] যার বেতন ছিল ১০ পাউন্ড। ফ্যাকটর বা কুঠিয়াল এবং জুনিয়র ও সিনিয়র মার্চেন্ট বা ব্যবসায়ী পেতেন যথাক্রমে ২০, ৩০ ও ৪০ পাউণ্ড।

৩৬ বাণিজ্যিক এলাকার প্রধান ছিলেন প্রেসিডেন্ট যার বেতন ছিল ৫০০ পাউন্ড। তখন জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতির ওপর গুরুত্ব দেয়া হতো।[১৩]

বছরে ৫ পাউণ্ড বেতনে দীর্ঘদিন বিদেশে পড়ে থাকার জন্য নিশ্চয় কেউ কোম্পানির চাকরিতে আগ্রহী ছিল না। আগ্রহী ছিল, ব্যক্তিগত ব্যবসা যা ছিল নিষিদ্ধ। এসব নিষেধ আদি ব্যবসায়ীরা মানেন নি। ব্যবসা ছাড়াও উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের নানা রকম প্রাপ্তি যোগ ছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর প্রাপ্তিযোগটা আরো বেড়ে যায়। ১৭৭২ সালে ব্রিটিশ সংসদে দেয়া এক হিসেবে জানা যায় কোম্পানির কর্মকর্তারা কী পরিমাণ অর্থ পেয়েছিলেন।

গভর্নর ড্রেক পেয়েছিলেন ২৮০০০০, কর্নেল ক্লাইভ মেম্বার, সেনাপতি ও বিশিষ্ট দান হিসেবে পেয়েছিলেন ১৯০০০০০, মেম্বার ও 'বিশিষ্ট দান' হিসেবে ওয়াটস পেয়েছিলেন ১০৪০০০০, মেজর কিলপ্যাট্রিক বেতন ও অতিরিক্ত হিসেবে পেয়েছিলেন ৪৫০০০০, ক্যানিংহাম ২৪০০০০, কাউনসিলের ৬ জন সভ্য ৬০০০০০০ রুপি।[১৪] ক্লাইভ তো বলেছিলেন তিনি সংযমী, তেমন কিছুই করেন নি। তাঁর বিরুদ্ধে সংসদে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ আনলে তিনি বলেছিলেন "মীর জাফরের নিকট এই রূপ অর্থগ্রহণ অন্যায় কার্য বলিয়া মনে করি না। ইহাতে প্রভু কোম্পানির কোনো ক্ষতি হয় নাই। আমরা কিছুমাত্র না পাইলেও কোম্পানির লাভ ছিল না। আমি স্বয়ং বাণিজ্যাদি ব্যাপারে অর্থসঞ্চয়ের উদ্যোগ না করিয়া চিরদিন যুদ্ধকার্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলাম, কোম্পানির স্বত্ব ও সম্মান রক্ষাই জীবনের ব্রত ছিল। তদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকের অনেকেই আমাকে অর্থোপহার দানে উদ্যত ছিলেন, গ্রহণ করিলে আমি এক্ষণে কোটিশ্বর হইতে পারিতাম।... মুর্শিদাবাদ কোষাগারে প্রবেশ করিয়া চতুর্দিকে যে রাশি রাশি স্বর্ণরৌপ্য ও মণিমুক্তা লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তাহা স্মৃতিপথে উদিত হইলে, আমি এই সামান্য পরিমাণ অর্থগ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি, ইহা আমারই বিশেষ আশ্চর্য বোধহয়।"[১৫]

অর্থ সংগ্রহ শেষে চাকুরেরা লন্ডনে ফিরে সহায় সম্পত্তি কিনে নবাবের মতো বসবাস করতেন। আদি চাকুরেদের নাম হয়ে গিয়েছিলো তাই নবাব। অষ্টাদশ শতকের এই সব চাকুরেদের নিয়ে পার্সিভাল স্পিয়ারতো 'নবাব' নামে একটি বইও লিখেছেন।[১৬] ফলে, কোম্পানির চাকুরি লাভজনক হয়ে উঠলো এবং যারা চাকুরি দিতে পারতেন অর্থাৎ পরিচালকরা তারাও সমাজে প্রভাবশালী হয়ে উঠলেন। এবং সে নাগাদ কিছু পরিমাণ অর্থ আদায়ে তারাও পিছিয়ে ছিলেন না।

আদি যে কাঠামো পরিচালকরা ঠিক করেছিলেন তা হলো– সদর বা প্রেসিডেন্সির প্রধান ছিলেন প্রেসিডেন্ট, পরে সপরিষদ গভর্নর, এরপর কাউন্সিলের সদস্য। কাউন্সিলের সংখ্যাধিক্য ভোটে সিদ্ধান্ত নেয়া হতো। তিনটি প্রেসিডেন্সি ছিল স্বাধীন। এসব প্রেসিডেন্সির অধীনে অধস্তন কুঠি থাকতো। কুঠি রক্ষার জন্য

থাকতো সৈন্যও। এছাড়া পাদ্রী, ডাক্তার ইত্যাদিতো ছিলোই, ফলে, ক্রমপরিণতিতে দেখি, কোম্পানির চাকুরি সুবিন্যস্ত হচ্ছে দু'ভাবে সামরিক ও বেসামরিক। এই বিভক্তিতে, ঘোষালের মতে 'সিভিল সার্ভিস' শব্দটির উদ্ভব হয়। কোম্পানির ৪১টি আদি রেকর্ডের শিরোণাম ছিল 'বেঙ্গল সিভিল সার্ভেন্টস।'[১৭]

কোম্পানির চাকুরেদের বলা হতো সার্ভেন্ট। কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমরা দেখেছি, চাকুরেরা উর্দ্ধতন কর্মকর্তার কাছে আবেদন করলে লিখতেন 'ইয়োর মোষ্ট অবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট।' এই বাক্যের শুরু বোধহয় সেই কোম্পানি আমল থেকে যার ঐতিহ্য আমলাতন্ত্র বহন করেছে ৪০০ বছর। আগেই বলেছি প্রথম নিযুক্তি ছিল, 'অ্যাপ্রেনটিস' পরে তা লুপ্ত হয়ে পদের নাম হয় 'রাইটার'। ষোল-সতের বছরে একজনকে নিয়োগ দেয়া হতো। ধাপে ধাপে উঠতে হতো। চাকুরি ঠিক হলে একটি 'চুক্তি' বা 'কোভেনান্ট' স্বাক্ষর করতে হতো। সেই থেকে উৎপত্তি 'কোভেনান্টেড সার্ভিসের।' এরপর দিতে হতো জামিন। বিভিন্নপদের জন্য জামিনের পরিমাণ ছিল বিভিন্ন রকম– ৫০০ থেকে ১০,০০০ পাউণ্ড। আর এসময় এ কোম্পানি পরিচিত হয়ে ওঠে 'জন কোম্পানি' নামে।

॥ ৩ ॥

নানা ক্রমবিকাশের মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি/ব্রিটিশ সরকার পুরো ভারতবর্ষের জন্য একটি আমলাতান্ত্রিক কাঠামো দাঁড় করাতে পেরেছিলো। পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধনের মাধ্যমে তা পরিণতি লাভ করে। এই আমলাতন্ত্রের কাঠামো শুধু ভারতবর্ষে নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশেও চালু করা হয়। বর্তমান ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে সেই মূল কাঠামোই প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে। এই কাঠামো নির্মাণে পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, রেগুলেটিং অ্যাক্ট, হেস্টিংস, কর্ণওয়ালিস, বেন্টিং প্রমুখের সংস্কার বড় ভূমিকা পালন করেছিল। এই কাঠামো আলোচনা আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক নয় তবে একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা প্রদান করবো সিভিলিয়ানদের সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্যে।

ফিলিপ উডরাফ দু'খণ্ডে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের ইতিহাস লিখেছেন। তাঁর সুরটা স্বাভাবিকভাবেই পৃষ্টপোষকতার বা প্যাট্রোনোইজেশনের। ভারতে যারা চাকুরি করতে এসেছিলেন তাদের কর্মকাণ্ডকে উডরাফ চারটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন-

১. শুরুতে যখন কোম্পানির চাকুরেরা ছিল মুঘলদের অর্থী
২. তারপর ক্রান্তিকাল যখন কোম্পানি প্রভু হয়ে দাঁড়ালো
৩. এরপর দেড়শো বছর যখন তারা এই বিরাট ভূখণ্ড শাসন করলো

৪. শেষ ত্রিশ বছর যখন তারা "বিচার বিবেচনা করে ক্ষমতা হস্তান্তর করলো।"

এর মধ্যে তৃতীয় পর্যায়টিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ কোম্পানি শাসন। তারপর রাজার শাসন।[১৮]

উডরাফের এই পর্যায়গুলি মেনে নিলেও একটি বিষয় উল্লেখ করতে পারি, তা হলো ক্ষমতা বিচার বিবেচনা করে হস্তান্তর করা হয়নি। ক্ষমতা হস্তান্তর করতে ব্রিটেন বাধ্য হয়েছিলো।

আগে উল্লেখ করেছি, আদি চাকুরেদের একটি বড় সুবিধা ছিল বা কোম্পানি সেই সুবিধা দিয়েছিলো, সেটি হলো ব্যক্তিগত বাণিজ্যের সুবিধা। চাকুরেদের সঙ্গে যে চুক্তি করা হতো তাতে এর উল্লেখ থাকতো। আগে, বাণিজ্য করার সুবিধা সীমিত ছিল আমদানী রপ্তানি বাণিজ্যে কিন্তু ১৭৫৭ সালের পর রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে এলে চাকুরেরা অন্তর্বাণিজ্য শুরু করে। ১৭১৬ সালে, মুঘল সম্রাট ফররুখশিয়ার তাদের বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার সুবিধা দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা পাওয়ার পর তারা সে সনদ ও কোম্পানির অধিকার দু'টিই কাজে লাগায়। এর ফলে, চাকুরেদের কোম্পানির স্বার্থের প্রতি আগ্রহ কমে গেল। আর, নওয়াবের ক্ষতিতো হচ্ছিলোই কারণ তার সরকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। মীরজাফরও এ ব্যাপারে কোম্পানির কাছে অনুযোগ করেছিলেন। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রকারের উপঢৌকন তো ছিলই যার কথা উল্লেখ করেছি। যে ক্লাইভ 'নবাব' হয়ে ফিরেছিলেন লণ্ডনে, তাঁকে আবার পাঠানো হয় ভারতে সব বিষয়ে খতিয়ে দেখে সংস্কারের পরামর্শ দিতে। ক্লাইভ এসে বলেছিলেন, এটি হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে নষ্ট জায়গা যেখানে সব সিভিলিয়ানদের মাথায় কয়েকটি বিষয়ই ঘুরপাক খায়– নীতিহীনতা, দুর্নীতি, ব্যভিচার।[১৯]

এই ব্যক্তি বাণিজ্য ও দ্বৈতশাসনের কারণে প্রশাসন প্রায় ভেঙ্গে পড়েছিলো এবং ভারতে কোম্পানির সিনিয়র চাকুরেরা চাচ্ছিলেন ইংল্যান্ডের কোম্পানির পরিচালকরা কিছু করুক। তৎকালীন গভর্নর ভেরলেস্ত ও আরো অনেকে এ ব্যাপারে চাপ দিচ্ছিলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানি সিদ্ধান্ত নিলো বিভিন্ন এলাকায় তত্ত্বাবধায়ক বা সুপারভাইজার নিয়োগ করা হবে।[২০]

তত্ত্বাবধায়কের কাজ ছিল প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কাজের মিশ্রণ। বলা যেতে পারে ভারতে যে ফর্মাল আমলাতন্ত্রের বিকাশ, তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা ছিল তার ভিত। ১৭৬৯ সালে এই ব্যবস্থা কার্যকর হয়। ঠিক হলো, ঢাকা ছাড়া সব সুপারভাইজারদের নিয়ন্ত্রণ করবে মুর্শিদাবাদ দরবারে নিযুক্ত কোম্পানির রেসিডেন্ট, বিহারে পাটনার কুঠি প্রধান, ঢাকার কুঠি প্রধান ছিলেন বেঙ্গল বোর্ডের প্রধান সে কারণে তাকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণে না এনে তাকে দায়বদ্ধ করা হলো রেসিডেন্টের কাছে।

কিছুদিন পর দেখা গেল, কোনো ব্যবস্থাই তেমন ফলপ্রসু হচ্ছে না। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৭৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট পাশ করে রেগুলেটিং অ্যাক্ট। এর ফলে, তিনটি প্রেসিডেন্সিকে একত্রিত করে গঠিত হয় কেন্দ্রীয় সরকার তবে, বাংলা ছিল কেন্দ্রের সরাসরি অধীন। বাংলা প্রেসিডেন্সি শাসন করার জন্য থাকবেন একজন গভর্নর জেনারেল যাকে সাহায্য করবেন ৪ জন উপদেষ্টা বা কাউন্সিলর এবং একত্রে এর নাম হবে 'গভর্নর জেনারেল অ্যান্ড কাউন্সিল অব দি ফোর্ট উইলিয়াম ইন বেঙ্গল।' কাউন্সিল সদস্যদের সবার অধিকার সমান তবে ভোটাভুটির ক্ষেত্রে গভর্নর জেনারেলের 'কাস্টিং ভোট' থাকবে। বোম্বে ও মাদ্রাজের কর্মকাণ্ডও এরা তত্ত্বাবধান করবেন। কলকাতায় স্থাপিত হবে সুপ্রিম কোর্ট আর থাকবে তিনজন বিচারক যারা ব্রিটিশ প্রজাদের শাসন করবে। শাসনের জন্য স-পরিষদ গভর্নর জেনারেল আইন প্রণয়ন করবে। তবে, কোনো রকমেই তা ব্রিটিশ আইনের পরিপন্থি হবে না, শাসন সংক্রান্ত সব নথিপত্র পাঠাতে হবে লণ্ডনে পরিচালকদের কাছে, তারা আবার এর সারমর্ম জানাবে পার্লামেন্টে ভারত বিষয়ক কমিটিকে।[২১] এভাবে বাণিজ্যিক সংস্থা পরিণত হলো রাজনৈতিক সরকারে। আর ঐ যে বলা হলো কোনো আইন ব্রিটিশ পরিপন্থি হবে না, যে কারণে আমাদের জন্য যে সব আইন করা হলো এবং যা এখনও বলবৎ তার ভিত্তি হলো ব্রিটিশ আইন।

রেগুলেটিং অ্যাক্ট সব অসঙ্গতি দূর করতে পেরেছিলো এমন নয়। সে জন্য ১৭৮৪ সালে পাশ হয় 'পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট'। এ আইনে কাউন্সিলের সদস্য করা হয় ৩ জনকে, কোম্পানির সেনাবাহিনীর প্রধানকে করা হয় সিনিয়র কাউন্সিলর, বৃদ্ধি করা হয় গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা। অন্যদিকে লণ্ডনে সামগ্রিক তত্ত্বাবধানের জন্য গঠন করা হয়, বোর্ড অব কনট্রোল। এর সদস্য ছিলেন সেক্রেটারি অব স্টেট, চ্যান্সেলর অব দি এক্সচেকার ও ছয়জন প্রিভি কাউন্সিলর। এটি ছিল কোম্পানির পরিচালকদের ওপরে। পরবর্তীতে গভর্নর জেনারেলকে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান করা হয়। কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ সালের রেগুলেশানে [কর্নওয়ালিস কোড] আরো পরিবর্তন আনেন এবং বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে আলাদা করেন।[২২]

১৮৩০ সালে একটি কমিটি [সিভিল ফিন্যান্স কমিটি] কোম্পানির প্রশাসনের ব্যাপারে কিছু পরামর্শ প্রদান করে। তাদের প্রস্তাব ছিল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির নিয়ন্ত্রণ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে আলাদা করতে হবে। আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণ করবে কেন্দ্রীয় সরকার যার অধীনে থাকবে একটি সেনাবাহিনী ও সিভিল সার্ভিস।

এই প্রস্তাবসমূহ বিবেচনার জন্য পার্লামেন্ট একটি সিলেক্ট কমিটি গঠন করে যারা প্রশাসন, রাজস্ব, অর্থ, ব্যবসাবাণিজ্য ও বিচার বিভাগের ওপর ৫টি প্রতিবেদন তৈরি করে। ১৮৩৩ সালের আগে কোম্পানি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা করতে হলে এই রিপোর্ট অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৩৩ সালে পাশ করা হয় 'ইন্ডিয়া অ্যাক্ট' যার মূল

বৈশিষ্ট্য ছিল–

১. বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে দু'ভাগে ভাগ করে পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় আগ্রা (প্রেসিডেন্সি)।

২. গঠন করা হয় গভর্নর জেনারেল অব ইন্ডিয়া ইন কাউন্সিল যার অধীনে থাকবে সব প্রেসিডেন্সির সামরিক বেসামরিক বিষয়

৩. সুপ্রিম কাউন্সিলে ৩ জন সাধারণ সদস্য ও ১ জন (সেনাপ্রধান) অসাধারণ সদস্য থাকবে। সদস্যদের ভারতে ১০ বছরের বসবাসের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

৪. কেন্দ্র এখন থেকে বিধি নয়, আইন করার অধিকার পাবে এবং এ জন্য একটি আইন পরিষদ (লেডিজসলেটিভ কাউন্সিল) থাকবে। এখানে গভর্নর জেনারেল, কাউন্সিল ও অতিরিক্ত একজন আইন সদস্য থাকবেন। [প্রথম আইন সদস্য ছিলেন লর্ড মেকলে] ১৮৩৫ সালে আবার চার্টার আইন সংশোধন করে বাংলার জন্য একটি লে. গভর্নরের পদ সৃষ্টি করা হয়। রাজধানী হবে কলকাতা, স্বাভাবিক ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের স্থানও হবে তা।

রেগুলেটিং অ্যাক্টকে সীমারেখা ধরে বলতে হয় সে সময় থেকেই কেন্দ্রীয় সচিবালয় গড়ে উঠতে থাকে। প্রথম দুটি বিভাগ দিয়ে এর যাত্রা শুরু যার প্রধান সচিব, তাকে সহায়তার জন্য দু'জন সহকারি সচিব, তাদের কয়েকজন সহকারি এবং সবশেষে রাইটার। কিছুদিন পরপর এর বদল হয়। যেমন, ওয়েলেসলির সময় (১৭৯৮-১৮০৫) ৪টি বিভাগ হয়– ১. রাজনৈতিক, গোপন ও বৈদেশিক, ২ রাজস্ব ও বিচার, ৩. বাণিজ্য এবং ৪. সামরিক। প্রতি বিভাগের একজন সচিব ও একজন প্রধান সচিব। এটিই মূল কাঠামো হিসেবে থেকে যায় কিছু রদবদলসহ। এদের বেতনও বৃদ্ধি করা হয়। সচিবরা পেতেন বাৎসরিক ৫০,০০০ আর প্রধান সচিব ৫৫,০০০ রুপি।

ঔপনিবেশিক আমলে, শাসনের প্রধান চালিকা শক্তিই ছিল জেলা। সিরাজুল ইসলাম ঠিকই বলেছেন, কোম্পানির 'হোম গভর্নমেন্ট' গঠিত ছিল বোর্ড অব কন্ট্রোল, কোর্ট অব প্রোপ্রাইটার্স, কোর্ট অব ডাইরেকটার্স প্রভৃতি নিয়ে। কোম্পানির সুপ্রিম গভর্নমেন্টের ভিত্তি ছিল রেভেনিউ বোর্ড, গভর্নর জেনারেল কাউন্সিল, সচিবালয় ইত্যাদি নিয়ে। সাধারণ মানুষের কাছে এগুলি ছিল ধরা ছোঁয়ার বাইরে। প্রথম দু'টি নীতি নির্ধারণ করতো। "কিন্তু কার্যত প্রশাসন ক্ষেত্রে নীতি-নির্ধারণের মূলে ছিল জেলা কর্তৃপক্ষই। কোম্পানির শাসন জনমতের তোয়াক্কা করেনি। বিশেষ সমস্যার উদয় হলে বা কোনো নতুন ব্যবস্থা গ্রহণের সময় জেলা কর্তৃপক্ষের স্থানীয় অভিজ্ঞতা ভিত্তিক রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে সুপ্রিম গভর্নমেন্ট সম্মতি চাইতো হোম গভর্নমেন্টের। হোম গভর্নমেন্টের নির্দেশে সুপ্রিম গভর্নমেন্টে যে

নীতি নির্ধারণ করে সে নীতি কার্যকর করে জেলা কর্তৃপক্ষ। অর্থাৎ প্রকাশ্যে জেলা কর্তৃপক্ষ যে নীতি কার্যকর করে সে নীতির নেপথ্য নায়ক জেলা কর্তৃপক্ষই। এক কথায় জেলাই ছিল কোম্পানির প্রশাসনিক ভিত্তি।"[২৩] সাধারণের কাছে 'মা বাপ' বা 'কোম্পানি বাহাদুর' ছিল জেলা কর্তৃপক্ষ।

হেস্টিংসের আমল থেকে জেলা নিয়ে বিভিন্ন বিন্যাস শুরু হয়। কর্ণওয়ালিসের সময়ে এসে তা একটা আকার পায়। ১৭৯৩ সালে তিনি জেলায় দু'টি কর্তৃপক্ষ গঠন করেন- সিভিলজজ ও ম্যাজিস্ট্রেট এবং কালেক্টর। সিভিল শাসনকে ওপরে রাখার কারণে (কর্তৃপক্ষ) প্রশাসনে ওপরের পদমর্যাদা দেয়া হয় জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটকে যাদের মাসিক বেতন ছিল ২৫০০ থেকে ৩০০০ রূপি। আর কালেকটরের ১৫০০ থেকে ২০০০। বেন্টিং কয়েকটি জেলা নিয়ে বিভাগ ও তার প্রধান হিসেবে কমিশনার পদ সৃষ্টি করেন। কমিশনারের মাধ্যমেই যোগাযোগ হতো কেন্দ্রের সঙ্গে। বেন্টিংয়ের সময় জেলা প্রশাসনে বেশ পরিবর্তন হয়। প্রতি জেলায় অতিরিক্ত জজ (১৮৩৩), কালেকটরের সহায়তা করার জন্য ডেপুটি কালেকটর (১৮৩৩), ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট (১৮৪৩), জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট (১৮৫৯) পদসমূহ সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীকালে এইসব ডেপুটির পদ দেয়া হয় ভারতীয়দের। প্রশাসনে, এভাবে ভারতীয় অধস্তন ক্যাডার বা 'ছোটা সাহেব'দের উদ্ভব হয়। এরপর সৃষ্টি হয়, এসডিও ইত্যাদি। ১৮৩৫ সালে ইংরেজি ফার্সির স্থান দখল করে নেয়। এ সময় পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ান ও 'প্রজা'দের মধ্যে ছিলেন অধস্তন 'নেটিভ' আমলারা, এরপর ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত দেশীয় মধ্যবিত্তরা সিভিল সার্ভিসে আসতে থাকে। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের কাঠামোর তখন ব্যাপক পরিবর্তন আসে।

ইংরেজ শাসন বিস্তৃত ও সুদৃঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কভেনান্টেড চাকরির চাহিদা বেড়ে যায়। বৃটেনেই চাপ বাড়তে থাকে। শুধু কোম্পানির পরিচালকদের পৃষ্ঠপোষকতাই সাধারণের ভারতে আসার অধিকার বা ভারতে তাদের প্রশাসক হিসেবে পাঠানো উচিত, এমনটি মনে করতেন পরিচালকরা। এর সঙ্গে ভালো 'চাকুরি' ও 'ভাগ্যান্বষণের' ব্যাপারটিও জড়িত ছিল। ইতোমধ্যে ভারতে চাকুরি পরিচিত হয়ে ওঠে 'ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস' নামে। সে পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৫৩ সালে সিদ্ধান্ত হলো যে, বোর্ড অব কন্ট্রোলের অধীনে 'পাবলিক' পরীক্ষা হবে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের জন্য। ব্রিটিশ সরকার ভারতের ভার গ্রহণ করলে ১৮৫৮ সাল থেকে পরীক্ষা শুরু হলো সিভিল সার্ভিস কমিশনারর্সের অধীন তবে তা ছিল ব্রিটিশদের জন্য। ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার তাতে ছিল না। ১৮৫৮ সালে রানী ভিকটোরিয়া ভারতশাসনভার গ্রহণ করলে এই বিষয়টি সামনে চলে আসে অর্থাৎ ভারতীয়রা কেন এই অধিকার পাবে না? এবং পরীক্ষাও দিতে হতো লন্ডন থেকে।

এই যুক্তি ঠিক হলেও প্রকাশ্যে সরকার এর পক্ষে বিপক্ষে কোনো মন্তব্য করেনি।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও মনোমোহন ঘোষ এই দুই বন্ধু সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার জন্য লন্ডন গেলেন। বয়স তখন তাঁদের খুবই কম। ১৮৬৪ সালে পাশ করলেন সত্যেন্দ্রনাথ। লিখেছেন তিনি, "যখন পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয় আমি মনোমোহনের সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণে বেরিয়েছি– প্যারী নগরীতে 'পাস' হওয়ার সংবাদ আমার হাতে এল। আমি 'পাস' মনোমোহন ফেল। আমি প্রথম বছরেই পরীক্ষাত্তীর্ণ হতে পারব এমন আশা করি নাই।"[২৪]

১৮৬৪ সালে পাশ করার পর সত্যেন্দ্রনাথ প্রশিক্ষণ শেষে আই.সি.এস. হয়ে ভারতে ফেরেন এবং মহারাষ্ট্রে নিয়োগ পান অ্যাসিসটেন্ট কালেক্টর হিসেবে। কিন্তু চাকুরিতে বেশিদূর উঠতে পারেন নি। কারণ, ইংরেজরা বাধ্য হয়ে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের দ্বার উন্মুক্ত করেছিলো বটে কিন্তু তারা আসলে চাচ্ছিলো, ভারতীয়বিহীন ভারতীয় সিভিল সার্ভিস।

ঐ সময় পরীক্ষা দেওয়ার সর্বোচ্চ বয়স ছিল ২৩। কিন্তু দু'তিনজন করে ভারতীয়রা আই.সি.এস. হতে থাকলে ১৮৭৬ সালে পরীক্ষা দেওয়ার সর্বোচ্চ বয়স করা হয় ১৯। ফলে, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয়। কারণ, ভারতীয়রা তখন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বেরুচ্ছে, তাদেরও চাকুরি দরকার এবং সরকার হচ্ছে তখন প্রধান নিয়োগদাতা। ভারতীয়দের দাবি ছিল পরীক্ষা দেওয়ার সর্বোচ্চ বয়স ২৩ হতে হবে এবং ভারতেও পরীক্ষা হতে হবে। কংগ্রেসও এই দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু করে, ব্রিটিশদের এই দাবি মনঃপুত হচ্ছিলো না। কিন্তু এই দাবি সবসময় ওঠাতে ১৮৭৮ সালে বলা হলো 'Statutory Civil Service' প্রতিষ্ঠা করা হবে ভারতীয়দের জন্য। এ সার্ভিসের সদস্যরা একটু উচ্চপদ পাবেন এবং প্রধানত নিযুক্তি পাবেন বিচার বিভাগে। এই সার্ভিসের একজনের পদমর্যাদা যদি আই.সি.এসের কোনো সদস্যের পদমর্যাদার সমান হয়ে যায় তাহলে প্রথমোক্ত সার্ভিসের সদস্য দ্বিতীয়ক্তোর তুলনায় দুই-তৃতীয়াংশ বেতন পাবেন। এটি ভারতীয়দের কাম্য ছিল না। ফলে, ১৮৮৫ সালে এই সার্ভিস বাতিল করা হয় এবং ১৮৮৯ সালে বয়স সীমা ফের ২৩ করা হয়। তবে, ১৯১২ থেকে ভারতেও আই.সি.এস. পরীক্ষা নেয়া শুরু হয়।

ইতোমধ্যে সিভিল সার্ভিসের অনেক শাখাপ্রশাখা সৃষ্টি হয়েছিলো। কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস [আই.সি.এস] প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস [যেমন, বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস, পাকিস্তান আমলের ইপিসিএস] প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছিলো। আই.সি.এস এ অনেক ক্যাডারের সৃষ্টি হয়েছিলো পররাষ্ট্র, পুলিশ, বন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি, ফলে, চাকুরির সৃষ্টি হয়। ভারতীয়দের তখন আর আটকে রাখা যায়নি। প্রথমদিকে ভারতীয় আই.সি.এসরা মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও উঁচু পদে যেতে পারতেন না।

রমেশচন্দ্র মিত্রের মতো যশস্বীও কমিশনার পর্যন্ত উঠে যখন বুঝলেন যে, আর প্রমোশন হবে না তখন অবসর গ্রহণ করেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়কে তো চাকুরি জীবনের শুরুতেই কর্মচ্যুত করা হয়।

১৯২২ সালে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ বলেছিলেন, আই.সি.এস হচ্ছে ভারতীয় শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ইস্পাত কাঠামো, "You take the frame out. the stucture will collapse."[২৫]

না, 'কোলাপস' করেনি। ১৯৪৭ এর পর স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশ আই.সিএসরা দেশত্যাগ করতে থাকেন। পাকিস্তান-ভারতে চাকুরির কাঠামো ঠিক না হওয়া পর্যন্ত অনেক ইংরেজ থেকে যান। ভারতীয়রা তো ছিলেনই। যেমন, আর্থার ড্যাশ ছিলেন পূর্ববঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান, ফ্রেডারিক বোর্ন গভর্নর। ভারত-পাকিস্তান এরপর যে কাঠামো গড়ে তোলে তার সঙ্গে ইংরেজ সৃষ্ট কাঠামোর তেমন মৌলিক কোনো প্রভেদ ছিল না। ভারতীয় কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস পরিচিত হয়ে উঠে 'ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস' নামে আর পাকিস্তানেরটি 'সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান' [সিএসপি] নামে। শুধু কাঠামো নয়, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাও প্রায় একই রকম থেকে যায়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ হয়েছে। সেখানেও মূলত কাঠামো একই রয়েছে। অর্থাৎ, কোম্পানি আমলে উপমহাদেশে যে চাকুরি কাঠামোর সৃষ্টি এখনও তার রেশ রয়ে গেছে। তবে, প্রভাব-প্রতিপত্তির হেরফের ঘটেছে স্বাভাবিকভাবেই। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্যরা জনপ্রতিনিধিদের অধীনে বা নিয়ন্ত্রণে থেকে দেশ পরিচালনায় সাহায্য করেছেন। কারণ সেখানে ১৯৪৭ থেকে জনপ্রতিনিধিরাই শাসন করেছেন। কিন্তু পাকিস্তান বাংলাদেশে হয়েছে উল্টোটি। সেখানে এরাই শাসক হয়ে বসেছেন এবং যারা সামরিক আমলা তারাই প্রাধান্য পেয়েছেন। কোম্পানি থেকে ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত যা কখনও হয়নি বা যা কেউ চিন্তাও করেনি।

॥ ৪ ॥

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ফ্যাক্টরি বা কুঠি স্থাপিত হলেও ধরে নেয়া হয় ১৬৯০ সালে জব চার্নক তিনটি গ্রামের জমিদারি কিনে কলকাতার পত্তন করলে বাংলায় সূচনা হয় ইংরেজ শাসনের ভিত্তি। ভারতবর্ষে কোম্পানির বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল কলকাতা কারণ তা ছিল স-পরিষদ গভর্নর জেনারেলের শাসন কেন্দ্র।

ভারত সম্পর্কে ইংরেজ বণিকরা হয়ত কিছু জানতেন কিন্তু তেমন নয়। প্রথম দিকে ভাগ্যান্বেষী ও যাদের খুব প্রয়োজন তারাই সুদূরে চাকুরির সুবাদে ভারতে এসেছিলো বলে ধরে নিতে পারি। এক হিসেবে জানা যায়, পলাশীর যুদ্ধের আগে

কোম্পানির সিভিল সার্ভেন্টদের সংখ্যা ছিল ৭৬ আর ফোর্ট উইলিয়ামে ইউরোপিয় সৈন্য সামন্তের সংখ্যা ২৩০ এবং অন্যান্য অঞ্চলে ২৪০ জন। কোম্পানির বাইরে ইউরোপিয়দের সংখ্যা ১০০ এর বেশি ছিল না।[২৬]

সুরেশচন্দ্র ঘোষ উল্লেখ করেছেন, কলকাতা ও অন্যান্য অঞ্চলে ইংরেজ সমাজের চরিত্র ছিল পিতৃত্বমূলক। কোম্পানি/ফ্যাক্টরির চত্বরেই তাদের কাজকর্ম, বিনোদন, ঘুম সব। ১৮০৩ সালের মধ্যে এই চরিত্র পাল্টে যায়। এ সময়ের মধ্যে প্রসারিত হয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্য, গুরুত্বও বেড়েছে। কিন্তু অচিরেই তা ঢাকা পড়ে যায় সিভিল সার্ভিস দ্বারা যার সদস্য কালেক্টর, ম্যাজিস্ট্রেট, জজ ইত্যাদি। ফোর্ট উইলিয়ামে সৈন্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৫০০০ যেখানে তখন 'নেটিভরা'ও ছিল। সুরেশ চন্দ্র এখানে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেছেন। ১৬৫০ এর দিকে রাইটার, কালেক্টর বা মার্চেন্টরা বছরে পেতেন ১০ থেকে ৪০ পাউণ্ড, থাকা-খাওয়া ফ্রি এবং ব্যক্তিগত ব্যবসার আয় ছিল সুবিধা। কর্নওয়ালিসের সংস্কারের পর (১৭৯৩) বেতন দাঁড়ালো ৩ বছর চাকুরির পর ৫০০ পাউণ্ড, ৬ বছর পর ১৫০০, ১২ বছরের পর ৪০০০। তারপর কাউন্সিল সদস্য হলে তো কথা নেই, বছরে ১০,০০০ পাউণ্ড আর গভর্নর জেনারেল হলে ২৫,০০০ পাউণ্ড। তবে, সৈনিকদের বেতন তুলনামূলকভাবে কম ছিল। লেফটেন্যান্ট ২৫০ পাউন্ড, লে. কর্ণেল ১৫০০ পাউণ্ড। এছাড়া অন্যান্য চাকুরিতো ছিলই। লণ্ডনের তুলনায় এখানে বেতন কম ছিল না। শুধু তাই নয় কলকাতা ও অন্যান্য অঞ্চলে তারা জাঁকালোভাবে বসবাস করতেন।[২৭]

প্রথম দিকে চাকুরেরা ব্যবসা-বাণিজ্য করলেও ভাগ্য তেমন ফেরাতে পারেনি। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর পরিবর্তনটি হয় দ্রুত। এই সময়টা ছিল লুটপাটের। ইংরেজ 'নবাবদের' উত্থান এই সময়েই যার কথা আগে উল্লেখ করেছি। বিশ শতকের সত্তর দশকে বাংলাদেশে রব উঠেছিলো, ভাগ্য ফেরাতে হলে যেতে হবে মধ্যপ্রাচ্যে, সে সময় ভারতে গেলে ভাগ্য ফেরে এ কথাটি ইংল্যাণ্ডে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলে ইউরোপিয় ভাগ্যান্বেষীর সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং কোম্পানির পরিচালকদের যে পৃষ্ঠপোষকতা ব্যবস্থা ছিল তার ওপরও চাপ পড়তে থাকে। নিয়োগের ক্ষেত্রে ঘুষের আদান প্রদান শুরু হয়। এ কারণেই বিভিন্ন সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। এবং বিভিন্ন সংস্কারের মাধ্যমে সিভিল সার্ভিসের একটি কাঠামো গড়ে উঠে এবং পরবর্তীকালে তা স্বাধীন সত্তা হিসেবে কাজ করতে থাকে। তখন চাকুরির মাপকাঠি হয়ে ওঠে যোগ্যতা এবং মেধা। সুরেশচন্দ্র এক হিসেবে জানিয়েছেন, পরিচালকরা তখন বছরে প্রায় ১১৫ জনকে পাঠাতেন বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই। এর মধ্যে ৩০ জন রাইটার বাকীরা ক্যাডেট।[২৮]

কোম্পানির রাইটার হতে হলে প্রয়োজন ছিল বাণিজ্যিক অংক জানা ও খাতা-লেখার অভিজ্ঞতা। এ বিষয়গুলি শিক্ষা দেবার জন্য বিভিন্ন কোচিং সেন্টার গড়ে উঠেছিলো বিভিন্ন এলাকায়। ঐ আমলের বিখ্যাত স্কুল হ্যারো, ঈটন বা ওয়েস্টমিনিস্টারের ছাত্র কদাচিৎ চাকুরি পেয়েছে, ওয়ারেন হেস্টিংস ছিলেন ওয়েস্টমিনিস্টারের ছাত্র। তাঁর যখন ভারতবর্ষে যাওয়ার কথা ঠিক হলো তখন তাঁর চাচা তাকে ওয়েস্টমিনিস্টার ছাড়িয়ে এরকম একটি কোচিং স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন।[২৯]

১৮০০ সাল পর্যন্ত যারা চাকুরি নিয়ে ভারতে এসেছেন তাদের নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। ১৮০০ সালের পর যারা এসেছেন তাদের সম্পর্কে বরং তথ্য পাওয়া যায় কম। প্রাইস লিখেছেন ১৭৮৩ সালের "আগে রাইটার পদের জন্য যেসব তরুণদের যাচাই করা হতো তারা ছিল মধ্যশ্রেণির, যেমন, কোম্পানির পরিচালক তাদের সামরিক ও নৌ অফিসার, পুরনো চাকুরে, দেশের বণিক বা পুঁজি বিনিয়োগকারি যারা যুক্ত ছিল কোম্পানির সঙ্গে তাদের পুত্রঃ পরবর্তীকালে সমাজের উচ্চবর্গের এবং অভিজাতদের কিছু পুত্রকে নেয়া হয়েছিলো চাকুরিতে।"[৩০]

সুরেশচন্দ্র লিখেছেন, আসলে 'অভিজাতদের' বা উচ্চবর্গের সন্তানরা এসেছে বলে প্রাইস যে মন্তব্য করেছেন ঠিক নয়। তিনি রাইটারদের নিয়োগের প্রচুর নথিপত্র ঘেঁটে ১৭৬৮, ১৭৮০ ও ১৮০০ এর একটি হিসাব দিয়ে বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন। ১৭৬৮ ও ১৮০০ সালে উচ্চবর্গের কেউ রাইটার হয়নি, তবে ক্যাডেট হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলো যথাক্রমে ৭ ও ৫ জন, ১৮০০ সালে নিয়োগ পায় ৩ জন রাইটারও ৯ জন ক্যাডেট, মধ্যবর্গ (বণিক, পেশাজীবী) থেকে ১৭৬৫, ১৭৮০ ও ১৮০০ সালে রাইটার হয়েছে যথাক্রমে ১৫,৯ ও ১৯ জন। আর ক্যাডেট ২০,৪৭ ও ৮১ জন। নিম্নবর্গের (আর্টিজান ও ক্র্যাফটসম্যান) একজনও রাইটার হয়নি ঐ সময়ে তবে ক্যাডেট পদে নিয়োগ পায় ১,১ ও ৫ জন।[৩১]

উচ্চবর্গের কনিষ্ঠ সন্তান যেহেতু সম্পত্তি পেতেন না তাই তারা ক্যাডেট হিসেবে ভারতে পাড়ি দিয়েছিলেন। যে ৩ জন জ্যেষ্ঠ সন্তান ঐ সময় রাইটার হয়েছিলেন তাদের পরিবারের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়েছিলো। তাঁরা হলেন ১৭৬৯ সালে জন হ্যাডলি ডয়লি, ১৭৭২ সালে ব্যালক্যারেসের আর্লের পুত্র রবার্ট লিন্ডসে এবং চার্লস ক্লার্ক। সুতরাং এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ধারা বিচার করা যাবে না।[৩২] তবে, একতাবদ্ধ ছিলো তারা যা স্বাভাবিক। অচেনা দেশে, অচেনা পরিবেশ ও মানুষের মাঝে বসবাস করলে একতাবদ্ধ না থাকলে বেঁচে থাকাই দুষ্কর। সুরেশচন্দ্র উল্লেখ করেছেন, বিভিন্ন সার্ভিসের সদস্যদের মাঝে আত্মীয়তার বন্ধন তা আরো দৃঢ় করেছিলো। এদের তিনি 'ব্রিটিশ অফিসিয়াল ফ্যামিলি' বলে উল্লেখ করেছেন। আদিপর্বে রাইটার/ ক্যাডেটদের সিংহভাগ ছিল সন্তান, ভাই-ভাতিজা,

আত্মীয়স্বজন। এরা চাকুরিতে ভালো করতে থাকলে দেশ থেকে নিয়ে আসতেন পরিবার পরিজন।

এ ধরনের কয়েকটি পরিবারের কথা উল্লেখ করলে প্যাটার্নটি পরিষ্কার হবে। প্রথমেই উল্লেখ করতে চাই থ্যাকারের কথা। কারণ, এই বংশের উইলিয়াম থ্যাকপিস থ্যাকারে লেখক হিসেবে যশস্বী হয়েছিলেন।

ডা. থমাস থ্যাকারে ছিলেন ইয়র্কশায়ারের ডাক্তার। তাঁর সন্তান সংখ্যা ছিল ১৬, এর মধ্যে কনিষ্ঠতম উইলিয়ামের জন্ম ১৭৪৯ সালে, ১৭৬৫ সালে বাংলায় রাইটারের নিয়োগ পেলেন। বিধবা মায়ের জন্য কনিষ্ঠ সন্তানের চাকুরি লাভ ছিল আশীর্বাদ। অষ্টাদশ শতকে ক্যারিয়ার (ভাগ্য) গড়ার জন্য এটিই ছিল সোনার চাবি, কোনো প্রশিক্ষণ, কোনো পরীক্ষা ছাড়াই এই নিয়োগপত্র পান উইলিয়াম।[৩৩]

থ্যাকারে প্রথম চাকুরি পেলেন সেক্রেটারিয়েট অফিসে। ১৭৬৮ সালে সরকারি খাজাঞ্চি। এ সময় নিয়ে এলেন দুইবোন হেনরিয়েটা ও জেনকে। ১৭৭১ সালে প্রমোশন পেলেন ঢাকা কাউন্সিলের চতুর্থ সদস্য হিসেবে। কুঠি প্রধান জেমস হ্যারিস ঐ বছরেই বিয়ে করলেন হেনরিয়েটাকে আর বিখ্যাত গবেষক ভুগোলবিদ রেনেল ১৭৭৮ সালে বিয়ে করলেন জেনকে। দু'জনেই কোম্পানির পদস্থ চাকুরে, ঢাকায় রেনেলের কন্যাসন্তান জন্মের পর মারা যায়, যার সমাধি আছে ঢাকার নারিন্দায় খ্রিস্টানদের কবরস্থানে। এক বছরের মাথায় থ্যাকারে সিলেটের কালেক্টর পদে মনোনীত হন। সিলেটে প্রভূত অত্যাচার করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন এবং তাঁর নামই হয়ে যায় সিলেট থ্যাকারে। তাঁর বেনিয়া রঘু মল্লিক চরম অত্যাচার করে টাকা আদায় করতো। এই অত্যাচারে সিলেট, 'ডিপপুলেটেড' হয়ে যায়। ১৭৭৫ সালে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে সিলেটের জমিদার, তালুকদার ও অন্যান্যরা আবেদন করেন।[৩৪] এ ভাবে সে সময় সিভিলিয়ানরা নবাব ও বেনিয়া বা তার অধীনস্থ কর্মচারিরা বাবু হয়ে উঠতেন।

১৭৭৫ থ্যাকারে নিয়োগ পান ঢাকা কাউন্সিলের তৃতীয় সদস্য হিসেবে। ১৭৭৫ সালে বদলি হন কলকাতায়, সেখানে পরের বছর বিয়ে করলেন লে. কর্ণেল রিচমন্ড ওয়েবের কন্যা অ্যামেলিয়াকে, ওয়েব আবার জেনারেল জন রিচমন্ড ওয়েবের ছিলেন দ্বিতীয় কাজিন। বিয়ের পর শ্যালক হিসেবে থ্যাকারে পেলেন পিটার মুরকে যিনি ১৭৬৯ সালে বাংলায় এসেছিলেন রাইটার হিসেবে। অ্যামেলিয়ার আরো আত্মীয় যারা এসেছিলেন বাংলার রাইটার হিসেবে তাঁরা হলেন জনমুর (১৭৭৮), জন ওয়েব (১৭৯০) ও এডওয়ার্ড ওয়েব (১৭৯৫)।

১৭৭৭ সালের মধ্যে থ্যাকারে সিলেটে ব্যক্তিগত ব্যবসা চালিয়ে ভালো অর্থ আহরণ করলেন এবং অবসর নিয়ে পরিবার সহ ফিরে গেলেন ইংল্যান্ডে। হ্যাডলিতে সম্পত্তি কিনলেন। ১৭৯৭ সালের মধ্যে থ্যাকারে ১২টি সন্তানের জনক

হন। ইতোমধ্যে থ্যাকারের শ্যালক ১৮০৩ সালে কভেন্ট্রি থেকে পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। অন্যদিকে কলকাতায় চাকুরি করার সময় তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিলো হিউ ইংলিসের। তিনি ইতোমধ্যে শুধু কোম্পানির পরিচালক নন, ১৭৯৭ থেকে ১৮১২ সালের মধ্যে তিনবার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন পরিচালক মন্ডলীর। হান্টারের ভাষায় "The Floodgates of patronage which so abundently flowed from Leadenhall street to the crowded household at Hadley Green."

১৭৭৬ সালে থ্যাকারের বড় ছেলে উইলিয়াম মাদ্রাজে নিয়োগ পেলেন রাইটার হিসেবে। ২৭ বছর চাকুরির পর সেখানেই মারা যান। তৃতীয় পুত্র ও চতুর্থ পুত্র ওয়েব ও সেন্ট জনও গেলেন মাদ্রাজ। অষ্টম পুত্র উইলিয়াম ভারতে এলেন ক্যাডেট হিসেবে কিন্তু লেফটেনান্টের ওপরে উঠতে পারেননি। কনিষ্ঠপুত্র চার্লস এলেন কলকাতায় এবং কলকাতা হাইকোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করলেন। থ্যাকারের একমাত্র পুত্র রেভারেন্ড ফ্রানসিস থ্যাকারে ভারতবর্ষে আসেন নি কিন্তু বিয়ে করেছিলেন বেঙ্গল সিভিলিয়ানের এক মেয়েকে। তাঁর পুত্র স্যার এডওয়ার্ড ট্যালবট থ্যাকারে উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলা সকারের উচ্চপদে ছিলেন। থ্যাকারের আরেক পুত্র রিচমন্ড থ্যাকারে ১৭৯৭ সালে বাংলার রাইটার হিসেবে যোগ দেন।

রিচমন্ড পিতার মতো ১৮০২ সালে নিয়োগ পান ঢাকায়। নিয়ে আসেন তাঁর দুইবোন এমিলি ও অগাস্টাকে। ১৮০৩ সালে এমিলি বিয়ে করলেন তরুণ সিভিলিয়ান জন ট্যালবট শেক্সপিয়ারকে। ট্যালবটের পিতা জন শেক্সপিয়ার ১৭৭৮ সালে ছিলেন ঢাকা কুঠির প্রধান। তাঁর মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন রিচমন্ডের ভাই। এমিলি শেক্সপিয়রের ৯ সন্তানের মধ্যে ৮ জনই কোম্পানির চাকুরিতে ঢুকেছিলেন। রিচমন্ডের আরেক বোন আগাস্টা বিয়ে করেছিলেন কোম্পানির আরেক সিভিলিয়ান জন ইলিয়টকে ১৮১৬ সালে।

রিচমন্ড বোর্ড অব রেভিনিউর সচিব হয়েছিলেন। ১৮১০ সালে তিনি বিয়ে করেন বেঙ্গল সিভিলিয়ান জন হারমান বিচারের পরমা সুন্দরী কন্যা ড্যানকে। ভবিষ্যতের ঔপন্যাসিক উইলিয়াম ম্যাকপিস থ্যাকারে এ দম্পতির ঘরেই জন্ম গ্রহণ করেন ১৮১১ সালে। রিচমন্ড তারপরপরই ৩০ বছর বয়সে মারা যান। ড্যান তখন বিয়ে করেন বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার্সের মেজর হেনরি কারমাইকেল স্মাইলকে।[৩৫]

এরকম আরো দু'টি পরিবারের কথা উল্লেখ করতে পারি।

বেঙ্গল সিভিলিয়ান (আইসিএস) ডব্লিউ, এইচ, জে, ক্রিস্টি সি এস আই, সিআইই, ওবিই-র 'গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার' থমাস ক্রিস্টি (১৭৭৮-১৮২৯) ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সার্জন। তাঁর 'গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার' এইচ.পি ক্রিস্টি যোগ দিয়েছিলেন সেনাবাহিনীতে এবং ১৮৬৭ সালে অবসর গ্রহণ করেছিলেন মেজর

জেনারেল হিসেবে। তাঁর দাদা ও বাবা দু'জনেই যোগ দিয়েছিলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীতে। ক্রিস্টির জন্ম ১৯০৫ সালে পুনাতে। প্রথম ছয় বছর একটানা কাটিয়েছেন ভারতে।

১৯১৩ সালে তাঁর পিতামাতা ইংল্যান্ড চলে এলে ক্রিস্টি ভর্তি হন ইটনে তারপর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধ্রুপদী সাহিত্য ও ইতিহাসে প্রথম শ্রেণি পান। ভাবছিলেন সুদানে রাজনৈতিক সার্ভিসে যোগ দেবেন কিন্তু তাঁর এক শিক্ষক তাঁকে প্ররোচিত করলেন ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগ দিতে যা তাঁর শিক্ষকের মতে ছিল "Finest service in the world."

১৯২৭ সালে ক্রিস্টি আই.সি.এস পরীক্ষা দিলেন। পাশ করলেন। তাঁর অগ্রাধিকার এলাকা ছিল পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও বাংলা, তৃতীয় এলাকাতেই নিয়োগ পেলেন। ভারত ভাগ হওয়ার পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারের আন্ডার সেক্রেটারি হয়েছিলেন। ১৯৩৪ সালে ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের ডেপুটি কমিশনার। বিয়ে করেছিলেন আরেক চাকুরে স্টেপলটনের মেয়েকে। ১৯৫৭ সালের পর এক প্রাইভেট কোম্পানিতে আরো ১১ বছর চাকুরি করেছিলেন। দিল্লীতেই ছিলেন ঐ সময়।[৩৬]

বিখ্যাত সিভিলিয়ান হেনরি কটনের পিতা যোশেফ কটন (১৮১৩-?) সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলেন ১৮৩১ সালে, অবসর গ্রহণ করেছিলেন ১৮৬২ সালে। হেনরি বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন ১৮৬৭ সালে। অবসর নেন ১৯০২ সালে। তাঁর ছেলে মাদ্রাজ সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন ১৮৯৩ সালে। তিনি লিখেছিলেন ভারতে তারা পাঁচ জেনারেশন কাজ করেছেন যা অত্যাশ্চর্য, এবং "It is my pride that I am, as it were, an hereditary memeber of the administation."[৩৭]

কোম্পানির পরিচালকবৃন্দ ছাড়াও কোম্পানির স্বার্থ রক্ষা করতেন পার্লামেন্ট সদস্যরা। বিনিময়ে তাঁরাও কোম্পানি থেকে সুবিধে পেতেন, তার একটি ভারতে চাকুরি দেয়া। ফিলিপস এক হিসেবে দেখিয়েছেন ১৭৮০-১৮৩৪ পর্যন্ত কোম্পানির প্রভাবাধীন ছিলেন আবার আনুকূল্যও পেয়েছেন এমন সদস্যের সংখ্যা প্রায় ১১০০।[৩৮] ভারতে কর্মরত দম্পতির সন্তান বা উল্লিখিত 'জেনারেশনের পর জেনারেশন' ভারতে চাকুরি করেছেন তাদের বংশধরেরা ছিলেন বা অগ্রাধিকারও পেতেন। পারস্পরিক বিয়ের মাধ্যমেও এই 'সমাজ' বিস্তৃতি লাভ করেছিলো, কে লিখেছিলেন, এই ব্যবস্থার সুফল ছিল। তাঁর ভাষায়, "They looked to India as a Home, and to Indian service as a carrer..."[৩৯]

১৮৫৮ সালের পর থেকে পরিস্থিতি পাল্টাতে থাকে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা পৃষ্ঠপোষকতার স্থান দখল করে নেয়। অধস্তন ভারতীয়রাও দু'একজন করে

এই চাকুরিতে প্রবেশপত্র পেতে থাকেন। তাদের ঠেকাবার চেষ্টা কম করা হয়নি। কিন্তু ২০ শতকের পরিস্থিতি আরো পাল্টে যায়। ব্রিটিশ যারা আই.সি.এস. হয়েছিলেন তাদের সামাজিক পটভূমিও ছিল ভিন্ন। ভারতীয়দেরও তাই, কিন্তু সিভিলিয়ানদের চাকরি যে শুধু সম্মানজনক তাই নয়, ক্ষমতাশালীও– এই ইমেজ কখনও বদলায়নি।

প্রথমদিকে, আগেই উল্লেখ করেছি সামান্য পড়াশোনা নিয়ে রাইটাররা ভারতবর্ষে আসতো। তাদের কি প্রশিক্ষণের কোনো ব্যবস্থা ছিল? লর্ড ওয়েলসলি প্রথম তাদের প্রশিক্ষণের কথা ভেবেছিলেন। তিনি কোম্পানির পরিচালকদের লিখেছিলেন, সিভিল সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে চাকরির জন্য যাদের পাঠানো হচ্ছে তাদের সে পর্যায়ে চাকুরির যোগ্যতা নেই।[৪০] বিশেষ করে ভাষার বাধা ছিল দুর্লঙ্ঘ্য। ফার্সি তখনও সরকারি ভাষা। তা'ছাড়া স্থানীয় ভাষা [যেমন বাংলা] জ্ঞানও ছিল প্রয়োজন। ভাষা জ্ঞানের অভাবে প্রশাসন তো বটেই বিচারালয়ের ক্ষতি ছিল বেশি। অনভিজ্ঞ ইংরেজ যুবক সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতো দেশি পেস্কারের ওপর। মামলা প্রার্থীরা তা জানতেন। সে কারণে 'কোম্পানি রাজ' হলেও অধস্তন নেটিভদের সঙ্গেই তারা খাতির রাখতেন বেশি। এবং এভাবে এই অধস্তনরা আবার বাংলা মধ্যবিত্ত সমাজের পত্তন করেছিলো। কবি নবীন চন্দ্র সেনের আত্মজীবনীতে এর উদাহরণ আছে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে তাঁর পিতা ছিলেন চট্টগ্রাম জজ আদালতের পেশকার। "তাঁহার দোর্দন্ত প্রতাপ। ইংরাজ মহলে পর্যন্ত তিনি প্রকৃত জজ বলিয়া পরিচিত।... তিনি পারস্য কাগজ হাতে লইয়া অবিরল পার্শি পড়িয়া যাইতে পারিতেন। গিরিশেখরস্থ ধর্ম্মাধিকরণের দ্বিতল গৃহ কলকণ্ঠে পরিপূর্ণ করিয়া 'মিসিল' পড়িতে লাগিলেন; জজ টানা পাখায় আন্দোলিত শেখরজাত স্নিগ্ধ সমীরণে নাসিকা ধ্বনি করিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিলেন।... মিসিল বন্ধ হইলে জজের নিদ্রাভঙ্গ হইল; পিতার প্রদত্ত হুকুম দস্তখত করিলেন; বিচারকার্য্য শেষ হইল।" তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্যও সকালে তাঁর বৈঠকখানা উমেদারে পরিপূর্ণ থাকতো। আনা হতো ষড়োপচার।[৪১]

আদিপর্বে, ভারতবর্ষে পা রেখে চাকুরেরা একজন দেশি 'মুনশি' যোগাড় করে নিতেন। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে দেশি ভাষা জানেন এমন একজন– জন গিলক্রাইস্ট কোম্পানিকে জানালেন নবীন যুবকদের তিনি ভাষা শিক্ষা দেবেন, এর জন্য অতিরিক্ত খরচ লাগবে না। মুনশিকে যা দেয়া হয় তাকেও তা দিলে চলবে। গভর্নর জেনারেল এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। নবীন রাইটাররা এসে এরপর জন গিলক্রাইস্টের কাছে বছরখানেক ভাষা শিখতেন।

এ ব্যবস্থাকে একটি কাঠামোয় রূপ দেয়ার জন্য ওয়েলেসলি দুটি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এক, ১৮০১ সালের পর থেকে একটি ভাষা ও আইন কানুন না

জানলে চাকুরির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। দুই, এক বছর পর একটি পরীক্ষা হবে। পাঁচজন সিনিয়র কর্মকর্তার কমিটি পরীক্ষা নেবে। জজ বা রেজিষ্ট্রারকে জানতে হবে ফার্সি ও হিন্দুস্তানী। রাজস্ব কালেক্টর, কাস্টম বা সল্ট এজেন্ট [বাংলা ও উড়িষ্যা]কে জানতে হবে বাংলা।[৪২]

ওয়েলেসলি এ ব্যবস্থাটিকে বাস্তবরূপ দিতে চেয়েছিলেন, প্রশিক্ষণের জন্য একটি শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, পরিচালকদের তিনি জানিয়েছিলেন রাইটারদের অদক্ষতা, অযোগ্যতা দূরীকরণের জন্য–

"My opinion, after full deliberation on the subject is decided,that the writers, on their first arrival in India should be subjected for a period of two or three years to the rules and discipline of some collegiate institution at the seat of the government."[৪৩]

ওয়েলেসলি যা করতে চেয়েছিলেন, তা হলো, রাইটারদের পরীক্ষা দিতে হবে, পরীক্ষা পাশ করার পূর্ব পর্যন্ত আবেক্ষাধীনে থাকতে হবে। পরীক্ষায় কৃতকার্য হলে চাকরি পাকাপোক্ত হবে। সরকারি চাকুরি ক্ষেত্রে এই মৌল নীতি এখনও উপমহাদেশে মেনে চলা হয়।

কোম্পানির পরিচালকদের সঙ্গে চিঠি চালাচালিকালিন ওয়েলেসলি কলকাতায় প্রশিক্ষণের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিলো কোম্পানি এতে সম্মতি প্রদান করবে।

১৮ আগষ্ট ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো– 'দি কলেজ অব ফোর্ট উইলিয়াম' যা আমাদের কাছে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ নামে পরিচিত। প্রথম প্রভোস্ট [পরিচালক বলা যেতে পারে] ছিলেন রেভারেন্ড ডেভিড ব্রাউন। আরবি, ইসলামি আইন, ফার্সি ভাষা ও সাহিত্য, হিন্দুস্তানী ভাষা আইন কানুন, গ্রিক, ল্যাটিন ও ইংরেজি ধ্রুপদী সাহিত্য পড়ানো হবে। সবকিছুর প্রশিক্ষক ছিলেন ইংরেজরা।[৪৪] এই কলেজে পরবর্তী ৫০ বছর যারা পড়িয়েছেন তাদের মধ্যে কোলব্রুক, গ্ল্যাডউইন, হ্যারিংটন, গিলক্রাইস্ট, হান্টার, বুখানন, কেরি অনেকের নাম করা যায়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিকাশে ফোর্ট উইলিয়ামের অবদান অনস্বীকার্য।

ওয়েলেসলির সঙ্গে কোম্পানির পরিচালকদের এই কলেজ পরিচালনা নিয়ে মতবিরোধ হয়েছিলো। প্রশিক্ষকের কথা মনে রেখেই পরিচালকরা ১৮০৬ সালে ইংল্যান্ডে প্রতিষ্ঠা করেন হেইলিবারি কলেজ। স্বাভাবিকভাবে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গুরুত্ব কমে যায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের। বরং, গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৫৪ সালে কলেজটি বন্ধ করে দেয়া হয়।

ওয়েলেসলি কলকাতায় 'ক্যালকাটা কলেজ' বা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৮০০ সালে। ১৮০৪ সালে, চীনের ক্যান্টন থেকেও ইংল্যান্ডে

এ ধরনের প্রশিক্ষণের জন্য কলেজ প্রতিষ্ঠার আবেদন জানানো হয়। কারণ, চীনে কর্মরত কোম্পানির রাইটারদের নিয়েও একই ঝামেলা হয়েছিলো। এ পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানি ১৮০৬ সালে ৫,৯০০ পাউণ্ড দিয়ে হার্টফোর্ডশায়ারের হেইলিবারি এস্টেটটি কেনে। ১৮০৬ সালে, কোম্পানির চাকুরেদের প্রশিক্ষণের জন্য খোলা হয় 'ইস্ট ইন্ডিয়া কলেজ' যা পরিচিত হেইলিবারি কলেজ নামে। এর সঙ্গে একটি কোচিং কেন্দ্র খোলা হয় যাতে নবিসরা আগে এখানে প্রশিক্ষণ নিতে পারে। কোম্পানির ভবিষ্যতের সিভিলিয়ানদের এখানে দুই বছর প্রশিক্ষণ নিতে হতো, সাধারণ শিক্ষা, আইন, পলিটিকাল ইকোনমি ও প্রাচ্য ভাষায়। পরীক্ষায় পাশ না করলে চাকুরি হতো না। তবে, ফেল কেউ করতেন না কেননা সবাই ছিলেন প্রভাবশালীদের মনোনয়নকৃত। সিভিলিয়ানদের মধ্যে এই কলেজ একাত্মতা ও বন্ধন যাকে বলা যেতে পারে হেইলিবারি বন্ধন তৈরি করেছিলো। এম. ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছিলেন "The College become noted for its corporate life and the excellent spirit of comradeship which bound the inmates of the institution together."[৪৫]

জন লরেন্স, জন কলভিন, রিচার্ড টেম্পল প্রমুখ হেইলিবারি প্রশিক্ষিত। এখানে পড়িয়েছেন, চার্লস উইলকিনস, টি.আর ম্যালথাস, এইচ. এইচ. উইলসন, মনিয়ের উইলিয়াম, মৌলভী আবদুল আলী, মৌলবী মির্জা খলিল, মুন্সী গোলাম হায়দারের মতো পণ্ডিতবর্গ।

১৮৫৫ সালে মেকলের পরামর্শে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা নেয়া হয়। ঐ বছরই হেইলিবারি কলেজ বন্ধ করে দেয়া হয়। হেইলিবারি চালু রাখার পক্ষেও মতামত ছিল। এ পক্ষীয়দের মতে, ভারতে এসে উপযুক্ত সিভিলিয়ান হিসেবে কাজ করার জন্য হেইলিবারিই পারে একজনকে গড়ে তুলতে। "Hence the expence of the East India College is a real public benefit."

এই কলেজ না থাকার কারণে, আগে যারা ভারতে আসতো তারা রাইটার হিসেবে এসেই বিপাকে পড়তো। কলেজ থাকার সময় নবীনরা এসে সিনিয়রদের পেতো এবং তারপর তারা যখন ভারতবর্ষে আসতো তখন পরিচিত সেই সিনিয়ররাই তাকে সেখানে থিতু হতে সাহায্য করতো।[৪৬]

১৮৫৮ সালের পর থেকে প্রশিক্ষণ কোথায় হতো তা বিশদভাবে কোথাও পাওয়া যায় না। তবে, বিভিন্ন আইসিএসের স্মৃতিকথা থেকে জানতে পারি লন্ডনের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় আই.সি.এস.দের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছিলো, কেমব্রিজ, অক্সফোর্ড এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, পরবর্তীকালে লণ্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস। সেখানে নির্দিষ্ট কিছু বিষয় পড়তে হতো। ভারতবর্ষে পরীক্ষা দেয়ার আগে ইংল্যান্ডেই পরীক্ষা নেয়া হতো,

পরীক্ষার্থীদের তৈরি করার জন্য 'ক্র্যাম স্কুল'ও ছিল। সফল পরীক্ষার্থীদের পরবর্তীকালে ঘোড়ায় চড়ার ও মৌখিক পরীক্ষায়ও পাশ করতে হতো।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্ত ১৮৬৯ সালে আই.সি.এস. পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন। তিনি জানিয়েছেন, 'প্রবেশন পিরিয়ড' ছিল দুই বছর। এই দুই বছরে, নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের কোর্স নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করে পরীক্ষা দিতে হতো। এতে সফল হলে আই.সি.এস হিসেবে নিয়োগ দেয়া হতো। বিষয়গুলি ছিল– ভারতীয় ও ইংলিশ আইন এবং জুরিসপ্রুডেন্স, রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং ভারতীয় ভাষা।[৪৭]

অন্নদাশংকর রায় ১৯২৭ সালে আইসিএসে প্রথম হন। প্রশিক্ষণ সম্পর্কে কিছু না লিখলেও জানিয়েছেন, ঐ বছরই তাঁকে বিলেত যেতে হয়। "বিলেত যাওয়ার পাথেয় সরকার বহন করলেও কিন্তু প্রথম তিনমাসের খরচ আগাম দেবে না।" তবে, সরকার শিক্ষানবীসদের কোথায় কী পড়তে হবে তার জন্য জায়গা ঠিক করে রাখতো। অন্নদাশংকর লিখেছেন, "লন্ডনে আমার পরিচয় ছিল একজন ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস শিক্ষানবিশ। বিভিন্ন বিষয়ে লেকচার শোনার জন্য আমাকে যেতে হতো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। ইউনিভার্সিটি কলেজ, কিংস কলেজ, লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স। লন্ডন স্কুল ফর ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ। তার সঙ্গে যেতে হতো মামলা শুনতে নিম্ন আদালতে। পরে উচ্চ আদালতে। ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষা ছিল আবশ্যিক। সেজন্য আমাকে যেতে হতো লন্ডনের বাইরে উলউইচে ঘোড়ায় চড়া শিখতে।...

অক্সফোর্ডও আমার জন্য ক্রাইটচার্চ কলেজে জায়গা সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু, আমি লন্ডই থেকে গিয়েছিলুম।"[৪৮]

১৯২৩ সালে আই সি এস পরীক্ষায় পাশ করে শৈবাল গুপ্ত যান ইংলন্ডে। অক্সফোর্ড ভর্তি হন। লিখেছেন তিনি, "যাদের উপর পড়ানোর ভার ছিল তারা অনেকেই ছিলেন ভারত প্রত্যাগত এক্সপার্ট, কেউ সত্যিকার এক্সপার্ট, কেউ তথাকথিত।... দু'বছর টেনিং-এর পর শেষ লিখিত পরীক্ষা ও রাইডিং টেস্টে-এ উত্তীর্ণ হয়ে চুক্তি সই করে... দেশে যাত্রা করি।"[৪৯] ১৯৩৯ সালে পাশ করেন অশোক মিত্র। তিনিও পড়াশোনা করেন অক্সফোর্ডে।

এঁদের আগে ১৯০৯ সালে লন্ডন থেকে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছিলেন আর্থার ড্যাশ। তিনি লিখেছেন, আইসিএস পরীক্ষার পর শিক্ষানবিসী ছাত্র হয়ে থাকতে হয় একবছর। তাকে আইন ও ভাষা শিক্ষার জন্য আসতে হয় অক্সফোর্ডে। ঘোড়ায় চড়া পরীক্ষা ছিল খুবই সিরিয়াস। ফেল হলে ফেল। শ্রী অরবিন্দ আইসিএস পাশ করেও ঘোড়ায় চড়া পরীক্ষায় ফেল করার জন্য উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। শিক্ষানবসি পরীক্ষার পর ফলাফলের ভিত্তিতে যোগ্যতা নির্ধারণ হতো। যেমন,

ড্যাশের পরীক্ষার ফলাফল ছিল একরকম। শিক্ষানবিসি পরীক্ষার ফলাফল ভালো না হওয়ায় দু'ধাপে নিচে নেমে যান জ্যেষ্ঠতায়।[৫১]

চাকুরিতে যোগ দেয়ার পর ছিল ইন সার্ভিস ট্রেনিং বা হাতে কলমে শিক্ষা। তারপর প্রকৃতি ক্ষমতা লাভ বা চাকুরি জীবন।

॥ ৫ ॥

প্রথমে পাল ওড়ানো জাহাজ, তারপর বাষ্পীয় পোত, পথ কিন্তু একই। লন্ডন থেকে যাত্রা পথে পোর্ট সাঈদ, তারপর সাগর দ্বীপ। সেখান থেকে গার্ডেন রিচ হয়ে কলকাতা, ব্যতিক্রম যে ছিল না, তা নয়, ছিল, কিন্তু সাধারণ পথ ছিল এইটেই। মাদ্রাজ থেকে ভারতের অন্য অঞ্চলে যারা যেতেন, পোর্ট সাঈদ থেকে তাদের পথ ভিন্ন হয়ে যেতো। পাল তোলা জাহাজ ছিল অনিরাপদ, সময় লাগতো অনেক, যাত্রাও ছিল না তেমন আরামপ্রদ। বাষ্পীয় পোতের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে উনিশ শতকের শেষার্ধে লন্ডন থেকে কলকাতার যাত্রা আরামপ্রদ হয়ে ওঠে। ঐ সময় বেশ কয়েকটি জাহাজ কোম্পানি লন্ডন-কোলকাতা যাত্রী পরিবহন শুরু করে, এর মধ্যে খ্যাতনামা 'পি ও অ্যান্ড ব্রিটিশ ইন্ডিয়া লাইনস।'

উনিশ শতকের শেষে বা বিশ শতকের শুরুতে প্রাচ্য শুরু হতো সুয়েজ খাল থেকে নয় পোর্ট সাঈদ থেকে। অনেকে সেখানে নেমে ডাঙ্গার স্বাদ উপভোগ করতেন। যাত্রীদের একটি নির্দেশিকায় লেখা হয়েছিলো, কেউ এখানে নামতে চাইলে যেন ইউনিফর্ম পরে রিভলবার কোমরে বেধে নামেন। শুধু তাই নয় যারা 'ফ্রেঞ্চফটোগ্রাফ' দেখাতে চায় তাদের এড়িয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।[৫২] অনেকে সুয়েজের মন্থর যাত্রা পছন্দ করতেন না। তারা মরুভূমি পেরিয়ে কায়রোয় পিরামিড দেখে আবার সুয়েজের শেষে জাহাজে উঠতেন। তারপর কয়লা নেয়ার জন্য জাহাজ থামতো এডেনে। সেখান থেকে ভারত মহাসাগর।[৫৩]

ষোড়শ শতক থেকে উনিশ শতকের গোড়া পর্যন্ত, লন্ডন থেকে শুধু কোম্পানির চাকুরেরাই আসছিলেন তা নয়। ভাগ্যান্বেষণে ইউরোপ ও অন্যান্য দেশ থেকেও মানুষজন আসছিলেন, যার কথা আগেই লিখেছি। ডাক্তার থেকে চিত্রকর, ইঞ্জিনিয়ার থেকে অ্যাটর্নি, ব্যবসায়ী, বিচিত্র রকমের সব মানুষ। তবে, ভারত যখন ব্রিটিশ উপনিবেশে পরিণত হলো তখন ব্রিটেন থেকেই মানুষজন এসেছে বেশি। প্রথম দিকে মহিলাদের আগমনের সংখ্যা কম ছিল পরে বৃদ্ধি পায়। এরা মিলেই গড়ে তুলেছিলেন কলকাতা/বাংলার ইউরোপীয় সমাজ।

উডরাফ বিষয়টি আরো সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। রাণী অ্যানের আমলের সময় কোন ইংরেজ যদি থাকতো কলকাতায় তাহলে সে খুব বেশি একটা অবাক

হতো না। সমাজ তার কাছে মনে হতো, "dull, provincial, predestrian and behind the times." ইংরেজরা শুধু মনে হতো প্রাচ্যের প্রভাবে আচ্ছন্ন, খাবার, পোষাক-আষাক, কথার ধরণ, জীবন যাপন সবকিছু। তৃতীয় জর্জের রাজত্বের শেষ দিকে এলে সে দেখতো আকাশ পাতাল তফাত, ইংরেজ জীবন তেমন আচ্ছন্ন নয় প্রাচ্যের প্রভাবে, বরং একটি স্বাধীন সমাজ গড়ে উঠছে।[৫৪] এর একটা কারণ যে, কলকাতা কোম্পানির রাজধানী হিসেবে গড়ে উঠেছিলো, অনেক ক্ষেত্রে ইউরোপিয়দের মনে হতো তা লন্ডন থেকেও সুন্দর। তবে এরা যে জীবনের কথা লিখেছেন তা উচ্চবর্গের, এর সঙ্গে সাধারণতো বটেই ইউরোপীয় নিম্নবর্গের তেমন যোগ ছিল না।

ভারতবর্ষ তখন ইউরোপের চোখে মোহনীয় যেখানে গেলেই ভাগ্যলক্ষ্মী সদয় হতে পারে। এলিজাবেথ যেমন কলকাতা থেকে ১৭৮০ সালে লিখেছিলেন তাঁর বান্ধবীকে– "কলকাতা আমার কল্পনার শহর, কতদিন, কত দীর্ঘশ্বাস যে ফেলেছি, এই শহরের কথা মনে করে তার ঠিক নেই। আমার কত কামনা-বাসনা, কত ভয় ভাবনা, ভবিষ্যতের কত আশা আকাঙ্ক্ষা, কত বিলাস-ব্যসনের স্বপ্ন যে এই মহানগরীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তা তোমাদের বুঝিয়ে বলতে পারব না।"[৫৫] ষোড়শ শতক হোক আর উনিশ বা বিশ শতক হোক, বাংলা/ভারতবর্ষে পৌঁছলে তারা পদার্পণ করতো এক নতুন জগতে। নানা বর্ণ চোখ ঝলসে দিতো, উষ্ণ আবহাওয়া অস্বস্তির সৃষ্টি করতো, অগনিত মানুষ মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করতো।

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে উনিশ শতকের গোড়া পর্যন্ত কলকাতায় ইউরোপিয় সমাজের অবস্থা কী ছিল তা বিভিন্ন গবেষণায়, স্মৃতিকথায় বর্ণিত হয়েছে। সে অবস্থা বর্ণনার জন্য আমি শুধু অ্যাটনি উইলিয়াম হিকির স্মৃতিকথা উদ্ধৃত করবো।

বাংলায় পৌঁছাবার বর্ণনা দিয়েছেন হিকি এভাবে- "নভেম্বর ১৭৭৭ সন। ভোর চারটে থেকে সাগরপাড়ি দিয়ে বেলা প্রায় দুপুর আন্দাজ সাগরদ্বীপ এসে পৌঁছলাম। কিছুক্ষণ পরএকখানি পানসি নৌকা এল... ছ'জন 'কালা আদমী' [মাঝি] খুব জোরে জোরে দাঁড় বাইছিল, পানসিও চলছিল তরতর করে দুরন্ত বেগে। সন্ধে ছটার সময় আমরা কুলপিতে এসে পৌঁছলাম।...

পাশের খালের ভিতর দিয়ে বেশ খানিকটা এগুবার পর একটা ট্যাভার্ন (সরাইখানা) নজরে পড়ল। যেমন নোংরা তেমনি কুৎসিত ও জরাজীর্ণ সরাইখানার ঘর।... ভোজনান্তে শয়নের ব্যবস্থা করা হলো একটি বিলিয়ার্ড টেবিলের উপর।... বেলা দশটার সময় জোয়ার আসাতে পানসি ছাড়ল। আমরা ভেবেছিলাম, সন্ধ্যার আগেই গার্ডেনরিচে কর্নেল ওয়াটসনের বাড়িতে পৌঁছতে পারব। কিন্তু হঠাৎ উত্তরে হাওয়া বইতে তা সম্ভব হলো না। মাঝিরা রীতিমতো ক্লান্ত হয়ে পড়ল। বাধ্য হয়ে

আমরা উলুবেড়িয়া নামে একটি ছোট্ট গ্রামে রাত্রিবাস করলাম।... শেষ রাতে জোয়ার এল, পানসি ছাড়ল। ভোর হলো, পানসির মাথার উপর আমরা উঠে বসলাম। নদীর পূর্বতীরে গার্ডেনরিচের দৃশ্য ধীরে ধীরে আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল। চমৎকার সব বাগানঘেরা বড় বড় বাড়ি। দেখতে অতি মনোরম- এরকম সুন্দর দৃশ্য দেখলে কার না আনন্দ হয়। কোম্পানির বড় বড় কর্তাব্যক্তিরা এখানকার সুন্দর পরিবেশে বাস করেন। কেউ কেউ কেবল গ্রীষ্মকালে কয়েকমাসের জন্য এখানে থাকেন, কেউ বা সব সময় এখানেই বাস করেন। শহরে কেবল কাজকর্ম করতে যান। চারিদিকের গাছপালায় যেন সবুজের বন্যা নেমেছে মনে হয়। নিসর্গে কেবল সবুজের ঢেউ, যেন রঙের তুফান উঠেছে। এরকম অপূর্ব দৃশ্য দেখব, বিশেষ করে বাংলার মতন গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, কল্পনা করিনি কখনও।"[৫৬]

প্রাকৃতিক কারণে, হিকিকে একটু বেশি ঘুরতে হয়েছে। না হলে গার্ডেনরিচ বা ফলতা থেকে সরাসরি সবাই কলকাতায় পৌঁছতেন। সেখানে পৌঁছার পর থাকার জায়গা খোঁজা। পেশাজীবীরা তাদের ধান্দায় আর সিভিলিয়ানরা (রাইটার) যোগ দেন নিজের কাজে। একজন দেশি বেনিয়ান নিয়োগ করেন অনেকে। বেনিয়ান তার সঙ্গে দেশি সমাজের যোগাযোগের মাধ্যম। আপাত দৃষ্টিতে ইউরোপিয়দের মধ্যে বর্ণভেদে নেই মনে হলেও বর্ণভেদ ছিল বিশেষ করে কর্তৃপক্ষীয়দের সঙ্গে পেশাজীবীদের একটি দ্বন্দ্ব ছিল সবসময়ই। উডরাফ লিখেছেন, ঐ সময় অ্যাংলো ইন্ডিয়ায় তিনটি বড় ভাগ দেখা যায়- কোম্পানির সিভিলিয়ান, সামরিক আমলা ও স্বাধীন ব্যবসায়ী যাদের পরবর্তীকালে বলা হতো বক্সওয়ালা। পরবর্তীকালে কাজের চাপে এবং সবখানে যাওয়ার কারণে সিভিলিয়ানদের সঙ্গে অন্যদের দূরত্বের সৃষ্টি হয়। তার পক্ষে নবাবী চালচলন আর সম্ভব ছিল না। "From now on he has enough to be comfortable but not lavish."[৫৭]

প্রাথমিক পরিচয়ের পর সামাজিক আপ্যায়ন করা হতো বা শুরু হতো। সারাদিনের কাজের পর এটিই ছিল তখন প্রধান বিনোদন। লিখেছেন হিকি- "অল্পদিনের মধ্যে আমি শহুরে সামজে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠলাম, চেনাপরিচিতের সংখ্যাও বেড়ে গেল অনেক। ঘন ঘন চারিদিকে নেমন্তন্ন হতে লাগল। আগে থেকেই মদ্যপানের অভ্যাস করে ফেলেছিলাম, জাহাজে আসার পথে অভ্যাসটি বেশ পোক্তও হয়ে গিয়েছিলো। বাংলাদেশে এসে ভোজের আমন্ত্রণে তা দিন দিন আরও বেড়ে যেতে থাকল।"[৫৮] এর ফলে অনেকে অসুস্থ হয়ে যেতেন। হিকি আরো লিখেছেন, "বাংলাদেশে যাঁরা থাকতেন, তাঁরা প্রায় জলের মতন মদ্যপান করতেন।... বেলা একটায় সাধারণত তখন ডিনার খাওয়া হতো এবং খাওয়া

দাওয়ার পর সন্ধ্যার আগে গাড়ি করে হাওয়া খেতে বেরুনো হতো... একবার আমি একটি বেশ বড় ডিনার পার্টি দিয়েছিলাম।.... অতিথিদের সকলকে আমি আকণ্ঠ মদ্যপান করলাম। সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে সকলেই চিৎ হয়ে পড়লেন...।[৫৯] ১৭২০ সালের সিভিলিয়ানদের জীবন যাপন সম্পর্কে ক্যাপ্টেন হ্যামিলটনও একই রকম বর্ণনা রেখে গেছেন।[৬০]

তবে, সিভিলিয়ানদের বিস্তারিত বিবরণ পাই জেমস ম্যাকিনটসের গ্রন্থে। ১৭৭০ সালের যে বর্ণনা রেখে গেছেন তার অনুবাদ–

"সকাল সাতটার দিকে দারোয়ান গেট খুলে দেয় ও বারান্দা উন্মুক্ত হয়। তার সরকার, পিয়ন, হরকরা, চোবদার, হুকাবরদার, খানসামা, রাইটার [মুন্সি?] এবং সলিসিটারের জন্য। হেড-বেয়ারা এবং জমাদার হলে প্রবেশ করে এবং আটটার দিকে ঢোকে তার বেডরুমে। একজন মহিলা তার শয্যাত্যাগ করে এবং পেছনের সিড়ি দিয়ে তাকে হয় তার কক্ষে এবং অথবা প্রাঙ্গণে দিয়ে আসা হয়। যে মুহূর্তে গৃহকর্তা বিছানা থেকে তার পা বাইরে রাখে সে মুহূর্তে সবাই সালাম বা কুর্নিশ করে ঘরে ঢোকে। তিনি হয়ত প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে তার সলিসিটারের দিকে তাকান বা ইশারা করেন। আধঘণ্টার মধ্যে তার লম্বা অন্তর্বাস খুলে তাকে নতুন অন্তর্বাস, শার্ট, মোজা চটি পরানো হয়; তিনি বসে থাকেন মূর্তির মতো, হাত-পা না নেড়ে। নাপিত প্রবেশ করে তার দাড়ি কামায়, নখ কেটে দেয়, কান পরিষ্কার করে। একজন ভৃত্য একটি চিলমচি ও পানি ভর্তি জগ নিয়ে আসে তারপর তার হাত মুখ ধুইয়ে তোয়ালে এগিয়ে দেয়। কর্তা তারপর রাজকীয় ভঙ্গিতে নাস্তার টেবিলে আসেন, বসেন; খানসামা চা বানিয়ে তাকে রুটি বা টোস্টের পাত্র এগিয়ে দেয়। কেশবিন্যাসকারি পেছন থেকে দাঁড়িয়ে তার কাজ শুরু করে আর হুকাবরদার আলগোছে হুকার নলটি তার হাতে তুলে দেয়। যখন তার কেশ পরিচর্যাকারি তার কাজ করে তখন তিনি খান, চায়ে চুমুক দেন বা গড়গড়ায় ধোঁয়া ছাড়েন। এ সময় তার বেনিয়া সবার থেকে খানিকটাএগিয়ে এসে তাকে সালাম জানায়। সলিসিটার (বেনিয়া), যদি একটু নামী দামি হয় তবে তাকে চেয়ারে বসতে দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এসব অনুষ্ঠান চলে দশটা পর্যন্ত তারপর তার বহর নিয়ে কর্তা এগোন পালকির দিকে। পালকির আগে এগিয়ে চলে আট থেকে বারোজন চোবাদার, হরকরা এবং পিয়ন। প্রত্যেকের তকমা আটা নিজস্ব পোষাক। তাদের পোষাক, পাগড়ির রং আর কোমরবন্দ বলে দেয় কার কী কাজ। সাধারণত আটজন বেহারা কাঁধ বদলে বদলে পালকি নিয়ে চলে যাতে কর্তার সামান্যতম কষ্ট না হয়। তাকে যদি কোথাও যেতে হয় তাহলে পিয়ন পথ দেখিয়ে বেহারাদের নির্দেশ দেয়। এবং তার ব্যক্তিগত উপস্থিতি প্রয়োজন না হলে তিনি দর্শন দেন না। যদি পথে কোথাও না যান তবে তার কর্মস্থলে উপস্থিত হয়ে দুটো পর্যন্ত কাজ করেন তারপর সঙ্গীসাথী

নিয়ে ডিনারে বসেন। প্রত্যেকের নিজ নিজ খেদমতগার তাকে সাহায্য করে। মদ পানের সময় হলে, মহিলারা থাকলেও হুকাবরদার উপস্থিত হয়ে নিজ নিজ কর্তার হাতে নল তুলে দেন। চারটার দিকে আড়ম্বর ছাড়া তারা নিজ নিজ পালকিতে ওঠেন এবং কর্তা গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। তাকে লম্বা অন্তর্বাস পরিয়ে দেয়া হয় এবং সাতটা আটটা পর্যন্ত ঘুমান। ঘুম থেকে উঠলে আবার সকালের মতো কাপড় পরানো শেষে তিনি চায়ের টেবিলে যান, হুকাবরদার তার হাতে হুঁকোর নল তুলে দেয়, কেশ পরিচর্যাকারি তার কাজ শুরু করে। তারপর সুন্দর একটি কোট পরে তিনি বেরোন নিমন্ত্রণে সেখানে মহিলারাও আমন্ত্রিত। দশটার দিকে ফেরেন, দশটায় দেয়া হয় রাতের খাবার। রাত বারোটা একটা পর্যন্ত এইসব লোকজন তার ফুট ফরমাশ খাটে এবং তারপর বিনীতভাবে বেরিয়ে যায়। কর্তা তখন শোয়ার ঘরে ঢোকেন। সেখানে একজন মহিলাকে তিনি পান সকাল সাত-আটটা পর্যন্ত তাকে আনন্দ দেয়ার জন্য। এর থেকে বেশি কাজ না করে কোম্পানির চাকুরেরা প্রচুর ধন সম্পদ অর্জন করেন।"[৬১]

মহিলাদের জীবন যাপনও মোটামুটি একই ধারাই পরিচালিত হতো। কলকাতা থেকে লেখা বিভিন্ন মহিলার চিঠিতে সে বিবরণ পাওয়া যায়। মিসেস শেরউড প্রায় একই সময় লিখেছিলেন–

"ভোরের কিছু আগে কর্ত্রী ('এ লেডি') কে ডেকে তোলা হয়। তার আয়া ধোবা থেকে তার জন্য পরিষ্কার সব পরিচ্ছেদ নিয়ে আসে। তার সকালের পোষাকের ওপর জড়িয়ে দেওয়া হয় চমৎকার কাশ্মিরী শাল। তারপর তাজা বায়ু সেবনে তিনি ওঠেন তার গাড়ি বা খোলা পালকিতে। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফিরে আসেন, এক কাপ কফি খেয়ে বিছানার আশ্রয় নেন। পারলে এক দু'ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেন। পরিবারের নাস্তা খাওয়ার আগে উঠে পড়েন এবং প্রাতঃকৃত্যাদি সারেন বেশ সময় নিয়ে। এজন্য তাকে কোনো কষ্ট পোহাতে হয় না। স্নান করা, চুল বাঁধা বা অন্যান্য সব কাজ করে এক বা দুইজন কৃষ্ণরমণী।

প্রসাধন শেষে কর্ত্রী হলো ঘরে প্রবেশ করেন যেখানে সাজানো আছে চমৎকারভাবে নাস্তার টেবিল। বেশ ক'জন ভদ্রলোক চলে আসবেন নাস্তার টেবিলে। প্রাতরাশের ব্যাপারটি পাবলিক; সৌজন্যময় আলাপচারিতার মাঝে তা শেষ হয়। সবাই চলে গেলে কর্ত্রী সাজানো এক কক্ষে বসে হয়ত খানিকটা পড়েন, হয়ত খানিকটা মনোমত কাজ করেন, নয়তো কোনো পরিচিত মহিলা এলে কথাবার্তা সারেন। কর্ত্রী ইউরোপীয় সমাজের প্রচুর গুজব জানেন কিন্তু জানেন না নেটিভদের জীবন যাপনের রীতি নীতি।

টিফিনের আগে (মাধ্যহ্ন ভোজ) পোষাক আশাকে খানিকটা পরিবর্তন আনা হয়। আবার সেই টেবিল। খালি চেয়ারগুলি ভরে ওঠে অভ্যাগততে। দিনে এটিই

প্রধান খাবার। প্রচুর 'ওয়াইন ও পেল অ্যাল' পান করা হয়। টিফিনের পর কর্ত্রী নিজের রুমে ফিরে যান, পোষাক পরিচ্ছেদ ছেড়ে বিছানার আশ্রয় নেন। খানিকটা পড়েন নয়ত ঘুমোন। খরতাপ হ্রাস পেলে, সূর্য নিচে নামলে ওঠেন। এরপর আবার নতুন সেট পোষাক পরে কর্ত্রী হাওয়া খেতে বেরোন বেশির ভাগ সময় রেসকোর্সে। বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হলে হাসি বিনিময় করেন। ভদ্রলোকরা টুপি খুলে বাও করে। ঘরে ফিরে, আরো কিছু অলংকার পরে স্বামীর সঙ্গে খেতে বসেন। তারপর প্রায় সময়ই বল নাচের আসর বা অনুষ্ঠানে যান। যাবার আগে আরেকবার প্রসাধন সারেন।"

এলিজা ফে যেসব চিঠিপত্র লিখেছিলেন কলকাতা থেকে তাতে এ ধরনের বিবরণ আছে। মধ্যাহ্নটা সবাই এখানে এড়িয়ে চলেন। "মনে হয় মাঝরাতের মতন সব নিস্তব্ধ ও ফাঁকা। সন্ধ্যার পর সাহেবরা রাস্তায় একে একে বেরুতে থাকেন। ঘোড় দৌড়ের মাঠের দিকে সান্ধ্যভ্রমণে যান। ভ্রমণান্তে বাড়ি ফিরে সকলে নিয়মিত চা পান করে। চা পানে এখানে সকলেই অভ্যস্ত, শীত ও গ্রীষ্মে কোনো সময়ই তা বাদ দেওয়া হয় না। চা-পান শেষ হলে রাত দশটা পর্যন্ত তাস খেলা বা গানবাজনা চলতে থাকে। তারপর 'সাপার' খাবার সময়।"[৬২]

সামাজিক অনুষ্ঠান সব সন্ধ্যের পর। "খুব বেশি সময় কেউ একজনের বাড়িতে এসে থাকেন না, কারণ একদিকে তাঁকে একাধিক বাড়িতে যেতে হয়, আবার নিজের বাড়িতেও অতিথি আসার সম্ভাবনা থাকে। এই সামাজিকতা রক্ষার ব্যাপারটা প্রধানত মহিলাদের। ভদ্রলোকেরাও এই সময় আলাপ পরিচয় করতে আসেন। এবং তখন তাদের যদি টুপি নামিয়ে রাখতে বলা হয় তাহলে বুঝতে হবে সেদিনের 'সাপারে' তিনি নিমন্ত্রিত হলেন। তাই অনেক ভদ্রলোককে দেখা যায়, সন্ধ্যার পর আলাপ করতে এসে টুপিটা হাতে নিয়ে গৃহকর্ত্রীকে দেখিয়ে দেখিয়ে নাচাতে থাকেন। ইচ্ছা যাতে টুপিটা তাঁকে রাখতে বলা হয় কারণ তাহলে তিনি রাতের সাপার খেয়ে যেতে পারেন। কিন্তু সহজে গৃহকর্ত্রীরা তা বলেন না, এবং তিনি প্রায় আধঘণ্টা ধরে টুপি নাচাবার পর বিমর্ষচিত্তে বিদায় নেন।"[৬৩]

ঘোষাল উল্লেখ করেছেন ম্যাকিনটস সিভিলিয়ানের যে বিবরণ রেখে গেছেন তা কোম্পানির সিনিয়র ব্যাচেলর চাকুরেদের জীবনরীতি, জুনিয়ররা যা অনুসরণ করতেন। কিন্তু, সমসাময়িককালে অনেক ইংরেজ তার সমালোচনাও করেছেন। মিসেস শেরউড তার বিবরণ সংগ্রহ করেছিলেন এক মহিলার কাছ থেকে। তারপর তিনি মন্তব্য করেছেন, এক সপ্তাহের বেশি এটি কীভাবে সহ্য করা সম্ভব জানি না, কিন্তু অনেকে বছরের পর বছর একই ধরনের জীবন যাপন করে আসছে। স্পিয়ারও তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, সবাই এই ধরনের জীবন যাপন করতেন না। উচ্চপদস্থ অনেক চাকুরে যেমন, হেস্টিংস, কর্নওয়ালিস, ম্যাকার্টনি, শোর, কঠোর

পরিশ্রম করে সাধারণ জীবন যাপন করে গেছেন।[৬৪]

এসব বিবরণে খানিকটা ব্যঙ্গ, খানিকটা অতিরঞ্জন থাকতে পারে, তবে সমসাময়িক আরো অনেক বর্ণনা আছে যা কম বেশি একই রকম। অষ্টাদশ দশকের মাঝামাঝি থেকে উনিশ শতকের প্রায় দু'তিন দশক শুধু কোম্পানির চাকুরেরাই নন, অন্যান্য উচ্চবর্গের ইউরোপিয়ানরাও একই ধরনের জীবন যাপন করেছে। তবে, সব ইউরোপিয়র জীবনরীতি এমন ছিল তা ভাবলে ভুল হবে। যারা উপার্জন করেছে অর্থাৎ অর্থশালী হয়েছে তারাই এভাবে জীবন যাপন করতে পারতো। সাধারণ চাকুরে বা রাইটারদের পক্ষে এমন জীবন যাপন সম্ভব ছিল না। প্রথম দিকে তো তাদের কুঠির ভেতরেই থাকতে হতো, তারপর অবিবাহিতরা মেস বা 'চামারি' করে থাকা শুরু করে। অবস্থা একটু ফিরলে আলাদা বাড়ি। উচ্চবিত্ত, তারপরের সারিদের পোষাক, আষাক, জীবন যাপনের কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছিল। এবার সেগুলি উল্লেখ করবো।

উচ্চপদস্থ কর্মচারিরা অপরিচিতদের সঙ্গে পরিচিত হতেন 'পাবলিক ব্রেকফাস্টে'র মাধ্যমে। হিকি, ফিলিপ ফ্রানসিসের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য তার 'পাবলিক ব্রেকফাস্টে' গিয়েছিলেন। "তখনকার দিনে অপরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গে সাহেব সমাজে এটাই ছিল আলাপ পরিচয়ের রীতি। গভর্নর জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিলের সদস্যরা প্রত্যেকে এইজন্য সপ্তাহে একদিন করে 'পাবলিক ব্রেকফাস্ট দিতেন।'... প্রায় তিরিশজন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি টেবিল ঘিরে বসেছিলেন, ফ্রানসিস ছিলেন মাঝখানে।"[৬৫]

খাবারের মধ্যে সকালের খাবারের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এলিজা উল্লেখ করেছেন, "এখানে ডিনারের সময় হলো বেলা দুটো, এবং অনেকটা সময় ডিনার টেবিলে বসে থাকতে হয়, বিশেষ করে শীতকালে। কারণ এখানে যাঁরা থাকেন তাঁরা দেখছি গ্রিল, স্টু ইত্যাদি খাদ্য খুব ভালোবাসেন এবং খুব গরম গরম টেবিলে না দিলে খান না। 'বর্ধমান স্টু' (Burdwan stew) নামে এক রকমের স্টু আছে যা মাছ, মাটন ও মুরগি একসঙ্গে মিশিয়ে তৈরি করা হয়, কতকটা স্প্যানিশ 'ওল্লা পোদ্রিদা'র মত।"[৬৬] এর সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণ মদ তো ছিলই। 'সাপার' ও খাদ্যদ্রব্যের খুব একটা ব্যতিক্রম ছিল না।

এর সঙ্গে প্রাচ্য থেকে একটি রীতি তারা গ্রহণ করেছিলো তা হলো হুঁকো খাওয়া এবং হুঁকো সাজাবার জন্য নতুন এক পেশাই সৃষ্টি হয়েছিলো। এ পেশায় নিয়োজিতদের বলা হতো হুঁকোবরদার। হিকি উল্লেখ করেছেন যেখানেই তিনি ডিনারে গেছেন, সেখানেই দেখেছেন হুঁকো বিশেষ স্থান করে আছে। তাঁর ভাষায়, কোনো এক অনুষ্ঠানে "পৌঁছবার কিছুক্ষণ পরে একটি সুন্দর সুসজ্জিত হুঁকো তাঁরা আমার সামনে জলন্ত কলকেসহ উপস্থিত করলেন। আমি কয়েকটা টান দিয়ে

ধূমপানের আনন্দ উপভোগ করবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কৃতকার্য হলাম না। বার-ংবার চেষ্টা করে যখন ব্যর্থ হলাম, তখন আমন্ত্রিতদের জিজ্ঞাসা করলাম, এই পদ্ধতিতে ধূমপান না করলে কি কোনো ক্ষতি হবে, মর্যাদার হানি হবে? একজন বললেন, "নিশ্চয় হবে। কলকাতার সাহেব সমাজের এইটাই হলো ফ্যাশান; হুঁকো না খেলে বড় সাহেবদের সমাজে আপনি কলকেই পাবেন না।' আরেকজন অবশ্য তাঁকে বলেছিলেন, ইংরেজ সমাজে এটিই ফ্যাশান হয়েছে বটে তবে ভালো না লাগলে না খেলেই হয়। হিকি আর হুঁকো খাননি।"[৬৭]

আরেকটি অদ্ভুত প্রথা চালু হয়েছিলো তা হলো খাবারের টেবিলে খাবারের টুকরো ছুঁড়ে মারা যাকে বলা হতো 'পেলেটিং'। হিকির ভাষায়, "একটি অসভ্য প্রথা দেখে আমি রীতিমতো স্তম্ভিত ও ব্যথিত হয়েছিলাম। প্রথাটি হলো, খাবার সময় রুটির টুকরোগুলি পাকিয়ে অন্যের গায়ে ছুঁড়ে মারা। আরও আশ্চর্য হলাম দেখে, প্রথাটি কেবল পুরুষদের মধ্যে চলিত নয়, মেয়েদের মধ্যেও প্রচলিত। কেউ কেউ গুলিটি এমনভাবে পাকিয়ে এত জোরে ছুঁড়তে পারেন যে, কারও চোখেমুখে লাগলে তিনি বেশ আঘাত পান। গুলিগুলো তীরের মতন গায়ে লাগে।"[৬৮]

এ নিয়ে বাদ বিবাদ হতো এবং তা ডুয়েলে গড়াতো। ঐ সময় কথায় কথায় ডুয়েল লড়া প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগের ইউরোপিয় এই প্রথাটি প্রধানত সিভিলিয়ানরা চালু করেছিলো। হেস্টিংসকেও ডুয়েল লড়তে হয়েছিলো। ১৮৩০ সাল পর্যন্ত পত্র-পত্রিকায় ডুয়েলের খবর পাওয়া যায়।[৬৯] এবং ডুয়েলে প্রচুর হতও হতো। ফলে, এ নিয়ে লেখালেখি শুরু হয় এবং কালক্রমে তা লোপ পায়।

সিভিলিয়ান (ইংরেজরা)রা পোষাক আষাকের ব্যাপারে বেশ সচেতন ছিলেন। গরমের দেশ হলেও তারা বেশ কয়েকপ্রস্থ পোষাক চড়াতেন। পুরনো চিত্রমালায় এসব পোষাক আষাকের পরিচয় পাওয়া যাবে। তবে সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকে ঝালর দেয়া জমকালো পোষাক পরতে তারা পছন্দ করতেন।

বাসাবাড়ি ভাড়া বেশ চড়াই ছিল। চৌরঙ্গিতে ভাড়া ছিল বেশি। ৩০০ থেকে ৫০০ টাকা। অর্থশালীরা জাঁক জমকের সঙ্গে ঘর সাজাতেন। "বিত্তবান যাঁরা, ছিমছাম্ থাকার ব্যাপারে তাঁরা উদাসীন। মধ্যবিত্তরা বরং এদিক দিয়ে অনেক রুচিবান। বাড়ির বাগানটি বেশ সুবিন্যস্ত, কিন্তু সব বাড়ি সম্বন্ধে একথা কতদূর সত্য জানি না। জানালার শার্শি, খড়খড়ি সবই বন্ধ থাকে, বাইরে খসখসের টাটি ঝুলানো থাকে ঘর ঠাণ্ডা রাখার জন্য।"[৭০] ফ্যানি পার্কস লিখেছিলেন, "ঘরের মেঝে মাদুর বা শতরঞ্জি দিয়ে ঢাকা থাকে। শীতকালের কয়েকমাস পার্সী বা মির্জাপুরী কার্পেট পাতা হয়। ঘরের দরজা-জানালা সংখ্যায় অনেক বেশি এবং ঘরগুলিও অনেক বড় এবং উঁচু। প্রত্যেক শোয়ার ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন বাথরুম আছে। একঘর থেকে অন্য ঘরে যাওয়ার জন্য মধ্যে ছোট ছোট ঠেলা দরজা আছে। শৌখিন আসবাবপত্রের

অভাব নাই শহরে।"[৭১]

ঘর ভাড়া নেয়ার পর ঘর গোছানোর উৎসব পালিত হতো। হিকি লিখেছেন, কোথা থেকে এটি এসেছিলো জানা যায়নি। "উৎসবের দিন গৃহকর্ত্রী বাড়ির সবচেয়ে সুন্দর ও সুসজ্জিত ঘরে একটি চেয়ারে উপর সেজেগুজে বসে থাকেন, তাঁর দু'পাশে থাকেন বান্ধবীরা সখির মতন। তিনজন ভদ্রলোক সর্বদা মোতায়েন থাকেন দরজার কাছে শহরের মহিলাদের অভ্যর্থনা করার জন্য। তিনজন থাকেন কারণ প্রত্যেক মহিলার সঙ্গে দু'জন করে ভদ্রলোক আসেন।" পরিচয় পর্বাদি শেষে চলে যান। সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১১ পর্যন্ত এ উৎসব চলতে থাকে। হিকির বাসায় দু'রাত চলেছিলো এ উৎসব। এখানেই শেষ নয়, "যে সব মহিলা গৃহোৎসবে আসতেন। পালা করে তাঁদের প্রত্যেকের বাড়িতে সস্ত্রীক অন্তত একবার যেতে হতো।" হিকি জানিয়েছেন ইংরেজ বাসিন্দা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ উৎসবে লুপ্ত হয়। ১৭৮৬ সালের পর এ উৎসব আর পালিত হতেই দেখা যায়নি। খুব সম্ভব, আদিতে ইউরোপিয়দের সংখ্যা যখন কম ছিল তখন পরস্পরের পরিচয় ও একটা দিন ব্যতিক্রমী দিন হিসেবে কাটানোর জন্য হয়ত এ রীতি চালু হয়েছিলো।[৭২]

অবিবাহিতরা নারী সঙ্গের জন্য উন্মুখ থাকতেন। ম্যাকিনটোসের বিবরণে এর উল্লেখ আছে। ভারতীয় নারী সুলভ ছিল। ইউরোপীয় রমণী পাওয়া কষ্টকর ছিল। প্রতি জাহাজে কিছু কিছু মহিলা আসতেন বাগদত্তা হয়ে, বা বর বাছাইয়ের জন্য। ই.এ. ফস্টারের লেখা উপন্যাসেও এ বিবরণ আছে, ঘটনা যদিও বিশ শতকের। এর মাঝে কিছু ইউরোপিয় মহিলা যে স্বৈরিণী হতো না তা নয়। ইংরেজ সিভিলিয়ানরা অনেকে প্রকাশ্যে রক্ষিতা রাখতেন, সন্তানের পিতাও হতেন। এ জন্য কোনো সামাজিক লজ্জা ছিল না। হিকি উল্লেখ করেছেন তার বন্ধু পট ছিলেন মুর্শিদাবাদের রেসিডেন্ট, "মুর্শিদাবাদ থেকে খোঁজখবর করে একটি সুন্দর এদেশীয় মেয়ে আমাকে কলকাতায় উপঢৌকন" পাঠায়। মেয়েটির সঙ্গে হিকির একটি সন্তানও হয়। তবে তার কালো চুল আর কালো রং হিকির পছন্দ হয়নি। অবশ্য কিছুদিন পর হিকি আবিষ্কার করেন, সন্তানটি তার ভৃত্যের। কিরণবালাকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। এরপর হিকির স্ত্রী লন্ডন থেকে আসেন বসবাসের জন্য। তিনি মারা গেলে এক জমাদারনীকে রাখেন তিনি রক্ষিতা হিসেবে। তবে, যারা রেসিডেন্ট হিসেবে বিভিন্ন এলাকায় ছিলেন তাদের জীবনযাপন ছিল আরো জাঁক জমকের।[৭৩]

এ জীবন যাপনের কথা পূর্ণ হবে না ভৃত্যদের কথা উহ্য থাকলে। এ ভৃত্যদের মধ্যেও হায়ারার্কি ছিল। সিভিলিয়ানদের একজন বেনিয়ান থাকতোই। এ বেনিয়ান ছিলেন তার সচিব থেকে শুরু করে মহাজন। কলকাতার প্রচুর নামি পরিবারের পত্তন বেনিয়াগিরি থেকে। ইংরেজরাই এর সংজ্ঞা দিয়েছিলো এভাবে–

"Interpreter, head book-keeper, head secretary, head broker, the supplier of cash and cash-keeper... serving to further such act and proceedings as his master they knew all the ways, all the little frauds, all the defensive armour, all the artifices and the contrivances by which abject slavery secures itself against the violence of power."[৭৪]

হবসন জবসনে অবশ্য বানিয়াকে সরাসরি ভৃত্য বলা হয়েছে।[৭৫]

গৃহভ্যন্তরে দায়িত্বে থাকে সরকার। বাড়ির ভৃত্যকূল, বাজার হাট সামলাবার দায়িত্ব সরকারের। বেতন ছাড়াও সরকার নিয়মিত বিভিন্ন কেনাকাটা থেকে পয়সা সরাতে কুণ্ঠিত হতো না। হবসন জবসনে সরকার সম্পর্কে বলা হয়েছে– "a domestic servant who is a kind of home- steward, and keeps the account of house hold expenditure, and makes miscellanous purchases for the family..."[৭৬]

ভৃত্যকূল ছাড়া ইউরোপিয় বা সিভিলিয়ানের জীবন ছিল অচল। প্রথম দিকে তো গোলাম কেনা বেচাই হতো। অত্যাচারিতও হতো তারা। সুযোগ পেলে অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্য পালিয়ে যেতো। এমা রবার্টস ও জর্জ জনসনের বইতে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ আছে। এমা রবার্টর্স লিখেছিলেন, বাংলার প্রেসিডেন্সির যে কোনো ঘরে হিন্দু মুসলমান ভৃত্য থাকবে। এদের মধ্যে প্রধান ছিল খানসামা, সাধারণত তারা হতো মুসলমান যে "acts in the capacity of majordomo, purveryor, and confectioner, superintending the cooking department."[৭৭]

খাবার টেবিলে কর্তার চেয়ারের পেছনে দাঁড়াবার অধিকার ছিল একমাত্র খানসামার, তারপাশে খিৎমদগার। চাপরাশি বাইরে ছোটাছুটির কাজ করতো। প্রতিটি কাজের জন্য ভৃত্য ছিল। "হরকরা নামে একদল ভৃত্য থাকত। যাদের একমাত্র কাজ ছিল সাহেবের বৈঠকখানা ঘরের পিছনের একটি কুঠুরিতে চুপ করে বসে থাকা, এবং 'কৈ হ্যায়' বলে সাহেব চেঁচিয়ে উঠলে 'হুজুর' বলে সেলাম দিয়ে সাহেবের কাছে এসে দাঁড়ানো।"[৭৮] একটি ছোট পরিবারের ক'জন ভৃত্য থাকতো তার একটি পরিসংখ্যান পাই এমার গ্রন্থে–

ঘরের জন্য

খানসামা	১	চাপরাসি	১
খিদমৎগার	১	দারোয়ান	১
আবদার	১	দরজি	১
হুকোরদার	১	ধোপা	১
বয়	১	ভিস্তি	১
পাচক	১	আয়া	১

মশলাচি	১	মেথর মেথরানী	১
সর্দার বেয়ারা	১		
হরকরা	১	মোট	১৬ জন

বাইরের জন্য

পালকি বেয়ারা	৪	মুর্গিঅলা	১
কোচওয়ান	১	মালি	১
সহিস	১		
ভেড়িওয়ালা	১	মোট	৯ জন।[৭৯]

এ সংখ্যা অনেকের ক্ষেত্রে আরো বেশি হতো। বেতন এদের খুব বেশি ছিল না দেখে 'সাহেবরা'রা এতো বেশি 'সার্ভেন্ট' রাখতে পারতো। যেমন ১৭৫৯ সালে একজন খানসামার বেতন ছিল ৫ টাকা, ১৭৮৬ সালে বেড়ে হয় তা ১০/২৫ টাকা।[৮০]

ফ্যানি পার্কস লিখেছিলেন, "ইংলন্ড থেকে নতুন কেউ এদেশে এলে তাঁর টেবিলের জন্য যে সংখ্যক ভৃত্য দরকার হয় তা অবিশ্বাস্য। গতকাল আমরা আটজন মিলে একটি ডিনার খেয়েছিলাম, তার জন্য তেইশজন ভৃত্য প্রয়োজন হয়েছিলো। প্রত্যেক ভদ্রলোক একজন থেকে ছ'জন পর্যন্ত ভৃত্য সঙ্গে নেন। এবং প্রত্যেক মহিলা যতজন খুশি দাসী পরিবৃতা হয়ে থাকেন।"[৮১]

এ কারণেই আদি সিভিলিয়ানদের নাম হয়ে গিয়েছিলো নবাব। অনেকে ঋণ করে নবাবি করেছেন, ঋণ শোধ না করেই মারা গেছেন। অনেকে প্রভূত রোজগার করে প্রভূত খরচ করে কূর্দকশূন্য হয়ে মারা গেছেন। অনেকে অর্থ জমিয়ে ইংল্যান্ডে জমিজমা কিনে নবাবি চালটা বজায় রাখতে পেরেছিলেন। আবহাওয়া, অমিতচারের ইত্যাদির কারণে অধিকাংশ সিভিলিয়ানের জীবন দীর্ঘ হতো না। বাংলার পথে প্রান্তরে এখনও কোনও না কোনও সিভিলিয়ান বা ইউরোপিয়দের সমাধির ধংসাবশেষ পাওয়া যাবে। আমি একবার বক্সা জেলে যাওয়ার জন্য পাহাড়ের পাকদন্ডি বেয়ে উঠছিলাম। পথে পথে অষ্টাদশ শতকে মৃত্যুবরণকারী অনেক ইউরোপিয়দের সমাধি দেখে বিস্মিত হয়েছি। ভাগ্যান্বেষণে কোথা থেকে কোথায় এসে তারা ছড়িয়ে পড়েছিলো। শুধু ছড়িয়ে পড়া নয় রাজত্ব করে গিয়েছিলো। 'ইন্ডিয়া বিল' বিতর্কের সময় স্কট বলেছিলেন, "গত ২২ বছরের মধ্যে ৫০৮ জন 'সিভিল সার্ভেন্ট' বাংলাদেশে নিযুক্ত করা হয়েছিলো, তাদের মধ্যে মাত্র ৩৭ জন দেশে ফিরে এসেছিলেন; ১৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এখন বাংলাদেশে যে ৩২১ জন কর্মচারী আছেন। তাঁদের মধ্যে আগামী দশ বছরে ৩৭ জনও ফিরে আসবেন কিনা সন্দেহ। আগে যে ৩৭ জন ফিরে এসেছেন তাঁরা কেউই খুব বেশি

ধনদৌলত নিয়ে ফিরতে পারেননি। অনেকেই ২০,০০০ পাউন্ডেরও কম সঞ্চয় নিয়ে ফিরে এসেছেন, কেউ কেউ আবার এক শিলিংও নিয়ে ফিরতে পারেন নি।"[৮২]

॥ ৬ ॥

উনিশ বা বিশ শতকের সিভিলিয়ানদের জীবনচর্যার সঙ্গে কোনো মিল নেই সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের সিভিলিয়ানদের। প্রথম পর্বের সিভিলিয়ানদের নিয়ে তথ্যের শেষ নেই এবং তা বৈচিত্র্যময়ও। এর একটি কারণ, ঐ জীবনচর্যা ছিল একেবারে ভিন্নরকম, তখন লেখক পর্যটকদের কাছে যা ছিল রোমাঞ্চকর। অন্যদিকে, দ্বিতীয় পর্বে বিশেষ করে বিশ শতকের জীবন চর্যার বিবরণ পাওয়া যাবে বিভিন্ন আত্মজীবনীতে, তবে, তা খানিকটা বৈচিত্র্যহীন। কারণ, এদের অধিকাংশের জীবনের বড় অংশ কেটেছে সদরের বাইরে 'স্টেশনে', মফস্বলে। সেখানে জীবন যাত্রা ছিল নিস্তরঙ্গ। এ ছাড়া, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সিভিলিয়ানদের চাকরির কাঠামো হয়েছে সুশৃঙ্খল, বেতন অপর্যাপ্ত নয়, [বিশ শতকে] সিভিল সার্ভিসে ভারতীয়দের সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। জীবনচর্যায় একধরনের সমতা এসেছে। উনিশ শতকের শেষার্ধে বা বিশ শতকে যারা ইংল্যান্ড থেকে ভারতে এসেছেন তাদের কাছে ভারত তখন কোনো অজানা ভূখণ্ড নয়। অনেকে বংশ পরম্পরায় চাকুরি করতে এসেছেন। ভারতে তাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখালেখিও কম ছিল না। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে কলকাতা শহর মেট্রোপলিটন এক আকর্ষণীয় নগরে পরিণত হয়েছে। শুধু ইংরেজ সিভিলিয়ানই নয়, বিভিন্ন দেশের মানুষ এসে জীবীকার্জনে ব্যস্ত। ভ্রমণ পিপাসুর সংখ্যাও কম নয়। বিশ শতকে এর আয়তন, জনসংখ্যা অন্যান্য শহরের তুলনায় এতো বেশি ছিল যে, বিশেষ ভাবে চোখে পড়ার মতো কেউ ছিল না।

ইউরোপিয়ানরা যখন প্রথম আসে এ দেশে তখন যেখানে বাণিজ্য কুঠি তার বাইরে তাদের পদার্পণ ছিল একরকম নিষিদ্ধ। কোম্পানি রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের পর, স্পিয়ারের ভাষায় 'মফস্বল সেটেলমেন্টে' পরিবর্তন আসে। কোম্পানি এলাকায় ব্যবসা করতে হলে তখনও বিশেষ ছাড়পত্র লাগতো কিন্তু তা সত্ত্বেও এসব 'সেটেলমেন্টে' ইউরোপিয়দের সংখ্যা বাড়তে থাকে। প্রথম দিকে সেখানে ছিল কূটনৈতিক [পলিটিক্যাল এজেন্ট] সৈন্য, সরকারি আমলা, সৈন্য ও 'এডভেঞ্চারারস'। বিভিন্ন রাজদরবারে ছিল এজেন্ট, সৈন্যরা ছিল রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে। কালেকটর বা তার অধস্তন কয়েক জন আমলা।[৮৩] তবে, মফস্বলে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলো 'বিভিন্ন ধরনের প্লান্টার, যেমন, চা-কর, নীলকর, স্বাধীন ব্যবসায়ী, দেশি জমিদারিতে চাকুরিরত অনেকে যারা ছিল ইউরোপিয়।

সিভিলিয়ানদের ঐ সময়ের জীবনচর্যার একটি চিত্র পাই থমাস উইলিয়ামের

একটি লেখা থেকে, তিনি লিখেছেন–

মোটামুটি ভালো স্বাস্থ্যের একজন ইউরোপিয় যদি সাধারণভাবে সংযমী হয়ে জীবনযাপন করে তাহলে শুধু কলকাতা নয়, পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় ভালোভাবে সে জীবনযাপন করতে পারবে। আবার এটাও স্বীকার্য যে, দু'একপাত্র মদ না খেলে, বিশেষ করে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, তাহলে হঠাৎ সে ইহলোক ত্যাগ করে। যারা খাবারের সঙ্গে দু'এক পাত্তর পান করে তারা টিকে থাকে। মদের মধ্যে উল্লেখ্য ক্লারেট ও মেডিয়ারা। শেষোক্তটি চমৎকার তবে বেশি পান না করাই ভালো। কারণ তা শোণিত তপ্ত করে, জ্বরের ঘোর নামে।

সিভিলিয়ান হয়ে এলে প্রথমে একবার জ্বরে কাবু হওয়া নিশ্চিত, তারপর বাড়ি খুঁজে পেলে থিতু হওয়ার প্রশ্ন। প্রথমে আসবাবপত্র। 'হসপিটালিটি'র দুর্নাম এখনও হয়নি, তবে তা আর আগের মতো নয় [অর্থাৎ ঘন ঘন আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণ]। আগে গাত্রবর্ণের কারণে, একজন আগন্তুক তার দেশি ভাইয়ের আসরে যাওয়ার ছাড়পত্র পেয়ে যেতো কিন্তু এখন একধরনের পরিচয়পত্র (ইন্ট্রোডাকশন) লাগে আর নিজের খরচ নিজেকেই বহন করতে হয়।

পোষাক আষাকের প্রয়োজন প্রচুর। ত্রিশটি স্যুট খুব বড় সংখ্যা নয়। কাপড় সাধারণত কালিকো বা নানকিন। কোট ব্যবহৃত হয় ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় নয়তো আনুষ্ঠানিক কোনো অনুষ্ঠানে।

যারা ঘোড়ায় চড়ে ব্যায়াম করে তারা খুব ভোরেই বেরিয়ে যায় এবং সূর্য খানিকটা ওপরে ওঠার আগেই ফিরে আসে। তারপর প্রাতরাশ চা, কফি, ডিম, টোস্ট এবং মাছ। অনেকে বিশেষ করে উত্তর ব্রিটেনের যারা তারা মিষ্টি বা সুজি খায় প্রাতরাশে।

সকালে নিজস্ব কাজ, বা পড়াশোনা ইত্যাদি। যারা অলস তাদের সঙ্গী হুঁকা বা তাস। যাদের অফিস আদালতে যেতে হয় তারা পালকি চড়ে রওয়ানা হয়। ৫-৬ ঘণ্টা পর কাজ শেষ হলে বাসায় ফেরে বা বন্ধুর বাসায় যায়। খানিকটা খেয়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ঘুমায়, ঘুম থেকে উঠে পরিষ্কার কাপড় পড়ে যায় নৈশভোজে। আটটা নটার দিকে কফি বা চা দেয়া হয়। কলকাতার কিছু পরিবার বা কিছু আউট স্টেশন ছাড়া সাপার কেউ খায় না।

অর্থকড়ি সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা ত্যাগ করা উচিত। জিনিষপত্র সস্তা হলেও। ইউরোপে যা খরচ এখানে তার থেকে তা বেশি। বাড়িভাড়া খুবই চড়া। কলকাতায় ছোট একটি বাড়ির ভাড়া দুশো রুপি মাসে, বা বার্ষিক তিনশ পাউন্ডের মতো।[৮৪]

গৃহিণীদের জীবন হয়ে উঠেছিলো আরো নিরানন্দ। উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সে অবস্থার খানিকটা পরিবর্তন এসেছিলো যখন ভারতীয় সমাজের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ হচ্ছিলো। এ ছাড়া ঘরের তত্ত্বাবধান,

অফিসিয়াল পার্টিতে সাজগোজ করে যাওয়া ছাড়া তাদের আর করার কিছুই ছিলো না। কলকাতা বা ঢাকার জীবনে তারা খানিকটা বৈচিত্র্য পেলেও এর বাইরে স্বামীর সঙ্গে মফস্বলে কাটানো ছিল এক ধরনের যন্ত্রণা। লিখেছিলেন মউড ডাইবার,

"An aglo Indian girls domestic duties are practically nil. All things conspire to develop the emotional, pleasure loving side of her nature... that curious slackness mental and moral- of which the Anglo-Indian woman female stands accused."[৮৫]

তবে, বাংলাভাষায় এদের অবদান একটি শব্দ, 'মেমসাহেব'। বাংলা প্রেসিডেন্সিতে বিবাহিত ইংরেজ মহিলাদের এই নামেই সম্বোধন করা হতো। এর বিপরীত সাহেব। আর শিশুদের 'বাবা' বা 'মিসি বাবা।' এই 'বাবা' বা 'মি-সিবাবাদের' জীবন ছিল বরং আনন্দময়, যদিও আয়াদের তত্ত্বাবধানে এক ধরনের রুটিন জীবন যাপন করতে হতো। উল্লেখ্য, উনিশ শতকের দ্বিতীয়/তৃতীয় দশক বিশেষ করে দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ইউরোপিয় দম্পতিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। উনিশ শতকের ত্রিশদশকের সন্তানসহ সিভিলিয়ান দম্পতির সুন্দর চিত্র পাই কোনো কোনো গ্রন্থে। এখানে তা উদ্ধৃত করছি–

বাংলায় এক শিশু (মেয়ে)র প্রথম বছরের রুটিন বর্ণিত হয়েছে, গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদ 'গার্ডেন' বা বাগানে। দেখা যাচ্ছে বাগান জীবনচর্যার একটি বড় উপাদান। পরিচ্ছেদে বাগানের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। ভোর হচ্ছে, কামান দাগা হচ্ছে (সংকেত হিসেবে)। মেম সাহেব উঠে পড়েছেন, ডাকছেন–

"Ayah! Ayah! take up missy,- wake the little boy. bring their shoes, socks, banyans, pyjamas, frocks, pelesses and cops."

কারণ, সকালের ঠান্ডা বাতাসে হাঁটলে গাল রক্তিম হবে। বেড়িয়ে এসে বাচ্চারা ভালোভাবে নাস্তা করবে। মা টমটমে বেরিয়ে যাচ্ছে বেড়াতে, ফুল আনতে। বেগোনিয়া ফুল নিয়ে মা ফেরে, বলে–

"And now I am tired, I have been a long way and must go and lye on my couch; when I get up I will send for you, But here is the donkey come to me milked! will you have a cup of milk."

মেয়ে বলছে, সে গাধার দুধ খাবে না কারণ তা খুব ঘন আর মিষ্টি সে ছাগলের দুধ খাবে। যাহোক তারপর সপরিবারে নাস্তা। মেয়ে ও আয়াকে লক্ষ্য করে মা বা গৃহকর্ত্রী বলছে–

"Bring Mamas cocoa, Papas coffee, and toast and milk for the little boy and girl; come, sit down by me, here is some bun for you, and a plain biscuit."

বিকেলে বাচ্চারা আবার একপ্রস্থ কাপড় বদলায়। তারা বাগানে খেলা করে,

মা আবার কোচে করে ভ্রমণে বের হন। মেয়ে বলে, "Mama, kiss me, and kiss Cecil too."

এক সময় বেরিয়ে ফেরেন। কর্ত্রী, মেয়েকে ডেকে বলেন,

"And now tea is come; here is the goats milk, and the hot water, the Misree, and dry toast, Now it is nice and seweet."

মাঝে মাঝে দাদা দাদী বা নানা নানী ইংল্যান্ড থেকে বাক্স পাঠান [বক্স ফ্রম ইংল্যান্ড], অর্থাৎ আদুরে নাতি-নাতনিদের জন্য জিনিষপত্র। একটু বড় হয়ে উঠলে বাচ্চাদের ইংল্যান্ড পাঠানো হয়, কারণ–

"For in England, little boys and girls are rosy and healthy; and rarely what is to be ill or unhappy."[৮৬]

সিভিলিয়ানদের আদর্শ জীবন একেবারে! বিশ শতক পর্যন্ত এর হেরফের খুব একটা হয়নি।

কলকাতা এবং কলকাতার বাইরের জীবনে ছিল আকাশ পাতাল তফাৎ। আবার কলকাতার আশেপাশের অঞ্চলের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের তফাৎ ছিল চোখে পড়ার মতো। পূর্ববঙ্গে পোস্টিং কারো কাম্য ছিল না। সিভিলিয়ানদের নিয়ে যারা লিখেছেন বা গবেষণা করেছেন তারা কলকাতা কেন্দ্রিক সিভিলিয়ান জীবনের ওপরই গুরুত্ব দিয়েছেন। আত্মজীবনীতে বর্ধমান, মেদেনীপুর, ২৪ পরগনার কথা আছে কিছু কিছু কিন্তু পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে তথ্য নেহাৎই কম। সাধারণভাবে বলতে পারি কলকাতার বাইরে জীবন ছিল নিঃসঙ্গ, একঘেঁয়ে। কলকাতার বাইরে ঢাকা পরিচিত ছিল সদর হিসেবে। কিন্তু কলকাতার তুলনায় ছিল মফস্বল। একারণে আমি সে জীবনের কিছুটা বর্ণনা করবো।

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে বা উনিশ শতকের শুরুতে পূর্ববঙ্গে সিভিলিয়ানের জীবন কেমন তার চমৎকার চিত্র আছে বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত রবারদিউর কাহিনীতে। ফলে, এখানে তা বিস্তারিত উল্লেখ করলাম না। ববারদিউ লিখেছিলেন– "মফস্বলের জীবন বৈচিত্র্যহীন, বিষাদময়, স্থবির, নির্জন, নিজের ভেতর থেকে আনন্দ সৃষ্টি করতে না পারলে, ব্যক্তি অসহায় হয়ে ওঠে।"

১৮৭০ সালে কটন ছিলেন চুয়াডাঙ্গার এসডিও, তিনি লিখেছেন, বাংলার একটি পরিচিত মহকুমা চুয়াডাঙ্গা এবং সরকার আমাকে এখানে নিযুক্ত করায় ভাগ্যবানই মনে হলো। প্রথম দেখায়, জায়গাটি আকর্ষণীয় নয়; চার্লস লয়াল এলাহাবাদ থেকে এখানে এলেন আমাদের সঙ্গে ক্রিসমাস কাটাতে। তাঁর ভাষায় এটি হলো ইঁদুরের গর্ত। ধানক্ষেতের মাঝে আমাদের ছোট বাংলো আর পাশে আদালত। যে রাস্তায় বৈকালিক ভ্রমণ তার দু'পাশে ধানক্ষেত; আমাদের কোনো ঘোড়ার গাড়ি ছিল না কারণ সেখানে কোনো রাস্তা ছিল না, নিসর্গের বৈচিত্র্যের জন্য

কোনো গাছও ছিল না, ব্যতিক্রম আমাদের কম্পাউন্ডে একটি বা দুটি পিপুল গাছ। দশ মাইলের মধ্যে ছিল না কোনো শ্বেতাঙ্গ মুখ।[৮৭]

কটন সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত ব্যস্ত থাকতেন। তাঁর স্ত্রীর কথা বলার কেউ ছিল না। কিন্তু দুটি সন্তান থাকায় তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হতো। আশে পাশের এলাকায় ছিল কিছু নীলকর যারা 'হসপিটেবল' ও বড়সড় বাড়ির মালিক। যাদের সঙ্গে কটন দম্পতির খাতির ছিল। নিম্নবঙ্গের নীল শিল্পের এটি ছিল কেন্দ্র। এবং তরুণ সিভিলিয়ানদের এটিই ছিল আকর্ষণের কারণ। অন্যান্য জায়গায় কর্মচঞ্চল হলেও শ্বেতাঙ্গ পাওয়া ছিল দুরূহ।[৮৮]

বেভারিজের স্ত্রী আনেৎ ১৮৮৪ সালে তার সন্তানদের লিখেছিলেন ফরিদপুর থেকে– এটি খুবই আকর্ষণীয় জায়গা এবং আশা করি তোমাদের কাউকে এমন জায়গায় বসবাস করতে হবে না তবে যদি করতে হয় তাহলে তোমার দৃষ্টিতে অনেক কিছুই ইন্টারেস্টিং ঠেকবে। একটি বিষয় আমার পছন্দ নয়। কলকাতায় না পাঠালে এখানে মাংস পাওয়া যায় না যা এখান থেকে অনেক দূরে। অবশ্য, ক্রিসমাসের দিন খানিকটা গরুর মাংস পেয়েছিলাম এবং তা খেয়ে সবাই খুব খুশি।

কয়েকদিন পরপর কালো দু'টি বড় মটকা নিয়ে গরুর গাড়ি নদীতে যায়। সেখানে মটকা দুটিতে পানি ভরা হয়। সে পানি ফুটিয়ে ফিল্টার করে আমরা খাই।[৮৯]

জেমস ফারলংয়ের নীলকুঠিতে [মূলনাথ] গিয়ে লেখা পত্রগুচ্ছেও নীলকারখানা ও আশেপাশের নিসর্গের প্রশংসা করেছিলেন কোলসওয়ার্দি গ্রান্ট। প্রচুর ড্রইং করেছিলেন তিনি সেখানে।[৯০]

কিন্তু জীবন কি খুব কষ্টকর ছিল? মোটেই না। অষ্টাদশ শতকের মতো উনিশ ও বিশ শতকেও ভৃত্যকূল এই সব প্রভুদের সেবায় নিয়োজিত ছিল।

"Life in India for those who ruled it has always been life with trains of servants."[৯১]

১৮৭৬ সালে বেভারিজ দম্পতির খেদমতে নিযুক্ত ভৃত্যের সংখ্যা ছিল ২১ জন এবং তাও ছিল না পর্যাপ্ত। এ সময় তারা রংপুরের মতো শান্ত স্টেশনে বসবাস (১৮৭৬) করছিলেন। পরিবারও ছিল ছোট। ১৮৮০ এর দিকে তাঁরা ছিলেন বাঁকিপুরে। তখন তাদের সন্তান সংখ্যা বেড়েছে এবং ছিল 'ফুল সোশ্যাল লাইফ'। এ সময় তাঁর ভৃত্য সংখ্যা ছিল ৩৯। ভৃত্যরা নিজ বাড়ি অথবা বাংলো চত্বরে নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় থাকতো। নিজেদের খাবার নিজেরাই খেতো।

সিভিলিয়ানদের বেতন তখন নির্দিষ্ট থাকার পরও মফস্বলে খরচ ছিল অতি সামান্য। ১৮৭২ সালে খাবার খরচের একটি হিসাব রেখে গেছেন তাঁর স্ত্রী।

৫৩টি বড় মোরগ	১২ রুপি ২ আনা

৬৬টি মাঝারি মোরগ	৬ রুপি ৩ আনা
৫১টি ছোট মোরগ	৩ রুপি ৩ আনা
৪টি হাঁস	১ রুপি ৪ আনা

খানসামাকে প্রায় ২৩ রুপি দেওয়ার পর সে ১৭০টি মোরগ ও ৪টি হাঁস এনেছিলো। ঐ সময় এক রুপি ছিল দু'শিলিংয়ের সমান, ১ আনা ১ বা আধ পেনির সমান।[৯২] ইংল্যান্ডে নিশ্চয় তা সম্ভব ছিল না।

বিশ শতকের গোড়ায় এসে ড্যাশ চাঁটগার সহকারি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিযুক্তি পেয়েছিলেন। তরুণ ড্যাশ চাটগাঁয় এসে বাসায় পৌঁছলেন। অবাক হয়ে বন্ধুকে লিখেছেন ভৃত্যের সংখ্যা অজস্র। তাঁর বেয়ারার নাম ছিল দুর্গা। তাঁর ভাষায়, "আমি দিনে দু'বার গোসল করতাম। তোয়ালে পড়ে বাথরুম থেকে বের হয়ে চেয়ারে বসতাম যা দুর্গা আগেই পেতে রাখতো। পা বাড়িয়ে দিতাম। দুর্গা পা মুছে দিতো। তারপর পায়ে মোজা পরিয়ে দিতো। শার্ট পরার পর বোতাম বা কাফলিং লাগিয়ে দিতো। তারপর পাতলুন। দুর্গা তা এমনভাবে ধরতো যাতে প্রভু দাঁড়িয়েই তাতে পা গলাতে পারেন। ইতোমধ্যে ড্রেসিং রুমে দুর্গা সাজিয়ে রেখেছে কিছু টাই আর কলার। প্রভু তার থেকে একটা বেছে নিতেন। প্রভু চেয়ারে বসলে দুর্গা এরপর জুতো পরিয়ে দিতো। জুতোর ফিতে বেঁধে দেয়ার পর প্রভুর হাতে রুমাল গুজে দিতো। অতঃপর প্রভু গৃহ থেকে নির্গত হতেন।" ড্যাশ লিখেছেন, "নবিস থাকার সময় এক বন্ধুকে নিয়ে খানিকটা হেঁটে এক হোটেলে খেতে গিয়েছিলেন প্রথম দিন, "unaware that gentlemen of our status and refinement rarely walk distances so long as 300 yards."[৯৩]

আরো পরে সিভিলিয়ানের দৈনন্দিন জীবনের চিত্র রেখে (১৯৩৬) গেছেন টাইসন যার সঙ্গে দেড়শ বছর আগের রুটিনের মৌলিক পার্থক্য ছিল না। একদিন ছিল আরেকদিনের মতো। ৬.৩০ এ চায়ের জন্য গাত্রোত্থান। বাসার অফিসে ৭.৩০ এর মধ্যে। ৮.৩০ পর্যন্ত কাজ। ৮.৩০ এ নাস্তা। ৯টায় অফিস, দর্শনার্থীদের দর্শন। ১০-৪৫ এর দিকে আদালত বা অফিসে। ১টা পর্যন্ত অফিস। তারপর স্যান্ডউইচ লাঞ্চ। ৩টার দিকে অফিস ত্যাগ, বাসায় ফিরে চা খেয়ে কাজে বসা। ৮.৪৫ এ কাজ সেরে স্নান তারপর রাতের খাবার বা কাজ। রোববারে সকাল ১১টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের দেখা দেওয়া। তারপর ক্লাবে খানিকটা সময় কাটানো। গরমে কষ্ট পেতেন, তবুও গরমে ডিনারস্যুট পরতেন। রাতে গরমে ঘুমুতে না পারলে সেক্রেটারিয়েটওয়ালাদের মুণ্ডুপাত করতেন যারা পাহাড়ে বসে আরামে শুধু কাজ করে না, বেতনও পায় বেশি। জজ হিসেবে টাইসন কেটেকুটে পেতেন ১০৩৮ রুপি ৬ আনা যা ছিল প্রায় ৯১ পাউন্ডের সমান।[৯৪]

সাধারণভাবে অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে মফস্বলে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের

বিনোদনের প্রধান উপায় ছিল শিকার। সারা চাকুরি জীবনে প্রায় প্রতিটি সিভিলিয়ানের জীবন চর্যার প্রধান অঙ্গ ছিল শিকার। এ বিষয়ে আলাদাভাবে বিবরণ দেবো। যারা খানিকটা আঁকতে পারতেন তাঁরা কিছুটা সময় কাটাতেন ড্রইং করে যার বিবরণও আলাদাভাবে উল্লেখ করবো। আর ছিল চিঠি লেখা। বিদ্যাচর্চায়ও অনেকে রত ছিলেন এবং তাদের গ্রন্থ, রিপোর্ট এখনও আমরা গবেষণার জন্য ব্যবহার করি। তবে, এর সংখ্যা ছিল অল্প। 'স্টেশনে' কিছু শ্বেতাঙ্গ থাকলেই গড়ে উঠতো ক্লাব যেখানে প্রতি সন্ধ্যায় সিভিলিয়ান ও তাঁর স্ত্রী বা অবিবাহিত সিভিলিয়ান, অন্যান্য জেলার ইংরেজরা আসতেন। কম্পিটিশনঅলা ও বক্সঅলাদের সম্মিলন হতো সেখানে। আজকের ঢাকা ক্লাব গড়ে উঠেছিলো এভাবে। স্টেশন একটু বড় হলে (যেমন ঢাকা) পলো বা ক্রিকেট খেলা হতো মাঝে মাঝে। তবে, স্টেশন ক্লাবই একসময় সিভিলিয়ানদের সামাজিক কেন্দ্র হয়ে ওঠে। যেখানে গিয়েই সিভিলিয়ান আরাম কেদারায় বসে হাঁক দিতেন, 'কোই হ্যায়'?

॥ ৭ ॥

সিভিলিয়ানদের চাকুরি জীবনের [স্থূল] মৌল বিষয়টি এক হলেও, বিভিন্ন প্রেসিডেন্সিতে চাকরির ধরণটি ছিল ভিন্ন। প্রথমদিকে সবাই নামতেন কলকাতায়, পরে মুম্বাই। তারপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে সবাই চলে যেতেন যার যার কর্মস্থলে। কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লী সরে গেলে, বাংলার সিভিলিয়ানরা কলকাতায় নেমে প্রথমে দেখা করতেন রাইটার্সে চিফ সেক্রেটারির সঙ্গে। আই.পি. বা পুলিশ সার্ভিসের সদস্য পুলিশের উর্দ্ধতন কর্তার সঙ্গে। তারপর দু' একদিন রয়েসয়ে নিজের কর্মস্থলে। প্রথম নিয়োগ সহকারি ম্যাজিস্ট্রেট, থার্ড ক্লাস পাওয়ার। তার পোস্টিংয়ের জায়গায় তাকে অভ্যর্থনা জানাতো অধস্তন কর্মকর্তা, কোনো নেটিভ, কখনও তার 'সহৃদয়' শ্বেতাঙ্গ কোনো সহকর্মী। অনেক সময়, সেটি অবশ্য আরো পরের কথা, কেউই থাকতো না। তবে, সে ধরনের ঘটনা ঘটতো কম। অনেক ক্ষেত্রে উর্দ্ধতন কর্তা তার বাসায় তাকে সাময়িক আশ্রয় দিতেন, বা তার সহকর্মীর ডেরায় বা ডাকবাংলো বা সার্কিট হাউসে। তারপর নিজের ব্যবস্থা করে নিতে হতো। প্রথমদিকে শ্বেতাঙ্গ নবীন সিভিলিয়ান, শ্বেতাঙ্গ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাটির দেখা পেতেন। বিশ শতক থেকে সেটি বদলে যায়। নবীন সিভিলিয়ান দিয়ে দেখা পেতেন কৃষ্ণচর্ম উর্দ্ধতন কর্তার। উল্টোটাও হতো। তবে, সিভিল সার্ভিসের মৌলিক নিয়ম যেটি ছিল, অধস্তনদের পক্ষপুটে রাখা সেটি সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। অন্তরের কথা বাদ দিই, বহিরঙ্গে এই প্রথার মৌলিক পরিবর্তন হয়নি। আরো পরে, সেই প্রথায় ভাঙন ধরেছিলো।

গত শতকের চল্লিশ দশকের কথা। অশোক মিত্র সদ্য লন্ডন থেকে প্রবেশনারি পিরিয়ড কাটিয়ে পৌঁছেছেন কলকাতায়। রাইটার্সে দেখা করতে গেলেন চিফ সেক্রেটারি মি. নিকোলাস ব্ল্যান্ডির সঙ্গে। সচিবালয়ের একজন আন্ডার সেক্রেটারি নিয়ে গেলেন তাকে। "কেতামাফিক চিফ সেক্রেটারিকে 'সার' সম্বোধন না করে, মি. ব্ল্যান্ডি বলায় তিনি কিছু আপত্তি করলেন না, শুধু প্রায় লক্ষ্য না করার মত একটু উঁচুতে তাঁর ভুরুটা ক্ষণিকের জন্যে উঠে আবার সহাস্যে নেমে গেল।... গুডউইল [আন্ডার সেক্রেটারি] ঘরে ফেরার পথে বললেন চিফ সেক্রেটারিকে 'সার' বলাই নিয়ম। পাঁচ বছরের বেশি অগ্রজদের নামের আগে মিস্টার বলাই ভালো। পাঁচ বছরের কম অগ্রজদের তাঁদের নাম ধরে ডাকলেই চলবে।"[৯৫]

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে অন্নদাশংকর রায়ের প্রথম পোসিটং কৃষ্ণনগরে। কালেকটর হ্যারল্ড গ্রেহামের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। "আমি যেতেই বললেন, "তোমাকে বুঝি এখানেই দিয়েছে? তা তুমি কী করবে?" আমি বললাম "আপাতত তো এখানেই থাকছি, কী করব না করব সে তুমি জানো।" তখন নাজির বাবুর ডাক পড়ল। জানা গেল যে ছোট হজুরের থাকবার জন্য ভি আই পি অফিসটা খালি করা হয়েছে, ধোয়া মোছাটাই যা একটু বাকি। সার্কিট হাউজ থেকে কিছু ফার্নিচারও পাওয়া যাবে। যতদিন না ছোট হুজুরের নিজের ফার্নিচার জোগাড় হয়।"[৯৬]

তার কিছু আগে অন্নদাশংকর রায় নিযুক্তি পেলেন, বহরমপুর। "একদিন সন্ধ্যার ট্রেনে বহরমপুর পৌঁছই। কেউ আমাকে নিতে আসেনি। পথঘাট অজানা। কোথায় উঠব তাও কি জানতুম। ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানকে বলি, "চলো কালেকটর সাহেবের কুঠি।" কালেকটর খুশি হন। অন্নদাশংকরের বন্ধু, খানিকটা সিনিয়র করুণাকুমার হাজরা "তখন সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেটও তাঁরই ওখানে আমার জন্যে ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁর কোয়ার্টাসে গিয়ে অবগত হই যে পরের দিন তিনি বহরমপুর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন সেটেলমেন্ট ক্যাম্পে। সেখান থেকে যাবেন মহকুমায়। সুতরাং সে বাসার আমিই কর্তা।"[৯৭]

আরো পরে, অশোক মিত্রের প্রথম নিযুক্তি কৃষ্ণনগরে। "নাজির বাবু যখন কৃষ্ণনগর স্টেশন থেকে আমাকে নামিয়ে ভাড়া গাড়িতে চড়িয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ির গাড়ির বারান্দায় নিয়ে নামালেন, তখন দে সাহেব [সুশীলদে] ও তাঁর স্ত্রী বাড়ির পিছনের বাগানে ছিলেন। তাঁরা নাজির বাবুকে বলে দিয়েছিলেন আমাকে বলতে যে, যতদিন আমার জন্য ঠিক করা বাড়িটি বাস করার মতো করে ঝাড়পোঁছ না হয় ততদিন আমি তাঁদের বাড়িতে অতিথি হয়ে থাকব। আমার আগের অ্যাসিস্টট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট, ইকবাল আথার [আতাহার] আলি, তখন সেটেলমেন্ট শিক্ষার জন্যে চলে গেছেন, কিন্তু তাঁর জিনিষপত্র তখনও অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেটের জন্য নির্দিষ্ট বাড়িতে আছে।"[৯৮]

বিশ শতকের যে ক'টি উদ্ধৃতি দিলাম তখন যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে কিন্তু পূর্ববঙ্গের অবস্থা তথৈবচ। উনিশ শতকে তো অবস্থা আরো ভয়াবহ ছিল। এখানে সংকলিত গ্রাহামের স্মৃতিকথায় দেখা যায়, ময়মনসিংহে কাজে যোগদানের জন্য ঢাকা থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে একা রওয়ানা হয়েছিলেন। কয়েকদিন পর পৌঁছেছিলেন ময়মনসিংহ। স্টেশনে পৌঁছার পর, নিজের বন্দোবস্তেই নিজেকে থিতু হতে হতো।

সিভিলিয়ানদের মধ্যে পুরনো প্রথা ছিল, স্টেশনে পৌঁছার পর উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যেটিকে বলা হতো 'কল' করা। 'কল' না করা ছিল অভব্যতা। বিশ শতকের চল্লিশ দশকেও তা বলবৎ ছিল। অশোক মিত্র লিখেছেন–

"আমার প্রথম সপ্তাহের প্রথম তিনচার দিন কাটল স্টেশনের প্রতিটি পরিবারের উপর 'কল করা', এবং স্থানীয় ক্লাবে গিয়ে সকলের সঙ্গে আলাপ করা, 'কল' করা দুরকম ছিল। আগে থেকে যদি বলা থাকত, তাহলে বাড়ি গিয়ে দরজার চাপরাশির হাতে দু'টি ভিজিটের কার্ড দিতে হতো, একটি কর্তার জন্যে, একটি গৃহিণীর জন্যে। যদি আপনার সঙ্গে আপনার স্ত্রী থাকতেন তবে তাঁর নিজস্ব একটি ভিজিটর কার্ড দিতে হতো গৃহিণীর জন্যে। উপরন্ত পরিবারে যদি প্রাপ্ত বয়স্কা অনূঢ়া কন্যা থাকতেন, আর আপনি যদি অকৃতদার থাকতেন তবে তাঁর উদ্দেশ্যে দিতে হতো আপনার আরেকটি কার্ড তবে তার এককোনা একটু কাটা হবে। যদি আগে থেকে বলা না থাকত তাহলে গেটে একটি নট অ্যাট হোম বাকস থাকত, তাতে দুটি অথবা তিনটি কার্ড ফেলে আসতে হতো। পরে আপনার নিমন্ত্রণের ডাক আসত। যদি আগে থেকে বলা থাকত, তাহলে কার্ড দিলে বেয়ারা বা চাপরাশি আপনাদের নিয়ে বসার ঘরে বসাত। চায়ের সময় গেলে চা পর্ব, সূর্যাস্তের পর গেলে গৃহস্বামীর হুইস্কি বা অন্য ককটেলে আপ্যায়িত করতেন।"[৯৯]

১৮৯০ সালে ওয়ে পৌঁছেছিলেন ভারতে। লিখেছেন, জজের সঙ্গে বাসায় দেখা করতে গিয়ে সোফার এক কোণে বসে ঘর্মাক্ত হচ্ছিলেন।[১০০]

পরে, অবশ্য হালচাল বদলে গিয়েছিলো। নবীনরা আর অতো ঘর্মাক্ত হতেন না। এ ধরনের অনেক প্রথা কালক্রমে বিলুপ্ত হয়েছিলো। অশোক মিত্র উল্লেখ করেছেন, একজন আইসিএস অফিসার যে কোনো জায়গায় কারো সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তার কার্ডটি পাঠালে প্রথমেই তার ডাক পড়তো। কীভাবে সবার সঙ্গে (অধস্তন সহ) ব্যবহার করতে হবে ১৮৭৪ সালে সে বিষয়ক একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিলো "তাতে নির্দেশ ছিল: 'আপনি যদি কারোকে দেখা করার অনুমতি দেন, সে যাই হোক, তিনি ঘরে ঢুকলে আপনি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াবেন, তাঁকে নমস্কার করবেন, তারপর সমুখের চেয়ারে বসিয়ে নিজে বসবেন। কথা বলে চলে যাবার সময়ে আপনি চেয়ার থেকে উঠে তাঁকে নমস্কার করে ঘর

থেকে বিদায় দিয়ে আবার বসবেন।' ১৯২০ সালের পর ইংরেজদের মধ্যে সব অফিসার এই নির্দেশ মানতেন না। এত তাড়াতাড়ি সাম্রাজ্য হারানোর এও বোধহয় একটি কারণ।"[১০১]

নবীন অফিসারকে কীভাবে কাজ দেখানো হতো তার বিবরণ আছে অশোক মিত্রের স্মৃতি কাহিনীতে। বিচারের কাজেই হাতে খড়ি হতো। এ ছাড়া রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়াদি। কারণ, সাম্রাজ্যরক্ষার মূল কথাই ছিল, শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও রাজস্ব আদায় করা।

সেটেলমেন্ট ট্রেনিংটি ছিল আবশ্যিক প্রশিক্ষণ কারণ এর সঙ্গে রাজস্বের বিষয়াদি জড়িত। সেটেলম্যান্ট ট্রেনিংয়ের আগে বা এসডিও হওয়ার সময় এই প্রশিক্ষণটি নিতে হতো। এর একটি নিয়ম দাঁড় করানো হয়েছিলো। নবীন যিনি সহকারি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে যোগ দিতেন, তার আগের নবীন সহকারি ম্যাজিস্ট্রেট তখন ট্রেনিংয়ে চলে যেতেন। শৈবাল গুপ্ত লিখেছেন "সদরে একবছর শিক্ষানবি-শর পর চারমাস সেটেলমেন্ট ট্রেনিং তারপর মহকুমার ভার–এই ছিল তখনকার নিয়ম।"[১০২]

সেটেলমেন্ট ট্রেনিংয়ে পুলিশ অফিসাররাও যোগ দিতেন। কারণ, বেশিরভাগ মামলা উদ্ভূত হতো জমিজমা সংক্রান্ত বিবাদ থেকে। একই সমসাময়িক ব্যাচের অফিসাররা একই সঙ্গে তাবুতে থাকতেন, সকাল থেকে প্রশিক্ষণ নিতেন। এফ.ও. বেল ১৯৩৬ সালে ছিলেন দিনাজপুরের সেটেলমেন্ট অফিসার। তাঁর ভাষায় চাকুরি জীবনে তাঁর সবচেয়ে তৃপ্তিদায়ক কাজ সেটেলমেন্ট অফিসার হিসেবে। কারণ, সেখানে তিনি নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতেন এবং তার ফলাফলের স্বীকৃতি এবং স্থায়িত্ব ছিল। সবচেয়ে বড় কথা স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণ লোকের সঙ্গে মেলামেশা হতো, ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নয়, যেখানে তাকে প্রায়ই মুখোমুখি হতো ক্রিমিনাল বা মামলাবাজদের সঙ্গে। অশোক মিত্রের স্মৃতিকথায়ও এর পরোক্ষ ইঙ্গিত মেলে।[১০৩]

এরপর মহকুমা ও সার্কল ট্রেনিং। "প্রধান শিক্ষার বিষয় ছিল এসডিওর সঙ্গে। তাঁর বাড়ির নিজস্ব অফিসে খাস কামরায় অথবা কোর্টের দপ্তরে বসে, তিনি কার সঙ্গে কিভাবে কথা বলেন, কী ধরনের কাজ কখন নিজে হাতে নেন, অথবা অন্য কোনো কর্মচারিকে করতে বলেন, অর্থাৎ কোন কাজকে তিনি কতখানি গুরুত্ব কী কারণে দেন তাই দেখা ও লক্ষ্য করা। তাছাড়া, তাঁর সঙ্গে অথবা তাঁর নির্দেশে একাই, গ্রামে গ্রামে ঘুরে তিনি কীভাবে কোন কর্তব্য পালন করেন সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা। এক কথায় চার সপ্তাহ ধরে তাঁর কাছে বা তাঁর এলাকায় শিক্ষানবিশী করা। চার সপ্তাহ তাঁর তত্ত্বাবধানে কাটিয়ে, আরো দু'সপ্তাহ থানা ও মফস্বল ট্রেনিং এর জন্য কাটাতে হতো কোনো থানায় সেখানে সার্কেল অফিসও

থাকত।"[১০৪]

মহকুমায় এসডিও ছিলেন সর্বেসর্বা। আদালতে বসে বিচার করতেন, প্রশাসনিক কাজ কর্ম করতেন। নিয়ম ছিল "সপ্তাহে একদিন তার অঞ্চলের যে কোনো জায়গায় গিয়ে রাত কাটাবেন যাতে নিজ এলাকার ব্যাপারে প্রাথমিক ধারনা জন্মে। প্রথমে নির্ঝঞ্ঝাট, পরে একটু সমস্যাসঙ্কুল মহকুমায় তাকে নিয়োগ দেয়া হতো। অনেকে একটিতেই পার পেতেন। নিয়মিত তাকে সফরে যেতে হতো। পূর্ববঙ্গের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে এই সফরটা সমস্যা সঙ্কুল ছিল না। কিন্তু পূর্ববঙ্গ ছিল আলাদা পৃথিবী। গত শতকের ত্রিশদশকের বিবরণ দেখুন তাহলে অনুধাবন করা সহজ হবে অষ্টাদশ ও উনিশ শতকে অবস্থা কী ছিল। ত্রিশের দশকে অন্নদাশঙ্কর রায় ছিলেন নওগাঁর মহকুমা হাকিম। তাঁর ওপরঅলা ঘোড়ায় চলাফেরা করতেন। আর তাঁর ব্যবস্থা ছিল "হাতী ছিল আমার প্রধান বাহন, যেমন হাউসবোট ছিল আমার প্রধান যান।" তাছাড়া ছিল পালকি। অশোক মিত্র লিখেছেন, তার ঐ একই সময়ে তার পূর্বসুরি সাইকেলে চড়ে ঘুরতেন।

গত শতকের ত্রিশের দশকে মার্টিইন ছিলেন কুষ্টিয়ার এসডিও। তিনি লিখেছেন, এসডিও যা করতেন, উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা তা সমর্থন করতেন। মহকুমার কোনো কাজকর্ম কেউ শোনেনি জেলা পর্যায়ের নির্দেশে হয়েছে।[১০৫]

মহকুমা হাকিমের ক্ষমতা ছিল অসীম তবে অর্থ কম। স্যার পার্সিভাল গ্রিফিথ লিখেছেন, বাড়ির আসবাবপত্রও নিজের বন্দোবস্ত করতে হতো এবং এ জন্য সরকারি কোনো বরাদ্দ ছিল না। ফলে, "you furnished it in a very simple, primitive way indeed."[১০৬]

উডরাফ লিখেছেন কেউ কোনো মহকুমায় দু'তিনবছর থাকলে সুবিধা হতো, তাকে ভাগ্যবান বলা যেতো। কারণ প্রথমবারের ভুলগুলি সে শুধরে নিতে পারতো।[১০৭]

মাঠপর্যায়ে সিভিলিয়ানের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী পদ ছিল কালেকটর বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের। ফরিদপুরের কালেক্টর এফ, ডব্লিউ, ওয়ার্ড ১৯০৩ সালে তাঁর চাচাকে এই পদের বৃত্তান্ত জানিয়েছিলেন। লিখেছিলেন তিনি–

রাজস্ব আদায় করা কাজের একটি অংশ মাত্র। তিনি রাজস্ব আদায়কারি, ম্যাজিস্ট্রেট, রেজিস্ট্রার, ড্রিস্কিটক্ট বোর্ড প্রধান, জেল প্রধান, জেলার পুলিশি কাজের দায়িত্ব এবং আরো কিছু ছোটোখাটো কাজের দায়িত্ব তার ওপর বর্ত্তায়। "প্রতিদিন সকাল ৬টায় উঠে হালকা প্রাতরাশ করি, আগের দিনের চিঠিপত্র ও আদেশের যেসব খসড়া তৈরি হয়েছে তা পাশ করি। তারপর স্নান সেরে নাস্তা। এরপর আগের দিন যেসব আপিল শুনেছি সেগুলির ওপর আদেশ দিই। ১১টায় অফিস। সেখানে বিভিন্ন মামলায় পুলিশের মামলার তদন্ত করি। যেগুলি প্রথম শুনানির জন্য

তৈরি হয়েছে সেগুলি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনে অধস্তন আদালতে প্রেরণ করি।

এরপর বেঞ্চ ক্লার্ক এসে প্রথম শুনানীর জন্য মামলা পেশ করে। প্রয়োজনে তা অন্য আদালতে প্রেরণ করি। যেগুলির জন্য বিশেষ আদেশ প্রয়োজন, এরপর সেগুলি নিষ্পত্তি করি, তারপর ফৌজদারি মামলার শুনানী।... দুপুর ২টায় টিফিন করার সময় পাই যদি সব মামলার নিষ্পত্তি করতে পারি। এরপর নিজের কাজ, সব ধরনের চিঠির উত্তর। যা বলিনি তাহলো, তোষাখানাও আমার দায়িত্বে। এবং আমার অধীনে যে দু'টি মহকুমা আছে তাও বছরে দু'বার পরিদর্শন করতে হয়। ২০টি পুলিশ থানা ও রেজিস্ট্রেশন অফিস বছরে ৩বার পরিদর্শন করতে হয়। মাসে একবার ডিস্টিলারি ও জেল পরিদর্শন। সভাপতি হিসেবে আমি দায়ী শিক্ষা, রাস্তা, খোঁয়াড়, ফেরি, খাল প্রভৃতির। আর কলেরা বা প্লেগ দেখা দিলে তো কথা নেই। জেলার আয়তন ২৩০০০ বর্গমাইল, জনসংখ্যা ১,৮০০০০০০ জন, আর ডেভনসায়েরের আয়তন ২৩,৫০০০ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ৬৬৫,০০০।"[১০৮]

অ্যারেরি ম্যাকে লিখেছিলেন, 'ভারতীয় জনসাধারণের কাছে কালেকটরই হচ্ছে ইম্পিরিয়াল গভর্নমেন্ট। তিনি বাংলায় নিযুক্ত না হলেও এ অভিজ্ঞতা সব অঞ্চলের জন্য ছিল মোটামুটি একইরকম। তিনি তাঁর জীবনযাপনের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। বাস করেন তিনি বড় সড় একটি বাংলোতে যা ফোল্ডিং চেয়ার টেবিলে সাজানো এবং যা দেখে মনে হয় এটি স্থায়ী একটি ক্যাম্প। বারান্দাভর্তি সাক্ষাৎ প্রার্থী।[১০৯]

এছাড়া ছিল অন্যান্য পদের সিভিলিয়ানরা। তারা শ্বেতাঙ্গ বা ভারতীয় দুই-ই হতে পারেন। কমিশনার [বিভাগ] ও সিভিল এবং সেশন জজ ছাড়া মহকুমা বা জেলা বা স্টেশনে যারা থাকতেন সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে তারা হলেন কালেকটর ম্যাজিস্ট্রেট, জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট, সহকারি ম্যাজিস্ট্রেট, সমস্ত কভেনান্টেড সিভিলিয়ানস। এছাড়া আছে সিভিল সার্জন, গণপূর্ত বিভাগের স্থায়ী কর্মচারি (যাকে বলা হয় পাবলিক ওয়েস্ট ডিপার্টমেন্ট, পিডব্লিউডি'র বদলে), দু'জন ডেপুটি কালেকটর, আনকভেনান্টেভ সার্ভিসের সদস্যবৃন্দ।[১১০] এছাড়া, পুলিশ, বন বিভাগের কর্মচারি যারা অনেকে ছিলেন সিভিল সার্ভিসের। রাজধানীতে ছিল সচিবালয় যা সবকিছুর কেন্দ্র। সচিবালয়ের সঙ্গে মাঠ পর্যায়ের দ্বন্দ্ব সব সময়ই ছিল। যদিও সচিবালয়ের সবাই কোনো না কোনো পর্যায়ে মাঠে ছিলেন। সেনা কর্মকর্তারাও কোনো কোনো স্টেশনে থাকতেন। এদের জীবন যাপন নিয়ে শ্বেতাঙ্গ/ সিভিলিয়ানরাই নানা রসালো ব্যাঙ্গাত্মক লেখা লিখে গেছেন।[১১১]

সামগ্রিক পর্যালোচনায় দেখা যায় ব্রিটিশরা এমন ব্যবস্থা করতে পেরেছিলো যে কোটি কোটি লোক অল্পকিছু শ্বেতাঙ্গের নির্দেশ মেনে নিয়েছিলো, একজন রাজকর্মচারি বা সিভিলিয়ান তার ওপর ন্যস্ত কাজ করে যেতেন। ট্রেভিলিয়ন

লিখেছিলেন– "The real education of a civil servent, consists in the responsibility that devolves on him at an early stage, which brings and whatever good there is in a man: the obligation to do nothing that can reflect his honour on the service. the varied and attractive character of his duties, and the example and precept of his superiors, who regard him rather on a younger brother than as a subordinate official."[১১২]

বেল লিখেছিলেন, জেলা ব্যবস্থাটা এমনভাবে গড়ে উঠেছিলো যে ব্রিটিশরা না থাকলেও তা চলতো। সেটি ঠিক, আজকের উপমহাদেশের জেলা ব্যবস্থার মৌলিক কাঠামো কম বেশি একই। বেল লিখেছিলেন–

"Yet if we think of the influence of the British members of the civil service, it is necssary to remember how few they were and how the machine employed many thousand of local Indians. In it's own way, the distict administration could carry on without any British officers what was less convincing about the district administration was its suitablility, or ability to adopt to the beginings of a more complex state, extending its functions."[১১৩]

॥ ৮ ॥

ব্যবসা করতে এসে একটি সাধারণ বাণিজ্য কোম্পানি বিশাল এক ভূখণ্ডের শাসক হয়ে বসলো– এরকম ঘটনা খুব কমই ঘটেছে। এবং এ জন্য খুব একটা প্রতিরোধের সম্মুখীনও হতে হয়নি। বলা হয়ে থাকে, ক্লাইভ সসৈন্য যখন মুর্শিদাবাদ পৌঁছলেন তখন মুর্শিদাবাদের প্রতিটি লোক যদি একখণ্ড পাথর ছুঁড়ে মারতো তাহলে একটি সৈন্যও ফেরত যেতে পারতো না। কেন কীভাবে উপনিবেশ স্থাপিত হয় এ বিষয়ে অনেকেই তাত্ত্বিক আলোচনা করে গেছেন। তবে, এ বিষয়ে ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী রেনি মওনিয়ে যা লিখে গেছেন তার মৌল বিষয়গুলি এখনও পুরনো হয়ে যায়নি। সিভিলিয়ান তথা কোম্পানি তথা ইংরেজ তথা ব্রিটিশ সরকার কী ভাবে শুধু উপনিবেশ স্থাপন নয় তা দৃঢ় করেছিলো তার সমাজতাত্ত্বিক অনেক উত্তর পাওয়া যাবে মওনিয়ের বই থেকে।

উপনিবেশ ও তার স্থাপনকারিদের বিষয়ে গত শত শতকের ত্রিশ দশকে মওনিয়ে অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়েছিলেন যা পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৪৯ সালে প্রায় ৮০০ পাতার একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় দুই খণ্ডে। অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন ই.ও. লরিমার, নাম 'দি সোশ্যলজি অব কলোনিজ।'[১১৪] তিনি প্রধানত প্রাচীন আমল, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসী বা পঞ্চদশ

শতকের পর স্পেনীয় ও ফরাসি উপনিবেশ স্থাপনকারিদের আলোকে গ্রন্থটি লিখেছেন। উনিশ বা বিশ শতকের বিশেষ করে আলজিরিয়ায় ফরাসি উপনিবেশ স্থাপন সম্পর্কিত বিষয় মাঝে মাঝে অবতারণা করেছেন। এর আলোকে ভারতে ইংরেজ উপনিবেশ স্থাপনকারিদের সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যাবে তা নয়। তবে, তাঁর গ্রন্থে উল্লিখিত উপাদান সমূহের আলোকে যদি ইংরেজ ঔপনিবেশকারিদের বিষয় আলোচনা করি তবে, অনেক বিষয় অনুধাবনে সুবিধা হবে।

মওনিয়ে কলোনি স্থাপন (কলোনাইজেশন) ও বিজয় কে (কনকোয়েস্ট) আলাদা প্রত্যয় হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতে, কলোনিকে কলোনি স্থাপনকারিরা সব সময় 'নতুন দেশ' বা 'নিউকান্ট্রি' বলে আখ্যায়িত করে। সুতরাং, ধরে নেয়া যেতে পারে, পুরনো দেশের সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। অর্থাৎ পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, সে দেশের (পুরনো) মতো উন্নত নয় নতুন দেশ তবে চমকপ্রদ (এক্সোটিক) হতে পারে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উপনিবেশ স্থাপনকারিরা নতুন দেশের অব্যবহৃত সম্পদ ব্যবহার করে এবং সম্পর্ক স্থাপন করে "bringing into contact human groups hiterto separated."

সে জন্য সব কলোনিতে দেখতে পাই উপনিবেশ স্থাপনকারিরা এসেছে বিজয়ী, গভর্নর, স্বার্থান্বেষী, পুরনো দেশের প্রতিনিধি হিসেবে। উদ্দেশ্য নতুন দেশের সম্পদের উন্নয়ন করে অধিবাসীদের উপকার করা। মওনিয়ের ভাষায়, "to bestow new countries the benefits of the development of their riches." [vol 1/p.6]

কলোনি স্থাপনে দু'টি মৌল উপাদানের প্রয়োজন। প্রথমত লোকের অভিবাসন [এমিগ্রেশন] এবং নতুন দেশ দখল [অকুপেশন]। দ্বিতীয়, নতুন দেশের সরকার ব্যবস্থা বা এর মানুষকে অধস্তনে পরিণত করা অন্যকথায় "occupation and legislation : an element of fact and an element of law." এ দুটি উপাদানই কলোনাইজেশনের শর্ত পূরণ করে। মওনিয়ের ভাষায়– "emigration without government is not colonization, nor is government without emigration." [Vol.I/4]

দেশান্তরের আবার দুটি উপাদান আছে। বসতির জন্য দরকার ব্যক্তির অভিবাসন এবং পণ্যের, রফতানি বা পুঁজির অভিবাসন। শেষোক্তটি না হলে কলোনি স্থাপনের বিষয়টি পূর্ণ হবে না। উপনিবেশ স্থাপনকারিকে অবশ্যই নিজ দেশের পণ্য ও কৃতকৌশল আমদানি করতে হবে। আরো মনে রাখা দরকার বসতি স্থাপনকারিরা সবসময়ই সংখ্যালঘু।

যে সব দেশ উপনিবেশ স্থাপন করেছে তারা জানে কীভাবে উপনিবেশ স্থাপন করতে হয়। এটি নির্ভর করে সে দেশের জনসাধারণ, তাদের প্রবণতা, তাদের

উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বিশেষ করে সমাজ ও বিলাসের চাহিদা। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ফ্রান্স থেকে আমেরিকা গিয়েছিলেন ভলনি। তিনি বলতেন, ফরাসিদের থেকে ইংরেজদের উপনিবেশ স্থাপনে ক্ষমতা বেশি কারণ, তারা সমাজের ওপর কম নির্ভরশীল এ অর্থে যে তারা একা বসবাসে অভ্যস্ত এবং ফরাসীদের থেকে 'পথিকৃত" [পাইনিয়ারস] সৃষ্টিতে অগ্রণী, তবে এটিও মূল কারণ নয়। সমাজ কাঠামোর প্রশ্নও আছে। Law of primogeniture এর কারণে, জ্যেষ্ঠপুত্র ছাড়া সবাইকেই ভাগ্যান্বেষণে বাইরে যেতে হয় বা সিভিল সার্ভিসে চাকুরি নিতে হয়। পুঁজির প্রশ্নে মওনিয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, "the history of colonisation is linked with history of capitalism; colonisation is in very truth a capitalist achievement." (ঐ. পৃ. ১১) সে কারণেই "...greatest colonising nations are the greatest capitalist nation." (ঐ.পৃ. ১২)

সাম্রাজ্যবাদী দেশ যারা তাদের মানুষ ও টাকা নিয়ে ঝুঁকি নিয়েছিলো নিজ স্বার্থে তারাই স্থাপন করেছিলো কলোনি।

কলোনির আইনগত দিকটি দেখা যেতে পারে। কলোনির সঙ্গে মেট্রোপলিটনের যোগাযোগ যা এর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। কলোনি হতে হলে বসতকারির নিজ দেশের সঙ্গে একটি আইনি বন্ধন থাকতে হবে সেটিই মেট্রোপলিটন বা মাতৃভূমির অর্থ। কর্তৃত্ব এই আইনি আইডিয়াকে প্রকাশ করে। এর অর্থ দেশীয়দের ('নেটিভ') ওপর মেট্রোপলিটনের কর্তৃত্ব। উপসংহারে মওনিয়ে বলেছেন, সাম্রাজ্য মানেই এক শাসন, এক সভ্যতা যা বিস্তৃত, বিভক্ত বা সংগঠিত স্পেসের ওপর। এক আইন, এক প্রশাসন যা শাসন করে "over a domain which aspires to know no bounds." সাম্রাজ্যের বৈশিষ্ট্য হলো কেন্দ্রীভূতকরণ ও একীভূত করণ (সেনট্রালাইজেশন, ইউনিফিকিশেন) "conformity of words, of manner, and of laws, which are current along every road to the furthest, and which by domination and persusation make for assimilation." [ঐ/পৃ ১৯]

এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে সব ফর্মের ঔপনিবেশিকতাই সাম্রাজ্যবাদিতা এবং এর অর্থ নতুন দেশের লোকদের অধস্তন করা।

কর্তৃত্ব যেমন ঔপনিবেশিক শক্তির মৌল বৈশিষ্ট্য তেমনি অধস্তনতা দেশীয়দের মৌল বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। উপনিবেশ স্থাপনকারিরা যখন দেশীয়দের সংস্পর্শে আসে তখন তার দৃষ্টিভঙ্গির তিনটি পর্যায় থাকতে পারে কর্তৃত্ব, সহযোগিতা [পার্টনারশিপ] এবং মুক্তি। [১/২৯]

কর্তৃত্ব তত্ত্বই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদিতা। মওনিয়ের ভাষায়, "It is the state of mind, individual or collective, which desires to rule others." কর্তৃত্বের

আইডিয়া সহযোগিতা প্রত্যয়ের ভিত্তি নয়। এটি উদ্ভূত মানসিকতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ থেকে। বিভিন্নরকমের মানুষ যখন সমাজ গড়ে তোলে, তখন এ ধরনের সমাজের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায় বিদেশিদের "দয়া"র [কাইন্ডনেস]র সঙ্গে বিবেচনা করা। তবে নিখুঁত পার্টনারশিপের জন্য দরকার সাম্য যা বিরাজ করতে পারে দু'পক্ষ সমান হলে। এর পরই আছে ভ্রাতৃত্ববোধ।

পার্টনারশিপের দু'টি পর্যায়ের মধ্যে দু'উপাদান উল্লেখযোগ্য। একটি হলো সহযোগিতা [কোলাবরেশান] অন্যটি আত্তিকরণ [অ্যাসিমিলশান]। প্রথমটির সরল অর্থ দু'পক্ষের নিজ নিজ স্বার্থে পরস্পরের সহযোগিতা, তবে, শ্বেতাঙ্গ বা উপনিবেশ স্থাপনকারিদের কর্তৃত্ব বজায় থাকবে। অন্যপ্রান্তে আত্তিকরণ, এখানেও কর্তৃত্বের বিষয়টি স্পষ্ট, যার মূল বিষয়, 'নেটিভদের' সভ্য করে তুলবে 'শ্বেতাঙ্গ'রা। আর মুক্তি হলো এমন এক পর্যায় যেখানে বিজেতারা নিজেদের স্বাধিকার [অটোনমি] ফিরে পায়। কলোনির ইতিহাসে এটি পরস্পর বিরোধী বিষয়। কারণ শ্বেতাঙ্গ [পাশ্চাত্য] ও অশ্বেতাঙ্গের যোগাযোগের কারণেই সৃষ্টি হয় জাতীয়তাবাদের। মওনিয়ে যেমন লিখেছেন–

"The first effect of colonisation is to lift the natives from tribe to town, from town to nation; to engender among them common interests and common feelings, to awaken in them a national spirit; token and consequence of the revolution in their social status." (1/45).

মওনিয়ে একটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিদেশীরা সবসময় কৌতুহলের সৃষ্টি করে। দেশিয়রা একজন বিদেশিকে ঘৃণা করতে পারে, সন্দেহ করতে পারে কিন্তু যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তাহলো দেশিয়রা কখনও নিস্পৃহ হবে না। এ বিষয়টি উপনিবেশ স্থাপনকারি এবং উপনিবেশে বসবাসকারিরা উপেক্ষা করেছে। এরা তাদের সুপেরিয়রিটির মিথ নিয়ে বসবাস করে। আরো আদিম সমাজে বিদেশি হয় দেবতা না হয় শয়তান। অথবা দুইয়ের মিশ্রণ। লিখেছেন মওনিয়ে "These are the obscure and complex relation, sometimes disqueting, some times thrilling, which the strangers arrival rouses in his soul." (1/55)

এ সম্পর্কের একটি পর্যায় আছে সন্নিধি (জুস্কটাপজিশান), সহযোগিতা (কোলাবরেশন), ও সংমিশ্রণ (ফিউশন)। এমনটি নিয়ে যায় কর্তৃত্বের (ডমিনেশন) দিকে, সেটি পরিণত হয় পার্টনারশিপে– এ সম্পর্ক গড়ে তোলে আইনের বন্ধন বা আইনি অধস্তনতা সৃষ্টি করে নিরাপত্তা এবং সহযোগিতা করে শাসন অনুপ্রবেশে (পেনেট্রেশন)। কর্তৃত্ব মাঝে মাঝে সৃষ্টি করে সংমিশ্রণের।

প্রবেশ অনুপ্রবেশ যেভাবেই হোক না কেন তা একসময় কর্তৃত্বের সৃষ্টি করে। বাণিজ্য বিস্তারের পূর্বশর্ত স্থিতিশীলতা। এর পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টি আইনি শাসনের

(ল'ফুল রেজিম)। এক ধরণের শাসনের সৃষ্টি হলে কিছু আইনি বাধ্যবাধকতার স্বীকৃতি দিতে হয় এবং এর দ্বিতীয় পর্যায় সহযোগিতা। মওনিয়ের ভাষায়, "colonisation and the reign of law produces collaboration between conquerer and coquered.'

ধর্মের ক্ষেত্রেও, ধর্মান্তর সৃষ্টি করে এ ধরনের সহযোগিতার। যেমন, শ্বেতাঙ্গ পুরোহিতের সঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গ (কালারড) পুরোহিতের। এভাবে কর্তৃত্ব সৃষ্টি করে পার্টনারশিপের এবং পরে সংশ্রিণের।

বলা যেতে পারে উপনিবেশের অবস্থা পর্যালোচনা করতে গেলে তিনটি উপাদানকে গুরুত্ব দিতে হবে– ঔপনিবেশিক অর্থনীতি, ঔপনিবেশিক সমাজতত্ত্ব এবং ঔপনিবেশিক মানসিকতার। প্রথম দুটিকে এককথায় বলা যেতে পারে, 'actions in colonial empires.'

শেষোক্তটি, "aims at studying not deeds but thoughts, not results but motives, not practice but beliefs, not action but ideas..." (1/137).

খ.

যে কোনো পর্যটকই ভারতে এসেছেন, তিনি ভারতকে দেখেছেন 'এক্সোটিক' হিসেবে। প্রাচীন আমল থেকেই পর্যটকরা ভারতের নাম শুনেই এ দেশে এসেছেন। ভারতবর্ষে আসার পথ খুঁজে বের করেছেন। মওনিয়ে যেসব অঞ্চলের কথা উল্লেখ করেছেন তাদের থেকে ভারতবর্ষের ব্যাপারটি আলাদা। তবে, প্রথম দেখায় অপছন্দ করার লোকও কম নেই। যেমন, বাবুর, তিনি জয় করেছেন ভারতবর্ষ, পত্তন করেছেন মুঘল শাসনের কিন্তু, মুঘল শাসনকে কেউ ঔপনিবেশিক শাসন বলেননি কারণ এর মেট্রোপলিটন ছিল ভারতবর্ষেই। বাবুর লিখেছেন, হিন্দুস্তানে তেমন কোনো আকর্ষণ নেই, এর লোকরা দেখতে ভালো নয়, সামাজিকতা বোধ বা মেধার উৎকর্ষ কিছুই নেই। হিন্দুস্তানের একটি বিষয়ই ভালো যে, এটি বিরাট দেশ এবং সোনারূপায় ভরা ইত্যাদি।[১১৫] তবুও বাবুর থেকে গিয়েছিলেন এখানে।

১৬১৭ সালে থমাস রো'র পুরোহিত ভারতবর্ষের জন্তু-জানোয়ার, মশা মাছির এক ভয়ংকর বর্ণনা রেখে গেছেন। লিখেছেন, সিংহ, বাঘ, চিতা প্রভৃতিতো আছেই আবার বড় বড় শহরে আছে ক্ষুধার্ত ইঁদুর যা ঘুমন্ত মানুষকে কামড়ায়।[১১৬]

১৮২৪ সালে বিশপ হেবার ভারতবর্ষে নেমেই মানুষের আকৃতি দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। উল্লেখ করেছেন, "এ হ্যান্ডসাম রেস" বলে।[১১৭]

উনিশ শতকে বোম্বে বন্দর দেখে শিল্পী এডোয়ার্ড লিয়ার মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। বন্দর থেকে নেমে ব্রিচ কান্ডি যাওয়ার পথে ফুল, গাছ যা দেখেছেন তা দেখেই মুগ্ধ হয়ে লিখেছেন, "colours and costumes and myriadism of

impossible picturesqueness."[১১৮]

১৯১২ সালে ভারতবর্ষ ভ্রমণের সময় ই.এম.ফরাস্টার লিখেছিলেন, "the moonlit country was beautiful."[১১৯]

ইংরেজরা এসেছে, এ দেশের পুরনো শাসনব্যবস্থা গুটিয়ে নিজেদের শাসনব্যবস্থা চালু করেছে, অনেকে থেকে গেছে, অনেকে দীর্ঘদিন কাটিয়ে চলে গেছে। এবং পণ্য রফতানি বা পুঁজির অভিবাসন ঘটেছে। শেষোক্তটির পরিমাণ কম হলেও, নিজের দেশের পণ্য ও কৃৎ কৌশল আমদানি করেছে। ভারতবর্ষ/বাংলার লোকসংখ্যার তুলনায় ইংরেজ/ইউরোপিয় অভিবাসীদের সংখ্যা তেমন কিছুই ছিল না। এমনও দেখা গেছে, ঊনিশ শতকের গোড়ার দিকে ময়মনসিংহে ইংরেজদের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে হয়ত ১০ জনও ছিল না।

উপনিবেশ স্থাপনে ব্রিটিশদের যে দক্ষতার কথা মওনিয়ে লিখেছেন তা মিথ্যা নয়। সেই দ্বীপপুঞ্জ থেকে অ্যাডভেঞ্চাররা, ব্যবসায়ী সবাই বেরিয়ে পড়েছে। ব্যবসা বা জয়ের মাধ্যমে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। এবং তার বিস্তৃতি এতো বিশাল ছিলো যে বলা হতো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না। সিভিল সার্ভিস মারফত যারা এসেছিলেন, আগেই দেখিয়েছি তাদের একটা বড় অংশ ভাগ্যান্বষণেই এসেছিলেন। ক্রমে ব্যবসা বেড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে শাসনের অধিকার কব্জা করা হয়েছে। পুঁজি ও কৃৎকৌশল আমদানি করা হয়েছে। টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে প্রবর্তন প্রভৃতি এর উদাহরণ। এল.এইচ. জেঙ্কিস লিখেছেন, "১৮৫৭ থেকে ১৮৬৫ সালের মধ্যে ব্রিটিশ পুঁজির প্রধান গতি ভারত অভিমুখী ছিল.. ১৮৭০ সালের মধ্যে রেলপথে গিয়েছিলো প্রায় ৭ কোটি ৫০ লক্ষ পাউন্ড। এর আগে ব্রিটিশদের হাতে যে স্টক ছিল তাছাড়াও অন্তত ৫ কোটি ৫০ লক্ষ পাউন্ড ভারতীয় ঋণ তাদের হাতে এসেছিল। চা বাগান, চটকল, ব্যাংক (শেয়ার ও আমানত উভয় মিলে) ও জাহাজে চলাচল এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে ব্যক্তিগত মালিকানার ২ কোটি পাউন্ড নিয়োজিত ছিল।"[১২০]

সব্যসাচী ভট্টাচার্য আরো হিসেব করে দেখিয়েছেন, "১৮৬৫ সালের মধ্যে বিদেশে ঋণপত্রের মারফৎ নতুন ব্রিটিশ বিনিয়োগের খাত ওয়ারি বিভাগ করলে দেখা যায় যানবাহন, রাস্তাঘাট, বাণিজ্য পোত নির্মাণ ও পূর্তকর্মে একটা মোটা ভাগ গিয়েছে; এই সবখাতে নিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ মোট পুঁজির ৬৯ শতাংশ (এর মধ্যে রেলপথের জন্য ৪১ শতাংশ); কাঁচামাল সংক্রান্ত শিল্পে (কৃষি সংক্রান্ত ও খনি সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ) ১২ শতাংশ এবং শিল্পজাত দ্রব্য নির্মাণে ৪ শতাংশেরও কম। simon এই থেকে সিদ্ধান্ত টেনেছেন, "অতএব প্রাথমিক উৎপাদনকারী জাতিগুলির বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত ইউরোপে রপ্তানি করার জন্য যে সব সুযোগ সুবিধা দরকার সেইগুলির উন্নয়নের উপরই জোর দেওয়া হয়েছিলো।[১২১]

এক্ষেত্রে দেশীয় সহযোগিতা তারা পেয়েছিলো এবং আত্তীকরণের ব্যাপারটি এভাবেই হয়েছিলো। এই সব প্রযুক্তি ও অর্থনীতি সাম্রাজ্যকে কেন্দ্রীভূত ও একীভূত করতে সহায়তা করেছিলো।

ইংরেজরা ঝুঁকি নিয়ে চীন এবং ভারতবর্ষে গিয়েছিলো। চীনে তারা চীনা প্রথা মেনে বারবার চেষ্টা করেছে প্রবেশের এবং ব্যর্থ হয়ে তারপর শক্তি প্রয়োগ করেছে। নতুন প্রযুক্তির কাছে চীনারা হার মেনেছে। ভারতবর্ষে আগমনে তাদের তেমন বাধার সৃষ্টি হয়নি। স্বল্প কয়েকজন অ্যাডভেঞ্চারার ব্যবসার খোঁজে এসেছে; প্রচুর প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও নিজেদের স্থান করে নিয়েছে এবং নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে দেশীয়দের হারিয়ে দখল স্বত্ব কায়েম করেছে। আমার নিজেরও মাঝে মাঝে অবাক লেগেছে এ ভেবে যে, কতদূর থেকে একা একা এসে তারা বসবাস করে গেছে এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে মওনিয়ের মন্তব্যই সত্য মনে হয়েছে। ইংরেজরা ভারতবর্ষে এসে কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছে। এমনই কেন্দ্রীভূত ছিল তা যে, যে কোনো প্রস্তাব কেন্দ্রে পৌঁছতে হতো (লর্ড কার্জনের উক্তি)। সাম্রাজ্য একীভূত সে অর্থে না হলেও হয়েছিলো, বিশেষ করে প্রযুক্তিগত উন্নতি তাতে সাহায্য করেছিলো। এবং বিশাল সংখ্যক মানুষ স্বল্প সংখ্যক মানুষের অধস্তন হয়ে পড়েছিলো। এই অধস্তনতা বহাল রাখার জন্য বিভিন্ন ফর্মের অবতারণা করা হয়েছে, যেমন, পোষাক, জাঁকালো অনুষ্ঠান, শিক্ষা, রীতিনীতি যাইহোক না কেন। জন মরিস লিখেছিলেন, এইসব পরে অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, এডোয়ার্ডীয় যুগে যা ছিল প্রগতি এখনও তা রয়ে গেছে। কেন্দ্রে, ফেডারেল সরকার এক সময় যা ছিল সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতা, এখনও তেমনি ভাবে বিদ্যমান প্রতিক্রিয়ার হাতিয়ার হিসেবে যা বিদ্যমান ব্যবস্থা রাখতে বদ্ধপরিকর–

"If there has not been a revolution in India, sweeping away to fresh start, it is because the ghosts of the British are lingering still around the half of the Indian Government."[১২২]

ইংরেজরা যখন এদেশে এসেছে, তখন প্রথমে কৌতুহল, কখনও বা সন্দেহের চোখে দেখা হয়েছে কিন্তু আতিথেয়তা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়নি। ইউরোপিয়দের লেখা বিভিন্ন গ্রন্থে এই উদাহরণ আছে। এরপর বাণিজ্যের কারণে পরস্পর সহযোগিতা করেছে এবং ইংরেজ আইনের মাধ্যমে আত্তীকরণ সম্পন্ন হয়েছে। আইনের বিষয়টি এমন হয়ে দাঁড়িয়েছিলো যে, ইংরেজ আইনই নিয়ন্ত্রণ করতো মানব জীবন এবং 'আইনের শাসন' একটি মিথ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইংরেজ শাসন ও আইনের শাসন (অর্থাৎ সুশৃংখল ও ন্যায্য শাসন) সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আইন এবং শিক্ষা [দুটিই ঔপনিবেশিক শাসক কর্তৃক প্রবর্তিত] দু'টিই উনিশ

শতকে বাঙালি ব্রিটিশ শাসক শ্রেণীর সংস্কৃতির প্রধান উপাদান হয়ে উঠেছিলো। সেই সঙ্গে হয়ে উঠেছিলো পরস্পর নির্ভরশীল। ইংরেজি শিক্ষা সামাজিক মর্যাদা ও গতিশীলতা সবকিছুর প্রধান উপাদান হয়ে উঠেছিলো। আবার এই শিক্ষা তৈরি করেছিলো বুদ্ধিজীবী এবং প্রধানত: অধস্তন আমলা যারা চালাতেন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রযন্ত্র। এই রাষ্ট্রযন্ত্রের সংজ্ঞা নির্ণীত হয়েছিলো আইন শাস্ত্রের সাহায্যে, নিয়ন্ত্রিত হয়েছিলো বিচার বিভাগের মাধ্যমে, এই আইন সংরক্ষিত হয়েছিলো শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে, আবার এর যৌক্তিক ভিত্তি দেওয়া হয়েছিলো আইনের সাহায্যে।[১২৩] শিক্ষিত ও পেশাজীবীদের সবকিছু বিচারের মাপকাঠি ছিল আইন এবং তারা সমাজকে দেখতেন নিজেদের দর্পণে বা বিচার করতেন এর ভিত্তিতে। উদাহরণস্বরূপ মীর মশাররফ হোসেনের *জমিদার দর্পণ* উপন্যাসটির উল্লেখ করতে পারি। উপন্যাসে দেখা যায়, জমিদার হায়ওয়ান ইচ্ছে করলেই রায়তের স্ত্রী নূরন্নেহারকে তুলে আনতে পারে কিন্তু সে ইতস্তত করছে কারণ, "এখন ইংরেজি আইন বিষ দাঁত ভাঙা।" আর আইনের বেড়াজাল যে কতো বিস্তার করেছে তা শোনা যায় এই উক্তিতে, "কোলের বউ পর্যন্ত আইন আদালতের খবর রাখে। হাইকোর্টের চাপরাসীরাও ইকুইটি আর কমনল'র মারপ্যাচ বোঝে।"[১২৪] একই লেখকের *উদাসীন পথিকের মনের কথায়* প্রজা বলে, "নিজেরা অশক্ত হইলে রাজদ্বার খোলা আছে। তখন রাজার আশ্রয় লইব। দেশের হাকিমের নিকট জানাইব– রক্ষা কর বলিয়া গলবস্ত্রে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইব।"[১২৫]

এখন দেখা যাক, আগত ও দেশীয়দের মধ্যে কীভাবে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। প্রাথমিক সম্পর্ক প্রধানত অপ্রত্যক্ষ। এ সম্পর্ক গড়ে তোলে মধ্যবর্তী এজেন্টরা। চীনে এ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলো কম্প্রাডররা, বাংলায় তেমনি বেনিয়া বা বানিয়া, সরকাররা। এ পরিপ্রেক্ষিতে কোলাবরেশান প্রত্যয়টি বিচার করলে দেখা যাবে, ভারতবর্ষে দু'পক্ষই দু'পক্ষকে সহযোগিতা করেছে নিজ স্বার্থে এবং বিনা দ্বিধায় মেনে নিয়েছে শ্বেতাঙ্গ কর্তৃত্ব। রামমোহন রায় থেকে কংগ্রেসের উদ্ভব হয়েছে কোলাবরেশনের মাধ্যমে। রামমোহন রায় উপনিবেশ স্থাপনের ভালো দিকগুলি বিবেচনা করেছেন, কিছু মন্দ দিকও এবং উপসংহারে পৌঁছেছেন, "সুতরাং, গভীরভাবে বিবেচনা করে আমি অশঙ্কিত চিত্তে সুপারিশ করি যে, চরিত্রবান ও মূলধনসম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তিদের এখন ভারতে বসবাস করবার অনুমতি ও উৎসাহ দেওয়া হোক।"[১২৬]

একজন জমিদার লিখেছিলেন, "আমার এ কথা বলা নিশ্চয় যুক্তিসঙ্গত যে এদেশের লোকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করছেন যে তার বিরোধী, অথবা যে ইউরোপিয়দের এ দেশে অবাধ ব্যবহারে বিরুদ্ধাচরণ করে– এই বসবাস অবিশ্যি বিচার পদ্ধতির কতকগুলি পরিবর্তন সাপেক্ষ– সে লোক এদেশের লোকদের এবং

ভবিষ্যত বংশধরদের শত্রু।"[১২৭]

দ্বারকানাথ ঠাকুরও ছিলেন পক্ষে, কিন্তু কালক্রমে, এত সহযোগিতা ও কর্তৃত্ব সত্ত্বেও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন স্তরে। বিভিন্ন ভাবে বিকশিত হয়েছে জাতীয়তাবাদী চেতনা, ১৮৫৭, বিশেষ করে বাংলায় বিভিন্ন কৃষক বিদ্রোহ, সমস্ত জাতীয়তাবাদী বিপ্লব, এই বোধকে তীব্র করে তুলে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পথে ভারতকে নিয়ে যায়।

সংমিশ্রণের প্রত্যয়ের আলোকে বলা যেতে পারে, অষ্টাদশ উনিশ শতকে অনেক ইংরেজ/ইউরোপিয়কে দেখবো তারা পত্নী/উপপত্নী গ্রহণ করেছে। অনেক সময় এদের সংমিশ্রণে তৈরি হয়েছে নতুন গোষ্ঠি যেমন অ্যাংলো যাদের নেতিবাচক ভাবে আমরা ফিরিঙ্গি বলি (ফিরিঙ্গি ইউরোপিয় অর্থেও ব্যবহৃত হয়) তবে, এর একটি বিশেষত্ব আছে যা মওনিয়ে উল্লেখ করেছেন। শ্বেতাঙ্গরা দেশীয় বা অন্যবর্ণের মহিলাদের গ্রহণ করে কিন্তু কোনো কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গ মহিলাকে নির্বিবাদে গ্রহণ করতে পেরেছে (উনিশ শতক পর্যন্ত) এমন নজির খুব কম।

মওনিয়ে ল'ফুল রেজিমের বা আইনানুগ শাসনের কথা বলেছেন, কিন্তু, বলা যেতে পারে সেটি উপনিবেশ স্থাপনকারীদের চোখে যা পরবর্তীকালে দেশীয়দের বাধ্য করা হয় মেনে নিতে।

কলোনির বাসিন্দারা তাদের প্রভুদের অনুসরণ করে। মওনিয়ে বলেছেন, এটি দু'ভাবে হতে পারে– স্বতস্ফূর্ত (spontaneous) ও প্ররোচনা (induced)। ইংরেজদের ক্ষেত্রে ধরে নিতে পারি তারা প্ররোচিত করেছিলো। এক্ষেত্রে মেকলের সেই ক্লাসিক উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে যে, ভারতীয়দের এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে যে, তাদের সবকিছুই অনুসৃত হবে ইংরেজদের রীতিনীতি দ্বারা। ভাবনার জগতেও তারা আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন প্রবলভাবে।

খুব প্রাসঙ্গিক না হলেও এ ক্ষেত্রে একটি ঘটনার উল্লেখ করতে পারি। মওনিয়ে তাঁর বক্তৃতায় 'অক্সফোর্ড সাইকেল' বলে একটি বিষয়ের উল্লেখ করেছিলেন। এর অর্থ কী জানতে চাইলে তিনি বলেন, ইংরেজরা ভারত থেকে উচ্চ পর্যায়ের পরিবারের সন্তানদের বাছাই করে অক্সফোর্ডে নিয়ে আসতো। সেখানকার শিক্ষাদীক্ষা তাদের রপ্ত করতে হতো। এটি ছিল 'বুদ্ধিবৃত্তিক সংমিশ্রণে'র (Intellectual asimilation) পরিকল্পনা। মওনিয়ের অনুবাদক লরিমার এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, ইন্ডিয়া অফিস ও অক্সফোর্ডের উপাচার্য তাঁকে জানিয়েছেন, এ ধরনের কোনো কিছু ছিল না। লরিমারের ভাষায়, "these authoritative answers dispose of the professors myth, we can only surmise that he has been the victim of some mischievous german or Indian- Congress anti-British propoganda." (1/74-75).

লক্ষ্যণীয় সাম্রাজ্যবাদিতা বিষয়ে বইয়ের অনুবাদ করলেও লরিমার বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য শুনতে নারাজ। আসলে মওনিয়ের বক্তব্য অনেকাংশে নির্ভুল। আইসিএসদের অক্সফোর্ড/কেমব্রিজে ঠিকই পাঠানো হতো 'শিক্ষিত' হয়ে ওঠার জন্য। তবে, মওনিয়ে যে বলেছেন, শুধু পার্সি পরিবারের সন্তানদের পাঠানো হতো সেটি সঠিক ছিল না।

॥ ৯ ॥

দেশিয়দের অধস্তনতা বহাল রাখার জন্য বিভিন্ন ফর্মের অবতারণা করা হয়েছিলো যেমন, অনুষ্ঠান, পোষাক, ব্যবহার ইত্যাদি। বিশেষ করে সিভিলিয়ানদের মারফত এ গুলি ছড়িয়েছে। প্রধানত তার কিছু নিয়ে এখানে আলোচনা করবো।

ফরাসী আবে দুব্যে ১৮২০ সালে ফ্রান্সে গিয়ে ভারতের ওপর একটি বই লিখেছিলেন। বইটি সে সময়ে সুধীজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। তিনি লিখেছিলেন, ভারতে ইউরোপিয় শক্তির ভিত্তি পেশি বা নৈতিক জোর নয়। এটি বিশাল জটিল এক যন্ত্রের অংশ যা স্প্রিংয়ের সাহায্য চালিত যেগুলি বিভিন্ন সময় লাগানো হয়েছে। ব্রাহ্মণ শাসনের সময় ভারতীয়রা তাদের সরকারকে ঘৃণা করতো কিন্তু তাদের শাসকদের শ্রদ্ধা করতো ও ভালোবাসতো; ইউরোপিয় শাসনে তারা শাসকদের অন্তরের অন্তস্থল থেকে ঘৃণা করে কিন্তু সরকারকে শ্রদ্ধা করে ও ভালোবাসে।"[১২৮]

তিনি ভারতে ইংরেজ আমলাতন্ত্রকেই বুঝিয়েছিলেন যা তখনও পুরোপুরিভাবে বিকশিত হয়নি। শাসনশোষণ সবই করেছে ইংরেজরা কিন্তু আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যে খানিকটা শান্তি নিরাপত্তা দিতে পেরেছিলো, জীবনের অনিশ্চয়তা খানিকটা দূর করতে পেরেছিলো তা একেবারে অস্বীকার করার উপায় নেই। এ পরিপ্রেক্ষিতে তারা এ ধারণার সৃষ্টি করতে পেরেছিলো যে ইংরেজরা ন্যায় ভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। সিভিলিয়ানরা এটি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতেন। আর ভারতীয় মধ্যবিত্তরা তাদের রচনায়, বক্তৃতায়ও এ ধারণার পক্ষেই লিখেছেন।

বাকল্যান্ড লিখেছেন, উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই ভারতে বেসরকারি লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি ভারতে ইংরেজ সমাজ গঠিত হয়েছিলো প্রধানত সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের দ্বারা। কলকাতায়, জজ, ব্যারিস্টার ও অন্যান্য আইন পেশার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা আলাদা একটি জগৎ গড়ে তুলেছিলেন। তারপর আসেন ব্যবসায়ীরা। অনেক প্রান্তিক অঞ্চল আছে যেখানে সরকারি কর্মচারির দেখা পাওয়া যাবে না বটে কিন্তু বেসরকারি কর্মচারি

দেখা যাবে যারা কোনো ভূম্যধিকারির কাজে নিযুক্ত আমলা বা নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত। বাকল্যান্ড 'কলোনি'র ব্যাপ্তি বোঝাতে চেয়েছেন। "In such a community the governor-general and the members of his council were pre-eminently the makers and rulers of society..."[১২৯]

সিভিল সার্ভিসে যারা আসতেন তাদের নিয়োগ পদ্ধতি আলোচনা করেছি। 'আইসিএস' পরীক্ষা প্রবর্তনের পর নিয়োগ পদ্ধতিতে একটি শৃঙ্খলা ফিরে আসে। এবং এ পরীক্ষা সম্পর্কে এবং এর নিয়মকানুন সব মিলে এমন একটি ধারণার সৃষ্টি করা হয় যে, যারা আইসিএস হবেন তারা আলাদা। তাদের প্রশিক্ষণ, আচার ব্যবহার সবকিছুই ছিল কিছু নিয়ম নীতিতে বাধা। ফলে, আইসিএস হয়ে দাঁড়ায় কলোনির শাসকদের বিশেষ এক মাধ্যম যা সবার থেকে আলাদা এবং 'ইউনিক'। এর চরিত্র সম্পর্কে যে ধারণার সৃষ্টি হয় তা হলো, একজন আইসিএস অতীব দক্ষ, প্রজাদের কাছে সে 'পিতৃতুল্য', সে কোনো ভুল করে না, সে ন্যায়ের প্রতীক, তার রীতিনীতি ভদ্রতা সবার থেকে আলাদা। এটি করার একটি কারণ, শুধু নেটিভদের মধ্যেই নয়, শ্বেতাঙ্গ অন্যান্যদের থেকেও নিজেদের আলাদা হিসেবে দাঁড় করানো যাতে কলোনিতে এককভাবে সবার ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করা যায়। অবশ্য এর মানে এ নয় যে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বৈধ ছিল। পুরনো নয়, বিশ শতকেও শ্বেতাঙ্গ/অশ্বেতাঙ্গ আইসিএসদের বিবরণ থেকে এ সম্পর্কে কিছু উদাহরণ দেবো।

জে.সি.মুর লিখেছেন, চাকুরিতে যোগ দিয়েই স্টেশনের সব মেমসাহেবের কাছে ভিজিটিং কার্ড রেখে আসতে হতো। তিনি তারপর নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানাতেন। বিশেষ পোষাক পড়ে সে আমন্ত্রণে যেতে হতো। বড় স্টেশন যেখানে মিলিটারিদের সংখ্যাও ছিল বেশ সেখানেও 'স্নবারি' কম ছিল না। সামাজিক সম্মানের একটি বিশেষ মাপকাঠি তারা নিজেরাই তৈরি করেছিলো।

"There was a tremondous lot of formality and protocal in British Society in India."[১৩০]

উডরাফ যিনি আইসিএসদের ওপর দু'খণ্ডে বিশ্লেষণমূলক বই লিখেছেন, দ্বিতীয় খণ্ডের উপ-শিরোনাম দিয়েছেন 'দি গার্ডিয়ানস'। তাঁর সিদ্ধান্ত–

"It was rule from above by a selected aristocracy who believed they were acting disinterestedly for the general good. For their ideal of light but benevolent administration, the machinery now forged was admirably adapted. It was indeed in many ways curiously un-English it had a premeditated logical air as though worked out by a political philosopher in the study."[১৩১]

খানিকটা দীর্ঘ হলেও অশোক মিত্রের স্বাদু গদ্যের আত্মজীবনী থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি দেয়া যাক।

নিজেদের মধ্যে তা সিনিয়র জুনিয়র যাই হোক না কেন খোলামেলা আলাপ করা যেতো। "কিন্তু এঁদের মধ্যে সরকারি বা বেসরকারি বাইরের লোক কেউ থাকলে একটু বেশি ভদ্রতা করে কথা বলতে হত। কারণ তারা যে আপনার দলের লোক নয়, সেই কথাটা মনে রাখার জন্য।"

'স্টেশন'-নন স্টেশনের মধ্যে পার্থক্য সারা ভারতেই ছিল। কিন্তু কোথাও গিয়ে কোনো আইসিএস দেখা করার জন্য ভিজিটিং কার্ড পাঠালে তখনিই তাঁর ডাক পড়তো। "কয়েক বছরের মধ্যে অবশ্য এই ধরনের খাতির পেয়ে পেয়ে, আপনার মর্যাদাবোধ আপনার অজান্তে আপনার মজ্জায় ঢুকে যেতো। তার ফলে আপনার পক্ষে খুব নিচু লোকের কাছে বেশি ভদ্র ও সভ্য ব্যবহার করা সহজ হতো, কারণ নিজের উঁচুপদ সম্বন্ধে আপনার সহজাত অবস্থা জন্মগত এবং নিজেকে অবিসংবাদিতভাবে বড় জানলে ছোটর কাছে নম্র হওয়া সহজ হয়। যাকে ইংরেজিতে বলে নোবলেস ওবলীজ (noblesse oblige)।"[১৩২] সাহেব ও স্ত্রীদের 'মেম সাহেব' সম্বোধনটা বোধহয় সিভিলিয়ানদের দ্বারাই বেশি প্রচলিত হয়েছে। পরবর্তীকালে অবশ্য সাহেব বললে 'কর্তা' ই বোঝাতো। *হবসন জবসনে* দেখছি ১৮৬৯ সালেই শব্দটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।[১৩৩] যিনি 'সাহেব' তিনি কিন্তু সবার থেকে আলাদা।

অশোক মিত্রদের সমসাময়িক বা খানিকটা সিনিয়র রহমতুল্লাহের স্মৃতি কাহিনীতেও এই চিত্র পাওয়া যাবে। তিনি জানিয়েছেন, সরকারি চাকুরিতে ইউরোপিয়দের অবস্থান ছিল স্বচ্ছন্দময় বিশেষ করে আইসিএস হলে তো কথাই নেই। প্রশিক্ষণের সময় কেরানীরা কাজ শেখানোর সময় বলতেন, "As member of ICS, your honour will soon be able to do anything and everything."

ভারতের স্বাধীনতার প্রাক্কালে যখন দেশীয় আইন প্রণেতা ও মন্ত্রীদের সংখ্যা বাড়ছিলো তখন শ্বেতাঙ্গদের আইসিএস হওয়ার বাসনায় ভাটা পড়েছিলো। তখন ব্রিটেনের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আইসিএসে যোগ দেয়ার জন্য রীতিমতো প্রচার চালানো হয় যার মূলকথা ছিল–

"That the real power continued to remian with the service and not the Ministers of Asiatic domicile..."[১৩৪]

আর. কে. নারায়ণও এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন যদিও তিনি সাহিত্যিক। তিনি লিখেছিলেন তাঁর একবন্ধু ছিলেন আই.সি.এস। তিনি তাঁর বাসার মানুষজনের সঙ্গে আপ্যায়নমেন্ট ছাড়া কথা বলতেন না। আইসিএস ম্যানুয়েল ছিল তার কাছে বাইবেল। নারায়ণ বলেছেন, তারা দক্ষ, সৎ, সার্ভিসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বটে তবে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় তাদের অন্য চরিত্র প্রকাশ পায়। এই চাকরি তাদের 'dehumanized' করেছিলো। সে কারণেই বোধহয়

একজন মন্তব্য করেছিলেন, আইসিএস ভারতীয় নয়, সিভিল নয়, চাকুরিও নয়। শ্বেতাঙ্গ আইসিএসদের সম্পর্কে মন্তব্য করে লিখেছেন, "He was content to isolate himself as a ruler, keeper of law and order and collector of revenue, leaving Indians alone to their religion and ancient activities. He maintained his distance from the native all thorugh..."[১৩৫]

এতো বিশ শতকের কথা। উনিশ শতকের সিভিলিয়ানদের আত্মজীবনীতে এ ধরনের অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে। জনৈক সিভিলিয়ান লিখেছিলেন, তিনি নিজের জন্য কাজ করছেন না, কাজ করছেন প্রজাদের জন্য। আমলাতন্ত্রের লাল ফিতা সত্ত্বেও, "The personal power of civilians for good on evil is very great indeed. I can honestly say that with one or two exceptions, from the highest to the lowest, all the members of my service whom I have known have felt this deeply, and acted accordingly."[১৩৬]

তবে, সব এক ছাঁচে ঢালা ছিলেন তা নয়। শ্বেতাঙ্গ অশ্বেতাঙ্গ উভয়ের মধ্যেই অনেক সিভিলিয়ান ছিলেন যারা ভারতকে ভালোবাসতেন, এর ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা করতেন, মানুষজনের প্রতি সহানুভূতি দেখাতেন। যেমন, মার্টিয়েন, তিনি গত শতকের ত্রিশদশকে আইসিএস হয়েছিলেন যখন ভারতীয়করণ তীব্র হচ্ছে। তিনি তা জানতেন এবং তা মেনেই চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। এবং নিজেই লিখেছেন, তিনি ছিলেন, "Very pro-Bengal and anti-government of India/white all in any conflict of interest that emerged."

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ফোর্ট-উইলিয়ামে সেনাপতি গভর্নরকে সম্মান জানিয়ে কামান দাগাতে অসম্মতি জানালে মার্টিয়েন তাকে কোর্ট মার্শালের হুমকি দিয়ে কামান দাগাতে বাধ্য করেছিলেন।[১৩৭] এবং তিনি নিজেও উডরাফের মতো মনে করতেন, একেবারে সেরা মেধাবীরা আইসিএসে এসেছিলেন তাও নয়। মাইকেল ক্যারিটতো ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির হয়ে কাজ করেছিলেন এবং চাকুরি জীবনের কয়েক বছর যেতেই পদত্যাগ করেছিলেন। লিখেছেন তিনি, সাম্রাজ্যবাদী সরকার আরোপিত ব্যবস্থার বাধা সত্ত্বেও অনেক সিভিলিয়ান দারিদ্র, অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে কাজ করতে চেয়েছিলেন–

"Not very many of these, I fear, as the twentieth century proceeded and even the best men in the service were frustrated by the contradiction between dedicated paternalism and their professional faith in the blessings of imperial rule."[১৩৮]

আইসিএস হওয়া, পোষাক, রীতি নীতি, বাসস্থান প্রসঙ্গ আসতে পারে। এ সম্পর্কিত ধারাণাগুলি উনিশ শতকে পাকাপোক্ত হয়। সে সব কয়েকটি ফর্ম নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

যে মিথস্ক্রিয়ার কথা আগে উল্লেখ করেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, পূর্বসুরি মুঘলদের রীতিনীতির অনেক ফর্ম তারা গ্রহণ করেছিলো। মুঘল দরবারের জাঁকালো ভাব, জাঁকালো স্থাপত্য তারাও গ্রহণ করেছিলো। বিভিন্ন সময় দরবার অনুষ্ঠান, বা অনুষ্ঠান করে না করে বিভিন্ন উপাধি প্রদান এর উদাহরণ। বৃহৎ ইমারত বা জাঁকালো স্থাপত্যের মাধ্যমে তাদের 'রাজা' ভাবটিই তারা তুলে ধরতে চাইতো। একই কারণে, নিজেদের আধিপত্য ছড়িয়ে দেয়ার জন্য 'দরবার', দাপ্তরিক, আদালতের ভাষাও তারা বদলে দিয়েছিলো।

পোষাকের কথা ধরা যাক। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে তারা যে পোষাক পরতেন তার সঙ্গে উনিশ শতকের শেষার্ধ ও বিশ শতকের তফাৎ আছে। সিভিলিয়ান বা বিভিন্ন শিল্পীর আঁকা ছবি দেখলে বিষয়টি যত স্পষ্ট হবে, বিবরণেও তত স্পষ্ট করা যাবে না। ইংরেজদের আসার আগেও যারা শাসন করেছেন তারাও নিজেদের সংস্কৃতি ও স্বাতন্ত্র বজায় রাখার জন্য পোষাক ব্যবহার করেছেন। পরে, আবহাওয়ার সঙ্গে মানানসই পোষাক পরার চেষ্টা করেছেন, সব ক্ষেত্রে নয়। স্বদেশীয়রা পোষাকের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন না। ইংরেজরা বিশেষ করে সিভিলিয়ানরা নিজ দেশের আবহাওয়া অনুযায়ী যা পরার দরকার ছিল তাই পরতেন। এ দেশে তা অনুপযুক্ত হলেও পরতেন। স্বদেশীয়রা একই পোষাকে কয়েকদিন স্বচ্ছন্দে কাটাতে পারতেন কিন্তু সিভিলিয়ানরা/ইংরেজ সম্ভব হলে প্রতিবেলা পোষাক পাল্টাতেন।

"It was beneath contempt to wear what the local people did, so the Europeans persisted in going about in heavy clothing."[১৩৯]

এ সবই ছিল নিজেদের আলাদা করে দেখানোর প্রচেষ্টা।

"At home, in the office, in the field hunting or on stage representing the majesty and authority the British dressed in their own fashions."[১৪০]

সিভিলিয়ান ফ্রেডরিক জন শোর এর ব্যত্যয় ঘটালে তাঁকে সাবধান করে বলা হয়েছিলো–

"The wearing of Indian dress in their public function by employees of the company was officialy banned in 1830."[১৪১]

অধস্তন দেশীয় সিভিলিয়ানরাও উনিশ শতকের শেষার্ধে তা অনুকরণ করা শুরু করে। একসময় আমলাদের ফরমাল পোষাক হয়ে দাঁড়ায় স্যুট পরা। এবং এখনও সেই ট্র্যাডিশন বজায় আছে। আমাদের এখানে কেউ কোনো পদে গেলে বা সরকারি অনুষ্ঠানে গেলে স্যুট পরা, নিদেনপক্ষে টাই পড়ে যাওয়া যেন বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটিও সেই স্বাতন্ত্র্য বজায় বা পদমর্যাদা প্রকাশের

চিত্র। এমনও দেখা গেছে, চৈত্রের গরমে মন্ত্রি/আমলা, ধানক্ষেতের আল দিয়ে হাঁটছেন [পরিদর্শন] কিন্তু গলায় টাই। জিয়াউর রহমানের সময়, পাজামা পাঞ্জাবি পরার কারণে আমলারা কামাল লোহানীকে প্লেনে উঠতে দেয়নি [রাষ্ট্রীয় সফরের জন্য]।

সুতরাং, সিভিলিয়ানরা নিজেদের পোষাকের স্ট্যানডার্ড নিজেরাই তৈরি করেছেন। রোদ থেকে বাঁচার জন্য বিভিন্ন রকমের টুপি পরা শুরু করেছিলেন বিশেষ করে শোলার এবং তা প্রচলন হয় ১৮৪০ সালে। দেশী সিভিলিয়ানরাও তা অনুসণ করেন এমন কি ১৮৭০ সালে বেঙ্গল অফিসিয়ালরা লে. গভর্নর স্যার অ্যাসলি ইডেনকে আবেদন জানিয়ে লিখেছিলেন তারা আর পাগড়ি পরতে চান না, পরতে চান টুপি। যা শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে যখন তখন খোলা যাবে।[১৪২]

সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে সিভিলিয়ান বা ইউরোপিয়দের সব পোষাকই ছিল ভিন্নতর। প্যান্ট, সার্ট, ব্রিচেস, টুপি, টাই, পরবর্তীকালে হাফপ্যান্ট-এসব কিছুই প্রাথমিকভাবে বিস্ময়ের সৃষ্টি করতো এবং দেশিয়দের থেকে তাদের আলাদা করতো। এর সঙ্গে যুক্ত হতো পাইক পেয়াদা। অন্য আরেকটি বিষয়ের অবতারণা করা যেতে পারে। অধস্তন দেশিয় বা খানসামা, দারোয়ান, পাইক-পেয়াদা, [পিয়ন]- এদের পোষাক [ইউনিফর্ম] তৈরি করা হয় মুঘল সময়ের সমাজ বা অভিজাতদের পোষাকের অনুকরণে। ইঙ্গিতটা ছিল মুঘল [মুসলমান] যুগ শেষ, তারা এখন ইংরেজদের অধিন। ইংরেজরা কর্তা। আশ্চর্য যে, এখনও বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে [যেমন হাইকোর্ট] এই ইউনিফর্ম বজায় আছে।

আরো দু'টি বিষয় ঔপনিবেশিক প্রভুদের স্বাতন্ত্র ও শক্তির প্রতীক ছিল– একটি ঘোড়া, অন্যটি বন্দুক। ঘোড়া দেশিয়রাও ব্যবহার করতে পারতো কিন্তু গরিব অঞ্চলে করতো না হয়ত জমিদাররা ছাড়া। ঘোড়া পোষার খরচও ছিল। ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে দাপটে সিভিলিয়ান দাবড়ে বেড়াতেন। সে কারণেই বোধহয় ঘোড়ায় চড়তে জানা পরীক্ষার একটি বিষয় ছিল এবং তাতে অবশ্যই পাস করতে হতো। আর ছিল বন্দুক যা তিনি সবসময় শিকারের জন্য ব্যবহার করতেন। বন্দুক সবাই রাখতে পারতো না, এগুলি ছিল শুধু তার স্বাতন্ত্র্য নয়, তার শক্তিরও প্রতীক।

বিশশতকে প্রকাশ্যে বন্দুক বা ঘোড়া নিয়ে ঘোরাফেরা কমে গিয়েছিলো, বড় শহরেতো নয়ই, কিন্তু পোষাকের বিষয়টি তখনও সিভিলিয়ান আঁকড়ে রাখতেন। টাইসন লিখেছেন (বিশ শতকের ত্রিশ দশকে) ডিনারে সবসময় সাদা ডিনারস্যুট পরে যেতেন কারণ– "ways of keeping up ones self respect in the Mofusil."

পোষাক শুধু স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যই নয়, উনিশ শতকে সিভিলিয়ানদের এই ধারণাও ছিল, এই পোষাক ভারতীয় আবহাওয়া যা তাদের জন্য ক্ষতিকর তা থেকে

তাদের রক্ষা করবে। পোষাকের অভ্যন্তরে রোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নানা রকম ব্যবস্থাও ছিল যেমন, কলেরা বেল্ট, স্পাইন প্যাড প্রভৃতি।[১৪৩]

পুরনো আমল থেকেই ভারতীয় আবহাওয়া সিভিলিয়ানদের পছন্দ হয়নি। প্রথমদিকে তাদের অতিমৃত্যুও এর কারণ। ছেলে-মেয়েদের এমনকী স্ত্রীদেরও তারা এখানে রাখতে চাইতেন না। যে কারণে, অধিকাংশ সিভিলিয়ানের স্মৃতিকথায় তাদের পরিবার-পরিজনরা অনুপস্থিত। স্ত্রী-সন্তান থাকলে, সন্তানদের মানুষ করতেন ভারতীয় ভৃত্যরা যার কিছু বিবরণ আগে দিয়েছি। সন্তানদের খানিকটা বয়স হলে তাদের পাঠিয়ে দেয়া হতো ব্রিটেনে, আত্মীয় স্বজনের কাছে বা বোর্ডিং স্কুলে। কারণ, তখন পর্যন্ত প্রাধান্য বিস্তারকারি ধারণা ছিল, ভারতবর্ষের আবহাওয়া শিশুদের উপযুক্ত নয়। তাদের তা দুর্বল করে দেবে। পরবর্তীকালে গুরুত্ব দেয়া হয় স্বাস্থ্য রক্ষা ও পরিচর্যার ওপর। এ ধরনের ধ্যান ধারণার কিছু পরিবর্তন হয় যা অন্য প্রসঙ্গ।[১৪৪] এভাবে, তাদের জীবন যাত্রার একটি প্যাটার্ন তৈরি হয়েছিলো যা অন্যান্য গোষ্ঠী থেকে তাদের স্বতন্ত্র করে রেখেছিলো। এর সঙ্গে জাতি-বৈরও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয় যা আগে আলোচনা করেছি। পরেও করা যাবে।

সিভিলিয়ানদের অবস্থানস্থল ছিল স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। 'স্টেশন' সিভিল স্টেশন বা সিভিল লাইনসের কথা আগে উল্লেখ করেছি। যেখানে একাধিক ইংরেজ কর্মচারিকে থাকতো হতো সেখানেই তাদের জন্য গড়ে তোলা হতো 'স্টেশন'। মূল বা পুরনো ঘিঞ্জি শহর থেকে তা আলাদাভাবে গড়ে তোলা হতো। এখানে থাকতো শোভিত চওড়া রাস্তা, মল, বিরাট প্রাঙ্গণে বড়সড় বাড়ি, একটি ক্লাব, কিছু দোকান [যদি এলাকাটি উন্নত হতো], ময়দান, বড় শহরে হয়ত অনেক সময় তা সম্ভব হতো না কিন্তু মফস্বলে এই প্যাটার্নটি অবধারিতভাবে ছিল বিশেষ করে উনিশ শতকে তা একটি নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে। ঐ শহরে ক্যান্টনমেন্ট থাকলে, সিভিলস্টেশন বা লাইনস থাকতো 'নেটিভশহরে' ও ক্যান্টনমেন্টের মাঝে। ১৮৬০ সালে ডব্লিউ. এইচ. রাসেল নামে এক সিভিলিয়ান লিখেছিলেন, নেটিভরা ঘিঞ্জি মতো জায়গায় হাজার হাজারে বাস করে আর কয়েকজন ইউরোপিয় এর চারগুণ জায়গা নিয়ে বসবাস করে।[১৪৫] বিশ শতকের গোড়ার দিকে, ঢাকায় নতুন গড়ে তোলা রমনা সিভিল লাইনস এর উদাহরণ।

একই সঙ্গে সেনানিবাস বা ক্যান্টনমেন্টেরও উদ্ভব হয়। সেই বিশেষ এলাকা ধারণা থেকেই এর বিকাশ। বিশেষ একটি এলাকা, সেখানে ইউরোপিয় সেনাদের জন্য থাকবে ব্যারাক। নেটিভদের জন্য, "Native huts termed lines for the sepoys." (কিং.পৃ.৪০), অফিসারদের জন্য বাংলো। ক্যান্টনমেন্ট শব্দটি সম্পূর্ণভাবে এদেরই সৃষ্টি এবং ভারত ছাড়া আর কোথাও এই শব্দটি ব্যবহৃত হয় না।[১৪৬]

সিভিলিয়ানদের বাসগৃহের জন্য আলাদা একটি শব্দ ছিল বাংলো। বাংলা শব্দ থেকে এর উৎপত্তি। বাংলার চালাঘরের স্থাপিত্যক বৈশিষ্ট্যকে নিয়ে ঔপনিবেশিকরা এর সঙ্গে নিজেদের বৈশিষ্ট্য যুক্ত করেছেন। ভারত/বাংলার আবহাওয়া ইউরোপিয়দের জন্য প্রতিকূল। তাদের ব্যক্তিগত স্পেস বা প্রাইভেসি দরকার যা বাংলা/ভারতের সংস্কৃতিতে অনুপস্থিত। সিভিলিয়ানের সঙ্গে অন্য সিভিলিয়ান বা 'নেটিভ'রা দেখা করতে আসবে। ঘরের প্রাইভেসি রেখে তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তার ভৃত্য থাকবে। ১৯০৫ সালের 'দি ইন্ডিয়ান হাউসকিপার ও কুক' গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে একজন সিভিলিয়ানের বাসগৃহের জন্য কমপক্ষে ১৮ জন ভৃত্যের প্রয়োজন। সুতরাং, এ সমস্ত আলাদা একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। উনিশ শতকেই *হবসন জবসনে* বাংলোর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছিলো এভাবে–

"The most usual class of house occupied by Europeans in the interior of India; being one storey and covered by a pyramid roof, which in the normal bungalow is by a thatch, but maybe of tiles without of impairing its title to be called a bungalow."[১৪৭]

সুতরাং, বাংলোতে যারা থাকছে তারা আলাদা। বিরাট স্পেসে তাদের বাংলো। আলো বাতাস চলাচল ও তাপরোধক ব্যবস্থা মেনে তা নির্মিত। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য শুধু চালা নয়। চারদিকে ঘোরানো ঘেরা বারান্দাও। যেখানে সিভিলিয়ান নেটিভদের সঙ্গে দেখা করতে পারবে, ঘরের প্রাইভেসি রেখে আবার নির্জনে সেখানে বসে সে নিসর্গ উপভোগ করতে পারবে বা চিন্তামগ্ন থাকতে পারবে। বাংলোর দরজা থেকে জমিতে নামার সময় কয়েকটি সিঁড়ি থাকবে। এই সিড়ি তাৎপর্যময়। পদমর্যাদা অনুসারে সিভিলিয়ান কাকে কয় সিঁড়ি ভেঙ্গে অভ্যর্থনা ও বিদায় জানাবে সেটি সে কারণেই সৃষ্টি। মূল বাড়ি থেকে ঢোকার ফটকে দূরত্ব থাকবে। ঐ দূরত্বটিই নেটিভকে মনে করিয়ে দেবে রাজার কাছে এমনিতেই পৌঁছানো যায় না। বাংলোর অভ্যন্তরে ঘরগুলি প্রশস্ত। পেছনে অতিদূরে রান্নাঘর ও ভৃত্যের জায়গা। চারদিকে শাকসবজি ফলফুলের গাছ। যদি বাংলো না হয়ে সিভিলিয়ানের পাকা বাড়িও হয় তাহলেও মূল প্রত্যয়টি একই। উনিশ শতকে মফস্বলে নির্মিত এসডিও, এসপি, সিভিল সার্জন, জজের বাসা এবং ঢাকায় বিশ শতকের গোড়ায় নীলক্ষেত ও মিন্টো রোডে পদস্থ কর্মচারিদের বাড়িগুলি এর উজ্জ্বল উদাহরণ। বিশশতকে সিভিলিয়ান আর্থার ড্যাশ হিলেন ঢাকায়। তাঁর বর্ণনায় আমি যে বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছি এবং সিভিলিয়ানদের হায়ারার্কিও কীভাবে প্রকাশিত হতো স্থাপত্য ও নগর পরিকল্পনায় তা বোঝা যাবে।

তিনি লিখেছেন, "রমনা ছিল পরিকল্পনাবিদদের ইচ্ছাপূরণের জায়গা। এক

হাজার একরের এই মাঠটিকে [সোহরাওয়ারী উদ্যান] একোয়ার করা হয়েছিলো যার মধ্যে অন্তর্গত ছিল একটি রেসকোর্স ও একটি ক্লাব, আরো ছিল, একটি পোলো গ্রাউন্ড, ক্রিকেট মাঠ এবং বারো হোলের গলফকোর্স, দু'টি হিন্দু মন্দিরও অন্তর্গত এই মাঠে। রেসকোর্সটি ঘিরে একটি রাস্তা। রাস্তা ঘিরে পূর্ববঙ্গও আসাম প্রদেশের রাজকর্মচারিদের জন্য বাসস্থান। যার পদ যত উঁচু তাকে তত ভালো জায়গায় বাড়ি দেওয়া হয়েছে। যেমন, লে. গভর্নর, হাইকোর্টের বিচারক, কাউন্সিলের সদস্যদের বাড়ি এমন জায়গায় যেখান থেকে অবশ্যই রেসকোর্সের উইনিং পোস্ট দেখা যাবে এবং বিনা আয়াসে পৌঁছা যাবে গলফকোর্সে। সরকারের সচিব ও বিভাগীয় কর্মকর্তাদের বাড়ি একটু দূরে। ক্লাবে [ঢাকা ক্লাব] বা গ্রান্ডস্ট্যান্ডে যেতে হলে তাদের গাড়ি ব্যবহার করতে হবে। এক প্রান্তে স্থানীয় কর্মকর্তা, কমিশনার, কালেকটর যেমন জজ, উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারিদের বাসা। নওয়াবপুরে অফিসে যাওয়াটা যেমন তাদের জন্য ঝামেলার ও দূরের, ক্লাবে বা গ্র্যান্ডস্টান্ডে যাওয়ার ব্যাপারটাও তাই।"[১৪৮]

কিং লিখেছেন, কলোনিয়াল বাংলো বা আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, 'কলোনিয়ান বাংলো কমপ্লেক্স' ঔপনিবেশিক নগর বসতির মৌল আবাসিক ইউনিট। ভারতে বিকশিত কিন্তু উনিশ শতকের শেষার্ধে এই 'কনসেপ্ট' ছড়িয়ে পরে দূর প্রাচ্য ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে। ইউরোপিয়রা যেসব দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলো, সেখানে ঔপনিবেশিক ইউরোপিয় সম্প্রদায়ের বাসস্থানের 'nodal form' ছিল তা। তিনি আরো লিখেছেন–

"The significance of the colonial bungalow compound complex lies in the fact that the terms, like the reality, represent a physical spatial strcuture which embodies an entire life-style and system of social behaviour unique to the colonial third culture. The continuation of the bungalow-compound complex as one of the major organising units of urban form in the modern city. seen against the perious urban tradition of the mohulla, reperesent one of the most striking aspects of 'Westernisation.' in the Indian urban system."[১৪৯]

এ কথাও বলা যায় যে, সিভিলিয়ানরা যখন চাকুরি নিয়ে এসেছেন এ দেশে তখন নিজ দেশে নিসর্গের কথা, বিত্তবান/উচ্চ মধ্যবিত্তের 'ডিটাচড' হাউসের কথাও তার মনে ছিল। এ নস্টালজিয়াও খানিকটা কাজ করেছে এ ধরনের গঠন রীতি নির্মাণে। শুধু সিভিলিয়ানরাই নয় নীলকর, চা কররাও এ ধরনের বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। আরো ছোট আকারে ভ্রমণের সময় সিভিলিয়ানদের নিশি যাপনের জন্য নির্মিত হয়েছিলো 'পরিদর্শন বাংলো,' 'ডাক বাংলো' প্রভৃতি।

স্টেশনের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ক্লাব যেখানে সিভিলিয়ানরা ও তাদের স্ত্রীরা

সময় কাটাবেন। ছিল অবধারিত টেনিসকোর্ট। সেখানে, সন্ধ্যায় ক্লান্ত সিভিলিয়ান এক পেগ হুইস্কির জন্য আরাম কেদারায় বসে উচ্চকণ্ঠে ডাকবেন 'কোই হ্যায়।'

স্টেশনের পর উনিশ শতকের প্রথমে উদ্ভাবিত হয় 'হিল স্টেশন' বা ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাহাড়ে শৈল নিবাস। সমতলের আবহাওয়া তপ্ত হয়ে উঠলে শৈল নিবাসে চলে যাওয়া, সিমলায় 'গ্রীষ্ম' রাজধানী এভাবেই নির্মিত হয়। সমতলে প্রজারা থাকে রাজারা চলে যায় শৈলচূঁড়ায়। সেখান থেকে সমতল পরিদর্শন করা যায়। হিন্দু সম্প্রদায় যেখানে হিমালয় বা তার পর্বতশ্রেণীকে বিচার করেছে ধর্মীয় কোন থেকে সিভিলিয়ানরা বিচার করেছে ঔপনিবেশিক আদর্শ থেকে।

এ. বিচার ১৯৩০ সালে একটি বই লিখেছিলেন ১৮৩০-৮৮ পর্যন্ত ভারত ও ইউরোপের স্মৃতি নিয়ে। সেখানে সিভিলিয়ানদের স্ত্রীদের দেশ ও ভারতে তাদের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করে দেখেছিলেন তার মধ্যে একটি প্যাটার্ন আছে। এ প্যাটার্ন 'নেটিভদের' মধ্যে ছিল না। এবং এ প্যাটার্ন সিভিলিয়ানদের স্ত্রীরা শুধু নয় স্বামীরাও [বিয়ের পর] অনুসরণ করতো।

১৮৩০-১৮৪৯ [শৈশব ও কৈশোর] লন্ডন, সেভেন অকস, সুইজারল্যান্ড (জেনিভা), ব্রডস্টেয়ারস, ব্রাইটন ও ডরকিং, চিচেস্টার, বাথ (অবকাশ কাটানো)

১৮৪৯-১৮৫৮ (বিয়ে ও ভারতে বসবাস) মাদ্রাজ, কলকাতা, বেনারস, লখনৌ, দিল্লী, আগ্রা, এলাহাবাদ, কানপুর, অমৃতসর, লাহোর, করাচী ও মুম্বাই চাকুরিসূত্রে বসবাস। সিমলায় বেশ কয়েকবার ভ্রমণ, দীর্ঘদিনের জন্য হলে কাসৌলি।

১৮৫৮-১৮৫৯- (হোম লিভ) বেশির ভাগ ক্ষেত্রে লন্ডন, রেডিং। বাথ, চিউ ম্যাগানা, মিডহার্ষ্ট (কেন্ট) এবং লুসান (সুইজারল্যান্ড)।

১৮৫৯-১৮৬১ (ভারত) কলকাতা, সিমলা।

১৮৬১-১৮৬২- (হোমলিভ) ডারটমাউথ, মেইডেনহেড, রেডিং, ওয়েস্টন-সুপার মেয়ার, ক্লিফটন (বাথ), ব্রডস্টায়র্সে দিন যাপন।

১৮৬৩-১৮৬৬ (ভারত) কলকাতা, সিমলা, মাহানু নৈনিতাল, আলমোড়া প্রভৃতি শৈল নিবাসে ভ্রমণ।

১৮৬৬-১৮৭০ (অবসর নিয়ে হোমে ফেরা) লন্ডন, টার্নব্রিজ, ওয়েলস।

এখানেও সিভিলিয়ান সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি হায়রার্কির ব্যাপার ছিল। সব সিভিলিয়ানের পক্ষেই শৈল নিবাসে বা গ্রীষ্মকালীন রাজধানীতে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

ঔপনিবেশিক শাসন শুরুর আগে থেকেই জাঁকজমকের প্রতি আকর্ষণ ছিল উপনিবেশ স্থাপনকারিদের। এর একটি কারণ বোধহয় ভারতে পুরনো শাসকদের জাঁকজমক যা তাদের আলাদা করে রেখেছিলো স্থানীয়দের থেকে। সপ্তদশ ও

অষ্টাদশ শতকে সিভিলিয়ানদের পোষাক, জীবনরীতিতে তা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিলো যা আগে উল্লেখ করেছি। উনিশ শতক থেকে জীবন রীতিতে তা হ্রাস পেলেও 'সরকারি' ভাবে হ্রাস পায়নি। সিভিলিয়ানদের তকমা আটা বিশেষ পোষাকধারী ভৃত্য বহর বা অধস্তন কর্মচারি, বাসভবন, ভোজে তা প্রকাশিত হতো। একটি উদাহরণ দিচ্ছি–

১৮২২ সালে লর্ড বেন্টিংয়ের দেয়া এক নৈশভোজে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন ফরাসী পর্যটক ভিক্টর জাঁকমো। তিনি লিখেছেন–

"চারদিকে যা আয়োজন দেখলাম তা সবই রাজকীয় ও এশিয়াটিক, কেবল ডিনারটি ফরাসী স্টাইলের। ফ্রান্সের মতন এখানেও দেখলাম পরিমিত মাত্রায় সুস্বাদু সুরাপানের ব্যবস্থা রয়েছে, এবং সোনালি বর্ডার দেওয়া লাল পাগড়ি মাথায়, সাদা পোশাক-পরা লম্বা দাড়িওয়ালা ভৃত্যরা সেই পানীয় পরিবেশন করছে। ডিনারের দ্বিতীয় দফা খাদ্য পরিবেশনের আগে,আগ্রহ জাগানোর জন্য, একজন ইটালীয়ান পরিচালিত চমৎকার জার্মান অর্কেস্ট্রাবাদন আরম্ভ হলো। মোজার্ট ও রসিনির সিমফনি দিয়ে। দূর থেকে সেই সিমফনির মধুর ঐকতান, চারদিকের ঘরের মধ্যবর্তী বড় বড় স্তম্ভের পাশ দিয়ে বিচ্ছুরিত মৃদু আলোর আভাস, ডিনার টেবিলের উপরের আলোর ঝলমলানি, তার উপর বিচিত্র রঙের ফলফুলের সমারোহ।ফুলের সৌরভের সঙ্গে মিশ্রিত শ্যাম্পেনের সুগন্ধ–এসব মিলে পরিবেশটিকে যে কি অপরূপ করে তুলেছিল তা বর্ণনা করা যায় না।"[১৫১]

এই জাঁকজমক স্থাপত্যরীতিতেও প্রভাব ফেলেছিলো। মুঘল স্থাপত্যের বিপরীতে তারা দেশজ, ইউরোপীয় ও রেঁনেসা স্থাপত্যের মিশ্রণে সরকারি অফিস ও উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের বাসগৃহগুলো গড়ে তুলেছিলো যাতে তাদের কর্তৃত্ব প্রকাশ পেতো। কলকাতার বেলভিডিয়ার, পরবর্তীকালে রাজভবন, দিল্লীর ভাইসরয় হাউস এমন কী ঢাকার লে. গভর্ণরের বাসগৃহ এর কয়েকটি উদাহরণ। এই স্থাপত্য আবার প্রভাবিত করেছিলো বাংলার ভূমধ্যধিকারি ও ধনিকদের যারা ছিলেন উপনিবেশ স্থাপনকারিদের অনুগত ভক্ত ও অনুসারি। বাংলার বিভিন্নস্থানে নির্মিত জমিদারবাড়ি, কলকাতার হর্ম্ম্যরাজিও এর উদাহরণ।

॥ ১০ ॥

সিভিলিয়ান রাজপ্রতিনিধি [কোম্পানির প্রতিনিধি হলেও], সুতরাং তিনি আলাদা, ধরাছোঁয়ার বাইরে। যখন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে তিনি নির্বাচিত হচ্ছেন তখন তিনি আরো আলাদা হয়ে যাচ্ছেন। মোটামুটি সবাই তার অধস্তন তার ওপরঅলারা ছাড়া। ভারতীয়রাতো বটেই, স্বজাতিও থেকেও তিনি আলাদা। কারণ

তার চাকুরিকে বলা হতো 'হেভেনবর্ণ'। নিজেদের অনেক সময় তারা ঠাট্টা করে 'কমপিটিশনঅলা' বললেও অন্যান্য ইংরেজ বিশেষ করে ব্যবসায়ী ইংরেজদের তাচ্ছিল্য করে বলতেন 'বক্সঅলা'।

আসলে স্থায়ী নিশ্চিত চাকুরি, চাকুরি করেও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে না থাকা অর্থাৎ স্বাধীনতা [অন্য কথায় একধরনের জবাবদিহিহীনতা] নিশ্চিত বেতন, রুটিন প্রমোশন, সামাজিকতা ও রাষ্ট্রিক সম্মান একজনকে বিশেষ করে মধ্যবিত্তদের আইসিএস হতে প্রলুব্ধ করতো। বিশ শতকের ত্রিশ দশকেও 'নেটিভ' বা ভারতীয় একজন আইসি এসের তার সার্ভিসের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বিচার করলে বোঝা যাবে, শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ানরা কীভাবে এই চাকুরিকে বিচার করতো। ঐ সময়ও ক্যারিয়ারের জন্য আইসিএস ছিল সেরা। অনেক রাজনৈতিক সংস্কার (স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদি) সত্ত্বেও আসল ক্ষমতা ছিল আইসিএসদের হাতে। দেশ চালাতেন তারাই। জেলায় একজন জেলা শাসকের ক্ষমতা ও মর্যাদা ছিল অতি উপরে কারণ তাকে বিবেচনা করা হতো–

"....a member of heaven born service and an integral part of the steel-frame of the administration, the service had built up a very high repute of honesty, integrity, devotion to duty and public service without fears or favour, the less was regarded as the stamp of scholarship, competence and rare qualities."[১৫২]

শেষোক্ত মন্তব্যগুলি জাতিবর্ণধর্ম নির্বিশেষে সব আইসিএসের লেখালেখিতে পাওয়া যাবে এবং এগুলি তারা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করতেন আন্তরিকভাবে।

উডফোর্ডও প্রায় একই ধরনের মন্তব্য করেছেন। ১৯৪০-৪৮ সালে তিনি ছিলেন ভারতে। তাঁর মতে, আইসিএসরা খুব মেধাবী ছিলেন তা নয়। তিনি নিজেও এই পরীক্ষায় দু'বার ফেল করেছিলেন। তাঁর ব্যাচের অন্যান্যরাও অসাধারণ কিছু ছিলেন না কিন্তু প্রতিষ্ঠান সৃষ্টিতে ও বিকাশে তাঁরা ভারতীয়দের সঙ্গে কাজ করেছেন–

"doing their best to administer justice, to keep the peace, to resist sedition, to organize relief in case of natural disaster and maintain existing traditions in social and official relation, enough in all conscience."[১৫৩]

উনিশ শতকের শেষার্ধে একজন সিভিলিয়ান মন্তব্য করেছিলেন, ব্রিটিশ সরকার ও কর্মকর্তারা পৃথিবীতে সেরা, তার মধ্যে যে নিরপেক্ষতা আছে তা অন্য কারো মধ্যে নেই, ভারতীয় কর্মকর্তাদের প্রভাব তাদের মতো নয়। তাদের জন্যই [শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ান] ভারত বাণিজ্য, শিল্প, স্বাধিকার, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি, বিচার, শান্তি সবকিছুর জন্য গর্ব করতে পারে। বৃটিশের আসার আগে এসব আশীর্বাদ

তাদের ওপর বর্ষেনি, ব্রিটিশরা না থাকলে তা উধাও হয়ে যাবে। এই কর্মকর্তারা অতি দক্ষ, স্বার্থহীন। সুতরাং, কোনো অবস্থাতেই এদের প্রতি আস্থা হারানো যাবে না, তাদের প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া যাবে না– "like a generous benefactor has bestowed upon us, nor must we forget to pray always for the stability of so benign, just and merciful a rule."[১৫৪]

আরো আগে উনিশ শতকের মধ্যভাগে একজন সিভিলিয়ান লিখেছিলেন, তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য তারা বিশ্বাস করে নিজেদের জন্য কাজ করছে না, কাজ করছে প্রজাদের মঙ্গলের জন্য।[১৫৫]

লুন্ট এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনা করে লিখেছেন, এদের মধ্যে এক ধরনের 'অ্যারোগ্যান্স' ছিল যা ব্রিটিশ চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় না। এটি বোধহয় [বোধহয় নয়, সঠিক] সৃষ্টি হয়েছিলো এ ধারনা থেকে যে তারা শাসক, অন্যরা শাসিত– "In majority of cases this led to a kind of paternalism, but in the case of a few it gave rise to deep resentment and even hatred."[১৫৬]

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো যা আগেই উল্লেখ করেছি, ক্ষমতার দম্ভ, বর্ণবিদ্বেষ যা ঔপনিবেশিক শাসনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। নিজেদের স্বাতন্ত্র্য জ্ঞাপনের জন্য এও ছিল এক ধরনের মাধ্যম।

সিভিলিয়ানরা ছাড়াও সমসাময়িক অনেক লেখক সিভিলিয়ানদের নিয়ে ব্যাঙ্গ বিদ্রুপ করে বই লিখেছেন। এর মধ্যে এটকিনসনের 'কারি অ্যান্ড রাইস' বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো।[১৫৭] একেকটি 'স্টেশনে' যাঁরা দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তাদের চরিত্র অংকিত হয়েছে এতে। এর প্রধান আকর্ষণ এটকিনসনের আঁকা অনেকগুলি ছবি। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে 'সাহেব' সবখানে প্রভু, প্রজারা গলবস্ত্র, এমনকী মুনশী যখন তার পাশে তখনও 'সাহেবের' পা দু'খানা আরাম কেদারার হাতলে। ফ্রেজার 'দি স্টেশন ক্যাট' নামে একটি নাটিকা লিখেছিলেন, সেখানে একটি দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে কর্ণেলের স্ত্রী স্টেশন ক্লাবে এসে ক্লাবের দেশীয় তত্ত্বাবধায়ক কে ডেকে বলছে–

"I see by your face, Baboo, that you have no idea even now of my identity. I am Mrs. Colonel Mudge, and I am the principal lady in Mofussilabad. I am able to get you turned out of here at a moments notice. One word to Colonel Mudge! Do you undestand!"[১৫৮]

এক সিভিলিয়ান লিখেছেন, অনেক সময় তারা জোর করে কাজ করাতেন, যার নাম দেয়া হয়েছিলো "নৈতিক প্রভাব" বা "পানজাবী কাজ"। শেষোক্তটির সংজ্ঞা– "Punjabi where things are done in a very high handed manner by the conqureing race."

এ প্রসঙ্গে তিনি ঢাকার বাকল্যান্ড বাঁধের উল্লেখ করেছেন। লীল্যান্ড পাঞ্জাবী কায়দায় এক বাড়ির কোনা ভেঙ্গে বাকল্যান্ড বাঁধ করেছিলেন। এতে তার মতে জমির দাম বেড়েছিলো সুতরাং "I don't think they had any right to complain.." এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য– "As a body, the natives do not show any public spirit and energetic civilians supply it in this manner."

একবার ঢাকায় বারুনির মেলায় খরচ চালাবার জন্য গর্ডন বা 'এক্স সিভিলিয়ান' এক জমিদারের কাছে টাকা চাইলেন। তিনি টাকা না দেওয়াতে তাকে গর্ডন (জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট) গ্রেফতারের আদেশ দিলেন। কিন্তু পুলিশকে বললেন তা কার্যকর না করতে। জমিদার তাড়াতাড়ি টাকা দিয়ে দিলেন। গর্ডন লিখেছেন, "My conduct, however, was not legal, and it was only the urgency of the case which induced me to do this- in fact, to act the enlightedned despot for the time being."[১৫৯]

ড্যাশ উল্লেখ করেছেন (গত শতকের গোড়ার দিকে) তিনি এবং তার দু'বন্ধু বেগুনবাড়ি থেকে ট্রেনে উঠবেন। তাদের বিয়ার এবং অনান্য মালপত্র আসছিলো গরুর গাড়িতে। রেল এলে, গরুর গাড়ির জন্য অপেক্ষা করা হলো। একপ্রস্থ মাল উঠিয়ে আবার গরুর গাড়ি ফেরত পাঠানো হলো মালপত্র আনতে। স্টেশন মাস্টার, গার্ড, ইঞ্জিন ড্রাইভারকে হুমকি দিয়ে চুপ থাকতে বলা হলো। তারপর সরিষাবাড়িতে মালপত্র নিয়ে নেমে, জগন্নাথগঞ্জ যাওয়ার জন্য ড্রাইভারকে অনুমতি দিলেন।

আরেকবার ড্যাশ উল্লেখ করেছেন, শিকার করতে চেয়ে তৃষ্ণার্ত হয়ে এক কৃষকের বাড়িতে ঢুকে ডাব পাড়তে বললেন। ডাব আনতে দেরি হওয়ায় কৃষকে কয়েকটি ঘুষি মেরেছিলেন।[১৬০]

ঐ আমলে এগুলি উল্লেখ করার মতো ঘটনা নয়। এতই সামান্য, কিন্তু সিভিলিয়ানরা কি এই সামান্য ঘটনা ঘটাবার সাহস রাখতেন স্বদেশে; আশ্চর্যের ব্যাপার যে, আইসিএসরা না বুঝলেও তাদের নিয়োগকর্তা রাণী ভিক্টোরিয়া বিষয়টি ভালোভাবে বুঝেছিলেন। হয়ত ভারতবর্ষ থেকে অনেক দূরে থাকার জন্য তিনি এই বিষয়গুলি বুঝেছিলেন। ১৮৯৯ সালে কার্জনকে ভারতে ভাইসরয় হিসেবে নিয়োগ দেয়ার আগে প্রধানমন্ত্রী সলসবারিকে তিনি একটি চিঠি দিয়েছিলেন। চিঠিতে ভাইসরয়ের কি কি গুণাবলী থাকতে হবে তার উল্লেখ করেছিলেন। মূল কথা ছিল, ভারতবাসীরা প্রজা এ কথাটি তাদের বুঝতে দিতে হবে তবে এমনভাবে যাতে তারা ক্ষুব্ধ না হন। দীর্ঘ হলেও ভিক্টোরিয়ার চিঠির উদ্ধৃতি দিচ্ছি বিষয়টি অনুধাবনের জন্য–

"The future viceroy must really shake himself more and more free from his red-tapist, narrow-minded council and entrourage. He must be more independent, must hear for himself what the feelings of

the Natives really are, and do what he thinks right, and not be guided by the snobbish and vulgar overbearing and offensive behaviour of many of our civil and political Agents, if we are to go as peacefully and happily in India, and to be liked and beloved by high and low, as well an respected as we ought to be, and not trying to trample on the people and continually reminding them and make them feel that they are a conquered people. They must feel that we are masters, but it should be done kindly and not offensively, which also is so often the case. Would Mr. Curzon feel and do this."[১৬১]

অন্যদিকে বিলেতে পড়ুয়া নেহেরু ভারত ও ভারতবাসীর অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন দেখেই স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে সরে আসেন নি। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছিলেন–

"কয়েক পুরুষ ধরিয়া ব্রিটিশগণ ভারতবর্ষকে নিজেকে বৃহৎ মফস্বলের বাড়ী (প্রাচীন ইংরেজগণের ধরনে) বলিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত। এ বাড়ীতে তাঁহারাই ভদ্রলোক এবং ভাল অংশে বাস করিবেন। ভারতীয়রা চাকরদের ঘরে, আস্তাবলে, রান্নাঘরে থাকিবে। প্রত্যেক মফস্বলের বাড়ীতে নিম্নপদগুলি নির্দিষ্ট হইয়া আছে সর্দ্দার চাকর, বাজার সরকার ও তদ্বিরকারক, পাচক, খানসামা, চাকরানী, কোচওয়ান প্রভৃতি প্রত্যেকেই স্ব স্ব নির্দিষ্ট নিয়মে চলাফেরা করে, কিন্তু বাড়ীর উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সামাজিক বা রাজনৈতিক কোন সম্পর্ক নাই, ব্যবধান অনতিক্রমণীয়। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যে এই ব্যবস্থা আমাদের উপর চাপাইয়া দিলেন, ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই; বিস্ময়ের এই যে, আমরা প্রায় সকলেই এই ব্যবস্থাকে আমাদের জীবনযাত্রার স্বাভাবিক ও অনিবার্য নিয়তি বলিয়া মানিয়া লই। বড়লোকের বাড়ীর ভাল চাকরের মনোবৃত্তিতে আমরা অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি। সময় সময় আমরা অতি দুর্লভ সম্মান পাই, বৈঠকখানায় আমাদিগকে এক-আধ পেয়ালা চা খাইতে দেওয়া হয়। আমাদের জীবনের সম্বন্ধে দুরাকাঙ্ক্ষা হইল ইংরাজের নিকট সম্মানলাভ ও ব্যক্তিগতভাবে উচ্চশ্রেণীতে 'প্রমোশন' পাওয়া। অস্ত্রবলে জয় বা কূট রাজনৈতিক কৌশলে জয় অপেক্ষা মানসিক দাসত্বই ভারতে ইংরাজের সর্বশ্রেষ্ঠ জয়। প্রাচীনকালের জ্ঞানী ব্যক্তিরা যেমন বলিয়াছেন যে, ক্রীতদাস নিজেকে ক্রীতদাস বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করে।"[১৬২]

স্বাভাবিক ভাবেই সিভিলিয়ানদের এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করে জাতিবৈরের। উপরের আলোচনায় বিভিন্ন উদ্ধৃতিতে এর উল্লেখ আছে। ভারতীয় রহমতুল্লাহ লিখেছিলেন, ব্রিটিশদের সঙ্গে ভারতীয় সিভিলিয়ানদের মেলামেশা নেই। একমাত্র সেটেলমেন্ট ট্রেনিংয়ের সময় তাদের যা খানিকটা মেলা মেশা হয়। এটি বিশ শতকের ত্রিশদশকের কথা। সুতরাং আগের অবস্থা অনুমেয়। বিভিন্ন

স্মৃতিকাহিনী, বিবরণ পড়ে আমার মনে হয়েছে প্রথমদিকে ইউরোপিয়ানরা স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করলেও জাতি বৈর ততটা তীব্র ছিল না। উনিশ শতকে শাসন ব্যবস্থা থিতু হলে এই বৈরিতা দেখা দেয় এবং উনিশ শতকের মাঝামাঝি তা তীব্র আকার ধারণ করে। স্পিয়ার তাঁর গ্রন্থে এ বিষয়ে খানিকটা অ্যাপোলেজিটিক।[১৬৩] কিন্তু তার দরকার ছিল না। ঔপনিবেশিক স্থাপনকারিদের ব্যবহার তেমন হওয়াটাই স্বাভাবিক। বিশ শতকের দিকে তার রেশ কমতে থাকে। কিন্তু সে রেশ পুরোপুরি কাটেনি। নিজের দুটি উদ্ধৃতি এর উদাহরণ।

অশোক মিত্র লিখেছেন, "স্টেশন ও নন স্টেশন ছাড়াও ব্রিটিশরা নিশ্চয় একই স্টেশনের মধ্যে কালো সাদা চামড়ার মধ্যে তফাত করতেন।... সাদাকালো চামড়ার এই পার্থক্য ভারতীয় অফিসারদের মধ্যে নিশ্চয় শুরু থেকে কিছুটা হীনম্মন্যতা ঢুকিয়ে দিত।"

১৯২৪ সালে দিকে টাইসন ছিলেন ফরিদপুরের জেলা জজ। ঐ সময় কালেকটর ছুটি নিয়ে গেলে তার জায়গায় সাময়িকভাবে একজন ভারতীয়ের আসার কথা ছিল। টাইসন তখন লিখেছিলেন, ঢাকায় একজন আছেন তাকে পাঠানো হোক (ইংরেজ) যদিও সে সিভিলিয়ান নয় এবং জুনিয়র সার্ভিসের কিন্তু একজন ইউরোপিয় 'একজন' বাবু থেকে উত্তম। সেই টাইসন ১৯৪৭ সালে লিখছেন, স্বাধীন হলে ভারতীয়দের আধিপত্য বাড়বে, সার্ভিস নষ্ট হয়ে যাবে কারণ ভারতীয়রা 'যো হুজুর' টাইপ। তারপর দুঃখ করে মন্তব্য করেছেন– "We gave India something: I am not sure that she even really valued it."[১৬৪]

তবে, ব্যতিক্রম যে ছিল না তা নয়, ছিল। উপর্যুক্ত কাঠামোয় সিভিলিয়ান হয়েও তাদের প্রবর্তিত ব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন অনেকে। এসব সমালোচনার কারণে চাকুরি জীবনে অনেকে হেনস্তা হয়েছেন যেমন হেনরি বেভারিজ। এই কাঠামোয় থেকেই অনেক সিভিলিয়ান ভারতচর্চা করেছেন। তাঁদের গ্রন্থাদির নানা সমালোচনা হতে পারে কিন্তু তাঁদের রেখে যাওয়া বিপুল তথ্য অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের ভারতকে বুঝতে সহায়তা করেছে।

১৮৫৭ সালের পর জনৈক সিভিলিয়ান তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লিখেছেন, ইংল্যান্ড ও ভারত আলাদা। ইংরেজরা যদি নিজেদের 'সুপিরিয়র' মনে করে নিজেদের ব্যবস্থা চাপিয়ে দিতে চায় তাহলে চলবে না। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, ইংল্যান্ডে কী হবে তার সিদ্ধান্ত ভারত বা চীন থেকে নিলে ইংরেজদের কেমন লাগবে? তার মতে, এ ব্যবস্থা চালু থাকলে ভারত রাখা যাবে না। তিনি লিখেছেন যতই তিনি ভারতকে দেখেছেন ততই তার মনে হয়েছে "our system of governing had a tendency to utterly destroy our good name; that our hold over the people was gradually wanning; that we know not the nature of

the natives: that our exclusiveness from them, and their cringing nature and flattery, blinded those in authority who ought to know better."[১৬৫]

উনিশ শতকের শেষার্ধে হেনরি বেভারিজ লিখেছিলেন, ভারতে যথেষ্ট শিক্ষিত লোক আছে, ইংল্যান্ড থেকে এখানে প্রশাসক আমদানীর প্রয়োজন নেই। আর ভারতীয়রা কেন সিভিলিয়ান পোষার এত খরচ বহন করবে? আসলে, ভারতীয়দের ক্ষমতার বলয়ের বাইরে রাখার জন্যই যাবতীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।[১৬৬]

কটন লিখেছিলেন, সিভিলিয়ানদের অত্যধিক ক্ষমতা তাদের অন্ধ করে দেয়। ফৌজদারি মামলা ও এর শাস্তির বিধান অমানবিক। এই শাস্তি দেয়াটা একটা নেশার মতো হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তীকালে এর জন্য তিনি অনুতপ্ত হয়েছিলেন। তিনি আরো জানিয়েছেন, যারাই ভারতবাসীর প্রতি খানিকটা সহানুভূতি দেখিয়েছেন তারাই ভারতীয়দের কাছে আদৃত হয়েছে। কটন নিজে আসামের চিফ কমিশনার হিসেবে অবসর নিয়েছিলেন বাধ্য হয়ে। লর্ড কার্জনের সঙ্গে মতবিরোধ এর কারণ। তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন ভারতীয়দের প্রতি। বিদায়কালে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তিনি যে সম্মান ও ভালোবাসা পেয়েছেন তা কার্জনও পাননি।

সিভিলিয়ান পর্বের শেষ অংকে ভারতে ছিলেন ইফ ম্যাকইনার্নি। তাঁর মাতামহ ছিলেন ফরাসী কূটনৈতিক যিনি মুম্বাইতে ছিলেন ১৮৮৬ সালের দিকে। তখন তিনি মন্তব্য করেছিলেন, ভারতীয়রা সবসময় ব্রিটিশ শাসনের অধীনে থাকবে না। একটা সময় আসবে যখন তারা স্বাধীনতা চাইবে। ম্যাকইনার্নি চেয়েছিলেন হোম সার্ভিস, পেলেন ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস, বাংলায় আসতে চাননি কারণ তিনি শুনেছিলেন তা অস্বাস্থ্যকর জায়গা। কিন্তু পেয়েছিলেন বাংলা বিভাগই। চাকুরি শুরু করেন বাখরগঞ্জের সহকারি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে। ১৯৪৭ সালে দাঙ্গার সময় তিনি ছিলেন নোয়াখালির ডি. এম। ১৯৭১ সালে যখন মুক্তিযুদ্ধ চলছে তখন তিনি চাকুরি জীবনের স্মৃতিচারণ করে লিখেছিলেন, প্রতিটি মানুষই সম্মান পাওয়ার যোগ্য। মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করে বাঙালিদের সম্পর্কে যে মন্তব্য তিনি করেছিলেন তা খুব কম সিভিলিয়ানই করেছেন–

"As for the Bengalis, I believe them to be the most charming, the most beautiful (physically and spiritually), the most poetical, the most musical, the most intelligent, the most potentially joyful, the most misunderstood and the most outrageously vilified people in face of the earth."[১৬৮]

॥ ১১ ॥

এক দেশ থেকে আরেক দেশ, আক্ষরিক অর্থেই দূরদেশ, যার আবহাওয়া নিজ

দেশের আবহাওয়া থেকে বিপরীত, আচার-আচরণ সংস্কৃতি, বিশ্বাস, ভাষা সবই আলাদা সেখানে এসে এক তরুণ ফের কীভাবে জীবন শুরু করতো তা একটি ভাববার বিষয় বটে।

সিভিলিয়ানের জীবন তিনটি পর্বে ছিল বিভক্ত। প্রথম পর্ব, যৌবনে উপনীত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নিজ দেশে অভ্যস্ত সমাজে বসবাস ও যৌবনের স্বপ্ন দেখা। যৌবনে পৌঁছে ভিন্ন এক দেশে এসে পৌঁছা। প্রায় ক্ষেত্রে বিবাহিত হলেও অবিবাহিতের জীবন যাপন। কারণ, সন্তান হলে বা সন্তান একটু বড় হলে তাকে একা বা মা সহ দেশে পাঠিয়ে দেয়া। এভাবে একই পরিবারে সৃষ্টি হতো দু'টি ধারা। জন বিমস লিখেছিলেন, তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিলো ত্রিশবছর পর।

বিশ শতকের ভারতবর্ষ না হয় সহনীয় ছিল কিন্তু অষ্টাদশ বা উনিশ শতকে (বিশেষ করে প্রথমার্ধে)? বিশাল জনসমুদ্রে কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ। বৈরি আবহাওয়া, বৈরি সংস্কৃতি, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে যাদের পোস্টিং ছিল তাদের অবস্থাতো ছিল ভয়াবহ। ফ্রেজার লিখেছিলেন, ভারত সাম্রাজ্যের সবচেয়ে সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও ভালো প্রশাসন এর সীমানায় এসে থেমে গিয়েছে। ঐতিহ্যমতেই একে উপেক্ষা করা হয়েছে।[১৬৯]

ড্যাশ লিখেছিলেন, পূর্ববঙ্গে পোস্টিংকে সবসময় নিচুস্তরের মনে করা হতো। ১৯১০ সালে আইসিএস হয়ে কলকাতায় পৌঁছলেন। প্রথম দিন রাইটার্স বিল্ডিংয়ে আন্ডার সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তিনি অন্যান্যদের পোস্টিংয়ের আলাপ সেরে–

"..turned more scornfully to those who had been alloted to the province of Eastern Bengal and Assam. We were coldly informed that Writers Buildings knew nothing whatever about us and our destinations and did not propose to investigate. The Under Secretary coldly advised us to communicate at our own expense with the Government of Eastern Bengal and Assam in Dacca. We were then ushered out."[১৭০]

সরকারি জগতের বাইরে কি তার আর কোনো জগত ছিল? কীভাবে দিন যাপন করতেন সেটিই প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। সরকারি কাজ ছাড়া সিভিলিয়ানরা সময় কাটাতেন তিনভাবে– প্রথম ক্লাব, দ্বিতীয় শিকার, তৃতীয় শিল্প সাহিত্য চর্চা/ গবেষণা/ রিপোর্ট লেখা।

মফস্বল বা সদরে 'স্টেশন' হলেই প্রথমেই পত্তন করা হতো একটি ক্লাবের। বেশ বড়সড় আঙ্গিনা নিয়ে স্থাপিত হতো ক্লাবের বাংলো। অবধারিত ভাবে সেখানে থাকতো ১টি টেনিসকোর্ট। বাংলাদেশের মফস্বলের পুরনো 'স্টেশন' গুলিতে গেলে

এখনও সে সব ক্লাবের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে যা পরিবর্তিত হয়েছে 'অফিসার্স ক্লাবে'। ক্লাবে সন্ধ্যায় স্টেশনের শ্বেতাঙ্গরা জমা হতেন। মদ্যপান, তাস খেলা, গুজবচর্চা, অবিবাহিত নারী থাকলে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা এই ছিল বিনোদন। 'স্টেশন ক্যাটে' লেখা হয়েছিলো- ছোকরা সিভিলিয়ান, যুবতী, স্ত্রীরা মফস্বলবাদের ক্লাবে সময় কাটায়। 'স্টেশন ক্যাট' হচ্ছেন মফস্বলাবাদের কর্নেলের স্ত্রী, কুচুটে স্বভাবের। স্বামীর কারণে নিজেকেও তিনি কর্নেল মনে করেন এবং সে ভাবেই চলেন, বলেন ও সবাইকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন। মেয়েরা নতুন পোষাকে সজ্জিত হয়ে ছোকরাদের দেখতে আসে। একটু প্রেম ট্রেমও যে করতে চায় না তা নয়।[১৭১]

সদর হলে ক্লাবের অবস্থা একটু রমরমা হতো। যেমন, ঢাকায়, সিভিলিয়ানরা উনিশ শতকে গড়ে তুলেছিলো ঢাকা ক্লাব, জিমখানা ক্লাব প্রভৃতি। ড্যাশের আত্মস্মৃতিতে এর বিস্তারিত বিবরণ আছে। ক্লাব কালচারের বিশেষ অঙ্গ ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (ভ্যারাইটি শো) এবং পার্টি। সদরেই পার্টির জাঁকজমকটা ছিল বেশি স্বাভাবিকভাবেই।[১৭২]

তবে, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল শিকার। বিশেষ করে গোটা উনিশ শতক সিভিলিয়ানদের বাঁচিয়ে রেখেছে শিকার। গ্রাহাম লিখেছিলেন– শিকারই আনন্দ– "These breaks in the monotony on mofunssil life and most revivifying, and we cameback full of health and spirit."[১৭৩]

শুধু ১৯ শতকেই নয়, বিশ শতকেও নতুন পুরাতন সিভিলিয়ানরা শিকারে বেরিয়ে যেতেন। বর্তমান সংকলনেও এর বিবরণ আছে।

শিকারে সবচয়ে জনপ্রিয় ছিল 'পিগ স্টিকিং' বা বরাহ শিকার। এর একটি কারণ বোধহয় চরম উত্তেজনা। মফস্বলে নিঃসঙ্গ সিভিলিয়ানের মনে তা মাদকের কাজ করতো। এই পিগস্টিকিং বা অন্যান্য শিকার নিয়ে প্রচুর বই বেরিয়েছে উনিশ শতকে।[১৭৪] পূর্ববঙ্গের জন্য সিমসনের বইটি উল্লেখ্য। এখানে পূর্ববঙ্গে যারা ছিলেন তাঁরা কীভাবে শিকারে মত্ত ছিলেন তার একটি বর্ণনা দিচ্ছি। এদের বিস্তারিত বিবরণ আলাদাভাবে উল্লেখ করেছি, কিন্তু শিকার ছিল যেহেতু তাদের জীবনযাপনের অন্যতম উপাদান তাই সে সম্পর্কে এখানে খানিকটা বিস্তারিত বিবরণ রাখছি।

১৭৭৬ সালে বরার্ট লিন্ডসে সিভিলিয়ান হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন ঢাকার কুঠিতে। তখনই জানিয়েছেন তিনি, সিভিলিয়ানদের মধ্যে বরাহ শিকারটি বেশ জনপ্রিয়। লিন্ডসে লিখেছেন, মৌসুমী বৃষ্টির পর, টঙ্গীর সমতলভূমিতে তাঁবু টানাতেন এবং তারপর যতরকম মাঠক্রীড়া আছে তাতে নিজেদের ব্যস্ত রাখতেন। লিন্ডসে লিখেছেন, তিনি ভক্ত ছিলেন বন্য বরাহ শিকারে যার জন্য দরকার ছিল সাহস ও দক্ষ ঘোড়া চালনা এবং এ কাজটি ছিল পৌরুষের। শিকারের অস্ত্র ছিল

তিনহাত লম্বা ভারী একটি বল্লম। প্রথমে কুকুর ছেড়ে দেয়া হতো। তারা বন্য বরাহ দেখলে তাড়া করতো। তাড়া খাওয়া বন্য বরাহের পিছু নিতো তখন শিকারি। প্রথমজন যদি লক্ষ্য ভেদে ব্যর্থ হতো, তখন তার জায়গা নিতো দ্বিতীয়জন। ঘোড়া চালনায় দক্ষ না হলে এ খেলা ছিল বিপজ্জনক। লিন্ডসে জানিয়েছেন, "বরাহের হিংস্রতার কারণে অনেক দুর্ঘটনা ঘটতে আমি দেখেছি। মাঝে মাঝে সম্মুখীন হতাম বাঘ অথবা চিতার কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়া ওগুলির পিছু নেওয়া ভাবতাম না।"

একবার লিন্ডসে খুব অশান্ত এক ঘোড়ায় চড়েছেন এবং ঘোড়ার কারণে মাঠ ছেড়ে তাকে তাঁবুতে ফিরতে হচ্ছে। সঙ্গে ভৃত্য। হঠাৎ পথিমধ্যে বিশাল এক বরাহ তাকে আক্রমণ করলো। লিন্ডসে অবশ্য বধ করলেন বরাহটিকে। এবং ভৃত্যের সাহায্যে বরাহটিকে নিয়ে গেলেন তাঁবুতে।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়। লিন্ডসে যে সময়ের কথা লিখেছিলেন সেটি ১৭৭৬-৮০ সালের কথা। ঐ সময় দেখা যাচ্ছে 'পিগ স্টিকিং' শব্দটির উদ্ভব ঘটে নি। কারণ লিন্ডসে সব সময় 'শিকার' শব্দটিই ব্যবহার করেছেন। খুব সম্ভব, উনিশ শতকের প্রথম দিকে উদ্ভব হয়েছে 'পিগ স্টিকিং' শব্দটির।[১৭৫]

শীতকালটা কাটাতেন তাঁরা ময়ূর, প্যাট্রিজ, বনমোরগ আর অন্যান্য পাখি শিকার করে। তবে, পায়ে হেঁটে শিকার করা ছিল ভয়ের কারণ, বন জুড়ে ছিল বাঘ আর চিতা। একদিন যেমন লিন্ডসে তাঁর স্কটিশ ভৃত্য জন ম্যাকে' কে নিয়ে ফিরছেন। হঠাৎ জন বললো, স্যার, ঐটি কী?

পথের ওপর বিশাল এক প্রাণী দাঁড়িয়ে।

ঐটি হলো রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

স্যার, গুলি ছুঁড়বো নাকি?

না, জন, তাকে তার পথে যেতে দেয়াই ভালো।

আরেকদিন বিশাল এক তেঁতুল গাছে একটি ময়ূর বসে আছে দেখে গুলি করতে প্রস্তুত হলেন লিন্ডসে। হঠাৎ দেখেন, তেঁতুলের আরেকটি ডাল বেয়ে নেমে আসছে এক চিতা। দ্রুত পালালেন লিন্ডসে।

লিন্ডসে লিখেছেন, সিলেটের গ্রাম বা বনাঞ্চলে প্রচুর বাঘের বাস। এবং সব রকমের বাঘই আছে সেখানে। আর বাঘ হত্যার জন্য সরকারি পুরস্কারও মজুদ। লিন্ডসে তাঁর বিবরণে বাঘ শিকার ও জ্যান্ত বাঘ ধরার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। সমসাময়িক অনেক বিবরণের সঙ্গে এর পার্থক্য প্রায় নেই বললেই চলে এবং তা আমাদের অনেকের জানা দেখে আর পুনরুক্তি করলাম না।

গণ্ডারও পাওয়া যেতো সিলেটে। অনেক কষ্টে লিন্ডসে ও তাঁর অনুচররা একবার একটি বিশাল গণ্ডার শিকার করেছিলেন। গণ্ডারটি মারা গেলে আশেপাশের গ্রামের প্রায় সব অধিবাসীই ঝাঁপিয়ে পড়লো মৃত প্রাণীটির ওপর। এবং দেহাবশেষ

থেকে যে যা পারলো তা সংগ্রহ করে নিয়ে গেল। কারণ সবার বিশ্বাস গণ্ডারের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রোগ সারায়। অনেক কষ্টে লিন্ডসে শুধু গণ্ডারের শিং আর মাথাটা সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। ইংল্যান্ডে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি এই সংগ্রহ। এক টুকরো মাংসও তিনি ভেজে খেয়েছিলেন। খুব একটা খারাপ লাগে নি। গয়ালের কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি। পার্বত্য ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রামে তা পালন করা হয়। এ ছাড়া লিন্ডসে বন্য হাতি ধরে বিক্রি করেও বেশ অর্থ উপার্জন করেছিলেন।

সিমসন পূর্ববঙ্গের শিকার নিয়ে একটি বই-ই লিখে ফেলেছিলেন। গত শতকের চল্লিশ দশকে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সিভিলিয়ান হিসেবে কর্মরত ছিলেন তিনি। সে সময় শিকার সম্পর্কিত তথ্যাদি টুকে রাখতেন যা পরে তাঁর বই লেখার কাজে লেগেছে।

১৮৪৭ সালের এক নোট থেকে সিমসন লিখেছেন, সময় বদলে যাচ্ছে অর্থাৎ আগে যেখানে যা পাওয়া যেতো এখন সেখানে তা নাও পাওয়া যেতে পারে। যেমন, সিমসনের অনেক আগে ত্রিপুরা [কুমিল্লা] ও সুধারামের [নোয়াখালি] মাঝামাঝি জায়গায় শিকারের জন্য বরাহ পাওয়া যেতো, এখন আর তা [উনিশ শতকের মাঝামাঝি] পাওয়া যাচ্ছে না। সিমসন নিজে বেশি শিকার পেতেন সিদ্ধি ও হিঙ্গুটিয়ায় যা তখনই মেঘনার বুকে তলিয়ে গেছে।

সিমসন উল্লেখ করেছেন, শিকারে যাওয়ার আগে প্রয়োজন ভালো শিকারি এবং তা মুসলমান হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ পূর্ববঙ্গে নদীনালায় যাতায়াত করতে হবে এবং সে জন্য লাগবে দক্ষ মাঝি এবং মুসলমানরাই মাঝি হিসেবে ভালো। খাওয়ার ব্যাপারে তাদের জাতপাতের বালাই নেই, মাহুতরাও মুসলমান। এবং শিকারের খবর পাওয়া যায় মুসলমানদের কাছেই। কারণ হিন্দুরা ধর্মীয় কারণে জীবজন্তু রক্ষার জন্য খবর দিতে চায় না। মুসলমানরা পতিত জমি উদ্ধারে আগ্রহী অর্থাৎ বনজঙ্গল সাফ করে তারা চাষবাসে আগ্রহী। ফলে কোথায় কী পাওয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে তারা খোঁজ খবর রাখে। সে কারণে সিমসন যখন শিকারে যেতেন তখন মুসলমান শিকারিই সঙ্গে নিতেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি এও বলেছেন, কলকাতা থেকে যেন শিকারি আনা না হয়।

কীভাবে শিকারে যেতে হবে, সে সম্পর্কেও সিমসন বেশ কিছু উপদেশ রেখে গেছেন সাহেবদের জন্য। ধরা যাক একজন কর্মরত ঢাকায়। হঠাৎ ইচ্ছে হলো তার স্নাইপ শিকারের। ঢাকায় তখন স্নাইপ বেশি পাওয়া যায় না। অফিস শেষে ঘোড়ায় চড়ে তখন নারায়ণগঞ্জ চলে যাওয়া ভালো। সেখানে নৌকা ভাড়া করে উঠে পড়া, রাতটা নৌকোয় ঘুমিয়ে কাটিয়ে দাও। ধলপহরে পৌঁছে যাও দাউদকান্দি। সেখান থেকে ঘোড়ায় চেপে পৌঁছে যাও বড় কামতা বা কুমিল্লার উপকণ্ঠে, সকালে।

সেখানে খবর দিয়ে রাখলে কুমিল্লার সাহেবরা তোমার জন্য অপেক্ষা করবেন। নিয়ে যাবেন শিকারে। মাসটা যদি সেপ্টেম্বর, অক্টোবর বা নভেম্বর হয় তাহলে তো কথাই নেই। ফার্স্ট রেট স্নাইপ শ্যুটিং হবে। সিমসন বলছেন, আসলে একটু নড়াচাড়া না করলে বা মালকড়ি খরচ না করলে শিকারের নতুন নতুন জায়গা খুঁজে পাওয়া যায় না। ঢাকার সাহেবরা দাউদকান্দি এবং এর আশেপাশে প্রায়ই বরাহ নিধনে যেতেন এবং সেখানকার বরাহকুল তারা প্রায় শেষ করে ফেলেছিলেন।

শিকার কোথায় পাওয়া যেতে পারে তারও বর্ণনা রেখে গেছেন সিমসন। ত্রিপুরায় স্নাইপ পাওয়া যেতো প্রচুর। ত্রিপুরা মানে কুমিল্লা। নোয়াখালির স্টেশন থেকে বেরুলেই ব্যাগ ভর্তি স্নাইপ শিকার করা যেতে পারে। ষ্টেশন অর্থ যেখানে কোর্ট-কাছারি অর্থাৎ সিভিলিয়ান আবাস আর দফতর। মেঘনার চরেও পাখি পাওয়া যেতো পর্যাপ্ত। চাঁটগায়ও স্টেশনের কাছে ও আলিশহরে শিকারি খালি হাতে ফিরতো না। আলিশহর আমাদের কাছে এখন পরিচিত হালিশহর নামে। চাঁটগার প্রতিটি পাহাড়েই বন্য প্রাণী ছিল পর্যাপ্ত। রাজশাহী, ময়মনসিংহ এবং প্রায় সব জেলা শহরেই স্নাইপ ছিল প্রচুর পরিমাণে।

সিমসন জানিয়েছেন রাতে নৌকা বা পালকি করে ভ্রমণ আরামদায়ক। রাস্তা ভালো হলে চাঁদের আলোয় দীর্ঘ পথ যাওয়া যায়। চাঁটগা থেকে ৪০ মাইল দূরে জোরারগঞ্জে প্রায়ই তিনি শিকার করতে যেতেন। রাতে বগি (ঘোড়ায় টানা গাড়ি) করে চলে যেতেন। রাতে ঘোড়ায় চড়ে ভাওয়াল জঙ্গল পেরিয়ে ময়মন-সিংহের পাঁচ টিকরি বিলে শিকার করতে যেতেন সিমসন।

বেশির ভাগ সিভিলিয়ান চাইতেন সে সব জায়গায় থাকতে যেখানে আবহাওয়া ভালো, সমাজ উন্নত। অর্থাৎ ডিনার পার্টি ও বল ডান্সের আসর বসে নিয়মিত। সিমসনের নেশা যেহেতু ছিল শিকার সেহেতু তিনি উল্টোটি চাইতেন। তাঁর যখন নোয়াখালিতে নিয়োগ হলো তখন তাঁর এক বন্ধু লিখেছিলেন, "অনেক চেষ্টাচরিত্র করে অবশেষে একজনকে পাওয়া গেল যে জায়গাটা সম্পর্কে জানে। তার মতে মেঘনার তীরে ভয়ঙ্কর একটি এলাকা যেখানে কোনো সমাজ নেই, ডাক্তার নেই, যেখানের লোকজন তৈরি করে বাজে লবণ এবং শিকার করে বরাহ আর বাঘ।"

সিমসনের কিন্তু নোয়াখালির চর পছন্দ ছিল। কারণ এর চর ভরপুর ছিলো ছোট আকারের বরাহে। এবং এগুলি শিকারে উত্তেজনা ছিল। এগুলি রুখে দাঁড়াতো, দৌড়োতে পারতো। সিমসন লিখেছেন, "আই নেভার মেট এ কাওয়ার্ডলি ওয়ান।" অন্যদিকে, কুমিল্লা, মধ্যরাজশাহী, মালদহ এবং দিনাজপুরের বরাহগুলি ছিল আকারে বড়। দিনাজপুর এবং রংপুরে তিনি এমন বরাহের কঙ্কাল দেখেছেন যা তিনি শিকারের সময় কখনও দেখেননি। তবে, এসব অঞ্চলের বরাহ

শিকারে তেমন উত্তেজনা ছিল না। কারণ এগুলি তেমন নড়াচড়া করতো না, সহজেই এগুলিকে কাবু করা যেতো।

ত্রিপুরায় পিগ স্টিকিংটা জমতো ভালো। পিগ স্টিকিং হচ্ছে বরাহ শিকার। সাহেব ঘোড়ায় চড়ে বল্লম হাতে বরাহ তাড়া করতেন এবং খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তা হত্যা করতেন। এতেই ছিল তাদের উত্তেজনা, শিকারের আনন্দ। কারণ গুলি করে তো অনায়াসেই বরাহ শিকার করা যায়। তাতে আনন্দ কই? দাউদকান্দির আশেপাশে পিগ স্টিকিংটা জমতো। ফসলের ক্ষেতের আশেপাশে ছিল ঘেসো মাঠ। ফসল কাটার সময় সেখানে শিকার মিলতো ভালো।

ত্রিপুরার অভ্যন্তরে অনেক গ্রাম, পুকুর ছিল পরিত্যক্ত। সেগুলি ভরা ছিল জঙ্গলে। পাহাড়ের আশেপাশে, জঙ্গলে বরাহ পাওয়া যেতো। কিন্তু, শিকারিদের দাপটে সিমসনের সময়ই সেখানে বরাহের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিলো।

বসন্তে ত্রিপুরার উত্তরে এবং সিলেটের দক্ষিণে বরাহ শিকার জমতো। সেখানে যে বরাহ পাওয়া যেতো খুব বেশি তা নয়। সিমসনও সেখানে একবারই শিকার করেছিলেন। "আর কেউ সেখানে শিকার করেছে বলে শুনিনি", জানিয়েছেন সিমসন।

শিকারের জন্য ঢাকা জেলা চমৎকার। সাভারের কাছে বংশী নদীর উত্তরে চরে শিকার মিলতো ভালো। ভাওয়াল আর টঙ্গীর মাঝামাঝি জায়গাও ছিল শিকারের জন্য উত্তম। এখানেই সিমসন একটি পরিত্যক্ত গ্রামের সন্ধান পেয়েছিলেন। খুব সম্ভব সেখানে গোটা চারেক কুঁড়ে ছিলো। এ গ্রামটিতে প্রচুর বরাহ পাওয়া যেতো। কেন? তার উত্তর তিনি খুঁজে পান নি। গ্রামটির নাম দিয়েছিলেন তিনি 'নেভার ব্ল্যাংক' অর্থাৎ যা কখনও খালি থাকে না। ১৮৬১ থেকে ১৮৭২ পর্যন্ত সেখানে নিয়মিত তিনি শিকার করেছেন। তবে, উল্লেখ করেছেন সিমসন, আরো বেশি পিগ স্টিকিংয়ের ইচ্ছে থাকলে সাহেবদের যেতে হবে গোয়ালন্দ বা ময়মনসিংহ।

শিকারের জন্য এক সময় ময়মনসিংহ ছিল শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মপুত্রের তীরে, জামালপুরে ছিল একটি সেনানিবাস। খুব সম্ভব বরাহ নিধনের একটি ক্লাবও। প্ল্যাট বরাহ নিধনের যে চমৎকার সব দৃশ্য এঁকেছিলেন সেগুলি এ এলাকারই। ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব তীর থেকে আসাম পর্যন্ত চর এলাকা ছিল শিকারিদের প্রিয়। সেখানে বাঘ শিকারেও যেতেন অনেকে। সিমসন লিখেছেন, সুসং এলাকায় নতুন একটি পুলিশ থানা হয়েছিলো এবং বরাহ মাংস ছিলো থানাদারদের প্রিয়। সরকারি গুলি খরচ করে তারা বরাহ শিকার করতেন। থানার পেছনে সিমসন বরাহ-র হাড়গোড়ের ছোটখাটো একটি ঢিবি দেখেছিলেন।

সে এলাকায় বাঘও ছিল যথেষ্ট। সিমসন ও তাঁর সাথীরা একবার ২৩টি বাঘ

হত্যা করেছিলেন। সিমসন জানিয়েছেন, বাঘরাই বরাহপাল নিকেশ করে ফেলতে পারবে। আরো লিখেছেন, বাঙালি পুলিশ সাধারণত ছোটখাটো বন্য প্রাণীই শিকার করতে পারে।

বংশী নদীর পশ্চিমে, ভাওয়াল জঙ্গল ঘেঁষে টিকরির সমতলভূমিতেও ছিল শিকারের উত্তম জায়গা। সিমসন লিখছেন, এ এলাকায় নানা রকমের শিকার পাওয়া যায় এবং তার মতে তার কাছে এটিই ছিল 'চয়েসেস্ট স্পষ্ট'। তখন গুজব শোনা যায় ঢাকায় যাওয়ার জন্য এ অঞ্চল দিয়ে রেল লাইনে যাবে। সিমসন লিখেছেন, তা গেলে শিকারের জন্য কোনো কিছু পাওয়া দুস্কর হয়ে উঠবে।

আসলে বরাহ পূর্ববঙ্গের সব জায়গায়ই কম বেশি পাওয়া যেতো। গোয়ালন্দে লর্ড মেয়োকে (গভর্নর জেনারেল) শিকারে নিয়ে গিয়েছিলেন সিমসন এবং গভর্নর জেনারেল বলেছিলেন, বহুদিন পর চমৎকার এক শিকারের জায়গায় তিনি এসেছেন। এছাড়া পাবনা, দিনাজপুর, রংপুর, রামপুর বোয়ালিয়া–সব এলাকায়ই সাহেবরা বরাহ নিধন করে বেড়াতেন।

শিকারে গেলে তারা কি পরিমাণ শিকার করতেন? একটি উদাহরণ দিচ্ছি। এতে বোঝা যাবে, আসলে পূর্ববঙ্গের নিসর্গ কেমন ছিল এবং বন্য পশুপাখির সংখ্যাও বা কী ছিল। সিমসন একদিন শিকারে গিয়ে দু'টি হরিণ, চারটি খরগোশ ও প্রায় ১০৬টি বনমোরগ, কবুতর শিকার করেছিলেন। আরেকদিন (১৮৪৭) ব্রহ্মপুত্রের চরে পাঁচটি বাঘ শিকার করেছিলেন।

আর্থার লয়েড ক্লে সিভিলিয়ন হয়ে কলকাতায় পা রেখেছিলেন ১৮৬২ সালে। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি কাজ করেছেন। এসব এলাকা ও মানুষজন সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আছে তাঁর আত্মজীবনীতে। আর বিবরণ আছে পিগ স্টিকিং এবং অন্যান্য শিকার কাহিনীর।

ক্লে'র প্রথম পোস্টিং ছিল চাঁটগায়। জুনিয়র কর্মকর্তা হিসেবে আরামেই ছিলেন সেখানে। অবসর সময়টা র‍্যাকেট খেলে, নাচের আসরে যোগ দিয়ে আর শিকার করে কাটাতেন।

চাঁটগা ছিল তখন জঙ্গলাকীর্ণ। দিনে দুপুরেও সেখানে শোনা যেতো বাঘের গর্জন। ক্লে চাঁটগা পৌঁছার এক সপ্তাহের মধ্যে দু'টি বাঘ মেরে আনা হলো সরকারি পুরস্কারের জন্য। ষ্টেশনের সুন্দর একটি রাস্তার নাম ছিল 'টাইগার পাস'– দু'পাহাড়ের মাঝ দিয়ে চলে গেছে সমুদ্র বরাবর। এই জায়গা দিয়ে খুব সম্ভব বাঘ চলাচল করতো তাই এই নাম। 'লেপার্ড পাস' নামেও জায়গা ছিল। খোঁড়া একটি চিতা নাকি সেখানে ঘোরাফেরা করতো। পরে অবশ্য তাকে মেরে ফেলা হয়। ক্লে জয়েন করার কয়েকদিনের মধ্যে একদিন দুপুরে বাঘ আক্রমণ করলো দু'জন নেটিভকে। এ আক্রমণে পা হারালো একজন। ক্লে লিখেছেন, সে কারণে পরিণত

হয়েছে সে একজন সুবিধাভোগী ভিক্ষুকে। এছাড়া শহরের আশেপাশের জঙ্গলে পাওয়া যেতো প্রচুর বনমোরগ, স্নাইপ। একদিন ক্লে শুনলেন, র‍্যাকেট কোর্টের (শহরের কেন্দ্রে) পাশে দাঁড়িয়ে ডাকছে একটি হরিণ।

চাঁটগার পর ছিলেন তিনি কুমিল্লায়। সেখানে ক্লে পুলিশ সুপার, সার্ভে সুপারিনটেনডেন্ট ও কালেক্টর মিলে একটি দল করেছিলেন। প্রতিদিন সকালে তারা শিকারে বেরুতেন। খেঁকশিয়াল, বাগদাশ যাই চোখে পড়তো তার পিছেই দৌড়াতেন। একদিন ক্লে খবর পেলেন, বিবিরহাটের কাছে জঙ্গলে বাঘ গরু মেরে গেছে। খবর শোনার পরদিন ক্লে সারাটা বিকেল কাছাকাছি অপেক্ষা করতে লাগলেন, ঝিঁঝির ডাক ছাড়া চারদিকে আর কোনো শব্দ নেই। যতই সময় যেতে লাগলো ততই চারদিক ঝিঁঝির ডাকে মুখরিত হয়ে উঠলো। কিন্তু, ব্যাঘ্র মশাই এলেন না। ক্লে যখন ফিরছেন তখন কয়েকটি কুটির থেকে ভয়ার্ত প্রশ্ন শোনা গেল 'বাঘ গিরা?'

কুমিল্লার পূর্বে পাহাড় ঘেঁষে ছিল বিরাট এক ঝিল। পেকপাড়া, বালিম, কোরা, জলপিপি নানা ধরনের পাখি পড়তো ঝিলে। ক্লে মাঝে মাঝে সেখানে যেতেন শিকারে। ঐ ঝিলের পাড়েই তার সঙ্গে একদিন দেখা হলো ফেঞ্জা গাজীর। ফেঞ্জা অভিজ্ঞ শিকারি। ক্লে- ফেঞ্জা গাজীকে মাসিক চার টাকা ভাড়ায় নিযুক্ত করলেন শিকারের জন্য। ক্লে'র পোষা দু'একটি প্রাণী ছিল। এদের একটি ছিল ময়নামতি পাহাড় থেকে ধরা হরিণ শাবক ও দু'টি বানর।

১৮৬৮ সালে ক্লে মাদারীপুরের মহকুমা প্রশাসক নিযুক্ত হলেন। মাদারীপুর পৌঁছে কয়েক দিনের মধ্যে ক্লে প্রশাসনিক কাজকর্ম গুছিয়ে নিলেন। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ছকলেন, তারপর মহকুমা পরিদর্শনে বেরুলেন। সঙ্গে তিনটি নৌকা। একটি তাঁর নিজের, একটি ভৃত্য ও রান্নার জন্য আরেকটিতে ওঠানো হলো তাবু ও মালপত্র।

প্রথমেই পড়লো গৌর নদীর পাড়ে এক পুলিশ থানা তারপর বরিশাল। সেখানে দিন দু'য়েক কাটিয়ে রওয়ানা হলেন কোটালি পাড়া থানার উদ্দেশ্যে। কোটালি পাড়ায় পৌঁছতে জলপথের জাল পেরুতে হয়। এইসব নদী-নালায় আবার আছে কুমির। ক্লে তো রিভলবার দিয়ে একটি বড়ো কুমির শিকার করে ফেললেন। কুমিরটির মাথাটি কেটে স্নাফসুতরো করে রাখা হলো স্মারক হিসেবে।

কোটালিপাড়া একটি মনুষ্যবর্জিত এলাকা। মাঝখানে খানিকটা উঁচু জায়গায় পুলিশ থানা ও তুচ্ছ বাজার। চারদিকের নিচু এলাকা বর্ষায় প্লাবিত হয়ে যায়। ক্লে শুনেছিলেন, কোটালিপাড়া নাকি স্নাইপ শিকারের জন্য ভালো। কিন্তু, মন্তব্য করেছেন, মানুষ বাসের উপযুক্ত নয়। সেখানে ক্লের পরিদর্শনের মোটেই ইচ্ছা ছিল না। তাই কোনোরকমে সেখানে খানিকটা সময় কাটিয়ে ফের রওয়ানা হলেন।

বরিশালে ফিরে কয়েকদিন কাটিয়ে আবার ট্যুর শুরু করলেন ক্লে। ২২ মার্চ পৌঁছুলেন বুড়ির হাট থানায়। পুলিশের চার্জে ছিলেন সেখানে একজন অ্যাংলো। নাম, বেনবো। তিনি জানালেন, এখানে শিকার পাওয়া যায় প্রচুর। মোষ, শুয়োর, চিতাবাঘ, বানর কিছুরই কমতি নেই। শিকারে বেরিয়ে দু'বার শুয়োরের দেখা পেলেন বটে ক্লে কিন্তু মারতে পারলেন না। দু'একটা পাখি শিকার করলেন মাত্র।

এপ্রিলের শুরু থেকে গরম পড়তে লাগলো, ট্যুরের সিজন শেষ হয়ে এল। সকালে ব্যায়াম করার জন্য হাতে বল্লম নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেরুতেন। উদ্দেশ্যে– নেড়ি কুত্তা মারা। সাধারণত ছোট বল্লম ব্যবহার করা হতো পিগ স্টিকিং-এ।

ইস্টারের দিন ক্লে খবর পেলেন বরাহের খোঁজ পাওয়া গেছে। লাঠি হাতে কয়েকজন ভৃত্য, বাড়তি কিছু বল্লম নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বেরুলেন। বরাহের খবর দিয়েছিলো ক্লের মুচি। বরাহের মাংসের তারা ভক্ত। এই মুচি, ঋষি এবং বুনওয়ারা কুকুর নিয়ে লাঠি হাতে বরাহের শিকার করে। তারা দু'টি বড় আকারের বরাহ হত্যা করলেন। তিনটি বরাহ শাবক ধরা হলো জ্যান্ত।

১৮৬৭ সালে ক্লে ঢাকা এলেন জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে। এর আগে মুন্সিগঞ্জে ছিলেন কিছুদিন। ঢাকায় থাকার সময় সিভিলিয়ানরা প্রায়ই দল বেঁধে যেতেন শিকারে। জমিদার গনি মিয়া হাতি দিয়ে সাহায্য করতেন। বেশির ভাগ সময়ই পিগ স্টিকিংয়ে যেতেন।

ঢাকায় এসেই গিয়েছিলেন ঢাকার উত্তরে জঙ্গলে যা মধুপুর হয়ে গারো পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত। ঢাকা ময়মনসিংহ রেল লাইন এই এলাকার ওপর দিয়ে গেছে। সিমসন আগে এর কথাই লিখে গেছেন। ক্লে লিখেছেন যা সিমসনের বক্তব্যই সমর্থন করে যে, তখনকার দিনে এই এলাকা ছিল ঢাকার শিকারিদের লীলাভূমি। তখন স্নাইপ থেকে বাঘ সবই পাওয়া যেতো সেখানে। ক্লে তখনও সেখানে দেখেছেন, হরিণ চরে বেড়াচ্ছে। কালো রঙের তিতিরও ছিল প্রচুর। পদ্মার তীরে এক জঙ্গলাকীর্ণ চরেও গিয়েছিলেন ক্লে ও তাঁর সঙ্গীসাথীরা। সঙ্গে নিয়েছিলেন হাতি। তবে, খুব একটা সুবিধা করতে পারেন নি। ঢাকা ও ফরিদপুরের মাঝামাঝি চর মুকুন্দিয়ায়ও গিয়েছিলেন একবার মহিষ শিকার করতে। তবে, মহিষ আর ভাগ্যে জোটেনি, গোটা দুয়েক বরাহ শিকার করেছিলেন মাত্র।

রাণীর জন্মদিন উপলক্ষে টঙ্গীতে একবার পিগ স্টিকিংয়ের আয়োজন করা হয়েছিলো। কালেক্টরসহ সব সিভিলিয়ান গিয়েছিলেন দল বেঁধে। শিকার করলেন খরগোস, হরিণ, তিতির আর সবুজ কবুতর। ক্লে পিগ স্টিকিং-এর আরো বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর বইতে। একই রকমের বিবরণ দেখে আর তার পুনরুক্তি করলাম না।

সিভিলিয়ানদের একটি অংশ ভারত চর্চা করে গেছেন এবং গভীরভাবে।

এশিয়াটিক সোসাইটি তারা সে উদ্দেশ্যেই করেছিলেন। অনেকে ইতিহাস চর্চা করেছেন, জরিপ করেছেন, গেজেটিয়ার রচনা করেছেন, বিভিন্ন বিষয়ে লিখে গেছেন অজস্র রিপোর্ট। সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কথা বাদ দিই, নিছক তথ্যের দিক থেকে বিচার করলেও তা সমৃদ্ধ। অনেকে এসব রিপোর্ট/ইতিহাস/বিবরণ রচনার কাজ আগ্রহের সঙ্গে নিতেন। কারণ, তাতে নিয়ত ভ্রমণ একঘেঁয়েমি কাটতো, রুটিন চাকুরি থেকে মুক্তি পাওয়া যেত। সবচেয়ে বড় কথা অর্থের সমাগমও হতো। এবং ভালো পরিমাণে। এ বিষয়টি কেউ উল্লেখ করেননি। আমার শিক্ষক অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে এধরনের সিভিলিয়ানদের ইতিহাস চর্চার ওপর অভিসন্দর্ভ রচনা করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে আর্থিক প্রণোদনা কাজ করেছে এবং এ কারণে কীভাবে বিভ্রান্তিকর তথ্য যুক্ত হয়েছে ও সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের বিষয়টি এসেছে। দেখা গেছে বিখ্যাত উইলসন হান্টারও অর্থের জন্যে কী বিপুল আগ্রহে রিপোর্টের কাজ নিজে থেকে বেছে নিয়েছিলেন [এ কারণে, অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেনকে পিএইচডি না দিয়ে এম.ফিল ডিগ্রি দেয়া হয়। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক পিএইচডি দেখেছি যা উল্লিখিত বইয়ের মানের সমান নয়। সেজন্যই এ অনুমান। সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব মননেও কীভাবে কাজ করে এগুলি তার ছোটখাটো উদাহরণ]।

এতো উনিশ শতকের কথা। বিশ শতকেও এমনটি ঘটেছে। ড্যাশ ও 'ম্যালি সম্পর্কে লিখেছেন– তিনি তাঁর চাকুরি ছাড়াও

"worked up an extremely profitable system of writing up the District Gazetteer without having had any district experience. He sat in Calcutta and collated what other who had experience, wrote. and for his labour he netted Rs 1000/= for each Gazetteer."[১৭৬]

এর সঙ্গে ছিল ছবি আঁকার বিষয়। এ বিষয়টি নিয়ে তেমন আলোচনা হয়নি কোথাও। তাই এ বিষয়টি এখানে অপ্রাসঙ্গিক মনে হতে পারে। কিন্তু, তা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয় দেখে খুব সংক্ষেপে তা আলোচনা করবো।

কী পরিমাণ ছবি সিভিলিয়ানরা এঁকেছিলেন তা বোঝা যাবে ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে রক্ষিত স্কেচ, জলরং ও অন্যান্য মাধ্যমে আঁকা ছবির পরিমাণ দেখলে। ১৯৬৯ সালে মিলড্রেড আর্চার এক হিসেবে জানিয়েছিলেন এর সংখ্যা ১০,৯৭৬টি। এখন মনে হয় তা কুড়ি হাজার ছাড়িয়েছে। কারণ দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির ব্যক্তিগত কাগজপত্রেও ড্রইং, জল রঙ পাওয়া যাচ্ছে। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি ইতোমধ্যে চারখণ্ডে তালিকা প্রকাশ করেছে। কিন্তু তা অসম্পূর্ণ।[১৭৭]

আর্চার তাঁর তালিকার দুই খণ্ডে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, এসব ছবির একটি বড় অংশ পেশাদারদের আঁকা নয়, আঁকা অ্যামেচারদের,

আর এসব অ্যামেচাররা ছিলেন সিভিলিয়ান। দু'কারণে, অ্যামেচাররা আঁকতেন। অবসর সময় বা একঘেঁয়ে সময় কাটানোর জন্য বৈচিত্র্যপূর্ণ নিসর্গ বা স্থাপত্য যা তাদের আকর্ষণ করতো। বা নিজ দেশে বিবরণ পাঠাবার সময় সে সব স্কেচও পাঠাতেন। এ ছাড়া সরকারি কর্তব্য হিসেবেও আঁকতেন। কোম্পানি পরবর্তীকালে সরকার বিভিন্ন অঞ্চল জরিপের জন্য সিভিলিয়ানদের পাঠিয়েছেন। এরমধ্যে সামরিক বেসামরিক দু'পক্ষই আছে। পরবর্তীকালে ক্যামেরা চালু হলে সিভিল সার্জনদের বলা হয়েছিলো বিভিন্ন বিষয়ে ছবি তুলতে যা সদর দপ্তরে নিয়মিত পাঠানো হতো। এ ধরনের এক বিশাল সংগ্রহ আছে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে।

আর্চার জানিয়েছেন, ১৭৮০ থেকে ছবির সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং বিশশতকের শুরু পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। ১৭৮৫ থেকে ১৮১০ সালের মধ্যে আঁকা স্কেচগুলি প্রধানত মাদ্রাজ, বাংলা ও মহিশূরের নিসর্গ। ১৮১০ থেকে ১৮৩০ সালে উত্তর ও দক্ষিণ ভারত। পশ্চিম ভারতের চিত্র তুলনামূলকভাবে কম। এ সময়টা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের যুগ। বিভিন্ন অঞ্চলের ড্রইং এর প্রমাণ।

অংকন, ইংরেজ লিবারেল শিক্ষা ব্যবস্থায় স্থান করে নিয়েছিলো। অষ্টাদশ দশকের শেষ ভাগে তা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং স্কুল/বাসায় শিক্ষক রেখে ড্রইং চর্চা শুরু হয়। উনিশ শতকে জলরং, ছাপচিত্র জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৮৮৮ সালে ভিক্টোরিয়া আলবার্ট মিউজিয়াম ও ন্যাশনাল আর্ট লাইব্রেরির একটি তালিকায় দেখা যায় ১৭৫০ পর্যন্ত অংকন শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা পাঁচশোরও বেশি।

সিভিলিয়ান হয়ে যারা ভারতে আসতেন তাদের শিল্পচর্চার এ ধরনের প্রাথমিক একটি ব্যাক গ্রাউন্ড থাকতো। এর মধ্যে যারা আদিসকম্ব থেকে সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে ক্যাডেট হিসেবে চাকুরিতে যোগ দিতেন তাদের ড্রইংয়ের ব্যাপারটা জানতে হতো এবং এ বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণও দেয়া হতো। যেমন, কোনো অঞ্চলে গেলে দুর্গ, সাঁকো, বিভিন্ন স্থাপনার ড্রইং করতে হতো তথ্য সংগ্রহের অংশ হিসেবে। হেইলিবাড়িতে ১৮০৬ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ২০০০ তরুণকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিলো। এদের সবাইকে ড্রইং শিক্ষা দেয়া হয়েছিলো।

এ সময় 'পিকচারেস্ক' ছবির প্রতি সাধারণের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। ফলে, সিভিলিয়ান শুধু নয় পেশাদার শিল্পীরা এ ধরনের ছবি এঁকেছেন। ১৮৫৭ সালের পর ঐ সময়ের ঘটনাবলির ওপর আকা ছবির চাহিদা বেড়ে যায়। ইংল্যান্ডের অনেকে কোথায় কী ঘটেছে, কীভাবে ঘটেছে তা জানতে চাইতেন, সিভিলিয়ানরাও চিঠির সঙ্গে স্কেচ পাঠাতেন। অ্যামেচার বা সিভিলিয়ানদের অনেকে এচিং করে ছেপেছেন নিজ খরচে। ডয়লিতো পাটনায় লিথোগ্রাফ মেশিনও বসিয়েছিলেন। তাদের প্রকাশিত গ্রন্থে এচিং সন্নিবেশিত করেছেন। এগুলি এখন আমাদের

সামাজিক ইতিহাস রচনার উপাদান হিসেবে বিবেচিত।[১৭৮]

পূর্ববঙ্গে থেকে পূর্ববঙ্গের যে সব ছবি এঁকেছেন সিভিলিয়ানরা সেগুলি আমি দেখার চেষ্টা করেছি, সংগ্রহেরও। তবে, এর সংখ্যা খুব বেশি নয়। উপরোল্লিখিত সবধরনের বৈশিষ্ট্যই এতে বিদ্যমান। কেউ নিছক সময় কাটানোর জন্য ড্রইং করেছেন। কেউ তার গ্রন্থের বিবরণে সম্পূর্ণতার জন্য এঁকেছেন (যেমন ক্লে, বা টেইলর) কেউবা পিন্সচারেস্কর দিকে মনোযোগ দিয়েছেন (যেমন, ডয়লি, ফিলিপস, বিমস প্রমুখ)। তবে, এসব ছবিতে মানুষের উপস্থিতি কম, থাকলেও তা বিদ্রুপাত্মক। তাঁদের ঝোঁক ছিল নিসর্গ, ভৃত্য। মানুষের সঙ্গে যোগাযোগহীনতা। এর একটি কারণ হতে পারে।

এসব ছবির মান বিচারে আমি যাবো না। কিন্তু, এগুলি দেখে আমার মনে হয়েছে, এতে প্রাণোচ্ছ্বাস নেই, আনন্দ নেই। আছে দীর্ঘশ্বাস, নিঃসঙ্গতার আর্তি। প্রায় ক্ষেত্রেই মনে হয়, আঁকতে হবে, আঁকতে হয়েছে। (ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, যেমন, ডয়লি বা কোলসওয়ার্দি গ্র্যান্ট) যে স্বপ্ন নিয়ে দরিদ্র সিভিলিয়ান এসেছিলেন ভারতবর্ষে (বাংলায়), সে সিভিলিয়ান যতদিন ভারতে থেকেছেন জাঁকজমকের সঙ্গে থেকেছেন, ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছেন কিন্তু পরিবারপরিজন ছাড়া একা একাই তাঁকে কাটাতে হয়েছে। নিজেদের মধ্যে সেই সঙ্গে অর্ন্তদ্বন্দ্বও কম ছিল না। পরিবার থাকলেও দেশি মানুষের সমুদ্রে ছিল তা দ্বীপের মতো। কমপিটিশনআলারা বক্সঅলাদের পছন্দ করতেন না। মফস্বলে থাকলে নীলকর বা ব্যবসায়ীদের থেকে সুবিধা নিতেন, সাহচর্যও পেতেন কিন্তু তাদেরও পছন্দ করতেন না। অবসর গ্রহণের পরপর এসব ক্ষমতা, জাঁকালো জীবনযাপন সব মিলিয়ে গেছে, তখন আরেক রকমের শূন্যতা বোধে আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের নিজের দেশও দেখা হয়নি, বিদেশও নয়। ভারতে এসে সব পেলেও মেট্রোপলিটনকে কখনও ভুলতে পারেন নি সেটিই মনোবেদনার কারণ ছিল সবসময়। এ প্রসঙ্গে উনিশ ও বিশ শতকের দু'টি উদাহরণ দিয়ে শেষ করবো।

এক্স সিভিলিয়ান প্রথমবার ফার্লোতে গিয়ে নিজের অনুভূতি বর্ণনা করে লিখেছিলেন, যে পৃথিবীর এক প্রান্তে নির্বাসিত হয়েছিলো, সেই একমাত্র সঠিক ভাবে দেশ ('হোম') ও সভ্যতার মূল্যায়ণ করতে পারবে। "There is a sense of potential enjoyment in taking up a news paper and reading through the entertainments to which it is possible to go. It is also so small thing to be able to walk about all day; I shall never forget the sensation of picking an apple for the first time after my return, and afterwards stealing a little cream form the dairy, when down at my fathers place in Sussex.."[১৭৯]

বিশ শতকের গোড়ার দিকে স্যান্ডহার্স্ট থেকে পাশ করা তরুণ সামরিক অফিসার ফ্রানসিস ইয়েটস ব্রাউন এলেন বেরিলিতে। তিনি লিখলেন–

কোনো ভৃত্যকে ডাকতে হলে আমাকে শুধু হাঁক দিয়ে বলতে হতো কোই হ্যায়? আসবাবপত্র, একটি কাশ্মিরী ফেল্ট কার্পেট, মোরাদাবাদী অলঙ্কার, খরচার জন্য রৌপ্যমুদ্রা। ঘোড়া, স্যাম্পেন, সিগার, যা কিছু চাই তার জন্য এক টুকরো কাগজে শুধু সই করলেই চলতো। আনন্দময় জীবন। কিন্তু এতসব ভৃত্য, সালামের মাঝে অনুভব করতাম, নিঃসঙ্গতার, যেন আমি চিড়িয়াখানার খাঁচায় আবদ্ধ একটি শ্বেত মর্কট যার পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে– "This incredibly beige race."

জুডির পিঠে চড়ে বেরিলির জমাট বাজারে মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে বা গ্রাম্যমন্দির পেরিয়ে, হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত বালুময় সমতল দুলকি চালে পেরুবার সময় শিউরে উঠতাম "at the millions and immensities and secrecies of India. I liked to finish my day at the club, in a world whose limit we knew and where people answered my back. An incandescent lamp coughed its light over shrivelled grass and dusty shrubbery; in it circle of illumination exiled heads were bent over English newspapers, their thoughts far away, but close to mind: Outside, people prayed and plotted and mated and died on a scale unimaginable and uncomfortable. We English were a caste. White overlords or white monkeys- It was all the same. The Brahmian made a circle within which they cooked their food. so did we, we were a caste; pariahs to them, princes in our own estimation."[১৮০]

॥ ১২ ॥

পূর্ববঙ্গ যে সব সিভিলিয়ান কাজ করেছেন, তাদের মধ্যে বরার্ট লিন্ডসের লেখা আত্মস্মৃতিটিই সবচেয়ে পুরনো। লিন্ডসে পূর্ববঙ্গে [এবং কলকাতায়] ছিলেন ১৭৭২ থেকে ১৭৮৮ পর্যন্ত। এর বেশিরভাগ সময়ই, প্রায় একযুগ কাটিয়েছেন সিলেটে। এসেছিলেন 'বনেদী' কিন্তু গরিব পরিবার থেকে, ফিরেছেন জমিদার হয়ে। রবার্টের অন্যান্য ভাইরাও ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে পড়েছিলেন। কেউ স্পেনে, কেউ চীনে, কেউবা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে। সবাই কম বেশি সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তবে ভাইদের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ কমই হয়েছে বা হয়নি। উল্লেখ্য রবার্টরা ছিলেন আট ভাই ও তিনবোন। ভাইদের স্মৃতিচারণের সঙ্গে নিজের স্মৃতিচারণ যুক্ত করেন। অর্থাৎ পরিবারের অনেকের স্মৃতিকাহিনী 'অরিয়েন্টাল মিসসেলানিস' নামে প্রকাশিত হয় ব্রিটেনের উইগান থেকে ১৮৪০ সালে। রয়েল সাইজের ২৯৫ পৃষ্ঠায়

ঝকঝকে গ্রন্থটির পুরো নাম–

Oriental Miscellanies: comprising Anecdotes of an Indian life by the Hon. Robert Lindsay; Narratives of the Battle of Conjeveram, d.c., by the Hon-James and John Lindsay; Journal of an Imprisonment in Seringapatam, by the Hon. John Lindsay; An Adventure in China, by the Hon. Hugh Lindsay.

রবার্ট লিন্ডসের স্মৃতিকাহিনীর নাম 'অ্যানেকডটস অফ অ্যান ইন্ডিয়ান লাইফ' এখানে 'লিন্ডসে সাহেবের সিলেটে গমন' নামে সংকলিত হলো। বরার্ট লিখেছেন তিনকন্যার চাপে পড়ে ১৮২১ সালে তিনি আত্মস্মৃতিটি রচনা করেন যদিও তখন তিনি অসুস্থ।

রবার্ট লিন্ডসের আত্মস্মৃতি কয়েকটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। অষ্টাদশ শতকে পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশে যারা নিযুক্ত ছিলেন তাদের আত্মজীবনী প্রায় নেই। লিন্ডসেরটিই এর মধ্যে একটি এবং পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে কোনো সিভিলিয়ানের প্রথম বিবরণ।

এ গ্রন্থের শুরুতে উল্লেখ করেছি প্রথম দিকে কারা আসতেন রাইটার হয়ে ভারতবর্ষে। লিন্ডসের বিবরণ তা সমর্থন করে।

লিন্ডসে যখন ভারতবর্ষে নামেন তখন কোম্পানি শাসনের প্রথম যুগ। ব্যক্তিগত ব্যবসা ও চুরি চামারির প্রভূত সুযোগ ছিল যা আগে উল্লেখ করেছি। লিন্ডসে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন। হদ্দ গরিব হয়ে ভারতে নেমেছিলেন, ফিরে যান দেশে জমিদার হয়ে।

রবার্ট লিন্ডসের অর্থ উপার্জন প্রক্রিয়া, কোম্পানির রাইটারদের মধ্যে পক্ষ নিয়ে অর্ন্তদ্বন্দ্ব, প্রমোশনের জন্য 'ঘুষের' ব্যবহার সবকিছুরই উল্লেখ আছে এ বিবরণীতে যা আমাদের গ্রন্থের প্রথমাংশে উল্লিখিত বিবরণের সঙ্গে মিলে যাবে। ঐ বিশেষ সময়টি বোঝার জন্য লিন্ডসের বিবরণটি বিশেষ উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। কোম্পানি আমলের প্রথমদিককার অর্থাৎ কর্নওয়ালিসের সংস্কারের আগে প্রশাসনিক অরাজকতা, ভারতবর্ষে শোষণ প্রক্রিয়ার শুরু– এসব কিছুর সাক্ষী লিন্ডসের বিবরণ।

১৭৭২ সালে লিন্ডসে পা রাখলেন কলকাতায়। এখানে উল্লেখ্য যে, ভাগ্যদেবী সব সময় সুপ্রসন্ন ছিলেন লিন্ডসের ওপর। কারণ, শুরু থেকেই দেখি তিনি ভালো পোস্টিং পেয়েছিলেন। এবং জীবনের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হননি। তাঁর মতো এত কম বয়সে কেউ কালেক্টর হয়েছিলেন কিনা জানি না। লক্ষ্য অর্জিত হলে তিনি আবার ফিরে গিয়েছিলেন নিজ দেশে।

লিন্ডসে যখন সিলেট পৌঁছেন তখন সিলেটের জনসংখ্যা কত তা জানা

পায়নি। তবে, ১৮১৩ সালের এক হিসেবে জানা গেছে তখন সিলেটের লোকসংখ্যা ছিল দেড় লক্ষ। লিন্ডসের সময় নিশ্চয় লোকসংখ্যা ছিল এক লক্ষ বা তার কম। পুরো অঞ্চলটি ছিল অরণ্যাবৃত যার বিবরণ লিন্ডসের আত্মজীবনীতেই আছে।

সিলেটের প্রথম কালেক্টর ছিলেন ঔপন্যাসিক উইলিয়াম ম্যাকপিস থ্যাকারের পিতামহ। সিলেটে তিনি ব্যবসা করে প্রচুর বিত্ত উপার্জন করেছিলেন। থ্যাকারের পর কালেক্টর হয়েছিলেন সোমনার, হল্যান্ড, লিন্ডসে। লিন্ডসের পর তাঁর সহকারী হিন্ডম্যান এবং তারপর উইলস। এঁদের মধ্যে থ্যাকারের পর লিন্ডসেই উপার্জন করেছিলেন বেশি। আর লিন্ডসে নিজেই তো লিখেছেন, তিনি শুধু নিছক চাকরি করতেই আসেননি। তিনি এসেছেন অর্থ উপার্জন করতে এবং তা দোষের ছিল না। পরে, অবশ্য কোম্পানির চাকুরেদের ব্যক্তিগত ব্যবসা বন্ধ করে দেয়া হয়। লিন্ডসে তখন ইংল্যান্ডে।

১৭৮৯ সালে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও কর্নওয়ালিসের প্রশাসনিক সংস্কারের অনেক আগেই ফিরে গিয়েছিলেন লিন্ডসে।

লিন্ডসের বিবরণটি চিত্তাকর্ষক। বোঝা যায় বাংলা (ভারতবর্ষ) কে তখনও রাইটাররা দেখেছেন অ্যাডভেঞ্চার হিসেবে। অন্য আরেকটি দিক হচ্ছে, ইংল্যান্ড থেকে ভাগ্যান্বেষণে কতো অল্পবয়সে তারা দেশত্যাগ করতেন। লিন্ডসে দেশত্যাগ করেছেন মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে। তাঁর বাবার মৃত্যুর পর তাঁর মামা তাঁকে এবং তাঁর ভাই কলিনকে নিয়ে আসেন লন্ডন। সেখানে কলিনকে ভর্তি করে দেন রোজ অ্যাকাডেমিতে আর রবার্টকে তুলে দেন স্পেনগামী এক জাহাজে যেখানে তার আরেক মামা থাকেন। সেখানে অনেক ঘাটের পানি খেয়ে আঠারো উনিশ বছরে কলকাতায় পা রাখেন। ছোটভাই কলিনের সঙ্গে দেখা হয় অনেক পরে যখন তিনি ফিরে আসেন লন্ডন। কলিন তখন একজন জেনারেল, আবার এক ভাইয়ের সঙ্গে তো তাঁর আর দেখাই হয়নি।

অ্যাডভেঞ্চারার লিন্ডসে সেই সময় কোম্পানির রাইটারদের 'বড় হওয়ার' রাজনীতিটি সম্যক বুঝতে পেরেছিলেন দেখেই অল্পবয়সে প্রভূত উন্নতি করেছিলেন এবং সব সময় নিজের অবস্থান ঠিক রাখতে পেরেছিলেন, এবং কোম্পানির চাকুরে হিসেবে যে তিনি বিশেষ কেউ সেটি ভোলেন নি। সিলেটে তাঁর মতো আরো কিছু ইউরোপিয় ছিলো কিন্তু তিনি তাদের সঙ্গে মিশতেন না কারণ তাঁর মতে, তারা এতো নিম্ন পর্যায়ের যে মেশার মতো নয়। অর্থাৎ ভারতবর্ষে ইংরেজরাও যে বহুধা বিভক্ত এবং সেই অষ্টাদশ শতকেই সিভিলিয়ান ও অন্যান্য ইউরোপিয়দের মধ্যে দেখা যায় পার্থক্য সূচিত হচ্ছে। এর একটি কারণ হতে পারে নবাব হবার প্রক্রিয়ায় কোম্পানির চাকুরেরা অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী সহ্য করতে রাজি ছিলো না।

শুধু এসব কারণেই লিন্ডসের বিবরণটি যে চমকপ্রদ তা নয়, অন্য কারণেও

তা গুরুত্ববহ। পূর্ববঙ্গের ভৌগোলিক, পরিবেশগত বিবরণ ছাড়াও সাধারণ মানুষের জীবন যাপন সম্পর্কেও কিছু তথ্য পাই বিবরণে।

হেনরি রবারদিউর আত্মস্মৃতির একটি অধ্যায়– 'এমিউজমেন্ট ইন দি কান্ট্রি'র ভাবানুবাদ করেছি 'রবারদিউর ময়মনসিংহ: দুশো বছর আগে', শিরোনামে।

লিন্ডসের সঙ্গে রবারদিউর বিবরণে পার্থক্য আছে। রবারদিউ যখন সিভিলিয়ান তখন কর্নওয়ালিসের সংস্কার সাধিত হয়েছে। তাই রবারদিউর বিবরণে অ্যাডভেঞ্চার নেই, টাকা রোজগারের, নেই বিবরণ। 'সিভিলিয়ান' প্রত্যয়টি তখন একটি রূপ পাওয়ার পথে। প্রান্তিক একটি স্টেশনে একজন সিভিলিয়ান কীভাবে জীবনযাপন করে রবারদিউর চেয়ে আরো কারো বিবরণে তা এতটা উজ্জ্বল নয়। রবারদিউ লিখেছেন–

"This premised I shall only describe Mymunsing to you, and think you will thence be able to form a tolerably correct idea of country living in India."

তাঁর ভাষায় "বছরের দু তৃতীয়াংশ আমরা বাস করি এক ধরনের শূন্যতার ভেতর।" এই শূন্যতার কথা আগেও উল্লেখ করেছি।

ববারদিউর বিবরণটি আমাদের নতুন গড়ে ওঠে নগর, মানুষজন, পরিবেশ বোঝার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। দুশো বছর আগের ময়মনসিংহের এতো সুন্দর বিবরণ আমরা আর কোথাও পাই না।

রবারদিউ তাঁর স্মৃতিকথায় নিজের সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য জানান নি। কোথায় ছিলেন, কীইবা তার পরিচয় কিছুই নেই। শুধু জানি ভাগ্য গড়তে এসে অল্পবয়সে ময়মনসিংহেই মারা গিয়েছিলেন।

পুনাতে ইন্ডিয়ান হিস্টোরিকাল রেকর্ডস কমিশনের এক অধিবেশন হয়েছিলো। প্রদর্শিত হয়েছিলো ঐতিহাসিক নথিপত্র। সেই প্রদর্শনীতে সাঁতারার রাও বাহাদুর ডিবি পারাসনিস একটি পাণ্ডুলিপি রেখেছিলেন। পাণ্ডুলিপিটি ছিলো এক ইংরেজ সিভিলিয়ানের। ক্ষুদ্র কলেবরের এই পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তু ছিলো ১৮০০-১৮০৮ সালের কলকাতা ও ময়মনসিংহের জীবন। 'বেঙ্গল পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট' ১৯২৫ সালে পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশ করে 'এ ইয়াং সিভিলিয়ান ইন বেঙ্গল ইন ১৮০৫' নামে।

'বেঙ্গল পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট' পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে বেশ গবেষণা করেছিলো। পাণ্ডুলিপির শেষে একটি অনুস্বাক্ষর ছিলো। লেখা ছিলো শুধু দু'টি শব্দ 'এইচ. আর'। ইংরেজ সিভিলিয়ানদের লেখা আত্মজীবনীর ক্ষেত্রে এটি ছিলো প্রধান প্রতিবন্ধকতা। লেখক অনেক ক্ষেত্রে নিজের নাম দিতেন না বা ব্যবহার করতেন

আদ্যক্ষর। এই পাণ্ডুলিপির শেষে শুধু লেখা ছিলো– "এই ছোট পাণ্ডুলিপিটি আমি রেখে গেলাম আমার জ্ঞাতি ভাই ল্যমেসুরিয়ারের কাছে, ১৮০৫।" 'বেঙ্গল পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্টে'র সম্পাদক বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট রুমের সুরেশচন্দ্র রায়কে অনুরোধ করেন 'এইচ, আর'টিকে বের করার জন্য। গোয়েন্দার মতো লেগে থেকে সুরেশচন্দ্র লেখকের পরিচয় খুঁজে বের করেন। এই খুঁজে বের করাটাই ইতিহাসের থ্রিল, আনন্দ। ভেবে দেখুন, ১৮০০ সালে তরুণ এক ইংরেজ ময়মনসিংহে চাকরি করতেন। কোথায় ইংল্যান্ড আর কোথায় ময়মনসিংহ। তিনি একটি ছোট পাণ্ডুলিপি রেখে গেলেন। সেটি পাওয়া গেল পুনায়। কলকাতার একজন সাঁতারায় তা দেখে ছাপলেন 'বেঙ্গল পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট'-এ। আর দু'শো বছর পর আমি বাঙালি পাঠকদের কাছে তুলে ধরছি সে সময়ের ময়মনসিংহের জীবন।

প্রথমে দেখা যাক, সুরেশচন্দ্র লেখক সম্পর্কে কী কী তথ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। রেকর্ডপত্র খুঁজে তিনি বের করেছেন এইচ,আর আদ্যাক্ষরের ব্যক্তিটির পুরো নাম হচ্ছে আইজাক টওনলি রবারদিউ। ১৭৯৯ সালের ২৯ আগস্ট তিনি কোম্পানির রাইটার হিসাবে নিয়োগ পান। ১৮০১ সালের ২৩ জুন নিযুক্ত হন ময়মনসিংহের সহকারী কালেক্টর। ১৮০৩ সালের ১১ আগস্ট জিলা বা জেলা জজের রেজিস্ট্রার পদ লাভ করেন। ১৮০৫ সালে কিছুদিনের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট এবং জজ হিসাবে ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। ১৮০৭ সালে নিযুক্ত হন জেলার জজ এবং ম্যাজিস্ট্রেটের সহকারী হিসাবে। পরের বছর রোগাক্রান্ত হয়ে এক মাসের ছুটি নেন। ইচ্ছে ছিলো নদীতে নৌকায় ঘুরেফিরে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার। কিন্তু তাঁর সে বাসনা পূর্ণ হয়নি। ১৮০৮ সালের ২৮ এপ্রিল ময়মনসিংহে তিনি মারা যান। কিন্তু ময়মনসিংহে ইউরোপিয়ানদের কবরস্থান ও রেকর্ডপত্র ঘেঁটে তৎকালীন জেলা শাসক এইচ.টি টুইনাম জানিয়েছিলেন রবারদিউ নামে কোনো নাম নথিপত্রে নেই। এবং সবচেয়ে পুরনো কবরটি হচ্ছে ১৮২১ সালের।

সংক্ষেপে এই হচ্ছে রবারদিউর জীবনালেখ্য। নথিপত্রে তিনি নাম স্বাক্ষর করতেন হেনরি রবারদিউ নামে। সে কারণে পাণ্ডুলিপিতে আধ্যক্ষর এইচ.আর ব্যবহার করেছিলেন। অনুমান করছি ১৭৯৯ সালে ইংল্যান্ড থেকে চাকরির আশায় রবারদিউ ভারতবর্ষে বা কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁর লেখা থেকে আন্দাজ করতে পারি, চাকরি নিয়ে নয়, চাকরির সুপারিশ নিয়ে তিনি কলকাতায় পা রেখেছিলেন এবং সুপারিশের জোরে কোম্পানিতে রাইটারের চাকরি পেয়েছিলেন। ১৮০১ থেকে ১৮০৮ পর্যন্ত তিনি ময়মনসিংহেই কাটিয়েছেন এবং সেখানেই এই পাণ্ডুলিপিটি রচনা করেছিলেন।

'বেঙ্গল পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট'র সম্পাদক জানিয়েছেন, ১৮০৩-৫ সালের ময়মনসিংহের কথাই লিখেছেন রবারদিউ। আসলে তা নয়। পাণ্ডুলিপিটি দু'ভাগে

বিভক্ত। প্রথম ভাগে একজন সিভিলিয়ানের (তাঁর নিজের) কলকাতায় আগমন ও ১৮০০ সালের কলকাতা সম্পর্কিত বিবরণ আছে। ১৮০১ থেকে ১৮০৮-এই সাত বছর রবারদিউ ছিলেন ময়মনসিংহে। সুতরাং ময়মনসিংহের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তিনি পাণ্ডুলিপিটি তৈরি করেছেন। ময়মনসিংহে তাঁর মৃত্যু হলে কবরও দেয়া হয়েছিলো নিশ্চয় ময়মনসিংহে। তার চিহ্ন আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। কারণ ঐ সময় ময়মনসিংহে তিন-চারজনের বেশি ইংরেজ ছিলেন না। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কাগজপত্র হাতবদল হতে হতে গিয়ে পড়ে ল্য মেসুরিয়ারের কাছে। হয়ত রবারদিউর আত্মীয় ছিলেন তিনি। কারণ নাম দেখে মনে হয় দু'জনেরই আদি নিবাস হয়ত ছিলো ফ্রান্স। রবারদিউর পাণ্ডুলিপির আকর্ষণ ছিলো ময়মনসিংহের কয়েকটি স্কেচ। 'বেঙ্গল পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট' মাত্র দু'টি স্কেচ ছেপেছিলো। বাকিগুলো খুব সম্ভব হারিয়ে গেছে।

আমি এখানে শুধু তাঁর কলকাতায় আগমন ও ময়মনসিংহের জীবনযাপন সংক্রান্ত দু'টি অধ্যায়ই তুলে ধরব।

কলকাতায় একজন সিভিলিয়ানের আগমন ও জীবন সম্পর্কে অনেক লেখা আছে। এখানে তৃতীয় ব্যক্তির জবানীতে রবারদিউ সে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন, যদিও অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না অভিজ্ঞতাটি তাঁর নিজেরই। এবং সে কারণেই এ অংশটি তুলে ধরেছি। তাছাড়া সেটি আমার গবেষণার পরিধির বাইরে দেখে তা নিয়ে আর আলোচনা করলাম না।

উল্লেখ্য, আমার জানা মতে, কোনো সিভিলিয়ানের লেখা ময়মনসিংহের বিবরণের মধ্যে এটিই সবচেয়ে পুরনো। ১৮৪০ সালের একটি বিবরণও আমি সম্প্রতি খুঁজে পেয়েছি। পরবর্তীতে সে সম্পর্কেও আলোচনা করা যাবে।

বর্তমান গ্রন্থে যে সব বিবরণ সংকলিত হয়েছে তার মধ্যে একেবারে ভিন্নতর হচ্ছে ফ্রান্সিস বুখাননের দক্ষিণ পূর্ববাংলায় ভ্রমণ। ১৮০২ সালে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, আরাকান ও মিজোরাম সীমান্ত ভ্রমণ করেছিলেন বুখানন। উদ্দেশ্য সমীক্ষা ও তথ্য আহরণ। বিবরণে বুখানন বা সিভিলিয়ানদের কথা নেই তেমন কিন্তু আছে গোটা দক্ষিণপূর্ব বাংলা সম্পর্কে প্রচুর নতুন তথ্য। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শাসনামলে অনেক সিভিলিয়ান ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনেক তথ্যপদ বিবরণ রেখে গেছেন। এরা নিছক অর্থোপার্জন এদেশে আসেন নি, জ্ঞান আহরণ ও বিতরণও করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের সেই সব রচনা আমাদের সাহায্য করেছে অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের ভারতবর্ষকে বুঝতে। কোম্পানি/পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকার নিজ স্বার্থেও অনেক সিভিলিয়ানকে এসব তথ্যানুসন্ধানের কাজে লাগিয়েছিলেন। এর মধ্যে অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সিস বুখানন ও উনিশ শতকে উইলিয়াম হান্টার বিখ্যাত। অষ্টাদশ শতকের বাংলার কিছু ও বিহার, নেপাল,

বার্মার বিবরণ তৈরি করতে গেলে ফ্রান্সিস বুখাননের তথ্যাবলীর স্মরণাপন্ন হতেই হবে ঐতিহাসিকদের। উনিশ শতকে এসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিলো এবং তার অধিকাংশই এখন দুষ্প্রাপ্য।

ফ্রান্সিস বুখাননের জন্ম স্কটল্যান্ডে ১৭৬২ সালে। গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি পাশের পর এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসা শাস্ত্রে ডিগ্রি পান ১৭৮৩ সালে। জাহাজের সার্জন হিসেবে তিনি এশিয়ার কিছু অঞ্চলে ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে কাজ করেন। এরপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকুরিতে নিয়োগ পান। কোম্পানির চাকুরে হিসেবে ১৭৯৫ সালে বর্তমান মিয়ানমারের রাজধানী আভার দূতাবাসে (সার্জন) যোগ দেন।

বুখানন কোম্পানির অন্যান্য চাকুরের মতো অর্থ উপার্জন প্রধান লক্ষ্য করেন নি। তাঁর ছিলো বিভিন্ন বিষয়ে কৌতূহল, নতুনকে জানার আদম্য আগ্রহ। এ কারণেও কোম্পানি তাঁকে বিভিন্ন সময় জরিপ কাজে নিয়োগ করেছে। নিজ আগ্রহেও তিনি কিছু কাজ করেন। ১৮০২ সাল পর্যন্ত তিনি দক্ষিণপূর্ব বাংলা, মহিশূর, মালাবার, দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করে রিপোর্ট তৈরি করেন। মাঝখানে অবশ্য বছর খানেক অতিবাহিত করেন ২৪ পরগনার বারুইপুরে। ১৭৯৮ সালে কিছুদিনের জন্য কলকাতা বোটানিক্যাল গার্ডেনের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বেও ছিলেন। ১৮১৯ সালে নেপাল ভ্রমণ করেন। ১৮০৩-৪ সালে ভারতের গভর্নর জেনারেলের সার্জন হিসেবে কাজ করেন। সে সময় তিনি থাকতেন ব্যারাকপুরে, কিছু পশু-পাখি পালনও করতেন। তাঁর এই বন্য প্রাণী সংগ্রহ দিয়েই সূত্রপাত হয় আলিপুর চিড়িয়াখানার।

১৮০৫ থেকে ১৮০৭ পর্যন্ত তিনি ছুটি কাটিয়েছেন ইংল্যাণ্ডে। ফিরে আসার পর তিনি দিনাজপুর ও বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে সমীক্ষা চালান। মৃত্যুর পর তাঁর সেই পরিসংখ্যানমূলক সমীক্ষাসমূহ প্রকাশিত হয়। এবং ঐ সব সমীক্ষা তাঁকে এখনও অমর করে রেখেছে। ১৮১৪ সালে আবার কিছুদিন বোটানিক্যাল গার্ডেনের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করে ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য অবসর গ্রহণ করে স্কটল্যান্ড ফিরে যান। ঐ সময় তিনি বুখানন উপাধি পরিত্যাগ করে মার উপাধি হ্যামিলটন গ্রহণ করেন। তবে, ফ্যানসিস হ্যামিলটন থেকে ফ্রানসিস বুখানন নামেই তিনি বেশি পরিচিত। ১৮২৯ সালে পরলোক গমন করেন।

বুখানন যে সব জরিপ চালিয়েছিলেন তাঁর অধিকাংশই প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর। দক্ষিণ পূর্ব বাংলার ভ্রমণ কাহিনীটি ১৯৯০-এর আগে খুঁজে পাওয়া যায় নি। প্রাক্তন জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক বেঁচে থাকতে আলোচনা প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন, বুখাননের বাংলা অঞ্চলের ভ্রমণ কাহিনীর আরো দু'একটি পাণ্ডুলিপি থাকতে পারে এবং কোনো এক সূত্রে তা জেনেছিলেনও কিন্তু তা আর

মনে করতে পারেন নি। আমাদের ওলন্দাজ বন্ধু ভেলাম ভান সেন্দেল ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে গবেষণার সময় বুখাননের দক্ষিণ পূর্ব বাংলা ভ্রমণের পান্ডুলিপিটি খুঁজে পান এবং ১৯৯১ সালে সম্পাদনা করে তা প্রকাশ করেন। যেহেতু সিভিলিয়ানদের পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের ওপর দীর্ঘদিন কাজ করছিলাম এবং পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা ও ভ্রমণ কাহিনী খুঁজছিলাম, সেহেতু, আমার আগ্রহে বইটির বাংলা অনুবাদ হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তৎকালীন তরুণ প্রভাষক সালাউদ্দিন আয়ুব বইটি অনুবাদ করেন এবং ১৯৯৪ সালে ২১৪ পৃষ্ঠার বইটি প্রকাশ করে সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র। বর্তমান নিবন্ধনটি বুখাননের ভ্রমণ কাহিনীর সংক্ষিপ্ত রূপ। বাংলা অনুবাদই এর ভিত্তি।

বুখাননের বিবরণ নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি সম্পর্কে যে প্রাথমিক জরিপ চালিয়েছিলেন, ও সংখ্যাতিত্ত্বক বিবরণ রেখেছিলেন তা এখনও বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও সামাজিক সমীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভাণ্ডার। বিশেষ করে এই বিবরণ থেকে দক্ষিণ পূর্ব বাংলা, মিয়ানমার ও ভারতের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সম্পর্কে নতুন অনেক তথ্য পাই আমরা।

বুখানন ভ্রমণকালে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন বিভাগ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইউরোপিয়দের সাক্ষাৎ পেয়েছেন যারা কৃষিতে পুঁজি বিনিয়োগ করেছেন। সে সময়ের পথের দুর্গমতার কথা মনে রাখলে অবাক লাগবে যে, সুদূর মহেশখালিতে নিঃসঙ্গ ইংরেজ আবাদে মগ্ন। অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ইউরোপিয়রা ছড়িয়ে পড়ছিলো ভাগ্যান্বেষণ। তবে, ভূমি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান না থাকায় তারা হয়ত সফল হতে পারে নি। বুখানন সেই সময় চাষীরা কৃষিপণ্য হিসেবে বাজারে যা আনছেন তার উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হলো তামাক, আখ, সুতা, শন, চাল, সুপারি, মরিচ, গন্ধদ্রব্য। পার্বত্য ও উপকূল অঞ্চলে– লবণ, মধু, মোম, সুপারি, শূটকি ও গর্জন গাছের তেল। বুখাননকে ভ্রমণের সময় স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলা মেশা করতে হয়েছে এবং তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সাধারণ মানুষরা ইংরেজদের এড়িয়ে চলতে চায়।

বুখাননের বিবরণ ঔপনিবেশিক শক্তির নীতির প্রাথমিক দলিল হিসেবেও বিবেচনা করা যেতে পারে। ঔপনিবেশিক শক্তি তখন তার আসন সংহত করছে। এই সংহতকরণের জন্য প্রয়োজন, সাম্রাজ্যকে জানা এবং অর্থনীতি কীভাবে সম্প্রসারণ করা যেতে পারে বা রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে তা দেখা। বুখাননকে পাঠানো হয়েছিলো, মশলা চাষের জন্য উপযুক্ত জায়গার সন্ধান করতে। এ সূত্রে বুখানন জরিপ করে যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে নতুন অঞ্চল সম্পর্কে শুধু ধারণাই নয়, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কীভাবে হতে পারে তারও ইঙ্গিত আছে। ভেলামভান সেন্দেল

বুখাননের সঠিক মূল্যায়ণই করেছেন, যখন তিনি লেখেন– "বুখানন কেবলমাত্র অজ্ঞাত তথ্যের সংগ্রাহক নন; নন শুধু সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সদস্য, নন 'অপরমানুষ' বিষয়ে ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গির একজন উপস্থাপক, নন শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনসম্মত সমীক্ষার সন্ধানী। ফ্রান্সিস বুখানন মূলত সমাজবিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের আদিপুরুষ, যিনি দক্ষিণ এশিয়ার সমাজ সংগঠন ও সমাজ পরিবর্তনের প্রাচীন রেখালেখ্য অঙ্কন করে গেছেন।"[১৮১]

রবারদিউ ময়মনসিংহের বর্ণনার পর আরেকটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা খুঁজে পেয়েছি ময়মনসিংহের ওপর। বছর দু'য়েক আগে ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে খুঁজে পাই একটি পুস্তিকা, নাম *এ ফিউ নোটস অন দি ডিস্ট্রিক্ট অব ময়মনসিংহ*। অর্থাৎ ময়মনসিংহ জেলা সম্পর্কে কিছু মন্তব্য। লেখকের নামের বদলে আছে 'অ্যান ওল্ড রেসিডেন্ট'। একজন পুরনো বাসিন্দা।

পুস্তিকাটি আট পাতার। উনিশ শতকে এ ধরনের পুস্তিকা অনেকেই ছাপতেন নিজের খরচে। বিতরণ করতেন বন্ধু-বান্ধবদের। ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে পাঠাতেন। ভারত সংক্রান্ত হলে পাঠাতেন ইন্ডিয়া হাউসে। এ ধরনের অনেক পুস্তিকা আছে ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে, বিচিত্র সব বিষয় নিয়ে লেখা। নেহায়েত প্রয়োজন না হলে কেউ এগুলোর খোঁজখবরও নেয় না।

এই পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়েছিলো ১৮৪০ সালে। 'ওল্ড রেসিডেন্ট' এক সময় থাকতেন ময়মনসিংহে। হয়তো প্রশাসন বা ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত অনেক সিভিলিয়ান লিখেছেন আত্মপরিচয় গোপন করে। 'পুরনো বাসিন্দা' হয়ত অবসর নিয়ে চলে যান লন্ডন এবং রচনা করেন পুস্তিকাটি। তাহলে কখন তিনি ছিলেন ময়মনসিংহে? লেখক তা উল্লেখ করেননি। তবে পুস্তিকায় বিভিন্ন ধরনের সময়ের উল্লেখ দেখে অনুমান করে নিতে পারি ১৮১৫-এর দিকে তিনি ছিলেন ময়মনসিংহে এবং বেশ দীর্ঘ সময়ই ছিলেন ওই জেলায়। পুস্তিকাটিতে ধরে নিতে পারি ১৮১৫-৩৫ সালের ময়মনসিংহের বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

পুরনো বাসিন্দার বর্ণনায় উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের একটি রূপ আমরা পাই, বিশেষ করে বিচার ব্যবস্থার। তিনি 'নেটিভ' দের দোষারোপ করেছেন কিন্তু ব্যবস্থাটি যে নেটিভদের নয়, তার দেশীয়দের এটি তার মনে হয় নি। ঔপনিবেশিক সরকার ইচ্ছে করেই দেশীয়দের কম বেতন দিতো এবং সে ধারা অব্যাহত রেখেছে সব সময়। ঘুষের ব্যবস্থাটি বিশেষ করে পুলিশের সে সময় থেকেই চালু হয়েছে যা এখনও অব্যাহত।

ক্যাপটেন পোগসন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি। তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে, ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে সামান্য কিছু ইঙ্গিত পাওয়া গেছে মাত্র।

মনে হয়, তাঁর জন্ম আয়ারল্যান্ডে, কারণ এই প্রসঙ্গ নানাভাবে এসেছে ভ্রমণ কাহিনীর প্রথম দিকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে পোগসন কলকাতা এসেছিলেন ১৮০৫ সালের এপ্রিলে। সেখান থেকে লে. জর্জের (পরবর্তীকালে লে. কর্নেল) নেতৃত্বে চলে যান কাউনপুর বা কানপুর। ছাব্বিশ বছর চাকরির পর উন্নীত হন তিনি ক্যাপটেন পদে। তিনি ছিলেন নয় সন্তানের জনক।

১৮৩০ সালে কোম্পানি সরকার পোগসনকে চট্টগ্রাম পাঠিয়েছিলো একটি বিষয় তদন্তের জন্য। চট্টগ্রামে, সরকারি চাকরি হতে অবসরপ্রাপ্ত অনেক দেশীয় ছিলেন। তদন্ত করে তাদের বকেয়া পাওনা মিটিয়ে দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো পোগসনকে। বকেয়া মেটানোর আগে সত্যাসত্য ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি পর্যালোচনা ছিলো পোগসনের উদ্দেশ্য।

চট্টগ্রাম থেকে ফিরে পোগসন একটি ভ্রমণ কাহিনী লিখেছিলেন। ক্রাউন সাইজের বড় বড় হরফে ছাপা ভ্রমণকাহিনীটি ১৮৩১ সালে প্রকাশিত হয়েছিলো শ্রীরামপুর থেকে। নাম *ক্যাপটেন পোগসনস ন্যারেটিভ ডিউরিং এ ট্যুর টু চাঁটিগাঁও*, ১৮৩১। ২২৮ পাতার বইটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন কোম্পানির কোর্ট অফ ডিরেকটরসদের। 'পোগসনের চট্টগ্রাম যাত্রা'র ভিত্তি ঐ বিবরণ।

১৮৩০ সালের ১৫ ডিসেম্বর কলকাতার ব্যারাকপুর থেকে পোগসন রওয়ানা হলেন চাটগাঁর উদ্দেশ্যে। ব্যারাকপুর পৌঁছার আগে তাঁর বজরা এসে থামলো কলকাতার কাছে উলিপুরে। এখানে পৌঁছেই তিনি স্মৃতিচ্ছান্ন হয়ে পড়লেন। সেই কবে ১৮০৫ সালে তরুণ ক্যাডেট হিসেবে পা রেখেছিলেন এখানে। মাঝখানে চোখের পলকে কেটে গেল ছাব্বিশটি বছর। তিনি কি ভেবেছিলেন আবার আসবেন এখানে!

চাঁটগার যে ক'টি বিবরণ এখানে সংকলিত হয়েছে তার মধ্যে পোগসনের বিবরণটিই সবচেয়ে পুরনো। পোগসন যে রকম গভীর মমতায় চট্টগ্রামের এক মুগ্ধ বিবরণ রেখে গেছেন তা আর কেউ রেখে যান নি। আরো পরে বিমসের বিবরণের সঙ্গে তুলনা করলেই তা বোঝা যাবে। চাঁটগার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করেছে, জানিয়েছেন তাঁর আগে উইলিয়াম জেনেস মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং এ জন্য চাঁটগা এসেছিলেন। চাঁটগার পুরাতত্ত্ব এবং ইতিহাস সম্পর্কে তিনি যা জেনেছেন তাও উল্লেখ করেছেন। চাঁটগার মানুষজনের সঙ্গে তাঁর তেমন একটা যোগাযোগ হয়নি কিন্তু উল্লেখ করেছেন সেখানকার সবাইর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'সহৃদয়তা, দয়া ও শুভেচ্ছা'।

পোগসনের বর্ণনায় আরেকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হয়, ইংরেজদের দেশীয়রা পছন্দ করছে না। একই কথা উল্লেখ করেছিলেন আরো আগে জন বুখানন। ডাক জমাদাররা পোগসনের বেয়ারার পোশাক খুলে রেখে দিয়েছিলো।

পোগসনকেও প্রথমে সাধারণ ইংরেজ ভেবে তারা পাত্তা দিতে চায় নি। তবে, পোগসনের সহৃদয় বিবরণের কারণ কি এই যে তিনি ছিলেন আইরিশ!

বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার্সের লে. কর্নেল ছিলেন সি জে সি ডেভিডসন। ১৭৯৩ সালে তাঁর জন্ম কলকাতায়। 'ইউরোপ শপ' নামে তাঁর বাবার একটি দোকান ছিলো কলকাতায়। আদিসকম্বে ১৮১০-১১ পর্যন্ত তিনি প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন প্রকৌশলী হিসেবে এবং সেনাবাহিনীতে ইঞ্জিনিয়ার ক্যাডেটশিপ লাভ করেছিলেন ১৮১২ সালে। ডেভিডসন চাকরি থেকে অবসর নিয়েছিলেন ১৮৪১ সালে এবং ফিরে গিয়েছিলেন লন্ডন। সেখানেই তিনি পরলোকগমন করেছিলেন ১৮৫২ সালে।

সংক্ষেপে এই হলো কর্নেল ডেভিডসনের জীবনী। ১৮৪০ সালে ডেভিডসন এসেছিলেন ঢাকায়। সে সময়ের ঢাকার একটি বিবরণ তিনি রেখে গেছেন তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে। সে বিবরণের কারণেই আমাদের কাছে ডেভিডসন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অন্যান্য কর্মচারী থেকে আলাদা। অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, ডেভিডসন এমন কি লিখে গেছেন যা জেমস টেইলরের বিবরণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ? জেমস টেইলরের প্রসঙ্গ আসছে এ কারণে যে ১৮৪০ সালেই প্রকাশিত হয়েছিলো তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'স্কেচ অফ দি টপোগ্রাফি অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস অফ ঢাকা।' এ বইটি এখনও ঢাকার ওপর প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত যদিও বইটি ঢাকা জেলার ওপর, শহরের ওপর নয়। ঐ সময়ে শহরের কিছু বিবরণী লিপিবদ্ধ করে গেছেন টেইলর। তবে, ডেভিডসন তাঁর বিবরণে শহর সম্পর্কে এমন কিছু তথ্য রেখে গেছেন যা টেইলর বা সমসাময়িক অন্য কোনো বিবরণে নেই। এ কারণেই ডেভিডসনের বিবরণটি কৌতুহলোদ্দীপক এবং বাংলাভাষী, ঢাকা চর্চায় আগ্রহী পাঠকদের জন্যে প্রয়োজনীয়।

খুব সম্ভব বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার্সের ষষ্ঠ এলাহাবাদ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে ১৮৩৯ সালে অবসর গ্রহণ করেছিলেন ডেভিডসন। এবং দেশে ফেরার আগে, সম্পূর্ণ লটবহর নিয়ে তিনি ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। এটি অনুমান, কারণ ডেভিডসন সম্পর্কে আর কোনো তথ্য পাইনি বা তাঁর রচিত মূল বইটি দেখাও সম্ভব হয়নি। জানা যায়, ৫ ডিসেম্বর ১৮৩৯ সালে তিনি বেরিয়েছিলেন ভ্রমণে। এ জন্য এক হাজার মণ ওজনের দু'টো নৌকো ভাড়া করেছিলেন। একটি নৌকোয় ছিলো তাঁর কেবিন বা থাকার জায়গা। এ নৌকোয় ছিলো আবার তাঁর আসবাবপত্র ভরা ৫৬টি বড় বড় বাক্স। অন্যটিতে ছিলো তাঁর তিনটি ঘোড়া।

এলাহাবাদের যমুনা থেকে নোঙ্গর তুলেছিলেন ডেভিডসন ১৮৩৯ সালের পাঁচ-ই ডিসেম্বর। দিনাপুর পৌঁছলেন ১৯ ডিসেম্বর, ২৭ ডিসেম্বর মুঙ্গের। রাজশাহীর রামপুর-বোয়ালিয়ায় পৌঁছলেন ১৮৪০ সালের ৩ জানুয়ারি। ৬ জানুয়ারি সূর্যাস্তে তাঁর নৌকো পড়লো পদ্মায়। চোখে পড়ছিলো তখন সব নীলকুঠি। ৯

তারিখে দেখেছিলেন তিনি নৌকোর লম্বা বহর, চাটগাঁ থেকে সেপাই নিয়ে যাচ্ছে বেনারস। ১১ জানুয়ারি ডেভিডসন পৌঁছেছিলেন মানিকগঞ্জের এক জনবহুল গ্রামে। এখানে পাশের গ্রামের নীলকুঠি থেকে পেয়েছিলেন খবরের কাগজ। ১৩ জানুয়ারি ১৮৪০ সালে পৌঁছেছিলেন তিনি ঢাকায়।

ভারতের একাংশ ভ্রমণের পর ডেভিডসন চলে গিয়েছিলেন লন্ডন। সেখানে থেকে ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিলো তাঁর ভ্রমণ কাহিনী *ডায়েরি অফ ট্রাভেলস অ্যান্ড এডভেঞ্চারস ইন আপার ইন্ডিয়া*।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইতিহাস বিষয়ক সাময়িকী 'বেঙ্গল পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট'-এ, সেই ভ্রমণ বিবরণের ঢাকা অংশটুকু 'ঢাকা ইন এইটিন ফোর্টি', শিরোনামে উদ্ধৃত করা হয়েছিলো। কর্নেল ডেভিডসনের সেই বিবরণ অবলম্বনে রচিত হয়েছে 'কর্নেল ডেভিডসন যখন ঢাকায়।'

উনিশ শতকের মধ্য ভাগের ঢাকার চমৎপর একটি বিবরণ রেখে গেছেন ডেভিডসন। ঢাকা সম্পর্কিত অনেক অজানা তথ্য পাই, যেমন, বেহালা উৎপাদনের কেন্দ্র ছিলো ঢাকা। সাধারণ মানুষরাও ছিলেন গান পাগল। কফিও উৎপাদিত হতো ঢাকায়। পোগসন লিখেছেন, চাঁটগায়ও কফি উৎপাদিত হতো। তবে, ঔপনিবেশিক শাসনে মুঘল রাজধানী যে ক্ষয়ের শেষ সীমায় তা ডেভিডসনের উজ্জ্বল বিবরণও ঢেকে রাখতে পারেনি। এ কারণে নিজেই একসময় মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন যে, "এ দেশের উৎপাদনের প্রতি যে অবহেলা ও আলস্য দেখিয়েছে আমাদের দেশ, বিশ্বের কোনো দেশ তা দেখায়নি।"

ফ্রাংক বি. সিমসনের বইটি অন্যরকম। কিন্তু তাঁর বিবরণও সংকলন করার কারণ, সিভিলিয়নদের প্রধান বিনোদন বা আকর্ষণ 'শিকার' নিয়ে গ্রন্থটি রচিত। এ বইটি আরেকটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশ প্রকৃতি সম্পর্কে এতো বিস্তারিত বিবরণ আর কোথাও নেই। এবং সে পরিবেশ ধ্বংসের প্রক্রিয়ার ইঙ্গিতও এ বিবরণে পাই।

সিমসন ছিলেন বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের। ১৮০০ সালের দিকে তিনি ছিলেন নোয়াখালির কালেকটর। চাকুরি সূত্রে বাংলা বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের অনেক জায়গায় নিযুক্তি পেয়েছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা বিশেষ করে শিকার সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন *লেটারস অন ইস্টার্ন বেঙ্গল* গ্রন্থে। ২৫৫ পৃষ্ঠার বইয়ে চিঠির সংখ্যা ৬১টি। এই চিঠি লিখেই তিনি শিকারের বিবরণ তুলে ধরেছেন। ১৮৪৭ সাল থেকে রচিত রোজনামচা ও চিঠিপত্রের সাহায্যে বইটি রচিত। সিমসন পূর্ববঙ্গের যে সব অঞ্চল সম্পর্কে বিবরণ রেখে গেছেন শুধু সেটুকুই এখানে সংকলিত হলো 'সিভিলিয়ান ও শিকার' নামে। মূল বইটি ১৮৮৬ সালে প্রকাশ করে লন্ডনের আর এইচ পোটার। বইয়ে সিমসনের করা শিকার সংক্রান্ত চমৎকার কিছু

এচিং আছে।

সিমসন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাইনি। তবে, এটুকু বলতে পারি, পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায়ই তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে এবং অবসরের আগে তিনি ঢাকার কমিশনার হয়েছিলেন।

উইলিয়াম টেইলরের আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ডটি আমি খুঁজে পাইনি। দ্বিতীয় খণ্ডটি পেয়েছি যা একাশিত হয়েছিলো ১৮৮২ সালে। প্রকাশক লন্ডনের ডব্লিউ অ্যালেন। নাম, *থার্টি এইট ইয়ার্স ইন ইন্ডিয়া*। এ বইয়ের উল্লেযোগ্য দিক হলো লেখকের করা ১০০টি স্কেচ।

শাস্তি হিসেবে টেইলরকে পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহে কিছুদিনের জন্য সেশন জজ হিসেবে বদলি করা হয়েছিলো। তাঁর আত্মজীবনীতে ময়মনসিংহে অবস্থানের ধারাবাহিক কোনো বিবরণ তিনি দেননি। তাঁর মানসিক অবস্থা তখন তেমন ছিলো না। ময়মনসিংহে তাঁর অবস্থানের বিবরণ দিয়েছেন তিনি আলাদা এক শিরোনামে 'র‍্যানডম নোটস বাই অ্যান এক্সাইল ডিউরিং হিজ ব্যানিশমেন্ট।' টেইলরের স্কেচ ও 'র‍্যানডম নোটস'-এর ভিত্তিতে রচিত হয়েছে ১৮৫৯ সালের দিকে ময়মনসিংহের বিবরণটি– 'টেইলরের ময়মনসিংহ।'

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময় উইলিয়াম টেইলর ছিলেন পাটনার কমিশনার। বিদ্রোহ ও বিদ্রোহ পরবর্তী সময় তিনি অত্যন্ত নির্দয় ব্যবহার করেছিলেন দেশিয় বিশেষ করে পাটনার মুসলমানদের সঙ্গে। এই অভিযোগের বিরুদ্ধে টেইলর সবসময় বলেছেন– না, নির্দয় ব্যবহার তিনি করেননি। বিদ্রোহের সময় তাঁর দায়িত্ব ছিলো সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষা করা, তা তিনি করেছেন। "প্রদেশের সমস্ত সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা, গির্জার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গ, বণিক, নীলকর, ভদ্র দেশিয় সবাই একবাক্যে বলেছেন, আমিই রক্ষা করেছি পাটনা। শুধু পাটনা নয়, পাটনার সঙ্গে বিহারও।" লিখেছেন টেইলর। শুধু দুজন, না, তিনজন তা স্বীকার করেননি। একজন তার অধীনস্থ আইসিএস অফিসার, যিনি টেইলরের পরে পাটনার ভার গ্রহণ করেছিলেন সেই স্যামুয়েল। আরেকজন হলেন এলিয়ট। টেইলরের ভাষায়, যিনি বাস করেন নেটিভ মহিলাদের এক হারেম নিয়ে এবং তাদের প্রভাবেই চলেন। তৃতীয়জন হলেন লে. গভর্নর হ্যালিডে। বাংলার লে. গভর্নর হ্যালিডে নাকি প্রধানত উপর্যুক্ত দুজনের সাক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে দোষী সাব্যস্ত করেছেন টেইলরকে এবং এ বিবরণী ছাপা হয়েছে সরকারিভাবে। এখানে উল্লেখ্য, বিদ্রোহের পর, বিদ্রোহপূর্ব, বিদ্রোহকালীন বাংলার অবস্থা তদন্ত করে একটি রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন হ্যালিডে, যা মুদ্রিত হয়েছিলো সরকারিভাবে। যা হোক সরকার নাখোশ ছিল টেইলরের ওপর। টেইলরের মতে, সরকার নয়, ব্যক্তিগতভাবে হ্যালিডেই নাখোশ ছিলেন। সুতরাং পাটনার কমিশনার হিসেবে

অব্যাহতি দেওয়া হলো টেইলরকে।

টেইলরের নতুন পদ হলো বিশেষ ভারপ্রাপ্ত অফিসার। এ পদটি অফিসহীন ও প্রায় বেতনহীন। পদটি যে এক ধরনের শাস্তি তা বলাই বাহুল্য। স্বাভাবিকভাবেই টেইলর 'ন্যায্য বিচার' চেয়ে স্মারকলিপি পাঠালেন সরকারের কাছে। কেটে গেল ছয় মাস। তারপর টেইলরের ভাষায়, "সরকারের যখন মনে হলো, নিজ দেশবাসী ও খ্রিস্টানদের বাঁচানোর জন্য যে পাপ করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে, তখন সরকার আমাকে আবার নিযুক্তির সিদ্ধান্ত নিলেন। আমার জন্য বাছা হলো, পাটনা থেকে ৬০০ মাইল দূরে পূর্ববঙ্গের এক কোণায় সুন্দর এক নিঃসঙ্গ স্থান।" জায়গাটির নাম ময়মনসিংহ।

টেইলরকে নিযুক্ত করা হলো সিভিল এবং সেশন জজ হিসেবে। স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন টেইলর। পাটনা আর ময়মনসিংহে অনেক তফাৎ আর আমলাতন্ত্রে স্ট্যাটাস বিবেচিত হয় কে কোন পদে এবং কোন অঞ্চলে নিযুক্ত তা দিয়ে। শুধু তাই নয়, আর্থিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হলেন তিনি। কমিশনার হিসেবে তার বেতন ছিলো বছরে ৪ হাজার পাউণ্ড। এখন তা কমে গেল। বাৎসরিক ক্ষতি দাঁড়াল ২৫ হাজার রুপি। তার ওপর খবর এলো, যে জাহাজে তিনি তার শখের স্কেচগুলো পাঠিয়েছিলেন লন্ডনে ছাপার জন্য সে জাহাজ গেছে ডুবে। এর মধ্যে তার স্ত্রী আক্রান্ত হলেন বসন্তে।

টেইলর অনুরোধ জানালেন, তাঁকে কি কলকাতা বা আশপাশে কোথাও পোস্টিং দেয়া যায় না? সম্ভব নয়, জানালেন কর্তৃপক্ষ। আসলে আমলাতন্ত্রে আরেকটি ব্যাপার ছিলো। টেইলর আইসিএস নন, এবং আমলাতন্ত্রের কর্তৃত্ব আইসিএসদের হাতে। টেইলরকে তাদের পাত্তা দেওয়ার কথা নয়। তাঁকে সোজা বলা হলো, ময়মনসিংহে যেতে হবে।

আগেই উল্লেখ করেছি, উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গ তার স্যাঁতসেঁতে বিষাক্ত আবহাওয়া, গ্রাম্যতা, জলাজঙ্গলের জন্য ছিলো বিখ্যাত। এবং সেখানে নিযুক্তি ছিলো এক ধরনের শাস্তি। টেইলরও স্বাভাবিকভাবে তাই দেখেছিলেন। এটি ছিলো পদাবনতি। এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ ছাড়া তার আর করার কিছুই ছিলো না। লিখেছেন তিনি ব্যঙ্গ করে, সরকারের চোখে ময়মনসিংহের গুরুত্ব ছিলো অনেকখানি, কারণ তা ছিলো পাটনা থেকে ৬০০ মাইল দূরে এবং অঞ্চলটি বিখ্যাত তার স্যাঁতসেঁতে ও অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার জন্য। টেইলর আরেকটি স্মারকলিপি পাঠালেন লন্ডনে কোম্পানির ডিরেক্টরদের কাছে।

শুধু তাই নয়, তাঁর পক্ষে দেয়া বিভিন্ন বিবৃতি চিঠি পত্রের একটি সংকলনও প্রকাশ করেছিলেন পরে ক্ষুব্ধ হয়ে। এরকম একটি চিঠি ছিলো রেভারেন্ড আলেকজান্ডার ডাফের (১৮.২. ১৮৫৮)। তিনি লিখেছিলেন– "... if there was a

man living who deserved the honour of British knighthood at the hands of his sovereign, that man was Mr. Commissioner Tayler. But instead of this what shall I say? Indeed, words fail me to give expression to my sense of the unremited indignity which has been offered to you."[১৮৩]

১৮৭৭ সাল পর্যন্ত তিনি দেন দরবার চালিয়েছেন। অনেকেই স্বীকার করেছেন তাঁর প্রতি অবিচার হয়েছে কিন্তু তাতে লাভ হয় নি। পুরনো পদে বা মহিমায় আর তিনি ফিরে যেতে পারেন নি।

যাহোক ফেব্রুয়ারি মাসে [১৮৫৯] তিনি চিঠি পেলেন বদলির। ঠিক করেছেন যাবেন ময়মনসিংহ। আশা, এরি মধ্যে তার প্রতি যে 'অবিচার' করা হয়েছে তার প্রতিবিধান হবে, ইংরেজদের 'ন্যায্য বিচার' বা ন্যায় বিচারের প্রতি তাঁর আস্থা ছিলো।

প্রথমে ঠিক করেছিলেন একা যাবেন। স্ত্রী অসুস্থ, তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। রওয়ানা দেওয়ার ঠিক আগে কনিষ্ঠ কন্যা বললেন, না তিনি যাবেন। পিতা-পুত্রি রওয়ানা হলেন ময়মনসিংহের দিকে। কিন্তু তাঁর বিবরণের পঞ্চম অধ্যায়ে আছে, ১৮৬৮ সালে তিনি কলেরা সংকীর্তন শুনেছেন ময়মনসিংহে। তা হলে ধরে নিতে হয় দীর্ঘদিন তাঁকে ফেলে রাখা হয়েছিলো ময়মনসিংহে। তবে আমার মনে হয় এটি ছাপার ভুল। কারণ, তিনি লিখেছেন ময়মনসিংহে ফেব্রুয়ারি মাসে পৌঁছেই তিনি কলেরা সংকীর্তন শুনেছেন।

টেইলর ময়মনসিংহে ছিলেন চারমাসের মতো। তারপর ছুটি নিয়ে গেলেন কলকাতা। এরপর স্মারকলিপি পাঠালেন লন্ডনে। কিছুদিন পর জানতে পারলেন লে. গভর্নর তা পাঠান নি। প্রতিবাদ করায় তাঁকে ফের সাসপেন্ড করা হয়। তখন টেইলর পদত্যাগ করেন। পদত্যাগের পরও বছর চারেক ছিলেন পাটনায়। কারণ, তাঁর ওপর পরিবারের দায় দায়িত্ব ছিলো। এই চার বছর বিভিন্ন মামলার পরামর্শক হিসেবে কাজ করে তিনি উপার্জন করেছেন। ভালোই উপার্জন করেছিলেন।

খুব বেশিদিন টেইলর থাকেন নি ময়মনসিংহে কিন্তু এরি মধ্যে যে সব অভিজ্ঞতা হয়েছিলো তা তিনি বেশ বিস্তারিত আকারেই লিপিবদ্ধ করেছেন। এসব ঘটনা আমাদের কাছে সাধারণ কিন্তু একজন ইউরোপিয়ের কাছে তা ছিলো কৌতুহলোদ্দীপক। একজন ইউরোপিয় প্রথম এসে পূর্ববঙ্গের প্রকৃতি, পরিবেশ দেখে কেমন বিস্মিত হতেন তার উদাহরণ টেইলর ও তরুণ ল্যান্স দম্পতি। এখানকার রীতিনীতিও তাঁদের বিস্মিত করেছে স্বাভাবিকভাবে। তিনি বাঙালিদের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য বুঝেছিলেন এবং তাঁর পর্যবেক্ষণটিও চমৎকার। বাঙালিদের না জানতে চাওয়ার আগ্রহই সবচেয়ে বড় অভিশাপ। আর এ কারণেই তারা সংস্কার মুক্ত নয়। তবে, অষ্টাদশ-উনিশ শতকে বাঙালিদের সম্পর্কে ইউরোপিয়দের যে পূর্ব

ধারণা ছিলো, তাঁর ধারণা এর থেকে আলাদা ছিলোনা। তবে, টেইলরের আগ্রহ ছিলো নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব আর উদ্ভিদ বিদ্যা সম্পর্কে। নিজের বাগান, গাছপালা, অলঙ্কার, বাঙালি স্বভাবের বিশদ বিবরণ এর উদাহরণ।

বছর কয়েক আগে ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে সিভিলিয়ানদের বিবরণ খোঁজার সময় দু'খন্ডের একটি বিবরণ পাই। আমার জানা মতে এ বইটি কখনও কোনো গবেষক ব্যবহার করেননি এমনকি যারা সিভিলিয়ানদের ওপর লিখেছেন তারাও। অথচ, বইটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক, নাম *লাইফ ইন দি মফস্বিল*।

লেখক: এক্স সিভিলিয়ান, প্রকাশিত হয়েছিলো লন্ডন থেকে ১৮৭৮ সালে। পুরনো বইয়ের এই একটি সমস্যা। অনেক সময় লেখকের নাম থাকে না। অনেক সময় থাকে শুধু আদ্যাক্ষর। এই স্মৃতিকাহিনীর লেখক ঢাকা ও ময়মনসিংহে জেলা ম্যাজিস্টেট হিসাবে কাজ করেছেন। নিজের নাম তিনি উল্লেখ করেছেন গর্ডন হিসাবে। বিভিন্ন বিবরণী খোঁজ করে দেখেছি কমিশনার হিসাবে স্যান্ডার্স নামেও কেউ ছিলেন না। এমনকি ১৮৬০ সালের সিভিলিয়ান তালিকায়ও গর্ডন নামে কেউ ছিলেন না।

বিবরণটি পড়তে পড়তে হঠাৎ ঢাকার একটি বর্ণনা পড়ে মনে হলো এই বর্ণনাটি তো আমি অন্য জায়গায় ব্যবহার করেছি সরকারি নথি থেকে এবং এই রিপোর্টটি গ্রাহামের। এবার মিলিয়ে দেখলাম সব মিলে যাচ্ছে। পরে লাইব্রেরির ক্যাটালগেও দেখা গেল লেখকের নাম হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে গ্রাহামের নাম। অর্থাৎ *লাইফ ইন দি মফস্বিল* বইটির লেখক জর্জ গ্রাহাম। গ্রাহাম ১৮৬০ সালে সিভিলিয়ান হিসাবে মনোনীত হন এবং ঐ বছরই অক্টোবর মাসে রওনা হন কলকাতার দিকে। কলকাতায় পৌঁছতে সাধারণত লাগতো তিন মাস। তাঁর লেগেছিলো পাঁচ মাস। তাঁর স্মৃতিকাহিনীতে সে যাত্রায় আঠারোজন মহিলা ও আঠারোজন পুরুষের দিন কাটানোর সরস বর্ণনা আছে। পাঁচ মাস পর তিনি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, মর্ত্যে মহিলাদের সঙ্গ পরম আশীর্বাদ, কিন্তু সপ্তাহ তিনেক পর মনে হয় সমস্ত মন্দের উৎস রমণী। কলকাতায় নামার পর প্রথমে উঠেছিলেন স্পেন্স হোটেলে, তারপর কয়েকজন মিলে চামারিতে। ভাষা পরীক্ষা পাস করার পর মুজফফরপুরে নিয়োগ পান সহকারি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হিসাবে। তারপর হরগঙ্গার সহকারি ম্যাজিস্ট্রেট। প্রথম খণ্ডের ২৮৪ পৃষ্ঠায় এসব কাহিনীই বিবৃত হয়েছে। কৃষ্ণনগরে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে যোগদানের কাহিনী নিয়ে দ্বিতীয় খণ্ডের শুরু (২৮১ পৃঃ)। সেখান থেকে ফার্লো বা ছুটি কাটাতে যান লন্ডন। লন্ডন থেকে ফিরে যোগ দেন ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে। ঢাকার কমিশনার ছিলেন তখন সিমসন যাঁকে গ্রাহাম উল্লেখ করেছেন স্যান্ডার্স হিসাবে। ঢাকা, ময়মনসিংহ সম্পর্কে তাঁর বিবরণের ওপর ভিত্তি করেই বর্তমান বিবরণ রচিত হয়েছে, নাম– 'গ্রাহাম

সাহেবের পূর্ববঙ্গ।'

ময়মনসিংহ থেকে গ্রাহাম বদলি হন হাওড়ায়। সেখান থেকে ২৪ পরগণায়। সেই জেলায় কাজ করার সময় একদিন বুকে ব্যথা অনুভব করেন। ডাক্তার তখনি তাঁকে বললেন, লন্ডন ফিরতে হবে। ফিরলেন লন্ডন। কিন্তু গ্রাহাম আর পুরোপুরি সুস্থ হননি। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হন। আমি এখানে শুধু গ্রাহামের পূর্ববঙ্গের অভিজ্ঞতাই সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত করেছি।

গ্রাহাম ঢাকায় ছিলেন বেশিদিন এবং ঢাকা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রেখে গেছেন। প্রশাসক হিসেবে সিভিলিয়ান কী ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতেন তা বোঝা যায় গ্রাহামের বিবরণ পড়লে। ঢাকা থেকে তাঁর ময়মনসিংহে পৌঁছার বিবরণটিও চিত্তাকর্ষক। একজন শ্বেতাঙ্গ অচেনা এক পথ পাড়ি দিয়েছেন নিজের পদে যোগ দিতে। প্রবল আত্মবিশ্বাসী তিনি। এই আত্মবিশ্বাসই ছিলো ঔপনিবেশিকতার শক্তি। রবারদিউয়ের বিবরণের প্রায় ষাট বছর পর গ্রাহামের বিবরণ লেখা হয়েছে। কিন্তু, দেখা যাচ্ছে, এই ছয় দশকে, খুব একটা পরিবর্তন হয়নি ময়মনসিংহের। একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায় এ বিবরণগুলি পড়লে যে, খাজনা ছাড়া ঔপনিবেশিক শক্তি উন্নয়নে কখনও আগ্রহী ছিলো না। 'উন্নয়ন' যদি সে কিছু করেও থাকে তবে তা বাধ্য হয়েই করেছে।

কেমব্রিজে দিনগুলো মন্দ কাটছিলো না আর্থার লয়েড ক্লে'র। বাবা ব্যবসায়ী, সচ্ছল পরিবার। সুতরাং অর্থ নিয়ে কোনো চিন্তা ছিলো না ক্লে'র। কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য, দামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা– সব সত্ত্বেও মনে হতো কি যেন নেই। লন্ডনের বিষণ্ন আকাশ, জীবনযাত্রার একঘেঁয়েমি মাঝে মাঝে চেপে বসতো মনের ওপর। ক্লে'র বাবা ভেবেছিলেন, ছেলে পড়াশোনা শেষ করে পৈত্রিক ব্যবসা দেখাশোনা করবে। কিন্তু ব্যবসা জিনিসটাই এড়িয়ে চলতেন ক্লে। ঠিক এমনি সময় তিনি সুযোগ পেলেন জীবনের লক্ষ্য ঠিক করার।

সাল ১৮৬২ ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা হবে। যেসব নবীন ইংরেজ যুবক ভাগ্যান্বেষণ এবং বৈচিত্র্যের স্বাদ চাইতেন তাঁদের জন্য সিভিল সার্ভিস ছিলো এক মোহ। কারণ, সিভিল সার্ভিস পাস করে সিভিলিয়ান হলে শাসন করা যায় (ভারতবর্ষ), ঘুরে ফিরে দেখা যায় কিংবদন্তীর দেশটি এবং ভাগ্যে থাকলে বিস্তর কামিয়ে দেশে ফেরা যায়। আরো অনেক তরতাজা ইংরেজ যুবকের মতো ক্লেও যেন হঠাৎ লক্ষ্য খুঁজে পেলেন জীবনের। পরীক্ষা দিলেন এবং উত্তীর্ণ হলেন ক্লে। কোন প্রেসিডেন্সী পছন্দ তাঁর? বাংলা। তারপর ১৮৬২ সালের এক শুভদিনে তরুণ ক্লে 'রিপন' জাহাজে করে রওয়ানা হলেন ভারতবর্ষের দিকে।

যে বৈচিত্র্যের খোঁজে আসতেন সিভিলিয়ানরা ভারতবর্ষে, তা পরিণত হতো একঘেঁয়েমিতে। সময় কাটানোর জন্য শিকার করা অথবা ঘোড়ায় চড়ে নেটিভদের

ওপর উৎপাত করা ছাড়া অনেক সময় তাঁদের আর কোনো কাজ ছিলো না। অধীর আগ্রহে তখন সিভিলিয়ান অপেক্ষা করতেন একটি খামের, যার ওপর 'এইচ এম সার্ভিস' ছাপ মারা রয়েছে। এই খামই বয়ে আনতো তাঁর জন্যে বদলি বা প্রমোশনের বার্তা।

সিভিলিয়ানদের প্রত্যেকের মধ্যে সদ্ভাব হয়ত ছিলো, কিন্তু প্রত্যেকে ছিলেন প্রত্যেকের প্রতিদ্বন্দ্বী। আমলাতন্ত্রের ইঁদুর-দৌড়ের শিকার ছিলেন তাঁরা, তাই হয়ত ঠাট্টা করে নিজেরাই নিজেদের নাম রেখেছিলেন 'কমপিটিশনওয়ালা'।

তরুণ কমপিটিশনঅলা ক্লে কলকাতায় পা রাখলেন ১৮৬২ সালে। ঐ সময় ইংল্যান্ড থেকে আগত সিভিলিয়ানদের প্রথমে তাঁদের বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়োগে করা হতো সহকারী বা এ্যাসিসট্যান্ট হিসেবে। চাকরির ঐটেই ছিলো প্রথম ধাপ।

নবীন সিভিলিয়ান ক্লে-কেও প্রশিক্ষণ নিতে হলো কলকাতায়। অবসরসময়টুকু তিনি ঘুরে বেড়ালেন এদিক-সেদিক। তারপর এক সময় নিয়োগপত্র পেলেন তিনি। চাটগাঁয় এ্যাসিসট্যান্ট হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে তাঁকে।

কর্মস্থলে যাওয়ার আগে ক্লে'র বন্ধু-বান্ধবরা এক পার্টি দিলেন কলকাতার অভিজাত হোটেল 'উইলসনে', যা এখন পরিচিত গ্রেট ইস্টার্ন নামে। তারপর ১৮৬৩ সালের নভেম্বরে রওয়ানা দিলেন তিনি চাটগাঁর উদ্দেশে। সঙ্গে দু'টি টাট্টু ঘোড়া। 'ডিক' এবং 'জিট'।

ক্লে চট্টগ্রাম, সেখান থেকে কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মাদারীপুর, মুন্সিগঞ্জ হয়ে এলেন ঢাকায় জয়েন্ট কালেক্টর হয়ে; এরপর আবার বদলি হয়েছিলেন চট্টগ্রাম, তারপর পূর্ববঙ্গের বাইরে। সিভিলিয়ান হিসেবে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে ১৮৯৬ সালে তিনি প্রকাশ করেছিলেন *লিভজ ফ্রম এ ডায়েরি ইন লোয়ার বেঙ্গল*। লণ্ডনের ম্যাকমিলান এই বিশাল গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলো। সে বিবরণের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে– 'একজন কমপিটিশনওয়ালার জগৎ।' এখানে উল্লেখ্য যে, ক্লে লেখক হিসেবে নিজের নাম ব্যবহার না করে ছদ্মনাম 'সি.এস.' ব্যবহার করেছেন।

ক্লে বিস্তারিতভাবে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন, 'লিভজ ফ্রম এ ডায়েরি'তে যা তৎকালীন ইংরেজ পাঠকদের আকর্ষণ করলেও, আজকের বাঙালি পাঠকদের আকর্ষণ করবে না। কিন্তু গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য এ কারণে যে, এ বইয়ে স্থিরচিত্রের মতো ফুটে উঠেছে মফস্বলে বসবাসরত ইংরেজ সিভিলিয়ানদের জীবনযাপন পদ্ধতি। জানা যায়, বাংলাদেশের কিছু কিছু অঞ্চলের তৎকালীন অবস্থা। সামাজিক ইতিহাসের উপাদান হিসেবে এর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। বিশালকায় এ গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ রবার্ট ফ্যারন ও গ্রন্থকারের আঁকা

অনেকগুলো ছবি [এচিং করছেন ফ্যারন]।

ক্লে পূর্ববঙ্গের যে যে অঞ্চলে কাজ করেছেন তার বিবরণই শুধু তুলে ধরা হলো, অনেক বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ আছে যা আজকের পাঠকের কাছে একঘেঁয়ে মনে হবে। এ রচনা তৈরির সময় তা বাদ দেয়া হয়েছে। অনেক জায়গায় সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

ক্লে'র বইয়ের অষ্টম অধ্যায়টি ঢাকা সম্পর্কিত। কিছুদিন আগে এই অধ্যায়ের উপর ভিত্তি করে ঢাকা নগর জাদুঘর একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। *ঢাকা : ক্লে'র ডায়েরি*। রূপান্তর করেছেন ফওজুল করিম। সে কারণে, এখানে আমি ঢাকা সম্পর্কিত বিবরণ সংক্ষিপ্ত করেছি। তবে, ক্লে তাঁর বিবরণে ঢাকার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে যা লিখেছেন এখানে তার খানিকটা পরিচয় তুলে ধরবো।

প্রথমেই তিনি উল্লেখ করেছেন ঢাকার বিদ্রোহ, ব্রেনান্ড, ফলিস মিল ও সেনানিবাস সম্পর্কে।

ঢাকার বিদ্রোহ বলতে তিনি ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে বুঝিয়েছেন। ক্লে ঢাকায় আসার অনেক আগেই এ বিদ্রোহ চুকে বুকে গিয়েছিলো। ক্লে অবশ্য পরিশিষ্টে এ বিদ্রোহকে গুরুত্ব দিয়ে, ঐ সময়কার ঘটনা সম্পর্কে ব্রেনান্ডের বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন। লালবাগে ঐ সময় সৈন্যদের অবস্থান সম্পর্কিত একটি মানচিত্রও যোগ করেছেন।

১৮৫৭ সালে পূর্ববঙ্গের প্রধান শহরে কি হয়েছিলো সে সম্পর্কে তথ্য কম; এ ক্ষেত্রে তৎকালীন ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল ব্রেনান্ডের রোজনামচা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এখানে বলে রাখা ভালো শুধু ব্রেনান্ডের রোজনামচার ওপর নির্ভর করলে পুরো ঘটনার একপেশে চিত্রই শুধু পাওয়া যাবে।

আইরিশ ব্রেনান্ড প্রথমে ছিলেন হিন্দু কলেজে। তারপর বদলি হয়েছিলেন হুগলিতে। সেখান থেকে ১৮৫৬ সালে নিযুক্ত হয়েছিলেন ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। ঐ সময়ের একটি সংবাদপত্র 'সম্বাদ ভাস্কর' এই নিযুক্তি সম্পর্কে লিখেছিলো–

"আমরা শ্রবণে আহলাদিত হইলাম ঢাকা কলেজের সর্বাধ্যক্ষ মেং ক্লিন্ট সাহেব উক্ত কর্ম্মত্যাগ করিয়া কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের এক্টিন প্রিন্সিপাল ও মেথামেটিক বিষয়ের প্রধানাধ্যাপক হইয়া কলিকাতায় আসিতেছেন, তাহার পদে মেং ব্রেনান্ড সাহেব নিযুক্ত হইবেন।"

ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে ব্রেনান্ড ছিলেন তৎকালীন ঢাকা শহরের একজন গণ্যমান্য নাগরিক। গণিতশাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিলো স্বীকৃত। তাছাড়া জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর আগ্রহ ছিলো প্রবল। ঢাকা কলেজের মাঠে তিনি একবার একটি সূর্যঘড়ি তৈরি করেছিলেন যা অনেকদিন পর্যন্ত ছিলো ঐ মাঠে। কলেজের ছাত্ররাও

দারুণ ভক্ত ছিলেন ব্রেনান্ডের। ঢাকা কলেজে তাঁর প্রাক্তন ছাত্ররা একবার তাঁর একটি গ্রন্থ *হিন্দু এ্যাস্ট্রনমি* ছাপাবার জন্য চাঁদা তুলে তাঁকে চার হাজার টাকা সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। ব্রেনান্ড অবসরগ্রহণ করেছিলেন ১৮৭৮ সালে।

ক্লে উল্লেখ করছেন, 'ফলিস মিল'কে সেনা ব্যারাক হিসেবে সেই সময় ব্যবহার করা হচ্ছিলো। এর আগে তা ছিলো রেসকোর্সের উত্তরে। তিনি রেসকোর্সের উত্তরে বলতে পল্টনকে বুঝিয়েছেন।

১৮৪০ সালে অনামা এক শিল্পীর আঁকা বুড়িগঙ্গার তীরের ঘরবাড়ির মধ্যে একটি দালানকে উল্লেখ করা হয়েছে, ঢাকা সুগার ওয়ার্কস কোম্পানি নামে।

শরিফ উদ্দিনও জানিয়েছেন, সেখানে একটি চিনির কল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো কিন্তু তা চলেনি কোনোদিন। ১৮৫০-এর দিকে তা গিয়েছিলো বন্ধ হয়ে। ১৮৫৮ সালের *ঢাকা নিউজ* পত্রিকায় দেখি, সেখানে একটি ময়দার কলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে অনুমান করে নেয়া যেতে পারে, চিনির কলটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর উইলিয়াম ফলি নামে এক ইংরেজ কলটি কিনে স্থাপন করেছিলেন একটি ময়দার কল এবং তখন তা পরিচিত ছিলো 'ফলিস মিল' নামে।

১৮৫৮ সালে, বিদ্রোহের সময় কলকাতা থেকে যেসব সরকারি সৈন্য এসেছিলো ঢাকায় তাদের একাংশকে রাখা হয়েছিলো এখানে। ক্লে'র সরকারি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, সরকার পরবর্তীকালে সেনাবাহিনী রাখার জন্য ফলিস মিলটি কিনে নিয়েছিলেন এবং ১৮৬৭ সালের সরকারি নির্দেশে মিল [দালান] এবং তার আশপাশের অঞ্চলকে ক্যান্টনমেন্ট হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিলো। সম্ভবত সেই সময় থেকেই দালানটি এবং এর আশপাশের অঞ্চল পরিচিত হয়ে ওঠে মিল ব্যারাক নামে।

ক্লে ঢাকায় এলিটদের ক্রীড়া-চর্চা সম্পর্কেও কিছু তথ্য রেখে গেছেন। খেলাগুলো ছিলো ক্রিকেট এবং পোলো। এখানে উল্লেখ্য যে, পুরনো কাগজপত্র যতোটা চোখে পড়েছে তাতে দেখেছি, উনিশ শতকে ঢাকায় ফুটবলের উল্লেখ প্রায় নেই বললেই হয়। কিন্তু ক্রিকেটের উল্লেখ আছে, এমনকি মফস্বলেও দেখা যায় ধনাঢ্যদের মধ্যে এর চল ছিলো। ধরে নিতে পারি, এ অঞ্চলে ক্রিকেটের আমদানি করেছিলেন সিভিলিয়ানরা। তাঁদের সঙ্গে 'নেটিভ' এলিটদের যোগাযোগের ফলে বাঙালি সমাজেও তা চালু হয়। ক্লে'র বিবরণ থেকে ধরে নিতে পারি, আজ থেকে দেড়শো বছর আগেও ঢাকায় ক্রিকেটের চল ছিলো। ক্রিকেট খেলার মাঠ ছিলো পুরানা পল্টনের কাছে হয়ত আজকের স্টেডিয়াম এলাকার কোনোখানে।

১৮৬৭ সালের ৩ এপ্রিল পোলো চালু হলো ঢাকায় এবং ক্রমেই দেখি, সিভিলিয়ানদের বিনোদনের একটি প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছে পোলো। পোলো ঢাকায় চালু করেছিলো মণিপুরীরা। মণিপুরের সিংহাসন নিয়ে এক বিরোধে

বৃটিশরা জড়িয়ে পড়েছিলো, বিরোধী মণিপুরীদের গ্রেফতার করে আনা হয়েছিলো ঢাকায়। ক্লে'র সময়, ঢাকার কালেকটর সিম্পসনের একটি চিঠি থেকে জানা যায়–

"ঢাকা থেকে ছয় মাইল দূরে তেজগাঁয়ে মণিপুরীদের ছোট এক লোকালয় আছে যেখানে ধৃত ব্যক্তিদের পাঠানো হচ্ছে। পূর্বোক্তদের অনেকে তেজগাঁয় চাষাবাদ করছেন। বর্তমানে ধৃত ব্যক্তিদের কেউ যদি চাষাবাদ করতে চায় তা হলে তাদের জন্যও জমির বন্দোবস্ত করা হবে।" মণিপুরীরা যেখানে বাস করতেন তাই পরিচিতি হয়ে ওঠে কালক্রমে মণিপুরী পাড়া হিসেবে। পোলো খেলার মাঠটি ছিলো খুব সম্ভব রমনার একপাশে, যেখানে এক সময় ছিলো ঢাকা ক্লাবের গলফ কোর্স।

বাকল্যান্ড বাঁধের কথা উল্লেখ করেছেন ক্লে। বাকল্যান্ড যখন কমিশনার, ক্লে তখন তাঁর অধীনে চাকরি করেছেন। ১৮৬৪ সালে ঢাকার কমিশনার নিযুক্ত হয়েছিলেন সি.টি. বাকল্যান্ড। পাঁচ বছর ছিলেন তিনি ঢাকায়। তাঁর আমলেই সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে পূর্তকার্য, বাড়িঘর নির্মাণে জোর দেওয়া হয়েছিলো। বাকল্যান্ড যখন ঢাকা ছেড়ে চলে যান তখন 'ঢাকাবাসী'রা বাকল্যান্ডকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন, নদী তীর বরাবর রাস্তাটি তৈরি করার জন্য। এটিই পরিচিত বাকল্যান্ড বাঁধ নামে। একটি পত্রিকার সংবাদে জানা যায়, এটি নির্মাণের জন্য খাজা আবদুল গনি, কালীনারায়ণ রায়, জগন্নাথ রায় চৌধুরী ও মোহিনীমোহন দাস ৬৫ হাজার টাকা দান করেছিলেন। ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত বাকল্যান্ড বাঁধ ছিলো পৌরসভার অধীন এবং তখন পর্যন্ত ঢাকাবাসীর অবকাশ কাটানোর একটি প্রধান জায়গা ছিলো এ বাঁধ। ১৯৬৩ সালে আইয়ুব খান বাকল্যান্ড বাঁধের স্বত্ব কেড়ে নিয়ে দেন অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন কর্তৃপক্ষকে। সেই থেকে ঢাকার একদা মনোরম জায়গাটি পরিণত হয়েছে কুৎসিত এক জায়গায়।

দোলাইখালের কথাও উল্লেখ করেছেন ক্লে। অবশ্য দোলাইখাল ব্যতীত গত শতকের পঞ্চাশ দশক পর্যন্ত বিবরণ সম্পূর্ণ হতে পারে না। ক্লে'র বর্ণনা থেকে বোঝা যাচ্ছে দোলাইখাল তখন অন্যতম জলপথ ছিলো। ময়মনসিংহ হয়ে ঢাকায় যাতায়াতের জন্য এবং বর্ষায় সিলেট থেকে আসা-যাওয়ার নৌকোও এই খাল ব্যবহার করতো। কারণ নারায়ণগঞ্জ হয়ে ঘুরে যাওয়ার চেয়ে এই খাল দিয়ে গেলে সময় বাঁচতো।

১৮৬৪ ও ১৮৬৫ সালে পঁচিশ হাজার টাকা ব্যয় করে সংস্কার করা হয়েছিলো দোলাইখাল। ১ এপ্রিল ১৮৬৭ থেকে সরকার এই খাল্লে চলাচলকারী যানবাহনের উপর ধার্য করেছিলো কর। করের হার ছিলো একশো মণি সব রকমের নৌকার জন্য [খালি অথবা মালামাল ভর্তি] দুই আনা, কাঠ বাঁশ ইত্যাদি ভেলার ক্ষেত্রে [পঞ্চাশ ফুট লম্বা এবং পাঁচ ফুট প্রস্থের বেশি নয়] চার আনা। খাল পার হওয়ার জন্য সময় দেয়া হতো তিনদিন। এরপর প্রতিদিন দিতে হতো ক্ষতিপূরণ হিসেবে

প্রদত্ত করের অর্ধেক।

বছরে সেই সময় দোলাইখাল থেকে প্রায় হাজার তিনেক টাকা আয় হতো। উদাহরণ হিসেবে ১৮৬৭-৭১ এই চার বছরে দোলাইখালের কর থেকে কি পরিমাণ আয় হয়েছিলো তার হিসাব দিচ্ছি–

১৮৬৭-৬৮	-	২৭২৪ টাকা
১৮৬৮-৬৯	-	৩১১৯ টাকা
১৮৬৯-৭০	-	৩৭৬৫ টাকা
১৮৭০-৭১	-	৩৮৫৩ টাকা

টঙ্গী ব্রিজ ও আয়রন সাশপেনশন ব্রিজের কথা উল্লেখ করেছেন ক্লে। টঙ্গীর পুল নির্মিত হয়েছিলো মুঘল আমলে। আয়রন সাশপেনশন ব্রিজ হলো লোহারপুল। ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ওয়ালটার্স নির্মাণ করেছিলেন এ পুলটি।

লোহারপুল নির্মাণ করা হয়েছিলো দোলাইখালের উপর। এখানে পুল না থাকায় খালের দু'ধারের লোকজনকে পোহাতে হতো নানা ঝনঝাট। তাছাড়া তখনকার উঠতি বন্দর নারায়ণগঞ্জের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যও একটি পুল প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিলো। সরকারি নথিপত্র অনুযায়ী, মুঘল আমলে এখানে একটি পুল ছিলো, কোম্পানি আমলে যা গিয়েছিলো ধ্বংস হয়ে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে ওয়ালটার্স পরিকল্পনা নিলেন দোলাইখালের ওপর পুল তৈরি করার। এ জন্য টাকা দরকার। ঢাকাবাসীর কাছে আবেদন জানালেন তিনি চাঁদার। ঢাকাবাসীও সাড়া দিয়েছেলেন সে আহবানে। ১৮২৮ সালে শুরু হয়েছিলো পুল নির্মাণের কাজ। প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আনা হয়েছিলো ইংল্যাণ্ড থেকে। দু'বছর লেগেছিলো লোহার তৈরি ঝুলন্ত এ পুল তৈরি করতে। এবং প্রায় একশো বছর এটি ছিলো ঢাকার একটি দ্রষ্টব্য। আমরা এখন যে পুল ব্যবহার করি তা অবশ্য আসল লোহার পুল নয়।

কেন্দ্রীয় জেলের কথা উল্লেখ করেছেন ক্লে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে মুঘল দুর্গটিকেই রূপান্তরিত করা হয়েছিলো জেলখানায়। ১৮৬৪ সালে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের জন্য একটি কেন্দ্রীয় জেল গঠনের প্রয়োজন হলে বাকল্যান্ড তা কুমিল্লায় স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন, অবশ্য তা কার্যকর হয়নি। ১৮৭৯ সালে ঢাকা জেল রূপান্তরিত হয়েছিলো কেন্দ্রীয় জেলে। আগে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে একজন কর্মকর্তা জেলের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা করতেন যিনি প্রায়ই হতেন কোনো আর্মেনিয়ান বা ইউরোপিয়ান। তবে ১৮৭৯ সাল থেকে নিয়োগ করা হয়েছিলো একজন জেল তত্ত্বাবধায়ক।

গ্রাহামের বিবরণে জেলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ঢাকায় ক্লে কার্যভার গ্রহণের বছর দুয়েক আগে স্থাপিত হয়েছিলো সরকার নিয়ন্ত্রিত ঢাকা পৌরসভা,

যেখানে ক্লে-কে মাঝে মাঝে করতে হয়েছিলো সভাপতিত্ব।

গণি মিয়ার কথা ঘুরে ফিরে এসেছে। তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত বলা নিষ্প্রয়োজন। যে ওয়াইজম্যানের কথা উল্লেখ করেছেন ক্লে, সেই ওয়াইজম্যান আমাদের কাছে পরিচিত শুধু ওয়াইজ নামে। বর্তমান বুলবুল ললিত কলা একাডেমী ভবনটি ছিলো তাঁর বাসগৃহ।

ঢাকা অবস্থানকালে, ক্লে উল্লেখ করেছেন, তিনি একটি রিপোর্ট রচনা করেছিলেন। রিপোর্টটি ১৮৬৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিলো *Principal Heads of the History and Sketches of Dacca Division* নামে। পূর্ববঙ্গের ওপর গবেষণার জন্য এখনও ঐ রিপোর্টটি মূল্যবান।

পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে গ্রাহাম আর ক্লের বইতেই বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে। কারণ, তাঁরা তাদের কেরিয়ারের বা চাকুরি জীবনের বড় অংশই কাটিয়েছিলেন পূর্ববঙ্গে। এ অঞ্চলে তারা নিঃসঙ্গ ছিলেন, কখনও কখনও কোনো অঞ্চলে একা ইউরোপিয়ান হিসেবে বসবাস করেছেন কিন্তু অভিযোগ করেন নি। পূর্ববঙ্গে বসবাস করাটা তারা উপভোগ করতে চেয়েছেন। তাই তাঁদের বিবরণে পূর্ববঙ্গের নিসর্গ নিয়ে বিস্তারিত বিবরণ আছে, খুঁটিনাটি অনেক বিষয়ের উল্লেখ আছে যা বর্তমান পাঠকের কাছে অকিঞ্চিৎকর কিন্তু তাঁদের কাছে তা ছিলো আগ্রহের বিষয়। দেশীয়দের সম্পর্কে খুব একটা কটু মন্তব্যও তারা করেননি যা পাওয়া যাবে বিমসের বিবরণে। এই দুই জনের লেখায় বিশেষ করে ক্লের লেখায় আমরা মফস্বল শহরগুলির গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া লক্ষ্য করি। বিশ শতকের গোড়ার দিকে কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। ঢাকা শহর সম্পর্কেও তাঁরা বিস্তারিত বিবরণ রেখে গেছেন।

আর, কারস্টায়ার্সের জীবন খুবই সাধারণ, সিভিলিয়ান হিসেবেও। কিন্তু, সমসাময়িক সিভিলিয়ানদের থেকে তাঁর চিন্তার জগৎ ছিলো ভিন্ন। এর প্রমাণ তাঁর স্মৃতিকাহিনী *দি লিটল ওয়ার্ল্ড অব অ্যান ইন্ডিয়ান ডিস্টিক্ট অফিসার*। লন্ডনের ম্যাকমিলান অ্যান্ড কোং ১৯১২ সালে গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলো।

স্মৃতি কাহিনী রচনার কারণ, প্রথম অধ্যায়েই লিখেছেন কারস্টায়ার্স, অধ্যায়ের শিরোনাম 'এ থট'। তিনি জানিয়েছেন ২৯ বছর ভারতে চাকরি করেছেন 'উইলদাউট ডিস্টিংশন'। অবসর নিয়েছেন ১৯০৮ সালে। তাঁর ভাষায়–

"This book is the story of a thought. From the time when I first landed in India to the time when I finally left it my great wish was to find a way of blending the will of the British Nation, the paramount power, with the will of the people among whom I worked."

এ বইতে তাঁর নিজের কথা তেমন নেই। কর্ম জীবনে উদ্ভূত নানা পরিস্থিতি

কী ভাবে মোকাবেলা করা যায় এবং জনস্বার্থে প্রশাসন কী করতে পারে তাই বিধৃত হয়েছে এ গ্রন্থে। কারস্টায়ার্স সেই সব সিভিলিয়ানদের একজন যিনি শাসক হয়েও কলোনি ও মানুষকে জানতে চেয়েছেন। কলোনির মানুষদের জীবনের উন্নয়ন ঘটাতে চেয়েছেন। বইটি তিনি উৎসর্গ করেছেন ভারতের গ্রামবাসীদের।

১৮৭২ সালে কারস্টায়ার্স আই সি এস পাশ করেন। দু'বছর প্রশিক্ষণের পর ভারতের উদ্দেশে রওয়ানা হন। প্রথমে পৌঁছান বোম্বে। সেখান থেকে কলকাতা। এখানে পৌঁছার পর জানতে পারেন তাঁকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে ত্রিপুরায়। সাল তখন ১৮৭৪। এরপর ১৮৭৮ সালে নিয়োগ পান ফরিদপুরের গোয়ালন্দের এস ডিও হিসেবে। সেখানে ছিলেন অল্পদিন। তার পর, শ্রীরামপুর, আলিপুর, আরা, মেদেনিপুরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে একই পদে ১৮৮৬ সালে নিয়োগ পান হাওড়ায়। সেখানে বেশিদিন থাকেন নি। ১৮৮৬ সালে নিযুক্ত হন সাঁওতাল পরগনার ডি.এম. হিসেবে।

সাঁওতাল পরগনাকে তিনি ভালোবেসেছিলেন। দীর্ঘদিন ছিলেন সেখানে। এরপর অবশ্য ভাগলপুর, চট্টগ্রাম ও বর্ধমানে কমিশনার হিসেবে কাজ করে ফের সাঁওতাল পরগণার কমিশনার হিসেবেই অবসর নেন ১৯০৮ সালে।

ইংল্যান্ডে ফিরে তিনি জ্ঞানচর্চায় মনোনিবেশ করেন। স্মৃতিকাহিনী ছাড়াও রচনা করেন *British Work in India, Human Nature in Rural India, A Plea for the Better Local Government of Bengal.*

কারস্টায়ার্স খুব আশাবাদী হয়ে তাঁর স্মৃতিকাহিনীর শেষে মন্তব্য করেছিলেন–

"The problems are continuing; and my solutions are the outcome of practical experiment. I permit myself, therefore, to hope that some of my plans will yet be thought worthy of a trial; and that they will bring some little benefit to the people among whom I lived many years and made good friends, and with whom so much of my heart still remains."

সিভিলিয়ান/শাসক হয়েও কারস্টায়ার্স যা অনুধাবন করতে পারেননি তা হলো, শাসকরা নিজেদের কাঠামোয় অনুসৃত নীতির বাইরে যায় না, বহিরাগতদের মতামতের ধার ধারে না এবং কলোনির মানুষের কল্যাণও কামনা করে না।

তাঁর গ্রন্থে গোয়ালন্দের ওপর একটি ছোটো অধ্যায় আছে। শিরোনাম 'গোয়ালন্দ'। এখানে তাই বিধৃত হলো– 'ভারতীয় এক জেলা অফিসারের ছোট পৃথিবী' নামে।

হ্যরম্যান মাইকেল কিশ্চ জন্মেছিলেন ১৮৫০ সালে লন্ডনে। পিতার চারপুত্র ও এক কন্যার মধ্যে তিনি ছিলেন কনিষ্ঠ। তাঁর পিতা ছিলেন ডাক্তার। ১৮৭৩ সালে

তিনি যোগ দিয়েছিলেন সিভিল সার্ভিসে, প্রথমে তাঁকে নিয়োগ দেয়া হয় হুগলিতে, সেখান থেকে বদলি করা হয় বিহারে। ঐ সময় সেখানে চলছিলো দুর্ভিক্ষ যা কিশ্চকে মর্মাহত করেছিলো। সেখান থেকে তিনি নিয়মিত দেশে বাবা মা ও অন্যান্যদের চিঠি লিখতেন। ১৮৭৪ থেকে ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত লেখা ও রক্ষিত এইসব চিঠিপত্রের ওপর ভিত্তি করে তাঁর কন্যা ১৯৫৭সালে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে, নাম *এ ইয়ং ভিক্টোরিয়ান ইন ইন্ডিয়া*। আমি অবশ্য এ গ্রন্থের জন্য আগে ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে রক্ষিত তাঁর চিঠিপত্র দেখেছিলাম, বইটি পাওয়ার পর সেটিই ব্যবহার করেছি।

সিভিলিয়ান হিসেবে কিশ্চের কেরিয়ার ভালোই ছিলো বলতে হবে। বিহারের পর তিনি বদলি হয়েছিলেন চাঁটগায়। ১৮৮৪ সালে নিয়োগ পেয়েছিলেন বাংলার পোস্টমাষ্টার জেনারেল হিসেবে। ১৮৮৮ সালে সিকিম যুদ্ধের সময় ডাকব্যবস্থা অব্যাহত রাখার আবদানের জন্য পুরস্কৃত হয়েছিলেন। ভারতের ডাকবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন এবং ১৮৯০ থেকে ১৯০৪ পর্যন্ত বিদেশে ভারতীয় ডাকবিভাগের হয়ে বিভিন্ন সম্মেলনে যোগ দেন। সি.এস. আই উপাধিও পেয়েছিলেন। ১৯০৯ সালে ঢাকা বিভাগের কমিশনার হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। প্রায় ৯২ বছর বেঁচেছিলেন তিনি। ১৯৪২ সালে যখন তিনি মারা যান তখন তাঁকে বিবেচনা করা হতো– ... at the time 'father' of the I.C.S."

কিশ্চ প্রায় প্রতি সপ্তাহে, সপ্তাহের একটি বিবরণ দিয়ে চিঠি লিখতেন। তাঁর চাকুরি জীবনের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান কালে চিঠিগুলি লেখা হয়েছিলো। এই চিঠিগুলিই সংকলিত হয়েছে গ্রন্থে। কিশ্চের প্রথম চিঠি পাটনা থেকে ১১ মার্চ ১৮৭৪ সালে। তারপর ত্রিহুত, মধুবনী, মণিপুর, চিনসুরা, ১৮৭৫ সালে চাঁটগা।

কিশ্চের চিঠিগুলি পড়ে সাধারণ মানের একজন আইসি এসের জীবন যাপন সম্পর্কে জানা যায়। সেই একই কাহিনী। লন্ডন থেকে কলকাতা, তারপর বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়া। যৌবনে প্রত্যন্ত অঞ্চলে পোষ্টিং, মধ্য বয়সে সদরে, অবসরের আগে কোনো বিভাগের কমিশনার বা কলকাতার সচিবালয়ে। একেবারে রুটিন জীবন। সাধারণের সঙ্গে সম্পর্ক বিহীন। নিসর্গ, বণ্যপ্রাণী, আবর্তিত জীবন। কিশ্চের চিঠিতে সাধারণ মানুষের কথা নেই যতোটা আছে বিভিন্ন সময় তাঁর পোষা বেজিগুলি সম্পর্কে।

এখানে পূর্ববঙ্গ থেকে লেখা কিশ্চের চিঠিগুলিই শুধু ভাবানুবাদ করেছি। অনেক জায়গায় সাধারণ অনেক বিষয় সম্পর্কিত ডিটেলগুলি সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছি বা বাদ দিয়েছি। প্রতিবেদনটির নাম 'ভারতে এক তরুণ ভিক্টোরিয়ান।'

১৮৮৫ সালে কুষ্টিয়ার কাছ থেকে লেখা তাঁর শেষ চিঠিটি পাই। সে সময় খুব সম্ভব তিনি ডাক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক। তিনি রামপুর বোয়ালিয়া

গিয়েছিলেন সফরে। এর আগে যেসব অঞ্চলে গিয়েছিলেন সেখানে তাঁর কর্মচারিরা তাঁর জন্য আরামদায়ক ব্যবস্থা করেছিলো। তারপর পৌঁছলেন রামপুর বোয়ালিয়া–

"At Rampur Bauleah, where I was yesterday, there was a regular avenue of evergreens and flowers erected in my honour from the entrance of the compound of the post office up to the steps which were covered with red cloth. At each place where I have been some rajah or zemindar has placed a carriage at my disposal during my stay, so that I have had no trouble to get about, I have always found that I know a number of officials who either wished to put me up or invited me to meals while I was in their station."

১৮৭৫ সালে চাঁটগায় নেমে একা কালেক্টারের খোঁজে বেরিয়েছিলেন। ১০ বছর পর তাঁর জন্যে সবাই অপেক্ষা করছে। এর জন্যই বোধহয় সিভিলিয়ানরা দেশ ত্যাগ, নিঃসঙ্গতা, সব মেনে নিতেন।

ফ্রানসিস স্ক্রাইন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারিনি। এটুকু জানা গেছে যে, ১৮৭১ সালে তিনি আইসিএস হিসেবে নিয়োগ পান। সে হিসেবে অনুমান করা যেতে পারে ১৮৬৯-৭০ সালে তিনি পরীক্ষায় পাশ করেন এবং প্রশিক্ষণ শেষে ১৮৭১ সালে সহকারি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগ পান পূর্ববঙ্গের কোনো এক জেলায়। তাঁর চাকুরি জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে বাংলায়। স্ক্রাইন আমাদের জন্য একটি মূল্যবান রিপোর্ট তৈরি করে গেছেন, তার শিরোনাম–

Memorandum on the Material Conditiom of the Lower orders in Bengal duing the ten years from 1881-82 to 1891-92. কলকাতা থেকে ১৮৯২ সালে প্রকাশিত হয়েছিলো। ১৮২৮ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত *বেঙ্গল পাষ্ট অ্যান্ড প্রেজেন্টে* তিনি স্মৃতিচারণমূলক একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন, নাম– *রুরাল বেঙ্গল ইন দা সেভেনটিস*। এখানে 'সত্তর দশকে গ্রামীণ বাংলা' শিরোনামে সংক্ষিপ্ত অনুবাদ দেয়া হলো।

স্ক্রাইনের এই রচনাটি খুবই ছোট। তাঁর নিজের সম্পর্কে তেমন কিছু তথ্য নেই সেখানে, তবে সিভিলিয়ানদের রুটিন জীবন, তাদের গোষ্ঠি দ্বন্ধ এবং সামগ্রিকভাবে মানুষের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির একটি পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি জানিয়েছেন তারা জনমানুষ থেকে বিছিন্ন এবং শাসক শাসিতের সম্পর্ক ১৮৫৭ সালের পর বদলে গেছে।

ভারতের অনেক সিভিলিয়ানের মতোই ছিলো জন বিমসের জীবন। ১৮৩০ সালে লন্ডনের উপকণ্ঠে গ্রীনউইচে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দাদা ছিলেন নামকরা ব্যারিস্টার। সম্পদশালীও ছিলেন কিন্তু পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে

তাঁর সম্পর্ক কখনই মধুর ছিলো না। এমনকী ছেলেদের সঙ্গেও কারণ, একগুঁয়ে স্বভাব। বিমসের বাবা যাজকবৃত্তি বেছে নিয়েছিলেন ফলে খুব একটা স্বচ্ছল ছিলো না বিমসের পরিবার, আভিজাত্য থাকলেও। বিমস যেদিন জন্মগ্রহণ করেন সেদিন ইংল্যান্ডের রাজা চতুর্থ উইলিয়াম পরলোকগমন করেন এবং রাণী হন ভিক্টোরিয়া। জন বিমস তারপর তাঁর অধীনে চাকুরি করেছেন এবং যখন অবসর নিয়ে ফিরে এসেছেন লন্ডনে তখনও রাজত্ব করছেন ভিক্টোরিয়া।

বিমসের বাবা লন্ডনের বিভিন্ন চার্চে চাকুরি করেছেন। আট সন্তানের পরিবার, বেতন বছরে ১০০ পাউন্ডের বেশি নয়। তারপরও বিমসের পড়াশোনার দিকে দৃষ্টি রেখেছেন। প্রথমে তাকে ভর্তি করা হয় স্ট্রিমাস একাডেমিতে। ১৮৪৭ সালে ভর্তি হন মার্চেন্ট টেইলরে 'থার্ডফর্মে'। এ প্রতিষ্ঠানে প্রধানত ক্লাসিকস শিক্ষা দেয়া হতো। ১৮৫৬ সালে সুযোগ পান হেইলিবারি কলেজে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে সিভিলিয়ান পদে কিছু নিয়োগের জন্য কোম্পানির পরিচালক জে. পি. উইলোবাই সুযোগ পান। তিনি ছিলেন মার্চেন্ট টেইলরের পুরনো ছাত্র। সুতরাং, তিনি তাঁর প্রাক্তণ স্কুলের ছাত্রদের আগে সুযোগ দিতে চাইলেন। হেডমাস্টার বিমসের নাম প্রস্তাব করলেন। আসলে বিমসের ইচ্ছে ছিলো অক্সফোর্ডে পড়াশোনার কিন্তু অক্সফোর্ডের প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন নি। সুতরাং, চাকুরির আশায় নমিনেশন দিলেন এবং কোম্পানির প্রশিক্ষণ কলেজ হাইলেবারিতে ১৮৫৬ সালে যোগ দিলেন নির্বাচিত ক্যাডেট হিসেবে। দু'বছরের প্রশিক্ষণ শেষে কোম্পানির কভেনান্টেড সিভিল সার্ভেন্ট হিসেবে চুক্তি সই করলেন। বছরে বেতন ৪০০ পাউন্ড। ১৮৫৮ সালে এসে পৌঁছলেন কলকাতায়।

কলকাতায় পৌঁছার পর, কিছুদিন প্রশিক্ষণের পর নিয়োগ পান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। ১৮৫৯ থেকে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত কাজ করেন পাঞ্জাব, গুজরাট, আম্বালা, লুধিয়ানায়। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বনাবনি না হওয়ায় তাঁকে বদলি করা হয় তৎকালীন বাংলায়। ১৮৬১ থেকে ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পদে বিহারের শাহবাদ, পূর্ণিয়া ও চাম্পারণে কাজ করেন। তারপর ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টর হিসেবে উড়িষ্যার বালাসোরে এবং ১৮৭৩-৭৭ পর্যন্ত উড়িষ্যার কমিশনার হিসেবে কটকে কাজ করেন। উড়িষ্যার কর্মজীবনই পছন্দ করেছিলেন বিমস।

এখানে লে. গভর্নরের সঙ্গে তার বনাবনি না হওয়ায় শাস্তিস্বরূপ তাঁকে চট্টগ্রামের কমিশনার করে পাঠানো হয় যা তিনি মোটেও পছন্দ করেন নি। তাঁর আত্মজীবনীতে এই ক্ষোভ তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে। চট্টগ্রাম পর্বের পর তিনি আবার ভাগলপুর, প্রেসিডেন্সীর কমিশনার এবং সর্বশেষে রাজস্ব বোর্ডের সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮৯৩ সালে অবসরগ্রহণ করে ফিরে যান লন্ডনে এবং ১৯০২ সালে সেখানেই পরলোক গমন করেন।

বিমসের চাকুরি জীবন ছিলো ঝঞ্ঝাময়, তাঁর মেজাজ ছিলো তাঁর দাদার মতো। চাকুরি জীবনে ওপরঅলাদের সঙ্গে তাঁর বহুবার বিবাদ হয়েছে, চাকুরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্তও হয়েছেন কিন্তু তাঁকে দমানো যায়নি। পিনাল পোষ্টিং পেয়েছেন কিন্তু অন্তিমে পৌঁছেছিলেন সিভিল সার্ভিসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদে।

ভারতীয়দের সম্পর্কে তাঁর ভালো ধারণা ছিলোনা। তাঁর ক্যাডারের বাঙালি ভারতীয় সিভিলিয়ানদের মনে করতেন ষড়যন্ত্রকারি হিসেবে যারা সাম্রাজ্যের ভিত নাড়িয়ে দিতে চায়। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের অপছন্দ করতেন। তাঁর বক্তৃতা বিবৃতি, লেখায় দেখা যায় বাঙালিদের প্রতি তাঁর এক ধরনের চাপা জাতি বিদ্বেষ ছিল। ১৮৮৬ সালে ইলবার্ট বিল বিরোধী আন্দোলনের সময় তিনি মন্তব্য করেছিলেন–

"the measure is not called for by any administrative inconvenience [in having Europeans judged by Europeans], that it is not desired by the Natives as a body, that it is intensely distasteful and humiliating to all Europeans, and that it will tend seriously to impair the prestige of British rule in India. In fact, under every simple and insignificant form, it conceals the elements of a revolution which may ere long prove the ruin of the empire." [১৮৪]

লক্ষ্যণীয়, এই বিমসই ভারতীয় ভাষা নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে একজন পথিকৃত। তাঁর এই জ্ঞানচর্চা 'ভারত চর্চা'র ক্ষেত্রে তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে, না হলে অনেক আইসএসের মতো তিনিও স্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতেন। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন, "The founder of a science, a pioneer who laid down the great principles of comparative linguistics of the aryan languages."

ঝঞ্ঝাময় কর্মজীবনেও বিমস ভাষা চর্চা করেছেন। সাত আটটি ভাষা তিনি শিখেছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে তিনখণ্ডে প্রকাশিত *Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages In India (1872-79)* এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *Outline of Indian Philology (1867)* এবং *Grammar for the Bengali Language.* তাঁর অসম্পূর্ণ আত্মচরিত *Memoirs of a Bengal Civilian* প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর। এখানে সেই স্মৃতিকথা থেকে চট্টগ্রাম অংশটির ভাবানুবাদ প্রকাশিত হলো– 'বিমস ও চট্টগ্রাম' নামে।

স্যার আর্থার ড্যাশ (১৮৮৭-১৯৭৪) ১৯১০ সালে যোগ দিয়েছিলেন চাকরিতে এবং একটানা বত্রিশ বছর চাকরি করার পর অবসর নিয়েছিলেন ১৯৪২ সালে। ড্যাশের চাকরি জীবনের বৈশিষ্ট্য হলো, চাকরি জীবনের তাঁর প্রায় পুরোটা সময় কেটেছে পূর্ববঙ্গে। চট্টগ্রামে তাঁর চাকরি জীবনের শুরু। ১৯১৯ সালে নিযুক্ত হয়েছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের পলিটিক্যাল এজেন্ট। ত্রিপুরার কালেক্টর হিসেবে এটি

ছিলো তাঁর অতিরিক্ত দায়িত্ব। চাকরি জীবনের শেষ পর্যায়ে বাংলা সরকারের শিক্ষা সচিব পদে উন্নীত হয়েছিলেন। ১৯৪২ সালে, বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য তিনি সিভিল সার্ভিস থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ভারত বিভাগের পর ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়। তিনিই ছিলেন কমিশনের প্রথম চেয়ারম্যান। ১৯৫১ সালে অবসর গ্রহণের পর ফিরে যান লন্ডনে।

লন্ডনে অবসর জীবনযাপনের সময় ড্যাশ তাঁর আত্মজীবনী লেখা শুরু করেন। ১৮৮৭ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত নিজ জীবনের ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন আট অধ্যায়ে। ১৯৬৫ সালে আত্মজীবনবীর টাইপ করা কপি দান করেন ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে।

লন্ডনের ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে কাজ করার সময় অপ্রকাশিত এই পাণ্ডুলিপিটি খুঁজে পাই এবং এ থেকে পূর্ববঙ্গ বা বর্তমান বাংলাদেশে তাঁর কর্মজীবনের অংশটুকু বেছে নিয়ে নিবন্ধটি রচনা করেছি। বা আরো নির্দিষ্টভাবে বলা যেতে পারে, ড্যাশের আত্মজীবনী অবলম্বন করে নিজের ভাষায় নিবন্ধটি রচিত হয়েছে– নাম 'কোই হ্যায়।'

ড্যাশ আত্মজীবনীর কোনো নামকরণ করেননি। বর্তমান নিবন্ধের নাম আমার দেয়া।

নতুন শতকে সিভিলিয়ানদের জীবনধারা কী ভাবে বদলে যাচ্ছিলো এবং অন্তিমে তার পরিণতি কী হলো সে সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাওয়া আর্থার ড্যাশের আত্মজীবনীতে। এই আত্মজীবনীটি সুদীর্ঘ।

ব্রিটিশ রাজ এবং পাকিস্তানের পতন দু'টিই ড্যাশ দেখেছেন। তিনি যখন চাকুরিতে যোগ দেন যখন আইসিএসদের প্রতিপত্তি ছিলো কিন্তু 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম ক্যাডার'-কে বিশেষ চোখে দেখা হতো। তবুও তো আইসিএস, যে কারণে ড্যাশ অ্যাকটিং চিফ সেক্রেটারিও হয়েছিলেন। তবে, সে সময় ভারতীয়দের রাজনৈতিক অধিকার বৃদ্ধি পাচ্ছে, জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতায়ণ শুরু হয়েছে যেটি স্বাভাবিক ভাবেই সিভিলিয়ানদের পছন্দ ছিলো না। টেবিলের এপাশ থেকে ও পাশে তাদের স্থান। যে কারণে ড্যাশের আত্মজীবনীতে দেখি তৎকালীন জনপ্রিয় প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধিদের সম্পর্কে কটু মন্তব্য ছাড়া ভালো কোনো মন্তব্য নেই। সাম্রাজ্যের অন্তিম পর্বে ইংরেজ সিভিলিয়ানদের মনের এই অবস্থা দেশিয়দের বোঝার কথা নয়। অন্যদিকে 'নেটিভ' সিভিলিয়ানদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছিলো এবং তাঁরাও শ্বেতাঙ্গ আইসিএসদের সবকিছু মেনে নিতে রাজি ছিলেন না।

ড্যাশের লেখায় বিশ শতকের পূর্ববঙ্গের প্রকৃতি, কাঠামোগত অবস্থা, অর্থনীতি সম্পর্কে অনেক তথ্য আছে, নিজ সার্ভিসের অর্ন্তদ্বন্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত

আছে কিন্তু দেশিয়দের সম্পর্কে বিশদ বিবরণ নেই। ভারতের সামগ্রিক রাজনৈতিক অবস্থাও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে পারেনি। তারা ছিলেন বিশ শতকের আই সি এস কিন্তু মনে প্রাণে উনিশ শতকের। একেই বলে সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি।

আই সি এস হয়ে ১৯০৭ সালে রবার্ট রীড পৌঁছেন কলকাতায়। তিনি ছিলেন বাংলা ক্যাডারের। কলকাতায় পৌঁছার পর তিনি কোথায় যেতে চান জিজ্ঞেস করা হলে তিনি রাঁচির প্রতি আগ্রহ দেখান। কারণ, তাঁর পূর্ব পরিচিত কয়েকজন সেখানে ছিলেন। রাঁচি থেকে শুরু হয় তাঁর চাকুরি জীবন।

রীডের চাকুরি জীবন কোথাও খুব স্থায়ী হয়নি। রাঁচি, মুজাফফরপুর হয়ে ব্যারাকপুরে নিযুক্ত পান। এরপর ১৯১১ সালে ছুটিতে চলে যান লন্ডন। ফিরে এসে কলকতায় সচিবালয়ে যোগ দেন সহকারি সচিব হিসেবে। আবার ছুটিতে যান ১৯১৪ সালে। ফিরে এলে, দুই বছরে ছয়বার বদলি হন। ১৯১৬ সালে যোগ দেন সেনাবাহিনীতে। যুদ্ধ শেষে ১৯২০ সালে নিযুক্তি পান রাজশাহীর ডি. এম. বা ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হিসেবে। এখানেই তাঁর নিয়োগ কাল খানিকটা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিলো।

রাজশাহীতে থাকার সময় সেই পিগ স্টিকিং করতে গিয়ে আহত হন। ফলে, রাজশাহীতে থাকার মেয়াদ শেষ হলে আরো দু'বছর কাটান ছুটিতে। ১৯২৫ সালে মেদেনীপুরে কালেকটর। দু'বছর পর নিযুক্তি পান কৃষিও শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে। ১৯৩০ সালে ফের জলপাইগুড়ির ডি. এম. এবং কিছু দিন পর রাজশাহীর কমিশনার।

এখানেও কমিশনার হিসেবে বেশিদিন থাকেন নি। তাঁকে নিয়োগ দেয়া হয় এরপর অস্থায়ী চিফ সেক্রেটারি হিসেবে, পরে স্থায়ী হন। এ সময় আবার লন্ডনে ছুটি কাটাতে যান, ফিরে এলে তাঁকে আসামের গভর্নর করা হয়। ১৯৪৩ সালে গভর্নর হিসেবে অবসর নেন। তিনি সরকার থেকে কে সি এস আই ও কে সি আই ই উপাধি পান।

স্যার রীড লন্ডনে ফিরে আসার পর অবসর সময়ে সিভিলিয়ান জীবন নিয়ে একটি পান্ডুলিপি রচনা করেন। ১৯৬৪ সালে তা দেন প্রকাশনার জন্য। কিন্তু পান্ডু-লিপি জমা দেয়ার দু'মাসের মধ্যেই মারা যান। পরে, উপমহাদেশ বিশেষজ্ঞ ইয়ান স্টিফানের সম্পাদনায় ১৯৬৬ সালে লন্ডনের আর্নেস্ট বেন প্রকাশ করে স্যার রবার্ট রীডের আত্মজীবনী- *ইয়ার্স অফ চেঞ্জ এন বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম।*

গ্রন্থটি দু'পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে বাংলা ও দ্বিতীয় পর্বে আসামের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এ দু'জায়গায় একজন সিভিলিয়ানের জীবনে যা ঘটেছে তাই তিনি লিখেছেন। জীবন ঐ একইরকম ছিলো, বৈচিত্র্যহীন। তবে, রীডের সময়টা রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। রীড নিজেই লিখেছেন, তিনি রাজনৈতিক

ইতিহাস লিখতে চান নি, আর ঘটনাস্থল থেকে ছিলেন সবসময় দূরে। তবে, তাঁর আত্মজীবনীতে একটি বিষয় পরিষ্কার, অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ানের মতো, ভারতে শাসনের জন্য যে মন্টেগু চেমসফোর্ড আইন হয়েছিলো তা তাঁর পছন্দ হয়নি। শ্বেতাঙ্গ হয়ে শ্যামল বা কৃষ্ণবর্ণ মন্ত্রিদের অধীনে চাকুরি করা তাদের জন্য কঠিনতর হয়ে উঠেছিলো।

আগেই উল্লেখ করেছি, রীড একজায়গায় বেশিদিন চাকুরি করেননি। শুধু রাজশাহীতেই ডি. এম. হিসেবে খানিকটা বেশি সময় কাটিয়েছিলেন। তাঁর গ্রন্থে সেই সময়কাল বিধৃত হয়েছে 'Sport, Politics and Flood' শিরোনামে এখানে যা সংকলিত হলো 'ক্রীড়া, রাজনীতি ও বন্যা' নামে।

রবার্ট রীডর আরেকটি স্মৃতিচারণমূলক নিবন্ধ খুঁজে পেয়েছি। অপ্রকাশিত এই নিবন্ধের নাম 'বম্ব অ্যান্ড পিস্তল ইন এ বেঙ্গল ডিসট্রিকট'।

১৯৩১ সালের নভেম্বরে তিনি চট্টগ্রামের কমিশনার নিযুক্ত হন। বেশিদিন সে পদে ছিলেন না। পরের বছর মার্চ মাসে চলে যান। তখন চট্টগ্রাম অস্ত্রগার লুণ্ঠনের পরবর্তি অবস্থা। চট্টগ্রামে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। রীডের এ লেখায় পুরো ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। বিভিন্ন অঞ্চলে বিপ্লবীদের কর্মকান্ডের সাধারণ একটা বর্ণনা আছে। তবে, নতুন কোনো তথ্য নেই।

ফিলিপ এডমুন্ড স্ট্যানলি ফিনি আইসিএস পরীক্ষা পাশ করেছিলেন তবে পেয়েছিলেন পুলিশ সার্ভিস। সে পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত বিবরণগুলির মধ্যে তারটি ব্যতিক্রম।

১৯০৪ সালে উত্তর ইংল্যান্ডে এক দরিদ্র পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা ছিলেন গির্জার সহকারি। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। ছেলেবেলা থেকেই তিনি সৈনিক হওয়ার বাসনা পোষণ করতেন। কিন্তু, স্যান্ডহার্স্টে পাঠাবার মতো পয়সা তাঁর পিতার ছিলো না। তাঁর এক চাচা ছিলেন ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসে। তাঁর পরামর্শে তিনি ১৯২৬ সালে আই সি এস পরীক্ষা দিলেন। সবাইতো বটেই তিনি নিজেও আশ্চর্য হলেন যখন দেখলেন যে তিনি পাশ করেছেন এবং পুলিশ সার্ভিস পেয়েছেন। সেক্রেটারি অব স্টেটের সঙ্গে কভোনান্ট বা চুক্তি স্বাক্ষরের পর আরো অবাক হলেন যখন দেখলেন তাঁর বেতন মাসে ৪৫৫ রূপি (৩৩.৩৭ পাউন্ড)। ফিনির ভাষায় ঐ টাকা তাঁর মনে হয়েছিলো– "...indeed it seemed so to this impecunious son of a poor person, of Rupees 450 per month while on probation. This cheered me."

এরপর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো তিনি কোন প্রদেশে চাকরি করতে ইচ্ছুক। তিনি প্রথমে দিয়েছিলেন পাঞ্জাব। তারপর *টাইমস* পত্রিকায় একদিন সন্ত্রাসবাদ সংক্রান্ত খবর দেখে ঠিক করলেন বাংলায় যাবেন। তাই জানালেন। তাঁর মনে

হয়েছিলো– "This is the life for me, I shall be riding round on my horse with my revolver dealing with terrorists."

প্রথমেই তাঁকে পাঠানো হয় সারদা পুলিশ প্রশিক্ষণ কলেজে। এরপর নিয়োগ পান নদীয়া (১৯২৬-১৯২৭), ব্যারাকপুর (১৯২৭-৩০), বক্সা ডুয়ার্স ক্যাম্প (১৯৩০-১৯৩১), দেউলি জেল (১৯৩২-৩৪), রংপুর ও বরিশাল (১৯৩৬-৩৭), কলকাতা পুলিশ (১৯৩৮-৪০), দিল্লী-কলকাতা (১৯৪৬-৪৭)। ১৯৩৭ সালে লন্ডনে ষষ্ঠ জর্জের করোনেশন উপলক্ষে প্যারেডে ইন্ডিয়ান পুলিশ কনটিনজেন্টের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। ভারত ত্যাগের পর ইংল্যান্ডে ১১ বছর ব্যবসা বাণিজ্য করেন, আর তারপর ৬ বছর কাটান মধ্য আফ্রিকার নিয়াসাল্যান্ডে স্পেশাল পুলিশের প্রধান হিসেবে। ১৯৩৭ সালে অর্ডার অব দি ব্রিটিশ এম্পায়ার উপাধিতে ভূষিত হন।

১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে তিনি তাঁর আত্মজীবনী রচনা শেষ করেন। ১৯৮০ সালে মারা যান। তাঁর ছেলে ক্রিস চাকুরি উপলক্ষে বাংলাদেশে আসেন ১৯৮৮ সালে। ছেলেবেলায় পিতার কাছে শোনা চাকুরি জীবনীর স্মৃতি আবার উজ্জিবীত করে তাঁকে। পিতার আত্মজীবনী প্রকাশের বন্দোবস্ত করেন তিনি। ২০০০ সালে ঢাকার ইউ পি এল প্রকাশ করে ফিনির আত্মজীবনী– *জাস্ট মাই লাক : মেমোয়ার্স অপ এ পুলিশ অফিসার অফ দি রাজ।*

এখানে পূর্ববঙ্গ সংক্রান্ত অধ্যায়গুলিই সংকলিত হয়েছে 'পূর্ববঙ্গে পুলিশ জীবন' শিরোনামে।

ফিনির বিবরণ নেহায়েত সাদামাটা। গরিব ঘরের ছেলে চাকুরি করতে এসেছেন। দশ পাঁচজনের মতো চাকুরি করেছেন। আই সি এসদের পরই ছিলো তাদের স্থান সুতরাং, তাদের ও আই সি এস [ডি এম. বা জেলা জজ] জীবন রীতিতে খুব পার্থক্য ছিলো না। অফিসের কাজ, ক্লাব, অবসরে শিকার। খেলাধুলায় ঝোঁক থাকায় ফিনি যেখানে গেছেন সেখানেই পুলিশদের নিয়ে ফুটবল বা হকি দল গড়েছেন, এটিই ব্যতিক্রম। তবে, তাঁর বর্ণনায় একটি বিষয় লক্ষণীয়, আই সি এসের ভারতীয়করণ এবং সহকর্মী অশ্বেতাঙ্গদের প্রতি এক ধরনের জাতিদ্বেষ মূলক মন্তব্য যা পাই অন্যান্যদের লেখায়, ফিনির বিবরণে তা অনুপস্থিত। ভারতীয় ওপরঅলার অধীনে তিনি নির্বিঘ্নে কাজ করেছেন, কটু মন্তব্য করেননি, প্রশংসাই করেছেন। হয়ত বিষয়টি তাঁর পছন্দ ছিলো না কিন্তু চাকুরির খাতিরে তা মেনে নিয়েছেন।

বর্তমান সংকলনের একমাত্র ব্যতিক্রমি বিবরণ মাইকেল ক্যারিটের। মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম, বাবা ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের প্রভাষক। ১৯২৪ সালে ক্যারিট নিজেই অক্সফোর্ডের কুইনস কলেজে ভর্তি হন স্কলারশিপ পেয়ে

ধ্রুপদী সাহিত্য পড়ার জন্য। কিন্তু সময় বদলে যাচ্ছিলো। ধ্রুপদী সাহিত্য পড়ে দেখলেন চাকরির বাজার মন্দা। বয়স তখন ২২। ১৯২৮ সালে বসলেন আই সি এস পরীক্ষায় যা তিনি কখনও দেবেন বলে ভাবেননি। ফেল করলেন। পরের বছর আবার কোচিং স্কুলে ভর্তি হয়ে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করলেন। একবছর প্রশিক্ষণ শেষে জানলেন তাঁকে বাংলা ক্যাডারে দেয়া হয়েছে যা কারো পছন্দ ছিলো না। যা হোক ১৯৩০ সালে লন্ডন থেকে তিনি বোম্বে পৌঁছলেন চাকুরিতে যোগ দেয়ার জন্য।

প্রথমে মেদেনিপুরে সহকারি, তারপর আসানসোল, টাঙ্গাইলে এস. ডি. ও. সচিবালয়ে স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়ে চাকুরির পর ছুটিতে যান লন্ডন। সেখানে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ হয় বৃটিশ কম্যুনিস্ট পার্টির বেন ব্র্যাডলির যাঁকে মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছিলো। ক্যারিট লিখেছেন, অক্সফোর্ডে থাকার সময় "I was mildly progressive in outlook but non-political."

আই সি এসের একশো বছরের ইতিহাসে কেউ সমব্যাথী হয়েছেন মার্কসবাদের এ রকম উদাহরণ নেই। সে জন্য ক্যারিটের মার্কসবাদে ঝোঁক খানিকটা অসম্ভব মনে হতে পারে। আসলে ঐ সময় বৃটেনের তরুণদের একাংশের মানসিক পরিবর্তন হচ্ছিলো। মেদেনীপুর, আসানসোল এবং টাঙ্গাইলে কাজ করার অভিজ্ঞতা তাঁর কাছে সুখপ্রদ ছিলো না। লিখেছেন, ক্যারিট "The indiscriminate beating-up of the whole villages which was organiged by senior police officers in Midnapore after Peddies murder; the daily misery of dealing with administration of the Detention camps; the thickening atmosphere of fear and hostility between the communities; the introduction (without public knowledge) of Military Intelligence officers with their staff to work independently of the constitutional machinery of governments; the institution of special tribunals to try political cases without juries and the selection of a panel of politically reliable judges to sit on them; .. and so on."

এসব কিছু এবং তারা যা বলে ও যা করে তার মধ্যে বিরাট পার্থক্য তাঁর মনে অভিঘাতের সৃষ্টি করেছিলো। "The gap between the professed benefit of civilized rule and the administrations outspoken respect for Hitler and his new order that undermind me."

লন্ডন থেকে তাঁর ভাই তাকে বামপন্থি *নিউ স্টেটসম্যান* পাঠাতেন। এর মতামতও তাঁকে প্রভাবিত করেছিলো। টাঙ্গাইল থেকে ছুটিতে যান তিনি লন্ডন। আগেই বলেছি যোগাযোগ হয় ব্র্যাডলির সঙ্গে। তিনি তাঁকে পরামর্শ দেন ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রাখার। ফিরে এসে তিনি যোগযোগ রাখেন ও

পার্টির হয়ে কিছু কাজ শুরু করেন। কিন্তু বেশিদিন তা চালাতে পারেন নি। যখন তাঁর মনে হলো এ যোগাযোগ উদঘাটিত হতে পারে তখন তিনি ১৯৩৮ সালে পদত্যাগ করে লন্ডন ফিরে যান। পরবর্তী বছরগুলিতে অধ্যাপনা করে সময় কাটান।

তাঁর এই কাহিনী অজানাই থেকে যেতো। জ্যোতি বসু ক্যারিটকে লিখেছিলেন, তাঁরা পার্টিতে থাকার সময় তাঁর কাহিনী শুনেছিলেন। ১৯৮৬ সালে তাঁর আত্মস্মৃতি প্রকাশের মাধ্যমে ক্যারিট তাঁর নীরবতা ভঙ্গ করেন। ১৯৮৬ সালে কলকাতা থেকে রূপা অ্যান্ড কোং প্রকাশ করে মাইকেল ক্যারিটের *এ মোল ইন দা ক্রাউন*। টাঙ্গাইলে মহকুমা হাকিম থাকার সময় তাঁর অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন 'ওয়ালন্ড অব মেনি ওয়াটার্স' অধ্যায়ে। এখানে তারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংকলিত হলো 'একজন কমিউনিষ্ট আই সি এস' নামে।

এ অধ্যায়ে যে চমকপ্রদ কোনো তথ্য বা বিবরণ আছে তা নয়। সাদামাটা জীবন যাপনের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। বিস্তীর্ণ জলরাশি, নৌকায় ভ্রমণ, আবহাওয়া যা তাঁকে মুগ্ধ করেছে বিদেশি হিসেবে তাই তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন যা বর্তমান পাঠকের অজানা নয়। কিন্তু মাত্র এই একজনের লেখাতেই ভারতীয়দের প্রতি কমিটমেন্ট লক্ষ্য করা যায় এবং এর কারণ ঐ একটিই, মার্কসবাদের প্রতি দুর্বলতা। এবং তিনি তা পরিষ্কার ভাষায়ই বলেছেন–

"Yes, it has certainly been worthwhile; not in the sense of goals achieved or even of much reward for all the effort spent, but commitment to a cause, a faith or goal social, political, religious or whatever, that is shared with others and is other-directed-and not just for personal power, fame, wealth or a good time-gives life coherence and significance even in the days of failure; to the uncommitted, as I was when I arrived in India, is to be ineffectual, an old rope dangling from the brunch of a tree that was once long ago the children's play-place."

॥ ১৩ ॥

আঠারো জনের বিবরণ এখানে সংকলিত হয়েছে। ব্যাপ্তি ১৭৭২ থেকে ১৯৪৭-প্রায় দু'শতাব্দী। শুরুতে যে তাত্ত্বিক কাঠামো আলোচিত হয়েছে সে আলোকে বিবরণগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, অক্ষরিক অর্থেই তা মিলে যাচ্ছে। যে আঠারো জনের বিবরণ আলোচিত হয়েছে তারা বৃটেনের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন সময় এসেছেন। সবার পারিবারিক পটভূমি মোটামুটি একই রকম, গরিব বা অল্পবিত্ত। কেউ এসেছেন আয়ারল্যান্ড থেকে, কেউ স্কটল্যান্ড বা কেউ ইংল্যান্ড থেকে। তাঁদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, মনোভাবে খানিকটা ভিন্নতা থাকতে পারে কিন্তু মূল

বিষয় সাম্রাজ্য রক্ষায় কারো দ্বিমত ছিলোনা।
এখানে যারা সিভিল সার্ভিসে ছিলেন শুধু তারাই নয় পুলিশ বা সামরিক বিভাগে ছিলেন, এক কথায় মেট্রোপলিটন থেকে সাম্রাজ্য রক্ষায় এসেছিলেন তাদের সবাইকে সিভিলিয়ান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

লিন্ডসে কোম্পানির আদি সিভিলিয়ান। তাঁর লক্ষ্য ছিলো একটিই, কী ভাবে স্বল্প সময়ে ব্যবসা করে দেশে ফিরে 'নবাবের' মতো দিন কাটানো যায়। এ জন্য যা যা দরকার তা তা তিনি করেছেন এবং একই সঙ্গে সাম্রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত করে সম্পদ আহরণ করা যায় সে বিষয়ও ভেবেছেন। তিনি ছিলেন স্কটল্যান্ডের। বুখানন অন্যান্য সিভিলিয়ান থেকে ভিন্ন এই অর্থে যে তিনি জ্ঞান চর্চা করতে চেয়েছেন। কিন্তু এই জ্ঞানচর্চারও মূল বিষয় ছিলো সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক বিষয়টি কী ভাবে জোরদার করা যায়। পোগসনের জন্ম আয়ারল্যান্ডে। সুন্দরবন দেখে তাঁর মনে হয়েছে এখানে উপনিবেশ গড়া যেতো। এবং ইংল্যান্ডের পরিপ্রেক্ষিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন যে, আয়ারল্যান্ডে অসন্তোষ, দাঙ্গা মোকাবেলা করা হচ্ছে বেয়নেট, ফাঁসি দিয়ে, কিন্তু 'মাইগ্রেশন' ঠেকানো যাবে না। কোম্পানি যে ভারত দখল করছে এবং কোম্পানির চাকুরেরা যে ব্যবসা করছে এটি তার কখনও মনে হয় নি। বাংলা সম্পদশালী দেশ কিন্তু এর মানুষরা নিরন্ন। কেনো যে নিরন্ন তা বুঝতে পারেননি। কিন্তু, অনুভবটা এসেছে, যেহেতু তিনি আয়ারল্যান্ডের। চট্টগ্রাম ভ্রমণে তাঁর মনে হয়েছিলো চা, কফি আর মশলার চাষ করা যাবে এবং "আমাদের সাম্রাজ্যের এই ইন্টারেস্টিং অংশে যোগ হবে নতুন মূল্য।" ১৮৫৮ সালের পর টেইলর তাঁর কর্তৃপক্ষ দ্বারা 'অবহেলিত' 'অবমূল্যায়িত' হয়েছেন কিন্তু ঘোষণা করেছেন, সাম্রাজ্য রক্ষায় যা করার তিনি তা করবেন। আরো পরে বিশ শতকের সিভিলিয়ানদের লেখায়ও কম বেশি বিষয়টি এসেছে। বিশ শতকে যখন সাম্রাজ্যের ভাঙ্গনের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে যখন স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা খুশি হননি। কারণ, সাম্রাজ্য না থাকলে তারা থাকেন না। এখানে যে মর্যাদা ও দাপট, নিজ দেশে তার কিছুই তারা পান না। এমন জায়গা কোথায় পাওয়া যাবে যেখানে সিভিলিয়ান যাওয়া মাত্রাই 'প্রজারা' দেখা করতে এসেছে, নজর দিচ্ছে টাকা পয়সা দিয়ে আর সিভিলিয়ান বিনিময়ে তাদের আপ্যায়ণ করছে পান সুপারি দিয়ে।

রবারদিউ লিখেছেন, সিভিলিয়ানরা পরিশ্রম করে না কারণ তাতে নেটিভদের সঙ্গে তারা সমান হয়ে যাবে। এমনকী তারা হাঁটতেও চায় না, যেহেতু নেটিভরা হাঁটে, তারা ঘোড়ায় চড়ে এ কারণে নয় যে এটি দ্রুত বাহন, এটি 'নেটিভদের' প্রতি তাচ্ছিল্যেরও প্রতীক। সেই উনিশ শতকের শুরুতে রবারদিউ লিখেছেন, "An English man in India is proud and tenacious, he feels himself a conqueror amongst a vanquished people and looks down with some degree

of superiority on all bellow him."

পরবর্তীকালে, বিশ শতকেও দেখি, জাতি দ্বেষ থেকে তারা কখনই মুক্ত হতে পারেননি। 'নেটিভ'দের সম্পর্কে তারা কখনই উচ্চ ধারণা পোষণ করেনি। ঢাকার কালে খাঁ নামের কামান দেখে লিন্ডসে বিস্মিত, কীভাবে এটি সম্ভব হলো যেখানে দেশিয়রা কৃৎ কৌশল সম্পর্কে অজ্ঞ। আসলে দেশিয়রা যে কিছু জানতো, বা জানতে পারে এটি বিশ্বাস যোগ্য ছিলো না। এর অর্ন্তনিহিত কারণ এই বোধ যে, একজন ইউরোপিয় বিস্তীর্ণ একটি এলাকা শাসন করছে অথচ কেউ তাদের বিরুদ্বাচরণ করছে না এটিই ছিলো শক্তি। সাম্রাজ্যে সবসময় একটি শ্রেণি থাকে যারা শাসকদের সমর্থক হয়ে দাঁড়ায় এবং এ ভাবে বিভাজনের সৃষ্টি হয়। দেশিয়দের প্রতি মাঝে মাঝে সদয় মন্তব্য করা হয়েছে। তাদের পরিশ্রমের প্রশংসা করা হয়েছে। গ্রাহাম ১৮৭৬ সালে লিখেছেন, মাথায় বোঝা দিয়ে ৪ আনা পারিশ্রমিকের জন্য একজন কুলি ১৭ মাইল হেঁটে যাবে। শোষণটা যে কতো নির্মম ছিলো তা অনুধাবন করা যায়। প্রায় সবাই উল্লেখ করেছেন, 'নেটিভ'রা মামলবাজ। কিন্তু এক বিষয়ে, তারা একমত– 'নেটিভ'রা তাদের ঘৃণা করে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ মনে প্রাণে বিষয়টি মেনে নিতে পারেনি। এটি এক ধরনের প্রতিরোধ স্পৃহা যা পূর্ববঙ্গবাসী সবসময় মনে পোষণ করেছে যা অন্তিম পরিণতিতে পৌঁছেছে ১৯৭১ সালে।

সিভিলিয়ানদের অধিকাংশ পূর্ববঙ্গে আসতে চাননি। কারণ, প্রত্যন্ত এ অঞ্চলের সঙ্গে কেন্দ্রের সম্পর্ক ক্ষীণ। শুধু তাই নয়, অজানা এক অঞ্চল। কিন্তু, এখানে এসে সবাই পূর্ববঙ্গ দেখে মুগ্ধ, বিস্মত হয়েছেন এক বিমস ছাড়া। পূর্ববঙ্গের জলা জঙ্গল, পশুপাখি, বৃক্ষ ও মাছের প্রাচুর্য তাদের বিস্মিত করেছে। কিন্তু, সিভিলিয়ান বুঝে না বুঝে হোক, পূর্ববঙ্গের পরিবেশ ধংস্ব শুরু করেছেন। প্রথমে পশুপাখি হত্যা। কী পাওয়া যেতো না পূর্ববঙ্গে কিন্তু দেড়শ বছরের মধ্যে দেখি সবকিছুর প্রাচুর্য হ্রাস পেয়েছে। সিভিলিয়ানরা যে পরিমাণ পশুপাখি ধ্বংস করেছে তা এখানকার মানুষও করেনি। তারপর গাছ-গাছালির দিকে হাত বাড়িয়েছে। গ্রাহাম লিখেছিলেন, দেশিয়রা গাছ বাঁচাতে ইচ্ছুক। পোগসন লিখেছিলেন, সৈন্যরা আসার পর চট্টগ্রামে মোরগের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। মাছের প্রাচুর্য এতো ছিলো যে, সিভিলিয়ানদের সকালে নাস্তায় একপদ মাছ থাকতোই।

সিভিলিয়ানদের জীবন যাপনের ঘনিষ্ঠ বিবরণ পাই সংকলিত রচনাগুলিতে। সাতসমুদ্র তেরনদী পেরিয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভিন্ন সংস্কৃতিতে তারা একা বসবাস করেছেন, শাসন করেছেন। ক্ষমতার দাপট দেখিয়েছেন। কিন্তু অন্তিমে তারা ছিলেন একেবারে একাকি। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় অনেকে ক্ষ্যাপাটে (একসেনট্রিক) হয়ে গেছেন। বর্তমান সংকলনে এর অনেক উদাহরণ পাওয়া

পারে। সেই উনিশ শতকে রবারদিউ যা লিখেছেন বিশ শতকে তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে ঠিকই কিন্তু মৌল বিষয়টি একই রয়ে গেছে। রবারদিউ লিখেছেন– "... a country life in India is dull, much to gloomy, spiritless and solitary and a man doomed to it is much to be pitied if he has no lasting amusements and resources within himself."

এরকম অঞ্চলে একা বসবাস করে দেশ শাসন করে গেছেন তারা। সঙ্গত কারণেই অনেকে প্রশ্ন করেন, এটি কী ভাবে সম্ভব? কী ভাবে তা সম্ভব শুরুতেই আলোচনা করেছি।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে একজন লিখেছিলেন– "In the interior of India, the natives show much higher respect for military rank than for civil dignity. They find it difficult to form a notion of great man possessing influence and authority unless he be a military chief and warrior of renown."[১৮৫]

প্রথমদিকে কর্তৃত্ব স্থাপনের কারণে হয়তো সশস্ত্ররা গুরুত্ব পেয়েছে কিন্তু উনিশ শতকের মাঝামাঝি দেখা যাচ্ছে তারা সিভিলিয়ানের শাসনের অধিনে। আই সি এসই দন্ডমুন্ডের কর্তা। আই পি এস নয়। সিভিলিয়ানদের অনেক অবদানের কথা বলা হয়, কিন্তু মনে হয়, তাদের প্রধান অবদানটি ছিলো সশস্ত্রের ওপর নিরস্ত্রের অর্থাৎ সিভিলিয়ান শাসনের প্রবর্তন। ভারতবর্ষে এটি ছিলো প্রায় অনুপস্থিত। ১৯৪৭ সালের পর ভারত সেই ধারা অব্যাহত রেখেছে, পাকিস্তান বা ১৯৭১ সালের পর বাংলাদেশ সে ধারা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। এবং না পারার ফল কী হতে পারে তা তিনটি দেশের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলেই অনুধাবন করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় পর্ব

সিভিলিয়ানদের চোখে পূর্ববঙ্গ

ইস্ট ইন্ডিয়াম্যান'। পালতোলা সেই সব আদিম জাহাজ যেগুলিতে করে রাইটাররা সাগর পাড়ি দিয়ে পৌঁছুতেন ভারতে। জাহাজের যাত্রী ৪০ জন। এর মধ্যে ভারতে আদি সিভিলিয়ান হবেন এমন কয়েকজনও ছিলেন। জাহাজের কাপ্তানটি ছিলো বদমেজাজি। একহাত নেই। আগের সফরে এক তরুণীকে নিয়ে আরেক যাত্রীর সঙ্গে ডুয়েলের ফল। যাত্রীদের পর্যপ্ত খাবার দাবার দেয়ার ব্যাপারেও ছিলো তার কৃপণতা, আদি জাহাজীদের সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় এ বিবরণ থেকে।

উত্তমাশা অন্তরীপে হপ্তাকাল থেকে তারা ফের রওয়ানা হলেন কলকাতার পথে। এ সময় একটি ঘটনার কথা মনে আছে লিন্ডসের। সমুদ্রে একদিন তাঁরা একটি জাহাজ দেখতে পেলেন। জাহাজটি যাচ্ছে চীনে। টেলিস্কোপ দিয়ে লিন্ডসে দেখছেন জাহাজটি, হঠাৎ দেখলেন ডেকে দাঁড়িয়ে তাঁর ভাই উইলিয়াম। রোজগারের আশায় চলছে। উইলিয়ামও টেলিস্কোপ দিয়ে দেখলেন ভাইকে। দুটো জাহাজ এক সময় পরস্পরকে অতিক্রম করে চলে গেল। আরো পরে, সেন্ট হেলেনায় সমুদ্রে পড়ে হারিয়ে গিয়েছিলো উইলিয়াম। লিন্ডসের সঙ্গে তাঁর আর কোনোদিন দেখা হয়নি।

দূর থেকে কলকাতা শহর দেখেই লিন্ডসে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। লিখেছেন তিনি অবাক হয়ে, "কলকাতা শহরে ঢোকার মুখে দু'তীরে বাগানবাড়ির সারির চেয়ে সুন্দর আর কোনো দৃশ্য হয় কি না জানি না। এগুলি ঢাকা চমৎকার লতায়। দেখে ইংল্যান্ডের সেরা কাউন্টির কথা মনে হয়। সূর্যের নিচে অনেকে যে দৃশ্য দেখার আশা করি এ তার বিপরীত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে অনবরত জাহাজ আসা-যাওয়া করছে এবং এ দৃশ্য পুরো পরিবেশকে করে তুলছে জীবন্ত। শুধু তাই নয়, দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর এ যাত্রা শেষে একজন আগন্তুককে আশাবাদী করে তোলে এ দৃশ্য। তারপর চোখে পড়ে ফোর্ট উইলিয়াম। নদীর ওপর ঝুঁকে পড়া বিশাল দুর্গ প্রাকার। তাই বলে নদী থেকে শহর দেখার কোনো অসুবিধে নেই; নজরে পড়ে এসপ্লানেডের একাংশও। বাড়িগুলো অনন্য সাধারণ আভিজাত্যের প্রতীক। মনে হয় শহরটি প্রাসাদের শহর আর এর অধিবাসীরা খুব ধনবান।"

১৭৭২ সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতা পৌঁছলেন লিন্ডসে। তাঁকে নিয়োগ করা হলো কোম্পানির রাজস্ব বিভাগের একাউন্ট্যান্ট জেনারেল-এর সহকারি পদে। একেবারে আনকোরা রাইটার হিসেবে পদটি বেশ ভালোই বলতে হবে। চাকরি করতে করতেই ফারসি শিখলেন লিন্ডসে। এর মধ্যে কেটে গেল চার বছর। ১৭৭৬ সালে, ঢাকা রাজস্ব বিভাগের প্রধান ব্রাউটন রৌস এর সহকারি নিয়োগ করা হলো লিন্ডসেকে।

লিন্ডসের ঢাকা আগমন

১৭৭৬ সালের শরৎকালে, জলপথে ঢাকার উদ্দেশে কলকাতা ত্যাগ করলেন

লিন্ডসে। বালাঘাটের লোনা জল পেরিয়ে এলেন তারা সুন্দরবনে। লিখেছেন লিন্ডসে, "পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন এই অঞ্চলটি অরণ্য পানিতে ভরা।" আর গঙ্গা অববাহিকার একটি অংশ এটি যা বিস্তৃত দুশো মাইল। বনাঞ্চলে আছে বাঘ, সরীসৃপ এবং গ্রীষ্মমণ্ডলীর উপযুক্ত বন্যপ্রাণী। মানব বসতি খুব কম। এক ধরনের বিষণ্ন পতিত অঞ্চল। কিন্তু অপূর্ব! জলের ধার ঘেঁষে বিশাল সব বৃক্ষ। নিচে নেই কোনো আগাছা বা ঝোপঝাড়। পুরোটা অঞ্চল নদীনালায় ভরা। বারো দিনের মধ্যে আমি ঢাকায় পৌঁছে গুছিয়ে বসলাম। পরিবেশ আমার মনোমতঃ সমাজে লোক নেই বেশি, তবে যারা আছেন তারা কোম্পানির চাকুরে নন– স্বাধীন ব্যবসায়ী এবং তাদের সঙ্গ সুখকর। তাদের আর কোম্পানির চাকুরেদের মধ্যে থেকে আমার দিন ভালোই কাটতে লাগলো।"

ঢাকার গৌরব রবি তখন অস্তমিত। ঢাকার সরকারি শাসক নায়েব নাজিম জেসারত খাঁ। দিওয়ানী লাভের আগে নিযুক্ত নায়েব নাজিমদের খানিকটা ক্ষমতা ছিলো। কিন্তু দিওয়ানীর পর তা হ্রাস পেতে থাকে বিশেষ করে রেগুলিটিং অ্যাক্টের পর। রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাশ করা হয়েছিলো ১৭৭৩ সালে। এর পরের বছর ঢাকায় নিযুক্ত করা হলো একটি প্রাদেশিক কাউন্সিল। নিজামত বা ফৌজদারী বিভাগ ছিলো নায়েব নাজিমের হাতে। অন্যদিকে ভূমি রাজস্বের কালেক্টর নিযুক্ত হয়েছিলেন দিওয়ানী আদালতের সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে। ১৭৮১ সালে নিজামত আদালতের ভারও গ্রহণ করেছিলো কোম্পানি। এই ধরনের প্রশাসনিক অবস্থায় কনিষ্ঠ রাজ কর্মচারী হিসেবে লিন্ডসের আগমন ঢাকায়।

ঐ সময় ঢাকা শহরের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিলো দৈর্ঘ্যে চৌদ্দ মাইল, প্রস্থে সাত মাইল। উত্তর সীমা ছিলো টঙ্গী জামালপুর, দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা, পূর্বে ধাপা ফুলতলা এবং পশ্চিমে মিয়াপুর সিদ্দি।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসনভার গ্রহণের পর ঢাকা দ্রুত পরিণত হলো নোংরা জঙ্গলময় অস্বাস্থ্যকর একটি শহরে। ১৭৮৬ সালে ঢাকার কালেক্টর ম্যাথু ডে, এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় ঢাকার মতো বোধহয় এমন কোনো জেলা নেই যা জঙ্গল আর পতিত জমিতে ভরা। জঙ্গল গ্রাস করছে শহর।

লিন্ডসে ঢাকা আসার ছ'বছর আগে অবশ্য ঢাকায় একটি মারাত্মক ঘটনা ঘটে গিয়েছিলো। তা হলো ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ। তায়েঁশ জানিয়েছেন, "ঐ বছর ঢাকার আশপাশে সর্বপ্রথম লাল পানি ওঠে এবং সারাদেশ পানিতে ডুবে যায়। কথিত আছে যে, শহরে এতো পানি ওঠে যে, প্রতিটি গলিতে ও সড়কে নৌকা চলতো।" বন্যার পর দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। দলে দলে লোক আসতে থাকে শহরে, না খেতে পেয়ে মারা যায় অজস্র। কথিত আছে যে, গ্রামের লোকেরা মাত্র একসের

চাউলের বিনিময়ে নিজেদের ছেলেমেয়ে শহরের লোকদেরকে দিয়ে দিতো। এভাবে শহরের লোকেরা অসংখ্য ছেলেমেয়ে কিনে নেয়। যেসব গ্রামের লোক দুর্ভিক্ষের পর বেঁচে যায় তারা শহরের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে বসতি স্থাপন করে।

এরকম একটা সময়ে লিন্ডসে এসে পৌঁছলেন ঢাকায়। তিনি নিজেও লিখেছেন, "গঙ্গা নদীর একটি শাখা, চমৎকার এক নদীর তীরে বড় একটি ক্ষয়ে যাওয়া শহর ঢাকা। বাইরে থেকেই অবশ্য বোঝা যায় ক্ষয় ধরেছে শহরটিতে। দেশীয় ঘরগুলো তুচ্ছ, টুটাফাটা কুটির; কিন্তু পুলের ধ্বংসাবশেষ, ক্ষয়ে যাওয়া পোর্টিকো আর থাম যাদের অনেকগুলো স্থাপত্যের ভালো নিদর্শন- সবকিছু প্রমাণ করে যে শহরটি ছিলো এক সময় উল্লেখযোগ্য। মুঘল আমলে এ শহর ছিলো বাংলা প্রদেশের রাজধানী, ভাইসরয়ের আবাসস্থল; কিছুদিন পর রাজধানী চলে গেল মুর্শিদাবাদ আর তখন থেকেই শুরু হলো ঢাকার ক্ষয়। এখন ঢাকার সেরা বাড়িগুলো ইউরোপিয় পরিবারদের। দেশীয়দের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু উৎপাদন (ম্যানুফ্যাকচার) ও কৃষির সর্বত্র সম্পন্নতার ছাপ স্পষ্ট।"

লিন্ডসের শেষোক্ত মন্তব্যটি বিপরীতধর্মী মনে হতে পারে। সুতরাং এর খানিকটা ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কারণ, চারদিকে যখন ধ্বংস ও ক্ষয়ের ছাপ তখন উৎপাদন বৃদ্ধি পায় কি ভাবে? অধ্যাপক আবদুল করিম লিখেছেন, মুঘল রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পর ঢাকায় বণিকেদের কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছিলো বিশেষ করে ইউরোপিয় কোম্পানিদের। তাদের রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছিলো তিন-চার গুণ। সুতরাং রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পর ঢাকার ক্ষয় হয়নি তবে এর বিকাশ গিয়েছিলো রুদ্ধ হয়ে।

কথাটা অন্যভাবে বলা যায়, কোম্পানির বাণিজ্য বৃদ্ধি মানে, দেশীয় শিল্পের ধ্বংস সাধন, শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি। সুতরাং সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে দেখলে অর্থাৎ কাগজে-কলমে ইউরোপিয় কোম্পানির বৃদ্ধির হার ঠিকই আছে কিন্তু বাস্তবে উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত কেউ লাভবান হয়নি। কারণ, তাঁর বইয়ে অধ্যাপক করিম নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন নিয়াবতের পঞ্চাশ বছর ঢাকার সীমানা বৃদ্ধি ঘটেনি। কোম্পানি যখন প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য গ্রহণ করে তখন দ্রুতলয়ে এর ক্ষয় হতে থাকে। লিন্ডসে যখন ঢাকায় একজন কনিষ্ঠ কর্মকর্তা, তখন কোম্পানির বস্ত্র রফতানি ব্যবসা মোটামুটি ভালোই চলছিলো। তাই ঐ মন্তব্য করেছেন তিনি।

গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ সালে বাংলাকে বিভক্ত করেন ৯টি জেলায়। আবার পরের বছর তা বাতিল করে গঠন করেন পাঁচটি প্রদেশ– কলকাতা, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর ও ঢাকা। প্রত্যেক প্রদেশের জন্য ছিলো চার সদস্যের একটি প্রাদেশিক কাউন্সিল। লিন্ডসে ঢাকার প্রাদেশিক কাউন্সিলের একজন কর্মচারী হিসেবে এসেছিলেন ঢাকায়।

লিন্ডসে জানাচ্ছেন, তিনি ঢাকায় আসার পর গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিলের সদস্য কর্নেল মনসন মারা যান। ফলে, কাউন্সিলে হেস্টিংস হয়ে যান শক্তিশালী। ঢাকা কাউন্সিলে সদস্য ছিলেন পাঁচজন। [লিন্ডসেসহ?] এঁরা হলেন– গ্রীস, ম্যাথু, জন শেক্সপীয়র ও ম্যাথু ডে। যা হোক, এর মধ্যে প্রথম দু'জন ছিলেন লিন্ডসের পৃষ্ঠপোষক। কর্নেল মনসনের মৃত্যুর পর ঢাকার প্রাদেশিক কাউন্সিলে তারা হয়ে গেলেন সংখ্যালঘিষ্ট। এই পরিপ্রেক্ষিতে লিখেছেন লিন্ডসে, "আমি ছিলাম সেখানে কনিষ্ঠ এবং তাই সচেষ্ট থাকলাম রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে। সরকারি কাজ করতেন কর্মদক্ষ সিনিয়র কয়েকজন কর্মকর্তা; ফলে কনিষ্ঠদের প্রচুর সময় ছিলো মেতে থাকার।"

ঢাকায় এক সময় পর্যটকদের আকর্ষণ করতো লালবাগ বা কাটরা নয়, আনন্দের বস্তু ছিলো মুঘল যুগের একটি কামান। লিখেছেন লিন্ডসে, "ঢাকায় গর্ব করার মতো তেমন কিছুই নেই।" লালবাগ দুর্গ, বড় কাটরা, কিছুই তাঁরে মন জয় করেনি, যদিও আমার মনে হয় তখনও সেগুলো ছিলো মোটামুটি জাঁকালো। শুধু একটি জিনিসই তাঁকে আকর্ষণ করেছিলো তা'হলো ঢাকার কয়েকটি কামান। এ কথা লিখেছেন রেনেল এবং পরবর্তীকালে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ডয়লিও।

ঢাকায় মুঘল আমলে ব্যবহৃত যে সব কামান ছিলো তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দু'টি বৃহদাকারের কামান। এর মধ্যে একটি এখন রক্ষিত ঢাকায় বর্তমান ওসমানী উদ্যানের সামনে। এই কামানটি আমাদের কাছে পরিচিত 'বিবি মরিয়ম' নামে। অপরটি, যা আকর্ষণ করেছিলো লিন্ডসেকে, তা তলিয়ে গেছে বুড়িগঙ্গার অতলে। জনশ্রুতি অনুযায়ী, বুড়িগঙ্গায় ডুবে যাওয়া কামানটির নাম ছিলো 'কালে জমজম' বা 'কালে খাঁ'। এই 'কালে জমজম' সম্পর্কে আমরা এতোদিন তেমন কিছু জানতাম না, বিশেষ করে কবে তা তলিয়ে গেল বুড়িগঙ্গায় সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য জানা ছিলো না। এখন লিন্ডসের স্মৃতিকথায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারছি।

প্রথমে দেখা যাক, কামানগুলো ঢাকায় এলো কি ভাবে? এ বিষয়ে নির্দিষ্টভাবে কেউ কিছু বলতে পারেননি। তবে ডয়লি জানিয়েছেন, সপ্তদশ শতকে বারংবার মগ বা আরাকানদের হামলা ঠেকাবার জন্যই কামান দু'টি নির্মাণ করা হয়েছিলো। ডয়লির বক্তব্য সঠিক হওয়ার এবং ঢাকাতেই কামান দু'টি নির্মিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কারণ, এতো বিশাল ও ওজনে ভারী জিনিস জলপথে হাজার মাইল দূর থেকে আনা প্রায় অসম্ভব। ঢাকায় হয়তো মুঘল প্রকৌশলীদের নির্দেশনায় দেশীয় কারিগররা তৈরি করেছিলেন কামান দু'টি।

সপ্তদশ শতক পর্যন্ত কিন্তু বিখ্যাত ছিলো 'কালে জমজম', 'মরিয়ম' নয়। প্রথমোক্তটি সম্পর্কে রেনেল এবং লিন্ডসের বিবরণ থেকে জানা যায়। এবং তাঁরা

দু'জন 'কালে খাঁর' কথাই উল্লেখ করেছেন, 'মরিয়ম' এর কোনো উল্লেখই করেননি। তাতে বোঝা যায়, 'কালে খাঁ'র তুলনায় মরিয়ম নেহায়েত অনুল্লেখ্য ছিলো। 'কালে খাঁ' হারিয়ে যাওয়ার পর সবার দৃষ্টি পড়ে মরিয়মের দিকে। এবং মরিয়ম হয়ে ওঠে বিখ্যাত। সেই থেকে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকের শুরু থেকে 'মরিয়ম'ও হয়ে ওঠে ঢাকার একটি দ্রষ্টব্য।

'কালে জমজমের' প্রথম উল্লেখ পাই রেনেলের স্মৃতি কথায়। ভুগোলবিদ হিসেবে জেমস রেনেল বিশ্ব বিখ্যাত। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে ঢাকায় তিনি কোম্পানির চাকুরের হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর এক কন্যার কবর এখনও আছে নারিন্দার খ্রিস্টান গোরস্থানে।

রেনেল খুব সতর্কভাবে কামানটি পরীক্ষা করেছিলেন। তাঁর বিবরণ–

"আমি সতর্কভাবে পুরো কামানটির মাপ নিয়েছি এবং আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকটি অংশের মাপ হিসেবে করেছি। পেটানো লোহা দিয়ে নির্মিত হয়েছে কামানটি। জিনিসটি বিশাল এক টিউবের মতো যার ভিত্তি বারো খণ্ড লোহার লম্বা টুকরো। এগুলোর ওপর দু' থেকে তিন ইঞ্চি পুরু চাকা [রিং] দিয়ে পিটিয়ে মসৃণ করা হয়েছে। সুতরাং দেখতে এটি চমৎকার পিতলের আগ্নেয়াস্ত্রের মতো যদিও এর সমানুপাত ত্রুটিপূর্ণ।

সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য	২২ ফুট ১০.৫ ইঞ্চি
কামানের পেছনের দিকে আয়তন	৩ ফুট ৩ ইঞ্চি
কামানের মুখ থেকে চার ফুট	২ ফুট ১০ ইঞ্চি
কামানের মুখের আয়তন	২ ফুট ২.৫ ইঞ্চি
ছিদ্র	১ ফুট ৩.১২৫ ইঞ্চি

কামানটিতে ব্যবহৃত হয়েছে ২৩৪, ৪১৩ কিউবিক ইঞ্চির শক্ত লোহা [যাতে মরচে ধরে না]। ওজন ৬৪, ৮১৪ পাউন্ড [ষোল আউন্সে এক পাউন্ড হিসেবে] বা এগারোটি বত্রিশ পাউন্ডার কামানের ওজনের সমান। গোলার ওজন ছিলো ৪৬৫ পাউন্ড।

এবার দেখা যাক লিন্ডসের বিবরণ–

"কামানটি ছিলো ছত্রিশ ফুট লম্বা, পেটানো লোহার তৈরি। চৌদ্দটি লোহার টুকরোর ওপর লোহার চাকা পিটিয়ে এটি নির্মিত। সুতরাং দেখতে জিনিসটি মন্দ নয়, তবে তা সমানুপাত নয়। কামানের পাশে আছে একটি পাথরের গোলা যা এর ক্যালিবারে থাকে। শক্তিশালী একজন লোক খুব বেশি হলে গোলাটি হাঁটু পর্যন্ত ওঠাতে পারবে। যদি গোলাটি ধাতু নির্মিত হতো তা'হলে এর ওজন হতো বারোশো পাউন্ডের মতো। কামানটির ওজন নিশ্চয় ৬৪.৮১৪ পাউন্ড।"

এখানে লক্ষণীয় যে রেনেল ও লিন্ডসের বর্ণনা একই রকম, একটি ক্ষেত্র

ছাড়া। রেনেল যেখানে বলছেন কামানটি দৈর্ঘ্য প্রায় তেইশ ফুট সেখানে লিন্ডসে বলছেন ছত্রিশ ফুট। এ ক্ষেত্রে রেনেলের ভাষ্য সঠিক বলে মেনে নেয়া উচিত।

লিন্ডসে আরো লিখেছেন–

"দেশীয়রা কৃৎকৌশল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সুতরাং কিভাবে এটি নির্মিত হলো এবং যুদ্ধের সময় কিভাবে তা ব্যবহৃত হতো তা ভেবে বের করা অসম্ভব।"

লিন্ডসের বিবরণ থেকে বোঝা যায়, দেশীয়দের মনেও এটি বিস্ময় সৃষ্টি করেছিলো। এবং ঐ সময়ের [১৭৭৬-৮০] স্থানীয়রা নিজেদের মতো করে এই ব্যাখ্যা দিতেন। লিন্ডসে লিখেছেন–

"তারা বলে যে স্বর্গ থেকে এটি পতিত হয়েছে। এবং এ কারণে কামানটি পূজিত। এর সম্মানে আবহমান কাল থেকে এর ভেতর জ্বেলে রাখা হয়েছে একটি প্রদীপ। ১৭৮০ সালে হারিয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কামানটিকে 'পবিত্র স্থান' [অবতার] হিসেবে পূজো করা হয়েছে।"

লিন্ডসে এবং তাঁর বন্ধু জন কোয়ি একবার পরিকল্পনা করেছিলেন, দ্রষ্টব্য হিসেবে কামানটিকে কলকাতায় পাঠাবেন। কোয়ি দক্ষ ছিলেন কৃৎকৌশলে। ঢাকাতেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো লিন্ডসের। এর আগে স্পেন-আমেরিকার যুদ্ধের সময় হাভানায় তিনি লড়েছিলেন। লিন্ডসে যখন ঢাকায় তখন কোয়ি এক রেজিমেন্ট সেবুন্দি বা দেশীয় সৈন্যের কমান্ডার হিসেবে ছিলেন। ১৮১৮ সালে কোয়ির মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। যা হোক ঐ পরিকল্পনা সম্পর্কে লিন্ডসে লিখেছেন–

"ঢাকা শহরের উল্টোদিকে একটি চরে ছিলো কামানটি। নদী চরটির কূল ভাঙছে। আমার বন্ধু জন কোয়ির সঙ্গে একবার পরিকল্পনা করেছিলাম যে, একটি নৌযান তৈরি করে এটিকে কলকাতায় পাঠাবো, কিন্তু আমাদের পরিকল্পনা কার্যকর হওয়ার আগেই আমাদের চলে যেতে হলো ঢাকা ছেড়ে।"

আক্ষেপ করে লিন্ডসে লিখেছেন যে, তাঁর ওপরঅলারা এ ব্যাপারে উদাসীন হলেন। অথচ তারা সক্রিয় হলে এই কীর্তিটি রক্ষা পেতো। 'অক্ষমনীয় অবহেলায়' তাঁরা দ্বীপটির তীর ভাঙতে দিলেন। নদী আস্তে আস্তে গ্রাস করে নিল দ্বীপটিকে। এবং কামানটি এখন শুয়ে আছে বুড়িগঙ্গার তলদেশে। স্থানীয়দের মতে, এটি যে আবার হারিয়ে গেছে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। স্বর্গ থেকে তা এসেছিলো এবং স্বর্গেই তা আবার গেছে চলে।

লিন্ডসের বিবরণ থেকে এটা স্পষ্ট যে ১৭৮০-এর দিকে 'কালে জমজম' বুড়িগঙ্গার অতলে স্থান নিয়েছে। এ বিবরণ থেকে সে সময়কার সাধারণ লোকদের ধ্যান-ধারণা সম্পর্কেও পরিষ্কার একটি চিত্র পাওয়া যায়।

অবসর সময়টা কাটাতেন কিভাবে নিঃসঙ্গ এই ইংরেজরা? শিকার করে।

শিকারের মধ্যে প্রিয় ছিলো বরাহ শিকার যাকে তারা বলতেন 'পিগ স্টিকিং'। না, আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে বরাহ শিকার করা যেতো না। বরাহ শিকার করতে হতো বল্লম দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে।

লিন্ডসের সময়ও দেখা যাচ্ছে বরাহ শিকার ছিলো বেশ প্রচলিত। লিন্ডসে লিখেছেন, মৌসুমী বৃষ্টির পর, টঙ্গীর সমতল ভূমিতে তাঁবু খাটাতেন এবং তারপর তাঁরা যত রকম মাঠ-ক্রীড়া আছে তাতে নিজেদের ব্যস্ত রাখতেন। লিন্ডসে ভক্ত ছিলেন বন্য বরাহ শিকারে যার জন্য প্রয়োজন ছিলো সাহস ও ঘোড়া চালনোর দক্ষতা। এ কাজটি ছিলো পৌরুষের। শিকারের অস্ত্র ছিলো তিন হাত লম্বা ভারি একটি বল্লম। প্রথমে কুকুর ছেড়ে দেয়া হতো। তারা বন্য বরাহ দেখলে তাড়া করতো। তাড়া খাওয়া বন্য বরাহ'র পিছু নিতো তখন শিকারি। একজন যদি লক্ষ্য ভেদে ব্যর্থ হতো, তখন তার জায়গা নিতো দ্বিতীয়জন। ঘোড়া চালনায় দক্ষ না হলে এ খেলা ছিলো বিপদজনক। লিন্ডসে জানিয়েছেন, "বরাহের হিংস্রতার কারণে অনেক দুর্ঘটনা ঘটতে আমি দেখেছি। মাঝে মাঝে সম্মুখীন হতাম বাঘ অথবা চিতার কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়া ওগুলোর পিছু নেয়ার কথা ভাবতাম না।"

একবার লিন্ডসে খুব অশান্ত এক ঘোড়ায় চড়েছেন এবং ঘোড়ার কারণে মাঠ ছেড়ে তাঁকে তাঁবুতে ফিরতে হচ্ছে। সঙ্গে তাঁর ভৃত্য। হঠাৎ পথিমধ্যে বিশাল এক বরাহ তাঁকে আক্রমণ করলো। লিন্ডসে অবশ্য বধ করলেন বরাহটিকে এবং অপর ভৃত্যের সাহায্যে বরাহটিকে নিয়ে গেলেন তাঁবুতে। সেখানে বাবুর্চির সাহায্যে বরাহ'র মাথাটি কেটে কৌশলে তা সেলাই করে দিলেন বরাহর পাশ্চাদদেশের সঙ্গে। ফলে তা অদ্ভুত এক প্রাণীতে পরিণত হলো। শিকার শেষে, লিন্ডসের বন্ধুরা তো এ ধরনের অদ্ভুত প্রাণী দেখে অবাক। লিন্ডসের তামাশা বুঝতে তাঁদের বেশ খানিকটা সময় লেগেছিলো। লিখেছেন লিন্ডসে, "এভাবে হাসি-তামাশা করে আমরা সময় কাটিয়ে দিতাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশে ফেরার কথা মনে হতো। বা আশা করতাম এমন কোনো জায়গায় আমাকে নিয়োগ করা হবে যেখান থেকে আমি আমার পরিশ্রমের ফল ভোগ করতে পারবো।"

লক্ষণীয় লিন্ডসের এই বাক্যটি– "বা আশা করতাম এমন কোনো জায়গায় আমাকে নিয়োগ করা হবে যেখান থেকে আমি আমার পরিশ্রমের ফল ভোগ করতে পারবো।"

এর অর্থ, এমন কোনো জায়গায় তাঁর নিয়োগ যেখানে তিনিই মোটামুটি কর্তা এবং যেখানে ব্যক্তিগত ব্যবসার সুযোগ আছে। কারণ, রাইটারের বেতনে আর যাই হোক, বড় লোক বা নবাব হয়ে ইংল্যান্ডে ফেরা সম্ভব ছিলো না। এবং রাইটার হওয়ার জন্য কেউ সাত সমুদ্র ডিঙিয়েও আসতো না। লিন্ডসে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং অচিরেই তাঁর আশা সফল হয়েছিলো।

ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বে সিলেট প্রদেশ, লিখেছেন লিন্ডসে, প্রদেশটি বেশ বড়, বিশাল নদটির পূব তীর থেকে দূরে উঁচু পর্বতমালা পর্যন্ত তা বিস্তৃত। এ পাহাড়ের পরেই চীনের সীমান্ত অঞ্চল। মেজর রেনেলের মতে, বাংলা সীমান্ত থেকে চীনের দূরত্ব তিনশো মাইল। বাংলা ও চীন সীমান্তের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসতি খুব কম এবং সেখানে বাস করে স্বাধীন তাতাররা। মুঘল আমলে সিলেট রক্ষার জন্য ঐ সীমান্তে বেশ শক্তিশালী সামরিক বাহিনী রাখা হতো– সামন্ত প্রথা অনুযায়ী রক্ষণাবেক্ষণ করা হতো সামরিক বাহিনীর এবং পাহাড়ের পাদদেশের জমি দেয়া হতো তাদের সামরিক চাকরির বিনিময়ে।

এ জেলা থেকে সরকার তেমন কিছু পেতেন না, কিছু হাতি, মশলা এবং কাঠ ছাড়া। বরং সীমান্ত রক্ষার জন্য তাদের বেশ ব্যয় করতে হতো। তবে, এ প্রদেশের পদটি ছিলো বেশ সম্মানজনক এবং সব সময় বাংলার নবাবের নিকট-আত্মীয়ই এ প্রদেশের প্রধানের পদটি পেতেন।

লিন্ডসে যখন ঢাকায় তখন সিলেট শাসনের ভার বর্তেছে ঢাকা কাউন্সিলের ওপর। লিন্ডসে চাকরিতে যোগ দেয়ার বছর দুয়েক আগে ঢাকা কাউন্সিল থেকে প্রতিনিধি হিসেবে মিঃ হল্যান্ডকে পাঠানো হয়েছিলো সিলেটে। উদ্দেশ্য, জমিদারদের সঙ্গে খাজনা বন্দোবস্ত করা। এবং এ বন্দোবস্ত সম্পন্ন করা ছিলো বেশ জটিল কাজ।

জমি বন্দোবস্তের কাজ সেরে মিঃ হল্যান্ড ফিরলেন ঢাকায় এবং জানালেন বন্দোবস্তের পরিমাণ প্রায় পঁচিশ হাজার পাউন্ড। সঙ্গে সঙ্গে এ কথা জানাতেও ভুললেন না যে, সিলেটের অধিকাংশ লোকজন খুব দুর্ধর্ষ এবং এ খাজনা আদায়ে বেশ ঝামেলা হবে। অন্যান্য সদস্যরা বন্দোবস্তটিকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনে নিলেন। লিন্ডসে লিখেছেন, "আমার সঙ্গে মিঃ হল্যান্ডের ঘনিষ্ঠতা বেড়েই চললো। তিনি ছিলেন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও নীতিবান ব্যক্তি। আমার সঙ্গে একবার গোপন কথা বলার সময় জানালেন, সিলেটে তিনি যে Prosperous কাজ শুরু করেছিলেন তা বোধহয় সম্পন্ন করা গেল না কারণ তার স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না। হল্যান্ড জানালেন এ কাজ সে-ই সম্পন্ন করতে পারবে যার স্বাস্থ্য ভালো, যার আছে একাগ্রতা ও দৃঢ়তা। আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললাম, 'আপনি যে রকম লোক খুঁজছেন সে রকম একজনকে আমি জানি।'

'কোথায় পাবো তারে?' জিজ্ঞেস করলেন হল্যান্ড।

'আমিই সেই ব্যক্তি', জানালাম আমি।

এ কথা শোনা মাত্র উঁচু গলায় হেসে উঠে চেয়ারে বসে পড়লেন হল্যান্ড, বললেন–

'লিন্ডসে, তুমি একটা হতচ্ছাড়া। তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। আমরা

কুড়িজন এখানে কাজ করছি এবং সিলেট যাবার প্রস্তাব পেলে আঠারো জনই রাজি হবে। আর তুমি, যে কিনা সবচেয়ে কনিষ্ঠ, সে আশা করছো সিলেট যাওয়ার।'

'গাছের মগডালে আমার চড়ার ইচ্ছায় কি তুমি কোনো দোষ দেখছো বন্ধু', জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'মোটেই না, কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব?'

'হ্যাঁ, তা অসম্ভব। তবে তোমার মতো বন্ধু থাকলে অনেক কিছু হতে পারে। ভবিষ্যতে, কাউন্সিলের কোনো সদস্য যদি সিলেটে যাওয়ার জন্য আমার নাম প্রস্তাব করে তবে কি আমি তোমার সমর্থন পাবো?'

'অবশ্যই।'

আমি তখন অনুরোধ জানালাম, আমার কাজটা খানিকটা না এগোনো পর্যন্ত তিনি যেন অবসর না নেন। শুধু তাই নয়, আমাদের আলাপও যেন গোপন থাকে। তিনি রাজি হলেন।"

এবার লিন্ডসে তক্কে তক্কে রইলেন। তিনি জানতেন কোনো রকমে কাউন্সিলে তাঁর নাম উঠলেই হল্যান্ড সমর্থন করবেন। আর হল্যান্ডের মতামতকে কাউন্সিলে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়। তবে লিন্ডসে এও জানতেন সতর্কতার সঙ্গে না এগুলো তাঁর সমূহ বিপদ। কিন্তু সামনে যখন থাকে লোভনীয় রঙিন স্বপ্ন তখন কে কাকে বিপদের কথা বলে ঠেকিয়ে রাখতে পারে?

সিলেট যাওয়ার জন্য লিন্ডসের তর সইছিলো না। প্রায় ছেলেবেলা থেকেই তিনি বিদেশে, জীবনে এখন স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে, কিন্তু যে কারণে সবাই ভারতবর্ষে আসার স্বপ্ন দেখে তা তো পূরণ হয়নি। সিলেটে একক কর্তৃত্ব পেলে, কোম্পানির কাজের সঙ্গে সঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত ব্যবসা শুরু করা যাবে। কে জানে তার ফলে হয়ত তিনি ক্লাইভের মতো প্রভূত সম্পদ আহরণ করে নবাব হয়ে দেশে ফিরতে পারবেন।

ইতোমধ্যে ঢাকায় ব্যক্তিগত ব্যবসার সুযোগ এসে গেল। ঢাকা জেলায় লবণের ব্যবসা ছিলো বেশ জমাট। সমুদ্রোপকূলে সরকারি এজেন্টরা উৎপাদন করতো লবণ এবং কোম্পানীর একচেটিয়া স্বার্থে তা সংরক্ষণ করা হতো। একটা নির্দিষ্ট সময়ে বিরাট নৌকো করে তা নিয়ে আসা হতো ঢাকায় এবং তারপর প্রকাশ্যে নিলামে বিক্রি করা হতো।

লিখেছেন লিন্ডসে, "কাদিজে আমি ব্যবসার যে শিক্ষা পেয়েছিলাম এখন তা কাজে লাগলো।" কি করলেন তিনি? লিন্ডসে লক্ষ্য করলেন, যখন নিলাম হয় তখন সেখানে স্থানীয়দের দেখা যায় না। হয়ত ভয়েই কেউ যেতো না। ফলে, কাউন্সিলের কারো না কারো ওপর নির্ভরশীল কেউ নিলামে ডেকে নিতো। এবং এভাবে মোটা অংকের টাকা লাভ করতো।

লিন্ডসে স্থানীয় এক ধনাঢ্যের সঙ্গে আলাপ করলেন। লিন্ডসের ইচ্ছা নিজেই নিলামে থাকেন। তাঁর কথায় ধনাঢ্য রাজি হয়ে তাঁকে বেশ বড় অংকের টাকা অগ্রিম দিলেন। পরবর্তী নিলামে লিন্ডসে উপস্থিত থেকে কুড়ি হাজার পাউণ্ডের লবণ কিনলেন। এই ফাটকাবাজীতে তাঁর যা লাভ হলো, তা দিয়ে সমস্ত দেনা, এমনকি কলকাতা থাকাকালীনও যে টাকা ধার হয়েছিলো সব শোধ করে দিলেন এবং তারপরও কয়েক হাজার টাকা লাভ হিসেবে থাকলো পকেটে। কাউন্সিলের অনেকে লিন্ডসের এই কৌশল পছন্দ করেনি। কারণ, এসব ব্যবসার জন্য তাঁরা অলিখিত কিছু নিয়ম করেছিলেন। লিন্ডসে সে নিয়ম ভেঙ্গে দেন। ফলে, ঢাকা থেকে অন্য কোনো জায়গায় তাঁর বদলির ব্যাপারটি সহজতর হলো। আর্মানিদের অনেকে বিভিন্ন জায়গায় কিনেছিলেন জমিদারি। এমনি একজন ছিলেন আলেকজান্ডার পানিয়াটি। থাকতেন তিনি চকবাজারের এক গলিতে যা এখনও পরিচিত পানিয়াটি গলি নামে।

তাঁর সঙ্গে বিশেষ যোগ ছিলো কাউন্সিলের একজন সদস্য ম্যাথু ডে'র। আর্মেনিরা স্থানীয় ছিলো না বটে, কিন্তু স্থানীয় বা দেশীয়দের সঙ্গেই তাদের যোগ ছিলো বেশি। আবার ইংরেজরা আর্মেনিদের দেশীয় ভাবতেন না। কিন্তু আইনের চোখে তাদের স্থানীয় বলে চালানো যায়, কারণ তারা বাস করেন ঢাকায়। কাউন্সিলের সদস্য যারা ব্যবসা করতেন তারা এই আর্মেনিদের মাধ্যমেই করতেন বলে মনে হয়। এবং লিন্ডসেও হয়ত এ রকম কোনো আর্মেনি থেকে টাকা ধার নিয়েছিলেন।

কিছুদিন পর হল্যান্ড সাহেব জানালেন লিন্ডসেকে যে, তিনি ঠিক করেছেন, আর সিলেটে ফিরবেন না। তখন লিন্ডসে প্রথমবারের মতো কুঠি প্রধান বা রেসিডেন্ট রৌস সাহেবের কাছে যেয়ে জানালেন যে তিনি সিলেট যেতে ইচ্ছুক। রৌসও হল্যান্ডের মতো বললেন, সবচেয়ে কনিষ্ঠ ব্যক্তিটিকে কিভাবে দেয়া যায় সবচেয়ে উত্তম জায়গায়? না, তেমন আশা নেই। লিন্ডসে বললেন, ঠিক আছে, যদি কাউন্সিলে কেউ তাঁর নাম প্রস্তাব করে তাহলে কি রৌস তা সমর্থন করবেন? অবশ্যই, খুশি হয়ে জানালেন রৌস। লিন্ডসে এভাবে দু'জন সদস্যের সম্মতি আদায় করলেন। আরেকটি ভোট দরকার। এবার গেলেন তিনি জন শেকসপীয়রের কাছে যিনি ছিলেন কাউন্সিলের প্রভাবশালী সদস্য। শেকসপীয়র সব শুনে নিমরাজী। পরে মত দিলেন, ঠিক আছে তিনি লিন্ডসেকে সমর্থন করবেন কিন্তু পরিবর্তে শেকসপীয়রের ওপর নির্ভরশীল দু'জনের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তাঁকে নিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে লিন্ডসে রাজী হয়ে গেলেন। পরদিন, শেক্সপীয়রই, সিলেটে হল্যান্ডের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য লিন্ডসের নাম প্রস্তাব করলেন। একমত হলো সবাই। ঢাকার ইংরেজ কুঠিতে প্রতিক্রিয়াটা ভালো হলো না। প্রতিযোগী হিসেবে লিন্ডসের কথা তারা কখনও ভাবেনি। তখন থেকেই তারা সচেষ্ট হলো এ নিয়োগ

বাতিল করতে।

লিন্ডসে লিখেছেন, "আমার আকাঙ্খার চুঁড়োয় পৌছলাম। বিদায় জানালাম ঢাকা-কে, যেখানে ছিলাম দু'বছর আরাম আয়েসে, ক্ষোভ ছিলো না কোনো।"

তারপর একদিন সিলেটের পথে বুড়ীগঙ্গায় নৌকো ভাসালেন।

দু'বছর ঢাকায় থাকার পর রওয়ানা হলেন সিলেটের দিকে। অবশ্যই নৌকায়, বুড়িগঙ্গা বেয়ে পৌঁছলেন ফিরিঙ্গি বাজারে। এখানে বুড়িগঙ্গা মিলেছে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে। প্রবল এই নদীটির নাম মেঘনা। লিন্ডসে লিখেছেন, "যেদিকে তাকাই সেদিকেই থৈ থৈ পানি, বিষাদ ঘেরা বিপন্ন এক অঞ্চল। বছরে প্রায় তিনমাস পানিতে ডুবে থাকে এ অঞ্চল। কেউ কি বিশ্বাস করবে যে যাত্রাপথে আমি কম্পাস ব্যবহার করেছি যা সমুদ্রে ব্যবহার করা হয়। একশো মাইলের বিস্তৃত এক হাওড় পাড়ি দিতে হলো। মাঝে মাঝে গ্রাম, মাটি উঁচু করে কৃত্রিম টিলার মতো করা হয়েছে তাতে ঘরবাড়ি। মাটির টিলা প্রায় কোথাও নেই। মানুষজনের একমাত্র ভরসা নৌকো। বাড়ির ঘাটে ঘাটে বাঁধা নৌকো। বর্ষায় জীবন হয়ে ওঠে খুবই কষ্টকর।"

যাক, লিন্ডসের নৌকা চলছে বিস্তীর্ণ হাওড় দিয়ে, আসলে তা ছিলো ধানের ক্ষেত, বর্ষায় এই অবস্থা, কোথাও কোথাও বুনো ধান ক্ষেত এত ঘন যে পানিই দেখা যায় না। চমৎকার দৃশ্য! নৌকো যখন ধানের ক্ষেতের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে তখন ধানগাছগুলি মাথা নুইয়ে নিচ্ছে, নৌকো পেরিয়ে গেলেই আবার মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। "যেন বিস্তীর্ণ সবুজ সমুদ্রে ডুবে আছি। খালি বিরক্তকর ছিলো ধানের পোকাগুলি, নাড়া খেয়ে তা নৌকোয় পড়ছিলো, রাতে আবার বাতি জ্বালালে পোকামাকড় আছড়ে পড়তো নৌকায়।"

সাতদিন চলার পর সিলেটের পেছনে পাহাড়ের সারি নজরে পড়লো। কালো মেঘের দল যেন। মাঝে মাঝে সাদা রেখা। পরে লিন্ডসে দেখেছিলেন সেগুলি জলপ্রপাত। "চল্লিশ মাইল দূর থেকে তা আমার নজরে এসেছিলো," জানিয়েছেন লিন্ডসে। "সুরমা নদীর দেখা মিললো সিলেট থেকে ত্রিশ মাইল দূরে। নিসর্গের পরিবর্তন হলো এখান থেকে। নদীর পাড় উঁচু।" লিন্ডসের কর্মচারিরা নৌকা সাজিয়ে তাঁকে নিতে এসেছেন। তারা তাঁর বাসায় তাঁকে নিয়ে গেলেন। পথে লিন্ডসে জানতে চেয়েছিলেন শহরটি কোথায়? আসলে শহর বলে কিছু ছিলো না, শহর বলতে ছিলো একটি বাজার মাত্র। উঁচু নিচু টিলার ওপর কিছু ঘরবাড়ি কিন্তু এত সবুজ গাছে ঢাকা যে পরিষ্কার কিছুই দেখা যায় না। "শহরটি অদ্ভুত হয়ত কিন্তু মনে হলো বসবাসের জন্য তা হবে আরামদায়ক।"

সিলেটে লিন্ডসে

লিন্ডসে এখন সিলেটে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি বা রেসিডেন্ট। এক কথায়

সিলেটের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

নিজের বাসায় এসে পৌঁছার পর তাঁকে জানানো হলো, হজরত শাহ জালালের মাজারে যেতে হবে শ্রদ্ধা জানাতে। প্রত্যেক রেসিডেন্টকে সিলেটে পা দিয়ে তাই করতে হয় এবং এটাই নিয়ম। লিন্ডসে জানাচ্ছেন, সারা ভারত থেকে মুসলমানরা আসে এ তীর্থস্থানে এবং এদের অনেকেই ধর্মান্ধ। তবে লিন্ডসে এসব ধর্মীয় ব্যাপারে নাক গলাননি কারণ তাঁর ভাষায় "এটা আমার কোনো ব্যাপার নয়।" সুতরাং তাঁর পূর্বসুরিদের মতো তিনিও গেলেন মাজারে, চৌকাঠে জুতো রেখে ভেতরে গিয়ে শ্রদ্ধা জানালেন পাঁচটি স্বর্ণমোহর দিয়ে। এক স্বর্ণমোহর ছিলো ষোল টাকার সমান।

এভাবে পবিত্র হয়ে ঘরে ফিরলেন লিন্ডসে। এখন তাঁর প্রজাদের শ্রদ্ধা নিবেদনের পালা। প্রজা, তিনি হিন্দু মুসলমান যেই হোন না কেন খালি হাতে ওপরঅলাকে শ্রদ্ধা জানাতে আসতে পারেন না। "ফলে আমার টেবিল ভরে উঠলো রূপোয়", লিখেছেন লিণ্ডসে; এক টাকার কমে কেউ নজরানা দেননি। অনেকে দিয়েছেন চার পাঁচ টাকা পর্যন্ত। এর বদলে ওপরঅলা শ্রদ্ধা নিবেদনকারীকে দেন কয়েকটি পান ও সুপারি।

সিলেটে এসে লিন্ডসে দেখলেন, মিস্টার হল্যান্ডের দু'জন বিশ্বস্ত কর্মচারী গৌরহরি সিং এবং প্রেমনারায়ণ বসু অফিসের সব কাজ দেখাশোনা করছেন; দু'জনই বিশ্বস্ত সুতরাং লিন্ডসেও তাদের বহাল রাখলেন। ভারতে যতদিন লিন্ডসে ছিলেন ততদিন গৌরহরি তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন। এবং লিন্ডসে দেশে ফেরার ত্রিশ বছর পরও গৌরহরি চিঠির মারফত যোগাযোগ রেখেছিলেন লিন্ডসের সঙ্গে। রাজস্ব বিভাগের কর্মচারী ছাড়া বিচার বিভাগে ছিলেন 'কৃষ্ণ অফিসার'রা। লিন্ডসের অনেক কাজের মধ্যে একটি ছিলো এই আদালতে সভাপতিত্ব করা। বিচারের সময় বেশ ক'জন পণ্ডিত তাঁকে আইন ব্যাখ্যা করে বোঝাতেন এবং সঙ্কটের সময় তাদের সাহায্যই তাঁকে সঙ্কট এড়াতে সাহায্য করতো। ফৌজদারী আদালত তখনও ছিলো বাংলার নবাবের অধীন। লিন্ডসের কাছে মনে হয়েছিলো সিলেটের জনসংখ্যা হিন্দু-মুসলমান সমান ভাগে বিভক্ত। হিন্দুরা ঝামেলা করতেন না, কিন্তু মুসলমানদের সঙ্গে পরে তাঁর অনেক ঝামেলা হয়েছে।

এরপর লিন্ডসে সিলেটের রাজস্ব ব্যবস্থা ও পরিমাণের বিবরণ দিয়েছেন এবং জানিয়েছেন, ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে এ ব্যবস্থা ভিন্ন। এ অঞ্চলে রূপা ও তামার মুদ্রার প্রচলন নেই বা খুবই কম। মুদ্রা হিসেবে এখানে প্রচলিত কড়ি। বাংলার সব অঞ্চলেই কড়ি প্রচলিত; এবং সমাজের ভিন্ন স্তরের লোকজন দৈনিক ছোটখাটো জিনিস সংগ্রহ করে কড়ি দিয়ে। কিন্তু লিন্ডসে অবাক হয়েছেন অন্য কারণে। "সমুদ্র থেকে তিনশো মাইল দূরে, একটি অঞ্চলে কড়ি কিভাবে একমাত্র

বিনিময় মাধ্যম হলো তা আমি বা অন্য কেউ বলতে পারিনি। ...চট্টগ্রাম থেকে বালাসোর, এই যে আড়াইশ মাইলের উপকূল তাও কাদায় ভরা। কড়ি পাওয়া সম্ভাবনা সেখানে কম। এর বিপরীত উপকূল মালাবার বা কোরোমন্ডেলেও কড়ি পাওয়া যায় না। বঙ্গোপসাগরের মুখে মালদ্বীপ এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেই পাওয়া যায় কড়ি। আর এই সিলেট, যেখানে আমি থাকি, সেখান থেকে ঐ দ্বীপগুলোর দূরত্ব দেড় হাজার মাইল।

এসব দ্বীপে লোকবসতি অল্প, বাণিজ্যের পণ্য কড়ি এবং নারকেল। দু'টি পণ্যই আসে চাটগাঁ'য়, তারপর ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে। সিলেট যেহেতু গরিব অঞ্চল তাই এখানকার লোকজন ছোটখাটো জিনিসপত্র কেনার জন্য তামার পয়সা ব্যবহার না করে কড়িই ব্যবহার করে।"

লিন্ডসে জানাচ্ছেন, অক্টোবর ও নভেম্বরে যখন পানিতে টান ধরে, তখন শুরু হয় মাছের ব্যবসা। এ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হাজার হাজার লোক। এ ব্যবসার ফলে কড়ির প্রচলন আরো বেড়েছে। সিলেটের যাবতীয় বাণিজ্যে যে পরিমাণ কড়ি ব্যবহৃত হয়, মাছের ব্যবসায় তার চেয়ে বেশি কড়ি ব্যবহৃত হয়।

মাছের প্রাচুর্যের কথাও উল্লেখ করেছেন লিন্ডসে। পানিতে টান ধরলে খাল বিল নদী নালায় মাছ থিক থিক করে। মানুষজন নেমে পড়ে মাছ শিকারে। তৈরি করে শুটকি।

সিলেটে রাজস্ব আদায় করে কিভাবে পাঠানো হয় ঢাকায়? এরপর তার বিবরণ দিয়েছেন লিন্ডসে।

সিলেট জমার পরিমাণ ২৫০,০০০ রুপি। কয় কড়িতে এক রুপি? চার কড়িতে একগণ্ডা, বিশ গণ্ডায় এক পণ, ষোল পণে এক কাউন এবং চার কাউনে এক রুপি। সুতরাং ৫১২০ কড়িতে এক রুপি। আর পাউন্ডের হিসাবে? আট টাকায় এক পাউন্ড। এক পাউন্ডে দাঁড়ায় ৪০,৯৬০টি কড়ি। তাহলে একবার দেখুন, রাজস্ব জমা হতে থাকলে কি ঝামেলা হয়? লিখেছেন লিন্ডসে, "এগুলো জমা রাখার জন্য দরকার হয় গুদামের। সারা বছর জমার পর নৌকোর বহরে পাঠাতে হয় তা ঢাকায়।"

সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায়, লিন্ডসের মতে, নষ্ট হয় শতকরা দশভাগ। "আমি সিলেটে আসার আগে, ঢাকায় রাজস্ব পাঠানোর সময় সমস্ত কড়ি গোনা হতো : এ প্রক্রিয়া আমার পছন্দ ছিলো না। আমি চাইলাম ওজন করে পাঠাতে। কৃষ্ণ খাজাঞ্চী আমাকে জানান তা অসম্ভব। আমি কর্তৃত্বের সুরে বললাম, যা বলেছি তা করতে হবে। হুকুম মানা হতে থাকলো। গর্ববোধ করলাম। কয়েক মিনিটের জন্য জায়গা ছেড়ে যেতে হয়েছিলো ফিরে এসে দেখি, মাত্র যা ওজন করা হয়েছে তার পরিমাণ যেন বেশ বেশি। খাজাঞ্চীর মুখে বাঁকা হাসি। 'ব্যাপারটা কি খাজাঞ্চী?' তেমন কিছু

না স্যার, মনে হয় খানিকটা বালি, মাপ বদলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।"

যা হোক, চেষ্টা করেও লিন্ডসে মাপার ব্যাপারটা দুরস্ত করতে পারলেন না। শেষে ঠিক হলো, ভবিষ্যতে একটা বিশেষ মাপের ঝুড়িতে কড়ি রাখা হবে এবং মাপ ঠিক করার জন্যে একশো ঝুড়ির পাঁচটির কড়ি গোনা হবে। তারপর থেকে টাকা থুড়ি কুড়ি গোনা নিয়ে আর ঝামেলা হয়নি। সরকারিভাবে জমিদারদের থেকে দাবি ছিলো ২৫০০০ পাউন্ড। রাজস্ব আদায় হলে তা পাঠিয়ে দেয়া হতো ঢাকায় যা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এবং সেখানে তা নিলামে বিক্রি করা হতো। অবশ্য বেশি দিন আর এ রীতি থাকেনি।

হল্যান্ড জমিদারদের সঙ্গে রাজস্বের যে বন্দোবস্ত করেছিলেন, অভিজ্ঞতা থেকে লিন্ডসে দেখলেন তা জটিল এবং ঝামেলার। লিখেছেন তিনি, "অনেক ক্ষেত্রে আমি বাধ্য হয়েছি সামরিক শক্তি ব্যবহার করতে এবং এ কারণে পাহাড়ে প্রায় বিদ্রোহ হয়েছিলো আর কি; কিন্তু আমি প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় মিঃ হল্যান্ডের পরিকল্পনা কার্যকর করতে অগ্রসর হলাম। কারণ রাজস্ব যা ধার্য করা হয়েছে এ অঞ্চল তা পুরোপুরি দিতে সমর্থ। প্রথম ন'টা মাস আমি রাজস্ব আদায়েই সম্পূর্ণ মগ্ন ছিলাম কারণ, ঢাকার কাউন্সিল সদস্যদের খুশি রাখাটা ছিলো জরুরি।"

এরি মধ্যে ঢাকার কাউন্সিল পরিবর্তন এসেছে। নতুন একজন সদস্য এসেছেন যার কিছু অর্থের প্রয়োজন। লিন্ডসে অবশ্য তাঁর নাম বলেননি। নতুন সদস্য সিলেট যেতে উৎসাহী। কাউন্সিল নির্দেশ দিলো লিন্ডসেকে নতুন যিনি আসবেন তাঁর কাছে সিলেটের ভার বুঝিয়ে দিতে। লিন্ডসে ঠিক করলেন, এতো সহজে তিনি ছেড়ে দেবেন না। "একদিন সকালে একা বসে নাস্তা করছি", লিখেছেন লিন্ডসে, "এমন সময় আমার পুরনো বন্ধু জন কোয়ির চিঠি পেলাম। তিনি লিখেছেন, 'যা আশঙ্কা করছিলাম তাই হয়েছে। এই লোকেরা তোমাকে পছন্দ করছে না। যত তাড়াতাড়ি পারো পাততাড়ি গুটিয়ে নাও।"

এ ধরনের সংবাদ লিন্ডসে প্রথম পেলেন। আগে হয়ত ভাসাভাসা শুনেছিলেন। কোয়ির চিঠি তাকে বিমূঢ় করে দিলো। এক মুহূর্তে স্বাচ্ছন্দ্যের চূঁড়ো থেকে যেন ধূলোয় লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর নিয়োগ পাকাপোক্ত ভেবে নিজস্ব ব্যবসার খাতিরে লিন্ডসে প্রচুর ধার করেছেন। তিনি থাকতে পারলে সে টাকা উঠে আসবে। কিন্তু সিলেটের অবস্থা তখন, লিন্ডসের ভাষায় 'অশান্ত।' তিনি না থাকলে পুরো টাকাই মার যাবে। "আমার কোনো বন্ধু ছিলো না যার সঙ্গে পরামর্শ করতে পারি" লিখেছেন লিন্ডসে, "বা ছিলো না একজন ইংরেজ যার সঙ্গে কথা বলতে পারি। কয়েক ঘণ্টা নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে রইলাম– আমাকে আবার যদি এ অবস্থায় দেশে ফিরতে হয়– একথা ভেবে কান্না পেলো। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই এই হতাশা কাটিয়ে উঠলাম। আমার চরিত্রে হতাশা বলে কিছু নেই।"

নিজেকে রক্ষার একটি পরিকল্পনা করলেন লিন্ডসে। প্রথমে তিনি রাজস্বের খতিয়ান পরীক্ষা করলেন। দেখলেন তিন মাসের রাজস্ব বাকি যার পরিমাণ ছয় হাজার পাউন্ড। তিনি জানতেন, ঢাকার কাউন্সিল তাকে সরাবার জন্য বলতে পারে যে তিনি রাজস্ব বাকি রেখেছেন। এই সুযোগ তাদের দেওয়া যায় না। নিজের তহবিল থেকে তিনি এই ঘাটতি মিটিয়ে খাতাপত্র ঠিক করলেন। তিনি জানতেন, যদি সিলেট থাকতে পারেন তাহলে সেই টাকা সুদে আসলে ফেরত আসবে।

এরপর তিনি কয়েকটি ডিঙি আনার নির্দেশ দিলেন। ভালো মাঝিমাল্লা ও সশস্ত্র প্রহরীর ব্যবস্থা করলেন। তারপর ঢাকা যাবার নাম করে ডিঙি ভাসালেন। দু'ঘণ্টা পর ডিঙি চালাবার নির্দেশ দিলেন তিনশ' মাইল দূরে কলকাতার উদ্দেশে। রওয়ানা হওয়ার আগে সুপ্রিম বোর্ডের কাছে পেশ করার জন্য তিনি একটি দরখাস্ত লিখে নিয়েছিলেন। দরখাস্তের মূল বিষয় ছিলো, গত নয় মাস প্রায় বিদ্রোহভাবাপন্ন একটি অঞ্চলে দিনরাত পরিশ্রম করে সরকারের রাজস্ব আদায় করা হয়েছে পাই পয়সা পর্যন্ত। অথচ ঢাকা কাউন্সিল অবমাননাকরভাবে তাকে পদচ্যুত করছে। কঠোর পরিশ্রমের এই কি পুরস্কার!

কলকাতা পৌঁছে বোর্ড সমীপে দরখাস্ত পেশ করলেন লিন্ডসে এবং প্রভাবশালীদের কিঞ্চিৎ তুষ্ট করতে সচেষ্ট হলেন। যোগাযোগ করলেন বিচারপতি হাইডের স্ত্রীর সঙ্গে। তিনি রাজি হলেন লিন্ডসের স্বার্থে কথা বলতে। ফলাফল হলো, কলকাতা থেকে ঢাকা কাউন্সিলের কাছে জানতে চাওয়া হলো মিঃ লিন্ডসেকে কি কারণে সরানো হয়েছে? উত্তরে তারা তেমন কিছু জানাতে পারলো না শুধু এটুকু ছাড়া যে, মিঃ লিন্ডসে ঢাকা কাউন্সিলের অনেকের জুনিয়র। তখন কলকাতা থেকে একটি অর্ডার জারি করা হলো লিন্ডসেকে সিলেটের রেসিডেন্ট এবং কালেক্টর ঘোষণা করে। শুধু তাই নয়, আরো বলা হলো– লিন্ডসে আর ঢাকার অধীন থাকবেন না, সরাসরি কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। লিন্ডসের জন্য এরচেয়ে বড় বিজয় আর কিছু ছিলো না।

নতুন নির্দেশ নিয়ে লিন্ডসে আবার ডিঙিতে উঠলেন। এবং এতো দ্রুত ফিরলেন যে সিলেটের মানুষরা তেমন কেউ জানতেই পারল না যে তিনি কলকাতা গেছিলেন। ছই ছাড়া একটি নৌকায় শুধু মাত্র সামান্য প্রহরা নিয়ে ছয়শ' মাইল তিনি ভ্রমণ করেছিলেন মাত্র কয়েকদিনে। লিন্ডসে দ্রুত সিলেট ফেরার ফলে, অবস্থার যা সামান্য অবনতি হয়েছিলো তাঁর উপস্থিতিতে সব আবার স্বাভাবিক হয়ে এলো।

ব্যবসায়ী লিন্ডসে

কলকাতায় যে তিনি এত সফলতা অর্জন করবেন তা লিন্ডসে নিজেও ভাবেননি। এবার ঠাণ্ডা মাথায় তিনি ভাবতে বসলেন সরকারি কাজ বাদে কিভাবে ব্যবসা করে

কপাল ফেরানো যায়। লিখেছেন লিন্ডসে, "রেসিডেন্ট হিসেবে আমার বেতন বছরে পাঁচশো পাউন্ডের বেশি নয়। সুতরাং কপাল ফেরাতে হলে নিজের পরিশ্রমের ওপর নির্ভর করা ছাড়া তার কোনো উপায় নেই।"

সিলেট জেলার নিম্নাংশ, উল্লেখ করেছেন তিনি, খুবই অনুর্বর। মোটা চাল ছাড়া সেখানে আর কিছুই উৎপাদিত হয় না। তবে পাহাড় সংলগ্ন অঞ্চল তা উঁচু নিচু যাই হোক না কেন উত্তম। কারণ সেখানে উৎপাদিত হয় চিনি, তুলা এবং অন্য পণ্য যা বণিকদের কাছেও আকর্ষণীয়। যেমন লিখেছেন লিন্ডসে, পাহাড়ে পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের কাঠ যা প্রয়োজনীয় নৌকা ও জাহাজ নির্মাণে। পাওয়া যায় চমৎকার মানের লোহা যা সম্পর্কে এ অঞ্চলের লোকেরা তেমন কিছুই জানে না। পাহাড় থেকে আঁঠালো বালুর আকারে এগুলো আনা হয় তারপর খাদ মেশানো হয় এবং এ প্রক্রিয়ায় যে লোহা পাওয়া যায় তা ইউরোপে কাঠ কয়লা পুড়িয়ে যে লোহা তৈরি করা হয় তার থেকেও উন্নতমানের। Moongadutties নামে এক ধরনের মোটা সিল্ক আনা হয় চীন সীমান্ত থেকে মালয়ে ব্যবসার জন্য; এর বিনিময়ে দেয়া হয় তামার খণ্ড এবং সামান্য কিছু ইউরোপিয় পণ্য। পার্শ্ববর্তী পাহাড়ও চমৎকার চুনের অশেষ আধার। এবং এগুলো পোড়ানোর জন্য নদীর মাটিতে আছে প্রচুর জ্বালানি। "এবং যেহেতু এ ব্যবসায়ই আমার সম্পদের ভিত্তি", লিখেছেন লিন্ডসে, "সেহেতু এ সম্পর্কে আমি পরে বিস্তারিত আলোচনা করবো। পাহাড় ও সংলগ্ন অঞ্চলে পাওয়া যায় চমৎকার সব হাতি। এবার আমার স্পেনীয় অভিজ্ঞতা এলো কাজে।"

বাণিজ্যের জন্যে বেশ ক'টি পরিকল্পনা ছিলো লিন্ডসের কিন্তু তৈরি পুঁজি ছিলো না তবে ভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন হলে কে ঠেকায়? ভাগ্যলক্ষ্মী ছিলেন লিন্ডসের পক্ষে। এবং হঠাৎ করে বেশ কিছু পুঁজিও চলে এলো তাঁর হাতে। কি ভাবে?

অ্যাকাউনটেন্ট জেনারেল মিঃ ক্রফটের অফিসে কাজ করতেন লোপেজ নামে একজন কৃষ্ণ রাইটার। লোপেজ ছিলেন বুদ্ধিমান। তাঁর মনে হলো– সিলেটে ব্যবহৃত কড়িগুলির সদ্ব্যবহার করতে পারলে প্রচুর লাভ থাকবে। অবশ্য যদি সরকারের সঙ্গে চুক্তি করা যায়। ক্রফট এই কৃষ্ণ রাইটারকে খানিকটা সুবিধা দিতে চেয়েছিলেন। ক্রফট, লোপেজের হয়ে সুপ্রিম বোর্ডে একটি প্রস্তাব দিলেন। প্রস্তাবটি সিলেটে রাজস্ব আকারে যে কড়ি জমা হয় একটি নির্দিষ্ট মূল্যে লোপেজ তা ক্রয় করবেন। তবে সেই মূল্য শোধ করা হবে দু'বছর পর। সচিব, বেসরকারিভাবে লিন্ডসের মতামত জানতে চাইলেন।

লিন্ডসে অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়লেন। যদি কৃষ্ণ রাইটারের হাতে রাজস্বের এ ভার থাকে তবে তাকে হতে হবে একজন 'অকর্মণ্য' কেননা এ চুক্তিনামা যার কাছে থাকবে তাঁর হাতেই জমা হবে সব রাজস্ব ফলে অঞ্চলের ওপরও তার

প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। লিন্ডসে লিখেছেন, "এর বিকল্প প্রস্তাব নিজের হয়ে পেশ করা আমার জন্য ছিলো দারুণ অস্বস্তিকর। কারণ বিষয়টি সাধারণের জ্ঞাতার্থে পেশ করা হয়নি। কিন্তু যেহেতু এর ওপরই আমার ভবিষ্যতের অনেক কিছু নির্ভর করে সেহেতু মনে করলাম মিঃ লোপেজকে একটু দেখে নেয়া যাক।" লিন্ডসে বোর্ডকে জানালেন, ঢাকায় রাজস্বের কড়ি বিক্রি করে যে অর্থ পাওয়া যায় মিঃ লোপেজের প্রস্তাবিত অর্থের পরিমাণ তার চেয়ে খারাপ নয়। অন্তত গত পাঁচ বছরের বিক্রির অংক তাই বলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়টিও পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, দু'বছর পর অর্থ শোধের ব্যাপারটি অযৌক্তিক। তবে, উপসংহারে বলা যায়, "বোর্ড যদি প্রস্তাবিত অর্থের পরিমাণ সন্তোষজনক মনে করেন এবং এই কাজ আমি করতে চাইলে যদি অনিয়মিত মনে না করেন", লিখেছেন লিন্ডসে, "তবে আমি ছ'মাসের মধ্যেই টাকা শোধ করব।" এর আগে অ্যাকাউনটেন্ট লিন্ডসের কাছে এমনভাবে লোপেজের জন্য তদবির করছিলেন যে এ প্রস্তাবে না করা কঠিন হয়ে উঠলো। "এবং স্বাভাবিকভাবেই কন্ট্রাক্টটি আমিই পেলাম। আমার সেই অ্যাকাউনটেন্ট জেনারেল, এ অপদস্থ হওয়া বিষয়টি মনে রেখেছিলেন। আবার আমাকে অপদস্থ করার জন্য চুক্তির বিষয়টি বিজ্ঞাপ্তিত হলো কলকাতায়। কিন্তু এবারও মিঃ লোপেজ নয় আরেকজন কৃষ্ণাঙ্গ চুক্তিটি ছিনিয়ে নেয়।"

"একই বিষয়ে আবার আমাকে লিখতে হলো বোর্ডকে", লিখেছেন লিন্ডসে, দেশীয় যে ব্যক্তি কনট্রাকটি পেয়েছে সে আমার নিজস্ব ভৃত্য; তবে প্রথমবারের মতো আমার এ কনট্রাকট গ্রহণে যদি আপত্তি থাকে তাহলে খুশি হয়ে আমি তা ত্যাগ করবো। উত্তরে সচিব জানালেন এ ব্যাপারে তাদের কোনো আপত্তি নেই।" ঐ একটি সুযোগই, যাকে লিন্ডসে উল্লেখ করেছেন ভাগ্য বলে, তাঁর জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিলো। কোম্পানির চাকরিতে থেকে লিন্ডসে যে বিশাল বিত্ত অর্জন করেছিলেন তার ভিত্তি ছিলো এই সুযোগ।

বাণিজ্যের পণ্য হিসেবে, উল্লেখ করেছেন লিন্ডসে, আরো কিছু কিছু পণ্য ছিলো যার চাহিদাও কম ছিলো না, যেমন মোটা মসলিন, হাতির দাঁত, মধু, রবার, ড্রাগ। ইউরোপিয় বাজারে এগুলোর চাহিদা ছিলো। ফলের মৌসুমে পাওয়া যেতো চমৎকার মানের অজস্র কমলা, পাহাড়ে যা এমনিই হতো। তবে একমাত্র গ্রহণযোগ্য পণ্য ছিলো চুন। লিন্ডসে লিখেছেন, হিন্দুস্থানের কোথাও এতো বিশুদ্ধ চুন আর পাওয়া যায় না এবং কলকাতার বাজারে চাহিদা মেটায় প্রধানত সিলেটের চুন।

এই চুনের দিকে নজর পড়লো লিন্ডসের। কিভাবে চুনের বাণিজ্যের উন্নতি ও বিস্তার ঘটানো যায়, এ ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে লাগলেন লিন্ডসে। দেখলেন, কিছু নিম্নশ্রেণীর ইউরোপিয়ান, আর্মেনিয়ান ও গ্রিকরা এই বাণিজ্য দখল করে আছে, তবে তাদের সংখ্যা নগণ্য। "তাদের থেকে আমার সুযোগ বেশি", লিখেছেন

লিন্ডসে, "কারণ, আমার পক্ষে এখন সম্ভব অর্থ নিয়ন্ত্রণ করা এবং এটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে, এই ব্যবসা আমাকে কেন্দ্র করেই হবে।" এবং তাই হয়েছিলো। লিখেছেন তিনি, "এবং এ বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলো আমার জন্য। নিজ অঞ্চলে কড়ি খাটাতাম মুদ্রার বদলে। ছ'মাস পর এই কড়ি হয়ে উঠতো নগদ টাকা চুনের বিনিময়ে এবং আমিও চুক্তি মোতাবেক নগদ টাকায় পরিশোধ করতাম রাজস্ব। এছাড়া সরকারের সঙ্গে চুক্তি অক্ষুণ্ন রাখা মুশকিল হয়ে উঠতো।"

যে অঞ্চল থেকে চুন উত্তোলন করা হতো তা লিন্ডসের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলো না। চীন এবং ইংরেজ রাজ্যের মাঝামাঝি অঞ্চলে ছিলো সে অঞ্চল এবং তা ছিলো স্বাধীন রাজাদের অধীনে। "আমার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিলো তাদের থেকে চুনাপাহাড়ের লিজ নেয়া", লিখেছেন লিন্ডসে, "কিন্তু তার আগে ওরা আমার সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করতে চাইলো। আলোচনার জায়গা ঠিক হলো পনডুয়া নামে এক জায়গায়, পাহাড়ের প্রায় নিচে, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় একটি অ্যাম্ফিথিয়েটারে।"

যে পাহাড়ে পন্ডুয়া, সিলেট থেকে তা মাইল পঁচিশেক দূরে। পাহাড়টি মনে হয় হঠাৎ করে জলাভূমি থেকে উঠে গেছে। অরণ্যে ঢাকা। প্রধানত খাসিয়ারাই থাকেন সেখানে।

খাসিয়ারা ক্যানোতে করে লিন্ডসেকে নিয়ে গেলেন চুনা পাথর দেখাতে। চুনা পাহাড় দেখে অবাক হয়ে লিখেছেন লিন্ডসে, "পাহাড়টি ভরা খাঁটি অ্যালবাস্টার চুনায় এবং এর পরিমাণ দেখে মনে হলো সারা পৃথিবীর চাহিদা এ পাহাড় থেকে মেটানো যাবে।"

ফেরার পথে লিন্ডসে পনডুয়াতে একটা ছোট কুটির বানাবার অনুমতি চাইলেন, যেখানে তিনি এসে থাকতে পারেন। কুটিরের চারদিকে থাকবে একটি দেয়াল যাতে বন্য জন্তু কোনো ক্ষতি করতে না পারে। লিন্ডসে লিখেছেন, "আসলে দেয়াল দেয়ার উদ্দেশ্য আমার এই খাসিয়া বন্ধুরা বুঝতে পারেনি। দেয়ালটি এমন নিরেট হবে যাতে বিপদের সময় আত্মরক্ষার কাজে তা ব্যবহৃত হতে পারে। বা কোনো আক্রমণের সময় পঁচিশ মাইল দূরে সিলেট থেকে সহায়তাকারী বাহিনী আসা অব্দি যাতে শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখা যায়।"

এরপর খাসিয়া বন্ধুদের থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এলেন লিন্ডসে সিলেট। চুন ব্যবসার প্রাথমিক কাজগুলো সম্পন্ন হলো। কলকাতা এবং অন্যান্য অঞ্চলে তিনি ব্রিটিশ এজেন্ট নিয়োগ করলেন।

চুনের ব্যবসার সঙ্গে হাতির ব্যবসাও করেছিলেন লিন্ডসে। প্রায়ই পঞ্চাশ-ষাটটি হাতি ধরে বিশ্বাসী ভৃত্য মুন্নুর হাতে সঁপে দিতেন। মুন্নু সে হাতির পাল নিয়ে সারা ভারতবর্ষ চষে বেড়াতো। ভারতের বিভিন্ন অংশে ছিলো অসংখ্য রাজ-রাজড়া;

তাই হাতির কদর ছিলো। গড়ে পঞ্চাশ ষাট টাকায় বিক্রি হতো একেকটি হাতি। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় পোষা হাতিটির মৃত্যু হলে লিন্ডসে তার দাঁত নিয়ে এসেছিলেন ব্রিটেনে যার ওজন ছিলো আশি পাউন্ড, দৈর্ঘ্যে আট ফুট। লিন্ডসের ভাষায়, "ব্রিটেনের সর্ববৃহৎ।"

এ প্রসঙ্গে ভারতের নিম্ন শ্রেণী সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেছেন লিন্ডসে। তাঁর মতে ইংরেজদের অনেকেই ভারতীয়দের সততা নিয়ে সন্দেহ করে কিন্তু লিন্ডসের মতে তা অমূলক– "আমি বছরে সিলেট থেকে দেড়শো থেকে দু'শো হাতি ধরে চার ভাগে ভাগ করে একেকজন পিয়নের নেতৃত্বে বিক্রির জন্য পাঠাতাম। এরা দিল্লি, শ্রীরঙ্গপত্তম, হায়দ্রাবাদ কোথায় না যেতো। কখনো কখনো দেড় বছর তাদের কোনো খোঁজ পাওয়া যেতো না। কিন্তু টাকা কখনও মার যায়নি। একবার মুন্নু এক বছর পর ফিরে এলো।" লিন্ডসে তখন ইংল্যান্ডে। মুন্নু ফিরে লিন্ডসের এজেন্টের কাছে তার ময়লা খুতি থেকে তেল চিট চিটে একটি ব্যাংকারস বিল দিলো যার মূল্য তিন থেকে চার হাজার পাউন্ড। আর মুন্নুর নিজের বেতন ছিলো মাসে ত্রিশ শিলিং।

লিন্ডসে লিখেছেন, তিনি কখনও তাঁর ভৃত্যদের অবিশ্বাস করেননি। তারাও বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছে। তবে তিনি লিখেছেন, "বাঁচতে হলে আগে আমি মুসলমানের বদলে হিন্দু বাছবো।"

এর কারণেও ছিলো যা পরে আলোচিত হয়েছে।

সিলেটে জীবনযাপন ও প্রশাসন

চুন আহরণ ও বিতরণের সুষ্ঠু বন্দোবস্ত করার পর ব্যবসা আপন গতিতে চলতে লাগলো। শুধু তাই নয়, ব্যবসা এমনিই ফুলে ফেঁপে উঠলো যে, সিলেটের নদী দেখা গেল লিন্ডসের চুনের নৌকোয় ঢেকে গেছে। এ ব্যবসায় সব সময় নিয়োজিত থাকতো পাঁচ থেকে ছ'শো লোক।

লিন্ডসের আর কি করার আছে? টাকা তো নিজস্ব গতিতেই এসে জমা হচ্ছে তার পকেটে। সুতরাং সেই একঘেঁয়ে জীবনযাপন শুরু করলেন। তবে তাঁর সময়ের একটা বড় অংশ কেটে যেতো আদালতে বিচার আচার সারতে। কারণ, তিনি ছিলেন সিলেটের প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট।

এর মধ্যে বছর তিনেক কেটে গেছে। এবং এ তিন বছর তার জীবন কেটেছে সন্ন্যাসীর মতো। কিছু ইউরোপিয়ান অবশ্য ছিলো সিলেটে, কিন্তু লিণ্ডসের মতে "তারা এতো নিম্ন পর্যায়ের যে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করা যায় না।" এই সময় কাটানো ও নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্য বেশকিছু উপায় উদ্ভাবন করলেন।

কাঠ, লোহা ও রূপোর কাজ জানে এমন কিছু শিল্পীকে তিনি নিজের কাজে

নিযুক্ত করলেন। চমৎকার নৌকা নির্মাতা হিসেবেও লিন্ডসে ও তাঁর লোকেরা খ্যাত হয়ে উঠলেন।

সিলেটে ইংরেজ সামরিক শক্তি বলতে ছিলো একশো সিপাহীর এক ব্রিগেড। একজন অফিসার ছিলেন এদের কমান্ডে। এসব সৈন্যরা প্রধানত উত্তর ভারতের। পাহাড়ি আবহাওয়া বিশেষ করে পানি, লিন্ডসের ভাষায় যা ছিলো স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর, সেই বাহিনীকে পুরো শেষ করে দিলো। লিন্ডসে নিজ খরচে নিজের স্বার্থে এ ব্যাপারেও সময় দিলেন। বোর্ডকে তিনি জানালেন, শান্তি রক্ষার্থে তিনি নিজে আগের চেয়েও কম খরচে একটি বাহিনী গড়ে নেবেন। দেশীয় লোকজন দিয়েই তিনি একটি মিলিশিয়া বাহিনী গড়ে তুললেন। কমান্ডে থাকলেন তিনি নিজে এবং যতদিন তিনি সিলেটে ছিলেন ততদিন এ নিয়ম বলবৎ ছিলো। প্রয়োজন মতো লিন্ডসে এ বাহিনীর আয়তন বাড়াতেন বা কমাতেন। লিন্ডসে সব সময় এদের সুখদুখে অংশ নিতেন। অন্যদিকে ব্যবসাও করতেন।

সিলেটের একশো পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে কোনো ডাক্তার ছিলো না। কিন্তু প্রয়োজনই আবিষ্কারের উৎস। বুখানের 'ডোমিস্টিক মেডিসেন' এবং একবাক্স ওষুধ লিন্ডসেকে টিকিয়ে রেখেছিলো কয়েক বছর। লিখেছেন লিন্ডসে, "প্রয়োজনে অনেক সময় আমাকে ছুরি ধরতে হয়েছে। এমনও হয়েছে যে নাপিত যখন ভিমড়ি খেয়েছে, আর তখন আমাকেই শরীরের জটিল অংশ থেকে বিষাক্ত তীরের ফলা বের করতে হয়েছে।" এখানে উল্লেখ্য যে, শরীরের কাটা-ছেঁড়ার সময় তখন নাপিতদেরই অগ্রাধিকার ছিলো। এ ধরনের কয়েকটি সাফল্যের পর লিন্ডসের চাহিদা এমন বৃদ্ধি পেলো যে বাধ্য হয়ে তাকে আবেদন জানাতে হলো একজন চিকিৎসকের জন্য। চিকিৎসক আসাতে স্বস্তি পেলেন লিন্ডসে।

মাঝে মাঝে সিলেটের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বেড়াতে যেতে পছন্দ করতেন লিন্ডসে। সিলেট থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে জয়ন্তিয়ার রাজা ছিলেন লিন্ডসের সীমান্ত বর্তী একজন প্রতিবেশী। খাসিয়াদের এই রাজা ছিলেন উপজাতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাবান। পাহাড় এবং সমতলে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলের আয়তনও বেশ বড়। যৌবনে তাঁর ধারণা হয়েছিলো যে তিনি এতটা শক্তিশালী যে কোম্পানি বাহাদুর তুচ্ছ। কিন্তু একদল সিপাহী তাঁকে এমনভাবে হটিয়ে দিলো যে নিজের অক্ষমতা বুঝতে তাঁর আর সময় লাগেনি। তারপর থেকে তিনি শান্ত। "আমার সাথে এখন একটু খাতির জমাতে চাচ্ছেন এ কথা বোঝাতে যে ব্রিটিশদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন।"

রাজা প্রস্তাব দিলেন, তাঁর অঞ্চলে লিন্ডসে যদি যান ভালো হয়। সেখানে বসে আলাপ-আলোচনা করা যাবে। এছাড়া রাজা একটা শিকারের ব্যবস্থাও করেছেন লিন্ডসের জন্য। আলোচনার খুঁটিনাটি ঠিক হওয়ার পর শিকারের দিন নির্ধারিত

হলো। দু'পক্ষের আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয়েছিলো দু'জনের সঙ্গেই লোকজনের সংখ্যা কম থাকবে। তখন বর্ষাকাল। পুরো অঞ্চল পানির নিচে, দেখে মনে হয় বিশাল এক হ্রদ। নিজের তৈরি চমৎকার এক ইয়টে চড়ে রওয়ানা হলেন লিন্ডসে। ইয়টে কয়েকজন পার্শ্বচর, আর আঠারোটি ক্ষুদ্র কামান। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে দু'পক্ষের মিলিত হওয়ার কথা। সেখানে পৌঁছে দেখলেন এক এলাহী ব্যাপার। রং বেরঙয়ের নিশান উড়িয়ে প্রায় পঞ্চাশটি নৌকার সারি এগিয়ে আসছে। লিন্ডসে ব্যাপারটায় সন্তুষ্ট হলেন না। কারণ চুক্তি এমনটি ছিলো না। যাক, লিন্ডসে নিজের ইয়টটি চালিয়ে দিলেন নৌকার সারির মধ্যে। তারপর শিঙ্গা ফুঁকে দিয়ে অভিনন্দন জানিয়ে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর নৌকায়।

অনুগত অনুচরদের নিয়ে রাজা এলেন ইয়টে। কেবিনে বসা মাত্র, তাঁকে অর্ভ্যথনার জন্য আঠারোটি লিলিপুটিয়ান কামান ছোঁড়া হলো, ধুয়ায় ঢেকে গেল চারদিক। ভারি অবাক হলেন রাজা।

এরপর রাজা তাঁকে নিয়ে গেলেন শিকারে। লিন্ডসের আত্মজীবনীতে এই শিকারের বিস্তারিত বিবরণ আছে। এখানে তার বিস্তারিত উল্লেখ আর করলাম না। শিকারের জায়গাটা প্রায় ৯০ বিঘার মতো। তা ঘেরা হয়েছে বেড়া দিয়ে। অনেকটা গড়ের মতো। রাজার প্রজারা বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন জন্তু খেদিয়ে এনেছে। লিন্ডসের জন্য একটি শিকারের মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। রাজা, তার মন্ত্রির পাশে দাঁড়িয়ে। লিন্ডসে অবাক হয়ে দেখলেন, প্রায় দুশো বুনো মহিষ, কয়েকশ বিভিন্ন প্রজাতির হরিণ এবং অজস্র বুনো বরাহ সেখানে জমা হয়েছে। রাজা লিন্ডসেকে বললেন শিকার করতে। লিন্ডসে ভালো বন্দুকবাজ নন, তবুও বন্দুকের গুলি ছুঁড়লেন, একটা বড়সড় মহিষ লুটিয়ে পড়লো। আসলে, এত প্রাণী যে, নিশানা ব্যর্থ হওয়ার কারণ নেই। মন্ত্রি একটি তীর ছুঁড়লেন লুটিয়ে পড়ল একটি হরিণ। এরপর রাজার দশটি হাতি মাহুত সহ এসে দাঁড়ালো গড়ের সামনে। শুরু হলো মহিষ আর হাতির লড়াই। লিন্ডসে আশ্চার্য হয়ে দেখলেন যে মহিষগুলি সুবিধা করতে পারেনি। যাক, লিন্ডসে আরাম করেই তিনটি দিন কাটালেন রাজার সঙ্গে। অবশ্য, সেই সময়টা মৃত প্রাণী বিশেষ করে মরা মহিষের গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে উঠেছিলো।

খাসিয়াদের জীবনযাপন রীতিনীতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন লিন্ডসে। আমি সে বিস্তারিত বিবরণে যাব না। শুধু উল্লেখ করতে পারি এই যে, লিন্ডসের মতে, খাসিয়ারা সহজ, সরল, সৎ তবে, আত্মসম্মান জ্ঞান টনটনে, যে কোনো কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে পারে। লিন্ডসের এক অনুচরের সঙ্গে এক খাসিয়ার কলহ হওয়ায় পরে খাসিয়ারা দলবদ্ধ হয়ে সে লোককে আক্রমণ করে। সে নিহত হয়। লিন্ডসে এসব এড়িয়ে চলতেন।

সিলেটের অনেক জায়গা, জানিয়েছেন লিন্ডসে, ডাকাতে ভরা। সিলেট থেকে ত্রিশ মাইল দূরে একটি এলাকা ছিলো খুবই খারাপ, লিন্ডসে নিজেও তাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। পরে, অবশ্য তিনি তাদের বাগে আনেন।

ইতোমধ্যে রাজস্ব আদায়ের একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন লিন্ডসে। ফলে রাজস্ব আদায়ের তেমন ঝামেলা আর রইলো না। লিণ্ডসে মোটামুটি হাত পা ঝাড়া হয়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর সময়ের সিংহভাগ কেটে যেতো সিলেটের অভ্যন্তরে শান্তি শৃংখলা রক্ষা ও বিচার আচারে।

"অন্যান্য বর্বর অঞ্চলের মতো", লিখেছেন লিন্ডসে, "নেটিভরা ভয়ঙ্কর রকম মামলাবাজ। আর তাদের উকিলরা সাধারণ মামলাকে করে তোলে জটিল। দশভাগের ন'ভাগ মামলাই ছিলো জমি সংক্রান্ত। আবাদী জমি সীমানা মোটামুটি পরিষ্কার। কিন্তু ঝামেলা বাধতো 'বন্য অঞ্চলে' (পতিত, জঙ্গলে ভরা)। কারণ, ঝোপঝাড়, গাছপালায় ভরা অঞ্চলে কার সীমানা কতটুকু তা নির্ধারণ করা একটু ঝামেলার ব্যাপার। আর 'ক্ষতিগ্রস্ত' ব্যক্তি প্রথমে বাধা দেয় না। ধরা যাক একখণ্ড জঙ্গলে ভরা জমি। এক ব্যক্তি তা আবাদের জন্য জঙ্গল পরিষ্কার শুরু করলো। যার জমি, সে চুপচাপ বসে দেখতে লাগল। জমি পরিষ্কার হয়ে গেলে সে মামলা ঠুকে দিলো। মামলার বিষয় তার জমি থেকে তাকে উৎখাত করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে মামলার রায় সাধারণত তার পক্ষেই যেতো যে জমি পরিষ্কার করেছে। কারণ, জমি পরিষ্কারের খরচটা কম ছিলো না।"

লিন্ডসে লিখেছেন, জমিদার, যাদের জমি উঁচু ভূমিতে তাদের তিনি আবাদে প্রচুর উৎসাহ দিয়েছেন। বলেছেন, তাদের জমিতে খাটলে প্রচুর ফসল হবে। "লোকজনের কমতি নেই এবং পুরো অঞ্চলটাকে তারা একটা বাগানে পরিণত করতে পারে", লিখেছেন লিন্ডসে 'কিন্তু যেদিকেই না যাই কেনো আমি শুধু সম্মুখীন হই আলস্য আর নির্লিপ্ততার। এসব জমিদারদের মাটি গম চাষের জন্য উপযুক্ত। কিন্তু পুরো অঞ্চলে একদানা গমও উৎপাদিত হয় না। আমি তাদের বললাম, গম ফলালে তাদের জমির দামও দ্বিগুণ হয়ে যাবে। তারা জানালো, তাদের যদি বীজ দেয়া হয় তাহলে যত্নের সঙ্গে তা চাষ করবে। আমি পঞ্চাশ মণ বীজ আনালাম এবং বার্ষিক বৈঠকের সময় প্রত্যেক জমিদারকে সমপরিমাণ বীজ দিলাম। এবং বললাম, তাদের ফসলও পরের বছর বেশ ভালো দামে কিনে নেব।"

বীজ নিয়ে চলে গেল সবাই। লিন্ডসে মাঝে মাঝে খোঁজ খবর করেন ফসলের। সবাই জানায়, না ফলন বেশ ভালোই হবে। পরের বছর এলো। দেখা গেলো জমিদারদের কেউ-ই বীজ লাগাননি জমিতে। লিন্ডসে প্রস্তাব দেয়ার পর তারা নিজেরা বৈঠক করেছেন এবং এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, লিন্ডসের প্রস্তাব তাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ, সুতরাং তা প্রতিরোধ করতে হবে। ফলটা হলো,

লিন্ডসের সাধের পঞ্চাশ মণ বীজ নষ্ট হয়ে গেল।

লিন্ডসে লিখেছেন, আসলে মুসলমান শাসকদের নির্যাতন তারা এখনও ভোলেনি। এবং স্বাধীন শাসনতন্ত্রের প্রক্রিয়া, যেখানে যার যার পরিশ্রমের ফল তার তার ভোগের অধিকার আছে, বুঝতে তাদের সময় লাগবে। তিনি আরো লিখেছেন–

"নিজের পয়সা খরচ করে আমি নীল ও রেশম চাষ করেছিলাম। বেশ খরচ হয়েছিলো তাতে। একবারের উৎপাদনের নমুনা কর্তাদের দেখিয়েছিলাম। কিন্তু এখানে যে ভীষণ বন্যা হয় তাতে এ প্রকল্প বাদ দিতে হলো। বিশেষ করে পাহাড় বেয়ে যখন ঢল নামে তখন সামনে যা পায় তাই ধুয়ে মুছে নেয়।

কফির দিকেও মনোযোগ দিয়েছিলাম। অনেক দূর এক প্রদেশ থেকে যেখানে কফি উৎপাদিত হয় সেখান থেকে আমি কফির চারা এনেছিলাম।

এরি মধ্যে কয়েক মাস আমাকে সিলেটের বাইরে থাকতে হবে। সিলেট ছেড়ে যাবার আগে মালীকে নির্দেশ দিয়ে গেলাম, চারাগুলোর আকৃতি প্রকৃতি বদলে গেছে; কিছু বেশ বড়, কিছু ছোট। মালীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল, একবার ছাগল ঢুকে আমার লাগানো চারা সব খেয়ে ফেলেছে। তখন মালী কাছের জঙ্গলে গিয়ে একই রকমের একই সংখ্যার চারা এনে এখানে লাগিয়েছে। আমার কাছে স্টকে তখন পুরনো কিছু চারা ছিলো। মালীর লাগানো চারার সঙ্গে আমারগুলোও লাগালাম। এবং নির্দিষ্ট সময়ে দু'ধরনের গাছে একই ধরনের কফি হলো। এতে প্রমাণিত হলো, এ অঞ্চলের উঁচু এলাকায় এমনিতেই কফি হয়।" লিন্ডসে একেবারের জন্য যখন সিলেট ত্যাগ করেন তখন তাঁর উত্তরাধিকারিকে এ ব্যাপারে জানিয়ে গেছিলেন। এবং খুব সম্ভব তার উত্তরাধিকারি এসব ব্যাপারে তেমন উৎসাহী ছিলেন না।

আগেই উল্লেখ করেছি লিন্ডসের সময়ের সিংহভাগ কেটে যেতো বিচার আচারে। এ সম্পর্কিত দু'টি ঘটনার উল্লেখ তিনি করেছেন। একবার এক মামলা এলো। একজন অভিযাগ করছে যে, অপরজন তার কোমরবন্ধ থেকে টাকা চুরি করেছে। অভিযুক্ত বিনীতভাবে সে যে নির্দোষ তা উল্লেখ করছে, সাক্ষী মানছে ঈশ্বরকে এবং সবশেষে বললো, পানির বিচার মানতে সে রাজি। অভিযোগকারী বলে উঠলো, ঠিক, ঠিক, পানির বিচার। পানি। চারপাশের লোকজন তাকিয়ে আছে লিন্ডসের দিকে। লিন্ডসে ম্যাজিস্ট্রেটের গাম্ভীর্য নিয়ে বললেন, "তবে তাই হোক। ঈশ্বরের ইচ্ছাই– পালিত হোক।"

কাছারিটি ছিলো সুন্দর এক পুকুরপাড়ে। লিণ্ডসের নির্দেশের পর বাদী-বিবাদী দু'জনই ঝাঁপ দিলো পানিতে এবং মিলিয়ে গেল নিচে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কথিত অভিযুক্ত ভেসে উঠলো এবং স্বীকার করলো তার দোষ। কিন্তু বাদীর দেখা

গেছে। কয়েক মিনিট পর লিন্ডসে ঘোষণা করলেন কেউ যদি ডুব দিয়ে বন্দিকে তুলে আনে তাহলে তাকে তিনি পুরস্কৃত করবেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন ঝাঁপ দিয়ে ডুব দিলো এবং মৃতপ্রায় বাদীকে তুলে আনলো। জানা গেল বাদী ডুব দিয়ে পানির নিচের শেকড় আঁকড়ে ধরে রেখেছিলো এবং ঠিক করেছিলো, মরে যাবে সেও ভালো কিন্তু তার দাবি সে ছাড়বে না।

আরেকবার কাছারি দিকে হেঁটে যাচ্ছেন লিণ্ডসে। এমন সময় একজন ভিখিরী পুরোহিত তার কাছে এসে বললো, "যদি আপনি ভদ্রলোক হন তাহলে আমাকে পয়সা দেবেন; আর যদি ডাকাত হন তাহলে আমার আর আশা করার কিছু নেই।" লিন্ডসে কষে তাকে এক চড় লাগালেন। পুরোহিত পড়ে গেল মাটিতে, শুয়ে রইলো মৃতের মতো। বিন্দুমাত্র সেদিকে নজর না দিয়ে লিন্ডসে চলে গেলেন। চার-পাঁচ ঘণ্টা পর যখন ফিরছেন তখন দেখলেন লোকটি সেভাবেই পড়ে আছে। লিন্ডসের অধস্তনরা লোকটির হাত-পা নেড়ে চেড়ে বললো, সে মরে গেছে। স্বাভাবিকভাবেই লিন্ডসে একটু ঘাবড়ে গেলেন। আশপাশের লোকও জমে গেছে। তখন তিনি একটুকরো খড় নিয়ে লোকটির নাকে সুড়সুড়ি দিলেন। অমনি বিকট স্বরে 'হ্যাচ্চো' করে সে উঠে বসলো। ফলাফল ঃ লোকটিকে পরে ভালোভাবে চাবুক পেটা করা হলো।

এরি মধ্যে জাহাজ নির্মাণের ব্যাখ্যাও করেছেন লিন্ডসে। ইঙ্গ-ফরাসি যুদ্ধের সময় জাহাজের দরকার। সরকারি বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে লিন্ডসে জানালেন আট মাসের মধ্যে নিজের জাহাজ নির্মাণ করে তিনি মাদ্রাজে পাঁচ হাজার টন চাল পাঠিয়ে দেবেন। সরকার রাজি হলো। লিন্ডসেও তাঁর কাজ শুরু করেছিলেন। কিছুটা সফলও হয়েছিলেন। ঐ সময় এক চিঠি থেকে জানা যায় লিন্ডসের সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ছিলো দশ থেকে পনেরো হাজার পাউন্ড। সরকারি কন্ট্রাক্ট ছাড়াও জাহাজ সংক্রান্ত আরো কিছু ব্যবসা করেছেন লিন্ডসে।

একবার এক জাহাজ নির্মাণের জন্য অংশীদার পেলেন। জাহাজের নাম রাখা হলো অংশীদারের মেয়ের নামে– অগাস্টা। অবশ্য জাহাজ নির্মাণের বেশির ভাগ কাজই করতে হলো লিন্ডসেকে, অংশীদার খুশী মনে শুধু টাকা দিয়েই খালাস। জাহাজ নির্মাণের পর প্রধান কাজ এটিকে সমুদ্রে নিয়ে যাওয়া। এ পথ ও পথ অনেক ঘুরে লিন্ডসে জাহাজ নিয়ে কিছুটা এগোলেন যদিও প্রায় তা ঠেকে যাচিছলো। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মোহনায় লক্ষ্মীপুরে এসে আটকে গেলেন তিনি। জাহাজের কাপ্তান টমাস ও লিন্ডসে নিজে দুটো নৌকায় নদী এপার ওপার করলেন। কিন্তু দেখলেন নদী দু'টি বিশাল বটে (কুড়ি মাইল চওড়ায়?) কিন্তু নাব্যতা কোথাও চৌদ্দ ফুটের বেশি নয়। অথচ জাহাজ সতোরো ফুটের। অবস্থাটা একবার চিন্তা করুন। সে জাহাজের আবার বাণিজ্যের জন্য ভরা হয়েছে চল্লিশ হাজার পাউন্ডের

মালপত্র। কি করা? লিন্ডসে ও টমাস দুটো নৌকো নিয়ে খুঁজতে বেরুলেন সরু কিন্তু গভীর কোনো খাল বা নালা পাওয়া যায় কিনা যাতে জাহাজটি যেতে পারে। এবং অনেক খোঁজাখুঁজির পর তারা গঙ্গার একটি ছোট শাখার খোঁজ পেলেন। নাম তার হরিণঘাটা।

এখানে লিন্ডসের অংশীদারও কাপ্তানের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিলেন। জাহাজটির গন্তব্য মালাক্কা। জাহাজের প্রধান পণ্য আফিম। পথে থামবে ম্যাকাও এবং চীনে। লিন্ডসে তাঁর অংশীদারকে বললেন, কাপ্তানকে এই অনুমতি দিতে যে, বাণিজ্য শেষে, ভালো দাম পেলে যেনো জাহাজটিও বিক্রি করে দেয়া হয়। অংশীদারের কোনো আপত্তি ছিলো না এতে।

ডিসেম্বর মাস শুরু হয়েছে। নদী শান্ত, বাতাস অনুকূলে। কাপ্তানকে বললেন লিন্ডসে, জাহাজের সমস্ত পাল খুলে দিতে, যাতে পানি কম থাকলেও টেনে হিঁচড়ে সমুদ্রে পৌঁছা যায়। তাই হলো। কাপ্তান পরে বলেছিলেন লিন্ডসেকে যে, জাহাজটি বেঁচে যাবে এ আশা তাঁর ছিলো না।

এরপর বারো মাস 'অগাস্টার' আর কোনো খোঁজ নেই। তারপর ক্যান্টন থেকে খবর পাওয়া গেল কাপ্তান সাফল্যজনকভাবে বাণিজ্য সম্পন্ন করে এক পর্তুগীজের কাছে জাহাজটি বেশ ভালো দামেই বিক্রি করে দিয়েছেন। এভাবেই লিণ্ডসের জাহাজ ব্যবসার সমাপ্তি ঘটলো। লিন্ডসে পরে তার জাহাজ ব্যবসার আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। সিলেট নদীতে বেশ বড়সড় একটি নৌকো পড়ে ছিলো যাতে চুন আনা নেওয়া হতো। জনৈক কাপ্তান টেইলর অনেক দিন লিণ্ডসেকে একটি চাকরির জন্য বলছিলেন। টেইলর নৌকোটা দেখে লিন্ডসেকে বললেন, এতে একটি ডেক তৈরি করে দিতে। তাহলে তিনি পণ্য নিয়ে মাদ্রাজ যাবেন। লিন্ডসে রাজি হলেন একটি শর্তে। শর্তটি হলো, মাদ্রাজ পৌঁছুবার পর জ্বালানি কাঠ হিসেবে যেন 'জাহাজ'টিকে বিক্রি করে দেয়া হয়। কাপ্তান টেইলর সফলভাবে তার ভ্রমণ সম্পন্ন করলেন কিন্তু জ্বালানি কাঠ হিসেবে এটিকে বিক্রি না করে প্রচুর পরিমাণ হলুদ রং দিয়ে একে চকচকে করলেন। পুরনো নাম 'গোলুস্পাস' বদলে রাখা হলো নতুন নাম 'প্রিন্স উইলিয়াম'। তারপর বিজ্ঞাপন দিলেন কাগজে– "বাংলায় সরাসরি; পণ্য ও যাত্রার জন্য যোগাযোগ করুন– ক্যাপ্টেন টেইলর।"

লিন্ডসের বন্ধু জন্ কারসটায়ার্স সবে ইংল্যান্ড থেকে এসেছেন। বিজ্ঞাপন দেখে তিনি টেইলরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার মালিক কে?'

'সম্মানিত রবার্ট লিন্ডসে।'

এই উত্তরের পর, পরদিন কারসটায়ার্স চেপে বসলেন সে জাহাজে। বাতাস অনুকূলে। তবুও জাহাজ দিনে তিন নটের বেশি এগোয় না। তাও আবার ঝামেলা

হয়। এক সময় কারসটায়ার্স আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপারটা কি ক্যাপ্টেন?'

'ব্যাপার আর কি স্যার, শান্ত স্বরে বললেন, ক্যাপ্টেন, 'জাহাজের কোনো কীল নেই, তলাটা প্যান কেকের মতো।'

কারসটায়ার্স কাপ্তানকে ভালোভাবে নিরীক্ষা করে নিশ্চুপ হয়ে নিয়তির হাতে নিজেকে ছেড়ে দিলেন। ভাগ্য ভালো যে, আবহাওয়া ভালো ছিলো। একটু এদিক ওদিক হলে তাদের সবাইকে পানির নিচে চলে যেতে হতো।

জাহাজ সংক্রান্ত কাহিনী শেষ করেছেন লিন্ডসে তাঁর মা'র লেখা একটি চিঠির অংশ উদ্ধৃত করে। ইংল্যান্ড থেকে তাঁর মা লিখেছিলেন–

'প্রিয় রবার্ট, ধরে নিচ্ছি তুমি একজন অতিজ্ঞ জাহাজ নির্মাতা– এ ক্ষেত্রে তোমার ট্যালেন্টও আছে মানি– কিন্তু তোমাকে একটি অনুরোধ– তুমি যখন দেশে ফিরবে তখন নিজের তৈরি জাহাজে ফিরো না।'

লিন্ডসে লিখেছেন, "আমি অক্ষরে অক্ষরে মা'র উপদেশ মেনেছি।"

১৭৮১ সাল এবং তার আগের বছর সিলেটে এমন ফলন হলো যে বলার নয়। লিন্ডসে লিখেছেন, নদীর কূলে কূলে ধানের গোলা উপচে পড়লো। অতি উৎপাদনের ফলে, চালের দাম গেল কমে। এতো কমলো যে, চাল বিক্রি করলে বাজারে নেয়ার খরচও পোষায় না। লিন্ডসে সরকারকে জানাতে বাধ্য হলেন যে, চাষিরা এ বছর (১৭৮১) আর খাজনা দিতে পারবে না। গরিব এলাকাগুলোর অবস্থা আরো খারাপ কারণ, চালই ছিলো রাজস্বের একমাত্র সূত্র। লিন্ডসের আবেদন গ্রহণ করলো সরকার। খাজনা মওকুফ ঘোষণা না হতেই হঠাৎ করে শুরু হলো বন্যা। সে কি বন্যা! খাড়াভাবে ত্রিশ ফুট উঁচু পর্যন্ত পানি উঠলো। ভাসিয়ে নিলো নদীর দু'তীর। কূলে কূলে উপচে পড়া গোলা, গরু বাছুর, সব ভেসে গেল পানির তোড়ে। উঁচু এলাকার গোলায় রাখা কিছু ফসল বাঁচলো। এক সপ্তাহের মধ্যে ভাগ্য বদলে গেল মানুষের। শুরু হলো দুর্ভিক্ষ। লিণ্ডসে এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম যে কাজটি করলেন তা হলো, চতুর্দিকে দ্রুতগামী সব নৌকো পাঠিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য, আগে বিভিন্ন প্রদেশে রপ্তানির জন্য যে চাল পাঠানো হয়েছে তা ফেরত আনা; এর ফলে, কিছু চাল উদ্ধার হলো বটে কিন্তু অবস্থার তেমন উন্নতি হলো না।

"আমি পড়লাম ভারি অস্বস্তিকর অবস্থায়", লিখেছেন লিন্ডসে, "কারণ এক সপ্তাহ আগে সুপ্রিম বোর্ডকে যা জানিয়েছি ঘটনা এখন তার বিপরীত। যা হোক সরকার তৎক্ষণাৎ আমাদের সাহায্য করলেন। কিন্তু পুরো ঘটনাটা তাদের অবাস্তব মনে হচ্ছিলো যে, গোপন তদন্তের জন্য তারা পাঠালো একজনকে। কিন্তু সামগ্রিক অবস্থায় পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আমার কাছে পৌঁছতে পারেননি। তিনি যে রিপোর্ট

দিলেন সরকারকে তার সঙ্গে আমার রিপোর্টের কোনো অমিল ছিলো না। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে এ ঘটনায় এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুবরণ করেছিলো।"

লিন্ডসে লিখেছেন, এতো দুরবস্থার মধ্যেও মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অপরিসীম শ্রম। ক্ষমতা তাঁকে অবাক করেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন তিনি। ফসল নষ্ট হওয়ার পর, কৃষকরা উঁচু জমিতে বেঁচে যাওয়া ধানের চারা যোগাড় করলেন। কিন্তু লাগাবেন কোথায়? তাদের জমি তো পানির নিচে। নতুন এক পদ্ধতি তারা উদ্ভাবন করলেন। পদ্ধতিটি যে তাদের কাছে একেবারে নতুন তা নয়। তবে কদাচিং তারা ব্যবহার করেন এ পদ্ধতি। কাজটি করা হতো ক্যানোতে; নৌকোর এক মাথায় থাকতো ধানের চারা। অন্য প্রান্তে আঠালো শক্ত মাটি। চাষি কয়েকটি চারা সে মাটিতে ভালোভাবে এঁটে পানিতে ফেলে দিতেন। চারার গোড়া চলে যেতো দেড় ফুট পানির নিচে। এবং তা লেগে থাকতো আঠালো মাটির সঙ্গে। পানি বাড়ার সঙ্গে চারাও বাড়তো। এবং বারো থেকে চৌদ্দ ফুট পর্যন্ত উঁচু হতো। শুনেছি, সম্প্রতি আমাদের ধান গবেষণাগারও নাকি এ ধরনের ধানের চারা উদ্ভাবন করেছে। যা হোক, লিন্ডসে লিখেছেন, এভাবে শ'য়ে শ'য়ে একরে ধান লাগানো হলো। এবং দুর্ভিক্ষ অবস্থা থেকে এ ফসল অনেককে বাঁচাতে সাহায্য করেছিলো।

এ ঘটনার কয়েক মাস পর ঢাকা যাচ্ছিলেন লিন্ডসে। তখনও তিনি দেখেছেন, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে পানিতে ডুব দিয়ে এক মুঠো ঘাস বা সবজি খোঁজার চেষ্টা করছে। এখানেই ঘটনার শেষ নয়। নতুন ফসল ওঠার পর নতুন অন্ন নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। ফল– আরো, আরো অনেক মৃত্যু।

বিদ্রোহ চারদিকে

লিন্ডসে লিখেছেন, সেই সময় অষ্টাদশ শতকের আশি নব্বই দশকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন তেমন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। ফলে, মাঝে মাঝে জ্বলে উঠতো বিদ্রোহের আগুন। এ প্রসঙ্গে তিনি ১৭৮২ সালে হেস্টিংসের বেনারস ভ্রমণের কথা লিখেছেন। ঐ সময় চৈৎ সিং এবং ওয়াজির আলী পরিকল্পনা মতো হেস্টিংস ও তাঁর দেহরক্ষী বাহিনীকে প্রায় গ্রেফতার করে ফেলেছিলো; যদি চৈৎ সিংয়ের পরিকল্পনা সফল হতো, তাহলে লিন্ডসে জানিয়েছেন, পুরো ভারত জুড়ে বিদ্রোহের দামামা বেজে উঠতো। কারণ অসন্তোষ যে বিদ্যমান ছিলো তা বলাই বাহুল্য। বাংলার বিভিন্ন প্রদেশেও সেই অসন্তোষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো যার খানিকটা রেশ পৌঁছেছিলো ঢাকা এবং সিলেটে।

সিলেটে বিদ্রোহ বেশ জোরালো হয়েছিলো। মুহররম এগিয়ে আসছে। এমন সময় হিন্দুদের একটি প্রতিনিধি দল লিন্ডসেকে এসে জানালেন, তারা গোপন সূত্রে

জানতে পেরেছেন মুহররমের দিন মুসলমানরা কোম্পানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে আর মন্দির ধ্বংস করবে। লিন্ডসে বললেন, তিনি ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছেন না। কারণ, দাঙ্গা বাঁধবে এমন কোনো আলামত তাঁর চোখে পড়েনি।

লিন্ডসের অধীনে যে সামরিক বাহিনী ছিলো তা তখন সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলে ছিলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। বিপদ ঘটলে কুড়িয়ে বাড়িয়ে জনা-পঞ্চাশেক-কে পাওয়া যাবে। যা হোক, লিন্ডসে তাঁর জমাদার বা কৃষ্ণ অফিসারকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিলেন।

তাজিয়া বিসর্জনের দিন বিকেল পর্যন্ত ঝামেলা হলো না। কিন্তু বিকেল পাঁচটার দিকে বেশকিছু হিন্দু বাসিন্দা শরীরে জখমের দাগ নিয়ে ছুটে এলো লিন্ডসের বাসায়। জানালো, মুসলমানরা দাঙ্গা শুরু করেছে। লিন্ডসে সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হয়ে নিলেন, পিস্তলে কার্তুজ ভরলেন এবং তা দিলেন তাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্যের হাতে। উদ্দেশ্য, ভৃত্যটি সঙ্গে সঙ্গে থাকবে এবং প্রয়োজনে পিস্তল এগিয়ে দেবে। তারপর হাতে হাল্কা একটা তলোয়ার নিয়ে লিন্ডসে বেরিয়ে পড়লেন।

শহরের চারদিকে তখন আগুন জ্বলছে। লিন্ডসে তাঁর ছোট বাহিনী নিয়ে এগিয়ে চললেন ঘটনা স্থলে। তিনি যা অনুমান করেছিলেন তার চেয়ে বেশি লোক সেখানে। লিন্ডসে এগোচ্ছেন, তারা পিছোচ্ছে। এবং পিছিয়ে একটা টিলার ওপর তারা দৃঢ় অবস্থান নিলো। লিন্ডসেও উঁচুতে উঠে তাদের বিপরীতে এক টুকরো সমতল জায়গায় তাদের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। তারপর তাঁর ভৃত্যকে নিয়ে এগোলেন তাদের মুখোমুখি হওয়ার জন্য।

এর পরের বর্ণনা লিন্ডসের ভাষায় দেয়া যাক–

"তাদের নেতা একজন মওলানা, বেশ খানদানীই মনে হলো, নেতৃত্ব দিচ্ছেন শ'তিনেক লোকের। তাঁর ব্যবহার ছিলো অস্থির; আমি ছিলাম শান্ত। আমি তাঁকে বললাম, এ এলাকার প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে আমি তাঁর কাছে এসেছি– আমি শুনেছি খানিক আগে দাঙ্গা হয়েছে। আগামী দিন আমি এর তদন্ত করবো এবং ন্যায় বিচার যা হয় তাই করা হবে– এখন আমার উদ্দেশ্য তাঁরা যেন অস্ত্র পরিত্যাগ করে শান্তভাবে ফিরে যায়। কথা শেষ হতে না হতেই তিনি খাপ থেকে তলোয়ার বের করে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'এখনই সময় হত্যার নয় মৃত্যুর; খতম হয়ে এলো ইংরেজ শাসন।' এবং তলোয়ার দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানলেন আমার মাথা বরাবর। ভাগ্য ভালো যে তা ফসকে গেল কিন্তু আমার তলোয়ারটি দু'খণ্ড হয়ে গেল। হাতলের সঙ্গে সামান্য কিছু অংশ রয়ে গেল আমার হাতে। আমার কৃষ্ণ ভৃত্য সঙ্গে সঙ্গে একটি পিস্তল গুঁজে দিলো আমার হাতে, আমি ঘোড়া টিপলাম, মওলানা পড়ে গেলেন মাটিতে– এতো কাছাকাছি ছিলাম আমরা যে তার কাপড়ে আগুন লেগে গেল।

আমার সিপাহীরা এ বিপজ্জনক পরিস্থিতি দেখে এগিয়ে এলো। তারপর এক সঙ্গে আমরা বেয়নেট চার্জ করে তাদের হটিয়ে দিতে লাগলাম। সে মুহূর্তে আমার পায়ের কাছে জখম হয়ে পড়েছিলো এক বৃদ্ধ, এবং একজন সিপাহী বেয়নেট দিয়ে তাকে গেঁথে ফেলছিলো, কিন্তু সে মুহূর্তে পা দিয়ে আমি জখমী লোকটিকে সরিয়ে দিলাম। এ ঘটনাটি বলার কারণ আছে যা পরে উল্লেখ করবো।"

বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। ফলাফল, মৌলানা ও তাঁর দুই ভাই হলেন নিহত। তাঁদের বেশকিছু আহত। অন্যদিকে, লিন্ডসের পক্ষে নিহত হয়েছে একজন, আহত ছয়জন। ভাগ্য ভালো যে, সিপাহীরা পক্ষ ত্যাগ করেনি, লিখেছেন লিন্ডসে, তাহলে সেদিন সিলেটে একজন ইউরোপিয়কেও আর খুঁজে পাওয়া যেতো না। সব শেষ হওয়ার পর লিন্ডসে খুঁজলেন তাঁর সহকারীকে। তাঁর ধারণা হয়েছিলো সহকারী বোধহয় নিহত হয়েছেন। না, খানিক পরই খোঁজ পাওয়া গেল সহকারীর। জানালেন লিন্ডসকে তিনি শান্তভাবে যে, যুদ্ধাবস্থা তার সহ্য না হওয়ায় তিনি চলে গিয়েছিলেন।

লিন্ডসে এরপর জখমীদের নিয়ে এলেন তাঁর ডেরায়। তাদের শুশ্রুষা দরকার কিন্তু চিকিৎসার কোনো বন্দোবস্ত নেই। তবে তাঁর দড়ি প্রস্তুতকারক জোষ হিনটন সেলাই জানতো ভালো। তাকেই লাগিয়ে দেয়া হলো জখমীদের ক্ষতস্থানগুলো সেলাই করার জন্য। শহরের অবস্থা কি তখনও তা পুরোপুরি অবগত হননি লিন্ডসে। তাই জিম্মি হিসেবে শহরের প্রধান মুসলমানদের ধরে নিয়ে আসা হলো তাঁর বাসায়। যখন তাদের জিম্মি করার কাজ প্রায় শেষ তখন বেশকিছু ইউরোপিয় দৌড়ে এলো লিন্ডসের বাসায় আশ্রয়ের জন্য। জানালো তারা, বাইরে লোক জমায়েত হচ্ছে এবং তারা লিন্ডসের বাড়ি পুড়িয়ে দেবে। পরে জানা গেল ব্যাপারটি ঠিক নয়। আসলে মশাল জ্বালিয়ে মিছিল করে নিহতদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দাফনের জন্য। লিন্ডসে সামরিক বাহিনী পাঠিয়ে তাদের জানালেন, যেহেতু তারা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে সেহেতু সম্মান প্রদর্শন করে তাদের দাফন করা যাবে না। পরদিন মৌলানার আত্মীয়রা জানালেন বিনীতভাবে যে, তাঁরা দাফনের অনুমতি চান। নিভৃতে দাফনের অনুমতি দেয়া হলো তাঁদের।

ঘটনাটি ছিলো মারাত্মক এবং তা সঙ্গে সঙ্গে জানানো হলো সরকারকে। সরকার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তি সৈন্য পাঠাবার নির্দেশ দিলেন। তাদের ধারণা হয়েছিলো লিন্ডসে বিপদে আছেন। কিন্তু শীঘ্রই উত্তেজনা হ্রাস পেলে সে নির্দেশ বাতিল করা হলো। ঐ সময় লিন্ডসেকে কি ধরনের লোকের মোকাবেলা করতে হতো তার দু'একটি উদাহরণ তিনি দিয়েছেন। লিন্ডসের নিজের ভাষায়–

"সিলেটের এক গ্রামের মোটামুটি পরিচিত এক স্যাঁকরা একদিন আমার সঙ্গে নিভৃত আলাপের অনুরোধ করলো। জানালো যে, কিছুদিন আগে এক খাসিয়া

প্রধান পাহাড় থেকে শহরে এসেছেন। স্যাঁকরার পাশেই তিনি থাকতেন। খাসিয়া প্রধানের চলাফেরা দেখে তার সন্দেহ হয়েছে যে আমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলছে। এরপর স্যাঁকরা আমাকে একটি চিঠি দিলো। চিঠিটা খাসিয়া প্রধান নাকি লিখেছেন আমার রক্ষী বাহিনীর প্রধানকে। তবে, চিঠির ভাষা তিনি উদ্ধার করতে পারেননি। অনুরোধ জানালো সে চিঠিটা পড়ার জন্য খাসিয়া জানে এমন একজনকে খবর দিতে। খবর দিলাম। দোভাষী এসে চিঠিটা পড়ে চটজলদি ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করা শুরু করলো। রক্ষীবাহিনীর প্রধান ছিলো আমার খুব বিশ্বস্ত। তাই এ ধরনের ষড়যন্ত্র আমাকে যথেষ্ট কাবু করে ফেললো। চিঠিটাতে লেখা ছিলো–

"তোমার শেষ চিঠি পেয়েছি এবং সে অনুযায়ী কাজ করবো। সোমবার, ভোর হওয়ার দু'ঘণ্টা আগে আমি তোমার প্রভুর বাড়ি ঘিরে ফেলবো এবং তাঁকে ও তাঁর অনুচরদের বন্দি করবো। তুমি এবং তোমার সিপাহীরা যারা আমার পক্ষে তারা সতর্ক থাকবে এবং তোমাদের যথাযথভাবে পুরস্কৃত করা হবে।"

"আমাকে বিচলিত করার জন্য এটাই ছিলো যথেষ্ট। আমি আমার ঘরে গিয়ে, পিস্তলে বারুদ ভরলাম। তারপর আমার ইউরোপিয় ভৃত্যকে বললাম রক্ষীবাহিনীর প্রধান রহিম খানকে খবর দিতে। রহিম খান এলে তাকে বললাম, তাকে আমি আমার একজন অনুগত ও বিশ্বস্ত ভৃত্য হিসেবে জানি। কিন্তু আমি কিছু খবর পেয়েছি তাতে আমার ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে। 'তুমি এখন বন্দি'। তারপর আমি আমার ইউরোপিয় ভৃত্যকে পিস্তল দিয়ে বললাম, 'সারারাত এসে পাহারা দেবে। যদি সে পালাবার চেষ্টা করে বা তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হয় তবে তার মাথা বরাবর গুলি করবে।' রক্ষীপ্রধান তার তলোয়ার দিয়ে দিলো।

এবার পাশের ঘরে গিয়ে ভিন্ন সুরে স্যাঁকরাকে বললাম, 'বন্ধু তুমি আমাকে এ খবর দিয়ে এক ভয়ানক ষড়যন্ত্রের কবল থেকে আমাকে রক্ষা করেছ। এই ষড়যন্ত্র প্রমাণিত হলে তোমাকে যথাযথভাবে পুরস্কৃত করা হবে। রক্ষীপ্রধান এখন বন্দি। এখন প্রয়োজন প্রমাণ। প্রধান বিচারক হিসেবে আমার দায়িত্ব তোমাকেও গ্রেফতার করা। শুধু তাই নয় এখন তোমার বাসা থেকে তোমার কাগজপত্রের সিন্দুকে এনে খোলা দরবারে তা পরীক্ষা করতে হবে।

স্যাঁকরা খানিকটা উত্তেজিত হয়ে বললো, তার কাজের এই কি পুরস্কার? আমি বললাম, যথাসময়ে ন্যায় বিচার করা হবে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তার কাগজপত্র এনে পরীক্ষা করে দেখা গেল লোকটি কম খচ্চর নয়। আমি দেখলাম, যে চিঠি এবং চিঠিতে ব্যবহৃত সীলমোহর আমাকে দেখিয়েছে তা জাল। এবং নিখুঁত জাল করার আগে এ নিয়ে বেশ কয়েকবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। সরকারি সীলও নিখুঁতভাবে জাল করা হয়েছে। তাকে রুটিন মাফিক আদালতে

প্রেরণ করা হলো এবং আমার রক্ষীপ্রধানকে প্রকাশ্যে পুরস্কৃত করা হলো।"

লিন্ডসে জানিয়েছেন, আগে তিনি রক্ষী ছাড়াই গ্রামেগঞ্জে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াতেন। এসব ঘটনার পরও তিনি একা বেরোতেন না কারণ তাঁর মনে হয়েছিলো তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করলে চারদিকে আতঙ্ক দেখা দেবে। কিন্তু এমন একটি ঘটনা ঘটলো যার ফলে, তাঁকে সতর্ক হতে হলো। ঘটনাটি ঘটেছিলো সেই মৌলানা নিহত হওয়ার পর।ঘটনাটি অবশ্য তিনি উল্লেখ করেননি।

আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন তিনি এ পরিপ্রেক্ষিতে। লিন্ডসের বন্ধু রবার্ট হ্যামিলটন এসেছেন তাঁর কাছে বেড়াতে। একদিন তাঁরা নৈশভোজ সারবেন এমন সময় একজন ভৃত্য এসে খবর দিলো, এক ফকির জরুরি কাজে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়। লিন্ডসে তাকে ভেতরে আনতে বললেন। তিনি দরজার দিকে মুখ করে বসেছিলেন। আর টেবিলের উল্টোদিকে, দরজার দিকে ফিরে বসেছিলেন হ্যামিলটন। ফকির ঘরে ঢুকে ঠিক হ্যামিলটনের পিছে দাঁড়ালেন। তারপর লিন্ডসেকে জানালেন, সিলেটে ঢোকার পর তার সব কিছু লুট হয়ে গেছে তাই এখন প্রতিকারের আশায় এসেছেন তিনি লিন্ডসের কাছে। তার ভঙ্গিতে ছিলো অস্থিরতা আর চোখগুলো যেন জ্বলছিলো। তার ডান হাত ছিলো কোমরবন্দের ওপর। তার ভাবভঙ্গি দেখে লিন্ডসের সন্দেহ হলো। তিনি গলার স্বর বা চেহারায় কোনো পরিবর্তন না এনে বললেন, 'হ্যামিলটন, ধাক্কা দিয়ে ব্যাটাকে ফেলে দাও'। হ্যামিলটন ইতস্তত করছিলো। 'আমার নির্দেশ পালন করো।' বললেন লিন্ডসে। হ্যামিলটন বেশ শক্তসমর্থ। চকিতে উঠে দাঁড়িয়ে ঘুষি চালালো। ফকির মাটিতে গড়ার আগে কোমরবন্দে লুকানো ছোরাটা বের করে হ্যামিলটনকে গাঁথতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে ব্যর্থ হয়ে নিজের বুকেই তা বিঁধিয়ে দিলেন। রক্তপাতের দরুন জ্ঞান হারালেন ফকির। যা হোক, সুস্থ হওয়ার পর লিন্ডসে তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। পাগলের মতো ফকির উত্তর দিলেন যে তিনি ঈশ্বরের দূত। পাঠানো হয়েছে তাকে বিধর্মীদের হত্যা করতে।

কয়েকদিনে পর ফকির মারা গেলেন কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর বক্তব্য থেকে তিনি সরেননি।

লিন্ডসে এ ঘটনাগুলোকে ঝামেলা হিসেবে উল্লেখ করলেও আদৌ কি তাই ছিলো? তাঁর বিবরণ বিশ্লেষণ করলে কিন্তু তা মনে হয় না। কারণ, লিন্ডসের বিবরণেই দেখি, সে সময়টা ভারতবর্ষে অসন্তোষ বিরাজ করছিলো যার রেশ পৌঁছেছিলো সিলেট অব্দি। প্রধানত মুসলমানরা বিধর্মী শাসন উৎখাত করার জন্য তৎপর ছিলেন। মৌলানার বিদ্রোহের পরও অসন্তোষের আগুন নেভেনি। ফকিরের ঘটনাটি তারই উদাহরণ।

এ প্রসঙ্গে লিন্ডসে আরেকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। এটি ঘটেছিলো

অনেক পরে; লিন্ডসে তখন অবসর জীবনযাপন করছেন নিজের দেশে। অবসর সময়ে পরিবারের সদস্যদের কাছে স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে সিলেটের সেই বিদ্রোহ এবং সাহসী বৃদ্ধ বিদ্রোহীর বাঁচাবার কথাও বলতেন। আগ্রহী হয়ে শুনতেন সবাই।

বিশ বছর পরে একদিন। রুটিন মাফিক ঘোড়ায় চড়ে সকালে ভ্রমণে বেরিয়েছেন লিণ্ডসে। তাঁদের পাদ্রী মিঃ স্মলের কুটিরের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলেন প্রাচ্যদেশীয় পোশাক পরে এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে। তাকে বিস্মিত করে লিন্ডসে হিন্দুস্থানীতে জিজ্ঞেস করলেন–

"তুমি জন্মেছো কোথায়?'

'কলকাতায়।'

'ঝুট বাত। তোমার উচ্চারণ তা বলে না। নিশ্চয় তুমি অন্য কোথাও জন্মেছো।'

'ঠিকই বলেছেন। আমি আশা করিনি বিদেশে কেউ আমাকে এমনি জেরা করবে।'

আভূমি নত হয়ে সালাম জানিয়ে তারপর তিনি লিন্ডসের পরিচয় ও তিনি কোথায় থাকেন জানতে চাইলেন। পাহাড়ের ওপর নিজের বাড়ি দেখিয়ে লিন্ডসে তাকে পরদিন সকালে দেখা করতে বললেন।

পরদিন ঠিক সময়ে তিনি এলেন। সপরিবারে লিন্ডসে তার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তারা কথাবার্তা শুরু করলেন হিন্দুস্থানীতে। লিন্ডসে প্রথমে তার নাম জিজ্ঞেস করলেন–

'সৈয়দউল্লাহ।'

'তাহলে প্রথম দেখায় কেন তুমি আমায় মিথ্যা বলেছিলে?'

'আপনি আমাকে আমার ভাষায় প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে অবাক করে দিয়েছিলেন। সত্যি কথা হলো, আমার জন্ম বাংলাদেশের সিলেটে। এখানে এসেছি মিঃ স্মলের ছেলের ভৃত্য হয়ে। তিনি ছিলেন জাহাজের পার্সার। আপনার নামের একজন আমাদের দেশে বেশ বিখ্যাত। লন্ডনে তাঁকে আমি অনেক খুঁজেছি, সন্ধান পাইনি।'

'মনে করো, আমিই সেই ব্যক্তি।'

'কি? আপনিই হত্যা করেছেন পীরজাদাকে (প্রধান মৌলানার পুত্র),' চেহারায় তাঁর ঘৃণার ভাব।

'হ্যা', জবাব দিলেন লিন্ডসে, 'কারণ, তিনি তলোয়ার হাতে আমায় আক্রমণ করেছিলেন। তাঁর কৃতকর্মের ফল তিনি ভোগ করেছেন।'

সৈয়দউল্লাহ স্বাভাবিক হয়ে এলেন। লিন্ডসে এ ব্যাপারে তাঁর মতামত জিজ্ঞেস করলেন। সৈয়দউল্লাহ বললেন, 'কেউ কেউ বলেন আপনি ঠিক করেছেন। কেউ কেউ বলেন, কাজটি ঠিক হয়নি। আমি অবশ্য তখন বালক।'

'সৈয়দউল্লাহ, সংঘর্ষের সময় তুমি কোথায় ছিলে?'

'পাহাড়ের ওপর, ঘর বাড়ির কাছে', তারপর খানিকটা রূঢ় স্বরে তিনি বললেন, 'আপনি আমার বাবাকেও হত্যা করেছেন।'

'তিনি কি একজন বৃদ্ধ, সৈয়দউল্লাহ।'

'হ্যাঁ।'

'তোমার বাবা মারা গেছেন যুদ্ধে। আমিই তাঁর প্রাণ বাঁচিয়েছিলাম, ঠিক কি না?'

'ঠিক', বললেন সৈয়দউল্লাহ, 'তিনি গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন। তারই ফলে মাস কয়েক পর তিনি মারা যান।"

ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে সৈয়দউল্লাহ ঘটনার বর্ণনা দিলেন। তারপর মহিলাদের তিনি সিলেট সম্পর্কে বললেন। লিন্ডসে জানিয়েছেন, সৈয়দউল্লাহ যেভাবে নিজের দেশকে দেখতে চেয়েছেন সেভাবেই বর্ণনা করেছেন। বাস্তব চিত্র তিনি তুলে ধরেননি। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কিসে তিনি দক্ষ। জানালেন তিনি, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তরকারি রান্নার জন্য তিনি খ্যাত। তাকে অনুরোধ জানানো হলো আগামীকাল এসে মুরগি রাঁধতে। তিনি রান্নার জিনিসপত্র তৈরি রাখতে বললেন।

"পরদিন নাশতার টেবিলে পরিবারের গভর্নেস উপস্থিত। ইতস্তত করে জানালেন, গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তার জানাবার আছে। 'আমি জানি', বললেন তিনি, 'স্বপ্ন বিশ্বাস করতে নেই', এ কথা বলে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বললেন, 'আমি গত রাতে যে ভয়াবহ স্বপ্ন দেখেছি তা না বলে থাকা যায় না। স্বপ্নে দেখলাম, প্রাচ্য থেকে এক কৃষ্ণকায় লোক এসে মিঃ লিন্ডসে ও তাঁর পরিবারকে বিষ প্রয়োগ করেছে। সুতরাং আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ আজ যা রান্না হবে তা যেন টেবিলে না দেয়া হয়'।

সৈয়দউল্লাহ ঠিক সময়ে এসে রান্না শুরু করলেন। নৈশভোজের আগে বৃদ্ধা হাউসকিপার পাশের রুমে আমার স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে উত্তেজিত স্বরে বললেন, 'ম্যাডাম, এ তুচ্ছ বিষয় আপনাকে জানানো উচিত কি না জানি না, কিন্তু আমি মনে করি ঘটনাটা জানানো আমার কর্তব্য। সে যখন রান্না করছে তখন আমি দেখেছি, রান্নার সময় একবারও সে তরকারিটা চেখে দেখেনি। আমি তাকে বললাম, লবণটা বোধহয় ঠিক হয়নি। সে বললো– না, না, সব ঠিক আছে। ম্যাডাম, সাহেবকে বলুন তিনি যেন এ তরকারি না খান।' লিন্ডসের পরিবারের সবাই তাঁকে একই অনুরোধ জানালেন।

লিন্ডসে তাতে বিন্দুমাত্র কান না দিয়ে সৈয়দউল্লাহর রান্না খেলেন। লিখেছেন তিনি, 'এতো চমৎকার রান্না আগে দেখিনি, আর এতো চমৎকার নৈশভোজও আগে

কখনো করিনি।

আমি জানতাম কেন সৈয়দউল্লাহ রান্না চেখে দেখেনি। কারণ, মুরগিটা মেরেছিলো আমার রাঁধুনে। যদি সে হালাল মতো মুরগি জবাহ করতো তা'হলে সৈয়দউল্লাহর রান্না চেখে দেখার ব্যাপারে কোনো আপত্তি থাকতো না।"

জীবন যে রকম

সিলেটের কর্তৃত্ব পাওয়ায় ঢাকা কাউন্সিলের অনেকেই ক্ষুব্ধ ছিলেন লিন্ডসের ওপর। তাদের কয়েকজন ইতোমধ্যে রাজস্ব বোর্ডের উচ্চপদে নিযুক্তি পেয়েছেন। প্রায়ই তাঁরা বিরক্তিকর সব নির্দেশ পাঠাতেন লিন্ডসেকে। এরকম এক চিঠিতে তাঁরা জানালেন, সিলেটের রাজস্ব আদায়ের ভার তাঁরা গোবিন্দরাম নামে জনৈক কৃষ্ণ ভদ্রলোকের ওপর ন্যস্ত করেছেন। সুতরাং লিন্ডসে যেন তাঁকে রাজস্ব আদায় বুঝিয়ে দেন। লিন্ডসেকে এরকম নির্দেশ পাঠাবার কোনো কারণ ছিলো না, কেননা তিনি নিয়মিত রাজস্ব শোধ করতেন।

লিন্ডসে নির্দেশ মেনে নিলেন কারণ তিনি জানতেন কোনো কৃষ্ণ ভদ্রলোকের পক্ষে এ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়।

গোবিন্দরাম এলেন। লিন্ডসে তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করলেন। গোবিন্দরাম বোর্ডকে জানালেন, প্রদেশের কার্যভার বুঝে নিতে লিন্ডসে তাঁকে সব রকমের সাহায্য করেছেন। লিন্ডসেও তখন খানিকটা অবসর চাইলেন। বন্ধু রবার্ট হ্যামিলটনের সঙ্গে তিনি বেরিয়ে পড়লেন বেনারসের উদ্দেশে।

ভারতবর্ষের আরো কিছু অঞ্চল ঘুরে দেখার ইচ্ছে ছিলো লিন্ডসের। কিন্তু হঠাৎ রাজস্ব বোর্ডের জরুরি বার্তা পেলেন যে তাঁকে সিলেট ফিরে যেতে হবে কারণ, গোবিন্দ রাম রাজস্ব আদায়ের কাজটি সম্পন্ন করতে পারেনি। সুতরাং লিন্ডসে আবার নৌকা ফেরালেন সিলেটের দিকে এবং মাসখানেকের মধ্যে ফিরে এলেন সিলেটে। গঙ্গা গোবিন্দের ভুলগুলো শুধরে আবার কাজ শুরু করলেন পূর্ণোদ্যমে।

লিন্ডসের অনুপস্থিতিতে তাঁর সহকারী ডব্লিউ, এইচ বিয়ে করেছেন। তাঁর স্ত্রী সিলেটের প্রথম ইউরোপিয় মহিলা। ডব্লিউ এইচের গলায় ঝোলানো থাকতো তাঁর স্ত্রীর একটি মিনিয়েচার। আর অনর্গল সে বলতে ভালোবাসতো তাঁর স্ত্রীর কথা। তবে লিন্ডসে জানিয়েছেন, ছবির সঙ্গে মহিলার চেহারার কোনো মিল ছিলো না। ডব্লিউ, এইচের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর পরিচয় হয়েছিলো কৈশোরে তারপর ভারতবর্ষ-ইংল্যান্ডে চিঠি চালাচালি করতে করতে তাদের প্রবল প্রেম গড়ে ওঠে। তবে, ভারতবর্ষে মহিলা আসার পর দু'পক্ষই হতাশ হয়। বিয়ের পর এই হতাশা চরমে ওঠে এবং লিন্ডসে তাদের মধ্যে সমঝোতা করতে গিয়ে নাজেহাল হন। এরপর

ডব্লিউ, এইচ বোতলের আশ্রয় নেন এবং শেষমেষ বোতলের শিকারে পরিণত হন।

এ সময় সিলেটের ইউরোপিয় সমাজের আয়তন খানিকটা বৃদ্ধি পায়। লিণ্ডসেও সমাজে মেলামেশা শুরু করেন। অপরাহ্ন পর্যন্ত তারা সরকারি বা নিজ কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতেন। বিকেলের দিকে তারা কয়েক ঘণ্টার জন্য বেড়াতে যেতেন লিন্ডসের বাগানে। এ বাগানটি কয়েক বছর ধরে একটি পাহাড়ে চূড়োয় যত্নের সঙ্গে করছিলেন লিন্ডসে। একদিকে তিনি লাগিয়েছিলেন কমলার চারা যা পরিণত হয়েছে এক কমলা বাগানে। অন্য ঢালে লাগিয়েছিলেন ফার গাছের সারি। এ অঞ্চলে এ গাছ আর কোথাও ছিলো না এবং লিন্ডসে গাছগুলো আনিয়েছিলেন তিব্বত থেকে। লিন্ডসে লিখেছেন, "ব্রিটিশ প্রজাদের যদি এ অঞ্চলে বসতি স্থাপনের অনুমতি দেয়া হতো তাহলে এ অঞ্চলটি বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর অঞ্চলে পরিণত হতো। কিন্তু, ব্রিটিশ প্রজাদের কলকাতার বাইরে বসতি স্থাপনের অনুমতি দেয়া হয় না। অবশ্য এর পেছনে যুক্তি আছে। দ্বিতীয় জেনারেশন তা হলে হারাবে আমাদের চরিত্র, কর্মক্ষমতা যার জন্য ভারতবর্ষে আমরা বিখ্যাত।"

শীতকালটা কাটাতেন তারা ময়ূর, প্যাট্রিজ, বনমোরগ আর অন্যান্য পাখি শিকার করে। তবে, পায়ে হেঁটে শিকার করা ছিলো ভয়ের কারণ, বন জুড়ে ছিলো বাঘ আর চিতা। একদিন যেমন লিন্ডসে তাঁর স্কটিশ ভৃত্য জন ম্যাকে'কে নিয়ে ফিরছেন। হঠাৎ জন বললো, 'স্যার, ঐটি কি?' পথের ওপর বিশাল এক প্রাণী দাঁড়িয়ে। 'ঐটি হলো রয়েল বেঙ্গল টাইগার।'

'স্যার, গুলি ছুঁড়বো নাকি?'

'না, জন, তাকে তার পথে যেতে দেয়াই ভালো।'

আরেকদিন বিশাল এক তেঁতুল গাছে একটি ময়ূর বসে আছে দেখে গুলি করতে প্রস্তুত হলেন লিন্ডসে। হঠাৎ দেখেন, তেঁতুলের আরেকটি ডাল বেয়ে নেমে আসছে এক চিতা। দ্রুত পালালেন লিন্ডসে।

লিন্ডসে লিখেছেন, সিলেটের গ্রাম বা বনাঞ্চলে প্রচুর বাঘের বাস। এবং সব রকমের বাঘই আছে সেখানে। আর বাঘ হত্যার জন্য সরকারি পুরস্কারও মজুদ। লিন্ডসে তাঁর বিবরণে বাঘ শিকার ও জ্যান্ত বাঘ ধরার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। সমসাময়িক অনেক বিবরণের সঙ্গে এর পার্থক্য প্রায় নেই বললেই চলে এবং তা আমাদের অনেকের জানা দেখে আর পুনরুক্তি করলাম না।

গন্ডারও পাওয়া যেতো সিলেটে। অনেক কষ্টে লিন্ডসে ও তাঁর অনুচররা একবার একটি বিশাল গন্ডার শিকার করেছিলো। গন্ডারটি মারা গেলে, আশপাশের গ্রামের প্রায় সব অধিবাসীই ঝাঁপিয়ে পড়লো মৃত প্রাণীটির ওপর। এবং দেহাবশেষ থেকে যে যা পারলো তা সংগ্রহ করে নিয়ে গেল। কারণ, সবার বিশ্বাস গন্ডারের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রোগ সারায়। অনেক কষ্টে লিন্ডসে শুধু গন্ডারের শিং আর মাথাটা

সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। ইংল্যান্ডে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি সেই সংগ্রহ। এক টুকরো মাংসও তিনি ভেজে খেয়েছিলেন। খুব একটা খারাপ লাগেনি। গয়ালের কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি। পার্বত্য ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রামে তা পালন করা হয়।

পাহাড়ে হাতি ধরার সুবাদে লিন্ডসের সঙ্গে পার্বত্য এক উপজাতির দেখা। এঁরা হলেন কুকি। লিন্ডসে লিখেছেন, "এর আগে এতো আদিম কোনো মানুষের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। বন্য প্রাণী থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা পত্রবহুল বৃক্ষে বাস করে। বন্য ফলমূল ও মধু খেয়ে তারা জীবনধারণ করে; সমতলের সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ নেই।" লিন্ডসে লালন পালনের জন্য এক কুকি শিশু নিয়ে এসেছিলেন। তাকে পড়ালেখা শেখাতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর মতে, "এদের মান খুব নিচু। পোষা বানর ও অন্যান্যদের সঙ্গ সে পছন্দ করতো।" লিন্ডসের কাছে এক বছর ছিলো সে কিন্তু এর মধ্যে সমতলের একটি শব্দও সে শিখতে পারেনি। তারপর সে পালিয়ে যায় বনে। লিন্ডসে আর কখনও তার দেখা পাননি।

শেষ জীবন

১৭৮৭ সাল চলে এলো। লিন্ডসে হিসেব করে দেখলেন, ভারতবর্ষে তাঁর কেটে গেছে প্রায় আঠারো বছর। এবং এই আঠারো বছর ছিলো শ্রমবহুল। তিনি ১৭৮৫ ও ১৭৮৬ সালের হিসেব নিয়ে বসলেন এবং দেখলেন তাঁর আয় তাঁর অনুমানকেও ছাড়িয়ে গেছে। খুশি মনে তখন তিনি দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নিলেন।

জানুয়ারি, ১৭৮৯ সালে ক্যাপ্টেন কামিংয়ের 'ব্রিটানিয়ায়' চড়ে রবার্ট লিন্ডসে রওয়ানা হলেন লন্ডনের পথে। ছয় মাস লাগলো লন্ডন পৌঁছতে। লন্ডনে পৌঁছে দেখলেন তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা বেশ ভালোই আছেন, উন্নতিও হয়েছে কারো কারো। যেমন- তাঁর ভাই কলিন, সে তখন পরিচিতি জেনারেল লিন্ডসে হিসেবে। দু'জন তাঁরা এক সঙ্গে স্কটল্যান্ড গেলেন। এই পথেই কুড়ি বছর আগে তারা রওয়ানা হয়েছিলেন স্পেনের দিকে।

লিন্ডসের শেষ জীবন লিন্ডসের ভাষাই উদ্ধৃত করি–

"জীবনের বাকি বছরগুলো কাটিয়েছি ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করে তুলতে আর সম্পত্তি বৃদ্ধিতে। এবং ও দু'টি কাজেই সবচেয়ে সাহায্যে পেয়েছি আমার বিশ্বস্ত বন্ধু আর স্ত্রীর। পঁয়ত্রিশ বছর আমরা বিবাহিত। তাঁর সঙ্গ আমার পছন্দ, আমার বড়সড় পরিবারও আমার পছন্দ। ভোগ করেছি পার্থিব সমস্ত সুখ-সুবিধা। ....আমার বাবা আমাকে বলে গেছিলেন উত্তর পুরুষের কাছে জীবন কাহিনী জানিয়ে যেতে। আমার তুচ্ছ কাহিনী আমি সেভাবে বর্ণনা করে বাবার অনুরোধ পুরো করলাম।"

২
বুখাননের দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা

১৫ ফেব্রুয়ারি ১৭৯৮ সালে পাতাহাট থেকে বুখানন রওয়ানা হন লক্ষ্মীপুরের দিকে। পাতাহাট চাঁদপুর-লক্ষ্মীপুরের সীমান্তে একটি গ্রাম। দূরত্ব নয় মাইল। সেখানে তিনি দেখা করবেন মি. কলফিল্ডের সঙ্গে। পাতাহাট থেকে লক্ষ্মীপুর অঞ্চলটি বুখাননের মনে হয়েছে চরাঞ্চল, আসলে ছিলোও তা। এখানে জায়ফলের চাষ করতে চেয়েছিলো কোম্পানি কিন্তু বুখাননের মনে হয়েছে এ মাটি ফলফলারির জন্য উপযুক্ত নয়, উপযুক্ত শাক-শবজির জন্য। এ অঞ্চলের ধান ও চাষের বিস্ত ারিত বিবরণ দিয়েছেন তিনি কারণ এসব তথ্য সংগ্রহের জন্যইতো তাঁর ভ্রমণ। বুখাননের কাছে বৈশিষ্ট্যময় ঠেকেছে, জমির যত্নের ব্যাপারটি। চাষি যেভাবে জমির চাষ করে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। কিন্তু কলাকৌশল পুরনো। লাঙ্গল আর বলদ। হালের বলদ রুগ্ন, আলাদা কোনো চারণভূমি নেই। গরুগুলোর অবস্থাও তাই, দুধ পাওয়া যায় না। দুপুরে তিনি দালালহাট পৌঁছে বিশ্রাম নিয়ে রহমত খালির তীর ধরে (নদী?) ছয় মাইল হেঁটে পৌঁছেন ভুলুয়ায়। বর্তমান নোয়াখালি তখন পরিচিত ভুলুয়া নামে। সেখানে দেখা হয় মি. জ্যাকসনের সঙ্গে।

বুখানন জানিয়েছেন যে অঞ্চলটা দিয়ে তিনি হেঁটে এলেন তার কোনো তুলনা হয় না। আদিগন্ত শস্যে পরিপূর্ণ। কোথাও কোথাও ছায়া সুনিবিড় গ্রাম। ফলবৃক্ষে ভরা। সব মিলিয়ে যেন ইউরোপিয় নিসর্গবিদের পরিকল্পিত। তবে, অন্তিমে এই সৌন্দর্য ক্লান্তিকর ঠেকেছে বুখাননের। তিনি নিসর্গে খুঁজছিলেন বৈচিত্র্য।

সুন্দর এক পুকুর পাড়ে মি. জ্যাকসনের বাড়ি। এ অঞ্চল তুলা চাষের উপযুক্ত তবে ইজারা মূল্য বেশি। ধানি জমির ইজারা প্রতি কানিতে চাররুপি, তুলার জন্য সাত রুপি। তুলার বীজ কিছু আসতো পাটনা, বাকিটা চট্টগ্রাম থেকে।

জ্যাকসনের বাড়ি থেকে দু'মাইল দূরে থাকতেন ফিনল্যান্ডের এক ভদ্রলোক মি. মার্কুয়ার্ড। বহুকাল ধরে তিনি সেখানে বসবাস করছেন এবং একজন বাগানবিদ। মার্কুয়ার্ড থেকে তৎকালীন কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কে বেশকিছু তথ্য আহরণ

করেন বুখানন। জমিদার কোম্পানি থেকে এক কানি ধানক্ষেত ইজারা নেয় ৪ রুপিতে। উঁচু জমির জন্য সাত-আট রুপি। এবং সুপারি বাগানের জন্য ভালো জমি ১৮ রুপি। জমিদার রায়তকে তা একই দামে ইজারা দেয়। লাভটা করে জমির মাপের হেরফের থেকে। কোম্পানি জমি মাপে যে নল দিয়ে তা লম্বায় ৩০ হাত। আর জমিদার যে মাপে রায়তকে জমি দেয় তার নল ২০ হাত। জমিদার ছাড়াও আছে তাদের পাইক-পেয়াদার উসুল।

মার্কুয়ার্ড তাঁকে আরো জানিয়েছিলেন, তুলাচাষ আর লাভজনক নয়। তবে, সুপারি চাষ বাড়ছে। বার্মা থেকে বণিকরা আসছে সুপারি কিনতে, সে সুপারি তারা রফতানি করছে সুমাত্রায়। মার্কুয়ার্ড আপেল বাগান করতে চেয়েছিলেন, পারেননি; তবে, কিছু কফি গাছ লাগিয়েছিলেন। বেঁচেছিলো সেগুলো।

৫ মার্চ, জ্যাকসনের বাসা থেকে বুখানন রওয়ানা হন ২২ মাইল দূরে মিস্টার হ্যারিসের বাড়ির উদ্দেশ্যে। সাতঘণ্টা পর পৌঁছলেন সেখানে। বুখাননের মতে, বাংলায় তিনি যত ঘরবাড়ি দেখেছেন তার মধ্যে ভুলয়ার বাড়িঘরগুলো সবচেয়ে সুন্দর। বাড়িঘরগুলো জমিদারদের। মনে হয়, বুখানন জমিদার বলতে ইজারাদার, পত্তনিদার, তালুকদার, প্রভৃতিকেও বুঝিয়েছেন। এখানে দু'টি লবণ তৈরির কেন্দ্র দেখেছেন তিনি। একটি মেন্দি, অপরটি শান্তাশীলায়। বুখানন লবণ প্রস্তুত প্রণালী বিশদ ভাবে বর্ণনা করেছেন।

পরদিন বিকেলে নোয়াখালি ছেড়ে রওয়ানা হন ১৬ মাইল দূরে যোগদিয়ায়। রাত কাটালেন যোগদিয়ায়। এখানেও লবণ প্রস্তুত করা হয়। মহিষের সংখ্যা বেশ তবে সেগুলো দিয়ে হালচাষ করা হয়। বাঘের উৎপাতও আছে। দেশীয় গরু থেকে মহিষ (স্ত্রী) দুধ দেয় বেশি। তা দিয়ে তৈরি হয় ঘি। এখানে উল্লেখ করতে পারি, যোগদিয়া অনেক আগে থেকেই বস্ত্র কারখানা ও আড়ং হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলো। ছোট ফেনী নদীর মুখে ছিলো যোগদিয়া। পরে তা সমুদ্র গ্রাস করে নেয়। যোগদিয়ার কাছেই বামনি দ্বীপ। ১৭৫৬ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সেখানে বস্ত্র কারখানা করেছিলো।

৭ মার্চ সকালে তিনি রওয়ানা হলেন ১০ মাইল দূরে মি. ব্রাউনের সঙ্গে দেখা করার জন্য। এখানের নিসর্গও একই রকম। তবে, শন চাষের দিকে ঝোঁক আছে। তেলের জন্য তা চাষ করা হয়। এখানেও বস্ত্র উৎপাদনের কারখানা আছে। সুতা আমদানি করা হয় সন্দ্বীপ থেকে। বুখানন উল্লেখ করেছেন, আমিরগঞ্জ পরে পরিণত হয়েছিলো ঘাসে ঢাকা এক চরে। লবণ চাষিরা প্রতি কানি তিনচার রুপিতে কিনে লবণ চাষ করতেন।

আমিরগঞ্জে তখন, জানিয়েছেন বুখানন, বিশটির বেশি ঘর ছিলো না। তবে, বাজারটি লোকের ভিড়ে একাকার। আড্ডা দিয়ে লোকজন বাজারে সময় কাটায়।

ক'ঘর পতিতাও আছে। বিবাহিত, অবিবাহিত সবাই তাদের সঙ্গে সময় কাটায় এবং তা কেউ অস্বাভাবিক মনে করে না।

আমিরগঞ্জ এখন আমাদের কাছে পরিচিত ফেনী নামে।

৮ মার্চ, খুব ভোরে রওয়ানা হলেন বুখানন। ছোট ও বড় ফেনী নদী পেরিয়ে পৌঁছলেন এক বাংলোয়। নদী দু'টি পেরিয়েছিলেন নৌকায়। সকাল দশটায় পৌঁছলেন একটা বাংলোয়। এটি নির্মাণ করেছিলেন বুখাননের ভাষায়, 'চট্টগ্রামের ভদ্রলোকেরা' অর্থাৎ সিভিলিয়ানরা। ফেনী-চট্টগ্রাম আসার পথে পর্যটকরা এটি ব্যবহার করতেন।

বিকেল তিনটায় ফেনীর বাংলো ছেড়ে রওয়ানা হলেন। ১২ মাইল পর পৌঁছলেন মিরখাসরাই। এখানেও বাংলোর মতন থাকার একটা জায়গা আছে। মিরখাসরাই হচ্ছে, মিরেরসরাই। চাটগাঁ পৌঁছতে হয় যে জেলা দিয়ে তার নাম আওরঙ্গাবাদ। এর অন্য প্রান্তে আরেকটা 'পরগনা' [জেলা] যা হাউলদহ বা হাবিলদার নদীর তীরে। হাবিলদার বা হাউলদহ নদী হচ্ছে হালদা নদী।

ফেনী ও মীরেরসরাইর মধ্যের এলাকাটি সমতলভূমি, প্রশস্থ। চাষবাসের অনুকূল, লোকসংখ্যার ঘনত্বও বেশি। এ অঞ্চলে, বছরে দু'বার ধান হয় তবে শ্রমিকদের বেতন ত্রিপুরার তুলনায় কম। চালের দাম কম। শীতের শস্য হচ্ছে মরিচ।

সমুদ্র ও হালদা নদীর সাথে পাহাড়ের সারি, উঁচু নয় তবে প্রশস্থ। তিনটি ভিন্ন জাতি বাস করে সেখানে বাঙালিরা যাদের বলে জুমা, ত্রিপরা, চাকমা। এরা ঝুম চাষ করে। জমিতে বোনে আদা, ধান, অন্যান্য গাছ। ওগুলির বিনিময়ে সমতল বা বাঙালিদের কাছ থেকে নেয় লবণ, মাছ, মাটির পাত্র, লোহার তৈরি জিনিসপত্র। এরা যে খুব দরিদ্র বা নিঃস্ব তা নয়। কিন্তু বেশিদিন এক জায়গায় থাকে না কুকিদের ভয়ে। কুকিরা অনেক দূর থাকলেও এদের ওপর সুযোগ পেলেই চড়াও হয়।

বুখানন পরের দিন ভোরে আশপাশের এলাকাটা ঘুরে দেখলেন। জমি ভালো হলে জমিদারকে কানি বাবদ ৩ থেকে ৬ রুপি খাজনা দিতে হয়। এখানকার ঘরবাড়িগুলো ত্রিপুরার লোকদের তুলনায় ভালো। প্রত্যেক বাড়ির সামনে উঠান, সেই উঠান 'মাদুরের বেড়া' দিয়ে ঘেরা। তবে হাটবাজারে অবস্থা খারাপ এবং বুখাননের মতে, "ইংল্যান্ডের শ্রমিকদের তুলনায় এরা মানবেতর জীবনযাপন করে।" এখানে আখের চাষটা হয় ভালো। আখের চারার ফাঁকে ফাঁকে 'ক্যাস্টর অয়েল'-এর (রেড়ির তেল) জন্য চারা পোতে। এই তেল বাতি জ্বালাবার ও ঔষধের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ঐদিন বিকেলে তিনি মীরেরসরাই ছেড়ে রওয়ানা হন, সন্ধ্যানাগাদ পৌঁছেন

সীতাকুন্ড নামে এক গ্রামে। এখানেও আশ্রয় নিলেন বাংলোয়।

১১ মার্চ, ভোরে বুখানন বেড়িয়ে পড়লেন সীতাকুণ্ডের পাহাড় দেখার জন্য। পাহাড়ের পাদদেশ থেকে তার বাড়িটা আধা মাইল দূরে। পাহাড়ে যাওয়ার পথে ইটের তৈরি একটা ঘর দেখে তিনি বিস্মিত হলেন কারণ এর আগে ইটের তৈরি ঘর খুব একটা চোখে পড়েনি। পাকদণ্ডি বেয়ে পৌঁছলেন সীতাকুণ্ড পাহাড়ের শীর্ষে। সেখান থেকে এক আগ্নেয় পাহাড়ে। পাহাড়ের গায়ে তিন-চারটি গর্ত। এইসব পাহাড়ের মুখ বা গর্ত থেকে অবিরাম অগ্ন্যুৎপাত হচ্ছে। বুখাননের মতে, এই আগুনের উৎস হাইড্রোজেন।

আগ্নেয় পাহাড়ের ওপর দিয়ে কিছুদূর এগোবার পর বুখানন দেখলেন কয়েকজন হিন্দু পুরোহিতের ঘরবাড়ি। তারা বহুদিন ধরে বসবাস করছেন এখানে। ভক্তদের দেয়া দান-দক্ষিণায় ভালোই চলছে তাদের। তারা মূলত শিবলিঙ্গের পূজারি। পুরোহিতরাও বুখাননকে জানাতে পারে নি, মন্দিরগুলো কারা কখন তৈরি করেছে। ঘুরতে ঘুরতে বুখানন উঠে গেলেন একেবারে শীর্ষে। সেখানেও একটি মন্দির। বুখাননের ভাষায়, "এখানে একটা অশ্লীল দেবতার ক্ষুদ্র মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের লাগোয়া কিছু কুঁড়েঘর। যারা দূর-দূরান্ত থেকে দেবতা দর্শনে আসে, তাদের জন্যে। এই মন্দির বেশ ভালোভাবে তৈরি করা হয়েছিলো। যদিও এখন সে অবস্থা নেই। মন্দিরের পাথরগুলোর মধ্যে গর্ত দেখা যাচ্ছে, এসব গর্তে লোহার গাঁথুনি ছিলো এবং সেই গাঁথুনি দিয়ে মন্দির বানানো হয়েছিলো। মন্দিরের উপরিভাগ সাম্প্রতিক কালের নির্মাণ, ইট-পলেস্তরা সে সাক্ষ্য দিচ্ছে। এখানে বোধহয় ইতিপূর্বে গৌতমবুদ্ধের পূজা হতো।"

বুখানন যে মন্দিরটির কথা বলছেন তা বিখ্যাত সীতাকুণ্ড পাহাড়ের চন্দ্রনাথ মন্দির। এটি কোনোভাবেই বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে জড়িত নয়। চন্দ্রনাথ বিখ্যাত হিন্দু তীর্থস্থান। কিন্তু বুখাননের তা জানা ছিলো না দেখে অবাক লাগছে। চন্দ্রনাথ মন্দির কবে নির্মিত হয়েছিলো তা জানা না গেলেও অনুমান করে নিতে পারি অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে হয়ত তা নির্মিত হয়েছিলো। পুজো হয়ত আরো আগে থেকে হতো।

সন্ধ্যাবেলা বুখানন গেলেন সীতাকুণ্ড থেকে ছয়মাইল দূরে বাঁশবাড়িয়া। সেখানে থাকেন আরেক ইংরেজ মি. ম্যাডার্ন। দলের কোনো কোনো জায়গায় সুপারির চাষ করা হয়েছে। আর সীতাকুণ্ডের পাহাড় শ্রেণী গিয়ে ঠেকেছে চট্টগ্রামে।

১২ মার্চ ম্যাডার্নের সঙ্গে বুখানন রওয়ানা হলেন বাড়বকুণ্ড দেখার জন্য। দু'মাইল পথ হেটে পৌঁছে গেলেন এক সরু উপত্যকায়। মাটি চাষের উপযোগী নয়। উপত্যকার শেষ মাথায় একটি আগ্নেয় জলাধার, হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান। শিব এবং অন্যান্য দেবতার পুজোর জন্য আছে কিছু ছোট ছোট মন্দির। আছেন

কিছু পুরোহিত যাদের বার্ষিক আয় প্রায় পাঁচ হাজার রুপি।

বুখানন তীর্থস্থানের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে দেখা যায়, ধর্ম নিয়ে ব্যবসা এখানে নতুন কিছু নয়। একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন তিনি। কিছুদিন আগে কিছু দূরে আরেকটি প্রস্রবনের পাশে লালঝাণ্ডা উড়িয়ে একজন ঘোষণা করে, নতুন প্রস্রবণটি আরো পবিত্র এবং স্বপ্নাদিষ্ট। ফলে, ভক্তরা নতুন প্রস্রবনে যেতে শুরু করে। রোজগার কমে যায় পুরনো প্রস্রবনের পুরোহিতদের। এ নিয়ে ঝগড়া ফ্যাসাদ কম হয়নি। পরে, পুরনো পুরোহিতরা নতুন প্রস্রবনের মালিককে জিজ্ঞেস করে, তার প্রস্রবনের গুণাগুণ কী বা অলৌকিকত্ব কী। নতুন জন কিছু প্রমাণে ব্যর্থ হয়। পুরনো পুরোহিতদের পসার আবার জমে ওঠে।

জলধারের ওপর সিমেন্টের একটি কক্ষ। তা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে হয়। জলাধার ঘিরে একটি প্ল্যাটফর্ম।

বিকেল প্রায় চারটের দিকে বুখানন রওয়ানা হলেন চট্টগ্রামের দিকে। পথে পথে দেখলেন তামাকের চাষ। সুপারির চাষও করা হয়েছে। জাফরাবাদ পৌঁছলেন রাত ন'টায়।

১৩ থেকে ২০ মার্চ, এক সপ্তাহ ছিলেন তিনি চট্টগ্রামে। দক্ষিণে যাত্রা শুরুর আগে প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য এ সময়টুকু দরকার ছিলো তাঁর।

২১ মার্চ সূর্য ওঠার আগে রওয়ানা হলেন পাথরঘাটার দিকে। পাথরঘাটা ব্যবহৃত হয় কর্ণফুলীর ফেরিঘাট হিসেবে। নদী এখানে মাইলখানেক চওড়া। জীর্ণশীর্ণ দুটো নৌকা করে সঙ্গীসাথীসহ আধঘণ্টা পর পৌঁছলেন অন্য পারে। সেখানে আরেকটি নৌক রাখা ছিলো তাঁর জন্য। এসব নৌকা কর্ণফুলী ও শঙ্খ নদীর মাঝে চলাচল করে। দু'দিকে সমতল ভূমি। শীতের কোনো ফসল বা শস্য দেখা গেল না। তবে, কলাইর ডাল ক্ষেতে ক্ষেতে দেখা গেল পেকেছে। তবে গরু, ছাগল, মহিষ অর্থাৎ গবাদিপশু চোখে পড়েছে প্রচুর।

ঘণ্টা তিনেক পর পৌঁছলেন তিনি চাঁদপুর। এই চাঁদপুর আমাদের সেই বিখ্যাত চাঁদপুর নয়। এ চাঁদপুর বাঁশখালির চাঁদপুর। শঙ্খ নদী এখানে প্রায় পৌনে এক মাইল চওড়া । কিন্তু বিকেল তিনটে পর্যন্ত না পেলেন তিনি কোনো খাবার দাবার না কোনো নৌকা। বুখানন মনে করেন, তিনি যেহেতু পদস্থ কেউ নন বা তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় উপকরণ না থাকায় তাঁর এই হেনস্থা। তবে, অজান্তে তিনি একটি মন্তব্য করেছেন যা মনে করতে পারি যথার্থ কারণ। তাঁর মতে, "এই অসহযোগ এবং এই সংকটের একাধিক কারণ আছে। প্রধান কারণ বোধহয় এই যে, বাঙালিরা– অন্যসব বিজিত জাতির মতো- বিজয়ী শক্তির লোকদের সাহায্য করতে চায় না।" তবে বুখানন মনে করেন, ইংরেজরা বাঙালির সঙ্গে যেরকম আচরণ করেছে এর আগে কোনো বিজয়ী শক্তি তা করেনি।

শঙ্খ নদীর তীর থেকে দক্ষিণে চলে গেছে পাহাড়ের সারি, বুখানন যাকে উল্লেখ করেছেন ছরামুনি পাহাড় হিসেবে। পাহাড়গুলো নিচু, বালুতে ভর্তি। তবে ভেতরে ভেতরে উর্বর উপত্যকা রয়েছে। এবং মাটি খারাপ নয় তবে মশলার উপযুক্ত নয়। বুখানন জেনেছেন, দক্ষিণে যেসব উপত্যকা আছে সেগুলোতে চাষবাস নেই। অনাবাদী, বন্য পশুতে ভর্তি যার মধ্যে আছে বাঘ, হাতি, শূয়োর আর হরিণ। পাহাড়ে আছে সজারুর আধিক্য। স্থানীয় যারা বসবাস করছে এখানে তারা চাষ করছে বেগুন, তামাক আর মরিচ এবং সুপারি। এই ছরামুনির নাম এখন বাঁশখালি।

দূরে উঁচু পাহাড়ের সারি যা বাঁশখালিতো বটেই চট্টগ্রাম থেকেও দেখা যায়। উত্তর-দক্ষিণে তা বিস্তৃত। লোকে বলে মুইন। তাদের মতে, এই পাহাড় পুবে মিশেছে গিয়ে মগ সর্দার কাউং-লা-পরুর দেশের সঙ্গে। মুইন বা ময়ন চাকমা শব্দ যার অর্থ পাহাড়। আর কাউং-হলা হপুরু হচ্ছে মার্মা সর্দার।

নদী তীরে এখানে প্রচুর কচুর চাষ হয়। এটি দুলাহাজারা পরগনা পর্যন্ত বিস্তৃত। বুখানন রাত যাপন করলেন যেখানে তার পাশে জেলেপাড়া। ত্রিশ-চল্লিশটি জেলে পরিবার বসবাস করছে সেখানে। বুখাননের পর্যবেক্ষণ অনুসারে, জেলেরা (বাংলার) যাযাবরের মতো। অন্তত দু'তিন বছর পরপর তারা জায়গা বদল করে ফলে, জমিদারকে কম পয়সা খাজনা দিতে হয়। তবে, বুখানন মুগ্ধ হয়েছেন জেলে রমণীদের দেখে। তাঁর ভাষায়– "জেলে রমণীরা বেশ স্পষ্টভাষী এবং দেখতে সুন্দর, তবে তারা বেশ মুখরা। পড়শির সঙ্গে ঝগড়ার কোনো ক্লান্তি নেই। তবে এ শ্রেণীর ইউরোপিয় মেয়েরা যে রকম কলহপ্রিয় ও বিদ্বেষভাবাপূর্ণ হয়, এরা সেরকম নয়। এদের গালাগাল বা ঝগড়াঝাটি ওরকম মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছায় না।"

পরদিন সকালে তিনি রওয়ানা হলেন কোম্পানির হাটের দিকে, চৌদ্দ মাইল দূরে। যাবার পথটি চমৎকার মিরেরসরাইর মতো। জল সরবরাহ প্রচুর, আছে পাহাড়ি ঝর্ণা। খাল কেটে ঝর্ণার পানি ব্যবহৃত হচ্ছে সেচে। ফলে, এখানকার কৃষকরা বছরে তিনটি ফসলের চাষ করে। শঙ্খ নদীর পাড়ে কিছু গম চাষও তাঁর নজরে পড়েছে। তবে, বুখানন যখন ঐ এলাকা পেরুচ্ছেন তখন কৃষকরা ব্যস্ত আখ চাষে। চাঁদপুর থেকে খানিকটা দূরে নীলচাষের 'ধ্বংসাবশেষ' নজরে পড়লো। বার্ড নামে এক ইংরেজ ছোট এক পাহাড়ে নীলচাষ শুরু করেছিলেন কিন্তু সুবিধা করতে পারেননি।

সকাল দশটার দিকে তিনি কোম্পানির হাটে পৌঁছলেন। বুখানন লিখেছেন কোম্পানির হাট শহরও নয়, গ্রামও নয়। একটুকরো জায়গা, চারদিক ঘেরা তেঁতুল ও ভাঁটুই গাছ দিয়ে। বাজার বসে গাছের ছায়ায়। বুখানন যেদিন পৌঁছলেন

কোম্পানির হাটে সেদিন ছিলো হাটের দিন। লোকজনের জমায়েত ছিলো আর স্বাভাবিকভাবে আগ্রহের কেন্দ্র ছিলেন বুখানন। কয়েকজন এসে বুখাননকে নালিশ জানালেন এ বলে যে, তাঁর লোকজন স্থানীয় মানুষজনের কিছু জিনিসপত্র ছিনতাই করেছে, প্রতারণাও করেছে। বুখানন তাদের বক্তব্য অবিশ্বাস করেননি।

কোম্পানির হাটে এক মুসলমান বুখাননকে জানালেন, দুলু নালা পেরুবার পর তিনি পৌঁছবেন একটা গ্রামে যার নাম কাউং-লা পুরার হাট। তার পুবে আছে একটি খাল, নাম সুলুক। সুলুকের পুবে একটি গ্রামে বাস করেন কাউং-লা পরুর রাজা। তার অধীনে বসবাস করেন একটি উপজাতি যাদের স্থানীয় ভাষায় বলা হয় 'জুম্মা'। কোম্পানির হাট থেকে এর দূরত্ব ছয়ঘণ্টা। এই উপজাতি রোসাং থেকে এসেছে বছর চল্লিশেক আগে। চাকমারা কিন্তু এর থেকে ভিন্ন। চাকমারা অধীন তাউব-বুকা রাজার। সেখান থেকে সুলুক পর্যন্ত পথটি ভালো। তউব-বুকা হচ্ছেন তারার খান।

মুসলমান সেই লোকটি বুখাননকে আরো কিছু খবরাখবর দিলেন। বুখানন যাকে বলেছিলেন 'মুইন পর্বত শ্রেণী', লোকটি জানালো তা হচ্ছে 'মনি মুরা'। এর অন্যপ্রান্তে নাফ নদী। নাফ নদী আর কাউং-লা-পরুর দেশের (এলাকার) মাঝে বসবাস করে দুটি উপজাতি। একটি সেতিনযা, অপরটি ভুঁইয়া রাজার অধীন। তাদের আছে ক্রীতদাস যারা আউকথের মতো। 'বনযোগী' নামে আরেকটি স্বাধীন উপজাতি বসবাস করে কোম্পানির হাটের পুবে। সামলে রাজার অধীন তারা। উল্লেখ্য নিম্ন মিয়ানমারের অধিবাসীরা পরিচিত ছিলো আউকথ নামে।

২৩ মার্চ ভোরবেলা আবার কোম্পানি হাট ছেড়ে রওয়ানা হলেন দক্ষিণে। ডানে, অল্পদূরে চরমুনি পাহাড়। যেতে যেতে চোখে পড়ে সবুজ, সম্পন্ন লোকালয়। পাহাড় থেকে ছোট ছোট ছড়া এসে পড়ছে দুলু খালে, দুলু খাল আবার মিশেছে শঙ্খ নদীতে। একটি ছোট পাহাড়ে উঠলেন বুখানন। তাঁর মতে, পাহাড়গুলো বালুকাময়, নিচু, ঝোপঝাড়ে ভরা। সরু উপত্যকায় হচ্ছে ধান চাষ। নেটিভরা থাকে পাহাড় চূড়োয়।

এসব পেরিয়ে এসে পৌঁছলেন তিনি চুনুতী নামে এক এলাকায়, তাঁর ভাষায় 'অপূর্ব সুন্দর উপত্যকা'। চুনুতী সাতকানিয়ার একটি ইউনিয়ন। বুখাননের লোকজন গ্রামবাসীর খোঁজে গিয়ে দেখল, গ্রামবাসীরা পালিয়েছে। তবে, গ্রামের মোড়লটি [শিকদার] ভালো; তিনি জানালেন, আসলে ইউরোপিয়ান বা পর্যটক বা বুখাননের ভয়ে তারা পালায়নি, তারা পালিয়েছে জমিদারের ভয়ে। পর্যটকদের সহায়তা করে তারা যে দু'চার পয়সা পায় জমিদার তা কেড়ে নেয় আর এরা আবার জমিদারের ওপর নির্ভরশীল। মোড়ল, বুখাননকে অনুরোধ করে বললেন, বিষয়টা যেন তিনি জানান বিচারককে। তবে, বুখানন যে সব বিশ্বাস করলেন তা নয়। তাঁর

ধারণা, এই অঞ্চলের লোকেরা ভীষণ মামলাবাজ, এখানের আদালতে বিচারের অপেক্ষায় থাকা মামলার সংখ্যা বিশ হাজারের বেশি।

২৪ মার্চ, সূর্য ওঠার আগেই তিনি রওয়ানা হলেন, পৌঁছলেন হার্বাং উপত্যকায়। এর মাটি বুখাননের কাছে শুধু ভালো নয়, মশলা চাষের জন্যও উপযুক্ত মনে হয়েছে। হার্বাংয়ের পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে বাস করে রোমাং, রোহান, রোসাঙ্গ, রেন্‌গ ইত্যাদি। বাঙালিরা তাদের এ নামেই ডাকে। আসলে এরা আরাকানের অধিবাসী, বর্মিরা ঐ এলাকা দখল করলে তারা এখানে চলে আসে। এদের আমরা এখন জানি রাখাইন হিসেবে। রাখইনরা জমিদারকে কিছু নজরানা দিয়ে তিনবছরের জন্য একেকটি জায়গা পরিষ্কার করে বসবাস করে।

২৫ মার্চও খুব ভোরে বুখানন রওয়ানা হলেন। বারাতোলার বনের ভিতর দিয়ে এগুলেন। পৌঁছলেন টোটোকালি নামে এক জায়গায়। সেখানে স্পার্কস নামে এক ইংরেজ চাষাবাস করছেন। সমুদ্রের পাশের এলাকায় তার অনেক জমিজমা আছে। তারপর পৌঁছলেন তাঁর ভাষায় মাসুরি/ মোরি নামে 'অসাধারণ' এক নদী তীরে। পাহাড় থেকে সাগর পর্যন্ত এলাকাটি মীরো সরাইয়ের মতো সমতল। আর গিরিখাতগুলো শোভিত দীর্ঘ গর্জন বৃক্ষে। টোটোকালি হচ্ছে টোটোখালি। মোরি বা মাসুরি হচ্ছে মাতামুহুরী।

মাতামুহুরীর তীর থেকে তিন মাইল দূরে নদীর লাগোয়া নিচু নিচু পাহাড়, বা পাশে সমতল ভূমি। বুখাননের কাছে মনে হয়েছে মশলা চাষের জন্য এর চেয়ে উপযুক্ত জায়গা আর তিনি দেখেননি।

বুখাননের গন্তব্য ছিলো দো দোস্তিখানের হাট। এটি এখন চকরিয়া থানার সদর। এখানে এক চমৎকার আম বাগানে এসে তাবু ফেললেন তিনি। নদীটি ভারি সুন্দর। তিন আরাকানির সঙ্গে কথা বললেন বুখানন। তাদের মূল বক্তব্য, বাঙালিরা নানাভাবে তাদের জ্বালাচ্ছে।

এখানে বুখানন উপজাতি এবং বাঙালিদের সঙ্গে কথা বলে উপজাতিদের সম্পর্কে ধারণা পেয়েছিলেন, ঐ অঞ্চলটিতে বাস করে 'মরু' বা মুরং, রাখাইন এবং ত্রিপুরা। বাঙালিরা তাদের কাছে লোহার ও মাটির তৈরি জিনিসপত্র ও গুড় বিক্রি করে। পাহাড়িরা কাপড়, বাঁশ, শন, হাতির দাঁত আনে বিক্রির জন্য। পাহাড়িরা প্রায়ই বসতি বদল করে। তবে, বুখাননের মনে হয়েছে, পাহাড়ি বা উপজাতিরা সব সময় সন্ত্রস্থ, একটা ভয় যেন তাদের তাড়া করে। এর কারণ, তিনি জানেন না বলে জানিয়েছেন। তবে, বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয় বাঙালি-পাহাড়ি টেনশন চলছে আজ প্রায় ৩০০ বছর এখন যা জনসংখ্যা স্ফীতীর কারণে তীব্র পর্যায়ে পৌঁছেছে। বাঙালিরা অধিকাংশ সময়ই পাহাড়িদের শোষণ করেছে বা বিপদে ফেলেছে। এ কারণে সমতল ভূমি বা বাঙালিদের সম্পর্কে একটি ভয় মজ্জাগত হয়ে গেছে।

সূর্য ওঠার খানিকপর বুখানন দোদোস্তিখানেরহাট থেকে ফের চলা শুরু করলেন। মাইল দু'য়েক হাটার পর পাহাড় আর বন পেলেন। সেই বন-পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে চলা শুরু করলেন তবে, পথটা ছিলো সমতল যা সাধারণত হয় না। মাটিতে বালুর পরিমাণ বেশি। বুখাননের মনে হয়েছে, এখানে সবজির চাষ সম্ভব।

বুখানন জানিয়েছেন, এ অঞ্চলে গর্জন তেল উৎপন্ন হয় প্রচুর। চার ধরনের গর্জনের সন্ধান পেয়েছেন বুখানন। তবে, সব গর্জন থেকেই তেল হয় না। এই তেল তৈরির বিশেষ পদ্ধতি আছে। মাটি থেকে দু'চার ফুট ওপরে কাণ্ডের মধ্যে ইংরেজি 'ভি' আকৃতির একটা খাঁজ তৈরি করতে হয় যার গভীরতা হবে ফুটখানেকের মতো। এই খাঁজে আগুন জ্বালাতে হবে। আগুন জ্বলবে এক থেকে দু'ঘণ্টা। তারপর তা নিভে যাবে। এরপর সমস্ত রাত ধরে সেখানে গর্জনের তেল জমতে থাকবে। প্রতিবার আধা গ্যালনের মতো তেল পাওয়া যায় এবং মাসে চার থেকে পাঁচবার তেল উৎপাদন করা যায়। বুখানন দুঃখ পেয়েছেন এভাবে একটি গাছকে দহন করা হয় বলে এবং তিনি জানতে পারেননি এই তেল কী কারণে ব্যবহৃত হয় কারণ তার মতে, "লোভীরা সত্য আড়াল করতে ওস্তাদ।" মধু ও গর্জন তেল সংগ্রহকারি ও মোমপ্রস্তুতকারিরা এক বিশেষ সম্প্রদায় এবং এরা মুসলমান। এ পেশাগত কাজ করার জন্য জমিদারকে তারা কর দেয়। তবে যে বিষয়টি তাঁকে অবাক করেছে তা হলো, এখানে বনের গাছ সম্পদরূপে বিবেচিত হয় না। যে কেউ বনে ঢুকে ইচ্ছে মতো নিজ প্রয়োজনে গাছ কেটে নিয়ে যেতে পারে।

এ পথে তিনি পার হয়েছেন দুলা হাজারি ও পউলি-বিল। শেষোক্তটি পরিচিত পাগলির বিল নামে। এখানে তিনি অনেক মানুষের বসবাস দেখেছেন। এর মধ্যে বিশটি পরিবার শুধু গর্জন তেল সংগ্রহ করে। নতুন যেসব জমি আবাদ হয়েছে তারা হিন্দু। কোর্ট কাচারিতে কাজ করে। বুখাননের কাছে হিন্দুদের সংযত ও নমনীয় মনে হয়েছে। তবে, সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর মুসলমানদের প্রভাব বেশি।

২৭ মার্চ, ফের সূর্য ওঠার আগে রওয়ানা হলেন বুখানন। তিনঘণ্টা পর পৌঁছলেন এডগং নামে এক উপত্যকায়। বুখাননের চোখে সুন্দর ঠেকেছিলো এডগং। চারদিকে আবাদের চিহ্ন, ধান ক্ষেত, পাহাড়ি রাস্তা গাছগাছালিতে ভরা। অনেক গিরিখাত আছে খুব গভীর, চারদিকে গর্জনের সারি। বুখাননের মতে, বালুকাময় মাটিতে গর্জন গাছ বাড়ে বেশি। এডগং-এ কোনো গ্রাম নেই। এটি ছোটখাটো হাট মাত্র। ২৭ মার্চ ছিলো হাটবার, নারী-পুরুষের সমাগম হাটে আর সবাই কৌতুহল নিয়ে দেখছিলো বুখাননকে। এডগং এখন আমাদের কাছে পরিচিত ঈদগাও নামে। কক্সবাজারের একটি ইউনিয়ন এটি।

পরের দিন আবার ভোরে বেরিয়ে পড়লেন। ঈদগাওর পাশ দিয়ে বয়ে গেছে

া নামেরই একটি নদী। সেটি পেরিয়ে পশ্চিমে সমতলভূমিতে এসে নামলেন। সমুদ্রের দিককার ছোট ছোট টিলা, উপত্যকা ইসলামাবাদের কথা মনে করিয়ে দেয়। মহেশখালির কথাও উল্লেখ করেছেন বুখানন। সেটিকে তার সমৃদ্ধ মনে হয়েছে। তবে, পাহাড়ের মাঝে সমতল অঞ্চল ইসলামাদের চেয়েও উজ্জ্বল ও উর্বর। নেটিভরা এগুলোকে ঝিল বলে। বুখাননের মনে হয়েছে চাষাবাদের জন্য অঞ্চলটি খুব উপযুক্ত নয়। বুখানন এখানে একটি কৌতূহলোদ্দীপক মন্তব্য করেছেন। তার মতে, বাঙালিরা শীতকালটা খুব একটা পছন্দ করে না, কারণ বস্ত্রাভাব। উল্লেখ্য মহেশখালিকে বুখানন মাছখালি হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন সেখানে অনেক ঝিল যা অনাবাদী তবে সুন্দরবনের গাছগাছালিতে ভরা।

আটটার দিকে বুখানন পৌঁছলেন ক্রজকূল যা এখন পরিচিত খুরুশখালি নামে। জোয়ারিয়া নদীর মুখে তা অবস্থিত। এখানে আছে রাখাইনের বিরাট গ্রাম। মাছ ধরে, মাদুর, নৌকা তৈরি করে, বাঁশ কেটে বা নিছক শ্রমিক বা মাঝি-মাল্লা হিসেবে এরা কাজ করে। ধান চাষ এরা করে না। কোনোরকম করও কাউকে দেয় না। নদীর মুখ পার হয়ে বুখানন পৌঁছলেন আরেকটি রাখাইন গ্রামে, তারপর সমুদ্র সৈকত হয়ে বাগখালী বা রামু নদীর উত্তরে পৌঁছলেন। সেখানে তাঁর এক বন্ধুর বাংলো ছিলো সেখানে উঠলেন। সারাদিন ব্যস্ত ছিলেন নৌকার সন্ধানে যাতে করে খাবারদাবার নিয়ে তিনি নাফ নদীতে পৌঁছতে পারবেন এবং আবার ফিরতে পারবেন উতেহঘাট হয়ে।

বুখানন উল্লিখিত বাগখালি নদী হচ্ছে বাঘখালি নদী। এর পাশের গ্রামই পরে পরিচিত হয়ে ওঠে কক্সবাজার নামে। আর উতেহঘাট হচ্ছে বর্তমানের উখিয়া।

ক্রুজকূলে আছে এক বর্মী ব্যবসায়ী। তার মতে, নাফ নদীর শেষে উতেহঘাট। আরাকান অংশে আছে এর একটি শাখা যার নাম কাইয়াউং। এর তীরে বাস করে থেক-রা। পুবে আরেকটি নদী আছে যার নাম ও রীত টাউং। এসব নদীর তীরে বাস করে বিভিন্ন উপজাতি, যেমন- শান-দু, লাইংগা, সে-উ, কু-য়ে, মে-ঈ, কিয়ো ও সেইয়ুন।

ঝড়োহাওয়া, তুফান প্রভৃতির কারণে বুখানন নাফ নদীতে যাওয়ার মতো কোনো নৌকা পেলেন না। ফলে, ৩০ মার্চ, ভোরে রওয়ানা হলেন তিনি মহেশখালির দিকে। তীরে রাখাইন পল্লীতে নামলেন। সেখানে মি. হ্যারিসের স্মৃতিতে একটি স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে। মি. হ্যারিস ছিলেন চট্টগ্রামের প্রাক্তন বাণিজ্য কর্তা। ফকিরহাট নামে একটা জায়গায় বুখানন তাবু গাড়লেন। গরুবাত্তা নামে একটি খাঁড়ির তীরে ফকিরহাট। গরুবাত্তা হচ্ছে গোরকহাটা খাল। সেখানেও নাফ নদীতে যাওয়ার জন্য তিনি নৌকা খুঁজলেন, পেলেন না। ঠিক করলেন রাজু নদী ও রত্নাপালং নদী দিয়ে রামু যাবেন। খাবারদাবার নিয়ে রত্নাপালং নদী দিয়ে

অনুচরদের আগে পাঠিয়ে দিলেন।

বিকেল বেলা বুখানন গেলেন বড় মহেশখালি। এখানকার মাটি তার কাছে চমৎকার মনে হয়েছে। বছরে দু'বার ধান হয়। বুখাননের মতে, মশলা চাষের জন্যও জমিটা মন্দ নয়।

পরদিন ভোরে গেলেন পাহাড়ের দক্ষিণে, দুম সাগাকা নামক একটা জায়গায় যেখানে বৃষ্টির জল জমে না। এখানে পানের চাষ হচ্ছে। বুখাননের মতে, এখানেও মশলার চাষ হতে পারে। সেখান থেকে গেলেন সুয়াবুক। এই উপত্যকায় আছে বেশ কিছু ঝর্ণা। উপত্যকার নিচে দেখলেন এক আম বাগান। এর মালিক ছিলেন ওয়ালেস নামে এক ইংরেজ। এখানে এক জায়গায় ঝুম চাষও দেখলেন।

মহেশখালিতে আছে প্রচুর গর্জন গাছ। গর্জন তেল আসে এখান থেকে। এক মণ তেলের জন্য জমিদার শ্রমিককে দেয় দুই রুপি [মহেশখালিতে এখনও আছে বেশকিছু গর্জন গাছ]। দক্ষিণের শেষ প্রান্তে আদিনাথের মন্দিরও দেখতে গিয়েছিলেন বুখানন। আশপাশের পাহাড়ের ঢাল, বুখাননের মনে হয়েছে, মশলা চাষের উপযোগী।

১ এপ্রিল গেলেন দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে। নিসর্গ একই রকম। পানিছরা পেরিয়ে পৌঁছলেন ওয়ানকে। সেখানে কুতুবদিয়ার মানুষজন আবাদের উপযোগী জমি তৈরি করছে। ওয়ানকের পেছনে পাহাড়ে মগরা ঝুম চাষ করে। খুবই দরিদ্র তারা।

বুখানন এখানে লবণ তৈরির এক উপায়ের উল্লেখ করেছেন। গরুবাত্তা ফাঁড়ির পানি লবণাক্ত। সেখানে কিছু গরিব লবণ উৎপাদন করেছিলো। সমুদ্রের পানিতে তারা খড় ভিজিয়ে নেয়। তারপর তা পুড়িয়ে লবণ তৈরি করে।

২ এপ্রিল ছোট মহেশখালি দেখলেন। সামগ্রিকভাবে বুখাননের মহেশখালিকে চমৎকার এক সম্ভাবনাময় দ্বীপ মনে হয়েছে। এর বালুময় স্থানে নারকেল চাষ হয়। এক একর জমিতে নারকেল চাষের বাৎসরিক ভাড়া ৫০ পাউণ্ডের মতো। তাঁর মতে, বোম্বাই থেকে নারকেল চাষে দক্ষ লোক এনে এখানে নারকেল চাষ করা যায়। মশলার জন্যও কিছু কিছু জায়গা উপযুক্ত। এখানে মূল্যবান গাছও জন্মে, যেমন- গর্জন, জারুল, তিতুয়া, তিলসার [তেলসুর?], সুন্দর, অরসল, গুতগুতিয়া, সুন্দুল ও রুনা। সুন্দরবনে রুনা পরিচিত পরশুর নামে। রাখাইন গ্রামগুলোতে প্রচুর শুটকি তৈরি হয় যা হিন্দু-মুসলমান সবারই প্রিয়। এই শুটকি আবার রফতানি করা হয় চাটগাঁ, ঢাকা, কলকাতা ও অন্যান্য অঞ্চলে। রাখাইনরা হাঙ্গরের শুটকিও তৈরি করে।

৩ এপ্রিল অনেক চেষ্টাচরিত্র করে বুখানন পৌঁছলেন রামু নদীর মোহনায়। বিকেলে দক্ষিণে পাহাড় ও নদীর মাঝ দিয়ে দীর্ঘ বালুময় এক সৈকত পেরিয়ে

পৌঁছলেন এক গ্রামে যেখানে বাঙালি ও রাখাইনরা বাস করে। রাখাইনরা বাঁশ ও বেত কেটে বিক্রি করে। রাখাইনরা তাঁকে জানিয়েছিলেন এখানে তারা ৬০ থেকে ৮০ মিটার লম্বা পর্যন্ত বেত দেখেছে। বুখানন ৪০ মিটার পর্যন্ত লম্বা বেত দেখেছেন। রাখাইনরা শক্ত কাঠ দিয়ে নৌকা বানায় যা গভীর সমুদ্রেও নিরাপদ। বাঙালিদের অধিকাংশ মুসলমান, তারা চাষাবাদ করে। পুরো উপত্যকায় প্রায় ১৫ হাজার রাখাইন বসবাস করে। রামু নদীর মোহনায় তাদের জন্য কিছু জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। এতে বাঙালিরা অসন্তুষ্ট।

দক্ষিণের এলাকাটা পাহাড়ি এবং দুর্গম। রামু নদীতে পাওয়া যায় প্রচুর ঝিনুক– সাদা, বড় এবং নরম। নাফ নদীতেও ঝিনুক পাওয়া যায় তবে তা ভোঁতা এবং শক্ত। তবে এ নদীর ঝিনুকে মৃদু একটা গন্ধ পাওয়া যায়।

৪ থেকে ১৪ এপ্রিল বুখানন ঘুরে বেড়িয়েছেন রামু ও বর্মী সীমান্তের বিভিন্ন অঞ্চল। এখানে অনেক রাখাইন বসবাস করে। এর সঙ্গে আছে কিছু উপজাতি। এর মধ্যে মুরংদের সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন। মুরংরা নিজেদের বলে মা-রো-মা। সবকিছু তারা খায়। ঈশ্বর উপাসনা করে না। লিখতে বা পাড়তে জানে না। রাখাউন উপভাষায় তারা কথা বলে তবে তা পরিষ্কার নয়। উদাহরণস্বরূপ তাদের কিছু শব্দ ও এর অর্থ উদ্ধৃত করেছেন–

বাংলা	ম-রো-সা	বাংলা	ম-রো-সা
সূর্য	তা-নী	জন্তু	কো-পৌ
চাঁদ	পু-লো	পাখী	টু-ওয়াও
তারকা	কেরে	মাছ	ডেম
পৃথিবী	করাউঙ	ভালো	য়উঙ
পানি	তু-ঈ	খারাপ	য়উঙ-দুয়ে
আগুন	মাই	মহৎ	এ-য়ুকু
পাথর	টো-হোয়া	ক্ষুদ্র	এ-টসি-টসা
বাতাস	রিলী	লম্বা	আ-করাঙ
মানুষ	ম-রু	ছোটো	আ-টাউঙ
মেয়ে	মী-সার	এক	লউ
শিশু	না-সা	দুই	প্রে
মস্তক	লৌ	তিন	সোউম
মুখ	নর	চার	তা-লী
বাহু	বউঙ	পাঁচ	তাঙগা
পা	সেই-পম	ছয়	তা-রউক
পাদদেশ	কু-কুউম	সাত	রা-নীট

হাত	রো-কুম	আট	রী-এট
নয়	তা-কু	দশ	হা-মুট
খাওয়া	তসা	আহার	কাম
হাঁটা	মা-নো-বো	নিদ্রা	ইপ
বসা	তসুম	বালু	রৌ
হত্যা	তয়েপ	হ্যাঁ	না-যা
না	না-দয়	এখানে	ওয়াঙ
সেখানে	পাই-কৌ	উপরে	ও-রো-কো
নিচে	করঙ		

চকরিয়া হয়ে বুখানন পৌঁছেন মাতামুহুরির উত্তরে মানিকপুরে। সেখানেও কিছু উপজাতি যুবক দেখা করে তাঁর সঙ্গে। নিজেদের তারা পরিচয় দেয় কিয়াং-সা বলে। এদের আরেক শাখা আছে যাদের তিনি মরুং বলে উল্লেখ করেছেন। এরা পিছন দিকে চুল বাধে ফিতে দিয়ে। চুল বাধা দেখে মরুং থেকে মুরুংদের আলাদা করা যায়। তিনি বাংলা, কিয়াং সা ও মরু-সা (মরু)দের কিছু শব্দ উদ্ধৃত করেছেন–

বাংলা	কিয়াং-সা	মরু-সা
সূর্য	লী	সাত
চাঁদ	ল	ল-মা
তারা	কিরা	করে
পৃথিবী	ম-রী	করাউঙ
অগ্নি	মী	মাই
প্রস্তর	কিঅউক	মাই-হুয়া
বায়ু	লী	লী
বৃষ্টি	মো	মো-ওহায়াং
মানুষ	লো	ম-রু
নারী	মেম-মা	মো-সীওয়া
শিশু	লো-সী	মো-রু-শা
মাথা	গাউঙ	লো
বাহু	লে-মাউঙ	বাউঙ
মুখ	কো-নাউঙ	নর
হাত	লে-ওয়া	রু-পা
পা	কীরি-ঈ	কালাউঙ

পাদদেশ	পো-ওয়াঁ	কো-পো
পাখি	হনগেক	ওয়া-উক
মৎস	নাগা	ডাম
উত্তম	কাউঙ	ইয়াউং
খারাপ	মা-কাউং	ইয়াউং-দা
মহৎ	কীরি	ইয়ুং-মা
ক্ষুদ্র	শেই	সাম-থচা
লম্বা	এ-কীরি	কালাং-মা
ছোটো	এ-টো	এ-টং-শা
এক	টেই	লাক
দুই	হনে	প্রে
তিন	সোম	সুম
চার	লে	তা-লী
পাঁচ	নাগা	তান্‌গা
ছয়	করু	তা-রু
সাত	কো-নী	রা-নীট
দশ	তাসে	হাও
আহার	তাস'	তাস'
পান	মোক	কাম
নিদ্রা	ইট	ইম-মোয়
হাটা	হালে	তাসাম-সা
বসা	তেইন	তাসাম
দাঁড়ানো	তা	রো
হত্যা	কয়-মে	তো-তে-মোয়
হ্যাঁ	হোয়-উ	না
না	মা-হো-পো	পো-দা-পো
এখানে	হীআ	ওয়ে
সেখানে	আ-উই-মা	ও-রো
আট	শেয়	রেয়াট
নয়	কো	তা-কো
উপরে	গাউং-কা-মা	মো-কাউং
নিচে	আ-নী	য়ো-আ

মরুদের একটি ঝুম দেখার জন্য ১২ এপ্রিল রওয়ানা হন, সঙ্গে এক গাইড। বেশ খানিকটা হেটে তাদের এক গ্রামে পৌঁছলেন। দু'সারিতে ২০টির মতো বাড়ি। মাঝে দূরত্ব ১০ ফুট। সাধারণত উপজাতিদের ঘর যেমনভাবে তৈরি সে রকমই। সর্দার বা কিংদাই বলে যার সঙ্গে বুখাননের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছিলো তার ঘরেই বসলেন বুখানন। তবে, লোকটি বারবার অস্বীকার করে জানালো যে, সে কিংদাই নয়। বুখানন বুঝলেন, ভয়ের কারণে সে পরিচয় লুকোচ্ছে। ভাবছে যদি ঝামেলা হয়। সে সন্দেহেই জনা দশেক গাট্টাগোট্টা তরুণ কাছে ধারে অবস্থান করছিলো। লম্বা পাইপ টানছিলো। তার স্ত্রী অবশ্য বুখানন ও গাইডকে তামাক আর আগুন দিলেন। দূরে শিশু ও বৃদ্ধরা আসন পিড়ি করে বসেছিলো। দেখতে এরা ঠিক চীনাদের মতো।

মরুদের চুল ফিতে দিয়ে বাধা। কানে চওড়া ধাতব রিং। লুঙ্গির মতো কাপড় পরনে। মেয়েরা সুঠাম। চুল পেছনে বাধা। কিং-দাইয়ের স্ত্রীর কানে বড়সড় পেতলের রিং। গলায় লালপুতির মালা। হাতে একটা ধাতব শাদা পাতলা চুড়ি। পরনে একফুট দীর্ঘ এক টুকরো যা উরু ঢেকে রাখে। ওপরে লালবুটি দেয়া কাপড়।

মরুরা খায় শূয়র, মুরগি, ছাগল, সাপ, গিরগিটি– সব কিছুরই মজুদ তাদের আছে। তবে শূওর আর মুরগি প্রচুর। বাঘেরা মাঝে মাঝে এসে ছাগল নিয়ে যায়, জানালো তারা। বল্লম দিয়ে তারা বাঘ মারে। তবে, বাঘের মাংস তেমন খায় না। ঝুমে তামাক আর সবজি চাষ করে। এর বিনিময়ে জামা-কাপড় কেনে। 'আরক' বা মদ নিজেরা তৈরি করে নেয়। ঈশ্বরে তাদের বিশ্বাস নেই। মৃত্যুর পর শবদেহ তিনদিন ঘরে রাখে তারপর পুড়িয়ে ফেলে।

মরুদের মধ্যে যাদের খানিকটা টাকা-পয়সা আছে তারা দু'টি বিয়ে করতে পারে বা করে। তবে সাধারণত অধিকাংশ এক নারীতেই জীবন কাটায়। কোনো পুরুষ কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলে, মেয়ের বাবাকে কুঠার, তরবারি, ছুরি বা লোহার তৈরি কিছু উপহার দেয়। খুব ধনী হলে দেয় গাই গরু। প্রস্তাব গৃহীত হলে মা মেয়েকে বরের হাতে তুলে দেয়। বিয়ে উপলক্ষে নাচগান উৎসব ভোজ হয়। কেউ মারা গেলে তার সম্পত্তি সমানভাবে সন্তানদের মধ্যে বণ্টন করা হয়।

১৪ এপ্রিল খুব ভোরে বুখানন রওয়ানা হলেন হার্বাঙের দিকে। ২২ এপ্রিল চট্টগ্রাম পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত এক সপ্তাহ তিনি হার্বাঙ, সুনোট, সুলোক প্রভৃতি এলাকা ঘুরেছেন। তাঁর বিশেষ কৌতূহল ছিলো পাহাড়ি বা উপজাতিদের বিষয়ে। এ চলার পথে তিনি কয়েক জন কুকির সাক্ষাৎ পান। অন্যান্য উপজাতিদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে পারলেও এদের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান খুব একটা বেশি হয়নি। কারণ, অন্য ভাষা তাদের বোধগম্য নয়। ২৩ থেকে ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত তিনি

কাটালেন চট্টগ্রাম। তাঁর ইচ্ছে, কর্ণফুলী নদীতে ভ্রমণ।

২৬ এপ্রিল বেরুলেন নদী ভ্রমণে। ভোরবেলা পৌঁছলেন পাথরঘাটা। পাশে সমতল ভূমি খুবই সমৃদ্ধ। দূরে নিচু নিচু পাহাড়। দুপুরে পৌঁছলেন রাজাগঞ্জ পাহাড়ে। চারকোণা জায়গা, আছে ঘর-বাড়ি দোকানপাট। উল্টোদিক থেকে এসে ঢুকেছে একটি নদী, নাম ইছামতি। এই শাখা নদীতে ছোট, এমনকী নৌকার জন্যেও। তবে এটি দিয়ে ঘণ্টা ছয়েক চললে পৌঁছা যাবে চাকমাদের সর্দার তাউবুকার আবাসস্থলে। এখানে তিনি রাঙ্গুনিয়ার বিভিন্ন এলাকার খাজনা আদায়ের জন্য আসেন। রাঙ্গুনিয়া তাঁর সম্পত্তি কিন্তু দখলে নেই। বাঙালিরা দখল করে নিয়েছে। সরকারও ঐ দখলকে অবৈধ মনে করে কিন্তু অবৈধ দখলদার মুক্ত করেনি। বুখানন তাঁর মাঝিকে চট্টগ্রাম থেকে চাল নিয়ে নিতে বলেছিলেন কিন্তু সে তা নেয়নি। বলেছিলো রাজাগঞ্জ থেকে নিয়ে নেবে কিন্তু নেয়া গেল না। দোকানে চাল থাকা সত্ত্বেও দোকানিরা দোকানপাট বন্ধ করে দিলো এই ভয়ে যে লুটপাট হতে পারে। বুখাননের কথা তারা শোনেনি কিন্তু তার ভৃত্যদের কথা বিশ্বাস করে। এ সুযোগে ভৃত্যরা আবার দ্বিগুণ দাম দাবি করে বুখাননের কাছে এবং বুখানন তা দিতে বাধ্য হন।

এখানে বুখানন চাল পেয়েছিলেন কীনা তা স্পষ্ট করে বলেননি। ২৭ এপ্রিল তিনি লিখেছেন, ফকিরহাট যাচ্ছেন চাল সংগ্রহে। এর অর্থ হতে পারে, পর্যাপ্ত চাল তিনি পাননি। ইছামতির মুখে একটি বাজার ফকিরহাট। সকাল আটটায় রওয়ানা হয়ে আটঘণ্টা পর পৌঁছলেন ফকিরহাট। এই বাজার থেকে কয়েক মাইল দূরে আছে হিন্দুদের একটি পবিত্রস্থান সীতাকাঘাট। এটি পেরিয়ে নদীর দক্ষিণ তীরে পৌঁছলেন। সেখানে বসবাস করে চাকমারা। এখানে একটি চৌকি আছে সুতোর ওপর কর তোলার জন্য। এই তীরে চাকমারা যেখানে বসবাস করে তা বুখাননের কাছে খুব উর্বর বলে মনে হয়েছে। এখানে আখ ছাড়াও কফি, নীলের চাষ হয়। অধিবাসীদের মূল্যবান গাছ-গাছড়া লাগাবার প্রবণতা আছে। জায়গাটা তাঁর কাছে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কোনো দ্বীপের মতো মনে হয়েছে।

সেখান থেকে বুখানন পৌঁছলেন কাপ্তাই। সীতাঘাট (সীতাকাঘাট) থেকে এর দূরত্ব মাইল দশেকের মতো। সন্ধ্যেয় তিনি কাপ্তাইয়ে চাকমাদের একটি গ্রামে গেলেন। গ্রামটির নাম রহিত-ঘিয়াঙ-বাক। সেটি এখনও আছে। পরিচিত রাইনখিয়ন বাক নামে। কাপ্তাই উপজেলার রাইংখিয়ং নদীর মুখে। সেই গ্রামে তখন মাত্র বারোটি ঘর। আবাদ হয়েছে বছর কয়েক। সেখানে এক লোকের সঙ্গে তার আলাপ হলো। সে বুখাননকে জানালো, আদতে তারাও রোসাঙ থেকে এসেছে। তাদের মাতৃভাষা হারিয়ে ফেলেছে বাংলাটাও রপ্ত হয়নি। তাদের সে জন্য সবাই ডাকে 'দোভাষী' হিসেবে। নিজেদের তারা পরিচয় দেয় 'সাকসাই' হিসেবে।

বাঙালিরা খুব সম্ভব এটিকেই বিকৃত করে বলে 'সাগমা' যা হয়ে গেছে 'চাকমা'। এরা যে ভাষায় কথা বলছে তা বর্মি ভাষা। ধর্মে তারা বৌদ্ধ বটে হিন্দুদের দেখাদেখি তাদের দেবদেবীদেরও ভক্তিশ্রদ্ধা করে। সীতাঘাটের চাকমারা পর্বতপুত্র বা টাউং-মাঙের পূজো করে। ছোয়াছুরি বাছবিচার তাদের মধ্যে নেই তবে, ভিন্ন জাতির কাউকে তারা বিয়ে করে না। তাদের মধ্যে যারা উচ্চশ্রেণীর তারা দাস রাখে। এই দাসরা প্রধানত ত্রিপুরা। চাকমারা চাকমাদের দাস হিসেবে রাখতে পারে না।

কাপ্তাই খালের মোহনা থেকে খরস্রোতা নদী বেয়ে চলতে লাগলেন বুখানন। তীর ঘেঁষে ছোট ছোট পাহাড়, মাটি উর্বর,ঝুম চাষ করা হয়েছে। বুখানন পৌঁছলেন আমরারাই ঙ খিয়াঙ নামে ছোট এক নদীতে। এটির নাম 'কাইং-ঘিয়াং'। এখান থেকে ছয়ঘণ্টা দূরে থাকেন প্রভাবশালী এক চাকমা আলীশান লস্কর। এখন বান্দারবানে এক ইউনিয়ন আছে যার নাম আলী খিয়ং। এ নামের উৎস হতে পারে আলীশান। আশপাশের গ্রামগুলো তার অধীনে। এখান থেকে বনযোগীদের এলাকা দুই দিনের পথ। যাক, একে একে ফেলিয়া ছরা, তরা ছরা পেরিয়ে এলেন। এখানে নদীতীর সমতল, মাটি চমৎকার। ধান চাষ করলে ভালো ধান হবে বলে মনে করেন বুখানন। তবে, গাছপালা কম, লম্বা লম্বা ঘাস। বাঙালিরা এগুলো কেটে চাটগাঁয় পাঠায়। ঘরের ছাউনি হিসেবে তা ব্যবহৃত হয়। মনে হয়, বুখানন উল্লিখিত লম্বা লম্বা ঘাস বোধহয় ছন।

দুপুর আড়াইটার দিকে কবুরিয়া ছরা পেরুলেন। এর উৎস একটি হ্রদ। সারা বছর এতে পানিতে থাকে। তারপর দোলিয়া ছরা। সেখান থেকে ৩/৪ মাইল দূরে মানিকছরা। উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে এসেছে এই শাখাস্রোত। এর মুখে বিচ্ছিন্ন এক পাহাড় সেখানে থাকেন, বুখাননের ভাষায় "চাকমা-বাঙালিদের অতিপ্রিয় রাজদিওয়ান বা মন্ত্রী : কোনাকা।" এখানে চাকমা ও বাঙালিদের দ্বন্দ্বের সময়, স্থানীয় গরিবরা (চাকমা না বাঙালি তা উল্লেখ করেননি বুখানন) শত্রুদের প্রতিরোধে নদীতে বাঁধ দিতে চেয়েছিলো। সম্ভব হয়নি। বরং, সামরিক বাহিনী এসে জায়গাটি দখল করে নেয়।

এর ডানদিকে আছে আরেকটি ছরা। এটি এবং এর উৎস ঝিলকে বলা হয় মগবন। সারা বছর এতে পানি থাকে। মগবন ও কবুরিয়া ছরায় প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। মগরা মাছ ধরায় উৎসাহী নয়। বাঙালি ছেলেরাই তা ধরে আশপাশের গ্রামে বিক্রি করে। এসব জায়গা আগে অস্বাস্থ্যকর ছিলো। এখন খানিকটা পরিষ্কার করার ফলে এলাকাগুলো স্বাস্থ্যকর হয়ে উঠছে। বুখাননের মতে, এই এলাকা শস্য ও মাছ উৎপাদনের জন্য সম্ভাবনাময় এবং সুতো (তুলা), কফি, নীল, চিনি (আখ) মশলার চাষ করা যেতে পারে। আফশোষ করে তিনি লিখেছেন, পৃথিবীর যে

কোনো উর্বর এলাকার সঙ্গে এ এলাকা তুলনীয় অথচ অযত্ন অবহেলায় তা পড়ে আছে।

মগবন ও মানিক ছরার মাঝে, মাইল দশেক দূরে পাহাড়ে সারি, নাম কুলিয়া। এটি রাঙ্গামাটির বালুখালি ইউনিয়নের বর্তমান কন্দিয়া। সন্ধ্যের দিকে বুখানন নামলেন তাউবুকার আবাসস্থলে। বাঙালিরা একে বলে রাজবাড়ি। রাঙামাটি শাখা নদীর মোনো থেকে খানিকটা দূরে নদীর দক্ষিণে এই রাজবাড়ি। এখান থেকে পাহাড়ের মাঝামাঝি এলাকায় বাস করে কুংখীরা। এরা রাজার করদ প্রজা। তাউবুকা (বা রাজা) যে রাজ বাড়িতে থাকেন তা সামান্য কয়েকটি কুঁড়ে ঘরের সমষ্টি। বাংলো ঘরের মতো। রাজার ভাইকে বলা হয় যাউবুকা। রাজা বাড়িতে না থাকায় বুখানন তার 'দুর্গে' ঢুকতে পারেননি তবে তাঁর আগমনে মহিলাদের মধ্যে হুলুস্থুল পড়ে যায়। তাদের পোষা শুয়োরগুলিও চিৎকার শুরু করে। আশপাশে চাষবাসের চিহ্ন নেই। তবে, বিঘাখানেক জমিতে লাঙল দেয়া হয়েছে।

পোল-ভো-গি নামে এক রাজ পুরোহিত বুখাননকে জানালেন, তারা আরাকানি ভাষা ভুলে গেছেন। যদিও তিনি আরাকানের ধর্মে বিশ্বাসী। তাদের এখানে মোইশাং ও সামোনা নামে দু ধরনের পুরোহিত আছে। মোইশাংদের মর্যাদা একটু বেশি, বাঙালিরা তাদের বলে 'রাওলিম'। বুখানন শুনেছেন, বনযোগীদের চাকমারা বলে টাই-কউপা। তার প্রজার সংখ্যা নাকি অনেক। এরা দু'টি উপজাতিতে বিভক্ত বনযোগী ও লুসাই। প্রজাদের প্রত্যেক পরিবার সর্দারকে বার্ষিক খাজনা হিসেবে দেয় এক বস্তা চাল ও এক খণ্ড সুতি কাপড়।

রাঙামাটি নদীটিকে রেনেলের বেশ চওড়া মনে হয়েছে, প্রায় মাইলখানেক। ২৯ এপ্রিল। সকাল আটটার দিকে তিনি রওয়ানা হন রাঙামাটি বাজার ছেড়ে। তিনি শুনেছেন টাই-কউপের বাড়ি থেকে মাইলখানেক দূরে বাস করেন একসময়ের প্রভাবশালী চাকমা ব্যক্তির রোনোকোর দুই সন্তান। বছর দুই তিনেক আগে তিনি অপমানিত (কার দ্বারা, কেন তা লেখেননি) হয়ে শঙ্খ নদী ছেড়ে চলে যান ছুয়াছরি। সেখানে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। তার দুই ছেলে ছুন্দুনকা ও রাতুনকা সেখানেই বসবাস করেন। পিতার কারণে সেখানে তাদের বেশ নাম ডাক।

৯টার দিকে বুখানন পৌঁছেন শিঙ্গী নদীর উল্টোদিকে। রেনেল তাঁর মানচিত্রে এটিকে শিংপ্রি বলে উল্লেখ করেছেন। এর ৪৫ মিনিট পর পৌঁছেন তিনি আরেকটি শাখা নদী কুলিয়ায়। পাশে পাহাড়। তারপরও পাহাড়। ছোট ছোট গ্রাম, শাখা নদী পেরিয়ে দুপুরের পর পৌঁছেন কাথালুং নদীতে। সেখানে স্রোতের কারণে যাত্রা স্থগিত করতে হয়। আশপাশের গ্রাম থেকে লোকজন ছুটে আসে বুখাননকে

দেখতে। হয়ত, এর আগে কোনো ইংরেজ তাদের নজরে পড়েনি। এখানকার মাটি তাঁর কাছে অসাধারণ মনে হয়েছে কিন্তু চাষবাস নেই, কিছু পানের বরজ ছাড়া। বুখানন মন্তব্য করেছেন, জ্যামাইকার মতো পরিকল্পিতভাবে এখানে কৃষির উদ্যোগ নিলে হাজার হাজার লোকের জীবন সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে।

সকালে ফের রওয়ানা হলেন, যাত্রাপথ তেমন মসৃণ ছিলো না। নদী হয়ে আসছিলো সংকীর্ণ। আরো পরে দেখা গেল, নদীর গভীরতা গেছে কমে। অপরাহ্নে শুরু হলো ঝড় বৃষ্টি। এর মধ্যে বুখানন পেরিয়েছেন প্রায় সাড়ে ৪ মাইলের মতো। সন্ধ্যের দিকে নৌকা ভিড়ালেন তীরে। অস্থায়ী এক খামার গড়ে তুলেছে ১৪/১৫ জন চাকমা। তারা এসেছে রাজবাড়ি থেকে। ঝুম চাষের শস্য কাটা পর্যন্ত তারা থাকবে এখানে।

পরদিন দুপুরে আবার রওয়ানা হলেন বুখানন। সন্ধ্যে সাতটার দিকে পড়লেন স্রোতোপ্রবাহে। দশটার দিকে পৌঁছলেন বরকল পাহাড়ের পাদদেশে। নৌকা ছাড়া এখানে চলাচল অসম্ভব। এখানেও চাষিরা খামার বানিয়েছে বরকলের পশ্চিমাঞ্চলে চাষাবাদের জন্য। পাহাড়ে পাহাড়ে হাঁটলেন ঘণ্টাখানেক। এখানে জলপ্রপাত আছে বেশ কিছু। নদী মাছে পরিপূর্ণ।

২ মে পর্যন্ত বরকলের আশেপাশে ঘুরলেন। আলাপ হলো চাকমাদের সঙ্গে। জানলেন কিছু তথ্য যার সত্যাসত্য নির্ধারণ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। যেমন, কাথালুং যাওয়ার পথে ১৫টি শাখা নদী পড়বে। কান্দাছরার ওপরে কোনো চাকমা বাস করে না, তবে সেখানে আছে রাজার দু'জন দেওয়ান। দেওয়ানের নামেই গ্রামের নাম হয়। এক দেওয়ান মারা গেলে সে গ্রামের নাম বিলুপ্ত হয়। নতুন দেওয়ানের নামে নাম হয় গ্রামের।

এ অঞ্চলের চাকমারা শুনেছে যে ফেনী, শিঙ্গী এবং কাথালুং নদীর উৎস কান্দুলের কাছে এক পাহাড়। সেই পাহাড়গুলিতে বাস করে লাংমাংরা। তাদের সঙ্গে সব সময় সংঘর্ষ চলছে কুংখীদের। লাংমাংরা নাকি চাকমাদের মতে, বানরের মতো, ঘুমোয় গাছে, ভাত খায় না। কাংশুন নামক শস্যই তাদের খাবার।

বুখানন পৌঁছেছিলেন বসন্ত নদীর মোহনার একটি গ্রামে। বেশ বড়সড় গ্রাম। দিওয়ান আছেন একজন যিনি গ্রামের কর্তা। চাকমারা স্থায়ীভাবে সেখানে বসবাস করে। এখানকার জমি খুব ভালো। বুখাননের মতে, জ্যামাইকার মতো চাষবাস করলে এখানে প্রাচুর্য আসবে। গ্রামবাসীরা আদা, পান, আখ, নীল, তামাক ও মরিচের চাষ করেছে। চাকমাদের ঘরবাড়িগুলি বাঙালিদের থেকে বুখাননের কাছে মজবুত মনে হয়েছে। তবে, তিনি চাকমাদের মধ্যে বৃদ্ধ দেখেননি। তাঁর মতে, পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় লোকজন বোধহয় এখানে বেশিদিন বাঁচে না।

৩ মে সকালে রওয়ানা হন রাঙ্গামাটির দিকে। জোয়ার ঠেলে দু'ঘণ্টার মধ্যেই

পৌঁছে যান রাঙ্গামাটির মুখে। তাঁর মনে হয়েছে মগবন ঝিল ও শাখানদী হলো কর্ণফুলীর প্রাচীন হ্রদের অংশ। এর পাশে রয়েছে লম্বা লম্বা ঘাসে ঢাকা বড় বড় মাঠ। চাটগাঁয় যা দিয়ে ঘরের ছাউনি দেয়া হয়। বাঙালিরা তাউবুকার থেকে নির্দিষ্ট ভাড়া দিয়ে জমি লিজ নেয়।

দুপুরের আগে তিনি পৌঁছেন কবুরিয়া ছরার কাছে। আশপাশের গ্রামগুলো ঘুরে ঝুমচাষ দেখেন। একজন চাকমা যতটা ইচ্ছা জমি চাষ করতে পারে। কারণ রাজা মাথাপিছু ট্যাক্স পান মাত্র। যেমন নিঃসন্তান দম্পতিরা বছরে দেয় ৫ থেকে ১৫ রুপি।

৪ মে রাজাগঞ্জ রওয়ানা হন বুখানন। যে নদী নিয়ে এগুচ্ছিলেন তার পাশের পাহাড়গুলো রাঙ্গামাটি থেকে মাইল দুয়েক দূরে। মাঝে মাঝে এতে আছে উপত্যকা। ঝুম চাষ করা হয়। বুখাননের মনে হয়েছে মশলা চাষের জন্য এ জায়গা অতি উত্তম। রাত ৯টার দিকে তিনি পৌঁছলেন পাথরঘাটা আর তখনিই শুরু হলো বজ্রবিজলিসহ বৃষ্টি।

৫ থেকে ৮ মে বুখানন ছিলেন চট্টগ্রাম শহরে। শহর মানে তার কাছে মনে হয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কিছু গ্রাম। তবে, শহরটি জনবহুল বাঁশ ও ছন দিয়ে ঘরবাড়িগুলি তৈরি এবং তা এতো নিখুঁত যে, এমনটি আর কোথাও চোখে পড়েনি বুখাননের। এখানে জিনিসপত্র খুব শস্তা। শহরের আছে সংকীর্ণ কিছু উপত্যকা। সীতাকুণ্ড থেকে বা কর্ণফুলী পর্যন্ত আছে পাহাড়গুলি। আরাকান রাজ্য থেকে পর্তুগীজরা এলাকাটি লাভ করেছিলো। এখনও শহরে তাদের সংখ্যা অনেক। একটি গির্জাও আছে তাদের। তবে, তাদের সামগ্রিক অবস্থা খুব একটা ভালো নয়।

বুখাননের ধারণা, আগে এখানে ত্রিপুরারা বাস করতো। মুসলমানদের আক্রমণে তারা শহর ছেড়ে চলে যায়। আরাকানিরা অবশ্য আবার এলাকাটি পুনর্দখল করে নেয়। চট্টগ্রামে কিছু ইংরেজও আছেন, তারা হলেন ম্যাজিস্ট্রেট, কালেকটর, এজেন্ট প্রভৃতি। কোম্পানির একটি ক্ষুদ্র সামরিক বাহিনীও আছে।

ইংরেজদের বাড়িগুলি পাহাড়ের ওপরে। পাহাড়ের একদিকে নদী, উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণে পাহাড়ের সারি। মাঝে উর্বর সমতল ভূমি। বুখাননের মনে হয়েছে, এখানে দারুচিনি চাষ চমৎকার হবে। তবে, ঘূর্ণিঝড়ের উৎপাত এখানে বেশি তাই দারুচিনি চাষ কতটা সফল হবে তা সন্দেহজনক।

কাগজপত্রে চাটগাঁর নাম ইসলামাবাদ। তবে, বুখানন স্থানীয়দের মুখে এই নামটি শোনেননি। নদীর পোতাশ্রয় খুব চমৎকার। বড় বড় জাহাজও এখানে নির্মিত হয়। বিদেশী বাণিজ্যের জন্য চট্টগ্রাম খুবই ভালো জায়গা।

৯ মে তিনি দেখতে গেলেন কদমরসুল। পথিমধ্যে জাফরাবাদও ঘুরে এলেন। জায়গাটা তার ভালো লেগেছে; চমৎকার একটি বাড়িও আছে এখানে।

ইংরেজ অভিজাতের মতো চারদিকে জায়গা নিয়ে তৈরি। আশপাশে আছে ছোট ছোট উপত্যকা। মশলা চাষের জন্য চট্টগ্রামের আশপাশের জায়গা উপযোগী মনে হয়েছে বুখাননের।

কদমরসুল, বুখাননের মতে এক কিংবদন্তী যা মূঢ়রা বিশ্বাস করে। তাঁর মতে রাখাইনদের দেখাদেখি মুসলমানরা এই মিথ তৈরি করেছে। আগে রাখাইনরা এখানে গৌতমবুদ্ধের পদচ্ছাপে পূজো দিতো। তাদের বিশ্বাস, পাথরে পায়ের ছাপটি গৌতম বুদ্ধের।

পরদিন, কদমরসুল থেকে বাঁশবেড়িয়া হয়ে যান সীতাকুণ্ড। ১১ মে সকালে মীরেরসরাই। পরদিন জোরারগঞ্জ পেরিয়ে রওয়ানা হন লক্ষ্মীপুরের দিকে। পথে পার হন 'হিন্দুলছরা' ও 'রক্তছরা'। এ দু'টি ফেনী নদীর শাখা। নদী পেরিয়ে অগ্রসর হন তিনি দাখিনসেকের দিকে। এখানে লোকজন তাঁকে জানায়, কন্দুলের পার্শ্ববর্তী এলাকার মালিক ত্রিপুরার রাজা। ফেনীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে চার ধরনের লোক বাস করে– ত্রিপুরা, রোয়াং, কুংখী (কুকি) ও আলীনগর। আলীনগরের লোকজন বসবাস করে চট্টগ্রামের উত্তরে এবং তারা কর দেয় কোম্পানির কালেকটরকে। বর্তমানে চট্টগ্রামের করেরহাট থানার অন্তর্গত আলীনগর।

১৩ মে তিনি মাহমুদ আলী নামে এক বাজারে গেলেন। বুখাননের মতে, ইংরেজ রাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে মাহমুদ আলী ছিলো একজন প্রতাপশালী দস্যু। 'পাপ' স্খালনের জন্য সে এখানে দীঘি খনন করে, মসজিদ তৈরি করে।

এই বাজারের পর তিনি মীরেরসরাই থেকে কুমিল্লা যাওয়ার একটি নতুন রাস্তা পেলেন। সেখানে তিনি মুহুরী নদী পেরোন। মুহুরীর তীরে তৈরি হয় লবণ।

পরদিন খুব ভোরে বুখানন রওয়ানা হন চৌদাগাঁও দেখার জন্য। চৌদাগাঁও বর্তমানে পরিচিত চৌদ্দগ্রাম নামে। আগের রাতে খুব বৃষ্টি হয়েছিলো। ফলে, পানি জমে ছিলো অনেকখানে। এখানে পুকুর প্রসঙ্গে বুখানন খানিকটা আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, এখানকার মানুষজন নিজের নামে পুকুর খনন করতে ভালোবাসে। এবং পুকুর প্রয়োজনীয়ও কিন্তু, প্রায় ক্ষেত্রে পুকুর খনন সম্পন্ন করা যায় না। ফলে, তা নোংরা, দুর্গন্ধময় গর্তে পরিণত হয়। ঐ জায়গাটা আর পরে কোনো কাজে আসে না। বুখানন বলেছেন, পুকুরের সঙ্গে সঙ্গে সরাইখানা নির্মাণ প্রয়োজন। কারণ, সরাইখানার খুবই প্রয়োজন এখানে। তবে কন্দুল পাহাড় ও বড় রাস্তার মাঝে বড় একটি দিঘীর তিনি প্রশংসা করেছেন। এর নাম 'রাজা গোবিন্দমানিক্যের দিঘী।' এর উত্তর দিকে কুমিল্লা থেকে কন্দুল যাওয়ার পুরনো রাস্তা এখন যা পরিত্যক্ত। এখানকার পাহাড়গুলো পরীক্ষা করে বুখানন জানিয়েছেন এখানে মরিচ, ভুট্টা, সুতা (তুলা)সহ অনেকরকম শস্য উৎপাদন করা যেতে পারে। তবে তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন পাহাড়ি অঞ্চল পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য যাতে তা

গোচারণভূমি হয়ে উঠতে পারে। হিংস্র প্রাণীর আধিক্যও তা হলে কমে যাবে।

১৫ মে, সকালে তিনি রওয়ানা হলেন কুমিল্লার দিকে। যে পথ দিয়ে তিনি গেলেন তা লম্বা লম্বা ঘাস, আগাছায় পরিপূর্ণ। চাষবাসের অবস্থা খারাপ। এখানকার লোকেরা পরিশ্রম করে একটি শস্যই উৎপাদন করে। তা হলো, ধান। এ অঞ্চলে জনবসতি কম তবে বুনো শুয়োরের উৎপাত খুব বেশি। এত বেশি যে বসন্তে কোনো শস্য চাষ করা যায় না। বুনো হাতিও ছিলো যথেষ্ট। তবে, সেগুলি তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

কুমিল্লা থেকে পশ্চিমে ৫ মাইল যাবার পর বুখানন পৌঁছলেন যে এলাকায় তার নাম রেনেল লিখেছেন 'ললমি' যদিও স্থানীয়রা একে বলে ময়নামতি। ময়নামতি স্তূপের তিনি উল্লেখ করেছেন তবে, এর গুরুত্ব তিনি অনুধাবন করেননি। জনশ্রুতি যা ছিলো তাই তিনি লিখেছেন তবে, ইংরেজরা সেখানে একটি বাংলো করেছেন।

এসব অঞ্চল পরিদর্শন করে ২০ মে তিনি পৌঁছেন মহব্বতপুরে। পথে তার জ্বর হয়েছিলো। মহব্বতপুরে একটি খালি বাংলো পেয়ে সেখানে আশ্রয় নেন। মহব্বতপুর বর্তমান চাঁদপুরের হাজিগঞ্জে। পরদিন পৌঁছলেন পাতাহাটে।

বুখানন বাংলার মাঝিদের প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে, ইউরোপিয়ানরা দেখতে শুনতে বাঙালিদের থেকে বলিষ্ঠ ও ক্ষমতাবান মনে হয়। কিন্তু না খেয়ে না দেয়ে বিরতিহীনভাবে সকাল সাতটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত নৌকা চালাতে পারে বা পরিশ্রম করতে পারে একমাত্র বাংলার মাঝিরা। তাদের শারীরিক শক্তি বা ক্ষমতা অসাধারণ।

৩
রবারদিউর ময়মনসিংহ

ডায়মন্ড হারবার দিয়েই বাংলার কাহিনী শুরু করা যায়, জানিয়েছেন রবারদিউ। যে পাইলট কলকাতা থেকে জাহাজ নিয়ে আসেন ডায়মন্ড হারবারে, তাঁকে সবাই ছেকে ধরে কলকাতার খবরের জন্য। জাহাজের পার্সারের মনে হয় জন্মগত অধিকার, প্রথম যে নৌকাটি জাহাজের গায়ে ভেড়ে তাতে চেপে বসা। লন্ডন থেকে আনা ডেসপ্যাচ নিয়ে সে রওয়ানা হয় কলকাতার দিকে। যাত্রীরাও নিজেদের পছন্দমতো নৌকা বেছে নেয়, তারপর রওয়ানা হয় কলকাতার দিকে। দিন দুই লাগে কলকাতা পৌঁছতে। নদী তীরে আছে অবশ্য একটি বাড়ি, ইচ্ছে করলে কেউ সেখানেও রাত কাটাতে পারে। পথে যেতে গার্ডেন রিচ ছাড়া দেখার মতো কিছু নেই। এখানে ভদ্রলোকদের সব বাগানবাড়ি। রবারদিউ চমৎকৃত হয়েছিলেন গার্ডেন রিচের ঘন বৃক্ষরাজি দেখে। কলকাতার কাছাকাছি পৌঁছলেই দেখা যাবে তীরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে সরকার, বেয়ারা, খিদমতগার আরও অনেক 'লুটেরা', যারা তৈরি 'গ্রিফিন' বা নবাগতের অধীনে চাকরি নিতে। নবাগত বা গ্রিফিন বাংলার মাটিতে পা রাখেন, অবাক হয়ে দেখেন এদিক-সেদিক। একজন চাকরি প্রার্থী ছাতা মেলে ধরে তাঁর মাথার ওপর, পথ দেখিয়ে নেয় 'পাঞ্চ হাউসে'র দিকে। সরাইখানা বলা চলে এগুলোকে। গ্রিফিন কিন্তু গরমে এরই মধ্যে অস্বস্তি বোধ করছেন। তিনি যদি মধ্যাহ্নে সরাইখানা পৌঁছেন তাহলে অবাক হবেন চারদিকের নিস্তব্ধতায়। রাস্তাঘাটও তখন থাকে নির্জন। এ সময়টা নেটিভরা ব্যস্ত টিফিন নিয়ে। সরাইখানার মালিক তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবেন এবং হয়ত তিনিই হবেন প্রথম স্বজাতীয়, যাঁকে দেখে গ্রিফিন খানিকটা স্বস্তিবোধ করবেন।

এই হঠাৎ গরমে গ্রিফিনের গলা শুকিয়ে কাঠ। তেষ্টা মেটাতে তিনি আনারস বা অন্য কিছু খেতে চাইবেন। এর মধ্যে দেখা যাবে, নদী তীরে যাদের দেখেছিলেন তাদের অনেকে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর চেয়ারের পিছে। কৌতূহলী হয়ে চারদিক তিনি দেখেন, কিন্তু সবই অচেনা, নতুন, অবোধ্য। তাঁর ইচ্ছে হবে রাস্তায় হেঁটে

বেড়াতে। কিন্তু তিনি জানেন না, তিনি এই মধ্যাহ্নে রাস্তায় হাঁটতে বেরুলে সবাই তাঁকে অবাক হয়ে দেখবে। ওপরে তাকিয়ে দেখেন বড়সড় একটা ফ্রেম তাঁর মাথার ওপর একবার আসছে-যাচ্ছে, তাতে সৃষ্টি হচ্ছে কৃত্রিম বাতাসের। সরাইখানার মালিক জানাবেন, একে বলা হয় পাংখা। শুধু তাই নয়, আরও জানাবেন, মধ্যাহ্নে দ্রষ্টব্য না হয়ে অপেক্ষা করুন আগামীকাল পর্যন্ত। কৌতূহল আস্তে আস্তে মিটবে।

সূর্য ডোবার সময় হয়। গ্রিফিন লক্ষ্য করেন কলকাতা নড়েচড়ে উঠছে। ট্যাভার্নের জানালায় দাঁড়িয়ে তিনি দেখেন রাস্তায় নেমেছে চ্যারিয়ট, বাগি বা ল্যান্ডো, এক সময় দেখেন দুলকি চালে আগে-পিছে বেহারা নিয়ে পালকি যাচ্ছে, যেন কোনো নবাব। গ্রিফিন পরে জেনেছেন, এই নবাব কোম্পানির একজন সাধারণ রাইটার মাত্র। গরমের সময়, সন্ধ্যায়, ঘরের দরজা-জানালা সব খুলে দেয়া হয়। অন্ধকারে, আক্ষরিক অর্থে বাড়িগুলো আলোময় হয়ে ওঠে। মোমবাতি ব্যবহৃত হয় প্রচুর। জানালা, দরজা গলিয়ে মোমের আলো ছিটকে পড়ে রাস্তায়। সব মিলিয়ে আনন্দময় রহস্যঘন এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সেই পাঞ্চ হাউসে গ্রিফিন একা বসে আছেন। রাতের খাবারের সময় হয়ে এসেছে। খাবারের অর্ডার দেন তিনি, ভাবেন, দু'এক পদ খাবার আসবে। কিন্তু তারপর যে দৃশ্যের অবতারণা হয়, তার জন্য নিশ্চয় প্রস্তুত ছিলেন না গ্রিফিন। একজনের পর একজন ভৃত্য আসছে, কিন্তু কারও হাত খালি নয়। একজনের হাতে ভাত-তরকারি, আরেকজনের হাতে পোলাও-কাবাব, তৃতীয়জন তাঁর সামনে আরেক ধরনের খাবার রাখে– যা আগে তিনি কখনও দেখেননি। ইংরেজ খাবারও যে নেই তা নয়। গ্রিফিন দেখেন তার টেবিলে আছে সেদ্ধ করা নানা ধরনের সবজি, গরু, খাসি, মুরগির রোস্ট। হয়তো গ্রিফিন সবশেষে বেছে নেন স্বদেশী খাবার। ঠাণ্ডা পানি বা পানীয় পানের পর টেবিলে আনা হয় ফল। এর মধ্যে থাকতে পারে পেয়ারা, কলা, কমলা বা আনারস। লিচু, লকেট বা ওয়ামপি। [এই ফলটিকে বাংলায় কী বলা হয় তা জানতে পারিনি]।

এরপর শোবার পালা। ক্লান্ত, পরিতৃপ্ত গ্রিফিন তো শুয়ে পড়েন; কানে শোঁ শোঁ শব্দ শোনেন, কিন্তু কিসের শব্দ বুঝতে না বুঝতে ঘুমিয়ে পড়েন। এক সময় অস্বস্তিতে ঘুম ভাঙ্গে। মনে হয় সারা শরীরে জ্বালা, চুলকাচ্ছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গ্রিফিন ঘাবড়ে যান। এ কি! আয়নায় দেখা যাচ্ছে প্লাম পুড়িংয়ের মতো একটি মুখ, চারদিকে যেন ছোট ছোট লাল জাম বসিয়ে রাখা হয়েছে। মশার কামড়ে তার চেহারা বদল হয়ে গেছে। কামড়ের জায়গাগুলো চুলকালে আরো ক্ষতের সৃষ্টি হচ্ছে। দু'তিন দিন তাকে ঘরে বসে কাটাতে হবে। অনেকে এর জন্য অনেক ওষুধ বাতলাবে। কিন্তু লিখেছেন রবারদিউ, "সবচেয়ে ভালো চুপচাপ বসে থাকা। এই কামড়ের বিষ আপনাআপনিই সেরে যায়।" সরাইঅলা কিন্তু তাকে একটা মশারি দিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু তা সে করেনি। এতেই বোঝা যায়,

সরাইঅলার অতিথিপরায়ণতার রূপটি কেমন ছিলো। এরই মধ্যে গ্রিফিন খোঁজ খবর নেন। যাঁর জন্য চিঠি এনেছেন তাঁর ঠিকানার খোঁজ নেন। দর্জিকে খবর দেয়া হয় এখানে পরার উপযোগী পোশাক তৈরি করে দেয়ার জন্য। পোশাকের রং সাধারণত হয় সাদা। পোশাকের মধ্যে থাকে প্যান্টালুন, ওয়েস্টকোট ও একটি জ্যাকেট। এই জ্যাকেটকে হাতাঅলা ওয়েস্টকোটও বলা যেতে পারে। নানা রকমের কাপড় ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু সর্বোত্তম হলো আইরিশ লিনেন। সাদা নানকিন বা মাদ্রাজী লংক্লথও আরামদায়ক। শার্টের নিচে অনেক ভদ্রলোক অন্তর্বাসও ব্যবহার করেন, যাকে বলা হয় বানিয়ান। বানিয়ান বানান হয় পাতলা মসলিন দিয়ে। কলকাতার রীতি অনুযায়ী নৈশভোজে যেতে হলে কোট পরে যেতে হয়। তবে বাড়ি পৌঁছান মাত্রই গৃহকর্তা অনুরোধ জানাবেন কোট্ খুলে রাখতে।

সকালে নাশতার টেবিলে বসে গ্রিফিন হতচকিত হবেন। রুটি, মাখন, টোস্ট ছাড়াও দেখা যাবে টেবিলে সাজান আছে ডিম, মাছ, ভাত, মুরগির মাংস, হ্যাম ইত্যাদি ইত্যাদি। পেছনে খিদমতগার দাঁড়িয়ে 'চৌরি' দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছে। চৌরি তৈরি হয় গরুর লেজের গোছা দিয়ে। ময়ূরের পেখম দিয়েও তা তৈরি করা যায়। তবে বলা দরকার, এর আগে হাতমুখ ধোয়ার জন্য তার সামনে যখন চিলমচি ধরা হবে, তখন তিনি হয়তো খানিকটা ঘাবড়ে যাবেন। রবারদিউ লিখেছেন, "এই যে প্রক্ষালনের ব্যবস্থা তাতে মনে হয় ইউরোপের মানুষের চেয়ে আমরা থাকি ঢের পরিচ্ছন্ন।"

দুটোর সময় গ্রিফিন দেখেন তাকে আবার খাবারের জন্য ডাকা হচ্ছে, যাকে নেটিভরা বলেন 'টিফিন'। এ সময় থাকে ঠাণ্ডা মাংস, তরকারি, সালাদ প্রভৃতি। এসবের সঙ্গে সাধারণত দেয়া হয় এক ধরনের স্যুপ। এটি তৈরি হয় মশলায় মুরগি সেদ্ধ করে, তারপর তাতে মেশান হয় রংয়ের জন্য হলুদ। এর নাম 'মুল্লি কি তানি'। ভাতের সঙ্গে তা খেতে হয় এবং এক কথায় তা অপূর্ব। টিফিনের পর বিশ্রাম অর্থাৎ ঘুম। ঘুমোবার যাদের অবকাশ আছে তারা দুপুরে ঘুমিয়ে নেয়। ঘুম ভাঙ্গে পাঁচটা-ছয়টায়। তারপর সেই পুরনো রুটিন। কিন্তু এবার রাতে ঘুমোবার সময় গ্রিফিন আর ভুল করেন না। শোবার সময় মশারি টাঙ্গিয়ে নেন।

এখন সময় এসেছে আমাদের গ্রিফিনকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার। যার কাছে তিনি লেটার অব রেকমেন্ডেশন নিয়ে এসেছেন তার সঙ্গে দেখা করবেন। সরাইঅলাই যাবার ব্যবস্থা করে দেয়। বাহন আছে দু'ধরনের। এক ধরনের পালকি আছে, যাতে আধশোয়া হয়ে যাওয়া যায়, নাম মাহান্না। আরেক ধরনের পালকি আছে চেয়ারের মতো, যাতে সোজা বসে যেতে হয়। পুরুষরা দুটোই ব্যবহার করে, বেশি করে মাহান্না। দ্বিতীয়টি কারোই পছন্দ নয়, মহিলাদেরতো নয়ই। এর ভাড়া সারাদিনের জন্য এক টাকা; সিক্কা টাকা, ইংল্যান্ডের দু'শিলিং ছয় পেন্সের সমান।

আর আছে 'টনজন'। 'টনজন'ও দু'ধরনের। তবে তা বেশি ব্যবহৃত হয় মফস্বলেই। রবারদিউ লিখেছেন, "আমি পছন্দ করি টনজন। তার মানে এই নয় যে, আমার পালকিও নেই। কারণ বর্ষার সময় টনজন ব্যবহার করা যায় না। পালকি বেশ জাঁকালোভাবে তৈরি করা যায়। রুচি বা সামর্থ্যভেদে পালকির দাম পড়বে আশি থেকে চার-পাঁচশ' পর্যন্ত। মোটামুটি ভালো একটির দাম হবে দেড়শ' থেকে দুশো। অনেক সময় অনেক পালকির ভেতর শেলফের ব্যবস্থা থাকে, যাতে সেখানে বোতল বা অন্য কিছু রাখা যায়।"

আমাদের গ্রিফিন পথে নামেন। তার হরকরাকে বলে দেন কোথায় তিনি যেতে চান। ঠিকানায় পৌঁছে গৃহকর্তাকে চিঠি পৌঁছে দেন। সাধারণত এ ক্ষেত্রে যা হয় তা হলো– গৃহকর্তা চিঠি পড়ে গ্রিফিনকে অনুরোধ জানান, যতদিন তাঁর কোনো ব্যবস্থা না হচ্ছে ততদিন যেন তিনি তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন। গ্রিফিন তাতে সানন্দে রাজি হন এবং ট্যাভার্ন থেকে তার মালপত্র নিয়ে আসতে বলেন। বলা যেতে পারে, সেদিন থেকে তিনি হলেন কলকাতার বাসিন্দা। তবে ৩৬৭ দিন না গেলে গ্রিফিন নামটি থেকে তিনি মুক্তি পাবেন না। রবারদিউ লিখেছেন, "নবাগতকে গ্রিফিন বলার উৎসটি খুঁজে বের করতে পারিনি।" *হবসন-জবসনে* দেখেছি, গ্রিফিন সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য নেই, তবে ১৬২৪ সালে শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিলো।

রবারদিউর এই বিবরণ ১৭৯৯ সালের, যখন তিনি কলকাতায় পা রেখেছিলেন। এই অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিলো কলকাতার মাটিতে পা রাখার পর, যা তিনি তৃতীয় পুরুষের ব্যক্ত করেছেন। অনুমান করে নিতে পারি, তদবিরের চিঠি বা 'লেটার অব রেকমেন্ডশেনে'র জোরে তিনি কোম্পানির নোকরিতে ঢুকেছিলেন বা রাইটার পদে যোগ দিয়েছিলেন। দু'বছর রাইটার হিসাবে কাজ করার পর তাঁকে পাঠানো হয়েছিলো ময়মনসিংহে। কলকাতায় তাঁর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রবারদিউ দু'টি অধ্যায় রচনা করেছেন– 'অ্যামিউজমেন্ট ইন ক্যালকাটা' এবং 'জেনারেল রিমার্কস অন ক্যালকাটা'। এ ধরনের বিবরণ প্রচুর আছে সিভিলিয়ন ও ঐতিহাসিকদের লেখায়। সেসব বিবরণ থেকে রবারদিউর বিবরণ তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। তারপর আছে ময়মনসিংহের বিবরণ, যা আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক। এ অধ্যায়ের শিরোনাম 'অ্যামিউজমেন্টস্ ইন দি কান্ট্রি'। এ অধ্যায়ের বিবরণটি খানকিটা এলোমেলো। আমি সে অধ্যায়ের ওপর ভিত্তি করে বিবরণটি আমার মতো করে সাজিয়েছি।

॥ ২ ॥

ঢাকা, পাটনা প্রভৃতিকে শহরও বলা চলে না, আবার সেগুলো নিছক গ্রামও নয়।

এক ধরনের মিশ্রণ সেগুলো। কলকাতার মতো সেখানে নেই ফূর্তি করার ব্যবস্থা, নিত্য বলনাচের আসর বা বড় বড় কোম্পানি; মফস্বলের শান্তি, ঘরোয়া পার্টি, মৃদু আমোদও নেই সেসব এলাকায়। এসব প্রান্তিক স্টেশনগুলো একই ধরনের একঘেঁয়ে। কোথাও হয়তো দু'একজন ইউরোপিয় বেশি, কোথাও হয়তো কম।

ময়মনসিংহের বিবরণ দিয়ে রবারদিউ বোঝাতে চেয়েছেন ভারতের মফস্বলের প্রান্তিক স্টেশনগুলোতে বসবাস করার অবস্থাটা। অন্যান্য স্টেশন থেকে ময়মনসিংহ আরো নির্জন। ব্রহ্মপুত্রের তীরে ময়মনসিংহ। কিন্তু এই ব্রহ্মপুত্র ধরে এগুলে আর কোনো স্টেশন নজরে পড়বে না। মাঝে মাঝে যে কোনো ভ্রমণকারী হঠাৎ এসে পড়বেন এখানে, সে আশাও কম। অন্যান্য জেলায় সব সময়ই দু'একজন আগন্তুক হঠাৎ এসে পড়ে। সুতরাং, একমাত্র বিনোদন মাঠে অর্থাৎ শিকারে। কিন্তু, তার সময় শীতকাল। "বছরের দু-তৃতীয়াংশ সময় আমরা বাস করি এক ধরনের শূন্যতার মধ্যে"– জানিয়েছেন রবারদিউ।

রেজিস্ট্রার হওয়ার পর জীবনটা কেমন ছিলো রবারদিউর। জানিয়েছেন তিনি, ভোর পাঁচটা থেকে ছয়টার মধ্যে উঠে পড়তেন। তারপর ঘোড়ায় চড়ে বেরুতেন ভ্রমণে বা ব্যায়ামে। সাতটার মধ্যে ফিরে আসতেন। তারপর বিশ্রাম, স্নান ইত্যাদি সেরে সকাল নয়টায় বসতেন নাশতার টেবিলে। নাশতা শেষ হলে আসত হুঁকো। হুঁকো টানতে টানতে এগারটা পর্যন্ত পড়তেন বা লিখতেন। এগারটার দিকে এসে নাজির জানাতো, আদালত তৈরি। তারপর তিনি পালকি বা টনজনে চড়ে রওয়ানা হতেন আদালতের দিকে। সেখানে থাকতেন পাঁচটা-ছয়টা পর্যন্ত। সন্ধ্যা নামার আগ পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতেন, হেঁটে বা ঘোড়ায় চড়ে বা পালকিতে। তারপর পোশাক বদলে তৈরি হতেন নৈশভোজের জন্য। নৈশভোজের আমন্ত্রণ থাকতো কোথাও না কোথাও। রাত এগারটার দিকে যেতেন ঘুমোতে। "এই হলো আমার জীবন", লিখেছেন রবারদিউ, "মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম হয় যদি শিকারে বা ঢাকায় যাই। ইংল্যান্ডে অনেকের ধারণা, আমাদের এখানে করার কিছু নেই। কিন্তু সারাটা দিন তো কেটে যায় কাজে। শুধু রবিবার বা বন্ধের দিন এ রুটিনের ব্যতিক্রম হয়। আমরা বলতে আমি বোঝাচ্ছি যারা বিচার বিভাগে কাজ করে। সরকারের অন্য বিভাগগুলোতে তুলনামূলকভাবে অবকাশ বেশি।"

ময়মনসিংহের সমাজটা কেমন ছিলো? সমাজ বলতে অবশ্য তিনি বুঝিয়েছেন ইংরেজ বা ইউরোপিয় সমাজ। কোম্পানির সব পদে লোক থাকলে সমাজে সভ্যের সংখ্যা দাঁড়াতো ছয়জনে। এঁরা হলেন, জজ এবং ম্যাজিস্ট্রেট, রেজিস্ট্রার, রেজিস্ট্রারের সহকারী, কলেক্টর, কালেক্টরের সহকারী এবং সার্জন। রবারদিউ যখন ময়মনসিংহে [অর্থাৎ বিবরণ লেখার সময়] তখন ইংরেজ ছিলেন চারজন। কালেক্টরের সহকারী ও সার্জন ছিলেন অনুপস্থিত। বাড়তি একজন

ছিলেন, একজন মহিলা, জজের শ্যালিকা। সার্কিট জজ বছরে দু'বার আসেন। এছাড়া আর কোনো ইউরোপিয় নেই। কাছের স্টেশন ঢাকা, তাও একশ' মাইল দূরে। জেলাটি ইংল্যান্ডের একটি কাউন্টির মতো বড় এবং লোকসংখ্যাও কম নয়। বার বা চৌদ্দ বছর আগে ময়মনসিংহ ছিলো ঢাকা জেলার অধীন। কিন্তু একজন জজের তুলনায় এলাকাটি ছিলো বেশ বড়। তাই ময়মনসিংহকে আলাদা জেলা করা হয়েছে। বাংলার ভাটি অঞ্চল ময়মনসিংহ, চমৎকার নদী বয়ে গেছে এলাকা দিয়ে। আবহাওয়া শুষ্ক ও এবং স্বাস্থ্যকর।

"অনেকের ধারণা হতে পারে", লিখেছেন রবারদিউ, "এই চারজনে কী কথা হতে পারে? কিন্তু বিকেলটা আমাদের ভালোই কাটে। বিকেল পাঁচটায় প্রতিদিন ডাক আসে। খবরের কাগজ আসে সপ্তাহে তিন-চারবার। জজ এবং কালেক্টর একদিন পরপর আমন্ত্রণ জানান।"

এসব এলাকায় নিজের সবকিছু নিজেকেই তৈরি করে নিতে হয়। যেমন বাজারে পাওয়া যাবে না মাংস, মুরগি বা ডিম, রুটি। নিজের খাবার তাই ব্যবস্থা করে নেয়া জরুরি, যেখানে থাকবে ষাঁড়, ভেড়া, বাছুর, হরিণ, ছাগল, মুরগি, হাঁস, টার্কি, খরগোশ প্রভৃতি। গ্রামেও যে এগুলো পাওয়া যায় না তা নয় কিন্তু মোটাসোটা বা তাজা নয়। যেমন- মুরগি পাওয়া যায় প্রচুর। মুরগির বাচ্চা পাওয়া যায় টাকায় ত্রিশ চল্লিশটি, মাঝারি আকারের (যা রোস্ট করে খাওয়া যায়) টাকায় বিশটা, বড়সড় টাকায় চার থেকে ষোলটা। এক রুপিতে পাওয়া যায় একটা ভেড়া, বয়স্ক ষাঁড় চার থেকে আট রুপির মধ্যে। রবারদিউ লিখেছেন, "দাম শুনে আপনাদের মনে হচ্ছে নিতান্ত সস্তা, আসলে কিন্তু দাম বেড়ে গেছে, রুটি-মাখন ঘরেই তৈরি করা হয় এবং যা ইংল্যান্ডের তুলনায় কোনো অংশে খারাপ নয়।" রবারদিউর রুটি তৈরি হয় ময়দা থেকে আর ঈস্টটা আসে তালের পরিশুদ্ধ রস থেকে। দেশীরা ওই রস থেকে তাড়ি তৈরি করে। রুটি আর মাখন তৈরি করা হয় প্রতিদিন। বাগান থেকে আসে সব রকমের সবজি।

যেসব জিনিস যেমন- মদ, পনির, হ্যাম এখানে পাওয়া যায় না, আনতে হয় কলকাতা থেকে ছোট নৌকা করে। ভারতবর্ষে বছরের প্রায় পুরোটা সময় নৌকায় চলাচল করা যায়। রবারদিউ লিখেছেন, অধিকাংশ সময় তাঁরা নৌকায় চলাচল করতেন, কারণ কাপড়চোপড়, হুঁকো, চাকরবাকর নিয়ে পালকিতে চলাচল কষ্টকর; বিশেষ করে গরমটা অসহ্য। গাড়ি বা ঘোড়ার প্রশ্ন আসে না। কারণ রাস্তা নেই, তাছাড়া সূর্যের প্রখর উত্তাপ মারাত্মক হতে পারে। রবারদিউ লিখেছেন, "আমরা হাঁটি না। গ্রীষ্ম এবং বর্ষায় বিনোদনের কোনো উপায় নেই', বিলিয়ার্ড টেবিল মাঝে মাঝে বিনোদনের মাধ্যম হয়ে ওঠে। তবে বিনোদনের অভাবটা অনুভব করা যায় না। কারণ মফস্বলে সিভিল সার্ভেন্টদের কাজ করতে হয় বিশেষ করে যারা বিচার

বিভাগের সঙ্গে যুক্ত। সারাদিনই তাদের কাজ থাকে। সে তুলনায় রাজস্ব বিভাগের লোকদের অবকাশ বেশি।"

"মফস্বলের [কান্ট্রি শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে] জীবন বৈচিত্র্যহীন, বিষাদময়, স্থবির, নির্জন", জানিয়েছেন রবারদিউ, "নিজের ভেতর থেকে আনন্দ সৃষ্টি করতে না পারলে, ব্যক্তি অসহায় হয়ে ওঠে।" তাই এ জীবনে সামান্য পরিবর্তন সৃষ্টি করে একটি 'যুগ'-এর যেমন সার্কিট জজের আগমন উল্লেখ করার মতো ঘটনা। বছরে দু'বার জুলাই এবং জানুয়ারিতে তিনি আসেন। পরিবার থাকলে, পরিবার সঙ্গে নিয়ে আসেন এবং যার সঙ্গে খাতির তার সেখানে থাকেন। এক মাসের বেশি তিনি থাকেন। যখন শোনা যায় তিনি আসছেন তখন নৌকা করে তাঁর বন্ধু বা বন্ধুরা তাজা সবজি, রুটি, মাখন তাঁর জন্য পাঠিয়ে দেন। অবশ্য এ নিয়ম সব ইউরোপিয়ান ভদ্রলোকের জন্যই প্রযোজ্য। এবং কোনও কোনও স্টেশনে যেখানে তাঁদের নিত্য আসা-যাওয়া সেখানে নিয়মিত এসব পাঠানো চাট্টিখানি কথা নয়। শহরেই শুধু রুটি বিক্রি করা হয়। আর ইউরোপিয়ানরা যে ধরনের রুটি খান 'নেটিভ'রা তা খায় না। অনেক ভদ্রলোক তাঁদের রুটিঅলা, মাখনঅলা, গরু, ছাগল প্রভৃতি নিয়ে ভ্রমণ করেন। অন্যান্য অঞ্চলের মতো মফস্বলেও নাশতা সারা হয় আটটা থেকে দশটার মধ্যে, নৈশভোজ ছয়টা থেকে আটটার মধ্যে। এসব জায়গায় টিফিনের বরং চল নেই, কারণ তাতে সময় নষ্ট হয়, কাজে বাধা পড়ে।

ময়মনসিংহকে বলা যায় গ্রামের থেকে বড় কিছু, সপ্তাহে একদিন বাজার বসে। তবে এর আয়তন আর জনসংখ্যা বাড়ছে; রবারদিউ জানিয়েছেন, "আমাদের বাসাবাড়ি ও জেলখানা ছাড়া ইটের তৈরি কোনো বাড়ি নেই।" সাধারণ বাড়িঘর বাঁশ বা মাটির। বাঁশের তৈরি বাড়ি শুকনো কিন্তু যে কোনো সময় আগুন ধরে যেতে পারে। রাস্তাঘাট প্রায় নেই। রবারদিউর আমলে সবচেয়ে দীর্ঘ রাস্তা, যা ত্রিশ মাইল লম্বা তৈরি করা হয়। কয়েদীরা এটি তৈরি করে। রাস্তা মানে,দু'দিক মাটি ফেলে খানিকটা উঁচুমতো জায়গা, যেখানে প্রয়োজন সেখানে সাঁকো তৈরি করা হয়েছে। রবারদিউ লিখেছেন, "এগুলোকে আমি ব্রিজ বলবো না।" আসলে এখানে বড় রাস্তার কোনো দরকার নেই। কারণ সারা ময়মনসিংহে চাকাঅলা কোনো শকট নেই। শকট যদি থাকে তবে তা স্টেশনের ভদ্রলোকদেরই থাকে। যেসব নেটিভ হাঁটতে পছন্দ করেন না তাঁরা পালকি চড়েন। ব্রহ্মপুত্রের এদিকের এলাকা সমভূমি। জমি ভাগ করার জন্য কোনো বেঁড়া বা ঝোপ নেই। অনেকটা ইংল্যান্ডের মাঠের মতো, যা সবাই ব্যবহার করতে পারে। উত্তরে পাহাড়-পর্বত যা বিস্তৃত তিব্বত পর্যন্ত। মেজর রেনেলের ছয় নম্বর মানচিত্রে এ এলাকা দেখানো হয়েছে। লিখেছেন রবারদিউ, "সেখানে খুঁজলে আপনারা পাবেন আমাদের এলাকাটি, যেখানে আমরা বাস করি। এর নাম সোয়ারা, যা বেগুনবাড়ি থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দক্ষিণে।"

অন্যান্য সিভিলিয়ানদের মতো, পূর্ববঙ্গের সিভিরিয়ানদের বিশেষ বিনোদন শিকারের কথা রবারদিউ উল্লেখ করেছেন বিস্তারিত ভাবে। এখানে সংক্ষেপে তা উল্লেখ করছি।

রবারদিউ জানাচ্ছেন, তাদের বিনোদনের প্রধান মাধ্যম শিকার এবং ভারতবর্ষে শিকারের প্রাণীর সংখ্যা কম নয়। এ দেশের অধিবাসীদের অধিকাংশ যেহেতু হিন্দু সেহেতু প্রাণী হত্যা তাদের পছন্দ নয়। শিকারের মধ্যে বরাহ শিকার উল্লেখযোগ্য, বরাহের দাঁতটা রেখে দেয়া হয় ট্রফি হিসেবে। রবারদিউ-ও কিন্তু পিগ-স্টিকিং শব্দটি ব্যবহার করেন নি। বোঝা যাচ্ছে বরাহ পাওয়া যেতো প্রচুর কারণ রবারদিউ উল্লেখ করেছেন, এক সকালে ২০টি বরাহ শিকার খুব বেশি কিছু ছিলো না।

বিভিন্ন প্রজাতির হরিণ আছে। তবে বর্শা দিয়ে নয়, বন্দুক দিয়ে অথবা গ্রেহাউন্ড লেলিয়ে তা শিকার করা হয়। স্নাইপ এবং তিতির শিকার ছাড়া সব সময় হাতিতে চড়েই তারা শিকার করেন। বুনো মোরগ, পাখির সংখ্যাও কম নয়। Floriken নামক পাখির এক প্রজাতির কথা উল্লেখ করেছেন রবারদিউ যা দেখেতে সুন্দর, শিকার করে খেতেও ভালো। বড়সড় মোগের থেকেও বড় এই পাখি। মহিষও আছে বেশ। দলবেঁধে এরা ঘুরে বেড়ায়। গন্ডার দেখা যায় কালেভদ্রে কিন্তু চিতা আর বাঘ প্রায়ই চোখে পড়ে। রবারদিউ লিখেছেন, "এদের একেকটি মাথার জন্য সরকার পুরস্কার ঘোষণা করেছে দশ রুপি, ফলে, আশংকা করা যায় কিছুদিনের মধ্যেই এ প্রাণী দুস্প্রাপ্য হয়ে উঠবে। কারণ, অনেকে জীবিকা নির্বাহের উপায়ই করে নিয়েছে ফাঁদ পেতে বাঘ ধরা। একবার দেখলাম একজন ৭৫ টি মাথা নিয়ে এলো তার মানে ৭৫০ রুপি। হাতিতে ভদ্রলোকরা বাঘ শিকার করলে টাকাটা পায় মাহুত। একজন সিভিলিয়ান নাকি বছরে এ ধরনের শিকার করে একলক্ষ টাকা রোজগার করেছিলেন এবং তাকে নিয়ে একটি ছড়া বাঁধা হয়ে ছিলো–

If s... kills puns, and takes his fees
The state must pay him ten Rupees;
If pun kills s... the case is clear,
The state will save a Lac a year;
Since saving them is all our plan
Live Royal Brute ! Die brutal Man!

বন্য হাতীও পাওয়া যায় প্রচুর বিশেষ করে নিম্নবঙ্গে। এ অঞ্চলের অনেক জায়গায় ভালুকের দেখা মেলে। তবে শেয়াল আর খরগোসতো প্রচুর। [এক তথ্যে জানা যায় ১৮৫৭ সালের মধ্যে নিম্নবঙ্গ ও বিহারে ভালুক প্রায় দুস্প্রাপ্য হয়ে উঠেছিলো]।

॥ ৩ ॥

অনেকের মনে হতে পারে চাকাঅলা গাড়ি না থাকলে মালপত্র আনা-নেয়া করে কিভাবে? এর একটা উত্তর, যা আগে উল্লেখ করেছি জলপথে, নৌকায়, যদি জলপথে আনা-নেয়া না যায় তা হলে স্রেফ মাথায় করে নিতে হবে। অথবা আছে 'ভাঙ্গিবরদার', যে কাঁধে বাঁক ঝুলিয়ে দু'টি ঝুড়িতে মালপত্র বয়ে নেবে। বাঁকের দু'মাথায় যদি ওজন খুব বেশি না হয় এবং সমান থাকে, তা হলে 'ভাঙ্গিবরদার' বেশ দ্রুত হেঁটে যেতে পারে। ভদ্রলোক অর্থাৎ ইউরোপিয়ানদের মালপত্র নেয়ার দরকার হয় না, কারণ তারা জেলার অভ্যন্তরে ভ্রমণ করে না আর নেটিভরা এগুলো নিয়ে চিন্তাও করে না। সে যখন ভ্রমণ করে তখন তার সঙ্গে থাকে একটা মাদুর, হুঁকো, পানি খাবার পাত্র। যখন প্রয়োজন হয় তখন সে কারও বাড়িতে আশ্রয় নেয় এবং এখানে পরস্পর পরস্পরের প্রতি সদয়। রবারদিউ লিখেছেন, "আপনারা শুনে হয়তো হাসবেন, কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি। নেটিভরা ভ্রমণের সময় জুতোটা হাতে নেয়!"

ইউরোপিয়ানরা স্টেশনে যেসব বাড়িতে থাকে তা সব সময়ই যে ইটের তৈরি তা নয়। তাদের বাড়িগুলোকে বলা হয় বাংলো। এগুলোর দেয়াল কখনও কখনও ইটের, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই বাঁশের ছাচ দিয়ে তৈরি। ছাদটা শণে ছাওয়া। বাংলোয় যিনি থাকবেন তাঁর রুচি অনুযায়ী বাংলোর পরিকল্পনা করা হয়। অনেকের বাংলোতে আছে কাচের জানালা, ভেনিসিয়ান ব্লাইন্ড। তবে সচরাচর এ ধরনের বাংলো চোখে পড়বে না। বাঁশের ছাঁচ দিয়ে তৈরি দেখে বাংলোর ভেতরটা অন্ধকার লাগে। সে জন্য অনেকে ভেতরটা প্লাস্টার করে চুনকাম করে নেয়। ভেতরে ছাদের নিচের অংশে মোটা কাপড় দিয়ে সিলিং তৈরি করা হয়। ভেতরে কোনো দরজা না থাকায় পর্দা ব্যবহার করা হয়। রবারদিউ লিখেছেন, "আমার বাংলো দু'টি কাছাকাছি। একটিতে আমি ঘুমোই, ওপরটিতে বসি, খাওয়া-দাওয়া করি। বারান্দাটা তৈরি করা হয়েছে ইট ও সুরকি দিয়ে, যা মাটি থেকে দু'তিন ফুট উঁচু।" তিনি আরও জানিয়েছেন, "সর্দার বেয়ারা ছাড়া আর কেউ আমাদের সঙ্গে বাংলোতে শুতে পারে না।" অন্য ভৃত্যদের যার যার নিজের কুটির আছে, যেখানে তারা পরিবার নিয়ে থাকে। যার যখন কাজ তখন সে এসে কাজটি করে দেয়। যেমন, খিদমতগার সকালে নাশতার সময় আসে। নাশতা শেষ হলে সে চলে যায়, আবার আসে নৈশভোজের সময়। এছাড়া আরও অনেক ভৃত্য আছে যারা ঘরে ঢোকে না যেমন– সহিস, ঘেসোরে, মালী প্রভৃতি। তাদেরও নিজ নিজ কুটির আছে। রবারদিউ এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, নেটিভদের আচার-আচরণ বিশ্বাস সব কিছু ইউরোপিয়ানদের থেকে একেবারে আলাদা, যার ফলে ইউরোপিয়ানদের সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ নেই। তার বিশ্বাস, নেটিভরা

ইংরেজদের ঘৃণার চোখে দেখে। এর কারণ, রবারদিউর মতে, ধর্ম বিশ্বাস, ইংরেজরা এইসব কুসংস্কার, 'পূজা'য় বিশ্বাস করে না যাতে নেটিভদের শুধু বিশ্বাস নয়, গর্বও করে। তবে– শিল্পের ক্ষেত্রে !আমাদের তারা ঈশ্বরের মতো মনে করে।" জানিয়েছেন রবারদিউ।

সিভিলিয়ানকে তার ঘোড়া থেকে আলাদা করে যাবে না। এটি সিভিলিয়ান সংস্কৃতির অঙ্গ। একেকজনের একাধিক ঘোড়া থাকতো। ঘোড়াকে খাওয়ান হতো রুটি ও ঘাস। প্রতিদিন একটি ঘোড়ার জন্য প্রায় ১০ পাউণ্ডের মতো বুট লাগে। এক রুপিতে পাওয়া যায় ষাট থেকে আশি পাউণ্ড বুট। ঘাসটা প্রতিদিন কাটা হয়; ঘাস কাটার জন্য আলাদা লোক থাকে। ঘোড়ার আস্তাবল খোলামেলা, কাঠামোটা তৈরি করা হয় বাঁশ বা ইট দিয়ে। তবে ইংল্যান্ডে যেমন আস্তাবলে ঘোড়ার খাবারের জন্য বন্দোবস্ত থাকে, এখানে তেমনটি থাকে না। তবে ঘোড়ার খাবার হিসাবে শুকনো খড়ের কদর বাড়ছে। মূল বাড়ি থেকে আস্তাবলটা একটু দূরে করা হয়। রান্নাঘরও দূরে। এক কথায়, মূল বাড়ি থেকে সব কিছুই আলাদা, এমনকি সবজি বাগানও। মালি সাধারণত বাগানেই কুটির বেঁধে থাকে। ভারতবর্ষ বা বাংলার আবহাওয়া সিভিলিয়ানদের শরীর-মনের অনুকূল ছিলো না। যে কারণে শারীরিক শ্রম তাদের পক্ষে করা খুব একটা সম্ভব ছিলো না। তাছাড়া, লিখেছেন রবারদিউ, নেটিভদের চেয়ে সিভিলিয়ানরা আলাদা সেটি বোঝাবার জন্যও তাঁরা শারীরিক শ্রম এড়িয়ে চলতেন। শারীরিক শ্রম করলে নেটিভদের চোখে তাঁরা হেয় হয়ে যেতেন। এ ব্যাপারে, তাঁর মতে নেটিভদের ধারণা অদ্ভুত ও হাস্যকর। তাঁদের অনেকের মতে, বন্দুক হাতে হেঁটে হেঁটে সিভিলিয়ানরা শিকার করে কেন? পাখি চাইলেই তো সে পেতে পারে। শিকার যে আলাদা একটা আনন্দ বা 'স্পোর্টস' এটা তাকে বোঝানো যাবে না।

ময়মনসিংহের কালেক্টর ছিলেন লা গ্রস। ১৭৯৫ সালে তিনি যোগ দিয়েছিলেন কালেক্টর হিসাবে। তিনি হাঁটতে ভালোবাসতেন। একদিন সকালে তিনি হাঁটতে বেরিয়েছেন। এক বৃদ্ধ তাঁকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এটা ভারি অদ্ভুত ব্যাপার যে, আপনি হাঁটছেন। কেন? আপনার একটা ফিটন আছে তারপরও হাঁটছেন? আপনার ঘোড়া আছে, তাও হাঁটছেন? আপনার বেয়ারা, পালকি, টনজন সবই আছে, তবুও হাঁটছেন? আপনারা হাওদা দেয়া হাতি আছে, নৌকা আছে তারপরও হাঁটছেন? এ ধরনের পরস্পর বিরোধিতার মানে কী?"

॥ ৪ ॥

ময়মনসিংহের প্রধান ফসল ধান। এরপর আছে আখ আর সামান্য কিছু তুলা; মোটা কাপড়ও উৎপাদিত হয় কিছু। আশপাশের জেলাগুলোতে নীল উৎপাদিত হয়।

এখানেও হতে পারে যদি ব্যবসায়ীরা উৎসাহিত হয়। নীলচাষের ওপর সরকারের আর কোনো বিধিনিষেধ নেই। যার ইচ্ছা সেই উৎপাদন করতে পারে। নীলচাষটা এখন অনেকটা জুয়া খেলার মতো হয়ে গেছে। নীল উৎপাদন করে একজন স্বর্ণখনির সন্ধান পেতে পারে, আরেকজন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। অনেকে নীলচাষ করে রাতারাতি ধনী হয়ে গেছে, অনেকে হয়ে পড়েছে নিঃস্ব। রবারদিউ লিখেছেন, "আমরা যারা কোম্পানির কমার্শিয়াল লাইনে কাজ করি না, তারা ব্যবসার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখতে পারব না বলে শপথ নিতে হয়েছে।"

কোম্পানি বা রাজকার্যে জড়িত নয় এমন কেউ বিনা অনুমতিতে কলকাতা থেকে দশ মাইল দূরে বসবাস করতে পারে না। তবে, তা অনেকে মানে না। অনেক জায়গায় ব্যবসায়ী হিসাবে অনেকে থিতু হয়েছে এবং সমাজে তারা সম্মানিতও। ময়মনসিংহে এ রকম দু'একজন ছিলেন, "কিন্তু এখন নেই", জানিয়েছেন রবারদিউ।

পশ্চিমের এলাকাগুলোতে বছরের একটা সময় প্রচণ্ড গরম বাতাস বয়। পাঁচ মিনিট ঐ তাপে থাকলে মুখের চামড়া উঠে আসবে। নিম্নাঞ্চলে গরমটা তেমন নয়; অনেক সময় এতটা গরম পড়েও না। আর এ গরমের জন ইউরোপিয়রা একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, যাকে বলা হয় টাট্টি। জানালা ও দরজায় আলাদা একটি ফ্রেম করা হয় এবং তা এক ধরনের সুগন্ধী ঘাস দিয়ে পূরণ করা হয়। একে বলা হয় খুশখুশ। ভিস্তি সব সময় খুশখুশ ভেজা রাখে। বাতাস যখন বয় তখন তা খুশখুশে ফিল্টার হয়ে স্নিগ্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া, ঘাসের সুগন্ধ ঘর ভরে রাখে। আর টিপটিপ করে খুশখুশ থেকে পানি পড়তে থাকে। সে শব্দও ঘুম পাড়িয়ে দেয়। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই খুশখুশ ভেজান হয় এবং মাঝ রাত পর্যন্ত এতে পানি দেয়া হয়। তা সত্ত্বেও, লিখেছেন রবারদিউ, "গরমকালে অনেক সময় বিছানা অসহ্য হয়ে ওঠে। তার ওপর শুতে হয় মশারির ভিতর। এর সঙ্গে প্রতিহত করতে হয় লাল পিঁপড়ের আক্রমণ। পিঁপড়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য খাটের চারটি পায়া পানি ভরা দস্তার পাত্রে রাখা হয় যাতে পিঁপড়ে খাটে উঠতে না পারে। কিন্তু সবচেয়ে ঝামেলা করে এক ধরনের পোকার ডাক। বিশেষ করে গ্রীষ্ম এবং বর্ষাকালে তাদের অবিশ্রান্ত আওয়াজে কান ঝালাপালা হয়ে যায়।" রবারদিউ পোকার নাম বলেননি। তবে, ধরে নিতে পারি তা হচ্ছে ঝিঁঝিঁ পোকা।

"আমাদের আসবাবপত্র" জানিয়েছেন রবারদিউ, "কিছু ভারতে তৈরি কিছু ইউরোপে।" বিভিন্ন কাঠের তৈরি ভালো চেয়ার তৈরি হয় ভারতে। সবচেয়ে ভালো কাঠটি, কালো, মেহগনির মতো। কলকাতায় ভালো ইউরোপিয় মিস্ত্রি আছে যারা চমৎকার, অলঙ্কারিক চেয়ার তৈরি করে। কিন্তু তা খুব ব্যয়বহুল। ইউরোপিয় দোকানগুলো ইউরোপ থেকে আসবাবপত্র ও অন্যান্য পণ্য আমদানি করে এবং

দাম নিশ্চয় দেড়শ' ভাগ বাড়িয়ে রাখা হয়। সে হিসাবে ইউরোপিয় দোকানগুলোতে জিনিসপত্রের দাম বেশি পড়ে। রবারদিউ জানিয়েছেন, একবার একটি টুপি কিনতে তাকে ছত্রিশ টাকা দিতে হয়েছিলো। পনির কিনেছিলেন পাউণ্ড তিন থেকে চার টাকায়। তবে মাছটা মোটামুটি ভালোই পাওয়া যায়। যেসব মাছ তাঁরা খেতেন সেগুলো হলো চাঁদা, হুইটিং, মনে, প্রভৃতি। চমৎকার একটি মাছ পাওয়া যায় যা পরিচিতি ম্যাংগো ফিশ নামে। কিন্তু এ মাছ আসে জোয়ারে। ফলে ব্রহ্মপুত্রে তা পাওয়া যায় না। সকালে নাশতায় সাধারণভাবে মাছ দেয়া হয়। গাছ-গাছালি এখানে খুব দ্রুত বাড়ে। রবারদিউ লিখেছেন, সবজি খাবার জন্য ফিট হতে না হতেই দেখা যায় বীজ হয়ে গেছে। গ্রীষ্মকালে সব নদীর পানি হ্রাস পায়, অনেকটি একেবারে শুকিয়ে যায়। ব্রহ্মপুত্রের পানি হ্রাস পায় প্রায় ত্রিশ ফুটের মতো।

সিভিলিয়ানরা চলাচল করেন পালকিতে। কখনও কখনও পালকির আগে আট-দশজন বা তারও বেশি চাপরাসি দৌড়াতে থাকে। চাপরাস হচ্ছে দস্তার তৈরি এক ধরনের ব্যাজ। চাপরাসিও ব্যাজ পরে অর্থাৎ সে সরকারের সঙ্গে যুক্ত। ময়মনসিংহের আদালতে চাপরাসির সংখ্যা ছিলো ষাটজন। বেহারারা পালকি নিয়ে ঘণ্টায় চার পাঁচ মাইল যেতে পারে। রবারদিউ লিখেছেন, একবার তিনি পালকি করে চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন। একশ' ছয় মাইল রাস্তা পেরিয়েছিলেন বাইশ ঘণ্টায়। নেটিভরা রাস্তার দূরত্ব হিসাব করে কোশ হিসাবে। এক কোশ প্রায় পৌণে দু'মাইলের মতো। দূরত্ব হিসেবের জন্য অদ্ভুত কিছু উপায়ও আছে। যেমন, বটের একটা সজীব ডাল নিয়ে হাঁটতে থাকলো। কতক্ষণ ডালটি তাজা থাকবে তার একটা হিসাব আছে। বা গরুর ডাক শোনা। কতদূর পর্যন্ত ডাক শোনা যায় তারও একটা হিসাব আছে।

এ অঞ্চলে ঘোড়ার দাম খুব বেশি। সবচেয়ে অভিজাত ঘোড়া হচ্ছে আরবি ঘোড়া। এর দাম পড়বে ১০০০ থেকে ১২০০, ১৬০০ এবং ২০০০। আরবি বলে আরেক ধরনের ঘোড়া ব্যবসায়ীরা চালিয়ে দেয় যার দাম পড়বে ৬০০ থেকে ৮০০ রুপি। তরুণ কোনো সিভিলিয়ানের জন্য এটা বেশ খরচের ব্যাপার। কারণ, ঘোড়া তার লাগবেই এবং কমপক্ষে দু'তিনটি ঘোড়া তাকে পালতে হয়। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকেও কিছু চমৎকার ঘোড়া আনা হয় তবে সংখ্যায় কম।

কোম্পানি উন্নতমানের গরু প্রজননের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান করেছে। এর জন্য তত্ত্বাবধায়ক একটি বোর্ডও আছে কিন্তু ফলাফল খুব একটা পাওয়া যায়নি। ভারতে সিভিল সার্ভিসে এমন অনেকে আছেন [যাঁরা ওপরে ওঠে গেছেন] যাঁরা ছয় সাতটি ঘোড়া পালেন। সিভিলিয়ানের পিছে ঘোড়ায় চড়ে সহিস যাচ্ছে এটি খুব একটা অচেনা কোনো দৃশ্য নয়। তবে, ঘোড়ার সাজ আসে ইংল্যান্ড থেকে এবং তাও বেশ দামি। ঘোড়ার জিন ও পাদানির দাম পড়ে প্রায় ১২০ রুপি।

রবারদিউ এরপর ভৃত্যদের কথা উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন, প্রতিটি কাজের জন্য আলাদা ভৃত্য রাখতে হয়। সহিস বুট সাফ করবে না, খিদমতগার আসবাবপত্র পরিষ্কার করবে না, মালি আস্তাবল পরিষ্কার করবে না, রাখাল বাগান থেকে একটা বাঁধাকপিও তুলে আনবে না। "আসলে, এ দেশের প্রতিটি মানুষ বিভিন্ন পেশায় জন্মগ্রহণ করে এবং আমার তুচ্ছতম চাকরটিও নিজের কাপড় নিজে ধোবে না", লিখেছেন রবারদিউ, "তার জন্য আলাদা লোক আছে।" হিন্দু সমাজের অনড় জাতিভেদ প্রথার পরিপ্রেক্ষিতে এ মন্তব্য করেছিলেন তিনি।

সিভিলিয়ানরা দিনে তিনবার কাপড় বদল করে। ভোরে ঘোড়ায় চড়ে ভ্রমণের জন্য ডেসাবিল বুট প্রভৃতি। ভ্রমণ থেকে ফিরে নাশতার সময় আলাদা পোশাক যা সাধারণত সাদা রঙের। নৈশভোজের সময়ও সেই পোশাক। তবে, ঋতু অনুযায়ীও পোশাকের পরিবর্তন হয়। কাপড় যেহেতু ঘন ঘন বদলানো হয় সে জন্য তা খুব ময়লা হয় না। কিন্তু যে প্রক্রিয়ায় তা নিত্য ধোলাই করা হয় তাতে কাপড় খুব বেশিদিন টেকে না। প্রত্যেক সিভিলিয়ানের মাইনে করা ধোবা আছে। যাঁরা পরিবার-পরিজন নিয়ে থাকেন তাঁদের মাইনে করা একাধিক ধোবা থাকে।

বাংলায় খুব কম বাড়িতেই ফায়ারপ্লেস আছে। ঘরের জানালা কাচের হলে ভালো হয়। "তবে আমার ঘরে কখনও কাচের জানালা ছিলো না এবং তার অভাবও কখনও বোধ করিনি", লিখেছেন রবারদিউ। শীতকালে বিছানায় কম্বল দরকার। "রাতের বেলা আমরা দরজা জানালা খুলেই ঘুমাই" লিখেছেন রবারদিউ, "চোরের কোনো উৎপাত নেই। তবে শিয়াল ঢুকে জুতা বা চামড়ার তৈরি কোনো জিনিস পেলে নিয়ে যেতে পারে। সিভিলিয়ানরা যেসব শকট ব্যবহার করেন তা ইংল্যান্ড থেকে কোনো অংশে খারাপ নয় তবে ততটা মজবুত নয়।"

খাবার পানির উৎস নদী, এর বিকল্প হচ্ছে পুকুর ও বৃষ্টির পানি। ব্রহ্মপুত্রের পানি খুবই চমৎকার। খাবার টেবিলে বিয়ার হচ্ছে এই পানি। সারা ভারতবর্ষ পুকুরে ভর্তি। কেউ তার নাম অমর করে রাখতে চাইলে একটি পুকুর কাটায় অথবা দীর্ঘজীবী কোনো গাছ বপন করে। "নাম করার জন্য মাধ্যমটি মন্দ নয়।" মন্তব্য করেছেন রবারদিউ।

আরকটি অদ্ভুত মন্তব্য করেছেন রবারদিউ। কোনো সিভিলিয়ানের বাসায় নৈশভোজে গেলে, ভোজ শেষে বিদায় না নিয়েই সবাই ফেরে। ভোজ শেষে 'আদিউ' বা 'গুড বাই' বলার দরকার পড়ে না। নিঃশব্দে একেকজন কেটে পড়ে, তারপর পালকিতে চড়ে বসে। রাতে পালকিতে আলো থাকে, তাছাড়াও লণ্ঠন বা মশাল হাতে সামনে দু'তিনজন পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

ভারতে যেসব পশুপাখি দেখা যায় তা অন্যান্য অঞ্চলের (যেখানে আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ) পশুপাখি থেকে আকারে ছোট্ট কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, এদের

মাংস গুণগত মানে খারাপ। মাটন বা খাসির [ভেড়ার] গোস্ত তো চমৎকার। সিভিলিয়ান যেখানে থাকেন [অর্থাৎ মফস্বলে] সেখানে তার খামারে সবসময় কমপক্ষে ১০০ ভেড়া ও ৩ থেকে ৪০০ মুরগি থাকবেই। প্রতিদিন বিভিন্ন পদের খাবারের জন্য ছ'সাতটি মুরগি লাগে। অন্যান্য ধরনের পশুপাখিও সমপরিমাণে রাখতে হয়। রবারদিউ অবশ্য লিখেছেন, "এ্যাংলো ইন্ডিয়ান টেবিলে মাংসের আধিক্য আমার পছন্দ নয়। মোটাতাজা করার জন্য পশুপাখি পালা হয়। যেমন– মুরগির খাদ্য হচ্ছে রুটি, দুধ আর চাল। ভেড়ার খাদ্য কলাই। কলাই খেলে ভেড়া দ্রুত চর্বিদার হয়ে ওঠে। গরু বা ষাঁড় তাজা করার জন্য নিয়মিত খাওয়ান হয় বুট। শূকরের মাংসটাও ভালো। চীনা এবং দেশী দু'টিই। এগুলোও একইভাবে লালিত হয়। রান্নার জন্য ব্যবহৃত হয় কাঠ। কারণ, কয়লা পাওয়া যায় না। তবে, ভারতীয় রান্নাঘর দেখলে, ইংল্যান্ডের যে কোনো গৃহিনীই আঁতকে উঠবেন। অবশ্য ইংরেজদের রুচি অনুযায়ীই নেটিভরা খাবার তৈরি করতে পারে।" "তবে", লিখেছেন রবারদিউ, "খিদে অটুট রাখতে হলে খাবার তৈরির প্রক্রিয়াটা না দেখাই ভালো।" "আমাদের বাড়িগুলো কাছাকাছি।" আমাদের বলতে ময়মনসিংহের সিভিলিয়ানদের বুঝিয়েছেন রবারদিউ। শুধু তাই নয়, নেটিভদের বাড়িঘর থেকে একটু দূরেও। রবারদিউ নিজেদের বাড়িঘরের একটি স্কেচ করেছিলেন। সে স্কেচের শিরোনাম, 'নদী থেকে ময়মনসিংহে আমাদের বাড়িঘরের অবস্থান। ছবির একদম বাঁয়ে হচ্ছে 'টাউন'। এখানে দেখা যাচ্ছে একগুচ্ছ খড়ো কুটির। তারপর কালেক্টরের অফিস, ল্য গ্রসের বাড়ি [তিনি ছিলেন কালেক্টর] ডাক্তারের বাড়ি। এরপর কিছু গাছপালা। তারপর জজের বাড়ি, আদালত এবং সবশেষে 'আমার বাংলো।' নদী তীরে সিভিলিয়ানদের বাড়ি, যা উঁচু, শুষ্ক, চমৎকার। সারা জেলায় অনেক 'টাউন' তবে ইটের বাড়িঘর নেই বললেই চলে। ঢাকা পাটনা দেখলে বোঝা যায় মুসলমান আমলে শহরগুলো কেমন ছিলো। "ঢাকায় গেলে আমি প্রায়ই দেখতে যাই আওরঙ্গজেবের প্রাসাদ ও তার ধ্বংসাবশেষ।" তিনি লালবাগ কেল্লাকে বুঝিয়েছেন। শুক্রবারে বাজারে বসে, সেখানে পাওয়া যায় চাল, মাছ, সবজি, ফল, অলঙ্কার, জামা, জুতা।

"খুব কম নেটিভই ঘোড়ায় চড়ে চলাচল করে" অবাক হয়ে মন্তব্য করেছেন রবারদিউ, "এই জেলায় অনেক ধনী আছেন যাদের আমি চিনি কিন্তু তাদেরও ঘোড়ায় চড়তে দেখিনি। অন্য এশীয়দের মতো এরাও চরমভাবে অলস ও নিরুদ্যম।"

শীতকালে রবারদিউরা বরফ পেতেন বা তৈরি করতেন। আফসোস করে লিখেছেন, শীতকালে যে রকম বরফ পাওয়া যায় [তৈরি করা যায়] গরমকালে যদি তা পারা যেতো! বিভিন্ন ধরনের লিকার গন্ধকের মধ্যে রেখে ঠাণ্ডা রাখতে হয় যা

ব্যয়বহুল। নাশতায় চা খাওয়া হয়। "তবে আমি চা খাই না", লিখেছেন রবারদিউ, "বরং পান করি দুধ ও পানি।" চা অনেকে সকালে খান বটে কিন্তু তাদের মত, চায়ের সুবাসটা ইংলিশ টি-এর মতো নয়। "আমাদের কাছে কথাটা অদ্ভুত শোনায়" লিখেছেন রবারদিউ, "মন্তব্যটা খানিকটা অতিরঞ্জিতও হতে পারে।"

রবারদিউ তৃত্যদের বেতনের প্রচলিত হার উল্লেখ করেছেন যা পাঠকদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে। বিভিন্ন ধরনের জিসিপত্রের দামও উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় একজন সিভিলিয়ানের জীবন যাপনের জন্য কয় ধরনের ভৃত্য লাগতো এবং তার খরচও বা কেমন ছিলো। আর বাজারে কী কী ধরনের পণ্য পাওয়া যেতো।

ভৃত্যদের বেতন
[মাস হিসেবে]

খানসামা (স্টুয়ার্ড বা বাটলার)	১৬ থেকে ৫০ রুপি
খিদমতগার	৫ থেকে ৮
সর্দার (হেডবেয়ারা যে সিভিলিয়ানের পোষাক আষাক দেখা শোনা করে)	৬ থেকে ১০
হুঁকাবরদার	১০ থেকে ২০
সহিস	৫
ঘেসোড়ে	৩
মাঙ্গি	৬
হরকরা	৬
বেহারা (পালকি টানার জন্য)	৩ থেকে ৫
দুরিয়া (কুকুরের দেখাশোনা করে যে)	৬ থেকে ৬
দর্জি	৬ থেকে ১৬
ধোপা	৮ থেকে ২০
মাহুত	৫ থেকে ১০
সবকার (খাজাঞ্চি)	১৬ থেকে ৪০
রাঁধুনে	৬ থেকে ১৬
মশালচি	৪ থেকে ৬
অউবদার (পানি শীতল করে যে)	৬ থেকে ১০
ফরাস	৪
দারওয়ান	৫
রাখাল, ভেড়া পালক, মুরগি পালক (প্রত্যেকের আলাদা বেতন)	৩

রুটি অলা (রুটি তৈরি করে যে)	১০ থেকে ১৬
মাখনদার (মাখন তেরি করে যে)	৫ থেকে ৮
জেলে	৪
ভিস্তি	৫

রবারদিউ জানাচ্ছেন এ কজন ভৃত্য রাখতেই হয়। এ সংখ্যা বাড়তেও পারে। যেমন প্রতিটি ঘোড়ার জন্য দু'জন ভৃত্যের দরকার হয়। এরা মূল বাংলোর বাইরে নিজ নিজ কুটিরে থাকে। যার যখন কাজ তখন এসে কাজ করে দিয়ে যায়। একজন অন্যজনের কাজ করে না।

পণ্যের দাম

গম-৬০ থেকে ৮০ পাউন্ড-১ রুপি

চাল-৮০ থেকে ১৬০ পাউন্ড-১ রুপি

ভেড়া (চর্বি ছাড়া) প্রতিটি ১ রুপি

ষাঁড় (চর্বি ছাড়া) প্রতিটি ৪ থেকে ১০ রুপি

টার্কি প্রতিটি ২ থেকে ৬ রুপি; কলকাতায় আরো বেশি

হাঁস ৪ থেকে ৬টি ১ রুপি

সব ধরনের ফলই শস্তা; চমৎকার আপেল ৫ থেকে ৬টি-১ রুপি

বুট (ঘোড়াকে খাওয়াবার জন্য) ৮০ পাউন্ড ১ রুপি

ছাগলছানা ৪ থেকে ৫টি-১ রুপি

মাছ নাস্তা; তবে কলকাতার বাইরে ভদ্রলোকরা বেতন দিয়ে জেলে রাখেন যে প্রতিদিন মাছ ধরে দেয়।

দুধ-৬০ থেকে ৮০ পাউন্ড-১ রুপি; তবে ভদ্রলোকরা (সিভিলিয়ান) নিজেরাই দুধের জন্য গরু পালেন।

দুধের গাই ১০ থেকে ১৬ রুপি

হাতি ৩০০ থেকে ১০০০ রুপি

ডিম ৪০ থেকে ৫০টি -১ রুপি

পায়রা ১০ থেকে ১২ টি ১ রুপি

বাছুর (চর্বি ছাড়া) প্রতিটি ৪ থেকে ৬ রুপি।

জেলাতে যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সেখানে জবাইর জন্য বাছুর পাওয়া শক্ত। ময়মনসিংহেও বাছুর পাওয়া যেতো না।

গন্ধক ১৬ পাউন্ড-১ রুপি।

ঘরে, রবারদিউ জানিয়েছেন, মোম জ্বালানো হয়। আর নেটিভরা সর্ষের তেলের প্রদীপ জ্বালায়।

বিবাহিত না হলে [সিভিলিয়ান] মহিলা ভৃত্য রাখা হয় না। ভদ্রলোকরা পকেটে কখনও টাকা রাখেন না। আসলে রুমাল ছাড়া তারা কিছুই বহন করেন না। আর সেই রুমাল হয় সাদা মসলিনের। মোম কিনতে খরচ হয় প্রতিমণ ৭০ থেকে ৯০ রুপি। প্রতিটি স্টেশনে ডাক ঘর আছে। ওজন ও দূরত্বের ভিত্তিতে মাশুলের হার নির্ধারিত হয়। যেমন, ময়মনসিংহ থেকে কলকাতায় একটি চিঠি পাঠানোর খরচ পাঁচ আনা বা ১০ পেন্স।

ঘরে সিভিলিয়ান বিশ্রাম নিলে পাশের ঘরে সবসময় হরকরা অপেক্ষা করে। সিভিলিয়ানকে শুধু হাঁক দিয়ে বলতে হয় 'কোই হ্যায়'। অনেক নবীন গ্রিফিন এরকম অনেক বাসায় যাওয়ার পর মনে করতে পারে প্রতিবাসায়ই বোধহয় একজন ভৃত্য থাকে যার নাম 'কোই হ্যায়?' ভৃত্যদের সাদা লিনেনের পোষাক দেয়া হয়, অনেক সময় রঙিন কোমরবন্ধ বা স্যাশ ও পাগড়িও দেয়া হয়। কোনো ভোজে প্রতিজনের পেছনে দু'জন খিদমতগার থাকে। অর্থাৎ ২০ জনের ভোজ হলে ঐ কক্ষে ৬০ জন থাকে।

॥ ৬ ॥

ঔপনিবেশিক প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কেও আমরা জানতে পারি রবারদিউর লেখা থেকে। রবারদিউ জানিয়েছেন, "বাংলা খুব জনবহুল"। সরকার থেকে ম্যাজিস্টেটদের কাছে চিঠি এসেছিলো প্রতি জেলার লোকসংখ্যা জানাতে, ময়মনসিংহের ম্যাজিস্ট্রেট জানিয়েছিলেন, জেলার লোকসংখ্যা ১,৯০০,০০০। কিন্তু জেলার আয়তন ও জনসংখ্যার তুলনায় এর রাজস্ব খুবই কম। বছরে সাত লাখ টাকার বেশি নয়। আসলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় এই হিসাব বা বন্দোবস্ত করা হয়েছিলো, যা এখন [১৮০৩] বদলাবার উপায় নেই। অনেক জমিদারের বন্দোবস্ত করা হয়েছে কম এবং তাতে যে তারা অখুশি নয় বলাই বাহুল্য।

প্রতিটি সিভিল স্টেশনে ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে কিছু সৈন্য থাকে। সিভিল স্টেশন রক্ষার জন্যই যে তাদের রাখা হয় তা নয়, কারণ বাংলা বেশ নিরাপদ জায়গা। এদের রাখা হয় কয়েদীদের পাহারা দেয়ার জন্য, জেল বা রেকর্ড রুম রক্ষার জন্য। এই মিলিটারিরা একজন নেটিভ অফিসারের অধীন। এরা নিয়মিত বাহিনীর সেপাই নয়, বিশেষ প্রয়োজনে এদের সৃষ্টি হয়েছে। এদের বলা হয় সেবুন্দি। ময়মনসিংহে এদের সংখ্যা ২৫০। আর ৩০ জন যুক্ত কালেক্টরের অফিসের সঙ্গে। তাদের প্রধান কাজ টাকা-পয়সা পাঠানোটা দেখাশোনা করা। রবারদিউ সেবুন্দিদের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করেননি। তাঁর মতে, সেবুন্দিরা হচ্ছে অকর্মণ্য, বিশৃঙ্খল একদল স্কাউন্ড্রেল। "এ দেশে আদালতের ক্ষমতার ব্যাপারটা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না", লিখেছেন রবারদিউ। কলকাতার সুপ্রিমকোর্ট

শুধুমাত্র ইংরেজ আইনের অধীনে সব বিচার করে এবং এর ক্ষমতা শুধু ফোর্ট উইলিয়ামের ফ্যাক্টরি ও টাউনের ওপর। এর বিচারকদের নিয়োগ করেন রাজা [ব্রিটেনের] এবং কোম্পানির সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক নেই। "আমরা যারা কোম্পানির চাকর এবং যাদের বিচারসংক্রান্ত কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে, তারা হিন্দু ও মুসলমানদের শাস্ত্র ও কোরানকে ভিত্তি করে বিচার করি। অবশ্য সকাউন্সিল গবর্নর জেনারেল যেসব আইন জারি করেছেন সেগুলোর আলোকেই বিচার করতে হয়।" লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ সালে 'নেটিভদের উপকারার্থে' এই ব্যবস্থার প্রচলন করেন। ওয়েলেসলি নির্বাহী থেকে আইন বিভাগকে আলাদা করে এর উন্নতি সাধন করেন।

ভারতে কোম্পানি অধিকৃত অঞ্চলগুলোকে শাসনের সুবিধার্থে বেশকিছু অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে, যেগুলোকে বলা হয় জিলা। ইংল্যান্ডের একেকটি কাউন্টির সমান হবে এগুলো। জেলা শাসন করেন একজন সিভিল সার্ভেন্ট, যাঁকে জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাও দেয়া হয়েছে। বিচারকার্যে তাঁকে সহায়তা করেন একজন মুসলমান কাজী ও একজন হিন্দু পণ্ডিত। হিন্দু ও মুসলমান আইন ব্যাখ্যা করাই তাঁদের কাজ। পরবর্তীকালে, অর্থাৎ ১৮৬৪ সালের এগারো আইন অনুযায়ী এ ব্যবস্থা বিলুপ্ত করা হয়। এছাড়া তার অফিসের সঙ্গে যুক্ত আছে রাইটার [কেরানী], রেকর্ডকিপার প্রভৃতি। এরা সবাই দেশীয়। সিভিল কোর্টে যুক্ত থাকেন একজন সিভিল সার্ভেন্ট, যিনি রেজিস্ট্রার হিসাবে পরিচিত। ৫০০ রুপির নিচের মামলা মীমাংসা করার ক্ষমতা তাঁর আছে। জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে আছে কাজী, যারা ৫০ রুপির নিচের মামলা মীমাংসা করতে পারে। তবে বিচারের ক্ষেত্রে জজের ক্ষমতাই সব। রদ্বারদিউ আদালতের বিচার প্রক্রিয়ারও বর্ণনা দিয়েছেন এবং একটি মন্তব্য করেছেন, যা সব সিভিলিয়ানই করেছেন বিভিন্ন সময়। তা হলো– নেটিভরা হচ্ছে মামলাবাজ।

জজের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা চলে প্রভিন্সিয়াল কোর্টস অব আপিলে। এ আদালতে বিচারকের সংখ্যা তিন; বেঞ্চ গঠিত হয় দু'জনের দ্বারা। ভারতে এ ধরনের ছ'টি কোর্ট আছে– কলকাতা, ঢাকা, পাটনা, মুর্শিদাবাদ, বেনারস এবং ব্রেইলিতে।

এরপর আছে কোর্ট অব সার্কিট। প্রত্যেক জেলা স্টেশনে বছরে দু'বার এর এজলাস বসে। এখানে কোর্ট অব আপিলের একজন বিচারকই বিচার করেন। সর্বোচ্চ আদালত হচ্ছে নিজামত আদালত (সুপ্রিমকোর্ট থেকে আলাদা), যার বিচারকের সংখ্যা তিন। তাঁরা সিভিল-ক্রিমিনাল দু'ধরনের বিচারকাজই সমাপন করতে পারেন। নিজামত আদালতের রায়ে সন্তুষ্ট না হলে ব্রিটেনের রাজার কাছে [সকাউন্সিল] আপিল করা চলে।

কোম্পানি এভাবেই ভারতে বিচারকার্য চালাচ্ছে। বিচার ছাড়া অন্যান্য কার্য নির্বাহের জন্য আছে বোর্ড অব ট্রেড, বোর্ড অব রেভেনিউ এবং মেরিন বোর্ড। কালেক্টরের কাজ রাজস্ব আদায় করা। কোম্পানির বিনিয়োগ দেখে কমার্শিয়াল রেসিডেন্ট। যেসব এলাকায় কোম্পানির বিনিয়োগ আছে সেসব জায়গাতেই এই রেসিডেন্ট আছে। সল্ট এজেন্টের কাজ হচ্ছে কোম্পানির একচেটিয়া লবণ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা। আফিম এজেন্টের কাজ কোম্পানির একচেটিয়া আফিম ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করা।

জেলা জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের বেতন বছরে ২৪,০০০ রুপি, সর্বোচ্চ ৩৬,০০০ রুপি। কোর্ট অব আপিল এবং সার্কিটের তিনজন বিচারক, সিনিয়রিটি অনুযায়ী বেতন পান বছরে ৪৫,০০০, ৪০,০০০ এবং ৩৫,০০০ রুপি। প্রত্যেক কালেক্টরের বেতন সমান, মাসে ১,৫০০ রুপি। তবে কোনও কোনও এলাকার কালেক্টরের আয়টা একটু বেশি। কারণ স্ট্যাম্প পেপার, মদের লাইসেন্স ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে ফিস নেয়া হয় তার একটা অংশ কালেক্টর পান। ফলে যে জেলায় এগুলোর বিক্রি বেশি সে জেলার কালেক্টরের আয়ও বেশি। যেমন বেনারসের কালেক্টরের বছরে আয় প্রায় ৪০,০০০ রুপি। কমার্শিয়াল রেসিডেন্টের বেতন মাসে ৫০০ কিন্তু তাঁরাও কোম্পানির বিনিয়োগের ওপর একটি অংশ পান। বিনিয়োগের মাত্রা যে কোনো কারণে হ্রাস পেলে তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। কিন্তু তাঁরা নিজেরাও ব্যবসা করতে পারেন, যে সুযোগ জুডিশিয়াল বা রেভিনিউ বিভাগের কর্মচারীদের নেই।

এছাড়াও রবারদিউ উল্লেখ করেছেন, সরকারি কর, আমদানি-রফতানিও ওপর শুল্ক আদায়ের জন্য কালেক্টর আছেন, যাঁদের পদটিও লোভনীয় বা লাভজনক। সরকারের চার বিভাগের চারজন সচিবও আছেন। রবারদিউ এসব চাকরি বা পদকে উল্লেখ করেছেন 'ক্যাপিটল এ্যাপয়েন্টমেন্টস' হিসাবে।

॥ ৭ ॥

কোম্পানির সার্ভেন্ট বা কোম্পানির চাকুরেদের মধ্যে সহৃদয় সম্পর্ক আছে। ভারতে সেই ফ্রিজিড ফর্ম্যালিটি'টা নেই, যা আছে ইংল্যান্ডে। কারণ এখানে সবাই নিজেকে কোম্পানির ভৃত্য ভাবে এবং মনে করে ব্যবসাবাণিজ্য করে এক সময় সিনিয়রের মতোই সে সচ্ছল হতে পারবে। কিন্তু রবারদিউর মনে হয়েছে, এরা অন্যদের সঙ্গে নাক উঁচু ভাব করে চলে। যেমন দোকানদার যার আচরণ ভদ্র এবং শিক্ষিত বা সেনা সদস্যদের সিভিলিয়ানদের সমাজে প্রবেশাধিকার নেই, যদিও ইংল্যান্ডের শপকিপার বা ভারতীয় শপকিপারদের পার্থক্য অনেক। এখানকার ইংরেজ দোকানদাররা শিক্ষিত, ধনী, ভদ্র। ফলে তাদের সমাজ আলাদা।

অন্যদিকে নেটিভদের সঙ্গেও সামাজিক যোগাযোগ নেই সিভিলিয়ানদের।

কারণ তারা ইউরোপিয়দের স্পর্শ করা কোনো খাবার গ্রহণ করবে না। ফলে নৈশভোজে তাদের ডাকার প্রশ্নই আসে না। রবারদিউ বোঝাতে চেয়েছেন, নৈশভোজেই সামাজিকতাটা হয়। ময়মনসিংহের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, এ ধরনের স্টেশনে মেলামেশাটা সীমাবদ্ধ থাকে তিন-চারজন সিভিলিয়ানের মধ্যেই। প্রাচ্যে একজন ইংরেজ বেশিদিন থাকলে তার মধ্যে একটা পরিবর্তন আসে। ভারতে একজন ইংরেজ গর্বিত, সহিষ্ণু। নিজেকে সে ভাবে বিজয়ী হিসাবে যে বাস করে বিজিতদের মধ্যে। ফলে অন্য সবাইকে, বিশেষ করে নেটিভদের সে অবজ্ঞার দৃষ্টিতেই দেখে। আবহাওয়ার কারণে আলস্যও তাকে প্রভাবিত করে। সে হয়ে ওঠে নির্লিপ্ত, অমনোযোগী। তার অধিকাংশ কাজেই থাকে এক ধরনের অমনোযোগিতা। পরের দিন কী হবে তা নিয়ে সে ভাবে না। তবে সবসময় স্বপ্ন দেখে বৈভবের। কর্মক্ষেত্রে কিন্তু সে ন্যায়ানুগ এবং রবারদিউর মতে, সারা পৃথিবীতে আর কোনো পাবলিক সার্ভিসে এত ইন্টিগ্রেটি নেই। এক কথায় ভারতে একজন ইংরেজ একই সঙ্গে কর্মী ও অলস, অমনোযোগী, কেয়ারলেস, লিবারেল এবং স্বাধীন। কোনো মানুষের ভ্রূকুটিকে সে পরোয়া করে না, কোনো মানুষের হাসিরও তোয়াক্কা করে না। ওপরঅলাদের সে ঈর্ষা করে না, কারণ সে নিজেই এক সময় ঐ জায়গায় পৌঁছবে। তার নিচে যারা কাজ করে তাদেরও তুচ্ছ মনে করে না, কারণ তাদের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটবে। রবারদিউর মতো উনিশ শতকে আর কেউ নিজেদের এমনভাবে তুলে ধরেনি।

৪
পোগসনের চট্টগ্রাম যাত্রা

ব্যারাকপুর থেকে রওয়ানা হয়ে দু'দিন পর অর্থাৎ ১৭ তারিখে পৌছলেন তিনি সুন্দরবনের মোহনায়। পড়ন্ত বিকেলে সুন্দরবন তাকে অভিভূত করলো। লিখেছেন তিনি, "বন ও জলের নিসর্গ যত সুন্দরই হোক না কেন, সারা চরাচর জুড়ে আছে নিঃসঙ্গতা, শব্দহীনতা ও শূন্যতা, এ এক অস্বস্তিকর অনুভব।" অথচ, পোগসনের মনে হয়েছিলো, "যদি এ ভূখণ্ড ইংল্যান্ডের সংলগ্ন হতো, তাহলে দ্রুত পরিশ্রম ও উদ্যমে এ বনপ্রান্তর পরিষ্কার করা হতো, জনবুলের শিঙার প্রবল হুংকার বাঘেরা তাদের গুহা ছেড়ে পালাতো। যদি এ অঞ্চল ভারতের স্বাস্থ্যকর কোনো অঞ্চলে হতো তাহলে আমার কামনা হতো, আয়ারল্যান্ড থেকে আমাদের কয়েক হাজার ভাই এসে এখানে ও আশপাশের জায়গায় যেনো গড়ে তোলে বসতি।

পোগসন আরো লিখেছেন, "ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন বন ও অকর্ষিত বিশাল প্রান্তর। আমাদের দেশতো মৌমাছির চাকের মতো লোকে গিজ গিজ করছে। আয়ার্ল্যান্ডে অসন্তোষ, দাঙ্গা, বিদ্রোহের জন্য বিরাজ করছে দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ। আর এসবের মোকাবেলা করা হচ্ছে বেয়নেট ও ফাঁসি দিয়ে। কতো ভালোই না হতো যদি তাদের অভিবাসন ও উপনিবেশ স্থাপনের জন্য লাঙ্গল কাঁধে এখানে আসতে দেয়া হতো।"

পোগসন লিখেছেন, কর্তাব্যক্তিরা এ ধরনের নীতি নিরুৎসাহিত করতে পারেন কিন্তু দেশ ত্যাগের বাধা দেয়া অসম্ভব, তা চলবেই। নিজের উদাহরণ দিয়ে পোগসন বলেছেন, তাঁর সন্তান সংখ্যা এখন নয়; এটাকে ভিত্তি হিসেবে ধরে একটি হিসেব করা যায়। এই নয়-সন্তানের যদি নয়টি করে সন্তান হয় তাহলে সে সংখ্যা দাঁড়াবে ৮১তে। তাদের আরো ন'টি করে সন্তান হলে, পোগসনের পৌত্র প্রপৌত্রের সংখ্যা দাঁড়াবে ৭২৯-এ। এ হারে বাড়লে, ষাট বছরে সে সংখ্যা হবে ৬৫৬১ জন। ধরা যাক, ভারতে এখন ১০,০০০ ইউরোপিয় আছে। ঐ সংখ্যাকে ভিত্তি ধরলে, চার প্রজন্মে ঐ জনসংখ্যা দাঁড়াবে ৬৫,৬১০,০০০ জন। এর মধ্যে যদি তিন-

চতুর্থাংশ মারা যায়, তা হলেও সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬,৪০২,৫০০ জনে। অবশ্য পোগসন নিজেই স্বীকার করেছেন এ কল্পনাটাও একটু বাড়াবাড়ি ঠেকছে।

সুন্দরবন দিয়ে এগোচ্ছিলেন পোগসন। ২১ ডিসেম্বর ভাবলেন, একটু শিকার করবেন। নামলেন তীরে কিন্তু কিছুই পেলেন না। নৌকোয় ফেরার পথে, এক কুঁড়েতে দেখলেন এক বুড়ির কাছে একটি মুরগি। পোগসন চার পয়সায় মুরগিটি কিনতে চাইলেন। বুড়ি বললো, পাঁচ পয়সা। তাই সই। তবে, পোগসন আক্ষেপ করে লিখেছেন, এদের প্রকাশভঙ্গি দুর্বল। ভাষা বা ব্যাকরণ জ্ঞান প্রায় নেই। কথা বলে দ্রুত, অস্পষ্টভাবে এবং কলকাতা বা তার আশপাশের অঞ্চল থেকে এ ভাষা, বলার ভঙ্গিও আলাদা।

এরপর পোগসন কিছু মাছ কিনলেন। ছয় আনায় তিনি কিনলেন দুইটি রুই মাছ, এক ডজন বড় গলদা চিংড়ি এবং এক ঝুপড়ি পাঁচ মিশেলী মাছ। সারেং দাম ঠিক করেছিলো চার আনা। পোগসন দু'আনা বেশি দেওয়াতে সে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলো। পোগসন মাছগুলো কিনেছিলেন সকালের নাশতা, মাঝি মাল্লার খাওয়ার জন্য। সূর্যাস্তের সময় তারা পেরুলেন খুলনা, তারপর পুবদিকে চলতে লাগলেন। খুলনা শহরের ঠিক অন্যপ্রান্তে চোখে পড়লো ইংরেজ রীতির একটি পাক্কা বাড়ি। এ বাড়ি সম্পর্কে তেমন কোনো কৌতূহল দেখাননি পোগসন। হতে পারে, ঐটে ছিলো কোনো নীলকরের বাড়ি।

খুলনা থেকে চাটগাঁর যাবার পথে পোগসন মন্তব্য করেছেন, "আমি বুঝে উঠতে পারি না, এরকম একটি দেশে যেখানে নদী ভরা মাছ এবং মাছ ধরাই অধিবাসীদের প্রধান কর্ম সেখানে লোকে কেনো খাবার পায় না। আমার মনে হয় না আমি এর আগে কখনো এতো সম্পন্ন, ধনী ও সুন্দর দেশ দেখেছি। মুসলমানরা ঠিকই বলে যে, দেশটি জান্নাত উল বিলাদ বা দেশসমূহের স্বর্গ।" পোগসন লিখেছেন, প্রয়োজনীয় কাঠের চেয়েও বেশি কাঠ আছে এ দেশে। ফসলের ক্ষেত ধানে ভরা, নদী মাছে আর গাছ মদে। এখানে বোধহয় পোগসন খেজুর বা তালের রসের তাড়ির কথা বুঝিয়েছেন। "এর চেয়ে মানুষের বেশি আর কি চাইবার আছে?" প্রশ্ন রেখেছেন পোগসন।

পোগসন উল্লেখ করেছেন যে বাংলার প্রায় পুরোটাই জঙ্গল।

যা হোক, পোগসন কেশবপুরে এক বাজারে দেখলেন পান বিক্রি হচ্ছে। ডিঙি দিয়ে এক ভৃত্যকে পাঠালেন বাজারে। সে দশ পয়সা দিয়ে দুই ফুট লম্বা একটি রুই মাছ কিনে আনলো।

২৪ তারিখ পোগসন পৌঁছলেন নলছিটি, তার তিন দিন পর হাতিয়া। লিখেছেন তিনি, হাতিয়ায় ঐ সময় তার চোখে পড়েছে মাত্র একটি গ্রাম ও কয়েকটি গাছ; উত্তর ও পশ্চিমে কোনো জমি নেই। কূল থেকে দুই মাইল পর্যন্ত পানির

গভীরতা আড়াই কিউবিট থেকে আধা ফ্যাদম। দূর থেকে তিনি দেখেছিলেন চারটি তালগাছ এবং তার মনেও হয়েছিলো গ্রামের সংখ্যা একাধিক কিন্তু নৌকায় লোকজন জানালো, না, গ্রাম একটিই।

তারপর পোগসন পৌঁছলেন সন্দ্বীপ। তীরে পৌঁছতেই একজন কিছু মাছ নিয়ে এল। পোগসন পয়সা দিতে চাইলে সে নিলো না, বললো, পয়সা চলবে না। বাধ্য হয়ে পোগসন তাকে একটি সিকি দিলেন। সিকিটা সে নিয়ে নিলো কারণ এতে তার মাত্রাতিরিক্ত লাভ হলো। এরপর সে আরো কিছু মাছ আনলো। পোগসন তাকে পয়সা, চুরুট, ব্র্যান্ডি দিতে চাইলেন। কোনোটাই তার পছন্দ না। তার পছন্দ হলো একটি লাল টুপি। পোগসন তাকে আরো কিছু পুরনো কাপড় দিয়ে বিনিময়ে কিছু মাছ যোগাড় করলেন এবং তারপর তা বিলিয়ে দিলেন নৌকোর লোকজনদের।

২৯ ডিসেম্বর ধলপহরে নোঙ্গর তুলে পোগসন রওয়ানা হলেন চাটগাঁর দিকে। সন্দ্বীপ চলে গেল চোখের আড়ালে। পাহাড়ের সারি তখনও মনে হচ্ছিল বিশ মাইল দূরে। মৃদুমন্দ হাওয়া পোগসনদের নিয়ে যেতে লাগলো তীরের দিকে, পানির মাপ যেখানে মাত্র এক ফ্যাদম। বালুচর এড়াবার জন্য সোজা না গিয়ে ঘুর পথে তারা পৌঁছলেন চাটগাঁ নদীতে। পোগসন নদীর নাম উল্লেখ করেছেন চাটগাঁ নদী। মনে হয় এটি কর্ণফুলী। ডানে চোখে পড়লো তার একটি পাহাড় যেখানে আছে পতাকা উড়াবার জন্যে উঁচু একটি মঞ্চ। বিকেল হয়ে এল। বেশকিছু স্তূপ ও অন্যান্য নৌযান পেরিয়ে রাতের বেলা নোঙ্গর করলেন মঘঘাটে।

মঘঘাট এখন পরিচিত চানবালি ঘাট নামে। আরাকান শাসনামলে কর্ণফুলীর তীরে আরাকানী বাণিজ্য ও রণতরী যে ঘাটে ভিড়তো সেটি পরিচিত ছিলো মঘঘাট নামে। ঐ আমলে আরাকানী মঘরাই প্রাধান্য বিস্তার করেছিলো। চট্টগ্রাম বন্দরে জেটি স্থাপনের আগে, এই মঘঘাটেই কলকাতা-চট্টগ্রাম যাতায়াতকারী নৌকো বা 'জাহাজ' ভিড়তো। আরো পরে, চানবালি স্টিমার কোম্পানির জাহাজ ভেড়া শুরু করে মঘঘাটে এবং তখন থেকে এর নাম হয়ে যায় চানবালি ঘাট।

পরদিন, অর্থাৎ ত্রিশ তারিখে, ক্যান্টনমেন্টের অদূরে এক 'নালা' দিয়ে পোগসন পৌঁছলেন তাঁর গন্তব্যে। সেখানে অপেক্ষা করছিলো তাঁর বন্ধুর বাগি। বাগিতে চেপে পৌঁছে গেলেন বন্দর বাড়ি যেখানে প্রতিদিন তাঁর প্রতি যত্ন ও আপ্যায়নের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

পোগসন যে নালার কথা উল্লেখ করেছেন সেটি খুব সম্ভব সংকীর্ণ কোনো খাল। মঘঘাটে নিজস্ব নৌকা রেখে কোনো ছোট নৌকা করে সম্ভবত তিনি খালপথে গন্তব্যে পৌঁছেছিলেন। সে সময় ক্যান্টনমেন্ট কোথায় ছিলো তার উল্লেখ করেননি পোগসন। আবদুল হকের তথ্য অনুযায়ী এখন যেখানে সব রেলওয়ে

স্টাফ কোয়ার্টার অবস্থিত সেখানেই ছিলো ক্যান্টনমেন্ট যা পরিচিত নেজামত পল্টন নামে। মুসলমান শাসনামলেও এখানেই ছিলো সেনাছাউনি।

পোগসন লিখেছেন, "চট্টগ্রাম খুব রোমান্টিক এবং চমৎকার জায়গা; পাশাপাশি পাহাড়ে সব বাড়ি, পাহাড়গুলো সমুদ্র থেকে শ'খানেক ফুট উঁচু। পাহাড়ের ঢাল, উপত্যকা সুন্দরভাবে সুপারি, আম আর নাগেশ্বরে ভরা। বাতাস ঠাণ্ডা,পরিষ্কার, নির্মল। জলো জায়গা থেকে পার্থক্যটা স্পষ্ট।"

পাহাড়ে ওঠা ও নামার জন্যে যে বাহন ব্যবহৃত হয় তা পুরনো এক সেডান, জানিয়েছেন পোগসন, খুব সম্ভব তা পর্তুগীজ আমলের ব্যবহৃত কোনো সেডানের প্রতিলিপি।

রোমান্টিক সব পাহাড়ের মাঝে আছে বন্য জমি, মরকত উপত্যকা এবং রাজকীয় এমফিথিয়েটার; আর আছে কুলকুল বয়ে যাওয়া ঝরনা। অবশ্য একেকটির পানি একেক রকম, গুণগত তফাৎ আছে কিন্তু সাধারণভাবে খুবই ভালো। কাতালগঞ্জের ঝরনাতে খানিকটা খনিজ মেশানো। যদি এ বিষয়ে ভালোভাবে তত্ত্ব তালাশ নেয়া যায় তাহলে হয়তো মূল্যবান আবিষ্কার হতে পারে।

কাতালগঞ্জের পত্তন মুঘল আমলে। মনে করা হয়, এ অঞ্চলেই মুঘলরা প্রথমে চট্টগ্রাম শহরের পত্তন করেছিলেন। অধ্যাপক করিমের মতে, কাতাল পীরের নামানুসারে কাতালগঞ্জ নামের উৎপত্তি। তাঁর পুরো নাম সৈয়দ সদর উদ্দিন রাজু কত্তাল বোখারী। ১৪৫২ সালে তিনি পরলোকগমন করেন পাকিস্তানের উচে। তিনি চাটগাঁ এসেছিলেন বলে এমন কোনো প্রমাণ নেই এবং কাতালগঞ্জে কাতাল পীরের মাজারটিও নকল। আবদুল হক মনে করেন, মুঘলরা যখন এ অঞ্চলে আদি শহর পত্তন করেন তখন এর কোনো নাম ছিলো না। যে কারণে, ক্যাডেস্টাল জরিপে এ অঞ্চলকে 'নিজ শহর' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কাতালগঞ্জ নামটির উদ্ভব এখানে তাঁর স্মারক মাজার নির্মাণের মাধ্যমে। পোগসন যখন আসেন চাটগাঁয় তখনও অঞ্চলটি পরিচিতি কিন্তু কাতালগঞ্জ নামে।

কাতালগঞ্জের ঝরনার বিবরণ দিতে গিয়ে পোগসন উল্লেখ করেছেন, ঝরনার বাইরের দিকে মাটি বালুময়। তা ছাড়া ঘন ঘন ভূমিকম্পের ফলে মাটিতে আগ্নেয়গিরির উপাদানও দেখা যায়। বাড়বকুণ্ড এবং আশপাশের অনেক ঝরনা থেকে যে বাষ্প উড়ে তা এই মাটির নিচে অগ্ন্যুৎপাতের জন্যেই। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেয়া যায় ভূগর্ভে আছে বিস্তৃত পরিমাণ কয়লা।

"আমাকে বলা হলো", লিখেছেন পোগসন, "ছয় সপ্তাহের মধ্যে এগারোটি ভূমিকম্প হয়েছে। এরমধ্যে দু'টিতো ভয়ানক। ঘরের দেয়াল ফেটে গেছে এক কোণ থেকে আরেক কোণ পর্যন্ত। বাকিগুলো অবশ্য স্বল্পক্ষণের স্বল্প মাত্রার।"

"পাহাড়ে যে পরিমাণ অচেনা ঝোপঝাড় আর উদ্ভিদ তা উদ্ভিদ গবেষণার

জন্য লোভনীয় এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে বাগানের জন্যে এ সব লুফে নেয়া হবে যদিও বাগান বিষয়ক চিন্তা অনুপস্থিত। স্যার উইলিয়াম জোনস লিখেছিলেন, চাটগাঁর পাহাড় ঢাকা গোলমরিচের লতায় আর কফি গাছের ফুলে উজ্জ্বল।"

পোগসন শুনেছেন, আরাকানের জঙ্গলে নাকি চা গাছ পাওয়া যায়। তার মানে, আশপাশে চা চাষের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। তাঁর মনে হয়েছে, চাটগাঁয় একটি পাবলিক গার্ডেন করলে অনেক সুবিধা হবে। এর পাহাড়ের ঢালে উপত্যকায় করা যাবে চা, কফি আর মশলার চাষ। লিখেছেন পোগসন "আমাদের সাম্রাজ্যের এই ইন্টারেস্টিং অংশে যোগ হবে নতুন মূল্য। ঝোপের ছায়ায় হচ্ছে আনারস। আর কাঁঠালতো মনে হয় বারোমাসেই হয়। প্রায় সব জায়গায়ই চোখে পড়ে বন্য নীল চারা। চাটগাঁর উদ্ভিদ ও খনিজ সম্পর্কে রচনা করা যায় বিশাল গ্রন্থ। কিন্তু আমার সে ক্ষমতা বা জ্ঞান নেই।"

পাহাড়ে বাস করে চিতা, জানিয়েছেন পোগসন। চিতা ছাড়াও আছে সেখানে অজগর আর শুয়োর। আর যে পাহাড়গুলো একটু দূরে সেগুলোতে থাকে বাঘ, হাতি ও নানারকম দুষ্পাপ্য সুন্দর পাখি। যেমন 'পিকক ফিজান্ট' আকার যার বড়সড় মুরগির মতো। তবে, সাধারণ 'পি-ফাউল' [মোরগ] থেকে এর পালকের উজ্জ্বলতা কম। 'ক্যালকাটা ম্যাগাজিন' লিখেছিলো, জানিয়েছেন পোগসন, যে চট্টগ্রাম উপকূলে টেনাসেরিমের যে বন্য গরু পাওয়া যায় তার উচ্চতা প্রায় তের হাত এবং চমৎকার লাল রংয়ের। শুধু পেটের দিকটা সাদা। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের গরুর মতো এর কোনো কুঁজ নেই। দেখতে যদিও এটি ইংল্যান্ডের লাল গরুর মতো কিন্তু তার চেয়েও সুন্দর। চাটগাঁর ষাঁড়ও বেশ চমৎকার। কপালটা শুধু সাদা। তবে, বন্য গরু শিকার করা খুব মুশকিল কারণ, এদের শ্রবণ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় অত্যন্ত প্রখর। যখন এরা চরে বেড়ায় বা জলায় পানি খেতে যায় তখন সব সময় দু'তিনটি গরু আলাদাভাবে দাঁড়িয়ে অন্যগুলোকে পাহারা দেয়। নাকে সামান্য রকম সন্দেহজনক কোনো গন্ধ পেলেই দৌড় দেয় এবং ঘটনা এতো দ্রুত ঘটে যে তা বিস্ময়কর। শিকারিদের মতে, পূর্ণবয়স্ক এই গরু জ্যান্ত ধরা মুশকিল। তবে, মাঝে মাঝে বয়সী গরু মেরে বাছুর ধরা হয়।

পোগসন লিখেছেন, চাটগাঁর উৎপাদিত প্রধান পণ্য হলো কাঠ, মোম, তুলা এবং ডাল। কাঠের মধ্যে আছে টুন বা এশিয়াটিক মেহগনি; চক্রশী বা এক ধরনের শির ওঠা কাঠ। আছে শক্ত আঁশঅলা জারুল। নদীতে স্লুপ ও অন্যান্য জলযান দেখে তার মনে হয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা ভালোই। "একমাস্তুলী কিছু জাংক দেখলাম", লিখেছেন পোগসন, "যা মালদ্বীপ থেকে নিয়ে আসে নারকেল এবং তেল, ছোবড়া, কড়ি ও শাঁখা।"

চাটগাঁর বেসামরিক কাঠামো দেখে তাঁর মনে হয়েছিলো এখানকার রাজস্ব

বোধহয় বেশি। কিন্তু তুলনা করে পোগসনের মনে হয়েছে, রাজস্ব বরং কম। কারণ, চাটগাঁয় তখন ছিলেন একজন কমিশনার, একজন জজ, একজন ম্যাজিস্ট্রেট, একজন কালেক্টর এবং তিনজন জুনিয়র সিভিলিয়ন। চাটগাঁ থেকে সে সময় আদায়কৃত রাজস্বের একটি হিসাব দিয়েছেন পোগসন–

	সিক্কা টাকা
জমি থেকে বার্ষিক রাজস্ব	৫,২২,০০০
নুনের ওপর শুল্ক	১,০০,০০০
পঞ্চত্র বা কাপড়ের ওপর শুল্ক	২৬,০০০
আবকারি বা মদের ওপর শুল্ক	৩০,০০০
কার্পাস বা তুলার ওপর শুল্ক	৯,০০০
সিক্কা টাকা	৬,৮৭,০০০

পোগসন জানাচ্ছেন, চাটগাঁয় তখন ছিলো একটি রোমান ক্যাথলিক গির্জা যা শ্রীরামপুরের মিশনারীদের অধীন। দেশীয় খ্রিস্টানের সংখ্যা ছিলো কয়েকশো। ছিলো মোহাম্মদ ইয়াহিয়া স্থাপিত একটি কলেজ যা পরিচালিত হচ্ছিল তাঁর বংশধর মখলুকুর রহমানের তত্ত্বাবধানে। রহমান তাঁকে জানিয়েছিলেন, কলেজে সে সময় আরবি ও ফার্সি শিখছিলো প্রায় একশ' চল্লিশ জন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চট্টগ্রামে সপ্তদশ শতকের শুরুতেই ক্যাথলিক ধর্মযাজকরা ধর্মপ্রচার শুরু করেন, দেশীয় স্বল্পসংখ্যকে ধর্মান্তরিতও করতে পেরেছিলেন, স্থাপন করেছিলেন গির্জা। পোগসন যে মোহাম্মদ ইয়াহিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন তিনি আসলে পরিচিত মীর ইয়াহিয়া বা এহিয়া নামে। অনুমান করা হয় যে, নবম শতকে তাঁর পূর্ব পুরুষ এসেছিলেন আরব থেকে বণিক হিসেবে। এ অনুমানের ভিত্তি তেমন সুদৃঢ় নয়। তবে, তথ্যের ওপর নির্ভর করে বলা যায় সৈয়দ আবদুল গণি নামে এক ব্যক্তি সম্রাট থেকে মাদ্রাসা ও মসজিদ নির্মাণের জন্যে কিছু জমি পেয়েছিলেন। তাঁর ছেলের নাম আবদুর রশীদ এবং তাঁর দৌহিত্র মীর ইয়াহিয়া। চাটগাঁর কাজীর দেউরি পরিবার তাঁর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

এখন যেখানে হাজী মোহম্মদ মোহসীন কলেজ, সে পাহাড়ে ১৭৫০ সালে মীর ইয়াহিয়া একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পোগসন এই মাদ্রাসাটিই দেখেছিলেন। ১৮৭১ সালে এই মাদ্রাসা নর্মাল স্কুলে এবং ১৯১৬ সালে এম ই বা মিডল স্কুলে রূপান্তরিত হয়। ১৯৬৬ সালে তা উন্নীত হয় জুনিয়র হাইস্কুলে, এখন তা চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় নামে পরিচিত।

পোগসন লিখেছেন, মি. এস যে পাহাড়ে থাকেন, সে পাহাড়টি আভার সঙ্গে যুদ্ধের সময় সুরক্ষিত করা হয়েছিলো। আভা হচ্ছে বার্মা। ঐ পাহাড় থেকে পুরো বসতির চমৎকার দৃশ্য উপভোগ করা যায়। শুধু কাচারি আর এ পাহাড় থেকেই

সমুদ্র দেখা যায়। সমুদ্র আর পাহাড়ের দূরত্ব বিবেচনা করলে ব্যাপারটি বিস্ময়কর বৈকি।

পাহাড় থেকে পোগসন কি দেখেছিলেন তার বিস্তৃত বর্ণনা অবশ্য তিনি করেননি।

ঝিনুক খাবার খুব শখ ছিলো পোগসনের। কিন্তু যা মনে করেছিলেন চাটগাঁর ঝিনুক তেমন ভালো নয়। আর এগুলো কেউ কাঁচা খেতেও চায় না, কারণ অনেকের ধারণা এভাবে খেলে কলেরা হয়। পোগসন জানিয়েছেন, চাটগাঁয় প্রচুর মোরগ পাওয়া যেতো। কিন্তু সেনাবাহিনী আসার পর তা হ্রাস পেয়েছে। দেশী খ্রিস্টানরা টার্কি পেলে পুষে বিক্রির জন্যে পাঠায় কলকাতা।

চাটগাঁর লোকজন লাঠির ডগায় বোঝা ঝুলিয়ে তারপর লাঠিটা কাঁধে রেখে পথে চলে। আসলে, চাটগাঁ নয়, মনে হয় গ্রামাঞ্চলেই হালকা বোঝা নিয়ে পথ চলার ঐটেই ছিলো ধরন। দূরত্বটা বোঝায় সময়ের মাপে। ধরা যাক কেউ জিজ্ঞেস করলো– 'কত দূর?' উত্তরে হয়ত বলবে, আধঘণ্টা বা একঘণ্টার পথ। তারা ধরে নেয় এক ঘণ্টায় প্রায় চার মাইল পথ হাঁটা যায়। আর জলপথের দূরত্ব নির্ণয় করে জোয়ার ভাটার সময়ে।

১৮৩১ সালের পহেলা জানুয়ারি ভোরে হঠাৎ প্রচণ্ড ভূমিকম্পে জেগে উঠলেন পোগসন। কম্পন স্থায়ী ছিলো আধমিনিট। যা হোক, ভূমিকম্পের অভিজ্ঞতার পর হাতিতে চড়ে তিনি গিয়েছিলেন সুলতান বায়েজিদের মাজারে। সুলতান বায়েজিদ সম্পর্কে স্থানীয়ভাবে তিনি যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তা হলো–

সুলতান বায়েজিদ জন্মেছিলেন খোরশানের বোস্তামে। বোস্তামের রাজা ছিলেন তিনি কিন্তু সাধুর শান্ত জীবনের জন্যে তিনি ত্যাগ করলেন রাজকীয় বিলাস এবং বারোজন আউলিয়াসহ এসে পৌঁছলেন চাটগাঁয়। তাঁদের চাটগাঁ আসাটা পরিদের রাজা জীনরা মেনে নিতে পারেনি। তারা চাইলো সুলতান যেন অনুচরসহ তখনি ত্যাগ করেন চাটগাঁ। সুলতান বায়েজিদ খুব বিনীতভাবে অনুরোধ জানালেন একটি বাতির আলোয় যতটুকু জায়গা আলোকিত হবে ততটুকু জায়গা তাকে দিতে যাকে বাংলায় বলা হয় চাঁট বা চটি। তাদের অনুমতি পেয়ে নিজের মূত্র দিয়ে তিনি জ্বালালেন একটি বাতি। কিন্তু আশ্চর্য! বাতির আলো এমন ছড়িয়ে পড়লো যে তার ছটা গিয়ে পৌঁছলো টেকনাফ পর্যন্ত। অর্থাৎ প্রায় একশ' কুড়ি মাইল। জিনরা এসব দেখে ভয়ে পালালো। এ পরিপ্রেক্ষিতে অঞ্চলটির নাম রাখা হলো চাটিগ্রাম বা চাটিগাও, চলতি ভাষায় চাটগাঁও বা আলোর গ্রাম।

তবে, জিনদের সঙ্গে সুলতান বায়েজিদের সংঘর্ষ হয়। তিনি তাদের পরাজিত করেন। তাঁর সেই শ্রমময় কর্মকাণ্ডের সময়, এখন যেখানে তাঁর মাথায় সেখানে তাঁর একটি স্মৃতি স্তম্ভ। কানফুল বা কর্ণফুল পড়ে যায় নদীতে, সে নদী

কর্ণফুলী। আরেকবার তাঁর হাত থেকে একটি শাঁখ পড়ে যায় আরেকটি নদীতে যার নাম শংখৌতি বা শংখ।

এসব কাজকর্ম সেরে সুলতান বায়েজিদ বারো বছরের জন্যে গেলেন গোরচিল্লায়। গোরচিল্লা শেষ করে তা রক্ষণাবেক্ষণ এবং বারোজন শিষ্যের ভরণপোষণ ও তীর্থের জন্যে উপযুক্ত পরিমাণ জমি দান করে তিনি রওয়ানা হলেন হিন্দুস্থানের মুকহানপুরের দিকে। চাটগাঁয় তার স্থান নিলেন শাহ মাদার যিনি পাপমোচনের জন্যে একপায়ে দাঁড়িয়েছিলেন বারো বছর। তারপর তিনিও রওয়ানা হলেন মুকহানপুরের দিকে। তিনি আবার স্মৃতিসৌধ রক্ষার ভার রেখে পেলেন সুলতান বায়েজিদের আরেকজন শিষ্য শাহ পীরের কাছে। সুতরাং সেই পুরনো আমল থেকেই এ জায়গা পবিত্র হিসেবে খ্যাত এবং দূরদূরান্ত থেকে অনেক তীর্থযাত্রী আসেন এখানে। একটি পাহাড়ের ওপর তা অবস্থিত যেখানে পৌঁছানো যায় এক ঝাঁক সিঁড়ি পেরিয়ে। পুরো জায়গাটা যা প্রায় ত্রিশ ফুটের মতো তা আবার ঘেরা পনেরো ফুট উঁচু দেয়ালে। গোরচিল্লার জায়গাটা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বারো থেকে ন'ফুট, এর ঠিক মাথার দিকে আছে কিছু ঝিনুক ও প্রবাল। পাহাড়ের নিচে এক পুকুরে আছে কিছু কচ্ছপ; কতকগুলো তো বিশাল। কোনো ফকির পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে 'মাদারী মাদারী' করে ডাকলে কচ্ছপগুলো পুকুর পাড়ে আসে হাত থেকে খাবার নিতে। পোগসন লিখেছেন, "যাওয়ার পথে কিছুই দেখা গেল না কুয়াশার জন্যে, চাটগাঁ যার জন্যে বিখ্যাত। খানিকপর সূর্যের আলোয় সরে গেল কুয়াশা, চোখের সামনে ভেসে উঠলো রোমান্টিক সব পাহাড় যা ঢাকা ঘন বন্য সবুজে লতায় শুধু তাই নয় চারদিকে আশ্চর্য সুন্দর নিসর্গ চোখে পড়লো– ঘাসের ডগায় শিশির বিন্দু, সকালের প্রথম আলোয় মুক্তোর মতো ঝকঝক করছে, চারদিক সতেজ– সবমিলিয়ে যেন রূপকথার দৃশ্য।"

একমাইল চওড়া এক উপত্যকা দিয়ে ফিরলেন পোগসন। আর প্রতিপদেই সম্মুখীন হলেন মনভুলানো সব দৃশ্যের।

পোগসন বায়েজিদ বোস্তামী সম্পর্কে যেসব জনশ্রুতির কথা উল্লেখ করেছেন তার সঙ্গে এখন পর্যন্ত প্রচলিত জনশ্রুতিসমূহের খুব বেশি হেরফের নেই। তবে, 'মাদারীদের সম্পর্কে অন্য একটি জনশ্রুতিও প্রচলিত। সুলতান বায়েজীদ যখন গভীর সাধনায় মগ্ন তখন দুষ্ট প্রকৃতির কিছু জ্বীন উৎপাত শুরু করে। তখন তিনি তাদের পাহাড়ের নিচে পুকুরে 'গজারী' (গজার মাছ) ও 'মাদারী' (কচ্ছপে) পরিণত করে বন্দি করে রাখেন।"

অধ্যাপক আবদুল করিম অবশ্য মনে করেন, পঞ্চদশ দশকে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা ছিলো অস্থির। রাজা গণেশ এই সময় তাঁর মনিব হামজা শাহর ক্রীতদাস শিহাবউদ্দিন বায়েজীদ শাহকে (১৪১২-১৪১৪) সিংহাসনে বসান।

কিছুদিন পর বায়েজিদও নিহত বা অপসারিত হন। এ সম্পর্কে তিন ধরনের মত প্রচলিত– তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন, রাজা গণেশ তাঁকে হত্যা করেন, রাজা গণেশের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে যান ও নিহত হন। আবদুল করিম লিখেছেন, "আমার মনে হয়, গণেশের চক্রান্তে অতিষ্ঠ হয়ে শিহাব উদ্দিন বায়েজীদ শাহ চট্টগ্রামে পালিয়ে আসেন এবং রাজবেশ পরিত্যাগ করে সুফীর বেশ ধারণ করেন, সত্যি সত্যি আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতা লাভ করেন। আমার মনে হয় নাসিরাবাদস্থ দরগাহটি সুলতান শিহাবউদ্দিন বায়েজিদ শাহের দরগাহ বা কবরগাহ। তিনি শাহও ছিলেন, সুলতানও ছিলেন!"

পোগসন একদিন শহর থেকে চার মাইল দূরে জাফরাবাদ গেলেন স্যার উইলিয়াম জোনসের বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখতে। বাড়ির ধ্বংসাবশেষটি পাহাড়ের সারির একেবারে উত্তরে এবং তার পুরোটা গাছপালায় ঢাকা। পোগসনের মতে, খুব সম্ভব সেগুলো স্যার জোনসেরই লাগানো। শুধু তাই নয়– "পুব দিকের দৃশ্য বন্য ও রোমান্টিক। কুয়াশা না থাকলে পশ্চিম দিক থেকে দেখা যায় সমুদ্র। ঘরের ছাদে জন্মেছে প্রচুর পরিমাণে পিপুল গাছ। গাছের শেকড় আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরেছে দেয়ালগুলো। বাড়ির ভিত্তি গড়া হয়েছে কাঠকয়লা মিশিয়ে যাতে ঘরগুলো শুকনো থাকে। হলঘরটি ৩৫ ফুট চওড়া, ৩০ ফুট প্রস্থে।"

এরপর পোগসন স্যার জোনসের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত এবং তাঁর গুণাবলীর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন ও উদ্ধৃত করেছেন জোনসের পাঁচটি চিঠি। আমরা শুধু যোগ করতে পারি যে, স্যার উইলিয়াম জোনসের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে গিয়ে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা। জোনস পাহাড় সংলগ্ন জাফরাবাদে হয়তো এই বাড়িটি তৈরি করেছিলেন বসবাসের জন্যে।

জাফরাবাদ নামের উদ্ভব খুব সম্ভব চট্টগ্রামের ষষ্ঠ মুঘল শাসনকর্তা নবাব জাফর খাঁর নাম থেকে। তিনি ছিলেন নবাব শায়েস্তা খাঁর পুত্র। জাফর খাঁর বড় ভাই বুজর্গ উমিদ খাঁ মুঘলদের হয়ে চাটগাঁ দখল করেছিলেন।

পোগসন জোনসের যেসব চিঠিপত্র উদ্ধৃত করেছেন সেগুলো ১৭৮৬-৮৭ সালে লেখা। ১৭৮৬ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর একটি চিঠি লিখেছিলেন ডা. প্যাট্রিক রাসেলকে। ডাক্তার রাসেলকে জোনস জানিয়েছেন, গরমের মাসটা কাটাবার জন্যে তিনি ইসলামাবাদ এসেছেন। "চাটগাঁ [বিকৃতভাবে যাকে বলা হয় চিটাগাং] উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের জন্যে স্বর্গ বিশেষ। মনে হয় চারটি নাম থেকে এর উদ্ভব। এতো সুন্দর ছোট পাখি আগে আর আমি দেখিনি। আশপাশের পাহাড় আর বন ভরা অজানা সব উদ্ভিদ আর প্রাণীতে। আসলে একজন দার্শনিকের জন্যে পুরো পূর্ব উপদ্বীপ খুলে দেবে নতুন জগৎ।"

টমাস ক্যালডিক্ট-কে ১৮৮৬ সালের একটি চিঠিতে জোনস জানিয়েছেন, তাঁর

ও তাঁর স্ত্রীর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে তিনি ভারতের মন্টপেলিয়ার চাটগাঁয় যাচ্ছেন। সেখানকার পাহাড় সব গোলমরিচের লতায় ঢাকা, আর কফিগাছের কলিতে চারপাশ ঝলমলে। "যদি জায়গাটি বর্ণনা দিতে চাই তাহলে একটি বই লিখতে হবে; আমি শুধু লিখছি ছোট একটি চিঠি।"

পোগসন এরপর জোনসের লেখা কিছু চিঠি, আরাকান সম্পর্কিত ইতিহাস উদ্ধৃত করেছেন যা এ নিবন্ধের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক নয়। তবে, পোগসন, জোনস সম্পর্কে আগ্রহী শুনে চাটগাঁর একজন সদর আমিন উবায়েদ উল্লাহ তাঁর কয়েকজন সহকর্মী নিয়ে পোগসনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। আরবীতে তারা কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেছিলেন।

এরিমধ্যে পোগসন একদিন গেলেন পীর বদরের মাজার দেখতে। বর্তমানে বক্সির হাট থেকে জেল রোড পর্যন্ত যে রাস্তা গেছে তার পুব পাশে, বক্সির হাট সংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি টিলার ওপর অবস্থিত বদর শাহর মাজার যাকে পোগসন বলেছেন পীর বদরের মাজার। আবদুল হক লিখেছেন, "বদর শাহর টিলাটি এখন একটি বিচ্ছিন্ন টিলা মনে হলেও প্রাচীনকালে এটা মুসলিম হাইস্কুল টিলা থেকে মেট্রোপলিটন পুলিশ সদর দপ্তর ও জেলখানা টিলার অংশ ছিলো। জেল রোড তৈরি করার সময় সদর শাহর টিলা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ইংরেজ আমলে এই পাহাড় মারকট সাহেবের পাহাড় নামে খ্যাত হয়।" তিনি জানিয়েছেন, চারজন পীরকে চাটগাঁর অভিভাবক হিসেবে মনে হয়, এরমধ্যে বদর শাহ শীর্ষস্থানে।

পোগসনকে একটি পাথর দেখিয়ে বলা হলো বদর শাহ এখানে বসতেন। একটি শিলালেখও দেখেছিলেন যা অস্পষ্ট। মাজারের কাছে একটি মসজিদ, সেখানেও আছে গ্রানাইট পাথরের অস্পষ্ট একটি শিলালেখ। এর খানিকটা দূরে আছে মহম্মদ ইয়াসিন খানের মসজিদ। এই মসজিদের ফটকেও আছে একটি শিলালেখ যাতে উল্লেখ করা হয়েছে ১১৩৬ হিজরীতে তৈরি করা হয়েছে মসজিদটি।

মসজিদের উত্তরের কক্ষে রাখা আছে হজরত মুহম্মদ (স.) এর ডান পায়ের দু'টি ছাপ। ছাপ তোলা হয়েছে পাথরের ওপর। হাজী মুহম্মদ জাফর এই পায়ের ছাপ এনেছিলো আরব থেকে। ক্ষুদ্র একটি ঝরনা থেকে পানি ঝরছে সেই পাথরের ওপর। পোগসন উল্লেখ করেছেন, একই জায়গায় টাঙ্গানো রয়েছে জীর্ণ একটুকরো কাপড় পরদার মতো। লোকে বলে, এটি নাকি রসুলের কবরের গিলাফ। এই কাপড়ের টুকরোর ওপর অনেকে কাগজে তাদের মানত লিখে গেঁথে রেখেছে। হাকিমুল্লাহ নামে একজনের আবেদনে লেখা রয়েছে রসুল যেন তাঁকে আরবী ও ফার্সি আরো ভালো করে আয়ত্ত করার মতো ক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করেন, শুধু তাই নয়, সে যেন ভালোভাবে তা লিখতে পারে। আমির উদ্দিন নামে একজনের

আবেদনও প্রায় একই রকম। রাবেয়া বিবির আবেদন, তিনি যেন রসুলের জন্যেই জীবন উৎসর্গ করতে পারেন।

মসজিদের মোতওয়াল্লী শেখ তোফেল আলী পোগসনকে জানালেন যে, মহম্মদ ইয়াসিন পরলোকগমন করেন মুর্শিদাবাদে। মহম্মদ শাহের সময় ১১৩৬ সালে তিনি নির্মাণ করেছিলেন মসজিদটি এবং এ মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে রসুলনগর পরগনা রাজকীয় ফরমান বলে দেয়া হয়েছিলো। মোতওয়াল্লীর পূর্বপুরুষ শেখ মহবতউল্লাহ ও শেষ আরামউল্লাহ পরবর্তীকালে দ্বিতীয় আলমগীর ও শাহ আলম থেকে পুনর্বার সেই ফরমান জারি করান। ইংরেজ কোম্পানি এখন এটি অধিগ্রহণ করেছে, তবে প্রতিমাসে কালেক্টরের মারফতও সরকার মোতওয়াল্লীকে সামান্য কিছু অর্থ সাহায্য করেন। সেই অর্থের পরিমাণ এতো সামান্য যে তা দিয়ে মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব নয়। পোগসন রাজকীয় ফরমান দুটি দেখে তার বিস্তৃত বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন।

হামিদুল্লা খাঁ'র 'তাওরিখ-ই ইসলামাবাদ' থেকে ওহীদুল আলম এ মসজিদ সম্পর্কে একটি বিবরণ দিয়েছেন। বিবরণটি পোগসনের বিবরণের কাছাকাছি, তবে পার্থক্য আছে খানিকটা। তিনি জানাচ্ছেন সম্রাট মোহাম্মদ শাহ'র (১৭১৫-৪৮) সময় ইয়াসিন খাঁ ছিলেন চট্টগ্রামের শাসক। এবং শাসক হিসেবে তিনি বেশ বিখ্যাত ছিলেন। ১৭২৩ সালে তিনি এই মসজিদটি নির্মাণ করেন যা আমাদের কাছে এখন কদমমুবারক মসজিদ নামে পরিচিত। "মসজিদে রসুলের (স.) কৃত্রিম পদচিহ্ন রক্ষিত ছিলো। উত্তরের ঝরনা হতে পানি রসুলের পদচিহ্নে পতিত হতো। এই পানি জনসাধারণের কাছে বড় পবিত্র মনে হতো। এই পদচিহ্ন প্রথমত বাঁশখালী থানার রসুল গ্রাম থেকে" ইয়াসিন খাঁ নিজে নিয়ে এসেছিলেন। এবং এই জায়গাটির নামকরণ করেছিলেন পরগনে রসুল নগর। এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দান করেছিলেন তিনি চৌদ্দ হাজার টাকা। কোম্পানি আমলে রসুল নগর বাজেয়াপ্ত করে মসজিদের জন্য পঞ্চাশ টাকা বেতনে একজন মোতওয়াল্লী নিযুক্ত করা হয় এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে মঞ্জুর করা হয় বাৎসরিক ছয়শত টাকা।

ওহীদুল আলম উল্লেখ করেছেন, মোতওয়াল্লী মুন্সী তোফেল আলী (যার কথা পোগসন উল্লেখ করেছেন) ছিলেন রাউজানের সুলতানপুরের বাসিন্দা। উনিশ শতকের মাঝামাঝি তাঁর দৌহিত্র আবদুস সুবহান ছিলেন মোতওয়াল্লী। "সে সময় মসজিদের চৌহদ্দী রহমত্‌গঞ্জ বাজার (তখন বাজার ছিলো) শুদ্ধ অন্তর্ভুক্ত ছিলো। বর্তমানে ইহা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়েছে। মসজিদের কাছেই নবাব ইয়াসিন খাঁর বসতবাড়ি ছিলো যার চৌহদ্দী প্রাচীর ছিলো। উল্লেখ্য, এই যে নবাব ইয়াসিন খাঁ আন্দরকিল্লার জামে মসজিদের জন্য সরকারি সাহায্য বন্ধ করে দেন এবং পরিবর্তে তাঁর মসজিদে মুসল্লীদের আহবান করেন। ফলে, আন্দরকিল্লার মসজিদটি একটু

'বিরানা' অবস্থায় পড়ে যায়।"

পোগসন লিখেছেন, এছাড়া কম বিখ্যাত আরো কয়েকটি মসজিদ আছে সেগুলোতে কোনো শিলালেখ নেই। সেগুলো হলো ওয়ালি বেগ খান, মীর ইয়াহিয়া এবং মওলা সায়েনের মসজিদ। এবং প্রত্যেকটি মসজিদের মোতওয়াল্লীর অভিযোগ একই রকম। কোম্পানি মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণের জমি বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে এবং বিনিময়ে যা দেয় তাতে মসজিদগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করা যাচ্ছে না। ফলে সবগুলো মসজিদের অবস্থাই জীর্ণ।

পোগসন এরপর 'তারিখ-ই আলমগিরি' ও গেজেটিয়ার থেকে চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের শাসকদের সম্পর্কে কিছু তথ্য উদ্ধৃত করেছেন। প্রাসঙ্গিক নয় দেখে এখানে আর তার বিবরণ দেখা হলো না।

কাজ সাঙ্গ হলে পোগসন এই "চমৎকার রোমান্টিক" অঞ্চল যার সমাজের বৈশিষ্ট্য 'সহৃদয়তা, দয়া ও শুভেচ্ছা'– ছেড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। তাঁর নৌকো পাঠিয়ে দিলেন কুমিরা খালে, আর নিজে ঠিক করলেন ডাক গাড়িতে বাড়বকুণ্ড হয়ে পৌঁছবেন নৌকায়।

চাটগাঁ ছাড়ার দিন বিকেলে তিনি গেলেন গোরস্থানে। প্রথম যে সমাধিতে তিনি গেলেন তা তার বন্ধু প্যাডি হেইসের। ১৮২৫ সালের ১৮ জুন যখন তিনি মারা যান তখন যুক্ত ছিলেন ৫৪ নেটিভ ইনফেনট্রিতে। তাঁর সহকর্মীরা তাঁর স্মরণে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করে দিয়েছেন। সবচেয়ে পুরনো যে সমাধিটি তাঁর চোখে পড়লো তা হলো জর্জ স্পার্কস-এর যিনি পরলোকগমন করেছিলেন ১১ অক্টোবর ১৭৭৪ সালে। এছাড়া আরো যাদের সমাধি দেখলেন তাঁরা হলেন– মিসেস এলারকার (অক্টোবর ১৭৭৬), এনসাইন জন টলি (১৭৭৬), চার্লস ক্রফটিয়াস যিনি ছিলেন চট্টগ্রাম কুটির প্রধান (১৭৮৬), মিস অ্যান লিকি (১০ জুলাই ১৭৮৭)। গোরস্থানটি একটি পাহাড়ের নিচে, চারদিক ঘেরা ছায়াচ্ছন্ন বৃক্ষরাজিতে।

পোগসন লিখেছেন গোরস্থানের যাবার পথে পড়ে একটি দরগা। সেখানে ১২১১ হিজরীতে 'সাদিকে'র লেখা একটি শিলালেখ আছে।

১৮ তারিখ রাত দশটায় চট্টগ্রাম ত্যাগ করলেন পোগসন। কদম রসুল ছিলো যাত্রা বিরতির প্রথম ধাপ। সেখানে দেখলেন তাঁর বেয়ারার সঙ্গে ডাক জমাদার ও পুলিশ চৌকিদারের ঝগড়া হচ্ছে। বেয়ারাদের কাপড় তারা খুলে নিয়েছে। পোগসনকে দেখেও প্রথমে তারা খুব একটা পাত্তা দিচ্ছিলো না। পোগসন তখন একজনকে আটক করলে বাকিরা সব পালিয়ে গেল। যাক, বিবাদ মিটিয়ে পোগসন আবার যাত্রা শুরু করলেন এবং কলকাতা পৌঁছলেন ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ সালে।

৫
কর্নেল ডেভিডসন যখন ঢাকায়

১৮৪০ সালের ১৩ জানুয়ারি, দূর থেকে আবছাভাবে ডেভিডসনের চোখে পড়লো ঢাকা। চারদিকে ঘন কুয়াশা। এর মধ্যে যে জিনিসটি নজরে এল তা হলো শহরের বিপরীতে, নদীর দিকে 'উঁচু ও স্থায়ী' এক দোতলা বাড়ি। ঢাকার নবাব আগে শিকার কুঠি হিসেবে এটিকে ব্যবহার করতেন। শহরটি বুড়িগঙ্গার পূর্ব তীরে, লম্বায় হবে প্রায় দু' মাইল। তিন চার মাইল দূর থেকে বা টেলিস্কোপ দিয়ে দেখলেও ভারি সুন্দর দেখায় শহরটিকে। বাড়িগুলি থামওয়ালা, সাদা, জ্বলজ্বল করছে। এগুলির জাঁকালো ভাব দেখে বিস্মিত হবেন যে কোনো পর্যটক। পরে অবশ্য কাছে থেকে এর ক্ষয় দেখে হবেন হতাশ। শহরের সীমারেখায় নৌকো ঢোকার পর ডেভিডসনের নজরে এল অনেকগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত অট্টালিকা যেগুলির কিছু কিছু অংশ পড়ে গেছে নদীতে। নদীকে বেঁধে রাখার সব ধরনের প্রচেষ্টাই ব্যর্থ।

টেইলরের বর্ণনাও প্রায় একই রকম। লিখেছেন তিনি, বুড়িগঙ্গা ও ধলেশ্বরী যেখানে মিলেছে, তার প্রায় মাইল আটেক ওপরে, বুড়িগঙ্গার উত্তরে অবস্থিত ঢাকা। নদীটি সেখানে গভীর ও উপযোগী বড় বড় নৌকো চলাচলের। বর্ষাকালে নদী ভরে যায় এবং বড় বড় মিনার ও অট্টালিকা শোভিত ঢাকা নগরীকে মনে হয় ভেনিসের মতো। ঢাকার পূর্বে শীতলক্ষ্য নদী পর্যন্ত বিস্তৃত নিম্ন ভূমি, মুসলমান গোরস্তান, পরিত্যক্ত উদ্যান, মন্দির, মসজিদ ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িঘরে সমাকীর্ণ জঙ্গলাবৃত এক ভূ-ভাগ। যে অংশটি নিয়ে ঢাকা শহর গঠিত তা কেবল সীমাবদ্ধ নদীতীরেই এবং তীর বরাবর শহরটি দৈর্ঘ্যে চার ও প্রস্থে সোয়া ১ মাইল।

শহরের কাছাকাছি, ডেভিডসনের নৌকো পেরিয়ে গেল লম্বা একটি ডিঙ্গি। সিলেটের চমৎকার কমলা লেবুতে ভর্তি। তিনি জানিয়েছেন, ঢাকায় কমলা পাওয়া যায় প্রচুর এবং তা খুব শস্তাও। এক পয়সায় চারটি, বা দুই শিলিংয়ে ২৫৬টি। কিন্তু জানুয়ারি মাসটি শস্তার সময় নয়। বোম্বাই থাকার সময় ডেভিডসন আওরঙ্গবাদ, জোহানা এবং আগ্রায় কমলা বাগানে গিয়ে কমলা খেয়েছেন কিন্তু

তার তুলনায় সিলেটের বনের বুনো কমলা স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়।

ঘরবাড়ি নির্মাণের জন্য প্রচুর কাঠ ফেলে রাখা হয়েছে নদী তীরে। বাজারে সব ধরনের ভারতীয় কাঠ মজুদ। ডেভিডসন লিখেছেন, পরে শহর ঘুরে তাঁর মনে হয়েছে, শহরে কাঠের যা মজুদ তা আরো দশ বছরের চাহিদা মেটাতে পারবে। ঢাকা থেকে কলকাতায় কাঠ যায় কিনা সে সম্পর্কে ডেভিডসন কিছু জানাতে পারেননি তবে তাঁর মনে হয়েছে, ঢাকা শহর ও আশপাশে নতুন কোনো বাড়ি নির্মিত হচেছ না। নৌকো হয়ত কিছু তৈরি হয়।

ডেভিডসন যে নৌকো নির্মাণের কথা বলেছেন তার বিবরণ আমরা পাই পর্যটক তাভেরনিয়ারের লেখায়। ডেভিডসন ঢাকায় পা দেওয়ার প্রায় দুশো বছর আগে এসেছিলেন তিনি ঢাকায়। পাগলা পুলের কাছে দেখেছিলেন নৌকো নির্মাতাদের বসতি, তাঁরা ছিলেন ছুতোর মিস্ত্রি। বড় বড় নৌকো বা সব ধরনের জলযান নির্মাণ করতেন তারা। অষ্টাদশ শতকেও, অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত বাণিজ্যকেন্দ্র ছিলো ঢাকা ততদিন পর্যন্ত নৌকো নির্মাণ এক ধরনের 'শিল্পই' ছিলো বলা চলে। ডেভিডসন যখন ঢাকায় এলেন, মনে হচ্ছে তখন এ শিল্পের শেষ অবস্থা। কারণ, তখন ঢাকা এক বিপর্যস্ত নগরী।

আর ডেভিডসন বর্ণিত কাঠের ডিপোগুলি কোথায় ছিলো তার খানিকটা আঁচ পাওয়া যায় হৃদয়নাথ মজুমদার নামে এক উকিলের স্মৃতিচারণায়। লিখেছেন তিনি, ফরাশগঞ্জ অনেকদিন থেকে শাল ও সেগুন কাঠের ডিপো হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। রেবতী মোহন, দেবেন্দ্র চন্দ্র দাস এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীদের আলাদা গুদাম ছিলো ফরাশগঞ্জে। নওয়াবগঞ্জের চরেও ছিলো এ ধরনের কাঠের ডিপো। খুব সম্ভব এ বর্ণনা উনিশ শতকের শেষার্ধের। এখনও ফরাশগঞ্জে আছে কাঠের কয়েকটি ডিপো।

দু'জন স্টাফ অফিসার তাদের বাসাটা ছেড়ে দিয়েছিলেন ডেভিডসনের ব্যবহারের জন্য। তাদের একজন গেছেন মণিপুর থেকে সিলেট পর্যন্ত অরণ্য জরিপ করতে। আরেক জন গেছেন অনারেবল কোম্পানির জন্যে চাটগাঁর আশেপাশে হাতি ধরতে। ডেভিডসনের এই বাড়ির পিছে একটি বিশাল গথিক ফটক যা আগে ছিলো চমৎকার এক সরাইখানার প্রবেশপথ। মূল ইমারতটি তখন ধ্বংসের পথে। তবে, সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলে পুরো শহর এবং শহরতলির খানিকটা অংশ চমৎকার চোখে পড়ে। ইমারতটির উপরে ও নিচে অনেক ঘর। আশেপাশে মুসলমানদের তৈরি সৌধসমূহের ধ্বংসাবশেষ যা চার্লস ডয়েলির চমৎকার ড্রইং-এ ধরা আছে। ডেভিডসনের মনে হয়েছে, ঢাকা অনেকটা লখনৌর মতো। লখনৌর রেসিডেন্সির ছাদ থেকে পুরনো লখনৌকে যেমন দেখায়, ঐ ইমারতের ছাদ থেকেও ঢাকাকে তেমন দেখায়।

যে ইমারতের কথা উল্লেখ করেছেন ডেভিডসন তা ছিলো শাহসুজার আমলে ১৬৪৪ সালে নির্মিত বড় কাটরা। ঢাকার এক সময়ের ম্যাজিস্ট্রেট ডয়লি যিনি ছিলেন একজন খ্যাতনামা চিত্রকরও লিখেছিলেন ১৮২৯ সালে, ঢাকা শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত বড় কাটরা জাঁকালো, সুন্দর এবং বিশাল এক অট্টালিকা। রেনেলের মানচিত্র থেকে কাটরার মূল পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। মাঝখানে প্রাঙ্গণ, চারদিকে তা ঘেরা ছিলো ঘর দিয়ে। মূল প্রবেশদ্বার ছিলো উত্তর ও দক্ষিণে। দক্ষিণের অংশটি নদীর দিকে, দুশো তেইশ ফুট লম্বা। এ অংশের মাঝামাঝি ছিলো তিনতলা উঁচু ফটক। তার পাশে দোতলা, ঘরের সারি। একেবারে দু'প্রান্তে আটকোণা দুটি বুরুজ। বড় কাটরার একটি শিলালিপিতে লেখা ছিলো স্বর্গের সৌন্দর্য ম্লান এর কাছে। স্বর্গের সুখের স্বাদ পাওয়া যায় এখানেই।

মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পরই খুব সম্ভব বড় কাটরা অবহেলার শিকার হতে থাকে। তবে ১৭৬৫ সালে নিমতলি কুঠি নির্মাণের পূর্ব পর্যন্ত ঢাকার নায়েব নাজিমরা বসবাস করতেন এখানে। তারপর থেকেই বোধহয় অযত্নে পড়ে থাকতো বড় কাটরা। ১৮২৭ সালে লিখেছিলেন ডয়লি, বড় কাটরা তখনও ছিলো সুন্দর। বর্ষাকালে এর রূপ খুলে যেতো। এ সময় বড় কাটরায় বসবাস করতেন গরিবরা। ডেভিডসন যখন ঢাকায় তখন মনে হয়, বড় কাটরা অটুট থাকলেও এর উত্তর দিকের ফটক গিয়েছিলো প্রায় ধ্বংস হয়ে।

ছাদ থেকে ঢাকা শহর দেখার যে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন ডেভিডসন তা অতিরঞ্জিত নয়। বছর বিশেক আগে, একদিন পড়ন্ত বিকেলে গিয়েছিলাম বড় কাটরায়। কাটরার ছাদে উঠে ঢাকা শহর দেখার জন্যে। ছাদে উঠে দেখলাম, খানিক দূরে বুড়িগঙ্গা এঁকে বেঁকে চলে গেছে জাফরাবাদের দিকে, পড়ন্ত সূর্যের আলো তার বুকে, আর চারদিকে ছড়িয়ে শহর। সবচেয়ে বড় কথা, দৃষ্টি মেলে দেয়া যায় বহুদূর। কয়েকদিন আগে, আবার গিয়েছিলাম সেখানে। প্রবেশপথ সংকুচিত হয়ে গেছে, কাটরার ঠিক সামনে একাংশে উঠছে একটি মার্কেট, চারদিকে জঞ্জাল। বড় কাটরা যখন নির্মিত হয়েছিলো বুড়িগঙ্গা তখন বয়ে যেতো এর দক্ষিণ ফটক ছুঁয়ে। সে পরিবেশ মনে রাখলে দেখা যাবে, বড় কাটরা ছিলো ঢাকা শহরের অন্যতম মনোরম অট্টালিকা।

বড় কাটরার পাশের বাড়িটি যেটিতে ডেভিডসন উঠেছিলেন, সেটি খুব সম্ভব নির্ধারিত ছিলো সামরিক অফিসারদের জন্যে। স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে জানা গেছে, এটি ছিলো জনৈক আলেকজান্ডারের। ১৯৪৭ সালে, দাঙ্গার সময় এ বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো ইসলামিয়া হাই স্কুল। সম্প্রতি সে বাড়ি ভেঙ্গে নির্মাণ করা হয়েছে মার্কেট।

ডেভিডসন তারপর লিখেছেন, চকবাজার সম্পর্কে,– কাছেই চক, খুব সম্ভব

দুশোগজের একটি চত্বর, নিচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। চারপাশে একটি প্রশস্ত রাস্তা। চত্বরে ঢোকার জন্যে আছে অসংখ্য প্রবেশপথ। মাঝখানে একটি ফ্ল্যাগস্টাফ, তার পাশে একটি উঁচু বাঁধানো বেদীতে রাখা আছে একটি কামান। ডেভিডসনকে অনেকে জানিয়েছিলেন, নদীর পাশ থেকে কামানটিকে সরাতে অনেকে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন, পরে ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াল্টার্স-এর ইউরোপিয় প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নদীর পাশ থেকে কামানটিকে সরানো সম্ভব হয়েছে। এ বিষয়ে লিন্ডসের বিবরণ আগেই দিয়েছি।

টেইলর আর ডেভিডসন চকবাজারের যে বর্ণনা রেখে গেছেন তাতে কোনো পার্থক্য নেই। এখানে শুধু উল্লেখ করা যেতে পারে, যে কামানটির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তা হলো বিবি মরিয়ম। এটি ছিলো সোয়ারিঘাটে। ১৮২৮ সালে ওয়াল্টার্স কামানটিকে চকবাজারে স্থাপন করেছিলেন হয়ত এ ভেবে যে, চক হলো ঢাকার কেন্দ্র। এর ওজন ৬৪,৮১৪ পাউণ্ড। আরো জানা যায়, হিন্দুরা তেল সিঁদুর দিয়ে পুজো করতেন কামানটিকে।

ডেভিডসন লিখেছেন, চকবাজার ঢাকার প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। অসংখ্য ছোটখাটো দোকান, বিক্রেতা এখানে বিক্রি করে টুপি, সূতি বস্ত্র ও নানা বর্ণের ছিট কাপড়, লোহার জিনিসপত্র, বড়শী, যাঁতা, আয়না, শীতলপাটি, ভ্রমণকারীদের জন্যে বেতের পেঁটরা বা বাক্স, নানা রংয়ের ও ধরনের জুতো, নারকেলী হুঁকো ইত্যাদি। চক থেকে দক্ষিণে গেছে একটি রাস্তা যেখানে সামরিক বাহিনীর লোকজন ও সিভিলিয়ানরা থাকেন।

সেনানিবাসের কথাও উল্লেখ করেছেন ডেভিডসন, যা তাঁর মতে, "খুব সবুজ এবং সুন্দর কিন্তু রেজিমেন্টের সব অফিসারের মধ্যে একজন বা দু'জন থাকেন সেনানিবাসের ভেতরে। বাকীরা জ্বরে ভুগে বা জ্বরের ভয়ে থাকেন শহরে। এ কারণে, অফিসারদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে শহরে থাকার। সেনানিবাসের ঠিক পাশে আছে বেশ বড় এক জলাভূমি যা মারাত্মক ম্যালেরিয়ার উৎস। সেনানিবাসের ভেতরে আছে কয়েকটি পুকুর, যেগুলির বেলায়ও একই রকম বিশেষণ প্রযোজ্য। বর্ষায়, সেনানিবাসের দক্ষিণে জমে ওঠে পানি, শীতের সময় যা শুকোয় ধীরে ধীরে।"

ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট চার্লস ড'স তেজগাঁর বেগুনবাড়ি থেকে উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে পল্টনে স্থানান্তর করেছিলেন সেনানিবাস। কিন্তু অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য সিপাহী, অফিসার সবাই আক্রান্ত হতে থাকে। অফিসাররা তখন সেনানিবাসে বসবাস করতে অস্বীকার করে। ফলে, কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয় অফিসারদের শহরে বসবাস করার অনুমতি দিতে। ঢাকা সেনানিবাসে তখন বদলি হওয়াকে মনে করা হতো শাস্তি হিসাবে। জি, ও, ট্রেভিলিয়ানের একটি উপন্যাস দেখা যায় নায়ক

মার্সডেন, তার প্রেমিকা ফ্যানিকে বলছে– তুমি এক পাক্কা পরী। তোমার জন্য জান দিয়ে দেবো। তোমার জন্যে ঢাকার ইস্ট ইন্ডিয়া রেজিমেন্টে বিনা বেতনে কাজ করবো।

ডেভিডসন ঢাকায় আসার বারো বছর পর ১৮৫২ সালে কলকাতার একটি পত্রিকা লিখেছিলো ঐ সময়ের পল্টন সম্পর্কে–

"ঢাকা নগরের পার্শ্বে বহুকাল ব্যাপিয়া রাজকীয় এতদ্দেশীয় পদাতিক সৈন্য দলের যে আবাসস্থল নির্দ্ধার্য্য ছিলো সম্প্রতি সেনাপতিরা তৎসীমা বিস্তার করণার্থ নগরীর উত্তর দিগস্থ বহু সংখ্যক প্রজাগণের গৃহাদি ভগ্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই ছাউনির উত্তর ভাগে যে বিপুল বিস্তারিত অরণ্য আছে বোধকরি তাহা পরিষ্কার করিলে এমন দুই তিনশত সৈন্য শিবির স্থাপিত হইতে পারে কিন্তু উক্ত কর্ম্মে নিবিষ্ট অধ্যক্ষ মহাশয়েরা তাহা না করিয়া যে এই দুঃসহ বর্ষাকালে উপায়হীন দীন প্রজাসমূহকে উৎপাত করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন ইহা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়। ঐ অধ্যক্ষ মহাশয়গণ বলেন যে নগরের লোকদের দ্বারা নির্গত মলীনত্ব ও ষড়িত স্থান সকলের দুর্গন্ধ দ্বারা পল্টনের সিপাহিরা সর্ব্বদা পীড়িত হয়, এই হেতুক ঐ লোকদের গৃহাদি ভগ্নপূর্বক স্থানান্তরিত করণের আবশ্যক হইয়াছে, ফলতঃ তদর্থে এই নগরে একেবারে উৎখাত করিলে ঐ কথার পোষকতা হয়।"

ডেভিডসন এরপর জানিয়েছেন, ঢাকার ঘরবাড়ি সম্পর্কে। তাঁর মতে, মসলিন যখন ঢাকাকে বিখ্যাত করে তুলেছে তখন প্রধানত ইউরোপিয় বাসগৃহগুলি নির্মিত হয়েছিলো। বাড়িগুলি বড়সড়। দোতলা, কিন্তু তা সত্ত্বেও এদের ভাড়া মাসিক ষাট থেকে একশো পঁয়ত্রিশের মধ্যে। এসব বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতমটিতে থাকেন কমিশনার যার ভাড়া একশো পঁয়ত্রিশ টাকা। অধিকাংশ বাড়ির সঙ্গে আছে ছোটখাটো সুন্দর বাগান। আর যে বাড়িগুলি নদী তীরে সেগুলি সবচেয়ে সুন্দর এবং এসবের চাহিদাও সবচেয়ে বেশি। টেইলর লিখেছেন, এসব বাড়ির ছাদেও ছিলো বাগান।

একদিন ডেভিডসন চাইলেন ঢাকার নবাবকে সালাম জানাতে। ঢাকার নবাব বলতে ডেভিডসন বুঝিয়েছেন, ঢাকার শেষ নায়েব নাজিম গাজিউদ্দিন হায়দারকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি যাননি। কারণ তাঁর ভাষায়– 'আমাকে একজন ভারী বুদ্ধিমান লোক জানালেন, নবাব এখন খুবই দরিদ্র, দেখা করে কোনো লাভ নেই। তিনি একজন অশিক্ষিত তরুণ :'তবে তাঁর বয়সী ও বংশের তরুণদের থেকে খারাপ নয়। ইংরেজী তিনি একেবারে জানেন না। তিনি এতো উচ্ছৃঙ্খল এবং চিন্তাহীন যে তাঁর আয় এখন পাঁচ হাজার থেকে দুশোতে দাঁড়িয়েছে যার অর্থ বছরে ছয় হাজার টাকা থেকে দুশো চল্লিশ টাকা। কারণ, তাঁর আয় তিনি বন্ধক রেখেছেন। তাঁর পূর্ব পুরুষরা যে বাড়িতে বসবাস করতেন তিনিও সেখানে বসবাস করেন, তবে খুব

খারাপভাবে। মাঝে মাঝে দেখা যায়, পুরনো ধরনের শিরস্ত্রাণ পরে কয়েকজন ঘোড়সওয়ারসহ ঘোড়ায় চড়ে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন...'

গাজীউদ্দিনের পিতা ছিলেন কামার উদ দৌলা। পিতার মৃত্যুর পর তরুণ নাজিম উদদৌলা কমর উল মুলক নওয়াব সৈয়দ গাজী উদ্দিন খান বাহাদুর ফিরোজ জঙ্গ স্বীকৃত হলেন নায়েব নাজিমের পরিবারের কর্তা হিসেবে। তাঁর ভাতা ধার্য করা হয়েছিলো মাসিক সাড়ে চার হাজার সিক্কা টাকা। এই নতুন নবাবের দারোগা ছিলেন তাঁর নানা মীর জীবন। তাঁর প্ররোচনায় গাজী উদ্দিন লেখাপড়া ছেড়ে দেন। নবাব একমাত্র সমীহ করতেন তাঁর শিক্ষক মীর গোলাম আলীকে। মীর জীবনের প্ররোচনায় তাঁকেও বরখাস্ত করা হয়। এরপর নবাব তাঁর নানার পরামর্শে শুরু করেন উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন। এমন কোনো নেশা ছিলো না যাতে তাঁর আসক্তি ছিলো না। বিশেষভাবে আসক্ত ছিলেন তিনি রমণীদের প্রতি। এবং তাঁর হারেমে নিত্য নিয়ত নতুন রমণী আমদানি ও পুরনোদের দেওয়া হতো খারিজ করে। এছাড়া ভালোবাসতেন তিনি ঘুড়ি ওড়াতে, মোষ এবং মোরগের লড়াই দেখতে, বুলবুলি, কুকুর ও বেড়ালের বিয়ে দিতে এবং ইউরোপিয় মহিলাদের মতো পোশাক পরতে। এ কারণে, ঢাকাবাসীরা তাঁকে ডাকতেন পাগলা নবাব বলে। উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের জন্যে সরকারি ভাতায় তাঁর কুলোতো না। ফলে, স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দিতে লাগলেন তিনি মহাজনদের কাছে। তার দাদী ও কোম্পানি সরকারও গাজীউদদীনকে কয়েকবার শোধরাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।

১৮৪৩ সালে অত্যাধিক ব্যভিচারের কারণে খুব অল্প বয়সেই নবাব গাজীউদ্দিন পরলোক গমন করেন। তাঁকে সমাহিত করা হয় হুসেনী দালানে। এবং তাঁর মৃত্যুর সঙ্গেই লুপ্ত হয়ে যায় ঢাকার নায়েব নাজিম বংশ।

॥ ২ ॥

একদিন সকালে ডেভিডসন ঘুরে বেড়াবার সময় দেখেন, এক জায়গায় বেশকিছু পালকি দাঁড় করানো। যদিও সেদিন সপ্তাহান্ত নয়, জানলেন তিনি, কাছের আর্মেনী গির্জায় চলছে উপাসনা এবং সে কারণে এ জমায়েত। চৌদ্দফুট প্রশস্ত এক বারান্দা দিয়ে ডেভিডসন ঢুকলেন গির্জায়। দালানের ভেতর মেঝে বিভক্ত তিন ভাগে; রেলিং দিয়ে ঘেরা একটি বেদী; মাঝখানের অংশে আছে দুটি ফোল্ডিং দরজা; তৃতীয় ভাগটি বেষ্টনী দিয়ে আলাদা করা যাতে শুধু বসেছিলো মহিলা ও শিশুরা। এর ওপরে আছে আবার একটি গ্যালারি। দেয়াল থেকে চারফুট দূরে অর্ধবৃত্তাকার বেদী, মনে হয় তা কাঠের তৈরি এবং দশ ফুটের মতো উঁচু সিঁড়ি আছে ওপরে ওঠার। সিঁড়িতে তিনফুট করে লম্বা চব্বিশটি মোমবাতি আর চকচকে ধাতুর কিছু ক্রশ। রোদালো সকাল, তবুও মোমবাতিগুলি সব জ্বলছিলো।

বেদীর সামনে, বাঁ দিক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন পাদ্রি, বয়স পঞ্চাশের মতো, চোখে চশমা, মাথা ঠিক সোয়া দুই ইঞ্চির মতো বৃত্তাকারে কামানো। তাঁর অন্তর্বাস জমকালো রূপালি গোলাপের নকশায় অলংকৃত; বাইরের পোষাকটি কিংখাবের যার নিচের দিকে বর্ডারের চার ইঞ্চি সাধুসন্ত ও দেবদূতদের এমব্রয়ডারিতে ভরা। ছোট একটি পড়ার ডেস্কের সামনে তিনি দাঁড়িয়ে, পবিত্র জলের একটি বড় আধারও রাখা আছে সামনে। তাঁর পড়ার সময় মাঝে মাঝে চার পাঁচজন তরুণ বলছে 'আমেন, আমেন'। পরণে তাদের দারুচিনি রংয়ের সিল্কের আলখাল্লা। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে উৎসবের সঙ্গে বাজানো হচ্ছে গির্জার ঘণ্টা।

পাদ্রির উপাসনা শেষ হলে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সামনে নিয়ে আসা হলো। বড়রা বাইরের রূপোলি ক্রুশে চুমো খেয়ে যেতে লাগলো। পাদ্রির সহকারী বিভিন্ন রকম পাত্র যার মধ্যে সাধারণ বিয়ার বোতল থেকে রূপার কাপও ছিলো, সব ভরে দিতে লাগলেন পবিত্র জলে।

অনুষ্ঠান শেষে ডেভিডসন বেরিয়ে এলেন। বারান্দার বিভিন্ন আর্মেনে খ্রিস্টানদের কবরে লাগানো হয়েছে স্মৃতিফলক। আগে এই শহরে, লিখেছেন ডেভিডসন, বেশ কিছু আর্মেনি ছিলেন এবং এখনও তারা ধনী ও প্রভাবশালী সম্প্রদায়।

গির্জার পনেরো ফুটের মধ্যে, আলাদা দাঁড়িয়ে একটি স্থূল বর্গাকার টাওয়ার, চুঁড়োয় আছে চারটি শঙ্খিল মিনার। চারদেয়ালের মাঝে, মাটি থেকে কয়েক ফুট উঁচুতে দেয়ালে লাগানো একটি মার্বেল ফলক। আর্মেনি ও ইংরেজী ভাষায় তাতে লেখা যার মূল কথা মি. সার্কিস ঈশ্বরকে উৎসর্গ করছেন এই জমকালো মিনার।

ডেভিডসন পরে জানতে পেরেছিলেন, তিনি যা দেখেছেন গির্জায়, সেটি আর্মেনিদের ক্রিসমাস পালনের অনুষ্ঠান।

ডেভিডসনের এ বর্ণনায় একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। ঢাকায় তখনও উচ্চবর্গ ব্যাপক না হলেও বেশ ব্যবহার করতেন পালকি। টেইলর জানিয়েছেন, ১৮৪০-এ ঢাকা জেলায় চাকার প্রচলন হয়নি। তবে, বিশপ হেবারের বিবরণে জানতে পারি ১৮২৩ সালে ঢাকায় একটি হলেও ঘোড়াটানা গাড়ি ছিলো যা ব্যবহার করতেন নায়েব নাজিম শামসউদদৌলা এবং তা আমদানি করা হয়েছিলো কলকাতা থেকে। পরে ১৮৫৬ সালের দিকে, আর্মেনি সিরকো প্রচলন করেছিলেন ঠিকাগাড়ির।

আর্মেনিরা ঢাকায় এসেছিলেন কবে জানা যায়নি। তবে, ধরে নিতে পারি মুঘল আমলে ভাগ্য বদলাতে বিদেশ থেকে যখন অনেকে এসেছিলেন ঢাকায়, আর্মেনিরাও এসেছিলেন তখন। তেজগাঁও পর্তুগিজ কবর আছে কয়েকজন আর্মেনিয়ানের যাঁদের মৃত্যু হয়েছিলো। ১৭১৪ থেকে ১৭৯৫ সালের মধ্যে। সুতরাং ধরে নিতে পারি সপ্তদশ শতকেই আর্মেনিরা দু'একজন করে আসতে

থাকেন ঢাকায় এবং বসবাস শুরু করেন এ অঞ্চলে।

অষ্টদশ ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে অতি ক্ষুদ্র একটি সম্প্রদায় হওয়া সত্ত্বেও ঢাকা শহরে ছিলেন আর্মেনিরা প্রভাবশালী। কারণ, তাদের ছিলো বিত্ত। ঢাকার আর্মেনিদের অনেকের ছিলো জমিদারি। এছাড়া, লবণের ঠিকাদারি, ধান,পাট ও কাপড়ের ব্যবসায় ছিলো তাঁদের কর্তৃত্ব। ঢাকা শহরের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে, সভা-সতিতিতেও আর্মেনীরা যুক্ত করেছিলেন নিজেদের। বর্তমান আর্মেনিটোলায় থিতু হয়ে বসার পর আর্মেনিরা এখানেই নির্মাণ করেছিলেন তাদের গির্জা। বর্তমানে যে গির্জাটি আর্মেনিটোলায় নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে ডেভিডসন তাতেই গিয়েছিলেন। এটি নির্মিত হয়েছিলো ১৭৮১ সালে। এর আগে, এখানে ছিলো গোরস্তান। গির্জা নির্মাণের জন্য গোরস্তানের আশেপাশে যে বিস্তৃত জমি তা দান করেছিলেন আগা মিনাস ক্যাটচিক। লোকশ্রুতি অনুযায়ী, জানিয়েছেন ফার্মিঙ্গার, গির্জাটি নির্মাণে সাহায্য করেছিলেন চারজন– মাইকেল সার্কিস, অক্টোভাটসেতুর জিভর্গ, আগা এমনিয়াজ এবং মার্কার পগোজ।

১৮৩৮ সালে, জানিয়েছেন টেইলর, ঢাকা শহরে বসবাস করতেন মাত্র চল্লিশটি আর্মেনিয় পরিবার।

॥ ৩ ॥

বাড়ি ফেরার পথে ডেভিডসনের চোখে পড়লো প্রাচীর ঘেরা একটি বিল্ডিং যার চূঁড়োর অলংকার দেখে তাঁর মনে হলো, এটি বোধহয় কোনো রোমান ক্যাথলিক ভজনালয়। ডেভিডসন ঢুকলেন ভেতরে, দেখলেন, না এ কোনো ক্যাথলিক ভজনালয় নয়, এটি কালীমার মন্দির। দরজার সামনে গিলোটিনের মতো কাঠের একটি যন্ত্র যেখানে ছাগল ছানা উৎসর্গ করা হয়। ছাগল ছানার মাথাটি পুরোহিতের প্রাপ্য। ডেভিডসন খোঁজ নিয়ে জানলেন, কালো ছাগল ছানার চাহিদা প্রচণ্ড যার ফলে অন্য রংয়ের ছাগল ছানা থেকে কালো ছাগল ছানার দাম কয়েকগুণ বেশি। ঢাকা শহরে মন্দির আছে পঞ্চাশটির মতো। এবং সবখানে এ রংয়ের ছাগল ছানার চাহিদা। মনে হয়, এখানে ডেভিডসন খানিকটা ভুল করেছেন। শহরে সব মন্দির কালী মন্দির ছিলো কিনা এবং সবখানে ছাগল বলি হতো কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে।

একদিন বিকেলে বেড়ানোর সময় কর্নেল ডেভিডসন দেখলেন 'ফিনিক্স পার্ক'। ঢাকার এক সময়ের জজ মাস্টারের বসত বাড়ির নাম 'ফিনিক্স পার্ক'। মি. গ্লাস তাঁকে জানালেন, মাস্টার ঘোড়া প্রজনন করতেন এবং মাস্টারের খামারের অনেক ঘোড়া এখনও বেঁচে আছে। মি. গ্লাসের কাছেও আছে মাস্টার খামারের একটি ঘোড়া যার বয়স পঁচিশ এবং এখনও কর্মক্ষম।

ডেভিডসন যে মাস্টারের কথা উল্লখ করেছেন তার পুরো নাম গিলবার্ট কভেনট্রি মাস্টার। রাইটার হিসেবে ইস্ট ইন্ডিয়ার কোম্পানিতে যোগ দিয়েছিলেন তিনি ১৭৯৭ সালে। ঢাকার জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ১৮১০ থেকে ১৮১৮ এবং কালেক্টর ১৮২১ থেকে ১৮২৪ পর্যন্ত। চেরাপুঞ্জিতে পরলোকগমন করেন তিনি ১৮৩২ সালে। বিশপ হেবারের রোজ নামচায় মি. মাস্টারের উল্লেখ আছে। হেবার যখন ঢাকায় এসেছিলেন মাস্টার ছিলেন তখন ঢাকার কালেক্টর। আর মি. গ্লাস যিনি ডেভিডসনকে মাস্টারের ঘোড়ার কথা বলেছিলেন তিনি ছিলেন ঢাকার একজন নীলকর, থাকতেন বুড়িগঙ্গার তীরে একটি বাড়িতে।

পুরনো ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশন থেকে শুরু করে ওসমানী উদ্যান, সচিবালয় হয়ে রেসকোর্সের (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) একটি অংশ ছিলো বোধহয় ফিনিক্স পার্কের অন্তর্গত।

খুব সম্ভব, মাস্টার যখন ঢাকার কালেক্টর (১৮২১) তখন গড়ে তুলেছিলেন ফিনিক্স পার্ক। অর্থাৎ তাঁর বসতবাড়ি ও ঘোড়ার খামার এবং এ কারণেই তৈরি করেছিলেন একটি রেসকোর্স। মাস্টার ঢাকা ছেড়ে চলে গেলে পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিলো ফিনিক্স পার্ক। ডেভিডসন এসে মাস্টারের তৈরি খামারের পরিত্যক্ত ইমারত, কাঠের রেলিং ইত্যাদি দেখেছিলেন। হয়ত, মাস্টারের রেসকোর্সের একটি অংশকে ভিত্তি করেই ড'স গড়ে তুলেছিলেন রেসকোর্স। পরে, ঢাকার নবাবরা কোনো এক সময় হয়ত কিনে নিয়েছিলেন ফিনিক্স পার্ক।

রেলওয়ে বিভাগ ১৮৮৫ সালের দিকে ঢাকার নবাবদের কাছ থেকে ফিনিক্স পার্ক অধিগ্রহণ করে। এরপর ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশন তৈরি হলে ফিনিক্স পার্কের অস্তিত্ব পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়।

ফিনিক্স পার্ক ও তার চমৎকার ফটক পেরিয়ে ডেভিডসন পৌঁছলেন স্টেশনের সদর রাস্তায়। তার মনে হয়েছে, ভালো অবস্থায় এটি নিশ্চয় সুন্দর এক জায়গা। কিছুদূর পর পর সিমেন্টের পিলার দিয়ে পুরো জায়গাটিতে বেষ্টনি দেয়া হয়েছিলো যা এখন প্রায় ধ্বংসের পথে। ডেভিডসনকে একজন জানিয়েছিলেন এতে খরচ পড়েছিলো এক লাখ টাকারও বেশি। এই বেষ্টনীর ভেতর আছে চমৎকার এক রেসকোর্স, এর কাঠের রেলিংয়ে কিছু অংশ ও ষ্ট্যান্ডটি এখনও টিকে আছে। কারণ, বোধহয় কাঠ এখানে মহার্ঘ নয় এবং নেই উইপোকার উপদ্রব।

ষ্ট্যান্ডের উত্তর-পশ্চিমে সেই ভদ্রলোক [মসলিন উৎপাদনের তুঙ্গ সময়ের একজন সিভিল সার্ভেন্ট যিনি মাঠটিকে ঘিরে দিয়েছিলেন, তৈরি করেছিলেন একটি কৃত্রিম পাহাড় আর বপন করেছিলেন সুন্দর সব গাছ] সকালে যারা রেসকোর্সে বেড়াতে আসতেন তাদের আপ্যায়ন করতেন চা বা কফি দিয়ে। পুরো জায়গাটি নেপাল থেকে আনা দুষ্প্রাপ্য গাছ, যেমন ক্যাসুরিনা, মিমোসা দিয়ে

সাজিয়েছিলেন। অদূরে তাঁর বাসগৃহ যা এখন ম্যালেরিয়ার কারণে অবাসযোগ্য ও পরিত্যক্ত।

ডেভিডসন ঢাকায় আসার পনের বছর আগে রেসকোর্স তৈরি হলেও মনে হয় খুব শিঘ্রিই পরিত্যক্ত হয়েছিলো। ১৮২৫ সালে জেলের কয়েদীদের দিয়ে রমনার জঙ্গল পরিষ্কার করিয়েছিলেন ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট চার্লস ড'স। তিনমাসের মধ্যে রমনার জঙ্গল পরিষ্কার করে স্থাপন করেছিলেন রেসকোর্স। ডেভিডসন বর্ণিত ঐ ঘরটিও ড'সের এবং তা ছিলো গথিক রীতিতে তৈরি। ডসের টিলাটি এখনো আছে, গথিত রীতির বাড়ির ধ্বংসাবশেষ কিছুদিন আগেও ছিলো। তখনকার ঢাকার শিক্ষিত লোকজন বাড়িটির নাম দিয়েছিলেন 'ড'স ফলি' বা ডসের ভুল নামে। কেন এই নামকরণ তা অবশ্য জানা যায়নি। তবে ধরে নিতে পারি, প্রচলিত ধারা উপেক্ষা করে, শহরে ঘর তৈরি না করে, শহরের বাইরে টিলা ও ঘর তৈরির জন্যই বোধহয় সবাই ভেবেছিলেন লোকটি কি বোকা!

॥ ৪ ॥

ঢাকা শহরের অবনতির মূল কারণ মসলিন ব্যবসার অবলুপ্তি, লিখেছেন ডেভিডসন। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের অবশ্য একই মত। তিনি আরো লিখেছেন, তখনও ১৫০ রূপী বা ১৫ পাউন্ড খরচ করলে দশগজ লম্বা উৎকৃষ্ট মানের এক টুকরো মসলিন পাওয়া যেতো। টেইলর জানাচ্ছেন, পাঁচ গজ লম্বা এবং নয় সিক্কা বা ১৬০০ গ্রেন ওজনের এক টুকরো উৎকৃষ্ট মানের মসলিনের দাম ছিলো ১০০ রূপী। এ ক্ষেত্রে টেইলরের হিসাবটিই মেনে নেওয়া ভালো। তবে, ডেভিডসন জানিয়েছেন, এত দাম হলে চাহিদা কম থাকবে এবং বিক্রি কম হবে।

সূক্ষ্মসূঁচের কাজ করা সিল্কের শালের কথা উল্লেখ করেছেন ডেভিডসন, যা প্রচুর পরিমাণে বাঁকে করে পাঠানো হতো কলকাতায়। খাঁটি রূপোর তৈরি বিভিন্ন ধরনের কানের দুল, যুক্তিযুক্ত দামে কম সময়ে সরবরাহ করা হয়।

আগে, ঢাকার শহরতলিতে হাজার হাজার মসলিন তাঁতী বসবাস করতেন। মসলিন তৈরির ব্যাপারটা এমনই ছিলো যে সব সময় সদা সতর্ক থাকতে হতো। সূর্যের আলো ও আবহাওয়া বিভিন্নতার কারণে এদের কাজ করতে হতো গভীর গর্ত করে। মসলিন উৎপাদন যখন বন্ধ হয়ে গেল তখন তাদের কর্মস্থলগুলি পরিত্যক্ত অবস্থায় রইলো। এখন বৃষ্টি হলেই এগুলি ভরে যায় এবং হয়ে ওঠে বিষাক্ত। কৃষি কাজের অন্বেষণে অধিকাংশ তাঁতী এখন ত্যাগ করেছেন ঢাকা। তাদের পরিত্যক্ত জমি সামান্য দামে পুঁজিপতিদের (ধনাঢ্যদের) অনুরোধ করা হয়েছে কিনে নেওয়ার জন্যে। কিন্তু কেউই আগ্রহ দেখায়নি কারণ তাদের মতে, ঐ পরিত্যক্ত ভূমি চাষাবাদের আওতায় আনতে গেলে যে খরচ পড়বে তাতে

পোষাবে না। ফলাফল হচ্ছে, শহরের আধামাইলের মধ্যে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বিষাক্ত জঙ্গল অবস্থিত। শুধু তাই নয়, শহর প্রান্ত দেখলেও বোঝা যায় এ শহরে দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে জনসংখ্যা।

ডেভিডসন যে সময়ের মসলিন ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন প্রায় ঠিক ঐ সময়ের (১৮৩৮) কিছু বিবরণ আমরা পাই টেইলরের গ্রন্থেও। জানিয়েছেন তিনি, ঐ সময় তাঁতীরা কাজ করতেন শর্তাধীনে। পাইকারের কাজ থেকে গ্রহণ করতেন তারা অগ্রিম। যারা দৈনিক বা মাসিক মজুরির বিনিময়ে কাজ করেন তাদের গড়পড়তা পারিশ্রমিক হলো আড়াই টাকা। এর সঙ্গে খুচরো কাজ করে আরো দশআনা পর্যন্ত উপার্জন করা সম্ভব। দশ থেকে বারো বছরের যেসব বালক শিক্ষানবিস দু'বছর কাটানোর পর পায় মাসে চার আনা। সুতাকাটার কাজেও সামান্য উপার্জন। অক্লান্ত পরিশ্রম করে একজন সূতাকাটিয়ে বছরে দুই সিক্কার বেশি সুতো তৈরি করতে পারে না। এ সুতা বিক্রি করে সে পায় ষোল টাকা বা বত্রিশ শিলিং। দিনে মাত্র এক পেনির মতো উপার্জন। অথচ টেইলর বলছেন, এই এক পেনি নাকি কাঁচামালের মূল্যের বারোশত গুণ অপেক্ষাও বেশি। একটু অবিশ্বাস্য মনে হয় না কি? তবে, এ হিসাব থেকে বোঝা যায় কেন তাঁতীরা মসলিন উৎপাদনের সঙ্গে আর জড়িত থাকতে চাননি।

ডেভিডসন যে জঙ্গলের কথা লিখেছেন তার উল্লেখ পাই রেভারন্ড রবিনসনের লেখায়ও। রবিনসন ছিলেন ব্যাপটিস্ট মিশনের পাদ্রি। ১৮৩৯ সালে মার্চ মাসে কাটরা থেকে তিনি গিয়েছিলেন তেজগাঁর পর্তুগিজ গির্জায়। লিখেছেন তিনি, ঢাকার দু'মাইল দূরে একটি গ্রাম-তেজগাঁ। এক সময় এটি ছিলো বর্ধিষ্ণু গ্রাম, বর্তমানে প্রায় পরিত্যক্ত। ঢাকা থেকে তেজগাঁ যেতে হলে ঘন এক জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। এক সময় এ জায়গাটুকুতেও ছিলো অসংখ্য সুন্দর বাগান। কোনও কোনও জায়গায় এখনও সেসব বাগানের প্রাচীর চোখে পড়ে। এ জঙ্গল দেখতে সুন্দর, কিন্তু বিপদও আছে এতে ওৎ পেতে। কারণ, বাঘের দেখা পাওয়া যায় এ জঙ্গলে।

এ প্রসঙ্গে তৎকালীন ঢাকার লোক সংখ্যারও কিছুটা উল্লেখ করা যেতে পারে। অবশ্য এ হিসাবটা আনুমানিক। ১৮২৪ সালের ঢাকার লোকসংখ্যা ছিলো ৩০,০০০। ১৮৩৭ সালে মাত্র ৬৮,৩৩৮।

ডেভিডসন নীলকরদের কথাও উল্লেখ করেছেন। শহরে, তাঁর মতে, আছেন বেশ ক'জন 'ধনী ও শ্রদ্ধেয়' নীলকর যারা, নীল উৎপাদন ছাড়াও সরকারি জমির স্পেকুলেট করেন যা তারা ভাড়া দেন জমিদার ও রায়তদের। বেশ আগে, এরা কফির চাষও শুরু করেছিলেন এবং তা ভালোও হতো কিন্তু রায়তদের অনাগ্রহের ফলে তখন তা লুপ্ত। এখানকার আবহাওয়া ও মাটি কফির জন্যে উপযোগী।

টেইলর জানাচ্ছেন, প্রায় ১,০০০,০০০ বিঘা জমি নীলচাষের অন্তর্গত এবং বাৎসরিক নীলের উৎপাদন আড়াই হাজার মণ। এর পেছনে পুঁজির পরিমাণ প্রায় তিনলাখ রূপী বা ত্রিশ হাজার পাউন্ড। শহরে আছে ষোলজন নীলকর এবং ব্যবসায়ী।

ঢাকায় সুপারির আধিক্যের কথা উল্লেখ করেছেন ডেভিডসন। লিখেছেন তিনি, এর উৎপাদন প্রচুর। শহরের কাছে অনেক ভারতীয় বাড়ি ঢেকে আছে সুপারির গাছে। এর ঋজু 'এলিগ্যান্স' দেখার মতো।

॥ ৫ ॥

ঢাকার তিনটি উৎপাদনের নাম এখন করা যায় কিন্তু আশ্চর্য যে, এ তিনটির কোনোটিই প্রচলিত পণ্য নয়। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো বেহালা, জানিয়েছেন ডেভিডসন। প্রচুর বেহালা তৈরি করা হয় ঢাকায় এবং তা বিক্রি করা হয় খুব সস্তায়। দু'টাকা বা চার শিলিংয়ে কেনা যাবে একটি বেহালা। চার শিলিংয়ে চমৎকার কাঠের তৈরি বেহালা ও ছড়! আশ্চর্য হয়ে গেছেন ডেভিডসন। ঢাকায় যারা আসেন তারা একটি বেহালা সংগ্রহ না করে গেছেন এমন শোনা যায়নি। দিন রাত সব সময় বেহালার শব্দ শোনা যাবেই। বাঙালিরা আসলে প্রচণ্ড গান পাগল [মিউজিক্যাল পিপল]। রাতে ঢাকার রাস্তায় হাঁটার সময় যদি কোনো দোকানে উঁকি দেন তা'হলে হয়ত দেখবেন একজন অক্লান্ত কারিগর বেহালা তৈরি করছেন, আরেক জন হয়তবা বেহালা বা সারেংগী বাজাচ্ছেন। আরো দেখা যাবে দলবেঁধে উঁচুস্বরে অনেকে গান গাইতে গাইতে হেঁটে যাচ্ছেন।

দ্বিতীয়টি হলো বিভিন্ন আকারের চুড়ি। মহিলা ও শিশুদের জন্যে তৈরি করা হয় এসব শাঁখার চুড়ি। কলকাতা থেকে প্রতি শ' আড়াই আনা করে কিনে আনা হয়। তিনশোর বেশি কারিগর এই কৌতুললোদ্দীপক উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত। কোতোয়ালির পিছে একটি রাস্তা দখল করে আছে এদের পুরো একটি দল। তাদের বাড়িগুলি ঢাকার সবচেয়ে পুরনো এবং সুন্দর। বাড়িগুলি মনে হয় যেন তাসের তৈরি। সব বাড়িগুলিই অলংকৃত ডরিক এবং করিনথিয়ান পিলার দ্বারা।

তৃতীয় উৎপাদিত পণ্যটি বাণিজ্যিক দিক থেকে উল্লেখ করার মতো নয়। তবুও ডেভিডসন উল্লেখ করেছেন সেই পণ্যের কথা। সেটি হচ্ছে মূর্তি। এবং তাও হঠাৎ করে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। একদিন সকালে হাঁটার সময় দেখলেন পাথর কাটাইয়ের ঘরের সামনে ভিড়। সবাই ব্যস্ত ঘর থেকে একটি [শিব] লিঙ্গ বের করার কাজে। এটি বিক্রি করা হয়েছে একশো পঁচিশ টাকায়। কালো পাথরে তৈরি চকচকে পালিশ করা, তিনফুট লম্বা ছিলো লিঙ্গটি।

আর একদিন শহরতলীতে হাঁটার সময় ডেভিডসনের নজরে পড়লো ছোট

এক নদীর ওপর ছিমছাম ঝুলন্ত এক সেতু। ১৮৩০ সালে মি. ওয়ালটার্স যখন ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট তখন তিনি জনসাধারণের চাঁদায় নির্মাণ করেছিলেন পুলটি। ডেভিডসন অবাক হয়ে মন্তব্য করেছেন পুলে ইংরেজি ও ফার্সী ভাষায় লেখা আছে, কিন্তু বাংলায় নেই যা এদেশের মাতৃভাষা।

ডেভিডসন ঢাকার বেহালা সম্পর্কে যে তথ্য দিয়েছেন সে ধরনের তথ্য আর কোথাও পাইনি। তবে এটা ঠিক ঢাকা ছিলো সঙ্গীতের পীঠস্থান। সে কারণে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সঙ্গীতজ্ঞ ও বাঈজীরা আসতেন ঢাকায়। এ ধারা আরো প্রবল হয়েছিলো ১৮৫৭ সালের পর। সংক্ষেপে এটুকু বলতে পারি, লখনৌ শহর বিখ্যাত ছিলো কণ্ঠ সঙ্গীতের জন্য। আর তবলা ও সেতার বাদনের জন্য ঢাকা ছিলো বিখ্যাত। উনিশ শতকের মধ্যভাগের ঢাকার সেতার বাদকরা সৃষ্টি করেছিলেন এ নিজস্ব ঘরানার। এ ঐতিহ্যের শুরু মুসলমান শাসকদের সময় থেকে, যখন ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে ওস্তাদরা আসতেন তাদের দরবারে আশ্রয় নিতে। ইংরেজরা বাংলায় আসার পরও একশো বছর ধরে এই ধারা অব্যাহত ছিলো।

ঢাকায় শাঁখারিরা সব সময়ই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, দলগত ভাবে বসবাস, তাদের নির্মিত বাড়িঘর এবং উৎপাদিত শাঁখার তৈরি জিনিসপত্রের জন্য।

জেমস ওয়াইজ লিখছিলেন, কিংবদন্তি অনুসারে, পূর্ববঙ্গে শাঁখারিরা এসেছিলেন বল্লাল সেনের সঙ্গে, বিক্রমপুরে তাদের সেই স্মৃতি বহন করছিলো একটি বাজার- শাঁখারি বাজার। সপ্তদশ শতকে মুঘলরা ঢাকায় এসে শাঁখারিদের নতুন শহর ঢাকায় নিয়ে আসা হয়েছিলো লাখেরাজ জমির প্রলোভন দেখিয়ে। ঢাকায় এসে শাঁখারিরা যে অঞ্চলে বসবাস শুরু করেছিলেন তাই আমাদের কাছে বর্তমানে পরিচিত শাঁখারি বাজার নামে। সেই ১৬৬৬ সালে তাভেরনিয়ার যখন ঢাকায় এসেছিলেন তখন তিনি এ অঞ্চলে বসবাস করতে দেখেছিলেন শাঁখারিদের। সেই থেকে এখনও পেশাদারী একটি গ্রুপ হিসেবে, শাঁখারিরা পুরনো রীতিনীতি প্রায় অক্ষুণ্ন রেখে এখনও ঠিক একই জায়গায় বসবাস করছেন।

শাঁখারিদের বাসগৃহের স্থাপত্য একটু স্বতন্ত্র ধরনের। ওয়াইজ অবশ্য এর একটি কারণ উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, যে লাখেরাজ জমি দেয়া হয়েছিলো শাঁখারিদের তা ছিলো আয়তনে ক্ষুদ্র। সেই আয়তন মেনেই নির্মিত হতো বাসগৃহ। সাধারণত এগুলি ছিলো দোতলা। সামনের মূল ফটক হতো ছ'ফিটের মতো। তারপর বিশ ত্রিশ ফুটের মতো লম্বা করিডোর চলে যেতো ভিতরে।

টেইলর লিখেছেন, সেখানে বহু চারতলা দালানের সম্মুখ ভাগে মাত্র আট বা দশ ফুটের মতো জায়গা রয়েছে। অপরদিকে পার্শ্ববর্তী দেয়ালসমূহ দরজা জানালাহীন নিচ্ছিদ্র এবং পশ্চাদদিকে বিশগজ পর্যন্ত প্রসারিত। এসব দালানের

কেবলমাত্র শেষ প্রান্তগুলো ছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত এবং একতলার ওপরে মধ্যবর্তী স্থান একটি ছোট প্রাঙ্গণের ন্যায় খোলা রাখা হয়। ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত শাঁখারিদের জমির জন্যে কোনো খাজনা দিতে হয়নি। কিন্তু ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় শাঁখারিরা তাদের লাখেরাজ জমির সনদপত্র দেখাতে না পারায় তাদের খাজনা দিতে বলা হয়েছিলো। টেইলর আরো জানিয়েছেন, ঐ সময় (১৮৩৮) ঢাকা শহরে জমির দাম বেশি ছিলো শাঁখারি বাজার ও তাঁতি বাজারে।

ওয়াইজ জানিয়েছেন, শাঁখারিদের অধিকাংশ ছিলেন নিরামিষভোজী এবং বিষ্ণু বা কৃষ্ণের অনুসরণকারী। ভাদ্রের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হতো তাদের প্রধান উৎসব। সে সময় পাঁচদিন তারা কাজ করতেন না এবং পুজো সরতেন অগস্ত্য ঋষির। তাদের মতে শংখ অসুর নামে এক দানবকে অগস্ত্য মুনি হত্যা করেছিলেন। হত্যার জন্য ব্যবহার করেছিলেন সে ধরনের করাত যে ধরনের করাত দিয়ে শাঁখারিরা শাঁখা কাটেন। শাঁখারি বাজারের বাইরে কোনো শাঁখারি বসবাস করলে তাকে করা হতো সমাজচ্যুত। সে কারণেই বোধহয় একই এলাকায় তারা বসবাস করছেন যুগ যুগ ধরে। তাই প্রায়ই মহামারী দেখা দিতো তাদের মধ্যে। পৌরসভা সে কারণে তাদের বাধ্য করতো প্রতিষেধক হিসেবে টিকা নিতে। শাঁখারি মহিলারা ছিলেন পর্দানশীন। শাঁখারিরা খুব অপমানিত বোধ করতেন কেউ যদি তাদের আবদুর রাজ্জাক বা রাজারাম রায়ের পোলা বলতেন। আবদুর রাজ্জাক ছিলেন একজন জমিদার। দ্বিতীয়জন ছিলেন বাংলার দেওয়ান রাজা রাজবল্লভের দ্বিতীয় পুত্র। কথিত আছে, তাঁরা নাকি প্রায়ই সুন্দরি শাঁখারি মহিলাদের নিয়ে যেতেন অপহরণ করে এবং তাদের প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে কেউ কিছু বলার সাহস পেতো না।

ডেভিডসন যখন ঢাকায় এসেছিলেন তখন ঢাকা শহরে শংখ কারিগরের সংখ্যা ছিলো প্রায় পাঁচশো। এ তথ্য জানিয়েছেন টেইলর। তাঁর মতে, শাঁখার অলংকার তৈরির জন্য তিন ধরনের কারিগর ছিলেন। যারা শাঁখা ভেঙ্গে পৃথক ও পরিষ্কার করতেন তারা চারশো বিশটি শাঁখার জন্য মজুরি পেতেন এক টাকা। মাসে এরা তিন থেকে চার টাকা উপার্জন করতেন। শাঁখার করাতিরা একশো শাঁখের জন্য দু থেকে চার টাকা পর্যন্ত আয় করতেন। শাঁখা মসৃণ, খোদাইকারীদের নিয়োগ করা হতো চুক্তির ভিত্তিতে। টেইলর আরো জানিয়েছেন, কলকাতা থেকে ঢাকায় আমদানিকৃত শাঁখের গড়পড়তা পরিমাণ ৩,০০৩,০০০।

ডেভিডসন যে পুলের কথা লিখেছেন তা আমাদের কাছে পরিচিত লোহার পুল নামে। এটি তৈরি করেছিলেন ঢাকার এক সময়ের জনপ্রিয় ম্যাজিস্ট্রেট ওয়ালটার্স। ১৮২৫ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত ছিলেন তিনি এ পদে। ঢাকার সাধারণ মানুষ তাঁকে পছন্দ করতেন এ কারণে যে, শহর উন্নয়নের জন্য আন্তরিকভাবে

তিনি বিভিন্ন কাজে হাত দিয়েছিলেন।

লোহার পুল নির্মাণ করা হয়েছিলো দোলাইখালের ওপর। এখানে পুল না থাকায়, খালের দু'ধারের লোকজনকে নানা ঝঞ্ঝাট পোহাতে হতো। তাছাড়া তখনকার উঠতি নারায়ণগঞ্জের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যও একটি পুল প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিলো। সরকারি নথিপত্র অনুযায়ী মুঘল আমলে এখানে একটি পুল ছিলো, কোম্পানি আমলে যা গিয়েছিলো ধ্বংস হয়ে।

ওয়ালটার্স পরিকল্পনা নিলেন দোলাইখালের ওপর পুল তৈরি করার। এর জন্য দরকার টাকার। ঢাকাবাসীর কাছে আবেদন জানালেন তিনি চাঁদার। ঢাকাবাসীরাও এ আহবানে সাড়া দিতে কার্পণ্য করেনি। ১৮২৮ সালে শুরু হয়েছিলো পুল নির্মাণের কাজ। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনা হয়েছিলো ইংল্যান্ড থেকে। উদ্বোধনের দিন প্রথমে একটি হাতি পার করানো হয়েছিলো পুল মজবুত হয়েছে কিনা দেখার জন্য। বর্তমানে আমরা যে লোহার পুল দিয়ে দোলাইখাল পার হই তা কিন্তু ওয়ালটার্সের তৈরি আসল পুল নয়, যদিও আদি নামটি রয়ে গেছে। ঢাকাবাসীরা তখন ওয়ালটার্সকে নিয়ে একটি ছড়া বেঁধেছিলেন–

ওয়ালটার্স সাব নে পুল বানায়া
উসকে নীচে গঞ্জ বসায়া
আওর চক ধারি কামান লাগায়া
গুর গুর চল...

॥ ৬ ॥

লোহার পুল পেরিয়ে কর্নেল ডেভিডসন পৌঁছলেন সুন্দর এক রাস্তায়। নদীর ধার ঘেঁষে পাগল পুল বা বোকার পুলের (ফুলস ব্রিজ) দিকে গেছে রাস্তাটি। রেভারেণ্ড শেফার্ডের নির্দেশনায় নির্মিত হয়েছে পুলটি। ডেভিডসন খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছেন কেন পুলটির নাম বোকা বা পাগলা পুল। তাঁর মতে, যে নদীর ওপর এটি নির্মিত হয়েছিলো তা গতি বদল করে ফেলেছিলো। এ ধরনের চিন্তার অবশ্য কোনো যৌক্তিকতা নেই। ডেভিডসন জানিয়েছেন, শহরের এটিই সবচেয়ে সুন্দর রাস্তা, তবে পূর্বের ঘন জঙ্গল তাঁর মনোপুত হয়নি। পুরো রাস্তায় চোখে পড়ে মাঝে মাঝে গরিব কিন্তু ছবির মতো গ্রাম ও নিঃসঙ্গ কুটির।

এই পাগলা পুলের কথা ডেভিডসন ছাড়াও আরো অনেকের স্মৃতি কাহিনীতে উল্লেখিত হয়েছে। ১৬৬৬ সালে ট্যাভারনিয়ার যখন ঢাকায় এসেছিলেন, তখন লিখেছিলেন, ঢাকা থেকে আধক্রোশ ভাটিতে আছে আরেকটি নদী-পাগলা। নদীর ওপর আছে সুন্দর একটি পুল যা তৈরি করেছিলেন মীর জুমলা। আরো লিখেছেন তিনি, নদীর দু'পাশে আছে বেশ কিছু টাওয়ার যেখানে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে

ডাকাতদের মুণ্ডু।

একদিন সকালে ডেভিডসন গেলেন গ্রিকদের গির্জা পরিদর্শনে। গির্জাটিতে এমন কিছু ছিলো না যা উল্লেখ করার মতো। এর চূঁড়োয় আছে একটি ক্রুশ। পাদ্রী একজন ইউরোপিয় গ্রিক, দেখতে বেশ হ্যান্ডসাম, থাকেন গির্জার আঙ্গিনায় ছোট একটি ঘরে। ডেভিডসনের কেরানী তাকে জানিয়েছিলেন, শহরে এখন গ্রিকদের সংখ্যা কম কারণ তারা বাঁচে না বেশি দিন। তবে ইঙ্গিত দিলেন যে, ভারতীয় রমণী ও গ্রিকদের মধ্যে বিয়ের চল ছিলো। পুরোহিতদের দ্রুত মৃত্যুর কারণ যে কেউই বলে দিতে পারবে। কারণ তাদের বাড়ি বদ্ধ এক গলির মধ্যে। যার আশেপাশে বিষাক্ত নর্দমা কখনও যা পরিষ্কার করা হয়নি। গির্জাটি ত্রিশ ফুট লম্বা আর বিশ ফুট চওড়া। ঘরের পূর্ব কোণে মাঝামাঝি দুটি বড় মোম জ্বলছে। মাঝামাঝি টাঙ্গানো ভার্জিন মেরির একটি ছবি; তাকিয়ে আছেন তিনি বিছানায় শুয়ে থাকা যিশুর দিকে, যার বয়স দেখলে মনে হয় তেরোর মতো। পাশে যোশেফ। এর বাঁ দিকে সাত আট ফুট উঁচু কুমারি মেরির ছবি, দেখলে মনে হয় পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হবে তাঁর। এছাড়া আরো আছে যিশু, জিবরাইল ও আরো দেবদূতের ছবি, এগুলি আঁকা হয়েছে কাঠ বা তামার ওপর। বাড়িটি তেলরংয়ে করা মিনিয়েচারের মতো, চমৎকারভাবে বার্নিশ করা। বছর পাঁচেক আগে গ্রীস থেকে এগুলো যোগাড় করা হয়েছে। এছাড়াও আছে রাফায়েলের অনুকরণে 'লাস্ট সাপার' এর একটি ভালো প্রিন্ট। ছবিগুলির নিচে, মেঝেতে আছে একটি পাথর যাতে জনৈক গ্রিক ভদ্রলোকের স্মৃতিতে উৎকীর্ণ করা আছে ইংরেজি ও গ্রিক লিপি।

ডেভিডসন আরো জানিয়েছেন, রেসকোর্সের পাশে আছে গ্রিকদের একটি কবরস্থান। সমাধিগুলো অলংকৃত বা সুন্দর কোনোটিই নয় বরং সবগুলো বড়ই নোংরা ও অবস্থা খারাপ। এগুলো দেখাশোনার জন্য দারোয়ান থাকা সত্ত্বেও পুরো চত্বরটি গরু বাছুর আর ছাগলে পূর্ণ।

আরেকদিন ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট মি. স্কিনারের সঙ্গে হাতিতে চড়ে যাচ্ছিলেন ডেভিডসন। তখন তিনি তাঁকে জানালেন, ঢাকায় আছে একটি হর্টিকালচারাল সোসাইটি এবং সমিতির একটি বাগানও আছে। বাগান বলে তিনি যা দেখলেন তা একটি অপরিচ্ছন্ন মাঠ। বাগানে সেচের ব্যবস্থা করতে গিয়ে চাঁদার টাকা গেছে শেষ হয়ে। বাগানে আছে মরিশাসের কিছু আখ এবং কিছু চারা যা দেখতে 'কটন বুশ' এর মতো। তবে, লিখেছেন ডেভিডসন, স্কিনার না দেখালে এ বাগান তার চোখে পড়তো না।

এ সময় মজার একটু দৃশ্য দেখলেন ডেভিডসন। কিছু বাঙালি, চুল তাদের অদ্ভুতভাবে আঁড়ানো-দূর থেকে মনে হয় যেনো ইউঝোপ।

বেশ কয়েকদিন ডেভিডসনের চোখে পড়েছে, মহিলারা মাথায় করে বিরাট

বিরাট কচ্ছপ নিয়ে যাচ্ছেন বিক্রি করার জন্যে। এর একেকটির ওজন বিশ থেকে ত্রিশ পাউণ্ড। দাম পাঁচ পয়সা বা দুই পেন্সের মতো। জেলেদের এটি খেতে বাধে না এবং নিম্ন বর্ণের লোকেরাই গ্রহণ করে এ ধরনের অপবিত্র খাদ্য। ডেভিডসনের মনে হয়েছে, বোম্বের মতো এখানেও ঝড়ের সময় সামুদ্রিক কচ্ছপ তীরে এসে মাঝে মাঝে আছড়ে পড়ে।

একদিন ঘোড়ায় চড়ে রাস্তায় বেড়াচ্ছেন ডেভিডসন। এমন সময় চোখে পড়লো একজন বৃদ্ধ চীনা, তারপর আরেকজন, এমনি করে প্রায় ডজনখানেক। ডেভিডসন চীনে ভাষায় তাদের সম্বোধন করলে তারা খুব অবাক হয়ে গেল। থেমে গেল সবাই, উজ্জ্বল হয়ে উঠলো আনন্দে আর চিৎকার করে বলতে লাগলো, 'চীন চীন!' তারা চা উৎপাদক; যাচ্ছেন আসাম। সেখানে চা কোম্পানিতে যে সব দেশীয়রা আছেন তাঁদের শেখাবেন চা এর উৎপাদন কৌশল। ডেভিডসন তাঁদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করলেন যে, পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তাঁদের শ্রমের ফলে শুধু চায়ের দাম কমবে না, ইউরোপে যে চা পান করা হয় তার গুণগত মানও বৃদ্ধি হবে, এমনও হতে পারে এখানে এক সময় এমন চা তৈরি হবে এবং সে সব দেশে ভারতীয় চা এর বিরাট বাজার হবে, যে বাজারে এখন এক হাজার পাউণ্ডের বেশি চা বিক্রি হয় না।

মি. ওয়াইজের সঙ্গে কথা বলার সময় ডেভিডসন বেশ কৌতূহলোদ্দীপক একটি তথ্য জানতে পেরেছিলেন। ত্রিপুরাবাসীরা অনেক দিন থেকে চা পান করে। ঐ অঞ্চলে চা গাছ জন্মে। চা এর পাতা তোলার পর তারা তা একটি বাঁশের ফোকরে রাখে। সাত আট দিন পর সেই শুকনো পাতা ফুটানো পানিতে ভিজিয়ে সে পানি পান করে।

তা সত্ত্বেও বলতে হয় চা পাতা আবিস্কৃত হয়েছে মাত্র। আগে জানলে, ফরাসিরা যখন প্রথমে এখানে এসেছিলো তখনই হয়ত ত্রিপুরায় চা উৎপাদন কারখানা গড়ে তুলতো। ইয়াংকিরা এর সাফল্যের জন্য মন দিতো রেলরোড বা ষ্টিল বোট নির্মাণে। মন্তব্য করেছেন ডেভিডসন, "এ দেশের উৎপাদনের প্রতি যে অবহেলা ও আলস্য দেখিয়েছে আমাদের দেশ, বিশ্বের কোনো দেশ তা দেখায়নি, এ মুহূর্তে ভারতে আছে অনাবিস্কৃত সম্পদের ভাণ্ডার।"

ঢাকার পিলখানা দেখতে গিয়েছিলেন ডেভিডসন। চাটগাঁ ও তার আশপাশের অঞ্চল থেকে কুকিরা হাতি ধরে, তারপর এখানে পাঠানো হয় পোষ মানানোর জন্য। ডেভিডসন যখন গেলেন পিলখানা দেখতে তখন সেখানে হাতির সংখ্যা ১২৫; বেশির ভাগই বাচ্চা এবং এগুলিকে কাজে লাগানোর জন্যে প্রস্তুত করতে বেশি খরচ হবে। ডেভিডসনের মনে হয়েছে খোলা জায়গায় এভাবে তাদের না রেখে আশপাশের আম বাগানে রাখলে এদের ভালো হতো কারণ তা হলে সব

ধরনের তাপমাত্রার সঙ্গে তারা মানিয়ে নিতো। হাতিগুলোকে স্নান করানোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয় নদীতে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় বছর পঁচিশেক পর, পিলখানার হাতিদের চরাবার জন্য জায়গা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিলো। এর আগে হাতি চরাবার জন্য জায়গা ছিলো না। ১৮৬৪ সালে, লে. গভর্নর ঢাকায় এলে, 'ঢাকা কমিটি'র সদস্যরা জানিয়েছিলেন, হাতিরা শহরে সৃষ্টি করছে 'সিরিয়াস নুইসেন্স'এর। এর পরিপ্রেক্ষিতে খুব সম্ভব বিস্তীর্ণ রমনা এলাকা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিলো হাতি চরাবার জন্য। পিলখানা থেকে রমনায় হাতি নেওয়ার জন্য যে পথটি ব্যবহৃত হতো কালক্রমে তাই পরিচিতি লাভ করেছিলো এলিফ্যান্ট রোড নামে।

১৮৪১ সালের চৌঠা ফেব্রুয়ারি কর্নেল ডেভিডসন রওয়ানা হলেন সুন্দরবনের দিকে। লক্ষ্য কলকাতা। ঢাকা থেকে এ জন্য ভাড়া করেছিলেন তিনি বিরাট এক বজরা এবং 'খুব বড়' দুটি পুলওয়ার। কলকাতায় পৌঁছেছিলেন তিনি একুশে ফেব্রুয়ারি।

ডেভিডসন তাঁর ঢাকা ভ্রমণ শেষে ঢাকা সম্পর্কে একটি মন্তব্য করেছেন যা দিয়ে শেষ করবো এ নিবন্ধ। লিখেছেন তিনি–

"মূল শহরের প্রান্ত থেকেই জঙ্গলের সীমানা। প্রায় দু'মাইল বিস্তৃত অঞ্চলটি ছবির মতো পুরনো মসজিদ, স্মৃতিস্তম্ভে সাজানো যা এ শহরের অতীত গৌরবের সাক্ষী। আগন্তুকরা সকাল বা বিকেলে যখন ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবেন তখন", লিখেছেন ডেভিডসন, "শহরকে ঘিরে আছে যে জঙ্গল তা এড়িয়ে চলবেন বিশেষ করে সূর্যাস্তের সময়। এ বিষয়ে আমি তাদের সতর্ক করে দিচ্ছি। ঐ সময় জঙ্গল ও শহরের সীমান্ত পেরুবার বা শহরে ঢোকার সময় শরীর হঠাৎ কাঁটা দিয়ে ওঠে।"

কিন্তু কেন শরীর শিউরে উঠতো? সেটি কি অশরীরি কোনো কারণে, নাকি রাইডার হ্যাগার্ডের নায়ক হিসেবে নিজেকে কল্পনা করে, তা অবশ্য ডেভিডসন উল্লেখ করেননি।

৬
পুরনো বাসিন্দার চোখে ময়মনসিংহ

'পুরনো বাসিন্দা'র অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই প্রথমে দেখা যাক উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ময়মনসিংহের আর্থ-সামাজিক অবস্থা। ঢাকা থেকে ১০০ মাইল উত্তরে, ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে ময়মনসিংহ। দৈর্ঘ্যে ৯০ মাইল, প্রস্থে ৬৭ মাইল, অন্য কথায় এর আয়তন ৫ হাজার বর্গমাইল। বিঘায় হিসাব করলে ৭,৪৬৮,৮০২ বিঘা। এর রাজস্ব নির্ধারিত হয়েছিলো ১,১৪৮,৭৭৭ রুপি। কিন্তু রাজস্ব আয় হচ্ছে বছরে ৭৮৯,০০০ রুপি। পুলিশের হিসাব অনুযায়ী জেলায় গ্রামের সংখ্যা ৫৫৮০, বাজার বা সিভিলিয়ানদের ভাষায় 'স্মল টাউন'-এর সংখ্যা ৩০০। জেলায় বাড়ির সংখ্যা ১৬৮,৯৭৭টি এবং জনসংখ্যা ৮২৪,১০৪। কালেক্টরের কাছে রাজস্ব জমা দেন এমন ভূমি মালিকের সংখ্যা ৬০০০। ময়মনসিংহে বৃষ্টিপাত কেমন হয় তার হিসাব দিতেও ভুলেনি লেখক। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বছরে ১০৬ কিউবিক ইঞ্চি। তাপমাত্রা ৫২ থেকে ৯০ ডিগ্রি।

ময়মনসিংহের মাটি খুব উর্বর তবে বালুময় এলাকাও আছে। এক-চতুর্থাংশ জমি পতিত অবস্থায় থাকে। জমির খাজনা প্রতি বিঘা ৬ পেন্স বা শিলিং, প্রতি একরে ৮ পেন্স থেকে ২ শিলিং।

বর্ষা মৌসুম শুরু হয় মে মাসে। শেষ হয় অক্টোবরের শেষে। তখন স্টেশন অর্থাৎ সদরের আশপাশ ছাড়া সব জায়গায় চলাচলের প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে নৌকা। জেলার যে কোনো প্রান্ত থেকে হেঁটে এলে সদরে পৌঁছতে সময় লাগে চার দিন। নৌকায় ছয় থেকে আট দিন। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সপ্তাহে একদিন অভিযোগ জানান যায়। পেয়াদার মারফত শমন পাঠাতে লাগে এক সপ্তাহ। পেয়াদারা আবার বছরে ছয় মাস 'নৌকা অ্যা-লাউন্স' পায়। সাধারণ একটি মামলার মীমাংসা করতে লাগে দুই মাস।

সে সময়, সারা জেলায় ছিলেন একজন জজ, একজন কালেক্টর, একজন ম্যাজিস্ট্রেট এবং একজন ডাক্তার পরে যিনি সিভিল সার্জন হিসেবে পরিচিত হয়ে

ওঠেন। এই ক'জন মিলেই ছিলো কোম্পানির প্রশাসন এবং তারা ইংল্যান্ডের তিনটি কাউন্টির সমান একটি এলাকা চালাতেন। আদালতের কার্যক্রম চলে ফারসি ভাষায় যে ভাষা দেশীয়রা জানে না, কর্তৃপক্ষও জানে না। 'ওল্ড রেসিডেন্ট' মন্তব্য করেছেন, নরমান বিজয়ের আগে ইংল্যান্ডের অবস্থা যেমন ছিলো, ভারতবর্ষের অবস্থা এখন সেরকম। "এ অবস্থায় কি জীবন সম্পত্তি নিরাপদ?" প্রশ্ন রেখেছেন তিনি। এ পরিপ্রেক্ষিতে পুরনো বাসিন্দা দুটি উদাহরণ তুলে ধরেছেন।

ঘটনাটি ২৫ বছর আগের যখন তিনি বাস করতেন জেলার দক্ষিণাঞ্চলে। ঢাকা ও রংপুর জেলার দুই জমিদার ঠিক করলেন দুটি মেয়েকে তুলে নেবেন। মেয়ে দুটির মায়েরও তালুক ছিলো যার উত্তরাধিকারী মেয়ে দুটি। এদের একজনের বয়স ১২ আরেকজনের ১৪। পরিকল্পনামতো জমিদার দুজন দুতিনশ লাঠিয়াল নিয়ে একই দিনে মেয়ে দুটিকে তুলে যার যার জেলায় চলে গেল এবং কাজির সামনে মেয়ে দুটিকে বলতে বাধ্য করাল যে, তারা স্বইচ্ছায় এসেছে। মা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আবেদন জানালেন, কিছুই হলো না। জমিদার দুজন দুটি মেয়ের স্বামী হিসেবে বিধবার তালুক, ভাগ করে নিল। ২০ বছর পর 'পুরনো বাসিন্দা' রংপুরের জমিদারের মালিকানাধীন জোর করে বিয়ে করা মহিলার ময়মনসিংহ তালুকের একটি অংশ কেনেন। তার স্বামী অর্থাৎ রংপুরের জমিদার তখন কোনো মামলার আসামি হিসেবে ফেরার, তালুকটি ঋণভারে জর্জরিত এবং মহিলাও মৃত। এ সময় হেড এজেন্টরা 'পুরনো বাসিন্দা'র কাছে এলেন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাগজ নিয়ে। এগুলো ছিলো মৃত মহিলার উইল সংক্রান্ত। কাগজপত্র অনুসারে তার একমাত্র পুত্রকে একজন অভিভাবকের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে, যিনি অর্থ গ্রহণ বা ঋণ নিতে পারবেন। "এর উদ্দেশ্য ছিলো আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে মামলা চালানো। কাগজপত্রগুলো ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলাম স্বাক্ষরগুলো একই ধরনের। কম্পাস দিয়ে মেপে দেখা গেল স্বাক্ষরগুলো একই আকারের। আমি এজেন্ট তিনজনকে কয়েকবার তাদের নাম লিখতে বললাম এবং মেপে দেখলাম প্রত্যেকটি স্বাক্ষরেই পার্থক্য আছে। তারাও অবাক হয়ে গেল। ঘোষণা করলাম, স্বাক্ষরগুলো জাল। আসলে রংপুরের আদালতের আমলারা টাকার বিনিময়ে জাল দলিল তৈরি করে দিয়েছিলো। তালুকটি অন্য একজনকে দেওয়া হলো।"

আরেকটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন তিনি সিরাজগঞ্জ মহকুমায় নিয়োগ পেয়েছিলেন একজন বুদ্ধিমান সাব-অ্যাসিসটেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট। একদিন তিনি রাতে খেতে বসেছেন এমন সময় হল্লাচিল্লা শুনে বারান্দায় এলেন। দেখলেন খাটিয়ায় করে চারজন একটি বালককে বয়ে এনেছে। তার শরীর কাদা আর রক্তে মাখামাখি। তারা জানাল, ছেলেটি মাঠে লাঙ্গল দিচ্ছিল এবং প্রতিবেশী জমিদারের ২০-৩০ লাঠিয়াল এসে হামলা করে। একটি বর্শা তার পায়ে গেঁথে যায়।

রক্তক্ষরণে সে মারা যায় এবং মৃত্যুর আগে সে ২০ জন হামলাকারীর নাম বলে গেছে। ম্যাজিস্ট্রেট ভাবছিলেন, বলবেন লাশটি নিয়ে যেতে। হঠাৎ তার মনে হলো ক্ষতগুলো একই জায়গায় হয়নি। তিনি আঙুল দিয়ে ক্ষতগুলো পরীক্ষা করে দেখলেন কোনোটিই আধা ইঞ্চির বেশি নয়। তখন ছেলেটি হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠলো। ম্যাজিস্ট্রেট বিচক্ষণ না হলে ২০ জন লোককে ১৪ বছর জেলের ঘানি টানতে হতো। ১ হাজার জনের মধ্যে হয়তো ৪০০ জনের শাস্তি হয়। তারও কারণ হলো, দারোগা তাদের ওপর অত্যাচার করে স্বীকারোক্তি আদায় করে এ আশ্বাস দিয়েছিলো যে বিচারে তারা খালাস পাবে।

লেখক জানাচ্ছেন, ২০ বছর আগে ময়মনসিংহে যে নিপীড়ন ও দুর্নীতি ছিলো তা উৎপাটনে সরকার কী ব্যবস্থা নিয়েছে? সরকার দুজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে দুটি মহকুমা স্থাপন করেছে। আমলাদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে। যেমন– নেটিভ দারোগারা মাসে এখন ২৫-৩০ টাকার বদলে ৫০ ও ১০০ করে বেতন পাচ্ছে। ফেরি ফান্ড কমিটির অধীনে দেওয়া হয়েছে জেলার রাস্তাগুলো। বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য পরগনা স্কুল করা হয়েছে। তার মতে, আরো অনেক কিছু করার আছে, খালি বেতন বৃদ্ধিতে কাজ হবে না। প্রতিটি জেলায় একটি স্কুল থাকা দরকার, যাদের চাকরির জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। পুরো পুলিশ বাহিনীর সংস্কার করতে হবে। প্রতি জেলায় এদের তত্ত্বাবধানে থাকবে একজন করে সুপরিনটেনডেন্ট। কোনো জেলায় যদি ২০ জন দারোগা থাকে তবে চারজন হওয়া দরকার খ্রিস্টান, দুজন নেটিভ ও দুজন ইউরোপিয়ান, যাদের বেতন হবে মাসে ১৫০ থেকে ২০০ রুপি। প্রতি জেলায় থাকা দরকার একজন পাবলিক প্রসিকিউটারের। যারা আদালতে প্র্যাকটিস করবে তাদের আরো পরীক্ষা নিতে হবে। একই ধরনের মাপ ও ওজন প্রত্যেক এলাকায় প্রচলন করতে হবে।

লেখক জানাচ্ছেন, প্রতিবছর হাতুড়ে চিকিৎসকদের হাতে হাজারখানেক লোক মারা যায়। এসব ডাক্তার ব্যবহার করে কাঁচা আর্সেনিক এবং বিষাক্ত ওষুধ। সরকার এ ক্ষেত্রে একটা মানবিক কাজ করতে পারে, তা হলো মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করা ডাক্তার প্রতি জেলায় নিয়োগ করা। তাদের মাসে ৫০ রুপি করে দেয়া হবে। ব্যক্তিগত প্র্যাকটিস করে তারা যা পায় তা তাদের থাকবে। তিন বছরের মধ্যে তারা থিতু হলে মাসোহারা বন্ধ করে দেওয়া যাবে। শোনা যাচ্ছে জানিয়েছেন তিনি, প্রত্যেক জেলায় স্মল জজ কোর্ট স্থাপন করা হবে। সবচেয়ে ভালো হয় তার মতে, সেখানে যদি বিচারক হিসেবে কিছু জমিদার এবং প্ল্যান্টারকে জাস্টিসেস অব দি পিস হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়, যারা ছোটখাটো মামলা নিষ্পত্তি করবে। তাহলে সস্তায় গরিবের কাছে বিচার পৌঁছে দেওয়া যাবে। মামলায় জুরি ব্যবস্থা চালু করলে লোকের মধ্যে বিচার সম্পর্কে ধারণা জন্মাবে।

সিভিলিয়ানরা এমন জীবনযাপন করেন যে, তাদের সঙ্গে নেটিভদের কোনো যোগাযোগ নেই। তারা যে তাদের অভাব-অভিযোগ জানাবে সিভিলিয়ানদের কাছে সে মাধ্যমও নেই।

অ্যাটর্নির (মোক্তার) মাধ্যমে হয়তো তারা তাদের অভিযোগ পৌঁছাতে পারে কিন্তু সে বয়ানটিও হয় অতিরঞ্জিত। লেখক জানাচ্ছেন, মিথ্যা সাক্ষী এত প্রচলিত যে বলার নয়। এর প্রতিকার হিসেবে তিনি প্রস্তাব করেছেন যেমন– জজের কাছে মিথ্যা সাক্ষী প্রদানের শাস্তির জন্য প্রদান না করে কোর্টকেই সেই ক্ষমতা দেওয়া উচিত।

জমি ও জমির খাজনা সম্পর্কেও লেখক মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। তার মতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার বা বাংলার জনগণের জন্য একটি উপকারি কাজ করেছেন। পরবর্তীকালে অনেক গবেষকও কোম্পানি বা ইংরেজ সরকারের মতামতই তুলে ধরেছিলেন। লেখকের মতে, জমির মালিকরা সবসময় ঋণে জর্জরিত থাকে। 'আমি অনেক গ্রামের রায়তদের জানি যারা মহাজনদের কাছে দুতিন বছর ধরে ঋণী।' ময়মনসিংহ থেকে সরকার প্রতি বছর ৭ থেকে ৮ লাখ রৌপ্য মুদ্রা হাতিয়ে নেন। এ অঞ্চলের প্রধান উৎপাদন মোটা চাল যা রপ্তানিযোগ্য নয়। অর্থাৎ রপ্তানি করার সময়টুকু পর্যন্ত তা টিকে থাকবে না। উত্তর ভারতে কিছু চাল রপ্তানি হতো তাও প্রতিবছর কমছে। চাষিরা ধান বীজ ধার নেয় মহাজন থেকে কিন্তু শর্তগুলো রায়তের বিপক্ষে। অর্থাৎ ফসল ওঠার পর তা চলে যায় মহাজনের হাতে। পাটের বাজার তৈরি হচ্ছে কিন্তু সে সময়ই দেখা যাচ্ছে চাষি কীভাবে বঞ্চিত হচ্ছে মূল্য থেকে। লন্ডনে প্রতি টন পাটের মূল্য ছিলো ১৫ পাউন্ড আর এখানে চাষিকে বিক্রি করতে হয় প্রতি মণ আটআনা (এক টাকায় দুই মণ) বা ৩০ শিলিংয়ে। লেখক জানাচ্ছেন, ইংল্যান্ডে ফিরে তিনি দেখেছেন সাদার্যান্ডের কোনো কৃষক যার ১০ হাজার ভেড়া আছে তার অবস্থা বাংলার জমিদার থেকে ভালো।

পুরনো বাসিন্দা থানা পুলিশ আর আদালতের আমলাদের কার্যকলাপ নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন। সে বিবরণের সঙ্গে বর্তমানে খবরের কাগজে যা পড়ি তার কোনো অমিল নেই। পুলিশ বা দারোগা ছিলো নিপীড়ক। তাদের সঙ্গে জমিদারের ভালো সম্পর্ক থাকত। টাকা সে রাজা-প্রজা দু'তরফ থেকেই নিতো কিন্তু শাস্তিটা দিতো প্রজাকে। কোনো গ্রামে কোনো দারোগার পদার্পণ মানেই ছিলো ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ। গ্রামের অবস্থা বুঝে দারোগাকে ঘুষ দিতে হতো ৩০ থেকে ২০০ রুপির। হয়তো এ কারণেই আগে গ্রামের মুরব্বিরা আশীর্বাদ করতেন এ বলে যে ভবিষ্যতে দারোগা হও। যাকে গ্রেফতার করা হতো তাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে হাজির করতে বলা হলেও সাত-আট দিনের আগে হাজির করা হতো

না। এ সময়টা নির্যাতন করে স্বীকারোক্তি আদায় করা হতো। থানার অবস্থাও খুব খারাপ। জীর্ণ। বন্দিদের রাখার কোনো বন্দোবস্ত নেই। গরু-ছাগলের মতো হাত-পা বেঁধে তাকে ফেলে রাখা হয়। প্রতি থানার জন্য সরকারি বরাদ্দ বার্ষিক ১৫ থেকে ২০ রুপি।

আদালতের আমলারাও যেভাবে পারে টাকা হাতিয়ে নেয়। মিথ্যা সাক্ষী একটি প্রচলিত ব্যবস্থা। অনেকে মিথ্যা সাক্ষী দিতে পারে এমন দু-একজন লোক বেতন দিয়ে পোষে। এমনও দেখা গেছে, একই সাক্ষী ৫০টি মামলায় সাক্ষী দিচ্ছে। অন্যান্য সিভিলিয়ানদের লেখায়ও আদালতের একই চিত্র ফুটে উঠেছে।

পুরনো বাসিন্দা সবশেষে লিখেছেন, "নেটিভ অফিসারদের সম্পর্কে আমি কড়া মন্তব্য করেছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলব যে, ব্যবস্থা যদি উন্নত করা হয় এবং তাদের যথোপযুক্ত বেতন দেওয়া হয় তাহলে তারা সরকারের প্রয়োজনীয় ভৃত্যে পরিণত হবে। আমরা কীভাবে এসব লোকদের কাছে সততা আশা করব যেখানে তাদের এত কম বেতন দেওয়া হয়।"

৭
সিভিলিয়ান ও শিকার

চিঠি: ১

১৮৪৭ সালের নোট থেকে সিমসন লিখেছেন, সময় বদলে যাচ্ছে। আগে যেখানে যা পাওয়া যেতো, এখন সেখানে তা নাও পাওয়া যেতে পারে। যেমন, আগে ত্রিপুরা [কুমিল্লা] ও সুধারামের [নেয়াখালি] মাঝামাঝি জায়গায় শিকারের জন্য বরাহ পাওয়া যেতো, এখন তা যাচ্ছে না। সিমসন নিজে বেশি শিকার করতেন সিদ্দি ও হিঙ্গুটিয়া নামে একটি চরে চা মেঘনায় তলিয়ে গেছে।

চিঠি: ২

শিকারে যাওয়ার আগে প্রয়োজন একজন ভালো শিকারি। এবং সে শিকারি মুসলমান হওয়া বাঞ্চনীয়। কারণ, পূর্ববঙ্গে শিকারের সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে নদী-নালায় নৌকা ব্যবহার করতে হবে এবং সে জন্য লাগবে ভালো একজন মাঝি, মাঝি-মাল্লা মুসলমান হলে ভালো কারণ খাওয়ার ব্যাপারে তাদের জাত-পাতের বালাই নেই। মাহুতরাও মুসলমান।

শিকার সম্পর্কে খোঁজখবর পাওয়া যাবে মুসলমান গ্রাম থেকে। হিন্দু গ্রাম থেকে নয়। কারণ, ধর্মীয় কারণে, হিন্দুরা প্রাণীহত্যা পছন্দ করে না। সে জন্য জীব জন্তুর খবরাখবর দিতে চায় না। মুসলমানরা প্রত্যন্ত জঙ্গল আবাদ করে সুতরাং তারা জানে কোথায় কী পাওয়া যাবে। হিন্দুরা পরিবার পরিজন আঁকড়ে পুরনো জায়গায় থাকতেই ভালোবাসে। সিমসন লিখেছেন, "এ সবতো বটেই, প্রয়োজনে আরো অনেক কারণ দেখাতে পারি হিন্দু শিকারি না নেওয়ার।" তবে তিনি সাবধান করে দিয়েছেন এ বলে যে, কলকতার শিকারি না নেওয়াই ভালো। কারণ সে স্নাইপ ছাড়া আর কোনো কিছুর খবর রাখে না। শিকারি পাওয়া অবশ্য সহজ না। "যদি শোনেন কোনো ভালো শিকারি আছে কিন্তু কোনো সাহেবের ভৃত্য ছিলো না তবে তাকে বাদ দেয়া ভালো, তখন বরং পুলিশ চাকুরির উমেদারদের মধ্যে

খোঁজখবর করা ভালো।”

শিকারি পেলে তাকে বেঁধে রাখার উপায় সহৃদয় ব্যবহার ও ভালো মাইনে। এ ছাড়া তার পরিবারের খোঁজখবর রাখা, কাপড়চোপড় দেয়া, পারলে ছেলে, ভাগ্নে-ভাতিজাকে চাকুরি দেয়া, প্রয়োজনে ছুটি দেয়া এসবই করতে হবে। তা হলেই সে একান্ত অনুগত ও বাধ্য থাকবে এবং খুবই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে।

চিঠি: ৩

ঢাকায় যদি পোস্টিং হয়, তা হলে খুব ধারেকাছে স্নাইপ শিকারে যাওয়া যাবে না, তবে খোঁজখবর করে ত্রিপুরায় একজন শিকারি পেলে একটা বন্দোবস্ত করা যাবে। সে ক্ষেত্রে, লিখেছেন সিমসন, “অফিসের পরপরই ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে যান নারায়ণগঞ্জ। নৌকায় তারপর রওয়ানা হন দাউদকান্দি। রাতেই পৌঁছে যাবেন সেখানে। ধলপহরে ঘোড়া হাঁকান কুমিল্লার প্রান্তে বড় কামতায়। সেপ্টেম্বর অক্টোবর ও নভেম্বরে ত্রিপুরায় সাহেবরা আপনাকে এরপর নিয়ে যাবে স্নাইপ শিকারের জায়গায়। আমি নিজে তা করেছি; অন্যদেরও তা করতে দেখেছি। তবে, স্নাইপ শুটিংয়ের জন্য এতো ঝামেলা কেউ করতে চাইবে না”, জানিয়েছেন সিমসন, “তবে ঝামেলা ছাড়া আর টাকা খরচ না করলে কোনো স্টেশনেই ভালো শিকারের আশা করা যায় না।”

অনেক বছর ধরে ঢাকার সিভিলিয়ানরা, কখনও কখনও শুধু তারাই ত্রিপুরায় দাউদকান্দি ও দক্ষিণে বরাহ শিকার করেছে। তারা ছাড়া অনেকদিন সেখানে কেউ শিকার করেনি।

চিঠি: ৪

স্নাইপ শিকারের জন্য ত্রিপুরা ভালো, নোয়াখালিতেও স্নাইপ শিকারে বেরুলে মোটামুটি ব্যাগ ভর্তি করে ফেরা যায়। মেঘনার চরও সুন্দর। চাঁটগায় স্টেশনের কাছে এবং আলি শহরে [হালিশহরে] সমুদ্রতীরে স্নাইপ পাওয়া যায়। প্রায় প্রতি পরগনায় পাহাড়ের পাদদেশে রাজশাহী, ময়মনসিংহ, মালদহ প্রায় প্রতি জেলায়ই স্নাইপ পাওয়া যাবে। তবে, বাখরগঞ্জ থেকে ঢাকা সদর স্টেশনের মাঝে স্নাইপ পেতে হলে বেশ খানিকটা দূরে যেতে হবে।

রাতে পালকি বা নৌকায় ভ্রমণ সহজ ও আরামের, রাস্তা ভালো হলে চাঁদের আলোয় অনেক দূর যাওয়া যায়। সিমসন লিখেছেন, “চাঁটগা থেকে ৪০ মাইল দূরে জারুরগঞ্জে প্রতি রাতে বাগি করে চলে যেতাম শিকারের জন্য, আমি প্রায়ই পাঁচটিকরি বিলে চলে যেতাম। ময়মনসিংহের এই বিলে সবরকমের শিকার পাওয়া যেতো। [ঢাকা থেকে রওয়ানা হয়ে] রাতে ভাওয়াল জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া

হাঁকিয়ে পৌঁছে যেতাম।"

বেশিরভাগ সিভিলিয়ান এমন সব স্টেশন চান যেখানে আবহাওয়া ভালো, সমাজ উন্নত, যেখানে প্রায়ই বল নাচ বা ডিনার পার্টি থাকে। শিকারের জন্য তা ভালো নয়। সিমসন উল্টো জায়গা ভালোবাসতেন। তিনি যখন নোয়াখালিতে পোস্টেড [১৮৩০] তখন তাঁর এক বন্ধু তাঁকে লিখেছিলেন–

'অনেক খোঁজ খবর করে একজনকে পাওয়া গেলো যিনি নোয়াখালি সম্পর্কে খানিকটা জানেন। তার মতে, মেঘনার তীরে কর্দমাক্ত এক ভয়ংকর জায়গা, যেখানে কোনো সমাজ নেই, ডাক্তার নেই, তৈরি হয় খাবার লবণ এবং [সিভিলিয়ানরা] শিকার করে বরাহ ও বাঘ।" সিমসন মন্তব্য করেছেন, "বর্ণনাটা ছিলো বাস্তবের কাছাকাছি।"

চিঠি: ৫

আরাম হচ্ছে স্নাইপ শিকারে। পাওয়াও যায় প্রচুর, বিশেষ করে নোয়াখালিতে– নদীর পাশে ঘন ঘাসে ঢাকা সমতলভূমিতে।

চিঠি: ১০

বরাহ শিকার যা বেশি পরিচিত পিগ স্টিকিং নামে "is the grandest sport you will get in Eastern Bengal." পূর্ব বঙ্গের সব অঞ্চলেই বরাহ পাওয়া যায় তবে নোয়াখালির চরে বরাহ শিকারে আনন্দ বেশি, এগুলি ছোট ছোট কিন্তু তীব্র গতির এবং কখনও পিছু হটে না।

ত্রিপুরা, মধ্য রাজশাহী, মালদহ এবং দিনাজপুরের বরাহকে বলা হয় 'গ্রামের বরাহ' (ভিলেজ হ্যাম), এগুলি বেশ বড়বড়। সিমসন প্রায় হাজারখানকে বরাহ শিকার করেছেন এবং এসব অঞ্চলে চেয়ে বড় বরাহ তাঁর চোখে পড়েনি, তবে শুনেছেন, ৪০ ইঞ্চি উঁচু বরাহও পাওয়া যায়। রংপুর, দিনাজপুরে তিনি যতবড় বরাহের কংকাল দেখেছেন, তার চেয়ে বড় বরাহ শিকার হতে তিনি দেখেন নি। এসব বরাহ কিন্তু ভিতু এবং শ্লথ।

চিঠি: ১১

নোয়াখালির সমস্ত পশ্চিম উপকূল, ফেনী নদীর মুখ থেকে দক্ষিণে লক্ষীপুর বাজার-চর এলাকা।

চর এলাকায় শিকার করা হয়েছে ১৮৫১ সালে। মহিষের সংখ্যাও কমে গেছে জঙ্গল কমে যাওয়ায়। এরা চলে গেছে মেঘনার তীরে বাখরগঞ্জে, সুন্দরবনের দিকে। তবে, বরাহ এখনও পাওয়া যায় প্রচুর। সিদ্দি হচ্ছে বরাহ শিকারের উত্তম

জায়গা। মেঘনার "আরো কিছু দ্বীপ-হাতিয়া, এলছেড়া, আলগীতেও আমি প্রচুর বরাহ শিকার করেছি, "লিখেছেন সিমসন। দক্ষিণ শাহবাজপুরে অবশ্য বাঘের সংখ্যা বেশি। দাউদকান্দির আশেপাশেও প্রচুর বরাহ পাওয়া যায়। এছাড়া ঢাকায় বংশী নদীর তীরে চর এলাকায় এবং ময়মনসিংহও এজন্য ভালো। উল্লেখযোগ্য ফরিদপুর, পাবনাও। এই পাবনায়-ই বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের সি. মিলস বরাহ শিকারের জন্য ১৮৩০ সালে ছোট বর্শা ব্যবহার করেন। এর আগে বরাহের দিকে বর্শা ছুঁড়ে মারা হতো, খুঁচিয়ে মারা হতো না। দিনাজপুর, টাঙ্গনের তীরে, রংপুরের কিছু অংশ, রাজশাহীতেও বরাহ মেলে।

চিঠি: ১২

শিকারের জন্য ভালো উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে আনা ঘোড়া তবে, যারা একটু লম্বা এবং মোটামুটি তাদের জন্য ভালো আরবি ঘোড়া যার দাম ১২০০ থেকে ১৫০০ রুপি। দেশি ঘোড়া শক্ত সমর্থ কিন্তু সরকার সেগুলি নিয়ে নেয় বাহিনীর জন্য। এরপর আছে ওয়েলার। বরাহ শিকারের জন্য বর্শার ফলা দশ ইঞ্চির মতো হতে হবে, হাতলটি বাঁশের।

চিঠি: ১৪

বরাহ শিকারের সময় কখনও কোনো অবস্থাতেই বর্শা ছুঁড়ে মারা চলবে না। কারো যদি এ অভ্যাস থাকে তবে তাকে শিকারে না নেয়াই শ্রেয়। [অন্যান্য চিঠিতে বাঘ এবং হাতি শিকারের পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত বিবরণ আছে]

চিঠি: ২৬

শিকার করতে চাইলে স্থানীয় জমিদারের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখা উচিত এবং শিকারের খাতিরে তাদের চটানো উচিত নয়। কারণ, যেসব জঙ্গলে শিকার করা হবে সেগুলি জমিদারেরই। এ ছাড়া নীলকররাও শিকারের অনেক খোঁজখবর রাখে কারণ সরকারি চাকুরেদের থেকে গ্রামাঞ্চল তারা ভালো চেনে।

চিঠি: ৩৭

ব্রহ্মপুত্রের চরে সিমসন গেছেন একবার বাঘ শিকারে, একদিনে তিনি মারলেন পাঁচটি বাঘ।

চিঠি: ৪৩

মহিষ পাওয়া যায় বেশি বাখরগঞ্জে মেঘনায় জেগে ওঠা নতুন চরে। যশোর,

ফরিদপুরেও মোষ পাওয়া যায়।

চিঠি: ৪৪

চাঁটগা থেকে কুমিল্লা যাওয়ার পথে পড়ে শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। আর এ জঙ্গলে পাওয়া যায় প্রচুর বনমোরগ।

চিঠি: ৪৬

একদিন শিকারে গেছেন সিমসন, ঘুরে ঘুরে শিকার করে দিনের শেষে হিসাব মেলালেন। কী কী শিকার করেছিলেন তিনি সারাদিনে- বনমোরগ ৫০টি, ময়ুর-২, ব্যাম্বু প্যাট্রিজ-১, উডকক-১, কবুতর-১৬, স্নাইপ-২২, হরিণ-২, খরগোস-৪, বিভিন্ন রকমের কাঠবেড়াল-৩, পারাদ্যুর-১ নাম না জানা প্রাণী-৩, মোট: ১০৬।

চিঠি: ৪৭

ময়মনসিংহের সীমান্ত যেখানে মিশেছে আসামের সঙ্গে সেখানে পাওয়া যায় গন্ডার; ব্রহ্মপুত্রের পূর্বে ও রংপুরের দক্ষিণেও গন্ডারের দেখা মেলে। এ ছাড়াও সিমসন বিভিন্ন রকমের পাখি, সাপ, হরিণ, শেয়াল প্রভৃতি শিকারের পদ্ধতি এবং কোথায় কোথায় এসবের সন্ধান পাওয়া যায় সে সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। যেমন, শেয়াল শিকারের উৎকৃষ্ট সময় সন্ধ্যা।

সিমসন লিখেছেন, ত্রিপুরায় খানিকটা পিগস্টিকিং করা যায়। দাউদকান্দির আশেপাশে শিকার মেলে। কৃষির ফলে ঘাস গজায় চার দিকে। শিকারিরা সতর্ক হলে, ফসল কাটার সময় এখানে ভালো শিকার পাওয়া যাবে। ঢাকার শিকারিরা শিকারের জন্য এটিকে উৎকৃষ্ট জায়গা মনে করে। তবে সিমসন, দাউদকান্দির দক্ষিণটাই পছন্দ করেন।

ত্রিপুরা জেলার অভ্যন্তরে পরিত্যক্ত গ্রাম এবং বড় বড় পুকুর যেগুলির পাড় কাটা ঝোঁপে ভর্তি এবং পাহাড়ের আশেপাশে, সে সব জায়গায়ও ভালো শিকার মেলে। তবে, একবার বরাহ শিকারের পর, কমপক্ষে দুই সিজনের আগে সেখানে আর বরাহ পাওয়া যাবে না।

বসন্তকাল ত্রিপুরার উত্তরে এবং সিলেটের দক্ষিণে বরাহ শিকার করা যায়। এখানে বরাহের সংখ্যা বেশি নয়, পানি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি বছর এখানে কিছু বরাহ মারা পড়ে। সিমসন লিখেছেন, "এ এলাকায় আমি একবারই শিকার করেছি। আর আমার জানামতে কেউ এখানে শিকার করেনি।"

শিকারের জন্য ঢাকা জেলা উত্তম, দাউদকান্দি ছাড়া, সাভারের বংশী নদীর পশ্চিমে কিছু চর আছে সেখানে সিমসন ভালো শিকারের খোঁজ পেয়েছিলেন,

ভাওয়াল আর টঙ্গি থানার মাঝামাঝিও শিকার মেলে। সিমসন লিখেছেন, "এখানে আমি এক পরিত্যক্ত গ্রাম পেয়েছিলাম যেখানে খুব সম্ভব চারটি ঘর আর বাগান ছিলো। অযত্নে ধংস্বপ্রাপ্ত। এখানে প্রায়ই বরাহ পাওয়া যেতো, এই জায়গাটির নাম আমরা দিয়েছিলাম নেভার ব্ল্যাংক। এবং আসলেও ১৮৬১ থেকে ১৮৭২ এর মধ্যে এ জায়গায় কখনও বরাহ শূন্য পাইনি। এতো ছোট এক জায়গা কেনো বরাহদের আকর্ষণ করে তার কারণ আমি খুঁজে পাইনি। গোয়ালন্দ আর ময়মনসিংহের দিকে গেলে আরো পিগ-স্টিকিং করা যাবে।"

ময়মনসিংহ জেলার বরাহ শিকারের অনেক জায়গা আছে। "অনেক আগে", লিখেছেন সিমসন, "আমার জানাশোনার আগে বাংলার সেরা শিকারের জায়গা বলে এর খ্যাতি ছিলো। ব্রহ্মপুত্রের তীরে জামালপুরে ছিলো ক্যান্টনমেন্ট এবং সেখানে একটি বরাহ শিকার ক্লাব গঠন করা হয়েছিলো। প্ল্যাট বরাহ শিকারের যে উৎকৃষ্ট সব ছবি এঁকেছেন তা নাকি এখানকারই। ঐ সময় আসাম পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব তীরের চরগুলি ছিলো শিকারের জন্য উত্তম। আমি সেখানে শিকারে গেলে অবশ্য শিকারটাই প্রাধান্য পেতো। তবে, আমার সঙ্গে যদি এমন কেউ থাকতো যে বরাহ শিকার পছন্দ করে তা হলে বরাহ শিকার করতাম। আমি একবার আবিষ্কার করলাম যেখানটায় গারো ও সুসংয়ের পাহাড় মিলেছে ব্রহ্মপুত্রে, সেখানে একটি থানা হয়েছে। এখানকার পুলিশদের প্রিয় বরাহ মাংস। এবং সরকারি গুলি খরচ করে তারা বরাহ শিকার করছে। থানার পেছনে আমি বরাহের হাড়গোড়ের এক স্তুপ আবিষ্কার করলাম। এ কারণে, বরাহের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। বাঘের সংখ্যা ছিলো অত্যাধিক, একবার এক শিকার পার্টি ২৩টি বাঘ মেরেছিলো।"

বংশী নদীর পশ্চিমে টিকরি মিশেছে ভাওয়াল জঙ্গলের সঙ্গে। এখানেও পর্যাপ্ত পরিমাণে বরাহ পাওয়া যায়। "সব ধরনের শিকারের জন্য, অন্তত আমার মতে, এটি অতি উত্তম জায়গা। গুজব শুনছি", লিখেছেন সিমসন, "যে এর পাশ দিয়ে রেল লাইন যাবে। সেক্ষেত্রে শিকার পাওয়া দুস্কর হয়ে উঠবে। ময়মনসিংহের উত্তরেও শিকারের ভালো কিছু জায়গা আছে।"

ময়মনসিংহ নদীর দু'পাড়ে (ব্রহ্মপুত্র?) বাইগুনবাড়ি ফ্যাক্টরি ও তার আশেপাশে, সুসং পাহাড়ের পাদদেশে তুলডুডাং এবং বিভিন্ন বিলের পাশের যেখানে ঘাস মোটামুটি পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে এবং ঘোড়ায় চড়ার অসুবিধে নেই, সেখানেও বেশ বরাহ পাওয়া যায়। এ সব জায়গায়, বদরুদ্দীনের মতো শিকারিরা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দু'টি হাতি নিয়ে তিনদিন ঘুরে ফিরে এসে জানাতে পারবে কোথায় বরাহ পাওয়া যাবে আর কোথাও পাওয়া যাবে না। তবে, ময়মনসিংহ বরাহ শিকারে একটা ঝামেলাও আছে। আরবি ঘোড়া নিলে শীত, গ্রীস্ম এবং বর্ষায়-এর অসুখ হয়। সিমসন এভাবে ৬টি ঘোড়া হারিয়েছিলেন ৬ মাসে। এগুলির

দাম ছিলো একেকটির ১০০ পাউন্ডের ওপরে, দু'টির ক্ষেত্রে প্রায় ২০০ পাউন্ড।

সিমসন যখন নোয়াখালিতে ছিলেন [১৮৩০ এর দিকে] তখন সেখানে বাঘ ছিলো অনেক, তবে প্রাধান্য দেয়া হতো বরাহ শিকারকেই। কিন্তু ময়মনসিংহে ঘোড়ার ঝামেলা ও অন্যান্য কারণে হাতি নিয়ে বাঘ শিকারই গুরুত্ব পেতে লাগলো।

গঙ্গা ধরে এগুলে, যেখানে তা মিশেছে মেঘনার সঙ্গে, তার দু'তীরে বরাহ প্রচুর। ফরিদপুরে, গোয়ালন্দের কাছে সিমসন লর্ড মেয়োকে নিয়ে গিয়েছিলেন শিকারে। লর্ড বলেছিলেন, এতো বছরে শিকারের এতো ভালো জায়গা আর তিনি পান নি। নদীর পাশে পাবনার দিকে বরাহ পাওয়া যাবে। পাবনায় শিকার করার সময়ই বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের মি. মিলস ১৮৩০ সালের দিকে বরাহ শিকারের জন্য ছোটো বর্শার প্রবর্তন করেন। উইলিয়ামসনের 'ফিল্ড স্পোর্টস ইন ইন্ডিয়া'য় এর ওপর একটি ছবি আছে। সিমসন লিখেছেন, "ছেলেবেলায় প্রচন্ড আগ্রহ নিয়ে তিনি বইয়ের ছবিগুলি দেখতেন।"

নদীর বাঁ তীরে, রাজশাহী, মালদহ, পূর্নিয়া থেকে ভাগলপুর জেলায় গিয়ে শেষ হয়েছে বরাহ নিবাস। পূর্নিয়া, মালদহ, রাজশাহী, পাটনা, দিনাজপুর এবং রংপুরের বরাহ শিকারের ভালো জায়গা আছে। মুর্শিদাবাদের নবাব হাতি ও লোকলস্করের বহর নিয়ে এই পথে শিকারের বেরুতেন এবং যা পেতেন তাই গুলি করতেন।

টাঙ্গনের তীরে, দিনাজপুরে, রংপুরের কোথাও কোথাও বরাহ পাওয়া যেতো, বেঙ্গল স্পোর্টিং ম্যাগাজিনে এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে।

৮

টেইলরের ময়মনসিংহ

১৮৫৯ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি কন্যাসহ টেইলর রওয়ানা হলেন ময়মনসিংহের দিকে। ময়মনসিংহ তার পছন্দ হয়নি ঠিকই কিন্তু লিখেছেন তিনি, স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া সত্ত্বেও ময়মনসিংহ ছবির মতো সুন্দর, খাঁটি বাংলা (বেঙ্গল) একেই বলে।

ইতিমধ্যে বাতাসে পাওয়া যাচ্ছে গ্রীষ্মের আঁচ। টেইলরকে ময়মনসিংহে পৌঁছার জন্য ঘুরে যেতে হয়েছে বারাসাত, যশোর, ফরিদপুর ও ঢাকা। ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণ তিনি দেননি কিন্তু ভ্রমণের মাধ্যমগুলোর স্কেচ এঁকেছেন। সেই স্কেচ দেখে অনুমান করা যায় পিতা-পুত্রী কীভাবে ভ্রমণ করেছিলেন। প্রথমত রাস্তার কথা ধরা যাক। রাস্তার কোনো বালাই ছিলো না এবং যা ছিলো তাও খুব খারাপ। নদী বা খাল পেরোতে হয়েছে অচল ফেরি দিয়ে। তারপর ছিলো কর্দমাক্ত জলা আর বিষাক্ত জঙ্গল। একে গরম কাল, তার ওপর পথের এ অবস্থা। ভ্রমণ যে সে সময় খুব আরামদায়ক ছিলো না, তা বোঝা যায়। ভ্রমণে তারা ব্যবহার করেছেন পালকি, ডিঙ্গি, ঘোড়ার টানা বগি ও হাতি। মাঝে-মধ্যে সবুজ নদী তীর বা গাছে ঢাকা ছায়া ঘেরা ঠাণ্ডা প্রান্তরে দু পা হেঁটে ক্লান্তি আর অবসাদ দূর করার চেষ্টা করেছেন। মজা করে লিখেছেন টেইলর, "একবার আমাদের দেখে দুটি বলদ ভয় পেয়ে পালালো আসা। হয়তো আমাদের বিজাতীয় পোশাক ছিলো এ ভয়ের কারণ।" তারপর এক সময় টেইলর ও তার কন্যা পৌঁছলেন তার ভাষায়, "বাংলায় এক দূর কোণে যা মানচিত্রে বা নেটিভদের ভাষায় পরিচিত নাসিরাবাদ আর অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ভাষা ও সরকারি নথিপত্রে পরিচিত ময়মনসিংহ নামে।"

ময়মনসিংহ টেইলর পৌঁছালেন ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে। পাটনা থেকে ময়মনসিংহ এই ৬০০ মাইল পেরোতে তার লেগেছে প্রায় দু সপ্তাহ। ময়মনসিংহের কালেক্টর চার্লস ক্যাম্পবেল খুব খাতির-যত্ন করলেন তাদের। টেইলর ময়মনসিংহে পৌঁছানোর পরপরই শুরু হলো বৃষ্টি! সে কি বৃষ্টি। একটানা চলল তা মে পর্যন্ত। মাঝে একদিনও বৃষ্টিহীন গেছে কিনা সন্দেহ। মেঘের ঘনঘটা, বজ্রের নির্ঘোষ ও

অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে ভরপুর ছিলো প্রতিদিন।

টেইলর মন্তব্য করেছেন, "ময়মনসিংহের ঝড় বাদলের তুলনা হয় না। এখানে বজ্রপাতের তুলনায় অন্যান্য অঞ্চলের বজ্রপাত কবুতরের বকবকম। আর হাওয়া। রাজা লিয়ারও এরচেয়ে জোরে তা বওয়াতে পারতেন কিনা সন্দেহ। ময়মনসিংহের ঝড়-বৃষ্টি দেখার পর অন্যান্য অঞ্চলের ঝড়-বৃষ্টি মনে হবে যেন ভায়োলেট গুচ্ছের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া দখিনা বাতাস।"

ময়মনসিংহের ঝড়-বৃষ্টির বেশ বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন টেইলর। বোঝা যায়, পাটনার বা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের একেবারে বিপরীত প্রকৃতির এই রূপ অবাক করেছিলো, মনে দাগ কেটেছিলো। তার বইয়ে অনেক কিছুর স্কেচ আছে কিন্তু ঝড়-বৃষ্টি বা এর প্রতিক্রিয়ার কোনো ছবি নেই। প্রকৃতির এই রূপটি আঁকা বোধ হয় তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

ময়মনসিংহের কালবৈশাখীর শুরুটা কেমন? প্রথম ব্রহ্মপুত্রের ওপারে, গারো পাহাড়ের চূড়ায় জমতে থাকে মেঘ। মেঘের পর মেঘ জমে দিগন্তের আকাশ হয়ে ওঠে কালির মতো কালো। তারপর হঠাৎ বাতাস আর মেঘ এসে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, সঙ্গে ব্রহ্মপুত্র তীরের রাশি রাশি বালু, বিদ্যুতের চমক, ঝলসে ওঠে সারা আকাশ।

টেইলর লিখেছেন, নির্বাসনে থাকার দরুন প্রকৃতির এই রূপ দেখা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। মে মাসে এ অঞ্চলে গরমে সবার ছটফট করার কথা বিশেষত বিদেশীদের, যারা অভ্যস্ত নন এ আবহাওয়ায়। কিন্তু ময়মনসিংহের দিন-রাত তখন ঠাণ্ডা। অনেক দিনে তো পাখারও দরকার হয় না। বরং কল্পনা প্রবল হলে চিন্তা করা যায়, গণগণে ফায়ার প্লেসের। সবই ভালো কিন্তু এই স্যাঁতসেঁতে ভাব যে কত নির্দয়-নিষ্ঠুর বোঝানো যাবে না। দস্তানা বা রঙিন ফিতে হয়ে ওঠে কুষ্ঠরোগীর চামড়ার মতো। কালো বুট ও জুতো হয়ে ওঠে সাদাটে আর বই হয়ে ওঠে সবুজ। ঠাট্টা করে লিখেছেন টেইলর, "ড্রাইয়েস্ট জোক অব আওয়ার হিউম্যারিস্ট বিকামস ময়েস্ট ইন আটারেন্স।"

সুতরাং টেইলরের মতে, শুকনো তাপ থেকে যারা ঠাণ্ডা পছন্দ করেন, যাদের নেই হাঁপানি এবং বিচলিত নন ঝড় বা বজ্রপাতে ও আপত্তি নেই বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে, ভালো বাসেন কল্পনা কসুম সাজাতে তাদের জন্য ময়মনসিংহে আছে বেশকিছু আকর্ষণ।

ভারতবর্ষে যে বিষয়টি ভয়াবহ ছিলো ইংরেজদের কাছে তা হলো টেইলরের মতে, গ্রীষ্মের নিদ্রাহীন রাত। টেইলরও বিশদ বিবরণ দিয়েছেন ইংল্যান্ড ও বাংলাদেশের রাতের।

ইংরেজরা রাতে শোয়ার সময় পরত বিশেষ পোশাক, অন্তত উনিশ শতকে যার সচিত্র বিবরণ পাই এ বইয়ে। লন্ডনের বিখ্যাত পত্রিকা 'পাঞ্চে' এ রকম ভদ্র

ইংরেজের নাম দেওয়া হয়েছিলো মি. ব্রিগস। ব্রিগসের রাতের পোশাক কেমন? মাথায় তার চূঁড়ো করা টুপি, পরনে লম্বা রাত কুর্তা। পায়ে মোজা নেই বটে তবে আছে চটি। তার চেহারায় ঘুমের আবেশ, বিছানায় শুলেই পড়বেন ঘুমিয়ে, হয়তো নাকও ডাকবেন মৃদুশব্দে।

এবার দেখা যাক, ভারতীয় বা বাংলাদেশের রাত কেমন? না, মাথায় নেই তার (সিভিলিয়ানের) চূড়ো করা টুপি, বরং চুল উস্কখুস্ক, ঘামে ভেজা। রাতে কুর্তার হাতা গোটানো, সামনের বোতাম সব খোলা, মনে হয় তা না পরতে পারলেই বোধ হয় ছিলো ভালো। পরনে ঢোলা তুর্কি পায়জামা। না, তার চোখে-মুখে নেই ঘুমুতে যাওয়ার আগে ব্রিগসের মতো সেই প্রশান্ত ও ভদ্রভাব বরং মনে হয় সে অশান্ত, উত্তেজিত ও শ্রান্ত।

তারপর ধরা যাক বিছানার কথা। লন্ডনের চমৎকার চার খুঁটিওয়ালা বিছানা, পালক ভরা তোশক। নরম বালিশ আর কম্বল। কার্পেটে ঢাকা ছোট ঘর, বদ্ধ জানালা, ভারী পর্দা। কেমন ঘরোয়া, প্রশান্ত ভাব, মনে হয় বিছানায় শুলেই ঘুম।

আর ভারতীয় বিছানা? সাধারণ চার পা-ই না হলে শক্ত খাট, শক্ত তোশক আর বালিশ। চারটি খুঁটি থেকে ঝোলে একটি মশারি। এ জিনিসটি না থাকলে, মশারা তাকে ঠাণ্ডা গোশত বা কেক মনে করে জীবন্ত খেয়ে ফেলবে। ঘরের জানালা থাকে সব খোলা, মেঝেতে খড়ের তৈরি পাটি, শূন্য সাদা দেয়াল চারপাশে।

ময়মনসিংহের সেসব গ্রীষ্মের রাতের কথা স্মরণ করে লিখেছেন তিনি, গ্রীষ্মের রাতে বেঙ্গল আর্মির স্মিথ বা সিভিল সার্ভিসের ব্রাউন, যেই হোন না কেন, প্রায় সময়ই কাটান বিছানার বাইরে। অসহ্য গরমে তিনি খামছে ধরেন চুল, হাই তোলেন, রাত কুর্তা প্রায় খুলে ফেলেন, দৌড়ে যান প্রায়ই সোরাইর কাছে। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড চাপড় মারেন হাতে বা পায়ে অজেয় একটি মশা মারার জন্য। যদি তার ঘরে থাকে পাঙ্খাওয়ালা তাহলে দুর্ভোগ আছে তার কপালে। স্মিথ বা ব্রাউন হঠাৎ ছুটে গিয়ে মারেন তাকে এক লাথি। তারপর বন্য অঙ্গভঙ্গি করে ফিরে আসেন বিছানায়। বিছানা তখন হয়ে উঠেছে আরো গরম। ছটফট করেন, উঠে বসেন, শোন তারপর শ্রান্ত হয়ে এলিয়ে পড়েন। সকালে ঘুম ভাঙে তার প্রশান্ত নিদ্রার পর নয়, বরং নিদ্রাহীন নিদ্রার পর, শরীর তখন শ্রান্ত।

ময়মনসিংহে লিখেছেন টেইলর, এসব ছাড়াও রাতে নিদ্রা বিনাশকারী ছিলো আরো অনেক কিছু। নিজের আঁকা একটি ছবিতে তিনি তা ফুটিয়ে তুলেছেন। লিখেছেন তিনি, রাতে যে শুধু রক্তখেকো মশা ছিলো তা নয়। ছিলো তেলোপোকা, বাদুর, নানা ধরনের ইঁদুর, চামচিকে এবং আরো অসংখ্য ভয়াবহ সব প্রাণী, যারা নির্ভয়ে সারারাত ঘোরাফেরা করত তার ঘরে। টেইলরেরর স্কেচটি দেখলে বোঝা যাবে একজন ইংরেজের জন্য ময়মনসিংহের রাত ছিলো কত ভয়াবহ।

॥ ২ ॥

ময়মনসিংহে টেইলরকে যে বিষয়টি অবাক করেছিলো তা হলো কলেরা সংকীর্তন। যে কোনো আগন্তুককেই সে সময় তা অবাক করতো বিশেষ করে তিনি যদি হতেন ইউরোপিয়।

ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে, লিখেছেন টেইলর, তিনি যখন পৌঁছলেন ময়মনসিংহ স্টেশনে, তখন দেখলেন বেশ কটি মিছিল যাচ্ছে। তার ভাষায়, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে করতে একেবারে উত্তেজিত হয়ে, কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে।

টেইলর ময়মনসিংহে পৌঁছার পরও দেখলেন, বেশ কিছুদিন ধরে সেই উচ্চকণ্ঠের নিনাদ ও কাঁসর চলছে এবং খোঁজ নিয়ে জানলেন যে, কলেরা তাড়াবার জন্য এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কারণ ময়মনসিংহে তখন শুরু হয়েছে কলেরা। এর সঙ্গে চলল কালী ও কৃষ্ণের আরাধনা। মন্তব্য করেছেন টেইলর, বিশ্বাস যতই দৃঢ় থাকুক এতে, একজন রোগীর নার্ভের পক্ষে বিশ্বাস বা নিনাদ সহ্য করা যে অসহ্য, তা অনুমেয়। তবে লিখেছেন তিনি; পুরো ময়মনসিংহের সবাই এ প্রতিষেধকে বিশ্বাসী এবং "আমার আদালতের প্রত্যেক উকিল, মোক্তার ও অন্য কেরানিরা মাঝে-মধ্যে এ মিছিল ও নিনাদে অংশগ্রহণ করতো। তবে মিছিলে যাওয়ার ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোনো সেন্টিমেন্ট ছিলো কিনা, নাকি তা ছিলো স্বতঃস্ফূর্ত তা আবিষ্কার করতে পারিনি। অনেক সম্ভ্রান্ত লোককে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছি। তারা মনে হয় লজ্জা পেয়ে আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে নিয়েছেন।"

স্যার উইলিয়াম জোনস, লিখেছেন টেইলর, "মন্তব্য করেছিলেন যে, হিন্দু সঙ্গীত অতি চমৎকার। তা স্টেশনের গায়িকা আমাদের অবাক করে দিয়ে তা নাকচ করে দিলো।" টেইলর যে 'লেডি মিউজিসিয়ানের' কথা উল্লেখ করেছেন তা বোধ হয় সে আমলের ময়মনসিংহের কোনো নামকরা বাইজি। বাইজি বলেছিলেন যে, এ সঙ্গীতের অর্থাৎ সংকীর্তনের আছে এক 'বন্য হারমনি' যা গ্রিগোরিয়ান সঙ্গীত থেকে উচ্চ মার্গের।

"রুচিভেদ থাকবেই", মন্তব্য করেছেন টেইলর, "বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে। আর এ মহিলা তো নিজেই সঙ্গীতজ্ঞ। কিন্তু তবুও অভ্যব্যের মতো আমি বলব, এ যদি উচ্চ মার্গের সঙ্গীত হয় তাহলে আমি যে কোনো সময় শেয়ালের কনসার্ট শুনতে পছন্দ করবো।"

বসন্তের তুলনায় কলেরা ভারতে নতুন, জানিয়েছেন টেইলর। এখানে বলতে পারি, বসন্ত মহামারি হিসেবে দেখা দিলেও টিকার প্রচলনে তা খানিকটা প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছিলো কিন্তু কলেরা থেকে রক্ষা পাওয়া মুশকিল হয়ে উঠেছিলো। প্রতি বছর অন্তত একবার কলেরা পূর্ববঙ্গে আতংক সৃষ্টি করতো। গ্রাম, শহর সব অঞ্চলের মানুষই ছিলেন এর শিকার, করেরার এই ভয়াবহ প্রকোপ প্রথম

পরিলক্ষিত হয়ে ছিলো যশোরে ২০ আগস্ট ১৮১৭ সালে, ২০ থেকে ২২ আগস্টের মধ্যে শহর প্রায় জনশূন্য হয়ে গিয়েছিলো। ঢাকায় প্রতি বছর দু'বার ফাল্গুন চৈত্র, ব্রহ্মপুত্রে স্নানের পর এবং বর্ষাকালে কলেরা দেখা দিতো। তখন মনে হতো ঢাকা যেনো জনশূন্য হয়ে যাবে। টেইলর জানালেন "কলেরার বদলে বসন্ত ইতিমধ্যে দেবীর স্থান অধিকার করে আছে। তিনি হলেন গাধার পিঠে বসা শীতলা। এ দেবীকে সঙ্গীতের মাধ্যমে পূজা বা অন্য কিছু নিবেদন করে সন্তুষ্ট করতে শুনিনি।" লিখেছেন টেইলর, "অনেককে গলায় তার প্রতিকৃত খোদাই করা বন্ধনী পরতে দেখেছি। খোদাইকৃত বন্ধনীতে দেখা যায়, অনমনীয়ভাবে বসে আছেন তিনি গাধার পিঠে। এবং সবাই অকপটে বিশ্বাস করে এই বন্ধনী বসন্ত থেকে রক্ষা বা বসন্ত হলে সুস্থ করে।" টেইলর তার নিজস্ব সংগ্রহের জন্য এ রকম একটি বন্ধনী সংগ্রহ করে স্কেচ এঁকেছিলেন।

তবে দেবী শীতলাকে সন্তুষ্ট করার প্রথা তার কাছে বীভৎস মনে হয়েছে। সেটি হচ্ছে, রোগীর মুখের বসন্তের গুটি ও কালো খোসাগুলো সংগ্রহ করে সাধারণত কোনো চৌরাস্তার মোড়ে রেখে দেওয়া। লিখেছেন টেইলর, "এতো চমৎকারভাবে রোগ ছড়ানোর পরিকল্পনা বা এরচেয়ে পাগলামি কল্পনা করা শক্ত।"

ময়মনসিংহে বিশেষ করে তাঁর বাগানের বর্ণনা করেছেন তিনি বিস্তারিতভাবে, যা বর্তমান পাঠকের কাছে বিরক্তিকর ঠেকবে। এর একটি কারণ হতে পারে যে, ময়মনসিংহে তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ এবং ভারাক্রান্ত। তবে এখানে উল্লেখ্য, উদ্ভিদবিদ্যা সম্পর্কে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিলো। সুতরাং নিসর্গ ও প্রকৃতির ছোটখাটো বিষয়গুলো তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অবলোকন করেছেন।

ময়মনসিংহে বেশকিছু খেজুর-পিপুল গাছ তাকে অবাক করেছিলো। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে, পিপুলের কাণ্ডের কোনো গহ্বরে হয়তো কোনা পাখি একটি খেজুরের দানা ফেলেছিলো এবং কালক্রমে সেই দানা পরিণত হয়েছে একটি খেজুর গাছের চূঁড়োয়। সেখানে জন্ম নিয়েছে পিপুল এবং আস্তে আস্তে তার শেকড় আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে খেজুর গাছকে। তিনি উল্লেখ করেছেন, অভাবের দিনে মানুষ এই বটফল খেয়ে জীবনধারণ করে।

তার বাসার বারান্দার সামনে একটি গাছ। দিনের বেলায় দেখলে একরকম, রাতে চাঁদের আলোয় অন্যরকম। বিশেষ করে অবিবাহিত কেউ যদি চাঁদের আলোয় বারান্দায় বসে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন গাছটির দিকে তাহলে দেখবেন, গাছটি পরিণত হয়েছে এক সুন্দরীতে, মাথায় যার সবুজ ফিতে, নরম টুপি, সরু কোমর, দৃঢ় পা যা গেঁথে আছে মাটিতে। মৃদু বাতাসেও মনে হয় গাছটি বুঝি নৃত্যরতা কোনো তরুণী।

টেইলর উল্লেখ করেছেন, তাঁর শোবার ঘরের জানালার পাশে আমগাছ আর

একটি দাঁড়কাকের কথা। দাঁড়কাকটি এসে বসে গাছের ডালে, কালো কয়লা চোখ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে। হঠাৎ উড়ে যায়, ফিরে এসে বসে আবার ডালে, ঠোঁটে একটি পোকা। আরেকটি কাক উড়ে এসেছে, বসতে চাইছে হয়তো একই ডালে। দাঁড়কাকটি ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার ওপর। খানিক পর দেখা গেল, হয়তো একটি চিল ঘুরপাক খাচ্ছে। ঘুরপাক খেয়ে আস্তে আস্তে নিচে নামছে। দাঁড়কাকটি নিশ্চুপ হয়ে দেখছে। তারপর কথা নেই, বার্তা নেই উড়ে গিয়ে চক্কর দিতে লাগলে ঠিক চিলের ওপর। খানিক পর চিলের মাথা বরাবর সোঁ করে নেমে এসে ঠোঁকর দিতে লাগলো। চিল পালালো। কাকটি ফের গর্বিতভাবে ফিরে এসে বসল আমের ডালে। মনে হয় এ তার নিজের সাম্রাজ্য যেখানে সে একা, কাউকে কাছে আসতে দিতে রাজি নয়।

আমের প্রসঙ্গ বিস্তাতিভাবে এসেছে টেইলরের লেখায়। তিনি জানিয়েছেন, ভারতের একটি প্রধান ফল আম এবং আমের ঋতুতে লাখ লাখ লোক নির্ভর করে এর ওপর। প্রকৃতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দান এই আম এবং তার মতে, "আমের উৎপাদন ও সংরক্ষণে যদি সরকার খানিকটা মনোযোগ দিতেন তাহলে এ দেশের উন্নয়নে বিশেষ সাহায্য করা হতো।"

টেইলর লিখেছেন, "আমার র‍্যানডম নোটসে আমের কথা এসেছে কারণ ময়মনসিংহে তা অত্যন্ত খারাপ এবং বোঝা যায় এর উন্নয়নের কথা কেউ কখনো ভাবেননি।"

ময়মনসিংহের আম কেন খারাপ সে সম্পর্কে একটি জনশ্রুতি আছে ময়মনসিংহে। একবার এক ফকির কি কারণে যেন ময়মনসিংহে এসে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। হয়তো কোনো ময়মনসিংহবাসী তার বিরক্তির কারণ হয়েছিলো। তখন তিনি অভিশাপ দিয়ে বলেন, ময়মনসিংহের আম হবে সবচেয়ে খারাপ। সে থেকে ময়মনসিংহের আমের এই অবস্থা। প্রশ্ন উঠতে পারে, এতসব জিনিস থাকতে ফকির অভিশাপ দেওয়ার জন্য আম বেছে নিলেন কেন? হয়তো সে সময় ছিলো আমের মৌসুম। যা হোক সেই থেকে ময়মনসিংহের আমের অবস্থা এরকম।

ফকিরের অভিশাপের প্রতীক হলো ছোট একটি কালো পোকা। ময়মনসিংহের প্রতিটি আমে পাওয়া যাবে এই পোকা। আম কাটলে দেখা যাবে, আমের ভেতরটা সেই পোকা ইচ্ছেমতো খেয়েছে। মাঝে মাঝে সাদা রঙের পোকাও পাওয়া যায়। তা না হয় হলো। আম কাটলে দেখা যায়, পোকাগুলো দিব্যি গুটি গুটি পায়ে হেঁটে বেরিয়ে যাচ্ছে।

টেইলর লিখেছেন, "আমি ভারতের অনেক অঞ্চলে থেকেছি, ঘুরেছি কিন্তু কোথাও এমনটি দেখিনি" এবং ময়মনসিংহের অনেকেই তাকে জানিয়েছেন, পূর্ববঙ্গের আরো কয়েকটি অঞ্চলেও এই অভিশাপের ফল দেখা যাবে। টেইলর

বেশ কয়েকজন জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে এ পোকার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেন বা ঢোকে কীভাবে? সবাই একটি নিষ্পাপ উত্তরই দিয়েছেন, 'হাম কেয়া জানে?'

"এই যে না জানতে চাওয়ার আগ্রহ এটিই সবচেয়ে বড় অভিশাপ, পোকা নয়।" লিখেছেন টেইলর, "এই হাম কেয়া জানে– হিন্দুদের সামাজিক ক্ষতির অন্যতম কারণ। এর জন্য এদের গরু ক্ষীণকায়। আর এ কারণেই এরা আবদ্ধ করে রাখে তাদের মহিলাদের।"

মেয়ের শোবার ঘরের বর্ণনা দিয়েছেন টেইলর। মেয়ের শোবার ঘরটি তার ঘর থেকেও মনোরম। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালে চোখে পড়ে মনোরম দৃশ্য। প্রথমেই দেখা যাবে, ব্রহ্মপুত্রের শরীর, নৌকা আর জেলে, চরে গরুর পাল। আরো দূরে নীল গারো পাহাড়, জানালার নিচে বসে আছে পোষা বাঁদর 'হলুক' যে তার মনিবিনী ছাড়া আর কারো হুকুম গ্রাহ্য করে না।

চরের দৃশ্য বিশেষভাবে মোহিত করেছে টেইলরকে। নদী তীর থেকে ৮০ বা ১০০ গজ দূরে পড়েছে চর। সারাদিন সেখানে চরে বেড়ায় এক পাল গরু। বিকেলে তারা ঘরে ফেরে। ঘরে ফিরতে হলে নদী পেরুতে হয়। সূর্যাস্তের আগে এক উলঙ্গ বালক আসে চরে, যার উচ্চতা দু ফুটের বেশি নয়। হাতে তার বড় লাঠি। চিৎকার শুরু করে সে। আর গরুগুলো শান্তভাবে একেবারে ভারতীয়ভাবে ঘরে ফিরতে থাকে।

টেইলর যখন ময়মনসিংহে তখন এক তরুণ ইংরেজ দম্পতি বদলি হয়ে এলেন সেখানে। এই দম্পতির আবার বিশেষ ঝোঁক ছিলো গাছপালা বা উদ্ভিদ বিদ্যার প্রতি। প্রতিদিন সকালে স্বামী-স্ত্রী ঘোড়া ছুটিয়ে বেরোতেন এবং কোনো না কোনো লতাপাতা খুঁজে বের করে আবিষ্কারের উত্তেজনায় মেতে থাকতেন। তারা ভাবতেন, হয়তো খুব শিগগিরই নতুন এক অজানা উদ্ভিদ আবিষ্কার করে খ্যাতিমান হয়ে উঠবেন এবং সে উদ্ভিদের নামকরণ হবে তাদের নামে।

আগেই উল্লেখ করেছি, টেইলরের শখ ছিলো উদ্ভিদবিদা সম্পর্কে। নিজের হাতে বাগান করা ছিলো তার অন্যতম হবি এবং সে কারণে অনেক উদ্ভিদের ল্যাটিন নাম তিনি জানতেন, অনেক ক্ষেত্রে কোনটি কোন শাখার তাও বলতে পারতেন। ফলে সে দম্পতি লতাপাতা চোখে পড়লেই প্রথমে এনে দেখাতেন টেইলরকে।

একদিন সে দম্পতি অতি উত্তেজিতভাবে এসে হাজির টেইলরের বাসায়। তখন সকাল। তরুণীটি বিশেষভাবে উত্তেজিত। তার মুখ জ্বলজ্বলে হাতে একটি লতা, তাতে উজ্জ্বল হলুদ ফুল। মহিলা ভাবছিলেন, সম্পূর্ণ এক নতুন লতা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং যার বোটানিকাল নাম হবে তার নামে। এ কথা ভেবে তার

চোখ হয়ে উঠেছিলো স্বপ্নমেদুর।

লতাটা ছিলো কদু বা লাউ গাছের। ময়মনসিংহের কৃষকের খড়ের ছাদ বা মাচার ওপর যার স্থান। আসলে সামান্য অবলম্বন পেলেই লাউয়ের লতা লকলকিয়ে বেড়ে ওঠে। এর পাতা আঙুর পাতার মতো সবুজ, আর ফুল উজ্জ্বল হলুদ, যা দেখলে মুগ্ধ হওয়া স্বাভাবিক। যা হোক দম্পতিকে হতাশ করতে হলো তার। তারপর তিনি বিবরণ দিয়েছেন কদুর গুণের। পেটের জন্য তা ভালো। সারা ভারতে কদুর খোল ব্যবহৃত হয় পানি রাখার পাত্র হিসেবে, বাদ্যযন্ত্র হিসেবে।

মহিলার আবিষ্কারের কথা ভেবে টেইলরের মনে যে চিত্রটি ভেসে উঠেছিলো তা এ রকম :

এক কৃষকের কুটিরের ছাদে শোভা পাচ্ছে লাউয়ের ফুলসহ লতা। দম্পতি উল্লাসভরে তা ছিঁড়েছে। আর বাড়ির বৃদ্ধা তা দেখে অসহায়ভাবে চিৎকার করছে, 'আরে বাপ। মেরা কদু, মেরা কদু' বলে।

আসলে বুড়ি যদি চিৎকার করেও থাকেন তাহলে চিৎকার করছিলেন, 'আমার কদু আমার কদু' বলে। কারণ ময়মনসিংহের কৃষক হিন্দুস্তানি জানতেন না আর টেইলরও জানতেন না বাংলা।

॥ ৩ ॥

ময়মনসিংহের বেশকিছু অলঙ্কারের কথা উল্লেখ করেছেন টেইলর। তার মতে, ময়মনসিংহে ব্যবহৃত অনেক অলঙ্কারের ফর্ম এসেছে প্রকৃতি থেকে এবং প্রাকৃতিক ফর্ম যখন মিশে যায় প্রচলিত ধারায় তখন তা হয়ে ওঠে উৎকৃষ্ট কারণ তাই প্রকৃত রুচির সত্তা। 'এই অলঙ্কারের ইতিহাস যদি লেখা হতো' আফসোস করেছেন টেইলর। আসলে তিনি বলতে চেয়েছিলেন, অলঙ্কারের সমাজতত্ত্ব যদি রচনা করা যেতো তাহলে জানা যেতো এ অঞ্চলের অনেক অজানা তথ্য।

গারোদের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। ময়মনসিংহের নিসর্গের একটি উপাদান নীল গারো পাহাড়। সেখানে বাস করে বন্য, নগ্ন মানুষ, যারা মাঝে মাঝে নেমে আসেন সমতলে। তবে লিখেছেন তিনি, গারো মহিলারা সত্যিই মহিলা। অন্যান্য দেশের মহিলাদের মতো তাদেরও ঝোঁক অলঙ্কারের প্রতি। তাদের কানে তিনি যে দুল দেখেছেন তা আগে কোথাও দেখেননি। দুলের ব্যাসার্ধের মাপ দু ইঞ্চির বেশি। ডিজাইনটা হলো একটি সরীসৃপ গিলে খাচ্ছে আরেকটি সরীসৃপকে। বৃত্তাকার দুলটি দস্তার তৈরি। প্রতি কানে এ রকম ছয় থেকে দশটি দুল পরা হয়। সরীসৃপ তো সেই আদিকাল থেকেই। লিখেছেন টেইলর, "যখন বিবি হাওয়া প্ররোচিত করেছিলেন আদমকে, তার প্রতীক। অবশ্য গারো মেয়েদের বোধ হয় তা জানার কথা নয়।"

আরেক ধরনের রুপোর দুলের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, যা ময়মনসিংহের সুন্দরী মহিলারা ব্যবহার করেন। দুটি নৌকা পাশাপাশি রাখলে যেমন– এটির আকারও তেমন। নিচের অংশটি মনে হয় নোঙ্গরের প্রতীক।

একটি নাকফুলের কথা বলেছেন টেইলর, যা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। স্থানীয় ভাষায় এটিকে বলা হয়, 'পিপুল পাত' বা পিপুল পাতা। এই নাকফুলের পাশে তিনি একটি পিপুল পাতা রেখে দেখেন নাকফুলটির আকার অবিকল পিপুল পাতার মতো। নাকে পরলে শরীরের নড়াচড়ার সঙ্গে তা কাঁপে। মৃদু হাওয়ায় পিপুল পাতার আন্দোলনের সঙ্গে মিল আছে এর।

॥ ৪ ॥

অনেকে যাদের ধারণা ভারতীয় ইতিহাস তারা ভালোভাবে পর্যালোচনা করেছেন, লিখেছেন টেইলর বা নিজেরা অভিজ্ঞ বা পড়েছেন হিন্দুদের জীবন সম্পর্কে তাদের মতে, গাঙ্গেয় উপত্যকার বা এই বাংলার মানুষ শান্ত, নমিত। শত বছরের দাসত্বে নিগড়ে বাধা থাকার দরুন, তার বলদের আগে সে তার ঘাড় বাড়িয়ে দেয় মনিবের দিকে বা বটতলায় বিশ্রাম নেয় নিরিবিলি। অন্য কথায়, একেকজন বাঙালি মসলিনে মোড়া বাদামি একেকজন ফেরেস্তা বরং বাঙালি বয়স্ক মহিলাদের দেখা হয়েছে একটু বক্র দৃষ্টিতে। তবে সবাই একমত যে, সামগ্রিকভাবে এ জাতির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এর শান্ত ভাব বা নমনীয়তা।

"এ রকম বড় ভুল আর আগে কখনো করা হয়নি", মন্তব্য করেছেন টেইলর। অবশ্যই তাঁর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। তাঁর মতে, নিম্নবর্গের বাঙালি এক হিংস্র প্রাণী। বিপক্ষ শক্তিশালী হলে তার কাপুরুষতা দেখার মতো। সে তখন একেবারে নমনীয় এবং শান্ত যে কারণে এ ধারণার উৎপত্তি। 'শক্তের ভক্ত নরমের যম' এই বাংলা প্রবাদের উৎপত্তি কি সে কারণে? এ প্রশ্ন অবশ্য আমরাও করতে পারি। কিন্তু আসলে তা নয়, লিখেছেন টেইলর, "এটা ঠিক যে তারা দুর্বল, কর্মক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণে অক্ষম, তবে সে রসিক এবং তার স্বার্থের ব্যাপারে একাগ্র। প্রয়োজনে সে এমনভাবে মিথ্যা বলে সত্যের সঙ্গে যার ফারাক করা মুশকিল। আর সততা তো স্বপ্নের অতীত। যার থেকে তার কিছু পাওয়ার আছে সেখানে সে নমিত, দাসের মতো এবং হয়তো নিপীড়িত। কিন্তু যারা তার আওতায় তাদের কারো আচরণ যদি বিরক্তি বা ক্ষোভের কারণ হয় তখন তার প্রতি সে হয়ে ওঠে ক্ষিপ্ত বেড়ালের মতো।"

টেইলরের এ মন্তব্য নতুন কিছু নয়। অষ্টাদশ বা উনিশ শতকের সরকারি নথিপত্র বা অন্যান্য বিবরণে বাঙালিকে এভাবেই চিত্রিত করা হয়েছে। টেইলরও হয়তো প্রভাবিত হয়েছেন সেগুলো পড়ে। অবশ্য তিনি লিখেছেন এ সিদ্ধান্তে

উপনীত হয়েছেন, তিনি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। এ প্রসঙ্গে তিনটি মামলার কথা উল্লেখ করেছেন তিনি।

বিচারক হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে তাকে তিনটি খুনের মামলার বিচার করতে হয়েছে এবং প্রতিটি খুনই করা হয়েছিলো বেশ ঠাণ্ডা মাথায়। বিহারে তিনি লিখেছেন, "হঠাৎ করে কলহ শুরু হয়, তারপর লাঠালাঠি এবং সবচেয়ে খুন। বাংলায় সে রকম হলে কোনো ক্ষতি ছিলো না। কিন্তু এখানে সেরকমভাবে খুন করা হয় না। এমন নির্লিপ্তভাবে ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয় যে বলার নয়। ভাবটা এমন যেন ভোজের জন্য শুয়র মারা হয়েছে।"

প্রথম যে খুনের মামলাটি এল তার এজলাসে সেটি এ রকম। অভিযোগকারী জানালেন, নদীতে গোসল করার সময় তার মৃদু স্বভাবের প্রতিবেশীর সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ হয়। মৃদু স্বভাবের বাঙালি উষ্ণ হয়ে উঠলেন, তারপর ক্রুদ্ধ এবং তারপর যত গালি তার জানা ছিলো সব দেওয়ার পর যখন শেষ হয়ে গেল গালির ভাণ্ডার তখন রওয়ানা হলেন তিনি তার বাড়ির দিকে। কিন্তু খানিক পর তিনজন সঙ্গী নিয়ে তিনি ফিরলেন এবং অভিযোগকারীকে মাটিতে ফেলে একজন চড়ে বসল বুকে, বাকি দুজন ধরে রাখল হাত আর পা। এবং মৃদু স্বভাবের সেই প্রতিবেশী তার নাকের ডগা আর কানের লতি আলাদা করে ফেললেন ছুরি দিয়ে। "খুব সন্তুষ্ট বোধ করলাম মৃদু স্বভাবের সেই বাঙালিকে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে", লিখেছেন টেইলর। আরেকটি ছিলো স্বামী কর্তৃক স্ত্রী খুনের মামলা। স্ত্রীর বয়স খুব বেশি হলে ১২ থেকে ১৪। কোনো রকম কারণ বা প্ররোচনা ছাড়াই বাচ্চা মেয়েটিকে খুন করা হয়। তৃতীয় মামলাটিও স্ত্রী খুনের মামলা। একই বয়সের বধূটিকে হাত-পা বেঁধে ঝুলিয়ে পেটানো হয়। পরদিন এক সাক্ষীর মতে, মেয়েটি দেখা গেল পাগলের মতো বকছে এবং তখন স্বামী তাকে দড়িতে ঝুলিয়ে কর্তব্য সমাপণ করলো।

টেইলর এই বাল্যবিবাহের সমালোচনা করেছেন। লিখেছেন, এই বাচ্চা মেয়েরা করুণার পাত্র হয়ে থাকে আজীবন এবং হিন্দু সমাজের এটি একটি কালো অধ্যায়।

চার মাস ময়মনসিংহে কাটানোর পর ছুটি নিয়ে পাটনার পথে কলকাতা রওয়ানা হলেন টেইলর। সঙ্গে মেয়ে ও কদু পাতার আবিষ্কারক সেই মিসেস চার্লস ল্যান্স। তার স্বামী আগে বদলি হয়ে রওয়ানা হয়ে গেছেন উত্তর প্রদেশ। এবার দুটো নৌকা ভাড়া করে রওয়ানা হলেন তার জলপথে। কলকাতায় তিনি তদবির করলেন বদলির, তারপর ছুটির কিন্তু হ্যালিডে কিছুতেই রাজি হলেন না। ফলে তাকে আবার 'পরম শান্তির নিঃসঙ্গ জলায় ফিরে আকর্ষণহীন কাজ' হাতে নিতে হলো। এবার অবশ্য তাকে আসতে হলো একা।

কিছুদিন পর টেইলর জানলেন, ময়মনসিংহে আসার আগে তিনি যে স্মারকলিপি পাঠিয়েছিলেন লন্ডনে কোম্পানির ডিরেক্টরদের কাছে তা হ্যালিডের অফিসেই পড়ে আছে, লন্ডনে আর পাঠানো হয়নি। শুধু তাই নয়, বড়লাট ক্যানিং তাঁকে আবার উঁচু পদে ফিরিয়ে নিতে বলেছিলেন। বাংলা সরকার তাতেও রাজি না। এমনকি মেডিকেল সার্টিফিকেট থাকা সত্ত্বেও তার ছুটি নামঞ্জুর করা হয়েছে। টেইলর দেখলেন, পদত্যাগ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। ভারাক্রান্ত চিত্তে ঝুঁকি নিয়ে তিনি পদত্যাগ করলেন। অবশ্য তাতে তার কোনো ক্ষতি হয়নি। কারণ এরপর তিনি শুরু করলেন আইন ব্যবসা, অর্থাগমনও হলো মন্দ নয়। তবে সে অন্য কাহিনী।

৯
গ্রাহাম সাহেবের পূর্ববঙ্গ

"প্রথমবার ঢাকা চমকে দেয়", লিখেছেন গ্রাহাম, "আমাকে তা ভেনিসের কথা মনে করিয়ে দেয়। এক ফার্লোতে আমি সেখানে গিয়েছিলাম। মনে হয়, নদী থেকে উত্থিত হয়েছে শহরটি। প্রথমে চোখে পড়ে সৈন্যদের ব্যারাক [মিল ব্যারাক] যেখানে রাখা হয়েছে সৈন্যদের, যদি প্রয়োজন পড়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে। তারপর পৌঁছলাম পাথরে তৈরি ঘাটে। মানুষজনের চাঁদায় তা নির্মিত।" গ্রাহাম বাকল্যান্ড বাঁধের কথা বলছিলেন। তাঁর মতে, এই বাঁধটি ঢাকার চেহারা বদলে দিয়েছে। অনেকটা লন্ডনে টেমসের এমবারকমেন্টের মতো। বাঁধের পাশে নির্মিত হয়েছে চমৎকার কিছু তিন তলা বাড়ি। গ্রাহাম লক্ষ্য করে দেখলেন, ইউরোপিয়ানদের জন্য যেসব বাড়ি নির্মিত হয়েছে সেগুলো সবই দোতলা। যতই তাঁরা এগিয়ে যেতে লাগলেন ততই দেশী মানুষ, মসজিদ আর মন্দিরের সম্মুখীন হতে লাগলেন। নদী তীর থেকে দু'তিন মাইল পর্যন্ত দৃশ্য এরকম। স্টিমার থেকে দৃশ্যটি ছবির মতো। নদীর ঘাটে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন লিল্যান্ড। গ্রাহাম তাঁর জায়গায় এসেছেন। লিল্যান্ড অবিবাহিত, থাকেন কমিশনারের তিন তলা বাড়িতে। বাড়ি না পাওয়া পর্যন্ত গ্রাহামরাও থাকবেন সেখানে। চাকরদের কাছে মালপত্র জিম্মা করে গ্রাহামরা উঠলেন ঠিকা গাড়িতে। গ্রাহাম লিখেছেন, এতো দূরে মফস্বলে এ ধরনের 'সভ্যতা' তিনি আশা করেননি।

গ্রাহামের মনে হয়েছে, শহরের দেশী অংশটি ব্যস্ত, জনবহুল আর স্বচ্ছল। কিছু দূর যেতেই লক্ষ্য করলেন, তাঁর স্ত্রীর মুখ মলিন হয়ে আসছে। কারণ আর কিছু নয়, আদ্রর্তা, এখন মার্চ আর বছরের এটিই সবচেয়ে শুকনো মাস। কমিশনারের বাসায় ঢোকার পরও স্ত্রীর মুখের ম্লান ভাব দূর হলো না। কমিশনার নিচের তলা ব্যবহার করেন না। নিচ তলা ব্যবহৃত হয় তাঁর অফিস হিসেবে। তবে, লিল্যান্ডও থাকে নিচে। তাঁর মতে, ম্যালেরিয়া বা স্যাঁতসেঁতেভাব তাঁর কিছুই করতে পারবে না।

কমিশনার স্যান্ডার্স তাঁদের আপ্যায়িত করলেন টিফিন দিয়ে। গ্রাহামের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে তিন তলায়। এখান থেকে নদী দেখা যায়, বাতাস আসে হু হু করে। মোটামুটি আরামদায়ক। বিকেলে, কমিশনারের বাসার উল্টোদিকে রেজিমেন্টের ব্যান্ড বাজতে লাগলো, সুবেশী পুরুষ-রমণীরা বাঁধে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। উচ্ছল এক পরিবেশ। গ্রাহাম লিখেছেন, "মফস্বলে কোনো সিভিল স্টেশনে আমি আগে এমনটি দেখিনি।"

বাঁধেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলো ভবিষ্যতে সহকর্মীদের সঙ্গে। জজ অডালেন ও তাঁর স্ত্রী যাঁরা আরেকটি দোতলায় বাস করেন। জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ল্যাং ও তাঁর স্ত্রী, পুলিশের এসপি পিল, অবিবাহিত, তাঁর সহকারী একজন স্কচ, মাকরে ও তাঁর সুন্দরী স্ত্রী; রেজিমেন্টের প্রধান একজন কর্নেল, অবিবাহিত; দু'জন সহকারী যার একজন বিবাহিত, ব্যাংক অব বেঙ্গলের একজন। আর আছেন ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল। তাঁর আছে একটি মেয়ে, সদরে যেটি সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয়। তাঁর ভাষায়, "টু পজেজ দ্য ম্যাটেরিয়াল ফর হোয়াট কুড বি কলড এ 'বল' ইন দ্য মফস্বিল"।

রাতে নৈশভোজের সময় গ্রাহাম মন্তব্য করলেন, বাঁধটি কতো বড় একটি উন্নয়ন। স্যান্ডার্স জানালেন, এটাতে তাঁর কোনো কৃতিত্ব নেই। এর সব কৃতিত্ব তাঁর পূর্বসুরি বার্কলের [বাকল্যান্ড]। এটি নির্মাণে ও সংরক্ষণে বেশ অর্থের দরকার। এবং এটি নির্মিত হয়েছিলো 'নৈতিক প্রভাব' বিস্তার করে। তিনি জানালেন, এখানে সবাই বার্কলেকে ভক্তিশ্রদ্ধা করতো। একদিন তিনি ঢাকার গণ্যমান্যদের ডাকলেন। এবং বাঁধ তৈরির পরিকল্পনা জানিয়ে সবাইর কাছে চাঁদা চাইলেন। কেউ যদি তাঁর মনোমতো চাঁদা না দিতো বার্কলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে তা জানিয়ে দিতে দ্বিধা করতেন না। যেমন, নব্য ধনী মোহিনী মোহন। সভায় তিনি ছিলেন না। খবর পেয়ে চাঁদা পাঠালেন আড়াই হাজার রুপি (আড়াইশ পাউন্ড) বার্কলে তা ফেরত পাঠিয়ে জানতে চাইলেন, এত কম চাঁদা পাঠানোর কারণ কী? মোহিনী মোহন যখন পাঁচ হাজার রুপি পাঠালেন, বার্কেলে তাও প্রত্যাখ্যান করলেন। মোহিনী মোহন তখন জানতে চাইলেন, কতো পাঠাতে হবে? বার্কালে জানালেন, শহরে মোহিনী মোহনের যে মর্যাদা সে অনুযায়ী পঁচিশ হাজার রুপি হবে উত্তম। মোহিনী মোহন তখুনি সে টাকাটাই পাঠালেন। লিল্যান্ড জানালেন, তিনিও কিছু পাঞ্জাবি কাজ করেছেন। পাঞ্জাব ক্যাডার থেকে লিল্যান্ড বদলি হয়ে এসেছেন। সেখানে উদ্ধতভাবে সব কাজ করানো হয়। লিল্যান্ড জানালেন, ব্যান্ড স্ট্যান্ড যেখানে, সেখানে একটি বাড়ির সীমানা এসেছে একেবারে নদী তীর পর্যন্ত। বাঁধ তৈরি সেই সীমানার এক টুকরো খুবই বিসদৃশ লাগছিলো। বাড়িটি ছিলো তিন ভাইয়ের। লিল্যান্ড তাঁদের অনুরোধ করলেন সীমানাটা খানিকটা ছোট করতে, যাতে বাঁধটা সোজা করা যায়। প্রত্যেকেই

জানালেন, বাকি দু'জন রাজি হলে তাঁর আপত্তি নেই। একদিন লিল্যান্ড নিজে প্রত্যেক ভাইয়ের কাছে গিয়ে জানতে চাইলেন, অন্য দু'জন আপত্তি না করলে তিনি যা করতে চান তাতে তাঁর আপত্তি নেই তো! প্রত্যেকে সম্মতি জানালো। লিল্যান্ড দুই শ' কুলি লাগিয়ে দু'ঘণ্টার মধ্যে সীমানা প্রাচীর ভেঙ্গে সব পরিষ্কার করে ফেললেন। পরের দিন নির্মিত হলো নতুন দেয়াল। তিন ভাই কিছুই বললো না। তাঁরা সামান্য কিছু জমি হারিয়েছে কিন্তু বাঁধ হওয়াতে তাঁদের জমির দাম বেড়েছে। "সুতরাং, অভিযোগ করার কোনো অধিকার তাদের নেই", জানালেন লিল্যান্ড। এ প্রসঙ্গে গ্রাহামের মন্তব্য, "পাবলিক স্পিরিটের বড়ই অভাব নেটিভদের মধ্যে; উৎসাহী সিভিলিয়ানরা এভাবেই সেই অভাবটা পূরণ করেন।"

পরদিন সকালে স্যান্ডার্স গ্রাহামকে নিয়ে বেরুলেন ভ্রমণে। তাঁর আঁস্তাবল ঘোড়ায় পূর্ণ। দেশী জকিও আছে একজন। গ্রাহামের মতে, তিনি যত স্পোর্টসমস্যান দেখেছেন তার মধ্যে স্যান্ডার্সই সবচেয়ে আন্তরিক। তাঁর বন্দুকের সংখ্যাও বেশি। হাতি আছে পাঁচটি, ময়মনসিংহ রোড ধরে চললেন তারা উত্তর দিকে। ধোলাই খাল পেরুলে বাঁ দিকে রেসকোর্স। ডানে পরিত্যক্ত ক্যান্টনমেন্ট [পুরানা পল্টন]। ম্যালেরিয়ার কারণে পরিত্যক্ত হয়েছে ক্যান্টনমেন্টটি।

শহরের পাশে খোলা একটা জায়গা দেখিয়ে স্যান্ডার্স বললেন, ঐটে পোলোগ্রাউ্ড। [সোহরাওয়ার্দী উদ্যান] উত্তর দিক থেকে শুরু হয়েছে জঙ্গল যা শেষ হয়েছে ময়মনসিংহ হয়ে মধুপুরে। স্যান্ডার্স জানালেন, শহরটি স্বাস্থ্যকর নয়, অপরিচ্ছন্ন। স্যানিটেশন ব্যবস্থা বলতে কিছু নেই। চোখ কান খোলা রেখে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না।

গ্রাহাম দেখলেন, লিল্যান্ড তখনই তাঁকে চার্জ বুঝিয়ে দিতে চাচ্ছেন না। তাঁকে ময়মনসিংহে বদলি করা হয়েছে জজ হিসেবে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে প্রাণবন্ত ঢাকা ছেড়ে নির্জন নাসিরাবাদে যেতে তাঁর মন চাইছিলো না। সুতরাং, গ্রাহাম সকালে বিভিন্ন জনের সঙ্গে দেখা করলেন, বিকেলে স্ত্রীর সঙ্গে বেরুলেন বাড়ি খুঁজতে। গ্রাহামরা একটি বাড়ি খুঁজে বের করলেন যেখানে একজন যাজক আর কয়েকজন পৌর কমিশনার থাকতেন। গ্রাহাম যেহেতু এখন পদাধিকারবলে পৌরসভার চেয়ারম্যান সেহেতু প্রভাব খাটিয়ে তাদের অন্যত্র সরিয়ে দিয়ে বাড়িটি নিজের জন্য ঠিক করলেন। নতুন বাড়িতে ওঠার আগ পর্যন্ত তিনি অবশ্য স্যান্ডার্সের বাসায়ই ছিলেন। "না হলে মুশকিল হতো", লিখেছেন গ্রাহাম, "কারণ, ঢাকায় কোনো হোটেল বা ডাকবাংলো নেই। স্যান্ডার্স ব্যবস্থা না করলে নৌকায় থাকতে হতো। অনেকে এরকম নৌকা বানিয়ে নিয়েছে। যেমন, দক্ষিণ-পূর্ব বিভাগের স্কুল ইন্সপেক্টরের অধীনে আছে চল্লিশ হাজার বর্গমাইলের এক এলাকা। তিনি নিজের জন্য একটা নৌকা তৈরি করে নিয়েছেন, যেখানে তাঁর বুক শেলফ

সংগৃহীত শখের উদ্ভিদের নমুনা সংরক্ষণের জায়গা ছিলো। তবে, ঝড়ে মেঘনায় একবার তাঁর নৌকা ডুবে যায়। অল্পের জন্য তিনি বেঁচে যান।"

পরের দিন গ্রাহাম গেলেন কাচারি। নতুন দুটি অফিস তৈরি হয়েছে। একটি তাঁর, অন্যটি জজ ও তাঁর অধীনস্থ অফিসারদের জন্য। প্রথম কাজ ছিলো স্ট্যাম্প গোনা, তারপর তোষাখানায় আফিম আর টাকার হিসাব নেয়া। সেটিতে সময় বেশি লাগলো না। টাকাটা নেয়া হলো ওজন করে। তারপর অধস্তনদের সঙ্গে দেখা করলেন গ্রাহাম, বিকেলে গেলেন র‍্যাকেট কোর্টে, খেলতে।

পরদিন লিল্যান্ড গ্রাহামকে নিয়ে গেলেন জেল দেখাতে। জেলটি শহরের মাঝখানে, যাকে বলা যেতে পারে 'ব্যাডলি সিচুয়েটেড'। জেলের প্রাচীরও তেমন উঁচু নয়। সংস্কারের কাজ চলছে, জেলারের বাড়ি বানানো হচ্ছে। গ্রাহাম চার্জ বুঝে নেয়ার পর সরকারি চিঠিটি লিখেছিলেন নির্বাহী প্রকৌশলীকে। তাঁকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, জেলে ঢোকার জন্য একটি গেট তৈরি করে দিতে। পরে তা তৈরি করা হয়েছিলো। জেলে কয়েদী ছিলো পাঁচশ' জনের মতো। গ্রাহাম দেখলেন, তেমন কড়াকড়ি নেই, চারদিকে কেমন একটা ঢিলেঢালা ভাব। পাগলাগারদও পরিদর্শন করলেন গ্রাহাম। কেননা, পদাধিকারবলে তিনি এরও পরিদর্শক। মিটফোর্ড হাসপাতালেরও। পাগলাগারদে আছে প্রায় তিনশ' পাগল আর হাসপাতালের চার্জে আছেন একজন দেশী সাব এাসিস্ট্যান্ট সার্জন।

দুপুরের দিকে লিল্যান্ড গ্রাহামকে চার্জ বুঝিয়ে দিলেন। গ্রাহাম নিজেকে আবিষ্কার করলেন ২,৮৯৭ বর্গমইলের এক এলাকার প্রধান নির্বাহী হিসেবে। এখানে প্রতি বর্গমাইলে বাস করে ৬৩৯ জন। এলাকার একটি বড় অংশ, বিশেষ করে ঢাকা জঙ্গলে পূর্ণ। আবাদযোগ্য যেখানে, সেখানে জনঘনত্বও বেশি। মুন্সিগঞ্জে প্রতি বর্গমাইলে বাস করে এক হাজার একত্রিশ জন। অন্যদিকে ইংল্যান্ডে দু'শ উনচল্লিশ জন, জার্মানিতে একশ' উননব্বই আর ফ্রান্সে একশ' আশি জন।

॥ ২ ॥

ঢাকায় থাকাকালীন গ্রাহাম যেসব ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন তার মধ্যে তিনটি ঘটনার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। তার একটি হলো–

জমিদার চণ্ডিচরণ ও বলরাম পালের মধ্যে একটি কাচারি ঘর নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিলো। তাদের সংঘর্ষ হয়। গ্রাহাম খবর পেলেন, একজন নিহত ও পাঁচ-ছয় জন আহত হয়েছে। খবর পাওয়া মাত্র পুলিশ সুপার পিল ঘোড়ায় চড়ে ছুটলেন বিশ মাইল দূরের গ্রামে। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখেন এক বৃদ্ধের লাশ। শরীরে জখমের চিহ্নও আছে। মৃতদেহটি দেখে কিন্তু পিলের মনে হলো, এটি আসল লাশ নয়। লাশটি তিনি ঢাকা পাঠালেন সিভিল সার্জনকে দিয়ে পরীক্ষা করানোর জন্য।

তারপর গেলেন পাশের গ্রামে। সেখানে গিয়ে জমিদারের কাচারিতে বসলেন। এমন সময় এক লোক এসে বললো, সে কনস্টেবলের চাকরি চায়। পিল জানালেন, তাঁর কনস্টেবলের কোনো দরকার নেই। লোকটি বললো, পিল চাইলে সে তাঁর উপকার করতে পারে। পিল জানতে চাইলেন, কী ধরনের উপকার? লোকটি জানাল, তিন মাইল দূরে লক্ষ্মীকান্তর বাবার বাড়িতে গেলে আসল লাশ পাওয়া যাবে। পিল আবার ঘোড়ায় চড়ে তিন মাইল গেলেন। খুঁজে বের করলেন লক্ষ্মীকান্তর বাবার বাসা। সেখানে গিয়ে দেখলেন, মহিলারা সব মাতম করছে এক যুবকের লাশ ঘিরে। লাশের মাথায় জখমের চিহ্ন। ব্যাপারটা তারপর সহজ হয়ে এলো। এদিকে সিভিল সার্জন জানালেন, বৃদ্ধ মারা গেছে জ্বরে। জখমের চিহ্ন মৃত্যুর পরের। পিল বুঝলেন, দু'পক্ষই দোষী। দু'পক্ষকেই শাস্তি দেয়া হলো। লক্ষ্মীকান্ত ছিলো চণ্ডিচরণের পক্ষে। পিল সেই লোকটিকে নিয়ে নিলেন কনস্টেবল পদে।

লিল্যান্ড ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার দিন চারেক পর গ্রাহাম উঠলেন নতুন বাসায়। বাসার পঞ্চাশ গজের মধ্যে ছিলো র‍্যাকেট কোর্ট। অফিস ছিলো দু'শ গজ দূরে। বাসার কম্পাউন্ড বেশ বড়সড়। নিচ তলায় ছিলো ৪০×৩০ মাপের হল ঘর। সঙ্গে দুটি বেড রুম। ওপর তলায়ও একই ব্যবস্থা। চারদিকে বারান্দা। দেয়াল দু'ফুট পুরু। ভাড়া মাসে এগারো পাউন্ড। এর সঙ্গে দিতে হতো সাড়ে সাত ভাগ পৌরকর। বাড়িঅলা, হিন্দু ভদ্রলোক ছিলেন ভারি কৃপণ।

গ্রাহাম দুটি বাথরুম করতে চাইলেন। বাড়িঅলাকে জানালেন এর জন্য খরচ হবে দু'শ' পঞ্চাশ রুপি বা পঁচিশ পাউন্ড। গ্রাহাম বাড়িঅলাকে এ কারণে মাসে এক পাউন্ড বেশি বাড়ি ভাড়া দেবেন। বাড়িঅলা জানাল, সে বাথরুম দু'টি করে দেবে। কারণ, প্রত্যেক সাহেবই এ বাড়িতে এসে নিজের মতো কিছু করতে চান। দু'মাস পর বাড়িঅলা কাজে হাত দিলো। এ দুই মাস সে শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিনে পয়সায় ইট যোগাড় করেছে। কিছু কিনেছে। বর্গার জন্য যোগাড় করেছে পোকায় খাওয়া কিছু বীম। কাজ শুরু হলো। একদিন ঘরে বসে গ্রাহাম কাজ করছেন, হঠাৎ শোনেন বিকট শব্দ। দেখলেন, নতুন বাথরুমের ছাদ ভেঙ্গে পড়েছে। ভাগ্যিস কেউ আহত বা নিহত হয়নি। গ্রাহাম ঘোষণা করলেন, বাড়িঅলাকে থানায় সোপর্দ করবেন। এবার বাড়িঅলা এসে কাকুতি মিনতি করে সময় চাইলো। গ্রাহাম রাজি হলেন। দু'মাসের মধ্যে ভালোভাবে বাথরুম তৈরি হয়ে গেল।

ঢাকায় তখন পোলো খেলার খুব চল। মনিপুরীরা খুব ভালো পোলো খেলতো। মনিপুরের যুদ্ধের পর এদের অনেককে বন্দি করে ঢাকার অদূরে এক গ্রামে [বর্তমান মনিপুরীপাড়া] রাখা হয় যার দেখাশোনার ভার ছিলো গ্রাহামের

ওপর। পোলো খেলার জন্য তাই গ্রাহাম দু'টি টাট্টু কিনে ফেললেন। পত্তন করলেন নতুন ক্লাব ঘরের। 'ঢাকা নিউজ'-এর সম্পাদক এ সময় তাঁকে বেশ নাস্তানাবুদ করেছেন। কারণ, সম্পাদক গ্রাহামকে পছন্দ করতেন না।

॥ ৩ ॥

জেলার ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে গ্রাহাম ছিলেন পদাধিকারবলে পৌরসভার চেয়ারম্যান। এটি তাঁকে সব সময়ে উদ্বেগের মধ্যে রাখতো। গ্রাহাম যখন পৌরসভার চেয়ারম্যান তখন ১৮৬৪ সালের এ আইন বলবৎ হয়েছে– যার অধীনে পৌর কমিশনারও নিয়োগ করা হয়েছে। পৌরসভার আয়-ব্যয়ের মধ্যে কোনো সঙ্গতি ছিলো না।

পৌরসভা বছরে কর থেকে পেতো ষাট হাজার রুপি। প্রথম নোটিশে কেউ কর দিতো না। তহশীলদারকে বারবার এ জন্য তাগাদা দিতে হতো। কর ধার্য করা হতো বাড়ি ভাড়ার ওপর এবং তা করতেন কমিশনাররা। এই হাত ছিলো শতকরা সাড়ে সাত ভাগ। গাড়ির ওপরও [হুইল ট্যাক্স] কর ছিলো।

গ্রাহাম মন্তব্য করেছেন, ভারতের মফস্বল শহরগুলোর জন্য 'হাউস ট্যাক্স' কাম্য নয়। ঐ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে, তাঁর মন্তব্য যথার্থ। কারণ, তাঁর মতে, খুব কম ইমারতেই আছে যথার্থ অর্থে যাকে বাড়ি বলা যেতে পারে; ইটের তৈরি যেগুলি, অধিকাংশ সেগুলো ছোট; ভাড়াও সামান্য।

ঐ সময়ের ঢাকা শহরের বর্ণনা করেছেন গ্রাহাম এভাবে– "ঢাকার অবস্থা খুব খারাপ। সরকার এখানে পয়ঃপ্রণালীর কোনো বন্দোবস্ত করেনি। রাস্তাঘাট ভাঙ্গাচোরা। পুরো শহর নানা রকম নোংরা গর্তে আকীর্ণ। গর্ত খুঁড়ে মাটি নিয়ে ঘর বানান হয়েছে।" আইনি ক্ষমতা দিয়ে গর্ত করা বন্ধের ক্ষমতা তাঁর ছিলো। কিন্তু গ্রাহাম মন্তব্য করেছেন, আগে শহর জুড়ে যে গর্ত করা হয়েছে সেগুলো ভরাট করবে কে? "ইংরেজরা যেসব আইন করেছে সেখানে বিদ্যমান স্বার্থ ক্ষুণ্ন না করার ভালো বন্দোবস্ত রেখেছে।"

পৌরসভা যা আয় করতো তার এক-ষষ্ঠাংশ যেতো মিউনিসিপ্যাল পুলিশের পিছে, যদিও তা পর্যাপ্ত ছিলো না। তিনি হিসেব করে দেখলেন, শহরে করদাতাদের সংখ্যা নয় হাজারের বেশি এবং প্রত্যেকের করের হার এক রুপির কম। অন্যদিকে ইউরোপিয়দের বাড়ি বড় হওয়ায় ও গাড়ি থাকায় তাদের কর দিতে হতো বেশি। নেটিভরা বলতো, তাদের করের টাকা যায় ইউরোপিয়ানদের দিক উন্নত করতে [অভিযোগ ছিলো সত্যি]। অন্যদিকে পোলো গ্রাউন্ডে জজের বউ বললেন, 'মিঃ গ্রাহাম, এখানে আসার সময় আমার গাড়ির স্প্রিং ভেঙ্গে গেছে। রাস্তাগুলো কখন সারাবেন?' আর ছিলো সাপ্তাহিক ইংরেজি সংবাদপত্র 'দি ঢাকা নিউজ'। পত্রিকাটি পৌরসভার ব্যর্থতার জন্য চেয়ারম্যানকে অনবরত দায়ী করছিলো। সঙ্কট

সমাধানের জন্য তিনি একটি খসড়া প্রস্তাব করে কমিশনারদের মিটিং ডাকলেন। সভার শুরুতে ঢাকার সার্বিক অবস্থা বর্ণনা করে বললেন, "ঢাকা এমন একটি জায়গা যেখানে কলেরা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে; শুধু তাই নয়, যে বাতাস তারা নিঃশ্বাসে নেয়, যে পানি তারা খায়, যে পানি দিয়ে তারা গোসল করে, কাপড় ধোয়া– সব দূষিত মলমূত্র দ্বারা। জোরালোভাবে বক্তব্য শেষ করলাম।"

সুতরাং এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে করের হার দ্বিগুণ করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে চার আনার নিচে সমস্ত কর বিলুপ্ত করতে হবে। 'ঢাকা নিউজ'-এর সম্পাদকও প্রস্তাব সমর্থন করে লেখালেখি শুরু করলেন। দেশী কমিশনাররা এর বিরুদ্ধে ছিলেন। তবুও প্রস্তাব গেল সরকারের কাছে এবং সরকার তা প্রত্যাখ্যান করলো। এ পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাহাম লিখেছেন, "বাংলায় কলকাতা ও আরো কয়েকটি বড় শহর ছাড়া পৌর আইন সব জায়গায় অপর্যাপ্ত; কারণ শহরের ভালো কিছু করার জন্য পর্যাপ্ত তহবিল নেই। আর শহরগুলো এমন এক সময় গড়ে উঠেছে যখন পয়ঃনিষ্কাশন সম্পর্কে ধারণা ছিলো না বা গুরুত্ব দেয়া হয়নি।"

ঢাকা শহরের পরিবেশের আরো কিছু বর্ণনা আছে তাঁর গ্রন্থে। তিনি জানিয়েছেন, "ঢাকার দেশী লোকদের বাড়ির ভেতর যে কুয়া আছে তার পানি মলমূত্র দ্বারা ভয়ানকভাবে দূষিত; মুসলমানদেরগুলো গলিত শবের দ্বারা। মুসলমানরা, মৃতদেহ বিশেষ করে মেয়েদের সমাহিত করে বাড়ির ভিতের নিচে!

[আন্ডার দি ফ্লোরস অব দেয়ার হাউসেস]। আমরা একটা জায়গা ঠিক করলাম, সেখানে কবর দেয়ার বন্দোবস্ত হলো। কিন্তু মুসলমানরা সেখানে যাবে না। এ কারণে অত্যন্ত কঠোর হতে হলো তাদের প্রতি।"

সকালবেলাটা গ্রাহাম ঘোড়ায় চড়ে একবার চক্কর দিতেন, পৌরসভার কাজ দেখতেন বা মিটফোর্ড, পাগলাগারদ ও জেল পরিদর্শন করতেন। একদিন কোতোয়ালির সামনে দিয়ে যাচেছন, দেখেন ভিড়। সামনে গিয়ে দেখেন এক কাশ্মীরি মহিলা শুয়ে। তার নাক ও ঠোঁটের ওপর দিকটা কাটা। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার শরীর। এক পুলিশ বসে আছে পাশে কাগজ-কলম নিয়ে।

'কি করছো?' জিজ্ঞেস করলেন গ্রাহাম।

'জবানবন্দি নিচ্ছি।' পুলিশের উত্তর।

'আরে রক্ত বন্ধ না হলে সে মারা যাবে', বললেন গ্রাহাম, 'একটা কাপড় দিয়ে মুখ ব্যান্ডেজ করে হাসপাতালে নাও।'

এটি শুনে মহিলা বললো, 'আমি তাহলে বাঁচবো?'

'বাঁচবে। এখন চুপ করে থাক।'

'আমার খালা আপনাকে সব বলবে।'

তার খালা বৃদ্ধ মহিলা। বললো, মেয়েটির স্বামী ঈর্ষাকাতর। সকালে ঝগড়া

করার একপর্যায়ে এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছে। 'নাকটা খুঁজে পাও কিনা দেখ', গ্রাহাম বললেন বৃদ্ধাকে, 'খুঁজে পেলে তা হাসপাতালে নিয়ে যাও।'

বৃদ্ধা জানালো, নাকটা খুঁজে পাওয়া যাবে। পাওয়া গেলো নাক। গ্রাহাম নিজে মহিলাকে নিয়ে গেলেন হাসপাতালে, সাব এ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনকে বললেন, নাকটা জোড়া লাগতে। গ্রাহামের মনে হয়েছিলো, সার্জারি ঠিক হলে, সার্জারির প্রতি দেশীয়দের যে ভয় আছে তা কেটে যাবে। বিকালে ডাক্তার এসে গ্রাহামকে জানালেন, মেথরকে তিনি নাকটা দিয়েছিলেন ধুতে। নাকটা ধুয়ে সে একটু পিছন ফিরেছে অমনি কাক এসে নাক নিয়ে পালিয়েছে।

এ রকম আরেকটা ঘটনা ঘটেছিলো কমিশনার স্যান্ডর্সকে নিয়ে। স্যান্ডার্স গেছেন একবার শিকারে। হঠাৎ পড়ে যান এক ভালুকের সামনে। ভালুক তাঁকে আক্রমণ করে তাঁর বুড়ো আঙ্গুলটি দাঁত দিয়ে কেটে ফেলে। স্যান্ডার্সের সঙ্গী গুলি করে ভালুকটিকে মারলেন। স্যান্ডোর্সের জন্য এর পর পালকির বন্দোবস্ত করে, মাটি থেকে আঙ্গুলটি তুলে পালকির ওপর রাখলেন। অমনি এক কাক এসে তা নিয়ে গেলো।

সেই কাশ্মিরী মহিলাটি বেঁচে গেলো। কিন্তু তারপর থেকে সে বোরখা পরতো। তার স্বামীর বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করা হয়েছিলো। দু'মাস পর বাখেরগঞ্জে তার স্বামী সন্দেহে একজনকে গ্রেফতার করে ঢাকা নিয়ে আসা হলো। মামলা উঠলো আদালতে। মামলার দিন আদালত ভিড়ে একাকার। বোরখা পরে সে মহিলা এলেন এজলাসে। লোকটিকে দেখে জানালেন, সে তার স্বামী নয়। মামলা শেষ।

ঢাকার জেলখানা নিয়েও সমস্যায় পড়েছিলেন গ্রাহাম। জেলার ছিলেন লুকাস নামে এক আর্মেনিয়ান। গ্রাহাম ঢাকায় এসে চার্জ বুঝে নেয়ার আগেই তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। তাঁর জায়গায় নিয়োগ করা হয় স্টার্কি নামে এক ইউরোপিয়ানকে। তাঁর বেতন ছিলো মাসে একশ' রুপি বা দশ পাউন্ড। এছাড়া জেলে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রির ওপর শতকরা পাঁচ ভাগ ছিলো তাঁর প্রাপ্য। কোনো ইউরোপিয়ান এ বেতনে কাজে রাজি ছিলো না। তবে, বেতনে দক্ষ নেটিভ পাওয়া যেতো।

স্টার্কির কাজে প্রায়ই গোলমাল দেখা দিতো। একবার অভিযোগ এলো, ডাক্তারের সঙ্গে সে খারাপ ব্যবহার করেছে। তদন্ত হলো। তদন্তে স্টার্কি নির্দোষ প্রমাণিত হলো। স্টার্কি এ উপলক্ষে এক পার্টি দিলো। লুকাসকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো পার্টিতে। স্টার্কির বাসা ছিলো জেল ফটকের ওপর। রাত দু'টায় গ্রাহাম খবর পেলেন জেলে একটা খুন হয়েছে। ছুটলেন সেখানে।

জানা গেল, স্টার্কি, তার বৌ ও তিনজন অতিথি মিলে পাঁচ ডজন বিয়ার খেয়েছে। তারপর কী কারণে যেন লুকাসের সঙ্গে তার ঝগড়া শুরু হয় এবং

ঝগড়ার এক পর্যায়ে লুকাসকে জানালা দিয়ে ঠেলে সে নিচে ফেলে দেয়। লুকাসকে নিয়ে যাওয়া হলো মিটফোর্ডে, মৃত্যুর আগে জবানবন্দিতে তার মৃত্যুর জন্য স্টার্কিকে দায়ী করেন লুকাস। এরপর স্টার্কিকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠানো হয়। আদালতে প্রমাণাভাবে স্টার্কি মুক্তি পায়। কিন্তু স্টার্কি পরে পাগল হয়ে যায়। তাকে পাঠানো হয় কলকাতা পাগলাগারদে।

জেলার হিসেবে এরপর ডানস্টান নামে আরেকজন ইউরোপিয়ানকে নিয়োগ করা হয়। ডানস্টান এসে জেলখানার নামে ব্যবসা করতে চাইলো। প্রথমে সে গ্রাহামকে প্রস্তাব দিলো, ইউরোপিয়ানদের খাসির মাংস সে সরবরাহ করবে। তাকে দেয়া হলো সে ভার। কিছুদিন পর সাহেবরা বলতে লাগলেন, মাংসের কোয়ালিটি খারাপ। তারপর ডানস্টান চাইল সোডা মেশিন বসাতে। জেলের মহাপরিদর্শকের অনুমতি নিয়ে তা বসানোও হলো। কিন্তু তাও ব্যর্থ হলো। "ডানস্টান এভাবে আমাকে মহাবিরক্ত করেছে", লিখেছেন গ্রাহাম।

গ্রাহামের মতে, "পাগলাগারদে দু'ধরনের লোক আছে। ক্রিমিনাল ও নন-ক্রিমিনাল। ক্রিমিনালদের মধ্যে সত্তর ভাগ পাগল হয়েছে গাঁজা খেয়ে– লিখেছেন তিনি। এ বিষয়ক আইনের দিকে নজর দেয়া উচিত। গাঁজা খেয়ে যারা পাগল হয়েছে তাদের নেশাখোর হিসাবে গণ্য করা উচিত এবং নেশাখোরকেই দায়ী করা উচিত। সিভিল সার্জনও এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত পোষণ করেছিলো। কিন্তু আমি ভারতে যতদিন ছিলাম ততদিন এ বিষয়ে কিছুই হয়নি।"

॥ ৪ ॥

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে গ্রাহামের দায়িত্ব ছিলো নিজ এলাকা বা জেলা পরিদর্শন করা। নভেম্বরের শেষদিকে বৃষ্টির উৎপাত বন্ধ হলে শুরু হলো পরিদর্শনের পালা। পূর্ববঙ্গে চলাচলের প্রধান উপায় নৌকা, গ্রাহামও বেশিরভাগ সময় ভ্রমণ করেছেন জলপথে। ভ্রমণের জন্য ব্যবহৃত হয় কয়েক রকমের নৌকা। নৌকা, বজরা ও কোষ নৌকা। প্রত্যেকটিতে আছে বসার, শোয়ার আর হালের কাছে স্নানের জায়গা। তবে প্রথম দু'টি বড়সড়। কোষ নৌকা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও সরু। অতটা আরামদায়ক নয়, কিন্তু দ্রুত। এগুলোর ভাড়ার হার ছিলো দিনে পাঁচ থেকে ছয় টাকা। সরকারি হার অনুসারে ট্যুরের জন্য পাওয়া যেতো পাঁচ রুপি (দশ শিলিং) বা মাইলপ্রতি আট আনা (এক শিলিং)।

গ্রাহাম লিখেছেন, বাঙালি মাঝিরা বিশ্রাম ছাড়া যেভাবে দাঁড় বাইতে পারে তা আশ্চর্যজনক। নৌকায় মাল্লারা হয় সাধারণত হিন্দু, নয় মুসলমান, যাতে একজন সবার জন্য রান্না করতে পারে।

জেলা অফিসারের কাজ হচ্ছে এ ধরনের ভ্রমণে চোখ কান খোলা রাখা,

যেমন– শস্যের ফলন কেমন, রাস্তার দরকার আছে কি-না, খালটি বুজে গেছে কি-না বা গ্রামের স্যানিটারি অবস্থা কেমন ইত্যাদি।

মানিকগঞ্জ মহকুমা পরিদর্শনের জন্য চমৎকার এক চাঁদনি রাতে ঢাকা থেকে গ্রাহাম যাত্রা করলেন উত্তর-পশ্চিম দিকে। দক্ষিণ-পূর্ব থেকে বইছে মৃদুমন্দ হাওয়া। সান্ডার্সের বাসার সামনে থেকে নৌকায় উঠলেন গ্রাহাম, বাঁধ, মসজিদ, মন্দির, লালবাগ পেরিয়ে নৌকা এগোতে লাগল। সকালের দিকে গ্রাহাম পৌঁছলেন সাভার। থানার সামনে চমৎকার এক তেঁতুল গাছ।

গ্রাহামকে অভ্যর্থনা জানাতে এলো এক সাব-ইন্সপেক্টর। সঙ্গে কয়েকজন অধস্তন কর্মচারী। প্রথমেই সে অনুরোধ জানালো তেঁতুল গাছটি ফেটে ফেলার জন্য। অবাক হলেন গ্রাহাম। কারণ দেশীয়রা সব সময় গাছ বাঁচাতে ইচ্ছুক সুতরাং এ ধরনের অনুরোধ অস্বাভাবিক। সাব-ইন্সপেক্টর জানান, লোকজন এসে তাঁকে বলছে, এ গাছের জন্য তাদের জ্বর হচ্ছে। গ্রাহাম এত সুন্দর গাছটি কাটতে ইচ্ছুক নন। লিখেছেন তিনি, "আমার বিশ্বাস গাছটি এখনও দাঁড়িয়ে কয়েক মাইলের মধ্যে যা একটি ল্যান্ডমার্ক।" থানা পরিদর্শনে অনেক সময় লাগে। কারণ সেখানে থাকে নানা ধরনের রেজিস্টার, আর সেগুলো ভালোভাবে পরীক্ষা করলে এলাকাটি সম্পর্কে নানা ধরনের তথ্য জানা যায়।

পুলিশ ক্ষমতার অপব্যবহার কিভাবে করতে পারে তার উদাহরণ দিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন, "এ কথা স্বীকার করতে হয় যে পুলিশ নিপীড়ক। কিন্তু তাদের তো নেয়া হয় সাধারণ থেকে এবং আমরা এর চেয়ে ভালো কিছু পাই না। তবে, আগে থেকে তারা এখন অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণে। অবস্থার অবশ্যই উন্নতি হয়েছে। তবে, সরকারি ক্ষমতা প্রাথমিকভাবে ব্যবহার করা হয় ব্যবহারকারীর স্বার্থে ও সাধারণ মানুষের মন থেকে এ ধারণা দূর করতে সময় লাগবে।"

গ্রাম পরিদর্শনের সময় গ্রাহামের সঙ্গে জুটলো এক খয়ের খাঁ। সে বিভিন্ন যুক্তি ও হিসাব দেখিয়ে বললো, সাভারকে পৌরসভা করলে লাভ হবে। গ্রাহাম তাতে রাজি হলেন না।

দুপুরের পর গ্রাহাম রওনা হলেন মানিকগঞ্জের দিকে। বাতাস অনুকূলে না থাকায় সেখানে পৌঁছলেন পরদিন সকালে। মাটির দেয়াল, খাড়া চাল, জীর্ণশীর্ণ কিছু বাড়িঘর– এই হলো মানিকগঞ্জ।

মানিকগঞ্জের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাজে গাফিলতি দেখলেন গ্রাহাম। এ বিষয়ে তিনি রিপোর্টও করেছিলেন কমিশনারের কাছে। কিন্তু কমিশনার সেই মুসলমান ভদ্রলোককে পছন্দ করতেন দেখে কোনো শাস্তি না দিয়ে ঢাকা সদরে বদলি করেছিলেন।

এরপর ঢাকায় ফিরে আবার রওনা হলেন ভাওয়ালের দিকে। ভাওয়ালের

জমিদার কালীনারায়ণ রায় সাহেব কর্মকর্তাদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখতে চান। তাঁর জমিদারির একটা বড় অংশ জঙ্গল। তিনি বাস করেন দক্ষিণ-পূর্বে খানিকটা পরিস্কৃত জায়গায়। তাঁর বাড়ির সঙ্গেই ইউরোপিয়ানদের থাকার জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করেছেন।

স্ত্রী-পুত্র নিয়ে গ্রাহাম সে বাড়িতেই উঠলেন।

কালীনারায়ণ খবর পাঠালেন, গ্রাহামের স্নান নাস্তা করা শেষ হলে তিনি দেখা করতে আসবেন। কালীনারায়ণের ড্রইংরুমটি সজ্জিত দশটি ইংলিশ এনগ্রেভিং দিয়ে। মজা হলো, প্রতিটি এনগ্রেভিং দুটো করে। এনগ্রেভিংগুলোর শিরোনাম– 'পুরনো আমলে বোলটন স্যাবি', 'ওয়াটার্লুর পর ব্লুচার ও ওয়েলিংটনের সাক্ষাত' ইত্যাদি। হয়ত কলকাতার কোনো এজেন্টের মাধ্যমে এগুলো সংগ্রহ করেছেন।

ঠিক সময়ে এলেন কালীনারায়ণ। খানিকটা কথাবার্তার পর গ্রাহামের স্ত্রীকে নিয়ে গেলেন ভিতরে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য। গ্রাহামের স্ত্রী পরে জানিয়েছেন, তিন বয়সী তিনটি স্ত্রী আছে কালীনারায়ণের এবং প্রত্যেকেই পরমাসুন্দরী। প্রত্যেকের ঘরেই ছেলেমেয়ে আছে।

গ্রাহাম লিখেছেন, "অনেকেই অভিযোগ করে যে আমরা দেশী সমাজ থেকে দূরে নাকি। আসলে, ব্যাপারটা উল্টো, বর্ণপ্রথা, মহিলাদের পরদা সব মিলিয়ে মেলামেশাটা হয় না। এই যে কালীনারায়ণ যিনি দেখাতে চান যে তিনি ভদ্র ও অতিথিপরায়ণ কিন্তু পারছেন না ধর্মের কারণে। এমনও হতে পারে প্রতিবার সাক্ষাতের পর তাঁকে শুদ্ধ হতে হয়।"

গ্রাহাম ভাওয়ালে ছিলেন কয়েকদিন। দিনে দু'বার তাঁর সঙ্গে দেখা হতো কালীনারায়ণের এবং ক্রমেই তাঁরা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন।

একদিন গ্রাহাম বসে আছেন কালীনারায়ণের সঙ্গে কাছারিতে। এমন সময় এক গ্রামবাসী তার ছোট মেয়েকে নিয়ে এলো, যার জন্ম হয়েছে হাত-পা ছাড়া। লোকটি বললো, 'আমার কপাল খারাপ যে এটি মেয়ে, যার বিয়ে হবে না; কারণ পণ দেয়ার ক্ষমতা আমার নেই। মেয়েটি কাজ করেও খেতে পারবে না।

'তুমি বোধহয় একে মেরে ফেলতে চাও', জিজ্ঞেস করলেন কালীনারায়ণ।

খুশি হয়ে লোকটি বললো, 'হুজুর, অনুমতি দিলে বলি, আমারও তাই ইচ্ছে।'

লোকটির প্রস্তাবে কালীনারায়ণ রাজি হলেন। গ্রামের চৌকিদার ছাড়া ব্যাপারটি আর কেউ জানতো না। কিন্তু কালীনারায়ণ বললেন, মেয়েটির যত্ন করতে হবে, টাকা তিনি দেবেন। মেয়েটির কোনো ক্ষতি হলে তিনি দেখে নেবেন। লোকটি হতাশ হয়ে চলে গেল।

কথা প্রসঙ্গে গ্রাহাম কালীনারায়ণকে বললেন, ফৌজদারী আদালতে তাঁর

কোনো মামলা নেই দেখে তিনি খুশি। কালীনারায়ণ বললেন, 'না, এখন নেই, তবে বয়স যখন কম ছিলো, রক্তও গরম ছিলো তখন লড়াই করতাম; কোর্টে কেসও থাকত। সে সময় নিম্নবর্ণ, পুলিশ আর অন্যদের পায়ে ধরতে হতো। এখন বয়স হয়ে গেছে। তাই যেতে হলে দেওয়ানীতে যাই। তাছাড়া ডেভিস সাহেবের সঙ্গে এখন কোনো বিবাদ নেই।'

এই এলাকার আরেকজন ডাকসাইটে জমিদার ছিলেন ডেভিস। গরিব হিসাবে ভারতবর্ষে তার আগমন কিন্তু হয়ে উঠেছিলেন পরে বড় জমিদার। তিনি প্রায়ই মামলা করতেন কালীনারায়ণের নামে।

কালীনারায়ণ জানালেন, একবার ডেভিসের সঙ্গে তাঁর ফৌজদারী মামলা হলো। সেটি ঠেকলো গিয়ে শেষে দেওয়ানী আদালতে। 'বাদী ছিলাম আমি।' বললেন কালীনারায়ণ, 'সদর আমীন আমার বিরুদ্ধে রায় দিলেন যা ন্যায্য ছিলো না। সুতরাং চলে গেলাম ঢাকা, দেখা করতে চাইলাম সদর আমীনের সঙ্গে। খবর পাঠালেন, তার মাথাব্যথা। রক্ত গরম ছিলো। চিৎকার করে বললাম, কালীনারায়ণের বিরুদ্ধে অন্যায় রায় দেয়ার কারণেই কি সদর আমীন দেখা করতে ভয় পাচ্ছেন?

চিৎকার শুনে সদর আমীন বেরিয়ে এলেন। বললেন আমাকে, 'আমার পরিবার, সবাইকে গাল দিন কিন্তু পায়ে ধরছি আমার সর্বনাশ করবেন না।'

'আমার বিরুদ্ধে অনাস্থা রায় কেন দিলেন?' জিজ্ঞেস করলেন কালীনারায়ণ।

'আমি গরিব লোক', বললেন সদর আমীন, 'আমার কিছু জমি আছে যার চারদিকে ডেভিসের জমি। তার বিরুদ্ধে রায় দিলে আমার জমি সে দখল করে নেবে। কিন্তু, আপনি কলকাতার সদর কোর্টে আপিল করতে পারেন। আমি রায় দিয়েছি বটে কিন্তু রায়ের পরিপ্রেক্ষিত উল্লেখ করিনি। আমি সে পরিপ্রেক্ষিত এমনভাবে লিখবো যাতে আপিল করলেই রায় পাল্টে যাবে।"

"আরেকবার ডেভিসের প্ররোচনায় দাঙ্গা বাধে আমার লোকদের সঙ্গে", জানালেন কালীনারায়ণ, "সাতজন মারা যায়। কিন্তু, আদালতে ঐ পক্ষের লোকজন জানালো, হাতির পিঠে চড়ে আমি আমার লোকদের প্ররোচিত করেছি। প্রধান আসামি করে আমাকে গ্রেফতার করা হয়। দু'দিন জেলে ছিলাম। পরে জামিনে ছাড়া পাই, কারণ দাঙ্গার সময় আমি ছিলাম ঢাকায়। ঐ দিন ঢাকায় কমিশনার ও কালেক্টরের অভ্যর্থনাসভায়ও আমি ছিলাম। তবে, ডেভিসকে একবার উচিত শিক্ষা দিয়েছিলাম" জানালেন কালীনারায়ণ।

"ঢাকায়, একদিন নিজের বাড়িতে বসে আছি। এক লোক এসে খবর দিলো, আমার লোক হাতির পিঠে বসে ডুমুর গাছের ডাল কাটছিলো। হাতি হঠাৎ লাফালাফি শুরু করলে সে পড়ে যায়, পা ভেঙ্গে জখম হয়েছে সে। আমার

ফৌজদারী মোখতার তখন সামনে বসেছিলো। সে সব শুনে বলে উঠলো, এবার ডেভিড সাহেবকে ধরা যাবে। কিভাবে সাজানো হবে মামলাটা?

মাহুত আদালতে জানাবে, জমিদার বাবুকে পাঁচশ' টাকা পৌঁছাবার জন্য ভাওয়াল থেকে সে ঢাকায় আসছিলো। টঙ্গীর কাছে পৌঁছার পর ডেভিসের গোমস্তা জন্য পনের লোক নিয়ে তাকে ঘিরে ধরে। জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় যাচ্ছো'?

'ঢাকা।'

'কেনো?'

'জমিদার বাবুকে টাকা পৌঁছাতে।'

এটি শুনে তারা মাহুতকে আক্রমণ করে, সে জখম হয়, পা ভেঙ্গে যায়। টাকাটাও তারা কেড়ে নেয়। আশপাশে কিছু গ্রামবাসী ছিলো। মাহুতের সহকারীও ছিলো। এসব দেখে তারা পালিয়ে যায়। মামলা হলো, গ্রেফতার হলো ডেভিসের কিছু লোক। ম্যাজিস্ট্রেট বিউচ্যাম্পের সন্দেহ হলো। তিনি গেলেন টঙ্গী তদন্ত করতে। আমার মোখতার গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীকে শিখিয়ে এলো কী বলতে হবে। বিউচ্যাম্প তদন্তে গেলে সবাই সেই শিখিয়ে দেয়া কথাই বললো। মামলা যখন চলছে তখন ডেভিস একদিন এলেন আমার সঙ্গে কথা বলতে।

'কালী, আমার চাকরদের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা মামলা দিয়েছো সে বিষয়ে কথা বলতে এসেছি।'

জানালেন ডেভিস।

'কিসের মিথ্যা মামলা?'

'আহ্, তুমি জান যে, এটা মিথ্যা মামলা। এটা তুমি কিভাবে করলে? তুমি জান, আমরা বিভিন্ন নামে একই ঈশ্বরের ভজনা করি। এ মিথ্যা মামলার কারণে ঈশ্বর তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন।'

'হ্যাঁ, ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হবেন। কিন্তু আমি তোমার দশজন কর্মচারী ও দুইজন গোমস্তাকে জেলে পুরছি। এ সুযোগ ছাড়বো কেনো?'

'এ মামলা তুলে ফেলতে হবে। আমি এরপর তোমার সঙ্গে সবকিছু আপোসে মিটিয়ে ফেলবো। এই যে বাইবেলে চুমো খাচ্ছি। বিউচ্যাম্পকে খবর পাঠাচ্ছি।'

বিউচ্যাম্পের সঙ্গে কথা হলো। আমি আমার মোখতারকে ডেকে বললাম, মামলা মিটিয়ে ফেলবো।

'আপনার বিরুদ্ধে ফৌজদারীতে যে তিনটি মামলা করেছে ডেভিস তার কী হবে?' জিজ্ঞেস করলো মোখতার।

'আমি তো কিছু জানি না।' বললেন ডেভিস, 'আমার মোখতারকে ডাকছি।' 'কালীবাবু যে মামলা করেছেন', জানান মোখতার, 'তার বিরুদ্ধে তিনটি মামলা

করা ছাড়া উপায় কী?'

ডেভিস বললো, 'এখনই তা মিটিয়ে ফেলতে হবে।' তারপর সব মিটমাট হলো।"

ভাওয়াল থেকে ফেরার পথে টঙ্গীতে গ্রাহামের সঙ্গে দেখা হলো স্যান্ডার্স ও ল্যাংয়ের। সঙ্গে সেনাবাহিনীর দু'জন। শনিবার তারা এসেছিলেন পিগ স্টিকিংয়ের জন্য। গ্রাহামও জুটে গেলেন তাদের সঙ্গে। পিগ স্টিকিং বা বরাহ শিকার ছিলো সিভিলিয়ানদের জন্য পরম বিনোদনের বিষয়। জঙ্গলময় পূর্ব বাংলা ছিলো বিভিন্ন রকম বরাহের আবাসভূমি। সাহেবরা বন্দুক দিয়ে নয়, ঘোড়ায় চড়ে বল্লম হাতে শিকার করতেন। এতে উত্তেজনা ছিলো, গ্রাহাম পিগ স্টিকিংকে সমর্থন করে লিখেছেন, বরাহরা হিংস্র ও খবিশ প্রাণী। নিয়ত চাষিদের ফসল ধ্বংস করে। সুতরাং, বরাহ শিকারের বিরুদ্ধে বিধিনিষেধ থাকা উচিত নয়। ক'জন ইংরেজই বা আনন্দের জন্য বরাহ শিকার করে। তাছাড়া মফস্বলের চরম একঘেঁয়েমি খানিকটা দূর হয় এই বরাহ শিকারের কারণে। বরাহ শিকার নিয়ে পত্রপত্রিকায় তখন কিছু লেখা হচ্ছিলো কিনা জানি না। না হলে, গ্রাহাম হঠাৎ এর যৌক্তিকতা প্রদর্শন কেনো করবেন? কারণ, আর কোনো সিভিলিয়ান তাদের আত্মজীবনীতে বরাহ শিকারের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করেননি।

॥ ৫ ॥

জেলা কর্মকর্তার একটি প্রধান কাজ ছিলো সরকারের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করা। এ প্রক্রিয়ার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন গ্রাহাম। তবে, বিচার ব্যবস্থায় জটিলতা বা কোনো বিষয়কে অযথা জটিল করার সমালোচনা করছেন তিনি। যেমন, একবার ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন বরাহ শিকারে স্যান্ডার্স গিয়েছেন এক গ্রামে। যে বরাহটিকে তিনি তাড়া করছিলেন সেটি আশ্রয় নেয় গ্রামের এক বাড়ির পিছে। স্যান্ডার্স সেদিকে এগোতেই বাড়ির দরজা খুলে এক হিন্দু প্রজা তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো। ভয়ার্ত মুখ। বললো সে, "হুজুর, বিচার চাই। পির মোহাম্মদ আমার বউকে তুলে নিয়ে গেছে। ঐ যে, তার বাড়িতে আমার বউকে আটকে রেখেছে। আমাকে হুমকি দিয়ে বলেছে ঐ বাড়ির সামনে গেলে আমাকে খুন করে ফেলবে। স্যান্ডার্স তাকে প্রশ্ন করছেন, এমন সময় ঐ বাড়ি থেকে চিৎকার ভেসে এলো। তিনি চিৎকার শুনে ঐ দিকে এগোতেই দেখলেন, বাড়ির দরজা খুলে এক রমণী দৌড়ে বেরিয়ে এলো। ঐ যে আমার বউ, বলে লোকটি ছুটলো সে দিকে। অন্যদিকে, সেই রমণীর পিছে লম্বা চওড়া পির মোহাম্মদ বেরিয়ে এলো। হাতে লাঠি। লোকটি তার সামনে পড়তেই তার মাথায় লাঠি বসিয়ে দিলো।" স্যান্ডার্স তাকে ধরে নিজের তাঁবুতে নিয়ে এলেন এবং

তখনই বিচার বসালেন। রায়ে লিখলেন, ঘটনাটি তিনি নিজে দেখেছেন। লোকটি অপরাধী, সে হিসাবে তাকে দু'বছরের কারাদণ্ড দেয়া হলো।

পির মোহাম্মদ জেলা আদালতে আপিল করলো। স্যান্ডার্সের রায় বাতিল হয়ে গেলো। কারণ, তাঁর বিবরণে স্যান্ডোর্সের লেখা উচিত হয়নি যে তিনি ঘটনাটি দেখেছেন, তাঁর উচিত ছিলো, অন্য এক ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে লোকটাকে চালান দেয়া এবং সাক্ষ্য দিয়ে বলা যে, ঘটনাটি তিনি দেখেছেন। গ্রাহাম লিখেছেন, এ ধরনের ঘটনা দেশীয়দের বিমূঢ় করে। তাদের মতে, ম্যাজিস্ট্রেট সত্যে পৌঁছতে চান। ঘটনাটি তিনি দেখেছেন। এর চেয়ে সত্য আর কী হতে পারে? এবং এই সত্যের পরও সেই বিষয়ে তিনি রায় দিতে পারেন না।

ঢাকা সম্পর্কে গ্রাহামের মন্তব্য, ঢাকা হচ্ছে সবচেয়ে মামলাবাজ এলাকা। দিনে কমপক্ষে দশটি মামলা দায়ের করা হতো তার এজলাসে।

গ্রাহাম ঢাকায় থাকার সময় পৌর এলাকার মধ্যেই দু'টি বাঘ মারা পড়লো। তবে, লিখেছেন গ্রাহাম, ঢাকার আশপাশে হাতি নিয়ে শিকার করা দুরূহ। পুরনো কুয়ো আর জঙ্গলে সব ঢাকা। একবার পুলিশ সুপারের হাতি ঐ রকম এক গর্তে আটকে গেলে, গুলি করে হাতিটিকে মেরে ফেলতে হয়। ছুটির সময় স্যান্ডোর্স প্রস্তাব দিলেন শিকারে যাওয়ার। গ্রাহাম রাজি। ঐ সময় বৃষ্টি হচ্ছিলো। তারা হাতি আর নৌকা নিয়ে রওনা হলেন। চারটি নৌকা, স্যান্ডার্সেরটি বড়। সেখানেই তারা গল্পগুজব করতেন বা খেতেন। ল্যাং ও গ্রাহামের জন্য ছিলো একটি নৌকা। স্কুল ইন্সপেক্টর ক্যাভেনডিস নিয়েছিলেন নিজের নৌকা। কারণ, তিনি গাছপালার নমুনা সংগ্রহ করবেন। চতুর্থ নৌকাটি ছিলো ময়মনসিংহের ম্যাজিস্ট্রেট ম্যানসনের। নদীপথে এসে ম্যানসন মিলিত হয়েছেন তাঁদের সঙ্গে।

ঢাকা ছাড়ার দু'দিন পর পাথরঘাটায় শিকারের জায়গা পেলেন। জঙ্গলে ভরা। পোকামাকড়ের উপদ্রব ছিলো প্রচণ্ড। নৌকায় থাকতেন তাঁরা। গ্রাহাম লিখেছেন, তাদের রুটিন ছিলো এরকম ঃ সকাল সাড়ে চারটায় স্যান্ডার্স বিউগল বাজালে সবাই ঘুম থেকে উঠতো। তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সেরে এক কাপ কফি ও একটি টোস্ট খেয়ে হাতিতে চড়তেন সবাই। ন'টি হাতি ছিলো তাঁদের। দুপুর পর্যন্ত চলতো শিকার। দুপুর বারোটা থেকে একটার মধ্যে ফিরে নৌকার ছইয়ে স্নান অর্থাৎ বালতি বালতি পানি ঢালা। তারপর নাস্তা, একটি সিগার ও দুপুরের ঘুম। ঘুম থেকে উঠে হুইস্ট খেলা। সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে নৈশভোজ। ঢাকা থেকে প্রতিদিন নৌকায় চিঠিপত্র আসতো। সেগুলোও দেখতে হতো। সূর্যাস্তের পর নৌকার ছাদে বা পৈঠায় বসে মাঝি বা মাহুতের গান শোনা। এরপর ঘুম।

তাঁরা যা শিকার করেছিলেন তা হলো সম্বর ও নানা ধরনের হরিণ, বনমোরগ, প্যাট্রিজ ও ভালুক। হরিণ শিকার করেছিলেন প্রচুর। মাঝি আর মাহুতরা

সেগুলো পেয়ে ছিলো উল্লসিত। দিন দশেক পর শিকার সেরে তাঁরা ঢাকা ফিরলেন।

॥ ৬ ॥

ডিসেম্বরে বারুণী মেলা। ধলেশ্বরীর তীরে। মেলায় প্রায় ত্রিশ হাজার লোক হয়। এবং প্রতিবছরই কলেরায় কিছু লোক মারা যায়। গ্রাহাম মেলার আগেই এক ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে পাঠালেন এলাকার স্যানিটারি বন্দোবস্ত ঠিক করতে। নিজেও মেলার সময় তাঁবু গেড়ে বসলেন।

ল্যাট্রিনের জন্য আলাদা বন্দোবস্ত করা হলো। কেউ আক্রান্ত হলে চিকিৎসার বন্দোবস্তও রইলো। এবার কিন্তু কলেরায় আক্রান্ত হলো মাত্র দুইজন।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পণ্য এসেছিলো মেলায়। যেমন, অমৃতসরের ব্রোকেড, দিল্লীর কিংখাব, দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল থেকে এসেছিলো জাপানী মাটি, সিলেট থেকে বাঁশের জিনিসপত্র প্রভৃতি। মেলার শৃঙ্খলা রক্ষা ও অন্যসব বন্দোবস্তের জন্য বেশ টাকার দরকার ছিলো। ঐ এলাকার জমিদারির অংশীদার ছিলেন তিনজন। দু'জনকে খরচ মেটাবার জন্য চাঁদা দিতে বলায় তাঁরা তা দিয়ে দিলেন। তৃতীয়জন চাঁদা দিতে রাজি না হওয়ায় গ্রাহাম তাঁর বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারি করলেন; কিন্তু পুলিশকে বললেন তা যেন কার্যকর না করা হয়। তৃতীয়জন চাঁদা দিয়ে দিলেন। অবশ্য গ্রাহাম লিখেছেন, "আমার এই আচরণ কিন্তু আইনানুগ ছিলো না। দ্রুত কাজ করার জন্য ব্যবস্থাটি আমাকে নিতে হয়েছিলো, অন্য কথায় কিছুদিনের জন্য জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরচারের মতো আচরণ করলাম।"

মেলা শেষ হওয়ার চার দিন আগে ঢাকা থেকে সিভিল সার্জন গ্রাহামকে খবর পাঠালেন যে তার স্ত্রী অসুস্থ। গ্রাহাম ফিরলেন। ঢাকার আবহাওয়ার কারণে স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বাঁচাতে হলে তাঁকে ইংল্যান্ডে নিয়ে যেতে হবে। গ্রাহাম খবর পেয়েছিলেন শনিবার বিকালে। স্টিমার কলকাতা ছাড়বে বুধবার। তিন দিনের মধ্যে সব ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রাহামের সহকর্মীরা তাঁর ছুটি ও অন্যান্য বন্দোবস্ত করলেন, গ্রাহামের আসবাবপত্র নিলামে ওঠানো হলো। দামী জিনিসপত্রগুলো বিক্রি হলো এক-পঞ্চমাংশ দামে। যেগুলো বাজে সেগুলো তিনগুণ বেশি দামে। কিন্তু কলকাতা যাবার পথেই গ্রাহামের স্ত্রীর মৃত্যু হলো। ছোট মেয়েটিকে নিয়ে পরবর্তী স্টিমারে রওনা হলেন লন্ডন। এবং তখন খবর পেলেন সেই জমিদার সরকারকে জানিয়েছেন গ্রাহাম তাঁর থেকে তিনশ' রুপি জোর করে নিয়েছেন।

॥ ৭ ॥

ইংল্যান্ডে মাসখানেক থাকার পর গ্রাহাম ফিরলেন কলকাতায়। সেখানেই তাঁর

থাকার ইচ্ছে ছিলো কিন্তু কোনো জায়গা খালি ছিলো না। বলা হলো তাকে ঢাকায় ফিরতে। কিন্তু ঢাকায়ও তাঁর আর ফেরার ইচ্ছা ছিলো না। ময়মনসিংহে জায়গা খালি ছিলো। সুতরাং সিদ্ধান্ত হলো, গ্রাহামকে ময়মনসিংহ যেতে। এরই মধ্যে শুনলেন বারুণী মেলা নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছিলো তা বাতিল করা হয়েছে।

গ্রাহাম পৌঁছলেন ঢাকায়, গিয়ে উঠলেন আবার সেই স্যান্ডার্সের বাসায়। স্যান্ডার্স আর ল্যাং তাঁকে ময়মনসিংহ যাওয়ার জন্য ঘোড়ার বন্দোবস্ত করে দিলেন। ঢাকা থেকে ময়মনসিংহের দূরত্ব একশ' মাইল। যেতে হবে জেলার উত্তরে জঙ্গলে ভরা জায়গা দিয়ে। টোক পর্যন্ত পঞ্চাশ মাইল যেতে হবে ঘোড়ায় চড়ে। তারপর যেখানে বানার নদী ঢাকা ময়মনসিংহকে ভাগ করেছে সেখান থেকে উঠতে হবে আবার নৌকায়। গ্রাহাম নৌকা ঠিক করে তিন দিন আগে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যা তাঁকে টোক থেকে গফরগাঁ পৌঁছে দেবে।

৩০ এপ্রিল গ্রাহাম রওনা হলেন ময়মনসিংহের দিকে, প্রচণ্ড গরম, জঙ্গল যতই ঘন হতে লাগলো আবহাওয়া ততই শ্বাসরুদ্ধকর হয়ে উঠলো। টোক যাওয়ার দুই-তৃতীয়াংশ পথ গজারির জঙ্গল। প্রায় চল্লিশ মাইল পেরোবার পর দেখলেন ল্যাং একদিন আগেই একটি ঘোড়া পাঠিয়ে রেখেছেন। ঘোড়াটা অবাধ্য ও তেজী। গ্রাহাম ঘোড়ার পাদানিতে পা রাখা মাত্র ছুটলো। অনেক কষ্টে গ্রাহাম ঘোড়াটা বাগে আনলেন। লম্বা ঘাস জঙ্গল পেরিয়ে এক সময় পৌঁছলেন নদীতীরে। এ পুরো সময়টা গ্রাহাম খালি ভেবেছেন, কখন নৌকায় উঠবেন এবং এক গ্লাস ঠাণ্ডা বিয়ার খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়বেন। এক সময় নীল নদী দেখা গেল, কিন্তু কোনো নৌকা নেই। এদিকে, সাত ঘণ্টা ঘোড়ায় চড়ার ফলে, তেষ্টায় ক্লান্তিতে গ্রাহাম অবসন্ন।

নদীতীর থেকে দুশো গজ দূরে ছোট একটি গ্রাম। অতদূর হেঁটে যেতে আর তার মন চাইলো না। তীরে, ফেরিঘাটের মাঝির একটা ছোট চালা ছিলো। সেখানেই শুয়ে পড়লেন। ঘণ্টা খানেক পর দেখলেন, ফেরির মাঝি এক লোটা দুধ এনে তাঁর পাশে রাখলো। দুধটা খেয়ে আবার তিনি শুয়ে পড়লেন। ঘণ্টা দুয়েক পর ঘুম ভাঙ্গলো।

দেখলেন, গ্রামের মোড়ল তাঁর দু'একজন সঙ্গী সাথী নিয়ে তাঁকে পর্যবেক্ষণ করছে। তারা ল্যাংয়ের সহিসের কাছে শুনেছে যে গ্রাহাম ময়মনসিংহের হাকিম। এবং যদিও এটা ঢাকা জেলা তবুও তারা অন্য জেলার হাকিমকে নিজেদের সহবৎ দেখাতে চাইছিলো। গ্রাহাম তাদের সঙ্গে ধান, পান, ইনকামট্যাক্স ইত্যাদি অনেক বিষয় নিয়ে আলাপ করলেন। কোনো কিছুর প্রতি তারা তেমন মুগ্ধ নয়। ক্ষুব্ধ তারা তাদের জমিদারদের প্রতি। যে তালুকে তারা বাস করে তার অংশীদার পাঁচজন। ফলে, খাজনা ও আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে নানা ঝামেলা হচ্ছে। তাদের মতে, যেখানে

একাধিক মালিক, সেখানে সরকারের উচিত একজন রিসিভার নিযুক্ত করা, গ্রাহামের কাছে তা যুক্তিযুক্ত মনে হলো, কিন্তু সরকার এ বিষয়ে কোনো মনোযোগ দেয়নি।

আরও এক ঘণ্টা গেলো, নৌকার দেখা নেই। গ্রাহামের মনে হলো রাতে থাকার বন্দোবস্ত করতে হবে। কিন্তু, গ্রামে কারও ঘরে থাকা যাবে না; কারণ, তাতে গৃহস্বামীর জাত যেতে পারে। কাছেই ছিলো একটা খড়ের চালা। পেঁয়াজ রাখা ছিলো তাতে। মোড়ল বললো, পেঁয়াজগুলো তারা সরাবার বন্দোবস্ত করছে। আর, এক ঘণ্টা পর রাতের খাওয়ার বন্দোবস্ত করা যাবে। ঘণ্টাখানেক পর তারা কলাপাতায় করে রাতের খাবার নিয়ে এলো ভাত আর ছেঁচকি। প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত ছিলেন গ্রাহাম, কারণ সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি। এমন সময় সবাই চিৎকার করে বললো, 'ঐ যে নৌকা! ঐ যে নৌকা!' ঘাটে এসে নৌকা ভিড়লো। গ্রাহাম নদীতে স্নান সেরে, খেয়ে নৌকায় উঠলেন। ঠাণ্ডা এক পাত্তর বিয়ার হাতে গা এলিয়ে দিলেন ছইয়ে। পরদিন দুপুর দু'টায় পৌঁছলেন গফরগাঁ।

থানায় পুলিশরা দাঁড়িয়ে। পুলিশ সুপার স্টার্কি একটা ঘোড়া পাঠিয়েছেন। ঘোড়ায় উঠতে যাবেন, সহিস বললো, 'জলদি কিজিয়ে।' বুঝলেন, এই ঘোড়াটাও আগের মতো দুরন্ত। ঘোড়ায় চেপেছেন মাত্র, সাব ইন্সপেক্টর এ সময় এক গ্লাস শরবত এনে বললো, 'হুজুর, এই প্রথম এসেছেন, মুখে কিছু একটা দিতে হবে।' শরবতের গ্লাস মুখে ঠেকাতে না ঠেকাতে ঘোড়া লাফ দিলো। শরবত সব ছিটকে পড়লো ইন্সপেক্টরের মুখে।

একটানা তিন মাইল ছুটলো ঘোড়া। অর্ধেক পথ যাওয়ার পর দেখলেন, জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট একটি ঘোড়া রেখে দিয়েছেন তাঁর জন্য। সেটিতে আরাম করে চড়ে ময়মনসিংহ পৌঁছলেন। সার্কিট হাউসে থাকেন দিরন ও তাঁর সহকারী পুলিশ সুপার কার্টিস। অবিবাহিত। গ্রাহাম সার্কিট হাউস গিয়ে স্নান সেরে বিশ্রাম করলেন। বিকালে খানিকটা হাঁটাহাঁটি করলেন। তারপর তাদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন যদিও কেউ তাঁর চেনা নয়।

নৈশভোজের সময় গ্রাহাম স্টেশনটি সম্পর্কে খানিকটা খোঁজখবর নিলেন। স্টেশনে আছেন দশজন ইউরোপিয়ান। তারা তিনজন ছাড়া, জজ ও তাঁর স্ত্রী, এসপি ও তাঁর স্ত্রী এবং ইউরোপিয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাডকিনস। কর্মকর্তারা ছাড়া আরও জনাদশেক ইউরোপিয়ান আছেন এই জেলায় যার মধ্যে একজন গ্রিক। অন্যদিকে, দেশীয়দের সংখ্যা গত আদমশুমারি অনুযায়ী ২,৩৪,৯০০ জন। এলাকার আয়তন ৬,২৯৩ বর্গমাইল।

গ্রাহাম পরদিন সকালে একটু ঘোরাঘুরি করলেন, মনে হলো, স্টেশনটি মন্দ নয়। আধমাইল ব্যাসের একটি মাঠকে ঘিরে পাঁচ ছ'টি বাড়ি। পুবে, ব্রহ্মপুত্রের

পুরনো খাত। দক্ষিণ ও পশ্চিমে দেশীয়দের ঘরবাড়ি, উত্তরে গ্রাম, হাঁটা ও ঘোড়ায় চড়া ছাড়া বিনোদনের আর কোনো উপায় নেই। গ্রাহামের একবার মনে হলো, ঢাকায় ফেরত না গিয়ে কি ভুল করলেন? তবে, ময়মনসিংহে পৌর ঝামেলা না থাকায় বেশি ঝামেলা হবে না বলেই মনে হলো। জেলার পৌর এলাকা শুধু নাসিরাবাদ যেটা সদর। গত বছর এর আয় ছিলো একশ' পঞ্চাশ পাউন্ড। ব্যয় ছিলো একশ' একচল্লিশ পাউন্ড পনের শিলিং ছয় পেন্স। জরিমানা আদায় হয়েছিলো এক শিলিং ছয় পেন্স। কোর্ট বিল্ডিংয়ের অবস্থা খারাপ। উইলসন জানালো তার রুমে সে সোলার টুপি পরে থাকে। আর বৃষ্টির সময় প্রয়োজন হয় ছাতার। গ্রাহামের বাড়িটি অসমাপ্ত। বাসা ভাড়া দশ পাউন্ড অথচ আকারে তা তার ঢাকার বাড়ি থেকে ছোট। হিসাব করে দেখলেন তাঁর খরচ পড়বে মাসে চারশ' রুপি বা চল্লিশ পাউন্ড, অবশ্য চারটি ঘোড়ার লালনপালনও এর অন্তর্ভুক্ত।

ময়মনসিংহের জমিদাররা বেশ লড়াকু, জানিয়েছেন গ্রাহাম। তাঁর পূর্বসূরি জমিদারদের সঙ্গে কঠোর আচরণ করতেন। গ্রাহামের ফৌজদারী সেরেস্তাদারও গ্রাহামকে বলেছিলেন, 'যরা ধমকাইয়ে'। গ্রাহাম একদিন জমিদারদের ডাকলেন, আলাপ করলেন, কিন্তু তাঁর মনে হলো, দু'তিনজন ছাড়া সব একই রকম। গ্রাম্য কর্কশ যা আগে গ্রাহাম কখনও দেখেননি।

এর মধ্যে লে. গভর্নর একবার ময়মনসিংহে এলে একঘেঁয়ে জীবনে খানিকটা উত্তেজনা এলো। জজ তাঁর আইসমেশিন দিয়ে গভর্নরের জন্য শীতল পানীয় তৈরি করেছিলেন। আর নৈশভোজের জন্য ছিলো খাসির মাংস আর টিনজাত কিছু খাবার।

গ্রাহাম যে রকম ভেবেছিলেন সে রকম কিন্তু সবার সঙ্গে বনলো না। যেমন সিভিল সার্জন ডারহাম ময়নাতদন্তের জন্য একটি লাশ এনে ফেলে রেখেছিলেন, তিনি তার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করলে মনোমালিন্য হলো। গ্রাহামের বাসার সামনে একদিন ক্রিকেট খেলা হচ্ছিলো। জজ ও তাঁর স্ত্রীকে তিনি আমন্ত্রণ জানাননি। ফলে, তাঁরা অসন্তুষ্ট হলেন। স্টার্কির সঙ্গে তো আগেই মনোমালিন্য হয়েছিলো। ফলে, দশজনের মধ্যে চারজনই দেখা গেলো, দেখা হলে শুষ্ক সৌজন্য বিনিময় করছেন। অবশ্য, জজ পরে মনোমালিন্যের ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলেছিলেন।

॥ ৮ ॥

বর্ষার পর শিকারের আয়োজন করলেন গ্রাহাম। দু'টি ঘোড়া নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। ময়মনসিংহের পথঘাট তাঁর অচেনা। এছাড়াও এ ধরনের শিকারে সবসময় ঝামেলা থাকে পথ চেনার। কারণ, গ্রামবাসীরা সোজাসাপটা উত্তর কখনও দেয় না, যেমন মুক্তাগাছা কোন্ দিকে? জিজ্ঞেস করলেন সাহেব। 'জে, কথা

বুঝতাছি না।' উত্তর চাষির।

ভাই শোন, মুক্তাগাছা চেন? আরেকজনকে প্রশ্ন সাহেবের।

আমি গ্রামের লোক, কথা বুঝছি না...।

ভাই শোন, ভয় পেয়ো না। বলতো, মুক্তাগাছা কোন দিকে? আরেক জনকে জিজ্ঞাসা সাহেবের।

আমি গরিব লোক। বুঝছি না। বলে চলে গেলেন চাষি।

তুমি বাঙালি। বাংলা বোঝ। মুক্তাগাছাটা কোনো দিকে? আরেজনকে জিজ্ঞাসা।

মুক্তাগাছা! বিস্ময়ে অবাক হয়ে চাষির জিজ্ঞাসা।

হাঁ ভাই, মুক্তাগাছা কোন দিকে?

ঐ দিকে। চারদিকের দিগন্তে চাষির অঙ্গুলি নির্দেশ।

এ ঝামেলা থেকে মুক্তি পাবার জন্য গ্রামের পুলিশ কর্মচারীদের খবর দেয়া হয়েছিলো পথে নিশানা দিয়ে রাখতে।

ময়মনসিংহে ঘোড়া চালিয়ে আরাম, জানিয়েছেন গ্রাহাম। তাঁর লোকজন নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে আগেই সুইস তাঁবু গেড়ে রাখতো। বারান্দায় সিঙ্গাপুরি লাউঞ্জ চেয়ার। চেয়ারে বসার সঙ্গে সঙ্গেই হাতে তুলে দেয়া হতো ধুমায়িত চায়ের কাপ ও বই। ভৃত্য খুলে নিতো পায়ের বুট। চা খেয়ে, সিগার ধরিয়ে ডিসেম্বরের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালোই লাগতো, লিখেছেন গ্রাহাম। এভাবে তিনি শিকার করতেন, পরিদর্শনে যেতেন। একবার এক স্কুলে গিয়ে শোনেন নয় বছর সেখানে কেউ পরিদর্শনে যায়নি।

একবার সেই গ্রিক ম্যানেজার কল্লিফেরাস ও কার্টিসের সঙ্গে গেলেন শিকারে। এক গ্রামে গিয়ে শুনলেন দু'জন মানুষকে চিতা জখম করেছে। গ্রামবাসীরা অনুরোধ জানালো, চিতাটাকে হত্যা করার। বললো, এক বাঁশঝাড়ের আড়ালে সেটি লুকিয়ে আছে। প্রথমে বাঁশ নিয়ে গ্রামবাসীরা বাঁশঝাড় খোঁচাতে লাগলো। কিছুই হলো না। তখন কার্টিস ঝরাপাতা কুড়িয়ে জড়ো করে আগুন দিলেন। ধোঁয়ার কারণে চিতাটা বেরিয়ে এলো। কার্টিস দেখলেন, একজোড়া চোখ জ্বলজ্বল করছে। গুলি করলেন কার্টিস। চিতার কপালের ঠিক মাঝখানে তা লাগলো। মরা চিতাটাকে নিয়ে তারা যখন ফিরলেন তখন গ্রামবাসীরা বললো, মেয়েরা চিতাটাকে দেখতে চায়। কারণ? তাদের বিশ্বাস– বন্ধ্য রমণী এ মৃত চিতা দেখলে সন্তানবতী হবে।

ময়মনসিংহ চিতায় ভর্তি। সাধারণত গ্রামের পাশে ঘন জঙ্গলে এগুলো থাকে। সুসংয়ের রাজার আমন্ত্রণে দুর্গাপুরেও গেলেন শিকারে। শিকারের কারণে ময়মনসিংহে কয়েকশ' মাইল ভ্রমণ করেছেন গ্রাহাম, যেখানে রাস্তা বলে কোনো

বস্তু ছিলো না। কিন্তু জানিয়েছেন তিনি, নির্দিষ্ট জায়গায় সব সময় গিয়ে দেখেছেন সুইস তাঁবুটি গাড়া আছে। এবং একটি কাপ বা তন্তুরিও ভাঙ্গেনি।

ময়মনসিংহ জেলার সীমানা নিয়েও বিরোধ ছিলো। বিশেষ করে নতুন চর নিয়ে ঝামেলা হতো।

জানুয়ারির শেষে যমুনার চরে গেলেন বন্দোবস্তির কাজ করতে। একা ধুধু চরে সারাদিন কাজ করতে করতে মনে হতো ময়মনসিংহে ফিরে যান। এরকম উচাটন মন নিয়ে একদিন তাঁবুতে ফিরে দেখেন সরকারি খামের চিঠি। তাঁকে বদলি করা হয়েছে হাওড়ায়। চিঠিটা পেয়েছেন তিনি তিন দিন পর। চিঠি পাওয়ার পর আর দেরি করলেন না। ফিরলেন ময়মনসিংহ, তড়িঘড়ি করে চার্জ বুঝিয়ে জিনিসপত্র তুললেন নিলামে। তারপর রওনা হলেন কলকাতা। কলকাতা পৌঁছে বেঙ্গল ক্লাবে নিজের রুমে জিনিসপত্র রেখে বাঁচলেন হাঁফ ছেড়ে।

১০
একজন কমপিটিশনওয়ালার জগৎ

চট্টগ্রাম : ১৮৬৩-৪

শুক্রবার সকালে স্টিমার ছাড়লো, রাতের মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম সাগরে। পরের দিন কেটে গেল বঙ্গোপসাগরে। আবহাওয়া মন্দ না, কিন্তু মৌলিমিন জাহাজটি ছোট; সমুদ্রে কলার মোচার মতো উঠানামা করছিলো। যাত্রীরা বিপর্যস্ত। বিকেলের দিকে অবস্থার খানিকটা উন্নতি হলো। ডিনার টেবিলে দেখা গেল অনেকেই উপস্থিত। একজন সিভিলিয়ানও ছিলেন, নাম এম গিলপিন। মাদারীপুর থেকে তাঁকে বদলি করা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামে। রোববার সকালে উপকূলের অদূরে জাহাজ নোঙ্গর করলো। জায়গাটা বন্য ও পর্বতময়। আবহাওয়া কুয়াশাচ্ছন্ন। তারপর শুরু হলো বৃষ্টি। মৌলিমিনের ভার নিলেন বন্দরের পাইলট এবং জাহাজ প্রবেশ করলো কর্ণফুলীতে। নদীর প্রবেশমুখ থেকে তিন বা চার মাইল দূরে উত্তর বা ডানতীরে হচ্ছে স্টেশন।

"নিম্নবঙ্গের সবচেয়ে সুন্দর জায়গা চট্টগ্রাম", লিখেছেন ক্লে। নিচু টিলা, তার চূঁড়োয় বাড়ি, দু'টিলার মাঝে পাকদন্ডী,– আগুন্তকদের অনেক সময় বিমূঢ় করে দেয়। কোনো কোনো পাহাড়ে উঠলে পূর্বদিকের চমৎকার দৃশ্য চোখে পড়ে। দূরে দিগন্তে কর্ণফুলী গিয়ে মিশেছে সমুদ্রে, চারপাশে ছড়ানো ছিটানো পাহাড়ের চূঁড়োয় বিন্দুর মতো সাদা বাংলো, মাঝে মাঝে বৃক্ষের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে মন্দির বা মসজিদ। পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে তাকালে চোখে পড়ে সরু রাস্তা– উপত্যকা আর অরণ্যের ফাঁক দিয়ে দেখা দিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে আবার ঝোপের আড়ালে। অনেকে চট্টগ্রামের নিসর্গকে সিলোনের সঙ্গে তুলনা করেন। কিছু মিল অবশ্য আছে। ছবির মতো পাহাড়, ঘন পল্লবগুচ্ছ, নারকেল আর সুপারি বাগান এবং অদূরে সমুদ্র।

পাহাড়ের ওপর বা এমনিতে অধিকাংশ বাড়ি একতলা, সমতল ছাদ, বাঁশের বারান্দা। সরকারি এবং ব্যক্তিগত কিছু বাড়ি পাকা অথবা প্রায় পাকা। কাঁচা

বাংলোও আছে কিছু অর্থাৎ যেগুলো কাঠ আর বাঁশের তৈরি, ছাদ খড়ের। নেটিভদের বাড়িঘর, বাজার সমতলে। বৃক্ষ আর পাহাড় রেখেছে সেগুলোকে ঢেকে। কাছের কোনো পাহাড় থেকে সেগুলো হয়তো চোখে পড়ে, নতুবা নয়। নির্দিষ্ট কোনো ময়দান নেই, তবে রেজিমেন্টাল লাইনের সামনে আছে ঘাসে ঢাকা এক টুকরো জমি যা মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হয় প্যারেডের জন্য, কখনওবা বিনোদনের জন্য। এখানেও আছে একটি 'স্ক্যান্ডাল কর্ণার'। চারটি রাস্তা যেখানে মিলেছে সেখানে আছে ছোট একটি ব্রিজ। তার নিচে একটি বসার জায়গা। এখানে বসে লোকজন রাজনীতি নিয়ে আড্ডা দেয়।

স্টেশনে আছে একটি র‍্যাকেট কোর্ট, একটি বিলিয়ার্ড টেবিল আর স্নানের জায়গা– সুন্দর একটি দিঘী যার নাম পরীর দিঘী। কালেকটরেটের সামনে আছে ছোট একটি গির্জা, গম্বুজ যার চতুষ্কোণ আর কাঁচগুলো রঙিন। ১৮৫৭-এর বিদ্রোহের সময় যারা পালিয়ে গিয়েছিলেন তারাই সেই পলায়নের স্মরণে নির্মাণ করেছিলেন গির্জাটি।

বাংলার পুরনো একটি স্টেশন চাটগাঁ। কোম্পানি আমলেও এখানে একটি কুঠি ছিলো। তা'ছাড়া বার্মার সঙ্গে সীমান্ত থাকায় চাটগাঁর গুরুত্ব অন্যান্য অঞ্চল থেকে ছিলো খানিকটা বেশি। ক্লে যখন চাটগাঁয় নিযুক্তি লাভ করেন তখন চাটগাঁ কমিশনারের অধীনে একটি বিভাগ। বিভাগের অধীনে রেগুলেশন জেলা হিসেবে ছিলো চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা (কুমিল্লা) এবং নোয়াখালি। নন রেগুলেশন জেলা হিসেবে ছিলো পার্বত্য চট্টগ্রাম। তাছাড়া একজন পলিটিক্যাল এজেন্টের মাধ্যমে কমিশনার আধা-স্বাধীন পার্বত্য ত্রিপুরার রাজার ওপর খবরদারি করতেন।

১৮৬৩-৬৪ সালে সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন কমিশনার, জজ, অতিরিক্ত জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, কালেকটর, জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট, পার্বত্য চট্টগ্রামের সুপারিনটেনডেন্ট ও দু' অ্যাসিসট্যান্ট। এঁরা সবাই ছিলেন কভেনেন্টেড সিভিলিয়ান। এছাড়া ছিলেন পুলিশের একজন ডিআইজি, জেলা এবং সহকারী পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট, সিভিল সার্জন, কালেকটর অব কাস্টমস যিনি ছিলেন আবার বন্দরের হারবার মাস্টার। সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করছিলো ৩৮ নেটিভ ইনফেনট্রি। এ বাহিনীতে ডাক্তারসহ ছিলেন পাঁচজন অফিসার। ব্যবসা-বাণিজ্য ছিলো অনুল্লেখ্য। চা চাষের তখন মাত্র শৈশবাবস্থা। সরকারি কর্মকর্তা ছাড়া এমন কেউ ছিলো না সামাজিকভাবে যাকে রেসিডেন্ট বলা যেতে পারে।

ইউরোপিয়ান ছাড়াও চাটগাঁয় তখন ছিলো শ্বেতাঙ্গদের কিছু অশ্বেতাঙ্গ বংশধর, ক্লে যাদের উল্লেখ করেছেন 'হাফ-কাস্টস্' হিসেবে। সোজা বাংলায় অবশ্য এদের বলা যায় ফিরিঙ্গি। অধিকাংশই পর্তুগীজদের বংশধর। মোঘল আমলে আসা পর্তুগীজ অ্যাডভেঞ্চারদের বংশধর এরা। গায়ের রং হালকা বাদামি

থেকে আবলুশ কাঠ সদৃশ্য। কিন্তু, নামের আবার আভিজাত্য আছে, যেমন- গোমেজ, পেরিয়েরা ইত্যাদি। স্থানীয় লোকজন এদের ডাকতো কালা ফিরিঙ্গি বলে। হিন্দু-মুসলমান সবাই এদের গণ্য করতো নিচু জাত হিসেবে। কর্ণফুলীর তীরে ছিলো কালা ফিরিঙ্গিদের একটি গির্জা। ওরা ছিলো রোমান ক্যাথলিক।

কর্মস্থলে পৌছার পর নতুন সিভিলিয়ানের প্রথম কাজ ছিলো অন্যান্য সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ (আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে)। কিন্তু চাটগাঁয় এ কাজ করতে গিয়ে ঘেমেটেমে অস্থির হতে হয়। কারণ বাড়িগুলো সব পাহাড় চূঁড়োয়, চড়াই-উৎরাই ভাঙতে গিয়ে কাহিল অবস্থা। ঘোড়ায় চড়েও কোনো কোনো জায়গা-যাওয়া প্রায় অসম্ভব, কারণ খাড়া পথ বেয়ে অনেক জায়গায় উঠতে হয়। যাতায়াতের জন্য তাই পাহাড় নিবাসীরা অনেকে ব্যবহার করেন টনজন, অনেকটা সেডান চেয়ারের মতো। পাহাড়ের চূঁড়োয় প্রায় প্রতিটি বাসার সামনে থাকে একটি টনজন। চারজন বেহারা তা বহন করে (পালকির মতো)। টনজন বইবার কাজ না থাকলে বেহারারা বাসায় পাখাঅলা বা মালি হিসেবে কাজ করে।

যাদের সঙ্গে দেখা করতে হবে তাদের সংখ্যা নেহাৎ কম ছিলো না। প্রায় দু'দিন লাগলো দেখাশোনার পর্ব শেষ করতে। কর্তব্যকর্ম শেষ হলে ক্লে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন আর বেহারারা তো দারুণ খুশি। ক্লে লিখেছেন, সহকর্মীরা সবাই অমায়িক, ব্যবহার ভালোই করলো শুধু দু'জন ছাড়া। একজন পার্বত্য চট্টগ্রামের সুপারিনটেনডেন্ট, অন্যজন ক্লে'র মতোই একজন অ্যাসিসট্যান্ট। কারণ কি? কারণ, ক্লের ভাষায় তারা দু'জনই ক্লে'র মতো কমপিটিশনঅলা। অর্থাৎ একই সার্ভিস, একই পদ এবং তাই সহজাত ঈর্ষা।

চাটগাঁর সব সিভিলিয়ানরাই হেইলিবারি পাস। একজন জুনিয়র অ্যাসিসট্যান্টের কাছে কমিশনার একজন দেবতা। তবে, সরকারি কাজকর্মের ক্ষেত্রে তিনি সহায়তাই করতেন, ব্যক্তিগতভাবেও ছিলেন অমায়িক। কমিশনারের স্ত্রী, ক্লে'র ভাষায় মিসেস গর্ডন ওয়াই- ছিলেন সুন্দরী। জজ বেলফোর্ট কাজের চাপেই অস্থির থাকতেন, কারণ চাটগাঁয় মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা ছিলো বেশি। সুতরাং তাঁর দেখা পাওয়া যেতো কম। কিন্তু, তার স্ত্রী ছিলেন দারুণ জনপ্রিয়। হাসিখুশি, সবার খোঁজ-খবর নিতেন। স্টেশনের কেন্দ্রবিন্দু বা শরীর ও মনই ছিলেন তিনি। ক্রকেট খেলার রাতে জজের বাসায় বেশ ভিড় হতো আর তাঁর বাসায় সকালের নাস্তা বা 'ছোট হাজারি'তে বিনা আমন্ত্রণে যে কেউ চলে যেতে পারতো। কালেক্টর ছিলেন ব্যাচেলর কিন্তু কর্ম চঞ্চল-ঘোড়ায় চড়তেন, র‍্যাকেট খেলতেন। বাসাটাও ছিলো সাজানো-গোছানো, অবারিত দ্বার। এছাড়া ছিলো তার হেফাজতে একটি স্টিমার, ট্যুরের কাজে যা ব্যবহৃত হতো। সিভিল সার্জন ডা.

ওয়াইজ ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহের সময় কাজ করেছেন। নিজের পেশা ভালোবাসতেন আর ইউরোপিয়ান ও নেটিভ নির্বিশেষে সবাই তাকে শ্রদ্ধা করতো, তার ওপর নির্ভর করতো।

সেনাবাহিনীর লে. ফারগুস জি এবং ফিন্সবারি ছিলেন ব্যাচেলর, থাকতেন মেসে। অন্যান্য অফিসাররা ছিলেন বিবাহিত। ক্লে নিজের থাকার ব্যবস্থা করলেন অপর অ্যাসিসট্যান্ট উইলকিনসনের সঙ্গে। গিলপিন চাটগাঁ এলে তাঁর জন্য একটা রুম ছেড়ে দেয়া হতো। তবে তাঁর আসা হতো কম, কারণ থাকতো সে পার্বত্য চট্টগ্রামের সদর চন্দ্রঘোনায়।

ভোরে অনেকে জমা হতো পরীর দিঘীতে। সেখানে মশকে চড়া ছিলো বেশ জনপ্রিয় খেলা। ভিস্তিদের মশকে পানি ভরে বেলুনের মতো ফোলানো হতো। এবং তার ওপর চড়তে হতো যা ছিলো কষ্টসাধ্য। কারণ, চড়ামাত্রই তা একদিকে হেলে পড়তো ফলে আরোহী হতো কুঁপোকাৎ। প্রতিদিনই মশকে চড়া নিয়ে বেশ আমোদ হতো।

সপ্তাহে চারদিন খেলা হতো র‍্যাকেট, দু'দিন ক্রকেট। র‍্যাকেট কোর্টটি ছিলো বেশ পুরনো। চাটগাঁ যখন সামরিক ঘাঁটি তখন বোধহয় তা নির্মাণ করা হয়েছিলো। পেছনে এর কোনো পরিকল্পনা ছিলো না। র‍্যাকেট কোর্টে মহিলা দর্শকদের ভিড় হতো বেশ, ফলে স্টেশনে পুরুষদের ক্রকেট খেলার আসরে বেশ নিয়মিত হাজিরা দিতে হতো। কমিশনার ও জজের দু'পাহাড়কে জোড়া লাগিয়েছিলো সংকীর্ণ একটুকরো জমি, সুন্দর ঘাসে ভরা; তাই ছিলো ক্রকেট-ফিল্ড। জায়গাটা ছিলো জজের বাসার এখতিয়ারভুক্ত। বেলফোর্টদের ওপর তাই ছিলো অতিথি আপ্যায়নের ভার। দিনের আলো নেভা না পর্যন্ত ক্রকেট চলতো। কফি ফিরতো হাতে হাতে।

চাটগাঁ ছিলো তখন জঙ্গলাকীর্ণ। দিনে দুপুরেও বাঘের গর্জন শোনা যেতো। ক্লে চাটগাঁ পৌঁছার এক সপ্তাহের মধ্যে দু'টি বাঘ মেরে আনা হলো সরকারি পুরস্কারের জন্য। স্টেশনের সুন্দর একটি রাস্তার নাম ছিলো 'টাইগার পাস'- দু'পাহাড়ের মাঝ দিয়ে চলে গেছে সমুদ্র বরাবর। 'লেপার্ড পাস' নামেও একটি জায়গা ছিলো। খোঁড়া একটি চিতা নাকি সেখানে ঘোরাফেরা করতো। পরে অবশ্য তাকে মেরে ফেলা হয়। ক্লে জয়েন করার কয়েকদিনের মধ্যে, একদিন দিনদুপুরে বাঘ আক্রমণ করলো দু'জন নেটিভকে। এ আক্রমণে পা হারালো একজন। ক্লে লিখেছেন, সে এখন অবশ্য একজন 'প্রিভিলেজড বেগার'। এছাড়া শহরের আশপাশের জঙ্গলে পাওয়া যেতো প্রচুর বনমোরগ, স্নাইপ। একদিন ক্লে শুনলেন, র‍্যাকেট কোর্টের পাশে দাঁড়িয়ে ডাকছে একটি হরিণ।

ক্রিসমাসের ছুটিতে নোয়াখালী, কুমিল্লা থেকে এলেন সিভিলিয়ানরা।

ক্রিসমাস ডিনার হলো জজের বাসায়। যেখানে উপস্থিত ছিলো সবাই। এ ডিনারে অবশ্যই থাকতো টার্কি এবং হ্যাম। স্টেশনে তা না পাওয়া গেলে বাইরে থেকে আমদানি করতে হতো। না হলে গৃহকর্ত্রীর ইজ্জত থাকতো না। ঢাকায় থাকার সময় সিলেটের এক মহিলা ক্লে'কে অনুরোধ করেছিলেন টার্কি পাঠাবার জন্য এবং এ কারণে তাকে বেশ পয়সা গুণতে হয়েছিলো। চাটগাঁয় অবশ্য সে অসুবিধা ছিলো না। কালো পর্তুগীজ বা কালা ফিরিঙ্গিরা শুয়োর ও মুরগির সঙ্গে টার্কি পুষতো। তাই টার্কি পাওয়া যেতো প্রচুর, দামও ছিলো সস্তা। চাটগাঁও আসল মুরগির (লম্বা ঠ্যাংঅলা অনেকটা 'কেচিন চায়না'র মতো) চাহিদাও কম ছিলো না। ডিনারের পর নাচ হলো খানিকটা। কয়েকদিন পর কালেকটর আয়োজন করলেন বলের, সেখানেও উপস্থিতির সংখ্যা কম ছিলো না।

প্রথম দিকে ক্লে'র কাজকর্ম তেমন ছিলো না। যেহেতু, প্রশাসনের প্রথম ধাপে ছিলেন তাই তাঁর দায়িত্বও ছিলো কম। অবশ্য তাঁকে বিচার করার জন্য মাঝে মাঝে কাচারিতে বসতে হতো। কিন্তু, ক্ষমতা ছিলো তাঁর খুব কম। তিনি মাত্র পঞ্চাশ টাকা জরিমানা ও এক মাসের জেল দিতে পারতেন।

প্রথম দিন কাচারিতে বসে ক্লে প্রায় কিছুই বুঝতে পারলেন না। ম্যাজিস্ট্রেটের একজন ক্লার্ক দোভাষীর কাজ করছিলো কিন্তু তিনি চলে যেতেই ক্লে' অন্ধকার দেখলেন। কোর্ট হাউসটি খুব বড় ছিলো না। ক্লে'সহ কয়েকজন সাব-অর্ডিনেট ম্যাজিস্ট্রেটকে পাশে আলাদা বাঁশের কুটিরে অফিস করতে হতো। তবে, মামলার বিষয়গুলো তুচ্ছ মারপিট, গালি-গালাজ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে।

একদিন ক্লে' গেলেন জেল পরিদর্শনে। সেদিন কয়েদিদের দু'গজ করে কাপড় দেয়া হয়েছিলো। বেশ ক'জন কয়েদি বোধহয় শুধু কাপড় পেয়েই সন্তুষ্ট ছিলো না। সূর্যের আলোয় মেলে ধরে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলো। কোনো ভারতীয় জেল পরিদর্শন ক্লে'র জন্য ছিলো এই প্রথম। এগুলো সাধারণত কালেকটর বা ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ। কিন্তু তারা অনেক সময় ব্যস্ততার কারণে এগুলো করতে পারেন না, বা করেন না। তখন ক্লে'র মতো জুনিয়ারদের ঘাড়েই চাপে এসব বিবিধ কর্ম।

১৮৬৪

নববর্ষ পালিত হলো বেশ ফুটা করেই। প্যারেড গ্রাউন্ডে হলো হকি ম্যাচ– চট্টগ্রাম বনাম বিশ্ব। শেষোক্ত দলে ছিলেন চট্টগ্রামের বাইরের অতিথিরা। রাতে কমিশনারের বাসায় ছিলো নাচের পার্টি। মহিলা সংখ্যা কম থাকলেও আসরটি মন্দ জমেনি।

এর কয়েকদিন পর কমপিটিশনওয়ালারা গেলেন পিকনিক করতে। শহরের

প্রান্তে এক পাহাড়ে। পাহাড়ের চূঁড়োয় উঠলে চোখে পড়ে, সমতলভূমি দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী, পেছনে পাহাড়ের সারি, তার ফাঁক দিয়ে সাগরের এক চিলতে। চারদিকে ছড়ানো ছিটানো শিরিষ গাছ। এখানে সেখানে তাঁবু খাটানো হলো। ভালো খাবার-দাবার, শিরিষের ছায়ায় গানগল্পে দিন কেটে গেল। ক্লে'রা কয়েকজন দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে হেঁটে বাড়ি ফিরলেন।

চট্টগ্রামে কোনো ক্লাব নেই। তবে মেসে ধূমপানের জন্য ছিলো একটা লাউঞ্জ। যেখানে বসে বসে পাইপ খেতে খেতে কাগজ পড়া যেতো, মাঝে মাঝে বিয়ারে চুমুক। র‍্যাকেট খেলাটা ছিলো গরমকালের, তাছাড়া র‍্যাকেট কোর্ট সারানো হচ্ছিলো। বিকেলে তাই দেখা যেতো অনেক হাঁটতে বেরিয়েছেন। স্টেশনের অনেক রাস্তা যেগুলোতে লোক চলাচল ছিলো কম, সে ধরনের রাস্তা। আবিষ্কারের আনন্দ ছিলো বেশি। এরকম চমৎকার একটি রাস্তা ছিলো 'ফ্লোরাস পথ'। পাহাড়ের মাঝ দিয়ে পথটি যুক্ত করেছে স্টেশনের দু'টি রাস্তাকে। 'ফ্লোরাস পথে একদিন হাঁটার সময় ধূসর রংয়ের একটি অদ্ভুত জন্তু চোখে পড়লো ক্লে'র। লম্বা নাক, শুয়োরের মতো মুখ, থাবায় ধারালো নখ, ছোট লেজ। এরকম জন্তু আগে দেখেননি ক্লে। ধরে ফেললেন ছোটখাটো জানোয়ারটিকে। সেটি চিৎকার করে উঠলেও ধস্তাধস্তি করেনি। কোটে মুড়ে ক্লে জানোয়ারটিকে বাসায় নিয়ে এলেন। পরদিন দেখলেন সেটি মরে গেছে। পরে তিনি জেনেছিলেন স্থানীয়রা এটিকে বলে বালুসুর।

২৪ জানুয়ারি কলকাতা থেকে স্টিমারে এলেন কর্নেল বয়েলি, রেজিমেন্টের কমান্ডার হিসেবে। এতোদিন এর কমান্ডার ছিলো একজন ক্যাপ্টেন। একই স্টিমারে এলেন নতুন পাদ্রী। এরপর জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও তার স্ত্রী জরুরি ব্যক্তিগত কাজে চলে গেলেন হোম। তাদের সঙ্গে একই জাহাজে গেলেন জজের স্ত্রী। জজ ভারি মুষড়ে পড়লেন। পনের বছর আগে বিয়ের পর এই প্রথম ছাড়াছাড়ি। ক্লে'র সাথী উইলকিনসন জয়েন্টের বাসায় উঠে গেলেন। লে. ফিন্সবারিও বদলি হয়ে গেলেন কাসালং সেখানে কুকিরা নাকি বিদ্রোহী হয়ে উঠছে। কুমিল্লার অ্যাসিসট্যান্ট স্মিথ এ সময় ছুটিতে গেলেন, উইলকিনসনকে বদলি করা হলো তার জায়গায় কুমিল্লায়। মোটেই খুশি হলেন না উইলকিনসন। কারণ, মাত্র তিনি সুন্দর বাংলোটায় গুছিয়ে বসেছেন। চাটগাঁ ক্লে'র পছন্দ, কিন্তু তাই বলে চাটগাঁ ছেড়ে যেতে অনিচ্ছুক ছিলেন না তিনি। সুতরাং উইলকিনসনের বদলে তিনিই যেতে রাজি হলেন কুমিল্লা।

কুমিল্লা ১৮৬৪

উপকূলের উত্তর-উত্তর পশ্চিম দিকে সমান্তরালভাবে ফেনী নদী পর্যন্ত চলে গেছে

ঢাকা ট্রাংক রোড। রাস্তার ধারে সীতাকুণ্ডের পাহাড় যার কোনও কোনোটি ১১০০ ফুট পর্যন্ত উঁচু। এর আশপাশে মাঝে মাঝে গ্যাসের বুদবুদের দেখা মিলে, ফলে এর প্রতি এক ধরনের আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য আরোপ করা হয়েছে। সীতাকুণ্ডের মন্দিরে অনেক তীর্থযাত্রী যান এবং বোধগয়ার মতোই তা একজন মহান্তের নিয়ন্ত্রণে। চাটগাঁ থেকে কুমিল্লার দূরত্ব ৯৩ মাইল। কয়েক পর্বে যাত্রা ভাগ করে নিতে হয়। ক্লে রওয়ানা হওয়ার আগে কুমিল্লায় তাঁর বন্ধু স্মিথকে লিখেছিলেন যাত্রার একটি পর্বে সাহায্য করার জন্য কিন্তু স্মিথের কোনো উত্তর পাননি।

২০ ফেব্রুয়ারি চাটগাঁ থেকে রওয়ানা হলেন ক্লে। রাতটা থাকলেন জোড়ারগঞ্জে। সঙ্গে 'ডিক' ও 'জিট'। এক সঙ্গে চল্লিশ মাইল পাড়ি দেয়ার মতো ঘোড়া এগুলো নয়। পরদিন ক্লে পেরুলেন ফেনী নদী। নদীর দক্ষিণ থেকে উত্তর লোকচলাচল কম। নোয়াখালির রাস্তাটা এসে মিলেছে দক্ষিণে এবং তারপর মাইলের পর মাইল চমৎকার মেটে রাস্তা। সবচেয়ে বড় কথা চাটগাঁ আর ফেনীর পথে যেসব নড়বড়ে সাঁকো আছে ফেনীর পর আর সে রকম সাঁকো নেই। তাই বোধহয়, রাস্তায় দেখা মেলে অজস্র গরুর গাড়ির। কুমিল্লা থেকে দশ মাইল দূরে ক্লে স্মিথের চিঠি ও তাঁর পাঠানো টাট্টু পেলেন।

গোমতীর দক্ষিণ তীরে ছোট সুন্দর শহর কুমিল্লা। গাছে ঢাকা রাস্তার দু'পাশে নেটিভ বাজার, এর পিছে সার্কিট হাউস, কাচারি আর ইউরোপিয়দের বাসভবন। সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে আছে কালেকটর-ম্যাজিস্ট্রেট, জজ, সারভের সুপারিনটেনডেন্ট, জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং কয়েকজন অ্যাসিসটেন্ট-সব সিভিলিয়ান, অধঃস্তন পদমর্যাদায় আছে পুলিশের জেলা সুপারিনটেনডেন্ট এবং তার সহকারী। সিভিল সার্জন এবং কয়েকজন ফরাসি জমিদার, চাটগাঁয় যা নেই এবং পার্বত্য ত্রিপুরার রাজার ইউরোপিয়ান এজেন্ট।

পৌঁছার পরদিন কালেকটরের অফিসে অ্যাসিসট্যান্ট হিসেবে শপথ নিলেন ক্লে। ত্রিপুরার কালেকটর রস মেংগলস হলেন বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের ভিক্টোরিয়া ক্রস প্রাপ্ত দু'জন সিভিলিয়ানের একজন। অপরজন হলেন মাকডোনেল যিনি পরবর্তীকালে হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময় সাহসিকতার কারণে তাঁরা এ মেডেল পেয়েছিলেন।

প্রথমে মেংগলস সম্পর্কে ক্লে তেমন কিছু জানতেন না। স্টেশনের সমাজ ছিলো দু'ভাগে বিভক্ত-মন্টেগু এবং ক্যাহলেটস। এক ভাগের প্রধান ছিলেন জজ সুইনডন, অন্য ভাগের মেংগলস। চাটগাঁয় ক্রিসমাসের সময় সুইনডনের সঙ্গে ক্লে'র আলাপ হয়েছিলো। ক্লে কুমিল্লায় পৌঁছলে সুইনডন তাঁকে বেশ খাতিরযত্ন করলেন। পরে ক্লে'র সঙ্গে খাতির হলো মেংগলসের এবং দেখলেন লোক হিসেবে তিনিও ভালো, খালি মেজাজটা একটু তিরিক্ষে। পরে ক্লে নিরপেক্ষ থাকাই শ্রেয় মনে করলেন।

কুমিল্লার দু'তিন মাইল পশ্চিমে ময়নামতি বা লালমাই পাহাড়ে বেড়াতে গেলেন ক্লে, পুলিশের সহকারী পিটের সঙ্গে। এর মাঝ দিয়ে চলে গেছে ঢাকা রোড। সরকারি রাস্তার পাশে ছিলো ত্রিপুরার রাজার একটি বাংলো। পিট এবং ক্লে'র বেড়ানো মানে ছিলো শিকার। ঠিক হয়েছিলো শিকারের পর এই ময়নামতি বাংলোতে এসে খাওয়া-দাওয়া করবেন। বন্দুকে গুলি ভরে দু'জন জঙ্গলে ঢুকলেন। কিছুক্ষণ পর ঘন জঙ্গলে দু'জনে পথ হারিয়ে দু'দিকে চলে গেলেন। ক্লে লিখেছেন, এক জায়গায় তিনি তার কার্তুজের খোলটি দেখলেন। সেটিকে চিহ্ন হিসেবে রেখে পথ খুঁজতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর দেখেন আবার সেই একই জায়গায় এসে পৌঁছুছেন। যাক, এভাবে পথ খোঁজাখুঁজির সময় অনেকক্ষণ পর দেখা পেলেন পিটের। দু'জন ফের ফিরে এলেন ময়নামতি বাংলোতে।

ইস্টার সানডের সকালে ক্লে আর পিট আবার বেড়াতে বেরুলেন। নদীর তীরে, পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এক জায়গায় এসে পৌঁছে দেখেন সেখানে এক সার্ভে পার্টি তাঁবু গেড়েছে। তাঁবুর পাশে হাতি বাঁধা। জায়গাটির নাম বিবির হাট। বিবির হাট পৌঁছেছিলেন চমৎকার এক ঘেসো পথ ধরে। ক্লে লিখেছেন, স্টেশনের চারদিকে এরকম ঘেসো পথ ছড়ানো, ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবার জন্য যা অতি উত্তম।

সকালে নাশতার পর ক্লে তার দু'চাপরাশির সঙ্গে বাংলোয় কথাবার্তা বলা প্রাকটিস করতেন। কারণ, বাংলায় তাঁকে পরীক্ষা দিয়ে পাস করতে হবে নয়তো প্রমোশন আটকে থাকবে।

ক্লে উল্লেখ করেছেন, চাপরাসী ছাড়া সরকারি অফিস ছিলো অসম্পূর্ণ। আসলে এরা ছিলো ব্যক্তিগত ভৃত্যের মতোই, ব্যক্তিগত কাজও করতো চাপরাসীরা। চাপরাসীর সংখ্যা দিয়েও আবার ব্যক্তির পদমর্যাদা বোঝা যেতো। যেমন– ক্লের চাপরাসী ছিলো দু'জন অন্যদিকে জজ বা কালেকটরের ছয়সাত জন। এদের বেতন কম তবুও এ চাকরির উমেদারের সংখ্যা কম নয়।

কুমিল্লায় থাকাকালীনই ক্লে'কে বিভাগীয় পরীক্ষা দিতে যেতে হলো চাটগাঁ। যে পথে এসেছিলেন কুমিল্লা, সে পথেই গেলেন চাটগাঁ। সেই পরীর দিঘীতে স্নানও করলেন। হরেক রকমের লোক এসেছিলেন পরীক্ষা দিতে। এর মধ্যে যেমন ছিলেন নবীন অ্যাসিসট্যান্ট, তেমনি ছিলেন আবার মাঝবয়েসী অভিজ্ঞ ডেপুটি। নেটিভদের মাথায় রঙিন পাগড়ি, পরনে ধপধপে চাপকান, বুকের ওপর আড়াআড়ি করে রাখা মসলিন খণ্ড। পুলিশ অ্যাসিসট্যান্টের পরনে ছিলো গাঢ় নীল ইউনিফর্ম, অন্যদের সিভিলিয়ান পোশাক।

পরীক্ষার বিষয় ছিলো আইন আর ভাষা। আইন বিষয়ে পরীক্ষার্থীদের জানতে হতো পিনাল এবং ক্রিমিনাল প্রসিডিউর সম্পর্কে, রাজস্বের পুরনো বিধি ও নতুন আইন সম্পর্কে। ভাষার ক্ষেত্রে, নিম্নবঙ্গে যে ধরনের বাংলা বা হিন্দুস্থানী

প্রচলিত তা বলতে ও লিখতে জানতে হতো। এ পরীক্ষার ধরন ছিলো প্রথমে শিক্ষিত একজন দেশীয় তারপর অশিক্ষিত একজনের সঙ্গে কথা বলতে হতো। এর পর দেশীয় একজন কেরানিকে দিতে হতো ডিকটেশন। বিশেষ করে রাজস্ব মামলা এবং ক্রিমিনাল চার্জ গঠনের বিষয়ে ডিকটেশন দিতে হতো। দু'একজন দেশীয় অফিসার সহ-কমিশনার, জজ এবং কালেকটর হতেন পরীক্ষক। ক্লে যেদিন এ বিষয়ে পরীক্ষা দিতে গেলেন সেদিন প্রশ্নপত্র পৌঁছায়নি, ফলে শুধু মৌখিক পরীক্ষা হলো, পরদিন এক সার্কুলারে জানানো হলো, আর কোনো পরীক্ষা হবে না, পরীক্ষার্থেরা নিজ নিজ স্টেশনে ফিরে যেতে পারেন।

কুমিল্লায় ক্লে, পিট, সার্ভে সুপারিনটেনডেন্ট জোসেফ ডেলাভাল যিনি ছিলেন ফরাসি জমিদার নন্দন এবং কালেকটর মিলে একটি দল করেছিলেন। প্রতিদিন সকালে তারা শিকারে বেরুতেন। খেঁকশিয়াল, বাগদাস যাই চোখে পড়তো তার পিছেই দৌড়াতেন।

পহেলা মে সেকেন্ড অ্যাসিসট্যান্ট স্মিথের ছুটি শেষ হলে কাজে যোগ দিলেন এবং ক্লে'র সঙ্গে বসবাসের জন্য তার পুরনো বাংলোয় ফিরে এলেন। কয়েক দিন পর খবর এল বিবিরহাটের কাছে জঙ্গলে বাঘ গরু মেরে গেছে। খবর শোনার পরদিন ক্লে সারাটা বিকেল কাছাকাছি অপেক্ষা করতে লাগলেন। ঝিঁঝিঁর ডাক ছাড়া চারদিকে আর কোনো শব্দ নেই। যতই সময় যেতে লাগলো ততই চারদিক ঝিঁঝিঁর ডাকে মুখরিত হয়ে উঠলো। কিন্তু ব্যাঘ্র মশাই এলেন না। ক্লে যখন ফিরছেন তখন কয়েকটি কুটির থেকে ভয়ার্ত প্রশ্ন শোনা গেল 'বাঘ গিরা?'

সপ্তাহ দুয়েক পর ক্লে জানলেন নতুনভাবে প্রশ্নপত্র তৈরি হয়েছে এবং চাটগাঁ বিভাগের সব স্টেশনে প্রশ্নপত্র পাঠিয়ে দেয়া হবে। অর্থাৎ তাঁকে আর চাটগাঁ যেতে হবে না। পরীক্ষার কথা যেন ক্লে ভুলেই গিয়েছিলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আবার প্রস্তুতি নিলেন। দু'দিন ধরে পরীক্ষা হলো। পরীক্ষক ছিলেন ফিল্ডিং ও সুইনডন। মৌখিক পরীক্ষা নিলেন স্মিথ, আর দেশীয় এক কেরানী নিলেন ডিকটেশন। তিনি আবার ডিকটেশন নেবার সময় মাঝে মাঝে শুধরে দিচ্ছিলেন। আকারে ইঙ্গিতে সুইনডনও সাহায্য করছিলেন। মাসখানেক পর ক্লে জানলেন, 'লোয়ার স্টান্ডার্ড' পরীক্ষা তিনি পাস করেছেন।

এ সময় হুইপিং অ্যাক্ট চালু হলো বা পিনাল কোডে যুক্ত হলো। চুরি বা ঐ ধরনের নির্দিষ্ট কোনো অপরাধের জন্য বলা হলো অভিযুক্তকে বেত মারা যাবে। তবে, ক্লে লিখেছেন, চুরির জন্য বেত মারাটা তাঁর কাছে যথাযথ মনে হয়নি। কারণ, নিম্নবঙ্গে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয় প্রচুর এবং এর ফলে, নিরপরাধ ব্যক্তিকেও বেত মারা হতে পারে। কুমিল্লায় কিছুদিনের মধ্যেই এই শাস্তির প্রয়োগ দেখলেন।

সার্কিট হাউস থেকে আম চুরি করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলো নতুন

পুলিশের একজন। মামলা হলো স্মিথের এজলাসে। স্মিথ তাকে ২৪টি বেত মারার নির্দেশ দিলো। সর্বোচ্চ বিধান ছিলো ৩০টি। জেলে হেড ওয়ার্ডার খুশি মনে বেত চালালো। কারণ, নতুন পুলিশ ও জেল পুলিশ ছিলো পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। অবশ্য ১৪ ঘা মারার পরই অপরাধী সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে।

২৪ মে, সার্কিট হাউসে ঘটা করে সম্রাজ্ঞীর জন্মদিন পালিত হলো। সার্কিট হাউসটি এ জন্য বেশ সাজানো হলো। বাইরে চত্বরে তাঁবু খাটিয়ে নৈশভোজের আয়োজন করা হলো। নাচের ব্যবস্থাও ছিলো। এ জন্য ঢাকা থেকে আনা হয়েছিলো একজন বেহালা বাদক। স্থানীয় একজন পিয়ানো বাজালেন বেশ জমেছিলো নাচের আসর।

এদিন স্মিথ প্রস্তাব দিলো, ভৃত্যদের 'রূপ প্রতিযোগিতার' আয়োজন করলে কেমন হয়? যেই ভাবা সেই কাজ। ডাক্তার গ্রিনিং হলেন বিচারক। ঠিক হলো পুরস্কার পাবে কুৎসিততম ভৃত্যটি। পুরস্কার পেলো ক্লে'র মশালচি। তিন টাকা পুরস্কার যা তার বেতনের অর্ধেক। ক্লে'র ভৃত্য পরে জানিয়েছিলো, মশালচিটি লজ্জায় মাথা তুলতে পারছে না। কারণ, তাকে নিয়ে সবাই ঠাট্টা করছে। ক্লে মন্তব্য করেছেন, এই উত্যক্ত করার আরেকটি কারণ হতে পারে ঈর্ষা। কারণ, নেটিভরা আবার টাকার খুব ভক্ত।

কুমিল্লার পূর্বে পাহাড় ঘেঁষে ছিলো বিরাট এক ঝিল। পেকপাড়া, কলিম, কোরা, জলপিপি নানা ধরনের পাখি পড়তো ঝিলে। ক্লে মাঝে মাঝে সেখানে যেতেন শিকারে।ঐ ঝিলের পাড়েই তাঁর সঙ্গে একদিন দেখা হলো ফেঞ্জা গাজীর। ফেঞ্জা অভিজ্ঞ শিকারি। ক্লে'কে ফেঞ্জা অনুরোধ জানালেন তাকে ভাড়া করতে। ক্লে'র ছিলো শিকারের নেশা। তাই ফেঞ্জা গাজীকে মাসিক চারটাকা ভাড়ায় নিযুক্ত করলেন শিকারের জন্য। ক্লে'র পোষা দু'একটি প্রাণী ছিলো। এর একটি ছিলো ময়নামতি পাহাড় থেকে ধরা হরিণ শাবক ও দু'টি বানর।

১৭ জুলাই পিটকে বদলি করা হলো ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। ত্রিপুরার একটি মহকুমা হলো ব্রাহ্মণবাড়িয়া বা নাসিরনগর।

ট্রেজারির চার্জেও ছিলেন ক্লে কয়েকদিন। ট্রেজারির ভার থাকে সাধারণত একজন আনকভেনেন্টেড ডেপুটি কালেকটরের ওপর। কাজটি একঘেঁয়ে। ধাতব মুদ্রা গোনার পর ওজন করে রাখা হয়। একবার ক্লে'র ওপর নির্দেশ এলো পৌনে দু'লাখ টাকা (১৭,৫০০ পাউন্ড) ঢাকার ব্যাংক অব বেঙ্গল-এ পাঠাতে। প্রথমে এক হাজার ও পাঁচ হাজার করে থলেতে টাকা ভরে বাঁধা হলো। তারপর সেগুলো ঢোকানো হলো মজবুত সব লোহার সিন্দুকে। সেগুলোকেও আবার আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা হলো। এরপর গরুর গাড়ি করে তা নেয়া হলো নদীর ঘাটে। সঙ্গে দশ থেকে বারোজন পুলিশ গার্ড। তারপর বাক্সগুলোর সঙ্গে বাঁশ বেঁধে নৌকায় উঠানো

হলো। এর কারণ, ঝড়ে বা অন্য কোনো কারণে যদি নৌকা ডুবে যায় তবে বাঁশগুলো ভেসে থাকবে; ফলে সিন্দুকগুলো চিহ্নিত করা সহজ হবে।

একঘেঁয়েমি কাটাবার জন্য ক্লে প্রায়ই শিকারে যেতেন। শিকার যে খুব একটা পেতেন তা নয়। পাহাড়ে জঙ্গলেও যেতেন মাঝে মাঝে। সেখানে বাস করে ত্রিপুরা উপজাতি। ক্লে' এদের আচার-ব্যবহার ও জুমচাষ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখে গেছেন যা এখনও বদলায়নি।

এরি মাঝে ক্লে'র নামে একদিন এল হার ম্যাজিস্টেস সার্ভিসের খাম। হৃদপিণ্ডের গতি যেন থমকে গেল। কারণ, এ ধরনের খাম, প্রত্যেক কমপিটিশনওয়ালাই আশা করে। সাধারণত এ খাম বয়ে আনে পদোন্নতির খবর। অবশ্য, সব সময় নয়। দুরু দুরু বক্ষে খাম খুলে ক্লে দেখলেন তাঁকে অস্থায়ীভাবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছে। হোক অস্থায়ী, তবুও মহকুমা প্রশাসক তো। ক্লে'র পুরনো বন্ধু পিট আগ থেকেই ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ছিলেন পুলিশের চার্জে। আরেক বন্ধু স্মিথ পেলেন মাদারীপুরের চার্জ। সম্পূর্ণ চার্জ। এ জন্য ক্লে'র কোনো ঈর্ষা হয়নি। কারণ, বাখরগঞ্জ আর ফরিদপুরের মাঝে মাদারীপুর ছিলো জোলো, স্যাঁতস্যাঁতে এক মহকুমা। তবে, মহকুমা যত বাজেই হোক না কেন, সবাই চাইতো মহকুমা প্রশাসক হতে। কারণ, সে তখন পরিণত হতো শাসকে। আর পদোন্নতির ধাপে এ ছিলো প্রথম সিঁড়ি। যে যত আগে মহকুমা প্রশাসক হবে সে তত আগে আরেকটি প্রমোশন পাবে। তাই কোনো কমপিটিশনওয়ালাকে যদি নরকের কোনো জায়গাও মহকুমা প্রশাসক নিযুক্ত করা হতো তা'হলেও সে আপত্তি জানাতো না।

এরি মাঝে পিট কুমিল্লা এলেন পরীক্ষা দিতে। পরীক্ষা শেষে ক্লে তাঁর সঙ্গে গেলেন চাটগাঁ। চাটগাঁয় কয়েকদিন ঘুরে-ফিরে এলেন কুমিল্লায়। তারপর রওয়ানা হলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ১৮৬৪

পিটের নৌকোয়, পিট ও ক্লে রওয়ানা হলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে। নৌকার সঙ্গে বাঁধা আছে ছোট আরেকটি নৌকা, যাতে রান্নাবান্না করা হয়। চাকরবাকর ও কুকুরও ঐ নৌকায়।

চন্দ্রালোকিত রাত, শীত আসন্ন। ঠাণ্ডা। ক্লে' রওয়ানা দেয়ার জন্য প্রস্তুত। এমন সময় ক্লে'র বিছানার নিচ থেকে বের করা হলো তার খিদমতগারকে। পাওনাদারদের ভয়ে লুকিয়েছিলো সে। পাওনাদাররা তার পিছ ছাড়েনি। ঠিক ঠিক এসে হাজির হয়েছে ঘাটে। যা হোক, খিদমতগার পাওনাদারদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে তাদের শান্ত করলো। তারপর গোমতী বেয়ে শুরু হলো যাত্রা।

চারদিনের এই যাত্রা ছিলো খুবই আরামদায়ক। বাতাস অনুকূলে থাকলে মাঝিরা দাঁড় বাইতো। না থাকলে গুন টানতো। খাবার খেতেন তারা নদীর তীরে কোনো বৃক্ষের নিচে। চারদিন পর নৌকা ভিড়লো গোকুলে। সেখান থেকে দু'বন্ধু মাইল দুয়েক হেঁটে পৌঁছুলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং কালেকটর ছিলেন একজন মুসলমান- মৌলভী তোজাম্মেল আলী। ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছার পরদিন ক্লে তাঁর থেকে চার্জ বুঝে নিলেন।

এমন কিছু আহামরি ছিলো না ব্রাহ্মণবাড়িয়া। অফিস আদালতের সঙ্গেই আছে ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ অফিসার আর মুনসেফের বাড়ি- সবগুলোর চাল খড়ে ছাওয়া। একটু দূরে জেল। সেটি অবশ্য ইটের তৈরি। কুমিল্লার মতোই অনেকটা গ্রাম আর ধানক্ষেত, নেই শুধু কোনো টিলা।

পুরো ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ক্লে আর পিট এ দু'জনই ছিলেন ইউরোপিয়ান। ক্লে'র শোবার জায়গা ছিলো কাচারিতে কিন্তু থাকতেন পিটের ওখানেই। দুই সিভিলিয়ানের দৈনন্দিন রুটিন ছিলো এরকম– সকালের প্যারেড থেকে পিট ফিরলে, উঁচু বুট পরে দু'জনে ঘোড়ায় চড়ে বাজারের মাঝ দিয়ে চক্কর মারতেন। রাস্তা তৈরি করছে যেসব কুলি তাদের তদারক করতেন এবং তারপর দুজন মিলে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতেন। ঘোড়া চালানো পর্ব শেষ হলে বাড়ি, স্নান এবং প্রাতঃরাশ, তারপর প্রাঙ্গণের তাঁবুতে বসে পিট শুনতেন পুলিশের রিপোর্ট আর ক্লে চলে যেতেন কাচারি।

কুমিল্লায় থাকতে পিটকে পুলিশ সুপার ও কালেক্টর মিলে কিছু ফুলের বীজ দিয়েছিলেন। বাক্সে মাটি ভরে বীজ হতে সেগুলো লাগানো হয়েছিলো। পিট সেগুলো নিয়ে এসেছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া, অঙ্কুরোদগম হলো। দু'জনে মিলে অধীর আগ্রহে অঙ্কুরের বড় হওয়া দেখতেন। ক্লে প্রতিদিন রোজনামচা লিখতেন। তাঁর দেখাদেখি পিটও রোজনামচা লেখা শুরু করলেন। শুধু রোজনামচা নয় ছবি আঁকাও শুরু করলেন। সেসব ছবি, লিখেছেন ক্লে, দেখে হিংসে হতো। দু'জনে অবশ্য দু'জনের লেখা ও ছবির নিয়মিত প্রশংসা করতেন।

জীবন ছিলো সুন্দর। কিন্তু সে সুখ বেশিদিন ক্লে'র কপালে ছিলো না। ২৮ নভেম্বর, মাত্র দু'সপ্তাহ পর কালেক্টর নির্দেশ দিলেন ক্লে'কে ফিরে যাওয়ার। তাঁর জায়গায় এলেন একজন হিন্দু ভদ্রলোক। স্বাভাবিকভাবেই পিট খানিকটা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কারণ, এখন থেকে তাঁকে একলা থাকতে হবে কারণ, বাবু বা নেটিভ যাই হোক তাদের সঙ্গে তো আর সামাজিক সম্পর্ক রাখা যায় না।

মাদারীপুর ১৮৬৫

কুমিল্লায় কিছুদিন থাকার পর আবার 'হার ম্যাজিস্টিস সার্ভিস'-এর খাম এলো

ক্লে'র নামে। এবার কমপিটিশনে জিতেছেন তিনি। নিযুক্ত হয়েছেন মাদারীপুরের মহকুমা প্রশাসক। ক্লে'র এটাই প্রথম সাবডিভিশন বা মহকুমা। যে ক্লে একদিন বন্ধু স্মিথ মাদারীপুরের চার্জ পাওয়ার পরও ঈর্ষান্বিত হননি, যদি তিনি নিজেও একজন কমপিটিশনওয়ালা, ভাগ্যচক্রে সেই মাদারীপুরের ভারই পড়লো তার ওপর। অবশ্য, ক্লে এতে অখুশি নন। কারণ, তিনি এখন মহকুমা প্রশাসক।

কুমিল্লা থেকে নদীপথে যেতে হয় মাদারীপুর। মাঝখানে বিরতি দাউদকান্দিতে। তখন সেখানে ছিলো একটি ডাকবাংলো ও একটি পুলিশ ফাঁড়ি। এখানে গোমতী মিশেছে মেঘনার সঙ্গে। ঢাকায় যাওয়ার রাস্তারও বিরতি এখানে। অন্যদিকে নারায়ণগঞ্জ থেকে আবার সে রাস্তার শুরু। সুরমা উপত্যকা ও ময়মনসিংহের পূর্বদিক থেকে নেমে আসা বিভিন্ন নদী-খাল এসে ভরে তুলেছে মেঘনা। এ ধারা বিভক্ত করেছে ঢাকা ও চাটগাঁ বিভাগকে।

মাদারীপুর যেতে হলে পেরুতে হবে মেঘনা। দাউদকান্দি পুলিশ ফাঁড়িতে পথের ঠিকানা জেনে নিয়ে ক্লে নৌকা ভাসালেন মেঘনায়। কিছুদূর যেতেই হরেক রকম পাখি বিশেষ করে গাংচিলরা ঘিরে ধরলো তাকে। শিকারের জন্য বেশ গুলিও খরচ করলেন ক্লে। কিন্তু খুব একটা সফল হলেন না।

৫ জানুয়ারি মাদারীপুর পৌঁছলেন ক্লে। সেখানে পৌঁছে তিনি অবশ্য খানিকটা হতাশ হয়েছিলেন। লিখেছেন তিনি– পার্বত্য ত্রিপুরার ছবির মতো নিসর্গের পর মাদারীপুর ভারি নীরস জায়গা। নদীর পারে মহকুমা প্রশাসকের ভবনটি মোটামুটি। ইটের তৈরি। কিন্তু প্রাঙ্গণে নেই কোনো বৃক্ষ, বাগানে অযত্নের ছাপ স্পষ্ট। কাচারিটি গোয়ালঘরের চেয়ে খানিকটা উন্নত। আর নড়বড়ে বেড়া ও কয়েকটি খোদল হচ্ছে জেল। নোংরা জঞ্জালের মধ্যে বসে বাজার। দু'পাশের দোকান আবর্জনায় ভরা। ম্যাজিস্ট্রেটের বাসার পেছন থেকে শুরু হয়েছে ধান ক্ষেত। গ্রীষ্মে যা খটখটে, ফুটাফাটা প্রান্তর। বাজার থেকে কোথাও যাওয়ার কোনো রাস্তা নেই। মাদারীপুরে ইউরোপিয় কোনো পুলিশ অফিসার ছিলেন না। তাই পুলিশের একজন হেড কনস্টেবল বা হাবিলদারই ক্লেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সব দেখালেন।

ক্লে লিখেছেন, "আমার পূর্বসুরি স্মিথ নিশ্চয় খুশি হয়েছিলো এ জায়গা ছেড়ে যেতে পেরে"। ক্লে আসার আগেই স্মিথ মাদারীপুর ত্যাগ করেছিলেন এবং কাগজপত্র, চাবিটাবি সব বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সদরে অর্থাৎ বরিশালের কালেক্টরের কাছে। ফলে, চার্জ বুঝে নেওয়ার জন্য পরদিন আবার নৌকায় করে ক্লে রওয়ানা হলেন বরিশালের দিকে।

৭ জানুয়ারি নজরে এলো বরিশাল গির্জার চূঁড়ো। নদীর ঘাটের কাছেই কালেক্টরের সুন্দর বাড়ি। কালেক্টর নেভিল ছিলেন হাসিখুশি অমায়িক মানুষ। এর আগে তিনি চাকরি করেছেন দিল্লি ও পাঞ্জাবে। বাখেরগঞ্জের জলাভূমি নিশ্চয় তাঁকে

জলাভূমির স্বাদ দিয়েছিলো।

মাদারীপুরে পৌঁছে কয়েকদিনের মধ্যে ক্লে প্রশাসনিক কাজকর্ম গুছিয়ে নিলেন। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ছকলেন তারপর মহকুমা পরিদর্শনে বেরুলেন। সঙ্গে তিনটি নৌকা। একটি তাঁর নিজের, একটি ভৃত্য ও রান্নার জন্য ও আরেকটিতে ওঠানো হলো তাঁবু ও মালপত্র। মহকুমা পরিদর্শনে বেরুলে এই তাঁবু সঙ্গে রাখতেই হতো। কারণ, গ্রামগঞ্জে প্রান্তরে এই তাঁবুই ছিলো মহকুমা প্রশাসকের আবাস এবং কাচারি। এবং কোনো জায়গায় এই তাঁবু পাতলেই লোকজন বুঝতো যে, মহকুমা প্রশাসক এসেছেন।

প্রথমেই পড়লো গৌরনদী, নদীর পাড়ে এক পুলিশ থানা, তারপর বরিশাল। সেখানে মনোমতো দিন দুয়েক কাটিয়ে রওয়ানা হলেন কোটালিপাড়া থানার উদ্দেশ্যে। কোটালিপাড়ায় পৌঁছুতে জলপথের জাল পেরুতে হয়। এইসব নদী-নালায় আবার আছে কুমির। ক্লে তো রিভলবার দিয়ে একটি বাচ্চা কুমির শিকার করে ফেললেন। কুমিরটির মাথাটি কেটে সাফসুতরো করে রাখা হলো স্মারক হিসেবে।

কোটালিপাড়া একটি মনুষ্যবর্জিত এলাকা। মাঝখানে খানিকটা উঁচু জায়গায় পুলিশ থানা ও তুচ্ছ বাজার। চারদিকের নিচু এলাকা বর্ষায় প্লাবিত হয়ে যায়। ক্লে শুনেছিলেন কোটালিপাড়া নাকি স্নাইপ শিকারের জন্য ভালো। কিন্তু, মন্তব্য করেছেন, মানুষ বাসের উপযুক্ত নয়। সেখানে ক্লের পরিদর্শনের মোটেই ইচ্ছে ছিলো না। তাই কোনোরকমে সেখানে খানিকটা সময় কাটিয়ে রওয়ানা হলেন বরিশাল এবং সেখান থেকে মাদারীপুর।

নিঃসঙ্গ এই মহকুমার রুটিন কাজ করে ক্লে কাটিয়ে দিলেন ফেব্রুয়ারি। ১ মার্চ, নেভিল তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন বরিশাল যেতে। অতীব আগ্রহে 'ডিক' আর 'জিট'কে হাঁটাপথে পাঠিয়ে নিজে রওয়ানা হলেন নৌকায় করে। বরিশাল সদরে দিন দুই কাটিয়ে গেলেন কোটালিপাড়া। দিন দুয়েক সেখানে কাচারি বসালেন।

বরিশালে ফিরে কয়েকদিন কাটিয়ে আবার ট্যুর শুরু করলেন ক্লে। ২২ মার্চ পৌঁছলেন বুড়িরহাট থানায়। পুলিশের চার্জে ছিলেন সেখানে একজন অ্যাংলো। নাম, বেন-বো। তিনি জানালেন, এখানে শিকার পাওয়া যায় প্রচুর। মোষ, শুয়োর, চিতাবাঘ, বাঘ, বানর কোনোকিছুরই কমতি নেই। শিকারে বেরিয়ে দু'বার শুয়োরের দেখা পেলেন বটে ক্লে কিন্তু মারতে পারলেন না। দু'একটা পাখি শিকার করলেন মাত্র।

এপ্রিলে শুরু থেকে গরম পড়তে লাগলো, ট্যুরের সিজন শেষ হয়ে এল। সকালে ব্যায়াম করার জন্য হাতে বল্লম নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেরুতেন। উদ্দেশ্যে, নেড়ি কুত্তা মারা। সাধারণত এই বল্লম ব্যবহার করা হতো পিগ হান্টিং বা শুয়োর

মারার জন্য।

ইস্টারের সোমবার (১৭ এপ্রিল) এই একঘেঁয়েমি কাটলো। খবর পেলেন শুয়োরের খোঁজ পাওয়া গেছে। লাঠি হাতে কয়েকজন ভৃত্য, বাড়তি কিছু বল্লম নিয়ে 'ডিক'-এর পিঠে চড়ে বেরুলেন। খবর দিয়েছিলো ক্লে'র মুচি। শুয়োরের মাংসের ভক্ত তারা। এই মুচি, ঋষি এবং বুনওয়ারা কুকুর নিয়ে লাঠি হাতে শুয়োর শিকার করে। তারা দুটি বড় শুয়োর মারলেন। তিনটি শাবক জ্যান্ত ধরলেন এর মধ্যে একটিকে বাসায় নিয়ে গেলেন। অবশ্য বাসায় নিয়ে এটিকে ছেড়ে দিলেন।

একদিন সকালে বৃষ্টির পর খবর পেলেন, কয়েকজন গ্রামবাসীর মাথায় বাজ পড়েছে। 'জিট'-এর পিঠে চড়ে একজন দেশি ডাক্তার ও পুলিশ নিয়ে রওয়ানা হলেন। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখেন, বজ্র তিনজনকে আঘাত করেছিলো। এর মধ্যে একজন মরে পড়ে আছে। দু'জন সংজ্ঞাহীন। ডাক্তার অবশ্য পানি ছিটিয়ে দু'জনের জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন।

মাদারীপুরে পূর্তকার্য বলতে তেমন কিছু নেই। ক্লে নতুন একটি কাচারি করার জন্য বাঁশ যোগাড় করলেন। কাচারি ছিলো এতদিন এক গোয়াল ঘরে। বাজারের রাস্তাটি মেরামত করলেন। ক্লে'র অনুপস্থিতিতে এসব কাজকর্ম দেখাশোনা করতো পুলিশ হাবিলদার। কাজের জন্য মজুররা ব্যবহার করে কোদাল। চাকাওয়ালা কিছু তারা দেখেনি। ওড়াতে ভরে মাটি আনা-নেওয়া করে। কাজের গতি মন্থর কিন্তু সময়ের তেমন কোনো দাম নেই এখানে আর মজুরও খুব সস্তা। ফলে, কাজ চলে যায় একরকম। সকালে ক্লে'র কাজই হলো এসবের তত্ত্বাবধান, বাজারের দোকানদারদের বকাঝকা করা যাতে তারা দোকানের সামনের দিকটি পরিষ্কার রাখে।

ইউরোপিয়ানদের মুখ দেখার উপায় ছিলো না ক্লে'র। এপ্রিলের প্রথম দিকে অ্যাসিসট্যান্ট ওয়েক্টকট পরীক্ষা দিয়ে ঢাকা থেকে বরিশাল ফেরার পথে মাদারীপুর নেমেছিলেন। মাসখানেক পর ঢাকা বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী নিজের তৈরি স্টিম ককবোট 'কনটেইল'-এ করে এলেন। নেটিভরা একেবারে অবাক হয়ে গেল। তিনি নেটিভ মজুরদের একটি 'হুইলব্যারো' বা চাকাওয়ালা ঠেলাগাড়ি তৈরি করে কিভাবে তা ব্যবহার করতে হয় শিখিয়ে দিলেন। যে মুহূর্তে তিনি পিঠ ফেরালেন অমনি মজুররা চাকাটা খুলে ফেললো, তারপর মাটিভর্তি ঠেলা মাথায় তুলে নিল। যেভাবে তাদের বাবা-দাদারা মাটি ফেলেছে সেই রীতির বাইরে যেতে তারা রাজি ছিলো না। প্রকৌশলী যাচ্ছিলেন উনিশ মাইল দূরে একটি নীল ফ্যাক্টরি দেখতে। সরকার মহকুমা সদর দফতর করার জন্য জায়গাটি কিনতে চাচ্ছেন। তার বোটের জন্য কাঠ যোগাড় করে প্রকৌশলী আবার চলে গেলেন মাদারীপুরকে নিঃসঙ্গ করে।

মে মাসের ২২ তারিখে তিনি আবার হিজ ম্যাজিস্টির ছাপ মারা একটি খাম

পেলেন। ভেবেছিলেন প্রমোশন, কিন্তু না তার বদলির আদেশ, তাকে মুন্সীগঞ্জের এসডিও করা হয়েছে। এরি সাথে বরিশালে তাকে ডেকে পাঠানো হলো জাস্টিস অফ পিস হিসেবে শপথ নেয়ার জন্য। জাস্টিস অফ পিস ছাড়া অন্য কেউ কোনো শ্বেতাঙ্গের বিচার করতে পারেন না। সে জন্য প্রতি জেলায় কয়েকজনকে জাস্টিস অফ পিসের ক্ষমতা দেয়া হয়। শপথ নিয়ে ক্লে বরিশালেই রয়ে গেলেন। ক্লে'র বস নেভিলকে ঢাকার কালেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট করা হয়েছে। সুতরাং, ক্লে মুন্সীগঞ্জে গেলেও আবার তার বস হবেন নেভিল। ক্লে এতে খুশি।

নেভিলের জায়গায় সাদারল্যান্ড এলেন বরিশাল। নেভিল ও ক্লে দু'জনেই চার্জ বুঝিয়ে দিলেন। নেভিল রওয়ানা হয়ে গেলেন। ক্লে একদিন বন্ধুবান্ধব নিয়ে গেলেন বালেশ্বর নদীতে, তারপর মংলা নামে এক জায়গায়। আবার ফিরলেন বরিশাল। কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হলো সেখানে। কারণ, উপযুক্ত নৌকা পাওয়া যাচ্ছিল না। কয়েকদিন পর আরেকজন কমপিটিশনওয়ালার দশ দাঁড়ের একটি নৌকা পাওয়া গেল। তাতেই রওয়ানা হলেন। কুমিল্লায় থাকলেন কয়েকদিন। রথযাত্রা দেখলেন। তারপর রওয়ানা হলেন ঢাকার দিকে।

মুন্সিগঞ্জ

১৮৬৫ সালের ২৯ জুন কুমিল্লা ছাড়লেন ক্লে এবং দোসরা জুলাই, রোববার সকালে দূর থেকে নজরে এলো ঢাকা। নদী থেকে দেখলে শহরটিকে সুন্দরই লাগে। উত্তর তীর পরিপূর্ণ বিভিন্ন ধরনের স্থাপত্যিক রীতিতে নির্মিত সব দালানে। এরমধ্যে সবচেয়ে সুন্দর নবাব এবং মুঘলদের লালবাগের প্রাচীর আর তোরণ। তবে, শহরের কাছাকাছি এলে দৃশ্য তেমন মনোহর ঠেকে না। রাস্তাগুলো আঁকাবাঁকা, সংকীর্ণ; অনেক ঘরবাড়ি জীর্ণ এবং তীর কর্দমাক্ত, পরিচ্ছন্ন নয়। ঢাকাকে তুলনা করা হয় ভেনিসের সঙ্গে, কিন্তু দুটোর মধ্যে তেমন কোনো মিল নেই। লিখেছেন ক্লে, 'আমি যেসব 'স্টেশন' দেখেছি ঢাকা তেমন নয়, ঢাকা একটি শহর এবং এর দোতলা বাড়িগুলো দেখলে কলকাতার কথা মনে হয়।'

প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে ঢাকার খানিকটা গুরুত্ব ছিলো। কমিশনারের দপ্তর ছাড়াও বিভিন্ন আঞ্চলিক বিভাগ যেমন শিক্ষা, টেলিগ্রাফ ও স্বাস্থ্য বিভাগের আঞ্চলিক সদর দপ্তর এখানে। পূর্বাঞ্চলের ইনসপেক্টর অফ স্কুলস, টেলিগ্রাফ সুপারিনটেনডেন্ট, হাসপাতালসমূহের ডেপুটি ইনসপেক্টর জেনারেল, প্রসিদ্ধ পাবলিক ইনস্টিটিউশন যেমন– ঢাকা কলেজ, মিটফোর্ড হাসপাতাল, পাগলাগারদ, সেনা বিভাগের পিলখানা ও এখানে সেনাবাহিনীর ১৭তম নেটিভ ইনফেনট্রির একটি শাখাও আছে ঢাকায়। প্রশাসনিক কর্মচারী ছাড়া উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন, জমিদার ও নীলকর ওয়াইজম্যান, গোয়ালন্দ ও নারায়ণগঞ্জের মধ্যে চলাচলকারি

ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের এজেন্ট ও ব্যবসায়ী গ্রেগ; মুসলমানদের নেতাও বড় জমিদার খাজা আব্দুল গনি, যিনি পরিচিত গনি মিয়া নামে ও তাঁর ছেলে আহসানউল্লাহ। এছাড়া আছে কিছু হিন্দু, গ্রিক ও আর্মেনী ব্যবসায়ী ও জমিদার।

মুন্সীগঞ্জে দেশী এসডিও থেকে চার্জ বুঝে নিয়ে ঢাকায় কয়েকদিন কাটিয়ে ক্লে ফিরে এলেন মুন্সিগঞ্জ। ঐদিনই সরকারি চিঠিতে জানালেন তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের পুরো ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতার তিনটি শ্রেণী আছে। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট দু'বছর জেল ও এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ছয় মাসের কারাদণ্ড ও দুশো টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারেন। তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা এক মাসের কারাদণ্ড ও পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা। প্রথমে একজন সিভিলিয়ানকে তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেয়া হয়। তারপর পরীক্ষা পাসের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতাও বাড়ে।

মুন্সীগঞ্জের মহকুমা প্রশাসকের বাড়িটি দুর্গের মধ্যে এক বাঁশের বাংলো। এ দুর্গটি হলো ইদ্রাকপুর দুর্গ যা মীরজুমলা তৈরি করেছিলেন মগ আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য। দুর্গের পুরু দেয়াল বিশ ফুট পর্যন্ত উঁচু। প্রাচীরে আছে ছোট কামান বসানোর জায়গা। দুর্গটি দেখতে ছবির মতো। দেয়াল ক্রিপারে ঢাকা, এদিক সেদিক ফাটল ধরেছে, শেকড় মেলেছে গাছ। দুর্গের একেবারে উঁচুতে ছোট একটি বাগান। কয়েকটি ঝাউ আর শিরিষ গাছ ঢেকে রেখেছে বাংলোটিকে। বাতাসে পাতায় ওঠে মর্মর ধ্বনি, যেন দূর সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ। কাছে ছিলো একটি মসজিদ, প্রায় ভেঙ্গে পড়া একটি ব্রিজ, যা দিয়ে পৌঁছা যায় কিছু পাবলিক বিল্ডিং এবং ছোট একটি বাজারে। মুন্সীগঞ্জে তিনিই একমাত্র ইউরোপিয়ান। তবে সান্ত্বনা এই যে, ঢাকা একরাতের পথ, আর নারায়ণগঞ্জের গ্রেগতো বলতে গেলে প্রতিবেশী।

নিম্নবঙ্গের অন্যান্য বাজারের মতো মুন্সিগঞ্জ বাজারেও অসংখ্য নেড়ি কুকুর নোংরা, রুগ্ন, ক্লান্ত। প্রায় সারাক্ষণই উচ্ছিষ্ট বা নোংরা নিয়ে কাড়াকাড়ি অথবা ঘেউ ঘেউ করে। বিশেষ করে ইউরোপিয়ান দেখলে তারস্বরে চিৎকার করতে থাকে। একদিন ক্লে ফিরছেন বাজার দিয়ে, এমন সময় এক নেড়ির কাণ্ড দেখে ক্ষেপে গিয়ে বন্দুক ছুঁড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে সামনের এক খড়ো ঘর থেকে আর্তনাদ শোনা গেল। মরে গেল নাকি কেউ? ভয় পেলেন ক্লে। দেখলেন, না মরেনি বটে কেউ তবে একজনের শরীর সামান্য ছিঁড়ে গেছে। ডাক্তার ডেকে তার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করলেন ক্লে, ক্ষতিপূরণ হিসেবে কিছু টাকাও দিলেন। কিন্তু, ঢাকার কাগজপত্রে এ নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হলো। আক্ষেপ জানিয়ে লিখেছেন ক্লে– নেটিভ কাগজগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো, সত্য ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করা, আর ইউরোপিয়ান

কেউ বিষয়বস্তু হলে তো আর কথাই নেই।

দুর্গের চারদিকে বেশ জঙ্গল। একদিন চাকররা জঙ্গল থেকে আসা একটি বাগদাস মারলো। ক্লে মারলেন একদিন একটি সজারু। এছাড়া গুঁইসাপ দেখা যেতো প্রায়ই।

মুন্সীগঞ্জের নিঃসঙ্গতা এবং বিষাদময় পরিবেশের কারণে ক্লে আক্রান্ত হলেন ডিসেনট্রিতে, শরীরটাও ভালো যেতো না। তবে, এরি মাঝে তার পুরনো বন্ধু পিটের ছোট ভাই লেঃ পিট এসে বেড়িয়ে গেলেন। ফুর্তিতে কাটালেন কয়েকদিন। এরপর এল দুর্গাপূজা। পূজার ছুটিটা কাটালেন ঢাকায়।

ছুটি কাটানোর পর মুন্সীগঞ্জে ফিরলেন ক্লে। বর্ষা কেটে গেছে, আবহাওয়া হয়ে উঠছে প্রসন্ন, নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ব্রহ্মপুত্রের তীরে বসে কার্তিক বারুণীর মেলা। মুন্সীগঞ্জের কাছে নদীর তীরে। বারুণী উপলক্ষে মেলা বসে। অধিকাংশ দোকানি আসে ঢাকা থেকে। তবে অমৃতসর থেকে আসে ব্রোকেড ব্যবসায়ীরা, দিল্লি থেকে মনোহারি দ্রব্যাদি নিয়েও আসে অনেকে। দক্ষিণ থেকে মগরা নিয়ে আসে কাঁচ বা জাপানি মাটি ও অন্যান্য পণ্য। সিলেট ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে আনা হয় বাঁশ, সুন্দরবন থেকে সুন্দরী কাঠ। ভিড় সামলাবার জন্য থাকে একদল পুলিশ।

মেঘনার পূর্বদিকে ত্রিপুরা, দাউকান্দির দক্ষিণের জায়গাটি শিকারের জন্য বিখ্যাত। কালেক্টর ক্লেকে পাঠালেন জায়গাটির খোঁজখবর করতে। একদিন কাচারি না থাকায় ক্লে সকালে বেরিয়ে পড়লেন। নদী পেরিয়ে পৌঁছলেন কালিপুরায়। তীরটি উঁচু, তারপর প্রশস্ত ময়দান ধানে ঢাকা, আর জঙ্গল। বোঝা যায় বরাহ পাওয়া যাবে। নেটিভরা যা খবরাখবর দিলো তাতেও বিষয়টি বেশ উৎসাহব্যঞ্জক মনে হলো। ধান কাটার পর ঘোড়ায় চড়ার জন্য জায়গাটি উপযুক্ত হয়ে উঠবে। সিভিলিয়ানদের প্রধান বিনোদন ছিলো পিগস্টিকিং। সোজা কথায় বরাহ শিকার। কিন্তু, বন্দুক দিয়ে গুলি করে মারায় কোনো উত্তেজনা নেই। উত্তেজনা আছে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারায়। সুতরাং বরাহ শিকারে যাবার সময় সিভিলিয়ানরা ঘোড়ায় চাপতেন, হাতে থাকতো বর্শা। আর বিটের দল ক্ষেপিয়ে তুলতো বরাহকে। ঝোপঝাপ থেকে বরাহ বেরুলেই শিকারিরা ছুঁড়তেন বর্শা। এরি মাঝে বিবাদ মেটাতে ক্লেকে যেতে হয়েছিলো চরে। সরকারের আয়ের প্রধান উৎস জমি। নদীর ভাঙনে কখনো চর জেগে ওঠে, কখনো জমি চলে যায়। নতুন চর জেগে উঠলেই শুরু হয়ে যায় বিবাদ, দখল নিয়ে। এরকম এক চরে যেতে হয়েছিলো ক্লেকে। ক্লের ভাষ্য, জবানবন্দির অধিকাংশ এসব ক্ষেত্রে হয় মিথ্যা। তবে, কালেক্টররা চরে যান। কারণ, চরে যাওয়া মানেই স্নাইপ শিকারের উত্তম সুযোগ।

এরি মাঝে ঢাকার বিখ্যাত ঘোড়দৌড় দেখতে গিয়েছিলেন ক্লে।

ঘোড়দৌড়কে পৃষ্ঠপোষকতা দেন গনি মিয়া আর তার ছেলে আহসানউল্লাহ। পুরস্কার হিসেবে বেশ ভালো টাকা দেওয়া হয়। দু'একজন ঘোড়ার মালিক ইউরোপিয়ন জকিও রাখেন।

ঘোড়দৌড়ের পর শুরু হলো ক্রিসমাসের ছুটি। এ সময় তারা ঠিক করলেন বরাহ শিকারে যাবেন কালিপুরা। দলে ছিলেন লিয়, রেজিমেন্টের একজন সাবঅলটার্ন ডসন, পুলিশের স্টাইফোর্ড এবং নারায়ণগঞ্জের গ্রেগ, তাঁবু না নিয়ে তারা নিলেন দুটি বজরা। রান্নাবান্নার সরঞ্জাম ও ভৃত্যদের জন্য নেওয়া হলো আরেকটি নৌকা।

কালীপুরায় কমপিটিশনওয়ালাদের ঘোড়া আগেই পৌঁছে গিয়েছিলো। দুটি হাতিও রাখা ছিলো। বেশ কয়েকটি বরাহ শিকার করলেন তারা।

১৮৬৬

নববর্ষের দিনটাও শিকারে কাটিয়েছিলেন কমপিটিশনওয়ালারা। ৭ তারিখ, নারায়ণগঞ্জে গ্রেগের সঙ্গে ছিলেন ক্লে। রাতে শুনলেন, বাজারে পুলিশ আর কয়েকজন চীনার সঙ্গে ঝগড়া শুরু হয়েছে। পুলিশ নয়জন চীনাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে। শীতকালে বার্মা উপকূল আর স্ট্রেইটস থেকে লোর্চা বা জাংকে করে মগ ও চীনারা আসে জাপানী মাটি, তুলা, সেগুনকাঠ ও অন্যান্য পণ্য নিয়ে। এর বদলে তারা নিয়ে যায় উৎপাদিত পণ্য, সুপারি, চিনি, নুন এবং তামাক। ফেব্রুয়ারির পর তারা আর থাকে না। কারণ, সাগর এরপর উত্তাল হয়ে ওঠে।

ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি ট্যুরে বেরুলেন ক্লে। কালেক্টর তাকে বেশ একটা আরামদায়ক তাঁবু দিলেন। সঙ্গে বাহির গির্দারিদের একটি দল। এঁরা হলেন আজকের জলপুলিশের মতো। কাচারি বসালেন মুলফতগঞ্জে। এলাকাটা জঙ্গলে ভরা। তারপর গেলেন রাজনগর। সেখানে রাজবল্লভের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ছিলো তখনও। তারপর নারায়ণগঞ্জ হয়ে মুন্সিগঞ্জ।

মুন্সীগঞ্জে ক্লে'র কেটে গেছে এক বছরেরও বেশি। গুজব শুনছিলেন যে তার প্রমোশন হবে। এবং একদিন সকালে প্রত্যাশিত সেই খাম পেলেন। তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঢাকার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে কাজ চালানোর জন্য।

ঐদিন সকালে যখন পরিদর্শনে বেরিয়েছেন তখন চোখে পড়লো শেকলে বেঁধে একজন পাগলকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নিয়ম হচ্ছে, এরকম কেউ পাগল হলে তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেট তার ডাক্তারি পরীক্ষা করেন। ঘোরতর উন্মাদ হলে তাকে সরকারি পাগলাগারদে পাঠানো হয়। তেমন না হলে পরিবার-পরিজন বা বন্ধুবান্ধবকেই দেখাশোনার দায়িত্ব দেয়া হয়। ক্লে

লিখেছেন, "ইনস্যানিটি ইজ নট আনকমন ইন বেঙ্গল"। সেদিন বিকেলেই ঢাকার কমিশনারও কালেক্টরের কাছ থেকে চিঠি পেলেন। তাকে তখনিই ঢাকায় জয়েন করতে বলা হয়েছে।

মুন্সিগঞ্জ ছেড়ে যাওয়ার আগে 'মুন্সীগঞ্জের উদ্দেশ্যে কবিতা' নামে বেশ বড়সড় একটি কবিতা লিখে ফেললেন ক্লে যার কয়েকটি ছত্র এরকম–

কি করেছি আমি নিঠুর ভাগ্য/ যার জন্য আমাকে ছুঁড়ে ফেললে এখানে/ ঘোড়া, কুকুর, মানুষ থেকে দূরে/ যারা ছিলো আমার পরম প্রিয়।

বারান্দায় আছি বসে/ চুরুট খেতে খেতে/ উপসংহার পৌঁছলাম এই যে/ সত্যিই আমি এক হতভাগা। কোনো ইউরোপিয়কে এখানে পাঠানো মানেই নিষ্ঠুরতা/ কারণ, এ হলো এক বন্দি জীবন।

ঢাকা ১৮৬৬-৬৭

মুন্সিগঞ্জ থেকে ক্লে এলেন ঢাকায়। তাঁর বন্ধু গ্রেগ তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। ক্লের জায়গায় গেলেন লিওন। নতুন বিয়ে করেছেন। রজরায় নতুন বউ নিয়ে রওয়ানা দিলেন মুন্সিগঞ্জ। আর ক্লে ঢাকায় এসে উঠলেন বুড়িগঙ্গার তীরে পুলিশ কর্মকর্তা ক্লেসের বাড়িতে।

ঢাকায় শিকারের পরিবেশটা বেশ জমজমাট। শিকারের জন্য গনি মিয়ার হাতি সব সময়ই মজুদ। ঢাকায় পৌঁছার পরদিন পুলিশের স্ট্যাটফোর্ড ক্লেকে নিয়ে গেলেন শিকারে। গনি মিয়ার হাতি পাওয়া গেল চাওয়া মাত্রই। শহরের উত্তরে জঙ্গল। সে জঙ্গলেই গেলেন তাঁরা শিকারে। মধুপুর হয়ে জঙ্গল চলে গেছে গারো পাহাড় পর্যন্ত। এক সময় ঢাকা যখন জমজমাট ছিলো তখন এই জঙ্গল সাফ করে কাপড় শুকনো হতো। শুধু তাই নয়, শহরে না থেকে অনেকে এখানেই থাকতেন। কিন্তু, তারপর সব ঢেকে গেলে জঙ্গলে আর ম্যালিরিয়ায়। সম্প্রতি এই এলাকার ওপর দিয়ে নির্মিত হয়েছে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেল লাইন। এতে পাল্টাচ্ছে পরিবেশ। এক সময় এ জঙ্গলে বাঘ থেকে শুরু করে সব ধরনের জন্তু পাওয়া যেতো। এখন অবশ্য তা পাওয়া যায় না, কিন্তু ক্লে হরিণের দেখা পেলেন। শিকার করলেন কয়েকটি কালো তিতির যার মাংস নাকি তাঁর মতে বিলেতি ধূসর তিতির থেকেও সুস্বাদু।

১৩ মে আনুষ্ঠানিক পরিচয়ের জন্য কালেক্টর ক্লেকে নিয়ে গেলেন গনি মিয়ার বাসায়। চমৎকার বিশাল বাড়ি। তাঁর ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া ছিলো অনেকগুলো এবং এগুলোর দেখাশোনা করতো এক ইউরোপিয়ান জকি। এছাড়া শিকারের জন্য ছিলো তাঁর হাতি আর একপাল ফক্সহাউন্ড। তাঁর ছেলে আহসানউল্লাহ শান্ত, নম্র এক যুবক, ভালোবাসে সে হারমোনিয়াম আর ক্যামেরা। তাঁর পিতার মতো,

লিখেছেন ক্লে, তিনিও ছিলেন অ্যাংলিসাইজড নেটিভের এক ভালো নিদর্শন।

রানীর জন্মদিন পালিত হলো ঢাকায় বেশ হৈ-চৈ করে। কমিশনারের বাসায় রাতে ছিলো ডিনারের নিমন্ত্রণ। কমিশনার বাকল্যান্ড সমবেত 'কমপিটিশনওয়ালা'দের সম্মুখে ক্লের উদ্দেশে পানপাত্র তুলে ধরলেন। 'আমার মতো নবীন সিভিলিয়ানের জন্য এ এক বিরাট সম্মান।' লিখেছেন ক্লে।

রানীর জন্মদিনের পর সবাই আবার দল বেঁধে গেলেন কালিপুরে বরাহ শিকার করতে। শিকারে যোগ দেয়ার জন্য মুন্সিগঞ্জ থেকে লিওন পর্যন্ত চলে এলো।

ক্লে প্রশাসন সম্পর্কেও কিছু বিবরণ রেখে গেছেন যার সংক্ষিপ্তসার হলো এরকম :

সদরে জেলা অফিসারের পর হচ্ছে সিনিয়র ম্যাজিস্ট্রেট যাকে বলা হয় 'জয়েন্ট'। তিনি আরজি শোনেন ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো নিজে রেখে বাকিগুলো অধঃস্তনদের মধ্যে ভাগ করে দেন। ঢাকার মহকুমা দুটি– মানিকগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ। সেখানে এসডিওই সর্বেসর্বা। আর ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে 'জয়েন্টের' স্থান কালেকটরের পরই। এক কথায় জয়েন্টের ওপর কাজের দায়িত্ব অনেক। তাই এই পদে মোটামুটি পরিশ্রমী ও অপেক্ষাকৃত কম বয়সী সিভিলিয়ান নিয়োগ করা হয়।

জেলা অফিসারের ডান হাত হলেন জয়েন্ট। ঢাকায় ক্লেকে জয়েন্ট হিসাবে মোক্তারি পরীক্ষার ভার দেয়া হয়। কালেক্টরের লাইসেন্সছাড়া কেউ মোক্তারি করতে পারেন না। অবশ্য, উকিলদের স্থান ছিল মোক্তারদের ওপর।

বর্ষার সময় ঢাকা শহর হয়ে ওঠে স্যাঁতস্যাঁতে, দমবন্ধ করা। তখন একমাত্র আরাম বাকল্যান্ড বাঁধে ভ্রমণ। কমিশনার বাকল্যান্ডের উদ্যোগে ও স্থানীয় ধনীদের অর্থ সাহায্যে তৈরি করা হয়েছিলো এই বাঁধ। ক্লে লিখেছেন, টাকা-পয়সার ব্যাপারে নেটিভরা খুব একটা উদারহস্ত নয়।এর একমাত্র ব্যতিক্রম গনি মিয়া।

জেলখানার দায়িত্বেও ছিল জয়েন্টের। একদিন জেল পরিদর্শনে গেলেন ক্লে। লিখেছেন তিনি, আগে, জেলের নিয়মকানুন ছিল বড় শিথিল। এখন (১৮৬৬-৬৭) তা কঠোর হয়েছে। তবে, সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে লাল ফিতার দৌরাত্ম্য। আসামিদের ভালো যত্ন নেওয়া হয়, জানিয়েছেন ক্লে, এবং জেল থেকে বেরুবার পর অনেক আসামিকে চেনাই দুষ্কর। কারণ স্বাস্থ্যোন্নতি।

ঢাকা জেলের জেলর ছিলেন ফিরিঙ্গি। জেলে কয়েদি ছিল চারশ' জন। জেলার বেতন পেতেন একশ' আর পেতেন জেলে প্রস্তুত জিনিসপত্র বিক্রি হলে তার কমিশন। জেলে যেসব জিনিস তৈরি করা হয় সেগুলো হলো– চেয়ার, মোড়া, টেবিলের চাদর, পরদার কাপড়, ডাস্টার, সরষের তেল, চুন মেশানো সুরকি ইত্যাদি।

নভেম্বরের দিকে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হতো অফিসারদের পরীক্ষা। বাইরে থেকে দুনিয়ার অফিসাররা পরীক্ষা দিতে আসতেন। ডিসেম্বরে হতো রেস। এ বছর (১৮৬৬) ডিসেম্বরের একটি বড় ঘটনা হলো, ঢাকা কলেজের স্বনামধন্য প্রিন্সিপাল ব্রেনান্ডের বড় মেয়ের সঙ্গে রেজিমেন্টের অ্যাডজুটেন্টের বিয়ে।

ঢাকার সিভিলিয়ানরা নববর্ষ পালন করতেন বেশ ধুমধামে। ১৮৬৭ সালের নববর্ষও পালিত হলো সেভাবে। দিনে হলো ক্রিকেট ম্যাচ, রাতে বলনাচ। ৫ তারিখ পিকনিক। পুরানো ক্রিকেট মাঠের পাশে পুরনো সিপাহী লাইনে হলো পিকনিক ৭ তারিখ আবার নৈশভোজ ও বলনাচ। কালেক্টর আবার ছুটিতে গেলেন কয়েকদিনের জন্য। ক্লেই তখন ভারপ্রাপ্ত কালেক্টর।

ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিলের মধ্যে কমপিটিশনওয়ালারা চারবার গিয়েছিলেন 'পিগস্টিকিং' বা বরাহ শিকারে। প্রথমে লিওন আমন্ত্রণ জানালেন। পদ্মার তীরে জঙ্গলাকীর্ণ এক জায়গায় চলবে শিকার। দলে ছিলেন নীলকর ওয়াইজ, প্লেস, বাকল্যান্ড আর লিওন নিজে। পর পর তিনদিন তারা চরে তাঁবু খাঁটিয়ে শিকারে বেরুলেন। খুব যে একটা সুবিধে করতে পেরেছিলেন তা নয়।

আরেকদিন ওয়াইজ, বাকল্যান্ড আর প্লেস গেলেন মহিষ শিকারে মুকুন্দিয়ায়। ঢাকা ও ফরিদপুরের মাঝামাঝি হলো মুকুন্দিয়া। মার্চে গেলেন নারায়ণগঞ্জের আশপাশে।

মার্চের শেষে ভালো খবর পেলেন ক্লে। নেভিল গেছেন ছুটিতে। আর তার জায়গায় তিনমাসের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হয়েছেন ক্লে। তাঁর খুশি দেখে কে। আরো ভালো খবর, তাঁর জয়েন্ট হয়ে মুন্সিগঞ্জ থেকে আসছেন লিওন।

কমপিটিশনওয়ালারা ঢাকায় হকি লেখতেন নিয়মিত। তবে, হকি খেলা হতো ক্রিকেটের মাঠে। পাছে ক্রিকেট মাঠ নষ্ট হয়ে যায় এ ভেবে রেসকোর্সের কাছে এক ময়দানে হকি খেলা সরিয়ে নেয়া হলো। এখানেই ৩রা এপ্রিল ঢাকায় প্রথম ঘোড়ায় চড়ে হকি খেলা চালু হলো। খুব সম্ভব পোলো-কেই ঘোড়ার পিঠে হকি খেলা হিসেবে লিখেছেন ক্লে। কলকাতার অনুকরণে ঢাকার স্থাপিত হয়েছিলো একটি বোটক্লাব কিন্তু খুব একটা সাড়া পাওয়া যায়নি।

এপ্রিলের গোড়ার দিকে ঢাকায় প্রশাসনে খানিকটা রদবদল হলো। বাকল্যান্ডের বদলে ময়মনসিংহ থেকে এলেন সিম্পসন। অবিবাহিত বাকল্যান্ড জুনিয়র সিভিলিয়ানদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় ছিলেন। ভালো শিকারি হিসেবে খ্যাতি ছিল তাঁর। কয়েকটি হাতি ও ঘোড়ার মালিক ছিলেন তিনি। মিশুকে ও অতিথিপরায়ণ ছিলেন বাকল্যান্ড। "ব্ল্যাক সিমি" নামেও আদর করে ডাকা হতো তাঁকে। এ নামে ডাকার কারণ, একই নামে আরেকজন সিভিলিয়ান ছিলেন যার রং ছিল খানিকটা উজ্জ্বল।

এপ্রিলের মাঝামাঝি আবার শিকারে গেলেন দল বেঁধে। শিকার করলেন একটি ছোট হরিণ, দুটো কালো খরগোস আর তিনটি তিতির।

মে মাসে সফরে বেরুলেন ক্লে। প্রথমে গেলেন মানিকগঞ্জ। সেখানে এসডিও তোজাম্মেল আলি। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তাঁরসঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো ক্লের। তারপর তুরাগ নদীর তীরে টঙ্গীতে। নদীর ওপর তিন স্প্যান দিয়ে তৈরি একটি পুরনো সেতু। ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহের সময় ম্যাজিস্ট্রেট কার্নাক মাঝখানের স্প্যানটি ধ্বংস করে দেন। নৌকা করে যাবার সময় ব্রিজটি দেখলে মুগ্ধ হতে হয়।

রানীর জন্মদিন উপলক্ষে ঢাকার সিভিলিয়ানরা টঙ্গীতে শিকারের যোগাড় করেছিলেন ২৪ মে। ক্লেও তাতে যোগ দিলেন। শিকার করলেন তারা একটি ছোট চিতা, একটি বরাহ, দুটি হরিণ। পরদিন শিকার পার্টি ঢাকা ফিরে গেলে ক্লে রওয়ানা হলেন মুন্সিগঞ্জ। রাতে ঝড়ের কবলে পড়লেন। রান্নার নৌকা ডুবলো। সে এক লণ্ডভণ্ড অবস্থা। মুন্সিগঞ্জ থেকে বিদায় নিয়ে ধলেশ্বরী পেরিয়ে পড়লেন শীতলক্ষ্যায়। পরিদর্শন করলেন কাপাসিয়া থানা। সেখান থেকে ঢাকার উত্তরে বর্মী। তারপর আবার ঢাকায়।

বর্ষায়ও একবার শিকারে গেলেন ক্লে কিছু বন্ধুবান্ধব নিয়ে। সেই টঙ্গীতেই। গনি মিয়া গোটা ছয়েক হাতি দিলেন। তাঁর গাড়ি তাঁদের পৌঁছে দিলো তালতলি পর্যন্ত। সেখান থেকে ঘোড়ায় চড়ে তাঁরা গেলেন টঙ্গীতে বরাহ নিধন করতে। ১৮ জুন, শিকার সিজন শেষ উপলক্ষে বলনাচের আয়োজন করা হয়। ক্লে একে 'পিগ বল' বলেছেন। বর্ষা শেষ হলে ফের শুরু হবে শিকার মওসুম।

এরিমধ্যে সিভিলিয়ান মহলে ক্লে গুজব শুনলেন, তাঁকে প্রমোশন দিয়ে নোয়াখালি পাঠানো হতে পারে। নোয়াখালি যাবার অর্ডার এসেছিলও। পরে তা ক্যানসেল হয়ে যায়। কিছুদিন পর প্রমোশনের উৎকণ্ঠা কাটলো। সরকারি চিঠি পেলেন, তাঁকে জয়েন্ট পদে প্রমোশন দেয়া হয়েছে। এখন তিনি কোথায় যেতে চান? ত্রিপুরা না চাটগাঁ? ক্লে চাটগাঁ বেছে নিলেন।

[এখানে অতি সংক্ষেপে ঢাকার বিবরণ দেয়া হয়েছে। কারণ, শুধুমাত্র ঢাকার বিবরণ অবলম্বন করে ঢাকা নগর জাদুঘর ফওজুল করিমের একটি বই প্রকাশ করেছে। নাম– *ঢাকা : ক্লে'র ডায়েরি*।]

চাটগাঁ ১৮৬৭-৬৮

চাটগাঁ পৌঁছে ক্লে দেখলেন শহরের অবস্থা আগের চেয়ে খারাপ হয়ে পড়েছে। জঙ্গল বেড়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্যও হয়ে পড়েছে স্তিমিত। এছাড়া, পুরনো সঙ্গী-সাথীরাও ছিটকে পড়েছে এখানে-সেখানে।

ঐ সময় এক রিপোর্টে বলা হলো, চাটগাঁর অস্বাস্থ্যের মূলে রয়েছে এর

জঙ্গল। তাই বনজঙ্গল পরিষ্কারের উদ্যোগ নিলেন ক্লে। সুপুরি বাগান ছিল চাটগাঁয় অনেক। বাগানের মালিকরা গাছের সংখ্যা কমাতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু, ক্লে লেগে রইলেন এবং শহরের জঙ্গলও খানিকটা পরিষ্কার করে ফেললেন।

তখন জেলাগুলোতে ডিস্ট্রিক্ট স্কুল কমিটি ছিল। কমিটিতে সরকারি সদস্য ছাড়া, স্থানীয় লোকজনও থাকতেন বেশ। ক্লে লিখেছেন, নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে নেটিভদের মধ্যে সবাই-ই হিন্দু। কমিটির মিটিংয়ে যেতে পছন্দ করতেন না ক্লে। কারণ, সেখানে খালি আলোচনাই হতো, চলতো উত্তপ্ত বিতর্ক। কিন্তু কাজ হতো না কিছুই।

বাঘের উপদ্রব তখনও কমেনি চাটগাঁয়। একদিন দিনদুপুরে কাচারির সামনে দেখা গেল বাঘ। 'বাঘ' 'বাঘ' বলে ঊর্ধ্বশ্বাসে সবকিছু ফেলে পালালো সবাই। বাঘও অবশ্য এই হুলস্থুলে কেটে পড়লো। ক্লে কিন্তু তক্কে তক্কে রইলেন। শহরের জংলি পথে টোপ গেঁথে রাখতে লাগলেন এবং একদিন চন্দ্রালোকিত রাতে তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ব্যাঘ্র মহাশয়ের। গুলিও করলেন কিন্তু ফসকে গেল।

এরপর চাটগাঁয় ছিলেন ক্লে ১৮৬৮ পর্যন্ত। কিন্তু, বৈচিত্র্যময় তেমন কিছু ঘটেনি। তারপর তিনি বদলি হয়ে যান মানভূম।

১১
উনিশ শতকের সত্তর দশকে গ্রামীণ বাংলা

"জানুয়ারি ১৮৭১ সালে আমি পরিণত হলাম একজন মফস্বলবাসী হিসেবে। আমাকে বদলি করা হলো পদ্মার উত্তরে একটি জেলা সদরে।" লিখেছেন ফ্রানসিস স্ক্রাইন, তারপর বর্ণনা করেছেন সিভিল সার্ভিস সম্পর্কে–

৫৭ বছর আগে উচ্চতর সব নিয়োগ পার্লামেন্টের আইন অনুযায়ী নির্ধারিত ছিল লন্ডনে আনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের জন্য। প্রতি বছর সে পরীক্ষা হতো, ভারতে চাকুরির জন্য তাদের প্রশিক্ষণের পর তারা সেক্রেটারি অব স্টেটের সঙ্গে একটি চুক্তিতে (কভেনান্ট) উপনীত হতো। এর ফলে তারা কোনো ব্যক্তিগত ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারতেন না। এতো অর্থ ব্যয় করে খুব কম ভারতীয়-ই লন্ডনে গিয়ে পরীক্ষা দিতে পারতেন। ১৮৭১ সালে মাত্র একজন [সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর] পাশ করে চাকুরি পেয়েছিলেন। তাঁর দেশবাসীরা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বা সাবঅর্ডিনেট জজের ওপরে উঠতে পারতেন না। তবে, ভারতীয় প্রত্যেক অফিসে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতেন এবং বলা হতো 'সিংহাসনের পেছনে' (সিভিলিয়ান কর্মকর্তা) শক্তি হচ্ছে সামান্য এক কেরানী। এটা খুবই স্বাভাবিক যে উচ্চতর নিয়োগে এ ধরনের মনোপলির বিরুদ্ধে অসন্তোষ ছিল শিক্ষিত ভারতীয়দের। দেশি পত্র-পত্রিকা, ধর্মসভার (প্রতিটি বড় শহরেই ছিল) মাধ্যমে এই ক্ষোভ মৃদুভাবে প্রচারিত হতো। ১৩ বছর পর একজন লে: গভর্ণরের অবিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্তের [জুরির মাধ্যমে বিচার সীমিত করণ; ইলবার্ট আইন] বিরুদ্ধে ক্ষোভের বিস্ফোরণ হলো। এর ফলে জন্ম হলো কংগ্রেস আন্দোলনের। ভারতীয়রা আজ যে ক'টি রাজনৈতিক সুবিধা ভোগ করছে তার প্রতিটির জন্য ঋণী কংগ্রেসের কাছে।

"আমি দেখেছিলাম", লিখেছেন স্ক্রাইন, "সারা বাংলায় ছড়িয়ে আছে অসংখ্য 'সিভিল স্টেশন'। প্রত্যেকটির কর্তা, একজন কভেনেন্টেড সিভিলিয়ানাদের মধ্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও সেশন জজ পরিচিত ছিল 'বড় সাহেব' (বড়া সাহেব) হিসেবে।

তাদের নিচে ছিলেন জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট যার মূল কাজ ছিল বিচার সম্পর্কিত। কভেনেন্টেড হায়ারার্কি সম্পূর্ণ হতো একজন সহকারি ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে যিনি পরিচিত হতেন 'ছোট সাহেব' (ছোটা সাহেব) হিসেবে। ছোট সাহেব বড় সাহেবের অধীনে কাজ শিখতেন। সত্তর দশকের গোড়ার দিকে উচ্চতর পদে অনেকে নিয়োজিত ছিলেন যারা ছিলেন মনোনীত এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কলেজে অদক্ষভাবে প্রশিক্ষিত। অনেক 'হেইলিবারিপাশ' কমিপিটিশনঅলাদের অপছন্দ করতেন। তবে, সামগ্রিকভাবে বলা যায় অধস্তনদের সঙ্গে তারা সদ্ব্যবহারই করতেন। তাদের কেউ কেউ ছিলেন চূড়ান্তভাবে অদক্ষ কিন্তু সমগ্রিক ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের মাধ্যমে বিদ্যমান ছিলো ব্রিটিশ মধ্যশ্রেণীর গুণাবলী। (স্ক্রাইন একে বলেছেন 'স্টারলিং কোয়ালিটি')। অন্যান্য বিভাগের ইউরোপিয় কর্মকর্তাদের একত্রে বলা হতো 'আনকভেনেন্টেড'। এবং তারা তাদের ঈর্ষা প্রকাশ করতো কভেনেন্টদের 'শ্বেত ব্রাহ্মণ' সম্বোধনে। আমার প্রথম স্টেশনের সবাই ছিলেন এ দলে। ছিলেন একজন সিভিল সার্জন দয়া করে যাকে বলা হতো 'গেজেটেড অফিসার।' ছিলেন একজন পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট যিনি ছিলেন তার বিভাগের অধীন। তবে লে. গভর্ণর স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল (১৮৭১-৭৪) তাকে নিয়ে আসেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে। পূর্ত বিভাগের প্রতিনিধি ছিলেন জেলা প্রকৌশলী। যে সব রাস্তার দায়িত্বে তিনি ছিলেন সেগুলির তখন বেহাল অবস্থা, গভর্ণর জেনারেল উইলিয়াম বেন্টিংক (১৮৩৩-৩৬) কংকর দিয়ে সব রাস্তা 'মেটালড' করেছিলেন। সে জন্য তাকে বলা হতো 'William the Kunkeror' চল্লিশ বছর পর কলকাতা থেকে উত্তর ভারত পর্যন্ত তিনি যে রাস্তা তৈরি করেছিলেন তা অকেজো হয়ে পড়েছিলো। তাঁর উত্তরসূরীরা অনুধাবন করেন নি যে একটি দেশের সভ্যতার মাপকাঠি তার রাস্তার অবস্থা। স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল এটি আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করতেন। তিনি স্থানীয় সংস্থাগুলির ওপর ভার দিয়েছিলেন রাস্তা ঠিক রাখার। তারা ভূস্বামীদের ওপর কর (সেস) চাপিয়ে অর্থ আদায় করতেন রাস্তা মেরামতের জন্য।

কোনো সিভিল স্টেশনে কর্তা ব্যক্তি কেউ গেলে এই ভূস্বমীরা তাদের চমৎকার ভাবে আপ্যায়িত করতেন। তবে, এখানেই জাতিগত পারস্পরিক লেনদেন শেষ। তারা যে বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল এর প্রমাণ প্রায় সব সিভিল স্টেশনে (তাদের স্থাপিত) পাবলিক লাইব্রেরি সমূহ।

১৮৫৭ সালের স্মৃতি সত্তর দশকেরও মুছে যায়নি। এই তিক্ত স্মৃতি ইউরোপিয় ও ভারতীয়দের আলাদা করে রেখেছিলো। আমাদের দৈনন্দিন রুটিন ছিল অন্যান্য অঞ্চলের মতোই। ঋতু বুঝে ৬টা বা ৭টায় আমরা উঠতাম তারপর রেসকোর্স ঘোড়া ছোটাতাম। এরপর স্টেশনের স্নানাগারে শরীর জুড়াতাম। সেখানে আগে থেকেই আমাদের ভৃত্যরা কাপড়চোপড় নিয়ে উপস্থিত থাকতো। এ

বিষয়ে একটি কৌতুককর ঘটনা মনে পড়ছে। 'প্র্যাকটিকাল জোক' এখন আর চলে না কিন্তু সত্তর দশকে তা ভালোভাবে চালু ছিল। একদিন আমরা স্নান করছি, আমার এক সহকর্মি তার বৃদ্ধ বেয়ারাকে দেখিয়ে বললো ফিসফিস করে, 'দেখো, তাকে কেমন চমকে দিচ্ছি।' তারপর সে চুপিসারে বৃদ্ধের পিছে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে গভীর পানিতে ঠেলে দিলো। আমরা উচ্ছাহাসিতে ফেটে পড়লাম। বেচারা হাবুডুবু খেয়ে উঠে বললো, 'আমার পকেটে যে সাহেবের ঘড়ি।'

বিকেলে আমরা বাঁধে ঘুরে বেড়াতাম, নদী থেকে শহরকে রক্ষার জন্য এই বাঁধ তৈরি করা হয়েছিলো। ঐ সময় প্রাক্তণ এক বিদ্রোহীর (১৮৫৭ সালের) নেতৃত্বে স্টেশন ব্যান্ড বাজনা বাজাতো। মাঝেমাঝে এই একঘেঁয়েমি কাটতো ক্রকেট পার্টি থাকলে। ১৮৭৪ সালের আগে লন-টেনিস চালু হয়নি। এটি চালু হওয়ার পর ব্যাচেলররা নারী সান্নিধ্য পেতো। ঐ সব দিনে ঝট করে ইংল্যান্ড ভ্রমণ ছিল স্বপ্নের বাইরে। দার্জিলিং যেতে হতো জ্বরো তরাইয়ের মধ্যে পালকি দিয়ে। আমার প্রথম স্টেশনে, ছয়জন মহিলা তাদের স্বামীদের সঙ্গে অসহ্য গরম বা প্রবল বর্ষার যন্ত্রণা সহ্য করতেন।" স্ক্রাইন জানিয়েছেন, সরকারি কর্মকর্তাদের বাইরে যে সব ইউরোপিয় ছিলেন তারা নীল ও সিল্কের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অধিকাংশ নীল কনসার্নের মালিক ছিলেন সম্পদশালী সব ব্রিটিশ কোম্পানি। এরা জোর করে রায়তদের কাঁচা মাল সরবরাহ করতে বাধ্য করতো। এর দাম ছিল উৎপাদন খরচের কম। ওয়ারেন হেস্টিংসের ইমপিচমেন্টের সময় থমাস এরাসকাইন হেস্টিংসের পক্ষে বলতে গিয়ে স্বীকার করেছিলেন, ভারত জয় করা হয়েছে "by the knavery and strength of civilisation."১৮৬৩ সালে বিখ্যাত নীল দাঙ্গার আগে এ ক্ষেত্রে অবস্থা ঐ রকমই ছিল। লং নামে একজন ইউরোপিয়ান নীলদর্পণ নামে একটি প্রচারপত্র লিখেছিলেন যা দাঙ্গায় প্ররোচনা যুগিয়েছিলো [মন্তব্যটি সঠিক নয়, নীলদর্পণ নাটক রচনা করেছিলেন দীনবন্ধু মিত্র এবং তা ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিলো ১৮৬১ সালে] নীল উৎপাদন অর্থনৈতিকভাবে আর লাভজনক করা সম্ভব ছিল না। পূর্ববঙ্গ তখন পাট উৎপাদনে একক আধিপত্য বিস্তার করেছিলো। প্রতিবছর প্রায় ৫৪,০০০,০০০ পাউন্ডের পাট রপ্তানি হতো। নীল ও সিলক প্রতিযোগিতায় মার খেয়ে যায়, কারণ কৃত্রিম বিকল্প তখন আবিস্কৃত হচ্ছিলো। তবে, সত্তর দশকের গোড়ার দিকে সেই বিপর্যয় যে হবে তখনও তা বোঝা যায়নি। ইউরোপিয় নীলকররা ছিল উচ্ছল, আতিথেয়তা ও খেলাধুলায় মত্ত। নববর্ষ এবং ক্রিসমাসে সিভিল স্টেশনে যে উৎসব হতো তার পৃষ্ঠপোষকতা এরাই করতো।

"ছোট সাহেব হিসেবে দু'বছর অসুখী সময় কাটাবার পর নিয়োগ পেলাম এক নীল জেলার মহকুমায়।" জানিয়েছেন স্ক্রাইন। মহকুমার নীলকরদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খারাপ ছিল না তবে প্রশাসনিক বিষয়ে ওপরঅলার কোনো পরামর্শ

তিনি পান নি। ভারতীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর খারাপ ছিলনা। রাণী ভিক্টোরিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে ধনীদের নিমন্ত্রণ জানালেন আর গরীবদের খাবার বিলালেন। একটি ভারতীয় কমিটির সাহায্যে বার্ষিক মেলার পত্তন করলেন যেখানে দূর দূরান্ত থেকে মানুষ ভিড় জমাতো। স্ক্রাইন বাঙালিদের প্রশংসা করে লিখেছেন, এদের নাটকের ক্ষমতা আছে আর তাদের ভাষায় রূপ প্রকাশ করা সম্ভব। এ কারণে তিনি অস্থায়ী মঞ্চ গড়ে দিয়েছিলেন যেখানে অ্যামেচার কোম্পানিগুলি নাটকাভিনয় করতো। স্ক্রাইনের পর্যবেক্ষণ হচ্ছে, গ্রাম জীবনের একঘেঁয়েমিই মামলা-মোকদ্দমা ও গোষ্ঠিগত দ্বন্দ্বের কারণ যা বাঙালিদের কাছে নেশার মতো। লিখেছেন তিনি, "এগুলি হ্রাসের জন্য হিন্দু-মুসলমানরা সহায়তা করেছেন। ঐসব দিনে ধর্মীয় দ্বন্দ্বের কোনো স্থান ছিল না। ওহাবীদের গোঁড়া মতবাদও তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি।"

১৮৭৪ সালে খরা হলে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। বিহারে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। স্ক্রাইন-কে পাঠানো হলো গয়াতে দুর্ভিক্ষ ডিউটি করার জন্য। ঐ ডিউটির পর তাঁকে আবার ফেরৎ আনা হয় পুরনো জায়গায়। সেখানে দেখা দেয় বন্যা। স্ক্রাইন নিজ বুদ্ধিমতে লোকজন নিয়ে বন্যা ঠেকানোর জন্য বাঁধ দিলেন। পূর্ত বিভাগের তা পছন্দ হয়নি। এই বাঁধ পরিদর্শনের জন্য তারা একজন প্রতিনিধি পাঠালো, পাঞ্জাব থেকে বিষন্ন এক প্রকৌশলী এলেন। স্ক্রাইনের সঙ্গে তাঁর বেশ জমে গেলো। বিকেলে তারা বেড়াতে বেরুতেন। একদিন লং জানালেন, সম্প্রতি তার স্ত্রী মারা গেছেন। "এক সপ্তাহ আগে এক সকালে আমার পুরনো বেয়ারা এসে আমাকে জানালো", বললেন লং, "সাহেব, গতকাল আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি, মেমসাহেব আমাকে এসে বললেন, 'সাধু তোমার সাহেবকে বলো তাকে বাংলায় পাঠানো হচ্ছে এবং সেখানে তার সঙ্গে আমার দেখা হবে।' আমার তখন ধারণা ছিল না এরকম প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমাকে বদলি করা হবে। কিন্তু কয়েক ঘন্টার মধ্যে কলকাতার সচিবালয় থেকে বদলির আদেশ পেলাম। সুতরাং সাধুর স্বপ্নের প্রথমাংশ ঠিক হয়েছে। বাকীটার অর্থ কী জানি না।" স্ক্রাইন লিখেছেন, "খানিক খুচরো আলাপের পর ঠিক শেষ মুহূর্তে খবর পেলাম উত্তরে দাঙ্গার আশংকা আছে। সুতরাং আমি যেতে পারলাম না, লং রওয়ানা হয়ে গেলো। পরদিন খবর পেলাম কলেরায় লংয়ের মৃত্যু হয়েছে।"

১৮৭৭ সালে মাদ্রাজেও ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। পূর্ণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্ক্রাইন গভর্নরকে জানালেন, সেখানে তিনি সাহায্য করতে চান। তাঁর পরিবারের সঙ্গে স্ক্রাইনের পরিবারের সম্পর্ক ছিল। এক সপ্তাহের মধ্যে স্ক্রাইনকে দক্ষিণাংশের প্রেসিডেন্সিতে বদলি করা হলো। স্ক্রাইন লিখেছেন, "আমার প্রিয় প্রদেশে ১৮৮১ সালের আগে আর ফিরতে পারিনি।"

১২
ভারতে এক তরুণ ভিক্টোরিয়ান

হুগলি

১ জানুয়ারি, ১৮৭৫

বাংলা সরকারের সচিবের সঙ্গে দেখা করলাম। বললেন, আমাকে যেতে হবে চাঁটগায়। এ ব্যাপারে তিনি আশংকায় ভুগছিলেন কারণ, সুস্বাস্থ্যের অধিকারি পাওয়া দুস্কর। লেফটেনান্ট গভর্ণরের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, চাঁটগায় যেতে আমি ইচ্ছুক নই। গভর্ণর জানিয়েছেন, যিনিই চাঁটগা যাবেন তাকেই প্রমোশনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। সচিব বলছিলেন, একবার চেষ্টা করে দেখতে কারণ, চাঁটগাতো অনেকেই আগে পছন্দ করেছে। জায়গাটি অস্বাস্থ্যকর নয়, তবে জ্বরটর হতে পারে। ভেবে দেখলাম, আপত্তি না করাই ভালো। আর লেফটেন্যান্ট গভর্নরও মেনে নিয়েছেন নয়মাস দুর্ভিক্ষের ডিউটি করার পর ভালো একটি স্টেশনই আমার প্রাপ্য। যতদূর জানি, চট্টগ্রাম ভর্তি ছোট ছোট পাহাড়ে, পাহাড়ের চুঁড়োয় ইউরোপিয়ানদের বাড়ি, জায়গাটি সুন্দর। একজন যিনি দীর্ঘদিন কালেক্টর ছিলেন চট্টগ্রামে, চট্টগ্রাম ছেড়ে কোথাও বদলি হতে চাইতেন না। কারণ, যতসব জায়গায় তিনি ছিলেন, চট্টগ্রাম তার মধ্যে সবচেয়ে ভালো।

চট্টগ্রাম

১৭ জানুয়ারি, ১৮৭৫

এক সপ্তাহ আগে কলকাতা ত্যাগ করেছি। রাত সাড়ে দশটার দিকে জাহাজে উঠে দেখি, আমার টাট্টুটা শুধু ওঠানো হয়েছে, ঘোড়া রয়ে গেছে তীরে। যে ভাবে দড়ি বেধে ছোট নৌকা থেকে ঘোড়া ওঠানো হয় সে ভাবে আমার ঘোড়াটি ওঠানো সম্ভব হয়নি। জাহাজে ছাড়বে ভোরবেলা। তা'হলে কি ঘোড়া ছাড়াই যেতে হবে? ফার্স্ট অফিসার জানালো, ভোর সাড়ে চারটার মধ্যে যদি ঘোড়াটিকে জাহাজের কাছে আনতে পারি তা'হলে তা তোলার ব্যবস্থা করা হবে। ফের জাহাজ থেকে নেমে বড়

একটি নৌকার সন্ধান করতে লাগলাম, যাতে ঘোড়া তাতে নিরাপদে বহন করা যায় ও দড়ি বেধে ওপরে ওঠানো যায়। ১২.৩০ এর দিকে, বেশ দূর থেকে একটি নৌকা যোগাড় করে দিয়ে জাহাজে ওঠে কয়েক ঘণ্টা ঘুমোবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় যদি জাহাজ ছেড়ে দেয় এই আশংকা করছিলাম। অন্যদিকে, জাহাজে কোনো মশারি ছিলো না। ফলে মশার যন্ত্রণায় ঘুমানো অসম্ভব। রাত তিনটার দিকে ফের তীরে নেমে নৌকো করে ঘোড়া এনে জাহাজে ওঠালাম। চট্টগ্রাম যাত্রাটা ছিলো শান্ত, কারণ সমুদ্র ছিল নদীর মতো মসৃণ।

লে. গভর্ণর তাঁর দলবল নিয় চট্টগ্রাম সফরে যাচ্ছিলেন এবং তারা আমার কয়েকঘন্টা আগে চট্টগ্রাম পৌঁছেন। জাহাজ ঘাটে নামার পর আমার টাট্টু আর ঘোড়া নামিয়ে কালকটারের সন্ধানে বেরোলাম। তারা তখন লে. গভর্ণরের সঙ্গে বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শনে বেরিয়েছেন। আমি পৌছে দেখলাম শহরের সবচেয়ে বড় ইংরেজি স্কুলে তারা বক্তৃতা শুনছেন।

এখন চট্টগ্রাম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি। তীর থেকে কয়েক মাইল দূরে, সমুদ্র আর এর মাঝে আছে এক মোহনা যা বেশ নাব্য, এমনকি বড় জাহাজ চলাচলের জন্যেও। জেলাটি বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ এমনকি স্টেশনটিও বন-জঙ্গলে ঢাকা। বর্ষায় এবং গ্রীষ্মে দেখা মেলে প্রচুর চিতার আর পার্বত্য চট্টগ্রামে আছে অসংখ্য বাঘ। মনে হয়, একটি রাইফেল যোগাড় করা দরকার, যদিও হয়তো তা ব্যবহারের দরকার হবে না। ইউরোপিয় বাড়িগুলি পাহাড়ের ওপর এবং প্রতিটি বাড়ি থেকে সমুদ্র আর জাহাজ দেখা যায়। ভারতে যত স্টেশন দেখেছি তার মধ্যে এটিই সবচেয়ে সুন্দর। এখানে আছে তিনটি ক্লাব- একটি বুক ক্লাব, র‍্যাকেট ক্লাব আর ব্যাডমিন্টন ক্লাব, তিনটিতেই আমি যোগ দেবো।

কালেক্টারের বাড়ি
চট্টগ্রাম
২৪ জানুয়ারি, ১৮৭৫

আমি একটি বাংলো ভাড়া নিয়েছি। তবে, বাড়িতে ওঠার আগে বাড়িঅলা তা মেরামত করবে। এতে সপ্তাহ তিনেক লাগবে, এ সময়টা আমি থাকবো কালেক্টারের বাসায়। যে বাসাটি ভাড়া নিয়েছি, অন্যান্য বাড়ির মতো তাও পাহাড় চুঁড়োয়। এতে আছে ছয়টি শোওয়ার ঘর, দু'টি স্নানঘর; বাইরে যা যা থাকার দরকার যেমন, ভাঁড়ার ঘর, রান্নাঘর, আস্তাবল, কোচ-হাউস, ভৃত্যদের থাকার জায়গা- সবই আছে। ভাড়া মাসে ৩৫ রুপি। পৌরকর দিতে হবে আমার আর কমিশনাররা [পৌর] যখন বলবেন তখন জঙ্গল সাফ করতে হবে।

আবহাওয়া বেশ ঠান্ডা, কলকাতার চাইতেও, এখানে আগুন জ্বালার উপায়

নেই কারণ কোনো স্টোভ নেই। নিজের বাসায় গেলে এর বন্দোস্ত করতে হবে। দিনে তাপমাত্রা থাকে ৫৬ থেকে ৬৫-এর মধ্যে। অবশ্য, এ সময় গরম আরো বেশি থাকার কথা কিন্তু গত সপ্তাহে ৬ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়েছে যার ফলে ঠান্ডা পড়েছে।

চট্টগ্রাম

৩১ জানুয়ারি, ১৮৭৫

গত সপ্তাহে আমাকে ম্যাজিস্টেরিয়াল বেঞ্চের সভাপতি করা হয়েছে, সপ্তাহে একদিন এই বেঞ্চ বসে, যার সদস্য সমস্ত দেশি ও ইউরোপিয় অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটবৃন্দ। নিয়ম অনুযায়ী, তারা চুপচাপ বসে থাকে এবং রায়ে তাদের নাম শুধু স্বাক্ষর করে। আমাকে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এর অর্থ আমি দু বছরের জেল ও ৩০০০ টাকা জরিমানা করতে পারবো।

আজ সকালে কয়েকজন বন্ধু সহ মাইল পাঁচেক দূরে কচ্ছপ পুকুর দেখতে গেলাম [বায়েজিদ বোস্তামীর পুকুর] তবে, কোনো কচ্ছপ দেখা দিলো না, ঠান্ডার কারণে, খাবার নিয়ে [খাদেম] অনেক ডাকাডাকির পরও তারা সাড়া দিলো না। গরমের দিনে খাবার নিয়ে ডাক দিলেই তারা ছুটে আসে।

চট্টগ্রাম

৭ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৫

গতকাল এই চিঠিটা আমি পেয়েছি যা অবিকল তুলে দিচ্ছি।

১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৫, কলকাতা

"ডিস্ট্রিকট স্টাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল" প্রস্তুতের জন্য সরকার আমাকে সহায়তা করার জন্য পাঁচজন জুনিয়ার সিভিলিয়ান বাছাই করতে বলেছে। আপনার সঙ্গে আমার আলাপ নেই, তবে আপনার কথা যদ্দুর শুনেছি তাতে মনে হয়েছে এ কাজের জন্য আপনি উপযুক্ত। সে কারণে, লে. গভর্নরের কাছে আপনার নাম পাঠিয়েছি এবং আশাকরি আগামী সপ্তাহে ভারত সরকারের ডিরেকটর জেনারেল অব স্ট্যাটিসটিকসের সহকারি হিসেবে আপনার নামে গেজেট হবে। আমার উচিত ছিলো প্রথমে আপনাকে লিখে সম্মতি জানা কিন্তু সময়ের অভাবে তা করা যায়নি।

আশা করি সোমবার স্টিমারে করে চট্টগ্রামের দিকে রওয়ানা হবো এবং মঙ্গলবার আপনাকে চট্টগ্রাম বিভাগের কাজ কর্ম বুঝিয়ে দেবো। এ কাজটিতে লে. গভর্ণর আগ্রহী এবং তিনি আমাকে বলেছেন, সুষ্ঠুভাবে কাজটি সম্পন্ন হলে যারা এর সঙ্গে যুক্ত তাদের প্রমোশনের ক্ষেত্রে আগ্রাধিকার দেয়া হবে।

আপনার বিশ্বস্ত

ডব্লিউ এম হান্টার

বি. দ্রঃ "আপনার হয়ত মনে আছে এক নৈশভোজে আপনার পাশে বসার সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো।"

চিঠিটি পেয়ে অবশ্যই যারপর নাই সন্তুষ্ট হলাম। আমি এখন বিভাগের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে পারবো এবং বর্ষা বা গ্রীষ্মের সময় কুমিল্লার মতো কোন জায়গায় গিয়ে থাকতে পারবো যা বাংলার সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর জায়গা।

রাঙ্গামাটি

১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৫

ড. হান্টার ১০ তারিখ চট্টগ্রাম পৌছলেন। নতুন বাসায় মাত্র উঠেছি তা সত্বেও তাঁর জন্য আরামদায়ক ব্যবস্থা করা গেছে। আমার কাজের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তিনি বুঝিয়ে দিলেন। বিষয়টি সংক্ষেপে হলো- ভারত সরকারের সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগের মহাপরিচালক ড. হান্টার। তাঁর ওপর দায়িত্ব বর্তেছে বিভিন্ন বিভাগের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিবরণ সংকলনের। বাংলার কাজটি করার জন্য পাঁচজন বেঙ্গল সিভিলিয়ানকে বাছাই করা হয়েছে। ড. হান্টার ইতোমধ্যে সংকলনের খসড়া করে ফেলেছেন। সহকারিদের কাজ হবে, বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে সরেজমিনে পরীক্ষা করে দেখা কিছু বাদ গেছে কিনা।

কাজটি ইন্টারেসটিং। বেতন যা পাবো এখন সহকারি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে যা পাই তার থেকে বেশি। আগামী বারো মাস চট্টগ্রাম বিভাগের পাঁচটি ও পাবনা জেলায় ঘুরে বেড়াতে পারবো, সফরসূচি এমন করবো যাতে বছরের সবচেয়ে খারাপ সময়টা স্বাস্থ্যকর জায়গা যেমন ত্রিপুরায় কাটাতে পারি, বারো মাস গেলে আমার আরো তিন মাসের কাজ থাকবে। সেটা আমি যেখানে খুশি সেখানে থেকে করতে পারি।

ড. হান্টার তাড়াতাড়ি ইংল্যান্ড চলে যাবেন। কারণ, সেখানে দ্রুত ও শস্তায় কাজটির যতটুকু সম্ভব সারা যাবে।

রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম

১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৫

পার্বত্য চট্টগ্রাম পর্বতময়, বন জঙ্গলে আবৃত এবং সবরকমের প্রাণী, বরাহ থেকে হাতি এখানে পাওয়া যাবে। বাঘ আর চিতা অসংখ্য এবং এদের মারতে পারলে পুরস্কারও পাওয়া যায় যথোপযুক্ত। এ জেলার অধিকাংশ মানুষ এমন এক শ্রেণির যাদের বর্ণ নিয়ে কোনো মাথা ব্যাথা নেই এবং তারা সর্বভুক, সাপ থেকে হাতি কিছুতেই অরুচি নেই। তারা উঁচু মাচায় বাসা করে থাকে। বন্য জন্তু ও রাতে মাটি

থেকে ওঠে আসা দুর্গন্ধময় বাতাস এড়াতে।

অধিকাংশ মানুষ এখনও লাঙ্গল দিয়ে চাষের পর্যায়ে পৌঁছেনি। [তারা জুম চাষ করে]। মানুষগুলি সরল, বাঙালিদের থেকে বেশি সহজ ও বিশ্বাসযোগ্য। সভ্যতার ধারণা থেকে এদের রীতিনীতি অনেক দূরে। ডেপুটি কমিশনারের কাছে যে সব নিবেদন/ মামলা আসে তা কৌতুহলোদ্দীপক। কয়েকদিন আগে এক লোক আবেদন করে জানালো, তার বউ তার সঙ্গে থাকতে নারাজ সুতরাং তাকে নিলামে তোলা হোক। বউ হিসেবে তাকে অথবা তার মূল্য পাওয়ার অধিকার তার আছে।

ঘরগুলি বাঁশের তৈরি, আসবাবপত্র, তৈজসপত্র সবকিছু বাঁশের তৈরি। এমনকি আগুন জ্বালায় তারা বাঁশের দু'টুকরো ঘষে যা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম

২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৫

রাঙ্গামাটিতে আছে এখন ১৩টি হাতি। এর মধ্যে দু'টি এখনও পোষ মানেনি [এরপর কী ভাবে হাতি পোষ মানানো হয় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন]।

দি ফ্লেমে বসে

২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৫

ড. হান্টারকে বিদায় জানাবার পর একজন কর্মকর্তা নিয়ে কর্ণফুলি সফরে বেরুলাম। কমিশনারের স্টিমার 'দি ফ্লেম' আমাদের নিয়ে রওয়ানা হলো। রাঙ্গামাটি পৌঁছলাম পরদিন। এরপর কমিশনার একটি দরবার বসালেন একটি পাহাড়ি উপজাতির প্রধানকে রাজা উপাধি দেয়ার জন্য। অনুষ্ঠানটি ছিল সংক্ষিপ্ত। এটি শেষ হওয়ার পর রাজার বাসায় গেলাম দুপুরের খাবার খেতে। পরদিন নদীপথে আরো উজানে গিয়ে কাসালং পৌঁছলাম। সেখানে স্টিমার রেখে নৌকায় উঠলাম কারণ স্টিমারের জন্য গভীরতা কম। বিকেলের দিকে পৌঁছলাম একটি ছোট গ্রামে, নাম ফিচকিচেরি [খুব সম্ভব ফটিকছড়ি]। রাতটা সেখানে কাটালাম। পরদিন দু'মাইল হেঁটে বরকল প্রপাতে পৌঁছলাম। রাঙ্গামাটি আর বরকলের নিসর্গ চমৎকার। বলা হয়ে থাকে, রাইনের নিসর্গের সঙ্গে এর মিল আছে তবে রাইন থেকে এখানকার নিসর্গ সুন্দর বেশি। রাইনের তীর এতো সবুজ আর ঘন নয়।

রাঙ্গামাটি থাকার সময় সুন্দর একটি বাঘের চামড়া দেখলাম। কয়েকদিন আগে দু'টি বাঘের মধ্যে লড়াই হয়। যাকে আমরা রাজা বানিয়েছি তাঁর বাসার কাছেই লড়াইটা হয়। একটি বাঘ অপরটি মেরে ফেলে যখন টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিলো তখন কিছু লোকজন এসে মরা বাঘটিকে উদ্ধার করে।

চট্টগ্রাম

সোমবার, ৮ মার্চ, ১৮৭৫

সন্ধ্যায় ল্যাম্পলাইটে সার্কিট বাংলোতে আমরা ব্যাডমিন্টন খেলি। এই ল্যাম্পলাইটে খেলাটা নতুন। কমিশনার ও তার স্ত্রীর পছন্দ নয়। আমিও দিনে খেলাটা পছন্দ করি। এখানে আমার বাসার সামনেই একমাত্র একখন্ড সমতল জমি আছে যেখানে ব্যাডমিন্টন কোর্ট করা যায়। গত সপ্তাহে এখানে ছোট একটি ব্যাডমিন্টন পার্টি করেছি। খেলার সময় চা-কফি বিলানো হয়। যারা 'পেগ' চান তাদের তাও দেয়া হয়। ব্রান্ডি আর সোডা ওয়াটারের মিশ্রণকে 'পেগ' বলা হয়। পেগ নামটির উদ্ভব একারণে যে একেকটি 'পেগ' খাওয়া মানে নিজের কফিনে একটি করে পেরেক পোতা।

চট্টগ্রাম

১৫ মার্চ, ১৮৭০

একটি বেজি পেয়েছি, বাচ্চা বেজি এখনও পোষ মানে নি, হাতে কামড়ে দিয়েছে।

আমি এখন ফৌজদারি সব কাজকর্ম সেরে সংখ্যাতাত্ত্বিক কাজ নিয়ে বসেছি....

চট্টগ্রাম

২৮ মার্চ, ১৮৭৫

চট্টগ্রামকে যেভাবে চিত্রিত করা হয় দেখলাম তা অতিরঞ্জিত। আর বন্য প্রাণীর কথা যতোটা বলা হয় ততোটা দেখা যায় না।

গত পরশু প্রচন্ড বৃষ্টি হয়েছে। প্রায় ঘন্টাখানেক বজ্রপাতের বিরতি ছিলো না। এপ্রিলের শেষ পর্যন্ত এখানে থাকবো।

স্থানীয় ধনী এক বণিক নাচের আসর বসিয়েছিলেন। সব ইউরোপিয়দের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ...মধুবাণী নাচ থেকে এটি ভালো, কাঁচের ঝাড়বাতিতে ঘরটি সাজানো ছিল। দেয়ালেও বেশ কাঁচের বাতি। সব গুলিতে মোমবাতি জ্বালানো। সারা সন্ধ্যা চা, কফি, ফল-ফলারি দিয়ে আপ্যায়ন করা হলো। আসরে ছিল দু'জন গায়ক ও চারজন নর্তকী। রাত ২টার পর কোনো ইউরোপিয় থাকে নি তবে মনে হয় আসর চলেছে সূর্য ওঠা অব্দি। আমন্ত্রণপত্র ছাপানো হয়েছিলো সোনার অক্ষরে এমনকি প্রত্যেকের নামও আলাদা ভাবে লেখা হয়েছিলো সোনার জলে [কালিতে]।

চট্টগ্রাম

রোববার ৪ এপ্রিল, ১৮৭৫

... সপ্তাহ খানেক আগে পৌরসভা শহরের সব ঠেলাগাড়ির ওপর কর আরোপ

করে। ঠেলাগাড়ি অলারা এতে আপত্তি করে কাজ বন্ধ করে দেয়। অনেকে গাড়ি টুকরো টুকরো করে ফেলে। এতে তাদের যেমন, ইউরোপিয়দেরও তেমন অসুবিধা হচ্ছে। তাদের ওপর কর আরোপ করা যাবে না। কিন্তু এরা সফল হবে না। কর দিতে হবে মাঝে তাদের লোকসানের পরিমাণটা পড়বে, কিন্তু, এরা বেশ স্বচ্ছল এবং নিজেদের স্বাধীনতা প্রদর্শনের জন্য নিজ ক্ষতিতেও পেছপা নয়।

চট্টগ্রাম

রোববার ১১ এপ্রিল, ১৮৭৫

চট্টগ্রাম বিষয়ক আমার সংখ্যাতাত্ত্বিক রিপোর্টের কাজ ভালোভাবেই এগুচ্ছে এবং আশা করি একমাসের মধ্যেই তা প্রেসে দেওয়া যাবে। এটি শুধু সংখ্যাতত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, প্রত্যেকটি বিবরণের সঙ্গে থাকবে জেলার ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়। ফলে, কাজটি কঠিনই বলতে হবে, কারণ আশংকা থেকে যায় কিছু না কিছু বাদ যাওয়ার।

বিদ্রোহের [১৮৫৭] সময় চট্টগ্রামের নেটিভ ইনফেনট্রির তিনটি কোম্পানি ছিল। বিদ্রোহের শুরুতে প্রথম ছয়মাস তারা বিশ্বস্তই ছিল, কিন্তু ১৮ নভেম্বর ১৮৫৭ সালে তারা বিদ্রোহ করে। কোনো ইউরোপিয়কে তারা আক্রমণ করেনি তবে কোষাগার থেকে লুট করে নেয় প্রায় ৩০,০০০ পাউন্ড আর জেল থেকে মুক্ত করে দেয় সবাইকে। এরপর তারা সেপাই লাইন পুড়িয়ে দেয়, আগুন দেয় তোষাখানায় তারপর রওয়ানা হয় উত্তরের দিকে। একরাতে, সবাই যখন বিছানায় তখনই ঘটে এ ঘটনা। তোষাখানায় আগুন লাগার পর মানুষ জন বুঝতে পারে কিছু একটা ঘটেছে। বিদ্রোহীরা চলে যাওয়ার পর আর কিছু ঘটেনি। তবে, আতংক ছিল কিছু দিন যে আতংক ঘটিয়েছিলো বিদ্রোহ।

চট্টগ্রাম

২৫ এপ্রিল, ১৮৭৫

গত বুধবার আমার বেজিটি যমজ বাচ্চা দিলো। মা এবং সন্তানরা আছে ভালোই। মা সন্তানদের নিয়ে ব্যস্ত। বাচ্চাগুলি হাঁটতে পারে না। মা তাদের মুখে করে এখানে সেখানে নিয়ে যায় বিড়ালের মতো।

প্রচন্ড বৃষ্টি হলো ভোরে, ফলে তাপমাত্রা আরো হ্রাস পেলো।

চট্টগ্রাম

বৃহস্পতিবার, ১১ মে ১৮৭৫

বেজির যমজ বাচ্চার একটি মারা গেল। একদিন বেজিটিকে ছেড়ে রেখেছিলাম এ

ভেবে যে, এটি কোথাও যাবে না, কিন্তু তার বোধহয় ছেলে বেলার কথা মনে পড়েছিলো, সে ছিলো মাটির গর্তে, ফলে তার এও মনে হতে পারে, বাচ্চাগুলিকে নিয়ে মাটির গর্তে থাকলে সেগুলি ভালো থাকবে। এ ভেবেই বোধহয় সে একটিকে নিয়ে কাছে এক ইদুরের গর্তে রেখে আসে দ্বিতীয়টিকে নেয়ার জন্য। আমার বেয়ারা ইতোমধ্যেই যে বাক্সে এদের রাখা হয়েছিলো সেখানে একটিকে দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুজি শুরু করে। ইতোমধ্যে মা বেজি ফিরে এলে বেয়ারা অন্য বাচ্চাটি আর তাকে নিতে দেয়নি। বরং তার গলায় সুতলি বেধে তাকে গর্তের কাছে নিয়ে যায় আর অপর বাচ্চাটিকে গর্তের ধারে রেখে দেয়। বেজি প্রায় গভীর গর্তে গিয়ে বাচ্চা নিয়ে আসে। পুরো পরিবারটি আবার একত্রিত করে বাক্সে রাখি। কিন্তু বেয়ারার অসাবধানতায় আঘাত পেয়ে একটি বাচ্চা মারা যায়। অপর বাচ্চাটি নিয়ে মা বেজি পালিয়ে যায় আরেকটি গর্তে। এই গর্তটি পরে আমি খুঁজে বের করে খুঁড়তে থাকি। মা বেজি তখন বাচ্চাটি নিয়ে আসে। এর মধ্যে তার চোখ ফুটেছে, হয়ে উঠেছে তরতাজা। আমার বেজির কারণে চিঠিটা এতো বড় [এখানে সংক্ষিপ্তসার দেয়া হলো] হলো। আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। বাংলোর ধারে কাছে সে কোনো সাপ আসতে দেয় না।

চট্টগ্রাম

২৩ মে, ১৮৭৫

১৯ তারিখ, বৃহস্পতিবার, রাত ন'টায় কক্সবাজারের দিকে রওয়ানা দিলাম। নদীর মোহনায় রাত কাটিয়ে, শুক্রবার সকালে রওয়ানা দিলাম। সকাল ৬টার দিকে কতুবদিয়া ও মূল ভূমির মাঝামাঝি চ্যানেলে পৌঁছলাম। শুক্রবার আর শনিবার রাত কাটিয়ে রোববার ভোর ৫টায় কক্সবাজার পৌঁছলাম। জোয়ারে কুতুবদিয়া অর্ধেক ডুবে থাকে। দ্বীপটিতে শুধু ধান চাষ করা হয়েছে। ফলে যেতে যেতে আরো কিছু দ্বীপ চোখে পড়লো যা কতুবদিয়া থেকেও সুন্দর। তবে, কুতুবদিয়ার মতো লোকবসতি তাতে নেই, ধান চাষও হয়নি তেমন। আমার বিশ্বাস এসব দ্বীপের পাহাড় ও জঙ্গলে আছে বেশ কিছু চিতা ও বাঘ।

চট্টগ্রাম

২৩ মে, ১৮৭৫

কক্সবাজার ভ্রমণ

যেসব জায়গা দেখেছি, কক্সবাজার তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এলাকার বেশ বড় সংখ্যক মানুষ মগ, ধর্মে বৌদ্ধ। এদের চেহারা, চরিত্র, রীতিনীতি দেখে মনে হয়, বাংলার মুসলমান ও হিন্দু থেকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা উচ্চমার্গেরি

(সুপিরিয়র)। নারী পুরুষ উভয়ই স্বাস্থ্যবান, মুখমন্ডল খানিকটা কুৎসিত, চীনাদের মতো কিন্তু মুখের ভাব দেখে তাদের মনোভাব আঁচ করা যায় না বাঙালিদের দেখে যা সম্ভব নয়। মগ নারীরা বাড়ির বাইরে কাজ করে বিশেষ করে রেশম তৈরিতে। তাঁতেও তারা দক্ষ। পরিবারের জন্য যতটুকু করা উচিত তার চেয়ে বেশিই তারা করে। অন্যদিকে পুরুষরা মুখে চুরুট নিয়ে ঘুরে বেড়ায় বেশ একটা স্বাধীনভাব নিয়ে যা বেলা আমোদজনক। নিজেদের বাড়ি ছাড়া, মগদের তিনটি বিশেষ ঘর আছে। একটি মাটি থেক ছ'সাত ফুট উঁচু। তিনদিক বন্ধ সামনের দিক খোলা। এখানে পুরুষরা ধুমপান করে, আড্ডা দেয়। মহিলাদের জন্য এ ঘর নিষিদ্ধ। দ্বিতীয়টি সুইস কটেজের মতো। এখানে বৌদ্ধের মূর্তি রাখা হয়, পুরোহিতরা এখানে শুধু পূজোই করে না বাচ্চাদের পড়ালেখাও শেখায়।

তৃতীয়টি, পাহাড়ে, পাথর খুদে করা সেখানে রাখা আছে শুধু বুদ্ধের মূর্তি। এ তিন ধরনের স্থাপনা ডজনে ডজনে দেখা যাবে কক্সবাজারে। তিনচারটি পরিবার মিলেই একটি 'লাউঞ্জ হাউস' [প্রথমটি] করে নেয়। তারা রঙ্গিন স্কার্ট পড়ে যা দেখতে ছবির মতো। ভ্রমণকারিদের জন্য তারা খুবই অতিথিপরায়ণ। প্রতিটি মগ গ্রামে একটি শেডের নিচে বড় এক মটকায় পানি রাখা থাকে, আর থাকে একটি কাপ। যাতে ভ্রমণকারি এখান থেকে পানি খেতে পারে। প্রতিদিন সকালে মেয়েরা মটকাটি পানি দিয়ে ভরে দেয়।

[এরপর বেজি নিয়ে দীর্ঘ বর্ণনা] বেজির অপর বাচ্চাটিও মারা যায় বেজি মা গলার সুতলিতে পেঁচিয়ে। কিশ্চ মাকে, বাচ্চাটি নিয়ে যেতে দিলেন। তার বাক্সে সে বাচ্চাটিকে নিয়ে গেলো। ভোরে দেখা গেল বাচ্চাটিকে সে খেয়ে ফেলেছে। কিশ্চ লিখেছেন, এ থেকে অভিজ্ঞা হলো, এদের বেধে রাখতে নেই। খাঁচায় পুরে রাখাই ভালো।

কক্সবাজার থেকে ফিরে কয়েক জোড়া সবুজ টিয়ার বাচ্চা কিনলাম। [১ জুন থেকে ১৬ জুন ১৮৭৫ পর্যন্ত ৪টি চিঠি আছে পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে যার তিনটি লেখা রাঙ্গামাটি থেকে। এখানে পার্বত্য অধিবাসীদের জীবন রীতি ও জুম চাষের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন যার খানিকটা পুনরাবৃত্তি। এ ছাড়া পরবর্তিতে বিমসের বিবরণেও বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে দেখে এখানে আর তা পুনরুল্লেখ করলাম না।]

কুমিল্লা, ত্রিপুরা

শনিবার, ৩ জুলাই, ১৮৭৫

কুমিল্লা, আমি যেখানে আছি, সুন্দর একটি স্টেশন যার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত একটি নদী গোমতী। জায়গাটি নিচু কিন্তু স্বাস্থ্যকর। বলা হয়ে থাকে এখানে অসুখে

পড়া মুশকিল। আমার নিজেরও বেশ তাজা লাগছে।

সন্দেহ নেই যে চট্টগ্রাম খুব একটা স্বাস্থ্যকর নয়। কিন্তু মানুষদের সেখানে পাঠানো দরকার। প্রতিবছর এর গুরুত্ব বাড়ছে। এবং চট্টগ্রাম বন্দর ভারতের মধ্যে সবচেয়ে ভালো।....

২৪ তারিখ সকালে আমি সীতাকুন্ডের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম ত্যাগ করি। আমার দু'বন্ধু আমাকে দু'টি টাট্টু দিয়েছিলো, আর আমার ছিল দু'টি। ফলে, ৪টির সাহায্যে খুব কম সময়ে আমি ২৪ মাইল পাড়ি দিই। ২৪ মাইলের মধ্যে ১৮ মাইল পাড়ি দিয়েছি প্রবল বষ্টির মধ্যে। সীতাকুন্ডে একটি বাংলো আছে। চার্জে আছে একজন যে কোনোরকমে রাঁধতে পারে। আমি সেখানে বাকি দিন আর রাতটা আরামেই কাটালাম। পরদিনও প্রবল বৃষ্টি কিন্তু তা উপেক্ষা করে ১৮ মাইল পাড়ি দিয়ে পৌঁছলাম দিওয়ানগঞ্জ, সেখানকার বাংলোতে বেয়ারাসহ জিনিষপত্র আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। পরদিন রওয়ানা হয়ে বেয়ারাকে বরখাস্ত করলাম কারণ ব্যাটা একটা রাস্কেল বিশেষ। পৌঁছলাম বৈদ্য বাজারের বাংলোয়। চমৎকার এক পুকুরের পাশে বাংলো। পুকুরে স্নান সেরে নাস্তা করলাম। অপরাহ্নে আবার ১২ মাইল ঘোড়ায় চড়ে পৌঁছলাম জয়করণ, সেখানে রাত কাটালাম। আমি পৌঁছার চার ঘন্টা পর আমার মালপত্র সহ গরুর গাড়ি এলো। পরদিন বাকি ১০ মাইল পেরিয়ে সকাল ৭টায় কুমিল্লা পৌঁছলাম। এ পথ পেরুতে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত সময় লেগেছে। ঘোড়া হাঁকিয়ে সোজা গেলাম সার্কিট হাউসে। সেখানে জায়গা পেতে অসুবিধা হলো না। আরো দু'জন ব্যাচেলর সেখানে ছিল। কুমিল্লায় বাসা পাওয়া ঝামেলা। সুতরাং, ঐ ঝামেলায় না গিয়ে এখানে থাকাই ভালো।

এখানে প্রায় পোয়া মাইল দীর্ঘ প্রকান্ড এক দিঘী আছে। এর পাড়ে একটি স্নানঘর বানানো হয়েছে। প্রতিদিন সকালে স্টেশনের পুরুষরা যায় সেখানে স্নান করতে। এর পানি পরিষ্কার, এখানে একটি অসুবিধা তা'হলো ঘোড়ার গলায় একটা রোগ হয় এবং ৬ ঘন্টার মধ্যেই তা মারা যায়। এক জনের পুরো আস্তাবল এই রোগে এক রাতে শেষ হয়ে যায়।

কুমিল্লা

১০ জুলাই, ১৮৭৫

[পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে খানিকটা স্মৃতিচারণ], কুমিল্লার স্টেশন জীবন চমৎকার, সারাদিন কাটানোর জন্য অনেক কিছু করার আছে। আমার তেমন বিশেষ কিছু করার না থাকলে বন্ধুদের সঙ্গে সকাল ৬ থেকে ৭.৩০ পর্যন্ত ঘোড়া ছোটাই। ৯ টার দিকে স্টেশনের সবাই যায় সেই দিঘীতে স্নান করতে। স্নানের পর প্রাতরাশ

সেরে যে যার অফিসে যাই। অফিস থেকে ফিরে টেনিস খেলতে যেতে পারি, অথবা হাঁটতে যেতে পারি, দিঘীতে নৌকা বিহারেও যাওয়া যায়।...

কুমিল্লা, ত্রিপুরা

১৭ জুলাই, ১৮৭৫

আমার শোবার ঘরে একটি বাক্স। বাক্সের ওপর খবরের কাগজ। তারপর ছিল একটি বই। গতকাল তা নামাতে গিয়ে একটি সাপ বেরুলো। ১০-১২ ইঞ্চি লম্বা। আমি প্রথমে তা দেখিনি, আমার খিদমতগারের নজরে পড়ে তা, তারা জানালো এটি বিষাক্ত। কুমিল্লায় সাপের সংখ্যা কম। কিন্তু শোওয়ার ঘরে সাপ নিয়ে বসবাস নয়।

চট্টগ্রাম থেকে আমার বেজিটি আনতে পারিনি। সে বাসার সামনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু ধরা দেয় না। গত রাতে ৬ সপ্তাহের বয়সের একটি বেজি যোগাড় করলাম। মনে হয় এটি তাড়াতাড়ি পোষ মানবে। স্নানঘরে তার থাকার ব্যবস্থা হলো।

কুমিল্লা

২৪ জুলাই, ১৮৭৫

আমার সংগ্রহে এখন এক ডজন পাখি। এর মধ্যে আটটি লাভবার্ড, বাকিগুলি লরিকিটস (lorrikeet)। আটটি লাভ বার্ড এক খাঁচায়। এখানে পাখি খুব শস্তা। প্রতিটি কিনেছি ৪ আনা করে। পাখি অলা নিশ্চয় কিনেছে ১ আনা করে। পার্বত্য ত্রিপুরা থেকে পাখি আনা হয় বিক্রির জন্য। কলকাতায়ও বোধহয় বেশ বড় চালান যায় এখান থেকে।

কুমিল্লা

৩১ জুলাই ১৮৭৫

আমার কাছে এখন আছে একটি পুরুষ ও একটি মেয়ে বেজি। দু'টিই বেশ পোষ মানা, এখন আর ধারে কাছে কোনো সাপ আসবেনা।

কুমিল্লা, ত্রিপুরা

৭ আগস্ট, ১৮৭৫

গত কয়েক দিন প্রচণ্ড বৃষ্টি। গত ১০-১২ বছরে নাকি এমন বৃষ্টি হয়েনি। নদীর পানি বাড়ছে, বাঁধেও নাকি ফাটল ধরেছে [এরপর বাঁধে গর্ত হওয়া ও তা মেরামত বিষয়ে দীর্ঘ অনাকর্ষণীয় বর্ণনা]।

কুমিল্লা

১৪ আগস্ট, ১৮৭৫

পার্বত্য চট্টগ্রামে যাদের পোস্টিং তারা সেখানে গেলে স্থানীয়দের মতো খাওয়া দাওয়া ও পোষাক পড়া শুরু করে। এতে সুবিধা আছে। কারণ এই জঙ্গলময় এলাকায় লটবহর নিয়ে চলাচল করা মুশকিল। দ্বিতীয়তঃ দেশিয়রা ইংরেজদের পছন্দ করে না কারণ তাদের সঙ্গে কোনো কিছুর মিল নেই। হিন্দু বা মুসলমানদের সঙ্গে আমরা মিলতে পারি না বর্ণগত, ধর্মগত ও মহিলা সম্পর্কিত ধারণার জন্য। পার্বত্য এলাকায় সে সবের বালাই নেই। ফলে তাদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এক সঙ্গে বসে একই রকম খাবার খেতে না পারলে পরস্পর মন খুলে কথা বলে না।

কুমিল্লা

২১ আগস্ট, ১৮৭৫

গত সপ্তাহ ছিল শুকনো ও গরম কিন্তু গ্রামাঞ্চলে পানি এখনও নামে নি। নোয়াখালির একটি উঁচু জায়গায় ২০০ গরু আশ্রয় নিয়েছিলো। স্রোতের কারণে সেখানে কারো পৌছা সম্ভব হয় নি, ফলে, গরুবাছুর না খেয়েই মারা গেছে।

ঢাকা থেকে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এসেছেন এবং সব দেখেটেখে বলেছেন, শীতের আগে বাঁধ মেরামত সম্ভব নয়। নদীর যে নতুন চ্যানেলটির সৃষ্টি হয়েছে তা আগেরটির মতোই গভীর।

[২৮ আগস্ট থেকে ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কয়েকটি চিঠি আছে সাপুড়ে, সাপ-বেজির লড়াই ইত্যাদি নিয়ে]

কুমিল্লা

১৭ অক্টোবর, ১৮৭৫

গতকাল ছিল দুর্গাপুজার বিসর্জনের দিন। বিকেলে আমরা সবাই গেলাম নদী তীরে। বারোটির মতো মূর্তি এনে উঁচু একটি প্লাট ফর্মে রাখা হলো। এর পেছনে সারি বেধে দাঁড়িয়ে ২০ থেকে ৪০ টি হাতি। নদীর দু'তীর লোকে ভর্তি। আতশবাজি পোড়ানো হলো। তারপর মূর্তিগুলিকে ভাসিয়ে দেয়া হলো।

কুমিল্লা

৩১ অক্টোবর, ১৮৭৫

নভেম্বরের ৮ তারিখ জজের সঙ্গে নোয়াখালি যাবো। প্রথম ১৭ মাইল যাবো ঘোড়ায় চড়ে। ১৭ মাইল দূরে লাকসামে গেলে তারপর দেশি নৌকায় চড়ে যাবো

বেগমগঞ্জ যা লাকসাম থেকে ২১ মাইল দূরে। সেখানকে ১০ মাইল ঘোড়ায় চড়ে পৌঁছবো নোয়াখালি।

আগামীকাল যাবো উদয়পুর, পুরনো পার্বত্য ত্রিপুরার রাজধানী, একসময় তা ছিল পূর্ববঙ্গের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। উদয়পুরও গোমতীর তীরে, উজানে, নৌকায় পৌঁছতে লাগবে দুইদিন। রাজা সেখানে আমাকে ৪টি হাতি পাঠাবেন যাতে পুরনো শক্তিশালী ঐ রাজ্যের প্রত্ন নিদর্শন ঘুরেফিরে দেখতে পারি। সেখানে এক মন্দির এখন তীর্থ স্থানের মতো। আমি উদয়পুর যাবো কাজে, আমার এক বন্ধু সঙ্গ দিতে যাবে আমার সঙ্গে। ভাগ্য ভালো হলে হরিণের সন্ধান পেতে পারি সেখানে শিকারের জন্য।

গত সপ্তাহে ছোট একটি 'হগ-ডিয়ার' কিনেছি, কয়েকদিনের বাচ্চা এখনও খেতে শেখেনি। তবে, দুধ খেতে পারে, মনে হয় বেঁচে যাবে এগুলি, সহজে পোষা যাবে। মারা গেলে চামড়া রেখে স্টাফ করে দেশে পাঠাবো।

খাঁচা খুলে দিয়েছি। কিছু পাখি বিলিয়ে দিয়েছি, কিছু উড়ে গেছে, তবে নোয়াখালি নিয়ে যাচ্ছি সাতটি টিয়ে, ১টি শ্যামা, হরিণ শাবক আর বেজি।

কুমিল্লা, ত্রিপুরা

৩১ অক্টোবর, ১৮৭৫

আমার বেজির সংখ্যা এখন ৪টি তবে এর মধ্যে ১টি ভালোভাবে পোষ মেনছে। আঙ্গিনাতেই ঘুরে বেড়ায়। আমার খাবার সময় ছুটে আসে আমার কাছে, হাত থেকে মাছ বা মাংসের টুকরো নিয়ে ছুটে যায়। [এরপর বেজি ও সাপের বিষ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা]।

কুমিল্লা

৭ নভেম্বর ১৮৭৫

সোমবার সকালে উদয়পুরের দিকে রওয়ানা দিলাম। ৬ মাইল দূরে বিবির হাট গেলাম ঘোড়ায় চড়ে। সোখানে রসদ-পাতি সহ দেখলাম তিনটি নৌকা আপেক্ষা করছে। একটি নৌকা ভৃত্য ও রান্নার জন্য, বাকি দুইটি আমার আর ডব্লিউর জন্য। আমরা আলাদা নৌকায় ঘুমোই তবে, একটিকে ব্যবহার করছি খাবার জন্য, আরেকটি বসার জন্য। প্রতি নৌকায় ৩ জন মাল্লা। তাতদিন লগি টেনে বুধবার রাত ১১টায় পৌঁছে গেলো নতুন উদয়পুর। বৃহস্পতিবার সকালে গোমতীর উজান বেয়ে পুরনো উদয়পুরে পৌছলাম যা এখন প্রায় পরিত্যাক্ত। একসময় তা ছিল ত্রিপুরার রাজার রাজমহল। কয়েকশো বছর হয়ে গেলো উদয়পুর প্রসাদ পরিত্যাক্ত কিন্তু এখনও তা মজবুত, এর আশেপাশের অনেক অট্টালিকা দেখলে মনে হবে

গতকাল তা নির্মিত হয়েছে। অনেকগুলির দেয়াল ৩ ফুট থেকে ১০ ফুট পর্যন্ত পুরু। একটি অট্টালিকার সামনে প্রায় আটফুট ইউরোপে তৈরি একটি কামান পড়ে আছে। কামানটি কীভাবে এখানে এলো তা কেউ বলতে পারলো না....

শুক্রবার সকাল ৫টায় কুমিল্লা পৌঁছলাম। গতকাল এখানে শেষ টেনিস গেমটি খেললাম। আগামীকাল ভোরে রওয়ানা হবো। ...কুমিল্লা ছাড়তে খারাপই লাগছে, জায়গাটা আমি ভারি পছন্দ করেছিলাম।

নোয়াখালি

১৪ নভেম্বর, ১৮৭৫

লাকসাম পৌঁছে দেখলাম নৌকা অপেক্ষা করছে। ছোট ডিঙ্গি নৌকা, একটি গাছ কেটে তৈরি, মাথার উপর খড়ের ছাউনি। সরু হলেও নৌকাটা আরামদায়ক, কারণ তা গভীর, চেয়ার পেতে আরামে বসা যায়। রাতদিন হয় লগি দিয়ে অথবা গুণ টেনে নৌকা নিয়ে যাওয়া হলো। সারাটা পথ নৌকায়ই গেলাম। শেষ ১০ মাইল আর ঘোড়ায় চড়িনি।

নোয়াখালি ধানের জন্য বিখ্যাত। আশেপাশে গ্রাম ছাড়া যেদিকে তাকাই সমতলে খালি ধানক্ষেত। আছে চমৎকার কিছু বৃক্ষ, জায়গাটা সুন্দরও বটে। তবে স্টেশনটি খুব প্রাণবন্ত এমন বলা যায় না। তবে এল কয়েকদিন থাকবেন ফলে সে কয়দিন ভালোবাবে টেনিস খেলা যাবে।

নোয়াখালি

২১ নভেম্বর, ১৮৭৫

রাস্তাগুলি ঘোড়া দৌড়াবার জন্য চমৎকার। সব ঘাসে ছাওয়া।

দিন দুয়েক আগে একটি ভোঁদর শাবক কিনেছি। যদি বেঁচে থাকে তবে তা মাছ ধরতে পারবে। আপার ইন্ডিয়ায় অনেকে (জেলেরাও) ভোঁদড় পালে মাছ ধরার জন্য। পানিতে নেমে মাছ ধরে তীরে মনিবকে পৌঁছে দেয় পোষা ভোঁদড়। সহজেই এদের পোষ মানোনো যায় আর খুব বিশ্বাসীও।

হরিণশাবকটিও দ্রুত বাড়ছে। বেশ শান্ত, ছেড়েই রাখা হয় তাকে, আমার এক ভৃত্য আজ বড়সড় এক lizard ধরলো। আমি এটাকে কিছুদিন রাখবো এর অভ্যাস পর্যবেক্ষণের জন্য। নাক থেকে লেজ পর্যন্ত এটি লম্বায় সাড়ে তিন ফুট।

নোয়াখালি

১৯ ডিসেম্বর, ১৮৭৫

[আগের দু'টি চিঠি সুয়েজক্যানাল ও আসন্ন দরবার নিয়ে]

অবাক কান্ড, সকালে নাস্তার টেবিলে আমন্ত্রণপত্র পেলাম দরবারে [পাটনার বাঁকিপুরে] যোগ দেয়ার। জানি না কোন নীতিতে আমন্ত্রণ দেয়া ঠিক হয়েছে। যে রীতি নীতিতেই হোক আমার আমন্ত্রণ পাওয়ার কথা নয়, সুতরাং, তা পেয়ে আমি আনন্দিতই।

২৩ তারিখ কুমিল্লার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবো, আমার হেড বেয়ারা জিনিষপত্র নিয়ে পাবনা চলে যাবে। এ জন্য নৌকা ভাড়া করেছি। ৮ দিনে এই দূরত্ব পার হবে। নৌকোটি ২২ টনের, মালিক আর সারেং ছাড়াও আছে ৮ জন মাল্লা। আমার জুনিয়র বেয়ারা আমার সঙ্গে যাবে কলকাতা।

কলকাতা

বুহস্পতিবার, ৬ জানুয়ারি ১৮৭৬

২৭ ডিসেম্বর, সোমবার, কুমিল্লা ছাড়ার আগে এক পিকনিক পার্টিতে যোগ দিলাম। আমরা ২৩ জন টিফিন খেলাম। টিফিনের পর টেনিস ও ব্যাডমিন্টন খেলা হলো। ৪ টার দিকে আমি রওয়ানা হলাম দান কান্দির [দাউদকান্দি?] দিকে। ৩২ মাইল পথ, ঘোড়ায় চড়ে ৩ ঘন্টায় পৌঁছলাম।

পৌঁছে দেখলাম ঘোড়া নেওয়ার জন্য ও আমার জন্য নৌকা অপেক্ষা করছে। ঢাকায় আগেই খবর পাঠিয়েছিলাম নৌকার জন্য। তখনও আমার ঘোড়া আর সহিস এসে পৌঁছেনি। তারা এলেই যেন রওয়ানা হয় এমন নির্দেশ দিয়ে নিজের নৌকায় ফিরে শুয়ে পড়লাম। একজন হাল ধরেছিলো , বাকি পাঁচজন ছিলো। সারারাত নৌকা চালিয়ে ৫.৩০ এর দিকে মেঘনা অতিক্রম করে নারায়ণগঞ্জ পৌঁছলাম। একটি ঠিকাগাড়ি করে ঢাকা রওয়ানা হলাম, নির্দেশ দিয়ে গেলাম, ঘোড়াসহ সহিস যেনো অপেক্ষা করে, কারণ, ভোররাতে স্টিমার ছাড়বে নারায়ণগঞ্জ থেকে। ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ পৌঁছে দেখি, পুলিশ সহিসকে ভুল নির্দেশ দিয়েছে। সে ঘোড়াসহ ঢাকা চলে গেছে। আবার ছুটলাম ঢাকার দিকে, শহরে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করে পেলাম না। পুলিশকে নির্দেশ দিয়ে এলাম ঘোড়াসহ সহিসকে পেলে যেনো বলে সোজা পাবনা চলে যেতে। কলকাতা পৌঁছে ঢাকার কোর্ট ইন্সপেক্টরের চিঠি পেয়ে নিশ্চিত হলাম। সে জানিয়েছে, সহিস ও ঘোড়া পাওয়া গেছে এবং তারা পাবনা রওয়ানা হয়ে গেছে। আমি ভয় পাচ্ছিলাম, ঘোড়াসহ সহিস না পালিয়ে যায়। কারণ, পুলিশ খোঁজ খবর করলে সাধারণত এমনটি হয়।

৩০ তারিখ ভোরে স্টিমার নারায়ণগঞ্জ থেকে রওয়ানা হলো, গোয়ালন্দ পৌঁছলাম ৩ তারিখ ৩ টার দিকে। বিকেলে ট্রেনে রওয়ানা হলাম কলকাতা।

[কলকাতা থেকে বিহারের বাঁকিপুর পৌঁছান দরবারের জন্য। প্রিন্স অব

ওয়েলসের আগমন উপলক্ষে দরবার বসেছিলো। বিহারের দুর্ভিক্ষে যে সব অফিসার কাজ করেছিলেন তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো, সে সূত্রেই কিশ্চ নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন কারণ বিহারে দুর্ভিক্ষের সময় তিনি কাজ করে ছিলেন।]

পাবনা

১৩ জানুয়ারি, ১৮৭৬

... ৭ তারিখ কলকাতা ছাড়লাম কুষ্টিয়ার উদ্দেশ্যে। পাবনার সবচেয়ে কাছের রেল স্টেশন কুষ্টিয়া। এখান থেকে ১০ মাইল যেতে হবে। ৭ মাইল গেলাম নৌকায়। নৌকো খুব ধীরে চলছিলো, ফলে ৮ তারিখ সকাল ৬টায় পৌঁছলাম, এখানে আমার ঘোড়া টোড়া সব পেলাম। নোয়াখালি থেকে আমার জিনিষপত্রসহ নৌকো এসেছে আগের দিন। ১৪ দিন লেগেছে। আমি আছি এখন পাবনা সার্কিট হাউসে।

পাবনা

১৩ জানুয়ারি, ১৮৭৬

আমি সম্বর শাবক আর একটি বেজি নিয়ে এলাম।....

পাবনা

৯ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬

বেশ শীত পড়েছে। পাবনায় একটি অসুবিধা হলো গরুর গোস্ত পাওয়া যায়না। মুরগি আর খাসিতে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। শেষোক্তটিও পাওয়া যায় সপ্তাহে একদিন। ভারতে মুরগি খেতে খেতে ক্লান্ত হয়ে যেতে হয়। এই একটি জিনিষই সবখানে পাওয়া যায়। সাধারণ একটি অ্যাংলোইন্ডিয়ান বাড়িতে দিনে ৫ থেকে ১০টি মুরগি লাগে। আমরা যে দু'জন এখানে বাস করছি তাদের খাদ্য তালিকা এরকম- ১০টায় নাস্তা-মাছ, ঝালমুরগির তরকারি, মুরগির কোল্ড ডিশ; ৭টায় নৈশভোজ মুরগির স্যুপ, মুরগির তরকারি, মুরগির রোস্ট। এখন তরকারির মরশুম। সামান্য পয়সায় পাওয়া যায় মটরশুটি, টমেটো, আলু, লেটুস, গাজর, শালগম ইত্যাদি।

পাবনা

১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬

১২ মাইল দূরে এক বিলে গেলাম আমরা। ভোর ৫ টায় রওয়ানা হয়ে সারাদিন স্নাইপ আর সোনালী প্লভার শিকার করেছি। বিলের কাছে খুব ভালোভাবে প্রাতরাশ সারলাম। সন্ধ্যার আগে ফিরেছি। দেশি পাচকদের বড় গুণ হলো, তারা যে কোনো সময়, স্বল্প নোটিশে চমৎকার রান্না করতে পারে। আমরা ১৭টি স্নাইপও ২১টি

সোনালী প্লভার পেয়েছিলাম ফলে স্টেশনের সবাইকে কিছু না কিছু পাঠাতে পেরেছিলাম।

গত বৃহস্পতিবার এক পর্তুগীজ যাদুকর এসে খেলা দেখালো।...

পাবনা

২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৬

গোয়ালন্দ গিয়েছিলাম ড. হান্টারের সঙ্গে দেখা করতে। প্রাতরাশ সেরে ঘোড়ায় চড়ে পৌঁছলাম কুমারখালি। নৌকা করে ঘোড়াসহ পদ্মা পেরুলাম। কুমারখালি থেকে ট্রেনে করে গোয়ালন্দ। কলকাতা আসাম চলাচলের কেন্দ্রও গোয়ালন্দ। আসামের সব চা বাগানের শ্রমিক যায় নিম্ন বঙ্গ থেকে। বিভিন্ন জায়গা থেকে শ্রমিক এনে এজেন্টরা জড়ো করে কলকাতায় তারপর রেল আর স্টিমারে করে পাঠানো হয় আসামে। এইসব ইমিগ্রান্টদের ব্যাপারে সরকার খুব কড়া। যে সব স্টিমারে কুলি (শ্রমিক) নেয়া হয় সেগুলি প্রতিটি বন্দরে চেক করা হয়। কলকাতা থেকে রওয়ানা হওয়ার আগে প্রত্যেক কুলির রেজিস্ট্রেশন হয় এবং এজেন্টকে তাদের জামা কাপড় সব সরবরাহ করতে হয়। এমিগ্রেশনের সময় প্রতি সপ্তাহে বাংলা থেকে হাজার হাজার কুলি যায় আসাম। নদীতীরে লালজামা পড়ে পুরুষ, নারী, শিশুরা বসে আছে স্টিমারের জন্য যা তাদের নিয়ে যাবে এমন এক জায়গায় যে জায়গা সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না।

পাবনা

১৫ মার্চ, ১৮৭৬

তাঁতিবন্দ বিলে একাই গেলাম শিকার করতে। ৩৪ মাইল ঘোড়া ছুটিয়েছি এবং বলতে পারি আমার শিকারের ঐটে ছিল সেরা দিন। ৩৫টি teal মেরেছি। ফলে স্টেশনের সব ইউরোপিয়ান এবং আমার প্রতিটি ভৃত্যকে একটি করে দিতে পেরেছি। আপনারা হয়ত জানতে চাইবেন শিকারের আয়োজনটা কীভাবে করা হয়। আগের দিন সন্ধ্যায় এক কুলির মাথায় বন্দুকগুলি ও খাবার পাঠিয়ে দিই ১৭ মাইল দূরে তাঁতিবন্দে। খাবারের মধ্যে থাকে তিনটি সেদ্ধ ডিম, তিন টুকরো টোবট, এক বোতল ঠান্ডা চা এবং যদি দরকার হয় সে কারণে একটি ব্রান্ডি ফ্লাস্ক। কুলি রোববার পর্যন্ত আমার সঙ্গে থেকে ফেরত আসবে। তাকে দিতে হবে ৪ আনা। এ ছাড়া খাওয়ার জন্য ১ আনা ও একটি শিকার (পাখি)। কুলির সঙ্গে যায় একজন ঘেসোরে, ঘোড়ার ঘাস কাটার জন্য। একই সঙ্গে একটি ঘোড়া সহ এক সহিস পাঠিয়ে দিই। অর্ধেক রাস্তায় সে দু'টি ঘোড়ার খাবার সহ অপেক্ষা করে। রোববার সকালে উঠে রওয়ানা হই। অর্ধেক রাস্তায় ঘোড়া বদল করি। তাঁতিবন্দ

পৌঁছে দেখি জিনিষপত্রসহ কুলি অপেক্ষা করছে। আমি শুধু নৌকোয় উঠে বসি আর পাখি দেখলে গুলি ছুড়ি। যা আপনাকে আশ্চার্য করবে তা'হলে নেটিভদের হাঁটার ক্ষমতা। মোটামুটি বোঝা নিয়ে দিনে রাতে ৩০/৪০ মাইল তারা হেঁটে যেতে পারে। তবে, রাতে একা কেউ ভূতের ভয়ে হাঁটবে না।

পাবনা

২৮ মার্চ, ১৮৭৬

[আগের (২২মার্চ) চিঠিটি বেজি ও হরিণ শাবকের কর্মকান্ড নিয়ে] গতকাল ড. হান্টার চলে গেলেন। দু'দিন আগে বোম্বের তারিখে তাঁর একটি চিঠি পেয়েছি তা উদ্ধৃত করছি অবিকল–

"I am asking the Lt.Governor to give you a Behar sub-Division or one in the healthy disticts of Western Bengal after your long and trying work in the damp and feverish East. Will you favour me by a copy of your photograph. I should value it highly. You have worked well...."

পাবনা

১৩ এপ্রিল, ১৮৭৬

.... গেজেটটি মাত্র পেলাম। আমাকে মানভূমের সহকারি কমিশনার করা হয়েছে। ছোট নাগপুরে মানভূম একটি নন-রেগুলেশন জেলা। আবহাওয়া চমৎকার। এই নিয়োগ প্রমোশন। খুব সম্ভব সোমবার রওয়ানা হবো।

১৩
ভারতীয় এক জেলা অফিসারের ছোট পৃথিবী

সাড়ে তিনবছর সদর দফতরে কাজ করার পর, কার্সটয়ার্সের পালা এলো মহকুমা যাওয়ার। সাল তখন ১৮৭৮।

সদর থেকে জেলার অনেক এলাকা দেখভালের প্রয়োজনীয়তা থেকেই মহকুমা সৃষ্টি করা হয় যার দায়িত্বে থাকেন মহকুমা অফিসার [এসডিও]। কার্সটায়ার্স যখন ত্রিপুরায় ছিলেন তখন উত্তরে একটি মহকুমা করা হয়েছিলো। এর কারণ ছিলো হয়তো, ত্রিপুরার রাজধানী অগরতলা যাওয়ার পথে তা পড়ে। দক্ষিণেও সৃষ্টি করা হয়েছে দু'টি মহকুমা। একটির কারণ ধূর্ত এক জমিদারকে তাবে রাখা, অন্যটির কারণ, দুরন্ত [জমিদারের অত্যাচার যারা মানতে রাজি নয়] কৃষকদের শাসনে রাখা।

কার্সটায়ার্সকে ১৮৭৮ সালের বসন্তে ত্রিপুরা থেকে ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ মহকুমায় এস ডিও করে পাঠানো হলো। ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে ইতোমধ্যে চলাচল শুরু করেছে। গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র যেখানে মিলেছে সেটিই গোয়ালন্দ এবং রেলওয়ের কারণে সেখানে একটি টার্মিনাস নির্মাণ করা হয়েছে। কলকাতা থেকে ১৫০ মাইল দূরে গোয়ালন্দ। এই দুই নদীর প্রবাহ তারপর বয়ে যায় ১০০ মাইল নিচে চাঁদপুর দিয়ে। ত্রিপুরার কাছাকাছি জায়গা চাঁদপুর।

কার্সটায়ার্স, একবছরের কম সময় ছিলেন গোয়ালন্দ, এর মধ্যে তিনমাস ছিলেন আবার ছুটিতে। খুব ব্যস্ত সময় কেটেছে তাঁর সেখানে কারণ তাঁর কোনো সহকারী ছিল না এবং কমপক্ষে দু'জনের কাজ তাঁকে করতে হতো। গোয়ালন্দে এমন কোনো কাজ করেননি যে তা মনে থাকবে তবে দু'একটি বিষয় কার্সটায়ার্স মনে করেছেন যার উল্লেখ করা দরকার।

প্রথম হলো বিশাল বিশাল নদীর শক্তি। রেলওয়ে লাইন যখন নির্মিত হয় তখন টার্মিনাসে বেশ কিছু ইমারত তৈরি করা হয়েছিলো এবং তা রক্ষার জন্য ইটের [বাঁধ] কাজও করা হয়েছিলো, তাতে খরচ হয়েছিলো ১৭ লক্ষ রুপি, পাউন্ডের

হিসেবে ১৭০,০০০ পাউন্ড। কাজ তখনও সম্পূর্ণ হয়নি কিন্তু গঙ্গা এসে ইমারত বাঁধ, সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। স্টিমার নোঙ্গর করতে হতো দূরে। তীর থেকে স্টিমার পর্যন্ত কাঠের পাটাতন ফেলে স্টিমারে উঠতে হতো, বিশপ কটন এভাবে স্টিমারে উঠতে গিয়ে নদীতে পড়ে ডুবে মারা যান।

কার্সটায়ার্স যখন গোয়ালন্দ গেলেন তখন রেল কোম্পানি একটি ডক তৈরি করছে যাতে বর্ষায় তাদের স্টিমার ভিড়তে পারে। ডক তৈরি হলো, বর্ষার আগ পর্যন্ত রইলো, তারপর বর্ষার সময় সুদূর হিমালয় থেকে পলি বাহিত পানি প্রবাহিত হতে থাকলো। কয়েকদিনের মধ্যেই তা কাদায় ভরে গেলো এবং তারপর আবার সব ভেসে গেলো।

এখানে একটি নীলকর পরিবার বসবাস করে যাদের চৌদ্দটি ফ্যাক্টরি ছিল। এখন আছে দু'তিনটি বাকিগুলি নদীগর্ভে তলিয়ে গেছে।

অন্য প্রান্তে কুষ্টিয়া, যেখানে রেল ছুঁয়েছে গঙ্গা। চল্লিশ মাইল দূরে। নদী থেকে দু'মাইল অভ্যন্তরে। ফলে তার কোনো ক্ষতি হয় নি, কিন্তু মূল গোয়ালন্দ চলে গিয়েছিলো নদীগর্ভে, এখন আবার তা ভেসে উঠছে অপর তীরে। পুরো ফরিদপুর জেলা গড়ে উঠেছে গঙ্গার পুরনো তীরে যা ছিল প্রথমে বালুচর, তারপর তা পানির উচ্চতার ওপরে ভেসে ওঠে। অন্তিমে নদীও তাকে ফেলে চলে যায়। এই চর ছিল ঢাল আর কোটরের সমষ্টি। ক্রমান্বয়ে ঢাল হয়ে গেল নদী আর বড় বড় কোটরে [নদী থেকে কোটরে রূপ নেয়] গড়ে উঠলো বড় বড় গ্রাম। একসময় তা ছিল নদী তীরে, এখন তা অভ্যন্তরে।

কার্সটায়ার্স জানিয়েছেন, এরকম বাসিন্দাদের টাইপ তিনি আগে আর দেখেন নি। কৃষিজীবীদের অধিকাংশ চন্ডাল। কাহিনী অনুযায়ী, এরা হিন্দুদেরই একটি বর্ণ ছিল যাদের বর্ণচ্যুত করে নির্বাসনে পাঠানো হয় ফরিদপুরের জলাভূমিতে। জলাশয়ে ঢিবি করে তার ওপর তারা বসবাস করতে থাকে। জীবীকা হয়ে ওঠে মাছ ধরা। ক্রমে জলাভূমি শুকনো উর্বর ভূমিতে পরিণত হয়। চন্ডালরা যারা ছিল ক্ষুধার্ত বন্য এক জাতি রূপান্তরিত হয় সম্পদশালী চাষীতে এবং সংখ্যাও বৃদ্ধি পায় তাদের।

এদের মধ্যে যুদ্ধং দেহি একটা ভাব আছে। অধিকার রক্ষার প্রয়োজনে ঢাল বর্শা নিয়ে রুখে দাঁড়াতে তারা দ্বিধা করে না। অবস্থার পরিবর্তন হওয়ায় এদের অনেকে আর চন্ডাল থাকতে চাইলো না, নিজেদের বর্ণ পরিবর্তন করে হলো নমশুদ্র।

গোয়ালন্দ একসময় ছিল বিরাট মৎস্যকেন্দ্র। তাজা এবং নুন দেয়া মাছ ট্রেন ভর্তি করে নিয়ে যাওয়া হতো। নোনা মাছে প্রণোদনা দেওয়া হতো। নিয়ম করা হয়েছিলো, যে পরিমাণ নুন ব্যবহার করা হবে সে পরিমাণ নুনে কোনো কর দিতে

হবে না।

কার্সটায়ার্স যখন গোয়ালন্দ তখন ব্যবসার ওপর লাইসেন্স ট্যাক্স আরোপিত হয়। যে ব্যবসায়ীর আয় ১০ পাউন্ডের বেশি তাকেই কর দিতে হবে। চারিদিকে অ্যাসেসার নিয়োগ করা হলো। অ্যাসেসারদের অ্যাসেসমেন্টে আপত্তি আপিল এসব নিরসনেই সারাদিন ব্যয় হতো। পরের বসন্তে তাকে বদলি করা হলো শ্রীরামপুরে।

১৪
বিমস ও চট্টগ্রাম

কটক ছেড়ে আসতে চাননি বিমস। কিন্তু, লে. গভর্নর অ্যাশলে ইডেনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছিলো। নয় বছর উড়িষ্যায় কাটানোর পর ভালোবেসে ফেলেছিলেন উড়িষ্যাকে। তাঁর স্ত্রী সুন্দরভাবে ঘরবাড়ি সাজিয়েছিলেন। ফেব্রুয়ারি ১৪, ১৮৭৮ সালে চাটগাঁর উদ্দেশ্যে উড়িষ্যা ছাড়লেন।

জোবরাঘাট থেকে স্টিমার ছাড়বে। ঘাটে 'নেটিভ' আর ইউরোপিয়ানরা ভিড় করে আছে। অনেকে কাঁদছিলো। তাদের কান্না দেখে বিমসেরও কান্না পাচ্ছিলো। তবে, তাঁর স্ত্রী কাঁদছিলেন। জাহাজ ছাড়লো। এক সময় রুমাল বা হ্যাট দোলানো হাতগুলি মিলিয়ে গেল।

ফলস পয়েন্টে [ফলতা] তাদের অপেক্ষা করতে হলো চারদিন। কারণ, তাদের স্টিমার ঠিক সময়ে পৌঁছেনি সেখানে। ফলে, কলকাতায় থাকতে হলো তিনদিন, এর মধ্যে একদিন ছিল বন্ধ। হাওড়ার স্টলকার্টের বাসায় উঠেছিলেন, নদীর পাড়ে বড়সড় বাড়ি। অতিথি, মানুষজনে ভরপুর। স্টলকার্টের ব্যবহার এমন যে, সবাই এটিকে নিজের বাড়িই মনে করে। লে. গভর্নরের সঙ্গে দেখা করলেন বিমস। বলাই বাহুল্য সেটি খুব আরামপ্রদ হলো না। রোববার সন্ধ্যেয় নৈশভোজের পর স্টলকার্টের বার্জে করে রওয়ানা হলেন স্টিমারের দিকে। নদীর তীর ও হাওড়া ব্রিজের দু'পাশে গ্যাসের বাতি জ্বলছে। অন্ধকারে, নিঃশব্দ নদী বেয়ে যাচ্ছেন, ওপরে তারার মেলা– সব মিলিয়ে মনে হচ্ছিলো যেন ভেনিস। বার্জ এসে একসময় থামলো তাদের জাহাজ 'ক্যালকাটা'র পাশে। আলোয় ঝলমল করছে জাহাজ। জাহাজে উঠে নিজেদের কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

পরদিন সকালে উঠে দেখেন গার্ডেন রিচ পেরুচ্ছেন। তার কিছুক্ষণ পর জাহাজ তার নিজস্ব গতিতে চলা শুরু করলো। দু'দিন বঙ্গোপসাগরে রইলেন। বুধবার ধলপহরে ডেকে বসে দেখলেন উত্তাল সমুদ্রে জাহার নোঙ্গর করে আছে। ভোরের আলো ফুটলে দিগন্তে দেখা গেল নিচু নিচু পাহাড়ের সারি। উত্তরে

সুন্দরবন থেকে আসছে নৌকার সারি, জাহাজের চারদিকে সাম্পানে উলঙ্গ [অর্ধউলঙ্গ] মাঝিদের সারি। সূর্য উঠলে নোঙ্গর তুলে জাহাজ এগোতে শুরু করল, সামনে নদী দিয়ে তিন-চার কিলোমিটার যেতে হবে।

নদী বেশ প্রশস্ত, বেশ আঁকাবাকা এবং বেশ কর্দমাক্ত। দু'পাশে নিচু পাহাড়ের সারি। ঘন গাছপালা আগাছায় ভরা। কল্পনাতীত সুন্দর। হঠাৎ একটি বাঁক নিতেই চোখে পড়ে ইংরেজ, ফরাসি আর মার্কিন জাহাজের সারি, দীর্ঘ গুদাম, জেটি, একটি ফ্ল্যাগ স্টাফ– গাছের মাথা ছাড়িয়ে বাড়ির ছাদ, ওপরে পামের গুচ্ছ এবং তারও ওপরে ছোট ছোট পাহাড়। প্রতিটি পাহাড়ের শীর্ষে একটি বাড়ি ও লম্বা একটি ক্যাসুরিনা গাছ। আরো দূরে কুয়াশার মতো অস্পষ্ট বার্মার নীল পাহাড়ের সারি– চাটগাঁয় পৌঁছলেন বিমস দম্পতি।

বাংলার পূর্বপ্রান্তে এবং বঙ্গোপসাগরের পূবে বার্মার দিকে সাগরে চাটগাঁ। এলাকার মানুষজনের একটা বড় অংশ মগ, যারা অনেকটা বর্মীদের মতো। আরেকটি অংশ, হয়ত গরিষ্ঠ হচ্ছে বাংলার মুসলমান। ভারতের সবচেয়ে ঝগড়াটে, মামলাবাজ ও প্রতিশোধপরায়ণ জাতি। এদের অনেকে সাহসী ও দক্ষ নাবিক এবং ভারতের নৌপথে চলাচলকারী অধিকাংশ স্টিমারের নাবিক। চট্টগ্রাম শহর গুরুত্ব পেয়েছে বন্দরের কারণে যারা পঞ্চদশ শতকে এখানে বসতি গেড়েছিলো। তাদের বাণিজ্যের সদর দপ্তর ছিল এখানে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে গলজালভেসের নেতৃত্বে হার্মাদরা আক্রমণ-টাক্রমণ সেরে এখানেই আশ্রয় নিতো। বাঙালি, হিন্দু এবং মুসলমান, মগ, পর্তুগিজ অন্যান্য জাতির পাপাচারে ভরা একটি জলাধার যেন। বিমসের ভাষায়, "ইট ইজ স্টিল এ সিংক অফ ইনিকিউটি, ফুল অফ স্কাম অফ ভেরিয়াস নেশনস...।" ভারতবর্ষের অন্যান্য এলাকা থেকে এটি বিচ্ছিন্ন, চরমভাবে অস্বাস্থ্যকর। কাজের ভার যথেষ্ট এবং শুধু জটিলই নয় অদ্ভুত রকমের ঝামেলাপূর্ণ। আবর্জনা, বিষাক্ত vermin আর অদ্ভুত দুর্গন্ধ। বিমস লিখেছেন, "আমরা বলতাম চিটাগাং দি লোথসাম।"

পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর। পূবে নিচু বৃক্ষে ভরা পাহাড়– আর এর মাঝে সরু দীর্ঘ একটি এলাকা হচ্ছে চট্টগ্রাম। দৈর্ঘ্যে একশ' আর প্রস্থে ত্রিশ মাইল। পাহাড় থেকে বেশ কটি নদী সমতলে নেমে এসে মিশেছে সাগরে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড়টির নাম কর্ণফুলী। এর মুখ [উৎস] থেকে পাঁচ মাইল দূরে চাটগাঁ শহর। নদী থেকে বেশকিছু গলির নেটওয়ার্ক, একটি খাড়ি [খাল]'র পাশে পর্তুগিজদের পুরনো পোর্টে গ্রান্ডি। এখানে আছে পাথরে তৈরি একটি রোমান ক্যাথলিক গির্জা ও বিশপের বাড়ি। এর পাশে পর্তুগিজদের কুটিরের দঙ্গল। এগুলি আবার তৈরি হয়েছে মাটি থেকে তিনফুট উঁচুতে ফলে নিচের খালি জায়গা বিভিন্ন ধরনের জঞ্জাল আর আবর্জনা ভর্তি। নদীতীরে সারিবদ্ধভাবে ফরাসি, ইংরেজ আর দেশী বণিকদের

গুদামের সারি। বাকি জায়গাটুকু দখল করে আছে দেশীদের কুটির (যাদের বেশিরভাগ মুসলমান), মাঝে মাঝে দু'একটি ইটের তৈরি সুন্দর মসজিদ। চারপাশে আর এসবের মাঝে সতেজ সব বৃক্ষ, পাম, বট, আম ও অন্যান্য গাছ, বিশাল গ্রীষ্মমণ্ডলীর লতা আর ঘন আগাছা। মাঝে মাঝে কালো বদ্ধ জলাশয়। এই নিচু এলাকার উত্তরে কিছু পাহাড়, যেগুলির মাঝে বয়ে যাচ্ছে ঝরণা। প্রতিটি পাহাড়ে ঘিরে থাকা ক্যাসুরিনার [শিরিষ] মাঝে একজন ইউরোপিয়নের বাড়ি। পাহাড়ের ঢাল turmeric plant এ ঢাকা। এ ছাড়াও আছে বিশাল একটি আদালত, পাবলিক অফিস, বড়সড় একটি প্রোটেস্টান্ট গির্জা, স্কুল এবং পোস্ট অফিস। এসব বেলে পাহাড় ফুড়ে এখানে সেখানে উঠেছে সতেজ পানির ঝরণা যা অধিবাসীদের খাবারের পানির চাহিদা মেটায়। আর সে কারণে প্রত্যেক মালিক সীমানা দিয়ে তা ঘিরে রাখে। এসব পাহাড়চূঁড়ো থেকে যতদূর চোখ যায় দেখা যায় উর্বর সমতল। দিগন্তে চমৎকার নীল পাহাড়ের সারি। এত চমৎকার দৃশ্য এর আগে আমার চোখে পড়েনি। এত খারাপ জায়গায়ও আর থাকিনি। স্থলপথে প্রতিদিন কলকাতায় ডাক যায় কিন্তু পার্শেল বা মালামালের জন্য নির্ভর করতে হয় পাক্ষিক স্টিমারের ওপর।

এখান থেকে ইলিয়টকে লেখা একটি চিঠিতে বিমস আরো বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন–

"বারান্দায় আমরা বসে, চারদিকে ফুটন্ত অর্কিড ঝুলে আছে কার্ণিশ থেকে। নিচে তাকালে চোখে পড়ে পাম আর অন্যান্য গাছের ঘনজঙ্গল, আরো নিচে পিঁপড়ের মতো মানুষ আর গরু গাড়ির দঙ্গল– সামনে সাদা নদী ভর্তি জাহাজ, দীর্ঘ গাছের সারির ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে অস্পষ্ট নীল সমুদ্র। এই জায়গার দৃশ্য মনোহর। রাস্তা হারিয়ে যাচ্ছে পাহাড়, পাম আর তার মাঝে মাঝে ঝরণার শেষ নেই। কিন্তু হায়! আমাদের মতো সাধারণ মানুষ যে আরামটুকু চায় তার অভাব খুবই প্রকট। ভৃত্যদের বেতন বেশি এবং প্রায় ক্ষেত্রে তারা নরকের কীট। বাড়িগুলি খুবই জীর্ণ আর বিষাক্ত কীটপতঙ্গে ভরা।"

সমতলে যেসব পাহাড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে সেগুলি করা হয়েছে চা-বাগান। বিমসের মতে, ভারতের অন্যান্য এলাকা থেকে এখানে চা-গাছ হয় ভালো, স্বাদও চমৎকার। ফলে অনেক ইউরোপিয় চা-বাগান করেছে। এদের মধ্যে ইংরেজ আর স্কটদের সংখ্যা বেশি। বিমসের ভাষায়, "এ রাফ, রাউডি ব্যাচেলার লট।"

ফরাসিদেরও আছে ছোট এক উপনিবেশ যার নেতৃত্বে আছেন– বয়সী, হাস্যকর, ছোটখাটো, মটরদানার মতো শুকনো এক লোক, নাম ম দ্য টারমেস। নিজের পরিচয় দেন 'এজেন্ট কনস্যুলিয়র দ্য লা ফ্রস'। তার বউ এবং মেয়েটি অবশ্য স্নিগ্ধ।

চট্টগ্রামের পূবে পাহাড়ে বাস করে আধা বর্মী Common লোকজন– মগ, চাকমা প্রভৃতি। এটি একটি 'নন-রেগুলেশন' জেলা। পরিচিত পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে। এর অধিকর্তা মেজর ইভানস গর্ডন নামে বিনয়ী, ভদ্র, মেধাবী তরুণ যে তার শাসনাধীন। এই বন্য, আদিম মানুষদের ভালোভাবে জানে। সীমান্তরক্ষার জন্য তার অধীনে আছে ক্ষুদ্র এক সেনা দল। সীমান্তের আরো দূরে বসবাস করে এক গুচ্ছ আরো বন্য Tribes সাধারণত যারা পরিচিত লুসাই নামে কিন্তু বিভক্ত হাওল, সাইলু, সেন্দু এবং আরো বর্বর designation এদের নেশা পার্বত্য চট্টগ্রামের সদর রাঙ্গামাটিতে অবস্থিত সেনাদলের ওপর হামলা করে ভড়কে দেয়া। গর্ভনের সহকারি হিসেবে আছে জারবো নামে এক সহকারি। পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট ক্রাউচ এবং বৃদ্ধ এক পর্তুগিজ ইন্সপেক্টর রোজারিও।

বিমসের ভাষায়, "চট্টগ্রামে ছিলাম আমরা চরমভাবে অসুখী। আমাদের জীবনের সবচেয়ে খারাপ সময় ছিলো ঐ দুই বছর। কটকের বিপরীতে আমরা যেখানে ছিলাম সুখী, এটি ছিল যন্ত্রণাদায়ক।" লে. গভর্নর স্যার অ্যাশলে ইডেন পছন্দ করতেন না বিমসকে। তাই তার জুনিয়রদের তাঁকে ডিঙিয়ে ভালো পদে নিয়োগ দিচ্ছিলেন। অন্যান্য কমিশনার পদ থেকে চট্টগ্রামের কমিশনারের বার্ষিক বেতন ৩৫০ পাউন্ড কম ছিল। যদিও সবার মত ছিলো, অন্যান্য কমিশনারশিপ থেকে এর বেতন বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ এখানে বিচারক (জজ) ও কমিশনারের পদ এক করে ফেলা হয়েছিলো খরচ কমাবার অজুহাতে। দু'টি পদের কাজের ধরণ ছিলো দু'রকম আর জজ হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা বিমসের তেমন ছিলো না। বিমস যদি কমিশনারের কাজে বেশি মনোযোগ দিতেন তাহলে হাইকোর্ট জানাতো জজ হিসেবে তিনি কাজে গাফলতি করছেন। আবার জজের কাজে মনোযোগ দিলে জানানো হতো প্রশাসনিক কাজ তেমন হচ্ছে না। সাত বছর পর (১৮৭৩-৮০) অবশ্য এই গোলমেলে ব্যাপারটার মীমাংসা করা হয় অর্থাৎ পদ দু'টি আলাদা করা হয়।

চাটগাঁয় পৌঁছার এক সপ্তাহ হয়নি। লোকজন নিয়ে অ্যাশলে ইডেন স্টিমারে চট্টগ্রাম এলেন পরিদর্শনে। বিমসের গোছগাছ তখনও শেষ হয়নি। বিমস মন্তব্য করেছেন, গ্রেটম্যানরা বোঝে না কত ঝামেলার সৃষ্টি করেন তারা। উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারীরা এলে তাদের দেখাভাল করা থেকে সবকিছু করতে হয় কমিশনারের। বিমস নতুন এসেছেন। তার আগের কমিশনার তাকে কিছু বুঝিয়ে দিয়েও যাননি। বিমসের ভাষায়, কালেকটরও বেজায় অলস। কাজে কোনো আগ্রহ নেই। সুতরাং, বিমসের মনে হয়েছে লে. গভর্নর তার পরিদর্শনে যা জানার কথা তা জানতে পরেননি। তবে এতে উল্লাস প্রকাশ করে লিখেছেন, "ঠিকই হয়েছে! তিনি ছিলেন এখানে তিনদিন এবং তাঁর চলে যাওয়াতে আমরা বেজায় খুশি।"

ইংরেজদের প্রতি ফরাসিদের এক ধরনের ঈর্ষা বা প্রচ্ছন্ন গর্ব কাজ করতো। এর একটি উদাহরণ দিয়েছেন বিমস। ইডেন আসছেন তাই শহরে তোরণ নির্মাণ করা হয়েছে। পাবলিক বিল্ডিংগুলোতে পতাকা তোলা হয়েছে, বন্দরে সার বেধে দাঁড়ানো ব্রিটিশ ও অন্যান্য দেশের জাহাজগুলোও সজ্জিত। শুধু দেখা গেল, ফরাসি কনসাল জেনারেলের অফিসের সামনে ফ্ল্যাগ স্টাফে কোনো পতাকা নেই। ছোটলাটের জাহাজ যখন নদীমুখে তখন কাস্টমস কালেক্টর বিষয়টি বিমসের নজরে আনলেন। বিমস তখুনি এম. দ্য টারমেসের কাছে একজন অফিসার পাঠিয়ে কারণ জানতে চাইলেন। অফিসার এসে জানালো, কনসাল জানিয়েছেন তার দেশের পতাকার অবমাননা তিনি সহ্য করবেন না। অফিসার তখন দেখলো, শুল্ক বিভাগের যে brig তা সাজানো তবে মাস্তুলের একেবারে চূড়োয় একটি সিগন্যাল ফ্ল্যাগ। তারপর ফরাসি দেশের তেরঙ্গা ঝান্ডা। বিমস তখুনিই তা বদলাবার আদেশ দিলেন। টারমেস তার অফিস থেকে দূরবীন দিয়ে ঘটনাটি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। সিগন্যাল ফ্ল্যাগ সরিয়ে তেরঙ্গা ঝান্ডা মাস্তুলের চূড়োয় ওঠাতেই ফরাসি ও ইউনিয়ন জ্যাক ওঠানো হলো ফরাসি কনসালের দপ্তরে। পরে টারমেস বিমসকে জানিয়েছিলেন, এগুলি ছেলে মানুষী ঘটনা কিন্তু তার কোনো উপায় নেই। তাকে ঘিরে থাকে ফরাসিরা। কে কখন প্যারিসে কী লিখে জানাবে কে জানে। তারপর চাকরি নিয়ে টানাটানি। তিনি এই চাকুরিটি হারাতে চান না।

'নেটিভ'রাও তোরণ ও পাবলিক বিল্ডিংয়ে পতাকা ও ব্যানার টানিয়েছিলো তাতে বাংলায় ও ইংরেজিতে অভিনন্দন বার্তা লেখা ছিল। পাবলিক হাসপাতালের একটি ব্যানারে একটি লেখা ছিল– 'যে এখানে আসবে সে আশা ছেড়ে আসবে।' স্যার অ্যাশলে এতে মজা পেলেও হাসপাতালসমূহের প্রধান পরিদর্শক বেজায় ক্ষেপেছিলেন।

বিমসকে এরপর যেতে হয়েছিলো পার্বত্য চট্টগ্রাম। মগদের বোমং রাজার কী একটা ঝামেলা হয়েছে। মীমাংসার জন্য বিমসকে যেতে হবে। বিমস নিজেও একটা পরিবর্তন চাচ্ছিলেন। বউ বাচ্চা নিয়ে রওয়ানা হলেন।

কমিশনারের ভ্রমণের জন্য ছোটখাটো একটা স্টিমার ছিল। পরিচ্ছন্ন এবং খুবই আরামদায়ক। রাঙ্গামাটির দূরত্ব, চট্টগ্রাম থেকে নৌ-পথে ৮০ মাইলের মতো। প্রথম ১৫ মাইল সমতলের মধ্যে দিয়ে। নিসর্গ চমৎকার তবে একঘেঁয়ে। তারপর আসে পাহাড়, নদী প্রশস্ত, বেগবতী, গভীর; পানি গাঢ় সবুজ, পাহাড়ের পাদদেশ স্যান্ডস্টোনের। ওপারে পাম, আম, বাঁশ আর অনেক রকমের গাছে ভরা। গাছ বেয়ে মাঝে মাঝে উঠে গেছে ঝলমলে রংয়ের লতা। কোথাও কোথাও ৫০/৬০ ফুট উঁচু পাথুরে পাহাড়ের রং লাল, কালো ও হলুদ, বিওমোন্টিয়ার সাদা ফুলে অর্ধেক পাহাড় আচ্ছন্ন। পাহাড়ের আনাচে কানাচে অর্কিড, ঘাস, ফার্নে ভরা।

পাহাড়ের পাদদেশে যেখানে ঢেউ এসে ভেঙ্গে পড়ছে সেটি ভরা মখমলি সবুজ শ্যাওলায়। তারপর পেরুতে হয় সংকীর্ণ এক উপত্যকার মুখ, উপত্যকা যেতে যেতে কুয়াশায় যেন গেছে হারিয়ে। এখানে সেখানে পাহাড়ের গায়ে বা চূঁড়ো পরিষ্কার করে মগরা বাসা বেঁধেছে। মাথায় পানির পাত্র। পরণে লাল পেটি কোটি আর নীল জ্যাকেট, মগ মহিলারা খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠছে।

এক উপত্যকার (Plateau) ওপর অবস্থিত ছোট রাঙ্গামাটি, তিনদিকে নদী, তা থেকে ৩০০ ফুট উচ্চতায় রাঙ্গামাটি। দুর্ভেদ্যতার জন্যে জায়গাটিতে বাছা হয়েছিলো। রাঙ্গামাটিতে আছে নেটিভদের ছোট একটি বাজার, রেজিমেন্টের থাকার জায়গা ও প্যারেড গ্রাউন্ড, ছয়সাতটি বাংলো, ছাদ খড়ের, দেয়াল মাদুরের। নদীতীরে পুরো ইউনিফর্ম পরে এলেন মেজর গর্ডন মি. ক্রাউচ। রেজিমেন্ট বিমসকে প্রদান করলো গার্ড অব অনার। এক পাহাড় চূঁড়ো থেকে কামান দাগা হলো এগারো বার। বিমস লিখেছেন, "আমার মনে হয়েছিলো পূর্ব সীমান্তে আমি বোধহয় পদাধিকারবলে ভাইসরয়ের এজেন্ট এবং সে জন্যই কামান দাগা হলো আমার সম্মানে।" তারপর খাড়া পাহাড় বেয়ে বিমসকে উঠতে হলো সার্কিট হাউসে। বেশ বড়সড়, আরামদায়ক ইমারত।

পরের দিন মং, বোমং এবং চাকমা রাজা তাদের অনুচরসহ এলেন মংগ্রি (কমিশনার)কে সম্মান জানাতে। চিফ এলে (চিফ) প্রজাদের জন্য ভোজের আয়োজন করতে হয়। এটাই রীতি। সুতরাং, খাটানো হয়েছে বিরাট এক শামিয়ানা, ইউরোপিয়দের জন্য বিছানো হয়েছে কার্পেট। দুপুর দুটোর দিকে বিমস সেখানে গেলেন। মাঝখানে বসলেন বিমস, এক পাশে ইউরোপিয়নরা, অন্যদিকে রাজারা। এরপর সবাই আসতে লাগলো বিমসের সামনে এবং সেজদার ভঙ্গিতে মাটিতে কপাল ঠেকানো। সবাই দেখতে মঙ্গোলিয়ানদের মতো, ছোটখাটো, চওড়া ফিগার, চেহারা চীনেদের মতো, চোখ সরু, নাক ভোতা, চোয়াল উঁচু, প্রত্যেকের বড় কানে ফুটো করে আটকানো প্রায় দশ ইঞ্চি লম্বা চুরুট, মেয়েদের কানে অথবা খোপায় বড়সড় বিউমন্টিয়া বা অর্কিড। এরপর সবাই সারি করে বসলো। সবার সামনে বাঁশের ছোট চৌকি রাখা হলো, ওপরে দেয়া হলো Plantain পাতা। যা চারদিকে মোড়া। বাঁশের চোঙ্গা দেয়া হলো যা কাপের মতো। তাতে একজন ঢেলে দিলো, আরেকজন মাটির পাত্র থেকে পানি। সবাই পান করলেন। এটি বোধহয় খাবার শুরুর প্রক্রিয়া। সবাই তারপর Plantain পাতা খুললো। ভেতরে ডিম, মুরগি, ভাত, মরিচ প্রভৃতি। সুন্দরভাবে রান্না করা। রান্নার জন্য মগরা বিখ্যাত। বিমস লিখেছেন, "আমরা খেলাম সামান্য, কিন্তু মগরা প্রায় দুইঘণ্টা ধরে খেলেন, পান করলেন, হাসি-ঠাট্টা করতে লাগলেন। বিশাল বিশাল ভাড় নিয়ে সারির মাঝে দিয়ে খাবার নিয়ে যেতে লাগলেন কয়েকজন, শূন্য পাতা খাবারে ভরে দিলেন।

বিমস লিখেছেন, "তাদের খাওয়া আর পানের বহর সত্যিই বিস্ময়কর।" এরপর বিলানো হলো চুরুট, সবাই চুরুট ধরালেন। মহিলারা যাদের কানে ছিল সোনার দুল আর গলায় নেকলেস, বিমসের স্ত্রী ও সন্তানদের ঘিরে ধরলেন। কৌতূহলের সঙ্গে তারা পর্যবেক্ষণ করছিলেন। বাচ্চা এঞ্জেলা হাতে হাতে ঘুরলো, সবার চুমোয় অভিষিক্ত হলো। তারপর তারা বিমসদের উপহার দিলেন পান-সুপারি এবং অবাক হলো যখন তারা দেখলেন, বিমসরা পান চিবুলেন না। আবার চললো রাম খাওয়া। বিমস এবার উঠে দাঁড়ালেন। এটি ছিল ভোজ সভার শেষের ইঙ্গিত। রাজারা দুপুরটা ঘুমিয়ে কাটালেন। তারপর আলোচনায় বসলেন কমিশনারের সঙ্গে। সন্ধ্যায় ম্যাজিক লণ্ঠনের আয়োজন করা হয়েছিলো যা তারা খুবই উপভোগ করেছিলো। বিমস জানিয়েছেন, এই ভোজের জন্য সরকারের অর্থ বরাদ্দ আছে। কারণ, ভোজ ছাড়া মগদের সঙ্গে কোনো রকম আলোচনায় বসা যায় না। এখানে বলে রাখা ভালো, বিমস চাকমা, মগ ও অন্যান্য উপজাতিকে মগ বলেই উল্লেখ করেছেন যদিও সেখানে বাস অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি সত্ত্বার।

বিমস লিখেছেন, "মগদের সঙ্গে বড় ধরনের একটা ঝামেলা হচ্ছে যার মীমাংসা প্রায় অসম্ভব।" এই ঝামেলাটা হচ্ছে জুম চাষ নিয়ে। আশপাশের পাহাড়গুলো দামী বৃক্ষে ভর্তি। এগুলো সব বন বিভাগের অধীনে আনা হয়েছে। বিমসের মতে, ভারতে যে কোনো বিভাগ মনে করে তার অধীনে যা আছে সব তাদের এবং কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ হলে তা দূর করা বাঞ্ছনীয়। তাদের মতে, মগরা বন নষ্ট করছে। বিমসও মনে করেন, মগ ও অন্যান্য উপজাতিরা বনের ভারি ক্ষতি করে। আগে বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ চলতো। জনসংখ্যার চাপ বাড়েনি। ফলে, গাছের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে হ্রাস পায়নি। এক জায়গায় কয়েক বছর জুম চাষের পর তা পরিত্যক্ত হতো। সেখানে আবার গাছ গজাতো। ব্রিটিশ শাসনের ফলে সংঘর্ষ থেমেছে। জসংখ্যা এমন হারে বাড়ছে যে, তা হ্রাস না পেলে পাহাড়ের প্রতিটি ইঞ্চি তারা পুড়িয়ে ফেলবে। বন বিভাগের প্রধান ড. স্লিফ প্রস্তাব করেছিলেন পাহাড় বাঁচাবার জন্য সব চাকমা ও মগকে তাদের 'নেটিভ হিলস' থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। কিন্তু, কোথায় সরানো হবে তা বলা হয়নি। বিমসের পূর্বসুরি দৃঢ়ভাবে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত করেন। তিনি লিখেছিলেন, মগ আর গাছেরা যদি এক সঙ্গে বসবাস করতে না পারে তাহলে গাছের সংখ্যা কমলেও ক্ষতি কম হবে। ড. স্লিক এ প্রস্তাবে এতো ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন যে বেশকিছু খারাপ মন্তব্য করেন। তখন কিছু 'বিজ্ঞ' লোক পরামর্শ দিলেন। জুম পাহাড়ের ক্ষতি করছে সুতরাং মগদের বাঙালিদের মতো লাঙল ব্যবহার শিক্ষা দিতে হবে। মগরা লাঙলের ব্যবহার জানেন না। এদিকে প্রস্তাবটি অ্যাশলি ইডেনের মনে ধরলো। তিনি নির্দেশ দিলেন, বিমসের ভাষায়, তাঁর স্বাভাবিক

'bullying injustice' চাপিয়ে যে, যদি মগরা লাঙল ব্যবহার না করে তাহলে ধরে নিতে হবে অফিসাররা ভালোভাবে চেষ্টা করেননি এবং ধরে নেয়া হবে তারা অযোগ্য ইডিয়ট। মগরা জানালেন, লাঙল ব্যবহার করলে তাদের জাতি শেষ হয়ে যাবে অর্থাৎ তারা মারা যাবে। মগ পুরুষদের থেকে মহিলাদের প্রতিবাদ ছিল বেশি জোরালো। মগরা এমনিতে হাসিখুশি, অলস, গা-ছাড়া ভাবের। কিন্তু এ বিষয়ে দেখা গেল তারা বিষণ্ন, ক্ষুব্ধ এবং দৃঢ়। বিমস লিখেছেন, তাদের প্রকৃতির সঙ্গে চাষের ব্যাপারটা মেলে। পাহাড়ের একদিক পোড়ানো। তারপর কোনোরকমে বীজ বোনা এবং তারপর যতদিন ফসল না ওঠে ততদিন বসে বসে ধূমপান আর হাসিঠাট্টা করা। মাটিতে লাঙল দেয়া, জমি ঠিক করে ফসল বোনা, আগাছা উপড়ানো, পানি দেওয়া ঐ সবের বিপরীত এবং তা মানায় বিষণ্ন, ঝগড়াটে, উদ্বিগ্ন বাঙালিদের। প্রকৃতির এই সন্তানরা তাদের ফসল পর্যন্ত কাটে না। প্রতিবছর ব্রিটিশ ইন্ডিয়া কোম্পানির স্টিমার বাংলা থেকে চট্টগ্রাম, আকিয়াব ও রেঙ্গুনে হাজার হাজার বাঙালি মজুর নিয়ে আসে। দু'তিন মাস ফসল তুলে তারা ভালো রোজগার করে। মজুররা যখন ফসল তোলার কাজে ব্যস্ত থাকে তখন মগ মালিকরা বারান্দায় বসে চুরুট টানে আর বাঙালিদের নিয়ে হাসিঠাট্টা করে। বিমস লিখেছেন, "আর এখন আমাদের ওপর নির্দেশ এসেছে এদের ফসল তোলা শেখানো আর লাঙলজীবীতে রূপান্তর করার।" বিমসরা যা করেছিলেন তা বর্ণনা করেছেন।

মগদের মধ্যে বাস করে, বিমসের ভাষায়, চাকমা নামে এক 'কিউরিয়াস পিপল' যারা মঙ্গোলিয়ান জাত কিন্তু ধর্মে বৌদ্ধ। মুসলমান ও হিন্দুদের থেকেও তারা অনেক রীতিনীতি গ্রহণ করেছে। তাদের আছে একজন রাজা। বিমসের সময় রাজার নাম ছিল হিন্দু নাম– হরিশচন্দ্র যদিও তার বাবার নাম ছিল মুসলমানী নাম। খাঁটি মগদের মতো তাদের লাঙল চাষে অনীহা নেই। সুতরাং, চাকমাদের কাছ থেকে সমতলের কিছু জমি তারা ভাড়া করলেন আর কিছু মগদের ভালো টাকা দিয়ে প্রণোদনা জোগালেন ধান চাষের। বিমসের ভাষায়, "তাদের জাতির মঙ্গলের জন্যে তারা আত্মত্যাগে রাজি হলো। সরকারকে লেখা হলো, অন্যান্য শিল্পের মতো, লাঙলে চাষও একটা আর্ট বা শিল্প যা শিখতে হয়। সুতরাং, মগদের লাঙল ব্যবহার শেখানোর জন্য কিছু বাঙালি নিয়োগ করা উচিত।" সরকার রাজি হলো।

গর্ডনকে নিয়ে বিমস গেলেন সে চাষাবাদ দেখতে। গিয়ে দেখলেন, বাঙালিরা চাষ করছে আর বাঙালিদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আলে বসে চুরুট খাচ্ছে, হাসিতামাশা করছে। বিমস তাদের ডেকে পাঠালে, হাসিখুশি ভাবেই তারা এলেন এবং প্রশ্নোত্তরে জানালেন, হ্যাঁ, তারা ভালোভাবেই শিখছে। ব্যাপারটা খুব সোজা। "কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা লাঙল চাষ দিতে পারবো।" তারা এটি শিখেছে বলে বিমস জানতে পারেননি। তবে, তাঁর বার্ষিক রিপোর্টে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে

পারলেন এরকম যে, নির্দেশ মতো তারা কাজ করছেন, এখন দেখা যাক কী হয়।

'নয়াবাদ' বিমসের জন্য বিরক্তির কারণ হয়ে উঠছিলো। চট্টগ্রামে নতুনভাবে ভূমি বন্দোবস্ত পরিচিত ছিল নওয়াবাদ (নয়া আবাদ) নামে। জমির উত্তরাধিকারি নির্ণয়, পাট্টা, করের হার সবকিছু নিয়ে জটিলতা এবং অভিযোগ ছিল। বিমসের ভাষায়, "সবকিছু মিলে একজনকে পাগল করে তোলার জন্য যথেষ্ট। যা কিছু নিয়ে মামলা করা যায়, আগ্রহভরে তা নিয়ে মামলা করা হয়। এরা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে মামলাবাজ লোক।" বিমস এ প্রসঙ্গে চাঁটগার প্রাক্তন প্রশাসক স্যার হেনরি রিকটসের কথা উদ্ধৃত করেছেন। স্যার হেনরি, চাঁটগার মানুষজনকে ভালোভাবে জানতেন। তিনি বলেছেন, প্রতিটি চাঁটগাইয়া একটি 'স্ট্যাম্প পেপার' নিয়ে জন্মে, এবং যখন সে হাঁটতে শেখে তখন প্রথমেই সেই স্ট্যাম্পপেপার নিয়ে একজন আইনজীবীর কাছে যায় মামলা ঠোকার জন্য। বিমস জমিজমার এসব জটিলতা নিস্পন্নের জন্য নিদ্রাহীন রাত পার করেছেন। লিখেছেন, উড়িষ্যা থেকে চট্টগ্রামে কাজ ছিল বেশি, জটিল, ধন্যবাদহীন ও নিরস এবং বিরক্তিকর। তাঁর মতে, এ কাজ দু-তৃতীয়াংশ কমে যেতো। যদি ক্ষুধার্ত ও হিংস্র বিষাক্ত কালো ছোট মুসলমানদের মন খানিকটা সমঝোতাপূর্ণ ও যুক্তিবাদী হতো।" নয়াবাদের ইতিহাসও তিনি খানিকটা বর্ণনা করেছেন। উনিশ শতকের শুরুতে লর্ড হেস্টিংসের একজন কর্মচারী জয়নারায়ণ কৌশলে এ এলাকার বিশাল ভূখণ্ড দখল করে। তার বেআইনী দখল পরে ধরা পড়ে এবং সরকার জমি ফেরত নিয়ে নেয়। ঐ সময় পাহাড়-জঙ্গল পরিষ্কার করে জমি আবাদ করা হচ্ছিলো। সে জন্য 'নয়াবাদ' নামের উৎপত্তি। কিন্তু, কিছু জমি ছিলো যা আইনি পদ্ধতিতে জয়নারায়ণ পেয়েছিলো এবং স্যান্ডি নামে এক ইংরেজ তা দেখাশোনা করতো।

এইসব যন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য স্ত্রী সন্তান নিয়ে মাঝে মাঝে তিনি নদীতে বেড়াতে যেতেন। *চাফিন্স* নামে তার একটি স্টিমার ছিল। মাঝে মাঝে তাঁর ভাই হ্যারি তাঁর লঞ্চ নিয়ে বেড়াতে আসতেন। হ্যারি ছিলেন কক্সবাজারের এসডিও। ঐ বছরের শেষে (১৮৭৮) কক্সবাজারে একবার বেড়াতেও গিয়েছিলেন। বিমস লিখেছেন, "চিটাগাং দি লোথসাম" এবং এর সঙ্গে জড়িত সবকিছুকে আমি এড়িয়ে চলতাম। এই জায়গা এবং লোকজন, কাজকর্ম সবকিছু ছিলো আমার অপছন্দের। এর সৌন্দর্য একটি ইভিল বিউটি। পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষজন ছিল কৌতুহলোদ্দীপক এবং বিভাগের এই একটি এলাকাই আমি পছন্দ করতাম। তবে, এখানে প্রায়ই একটা একটা ঝামেলা লেগে থাকতো।"

জুলাই মাসে সীমান্তের বাইরের লুসাইদের নিয়ে ঝামেলা হলো। স্যার রিচার্ড টেম্পল এই কাল্পনিক সীমারেখা তৈরি করেছিলেন যা লুসাইরা মানতো না। মানবে কী ভাবে? কারণ, তাদেরতো ধারণা ছিল না ঐ কাল্পনিক রেখার ওপারে ব্রিটিশদের

রাজত্ব। ঐ সময় লুসাইদের একটি শাখার প্রধান অসুস্থ হলেন। তার শুভানুধ্যায়ীরা জিজ্ঞেস করলো কে তাকে বান মেরেছে। চিফ এক প্রতিবেশীর নাম করলেন যার সঙ্গে তার বিবাদ ছিলো। এই লোকেরা বিশ্বাস করতো সব ধরনের অসুখের কারণ 'উইচক্রাফট'। সুতরাং, চিফের ছেলে ও বান্ধবদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ালো ঐ প্রতিবেশী খুঁজে হত্যা করা। এটি পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হতো। চিফের মৃত্যুর পর তার ছেলে সেই লোককে খুঁজে হত্যা করে।

সমস্যা হলো যে জায়গায় হত্যা করা হয়েছিলো সেটি ছিলো ব্রিটিশ এলাকা। সুতরাং, সেই লুসাই বালককে গ্রেফতার করে বিচার করা হলো। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হলো। বিমসের পূর্বসুরি ও অন্যান্য অফিসাররা এর প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু টেম্পল তাঁর স্বভাবজাত বাগড়ম্বরের মাধ্যমে জানালেন, লুসাইদের ব্রিটিশ অধিকার ও আইন সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া উচিত। প্রকৃতিতে বড় হওয়া লুসাই বালকের অন্তরীণ অবস্থা সহ্য হলো না। সে মারা গেল। এবং লুসাইরা ধরে নিল ব্রিটিশরা তাদের হত্যা করেছে। ফলে, দীর্ঘদিন ধরে লুসাইরা ব্রিটিশদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল। ভান্স গর্ডন ও তার পূর্বসুরি ক্যাপটেন লিউন কৌশলে তাদের ক্রোধ প্রশমণ করেছিলেন।

আগস্ট মাসে হাউলং আর আরাকানের খয়েমি ট্রাইবের মধ্যে গণ্ডগোল শুরু হলো। হাউলংরা খয়েমির চিফের বৌ আর চার সন্তানকে অপহরণ করেছিলো প্রতিশোধ হিসেবে। যা হোক, বিষয়টি মিটমাটের জন্য বিমস গর্ডনকে বললেন, লুসাইদের বা হাউলংদের চিফকে চাঁটগায় নিয়ে আসতে। অনুচরদের সহ চিফ এলেন চাঁটগায়। বিমসকে তাদের জন্য ভোজের আয়োজন করতে হলো। দু'টি খাসি, ছয়টি মুরগি, বিস্তর ভাত, বারো বোতল রাম, শখানেক চুরুট এবং অগণিত পানসুপারি দিয়ে ভোজ হলো। তারপর তারা জানালো, আলোচনার জন্য তারা তৈরি। সুতরাং, হল ঘরে তাদের আনা হলো। বিমস ইংরেজিতে বলেন, গর্ডন তা মগীতে অনুবাদ করেন আর মগ দোভাষী তা অনুবাদ করে লুসাইতে। যাক পরে বিষয়টির মীমাংসা হলো। এরপর তারা বিমসের বাড়ি দেখাতে চাইলেন। বিমস তাদের ড্রইংরুমে নিয়ে এলেন। সেখানে বিমসের স্ত্রী ও আরো কিছু মহিলা বসে ছিলেন। তারা সম্ভ্রমভরে মাথা নুইয়ে মহিলাদের সম্মান জানালে এবং খুব অবাক হলেন শুনে যে এরা মহিলা। তারা ভেবেছিলো এরা আরেক ধরনের ইউরোপিয়ান। দেয়ালে টাঙানো ছবি, টেবিলে নৈশভোজের জন্য সাজানো চীনামাটির বাসনকোসন, কেরোসিন তেলের আলো সব তাদের বিস্মিত করেছিলো। বিমস লিখেছেন, "পরে শুনলাম, আমাদের সাধারণ ইংলিশ হাউসের জাকজমক দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। কিছু কিছু জিনিসকে ভেবেছিলো জাদু।"

বিমস লুসাইদের বর্বর বা 'স্যাভেজ' বলে উল্লেখ করেছেন। জানিয়েছেন, যদি

এদের বিপরীত কিছু উল্লেখ করতে হয় তাহলে তা পাওয়া যাবে চাঁটগা শহরের পর্তুগিজদের মধ্যে। এদের অধিকাংশ খাটি পর্তুগিজ নয়। পুরনো পর্তুগিজ জলদস্যু ও তাদের মগ ক্রীতদাসীদের উত্তরাধিকারী তারা, যদিও নামগুলি বাহারি পর্তুগিজের। নামগুলি হলো– পেরিইরা, টেইক্সিয়ারা, ডা সিলভা, ডা সুওজা, আলমেইডা। তাদের অধিকাংশের চেহারা মঙ্গোলিয়ান। এরা হচ্ছে লম্পট, অপদার্থ, frowsy. "আমি একবার তাদের পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তার অনুসারীদের সম্পর্কে। পুরোহিত ইতালীয়, নতুন এসেছেন। উত্তরে হেসে তিনি মাত্র একটি শব্দ মাত্র উচ্চারণ করলেন– 'পশু'।" ভদ্রলোক শিক্ষিত একজন বেনেডিকটিন। তার অনুচরদের জন্য খুব বেশি ভালো। পর্তুগিজরা হলো অলস, অহংকারি এবং immoral. পুরুষরা পরে শাদা রংয়ের ক্যালিকো শার্ট, সুতির গাউন, কালো ম্যান্টিলা, হাতে রঙ্গীন ছাতা। নেটিভ টাউনে, নদীর ধারে তাদের আছে দোকান। সেখানে সামনের ঘরে নাবিকদের বিক্রি করে খারাপ মদ। পেছনের ঘরে মহিলাদের সঙ্গে চলে অনৈতিক কাজ। কলহ চলছে সব সময়। দু'জন ইউরোপিয়ান কনস্টেবলের নেতৃত্বে দেশি পুলিশরা এই জঘন্য বস্তিতে শান্তিরক্ষার্থে ব্যস্ত। ওলন্দাজ একজন রোমান ক্যাথলিক বিশপ ও পূর্বোক্ত পুরোহিত প্রাণপন চেষ্টা করছেন। [এদের সুশৃঙ্খল করতে] কিন্তু ফলাফল শূন্য। বর্ষায় সময় শহরের নিচু অঞ্চল ডুবে যায় এবং তখন দেখা দেয় কলেরা এবং খুব খারাপ রকমের ম্যালেরিয়া। বিমস লিখেছেন, চাঁটগার বৃষ্টি দেখার মতো। প্রথম মাসে (আষাঢ়?) ভোরের এবং ৩১ তারিখ রাত দশটায় ঘুমোতে গেলেও দেখা যাবে অক্লান্তভাবে বৃষ্টি পড়ছে। সবকিছু হয়ে যায় স্যাঁতস্যাঁতে, বইয়ের বাঁধাই খুলে পড়ে, পাহাড়ের চারদিকে আগাছা বাড়তে থাকে, পানি গড়িয়ে নিচে পড়ে দুর্গন্ধময় কাঁদাটে অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে বিমস তাঁর বন্ধু ইলিয়টকে ১৮৭৮ সালের আগস্ট মাসে যে চিঠি লিখেছিলেন তা থেকে উদ্ধৃত করছি। বৃষ্টি ও চট্টগ্রামের প্রতি বিমসের বিতৃষ্ণা তাতে স্পষ্ট হবে, অনুবাদে যা অনুভব করা যাবে না। তিনি লিখেছিলেন–

"Whatsoever thing and loathsome, thatsoever thing and slimy. Whatsoever thing are stinking, sickening, ghastly, oozy, decaying and decayed, morbiferous, facculent, miasmatic, malarious and repulsive-these things abound. And over everything steadily, slowly, pitilessly, drenchingly, comes down by night and by day the dull, deadly rain like a pall covering the flaccid corpse of the soil."

সেপ্টেম্বরে লুসাইদের মধ্যে আবার ঝামেলা বাঁধলে বিমসকে যেতে হলো রাঙ্গামাটি। তিন লুসাই নেতার একজনকে আটকাতে পেরেছিলেন পুলিশ অফিসার কাউচ। ধৃত নেতার নাম ভানটেইয়া । অপর দু'জন লুসাই নেতা গভীর জঙ্গলে পালিয়ে গেছিলেন। ক্রাউচ ভানটেইয়াকে নিয়ে সার্কিট হাউসে দেখা করতে এলেন

বিমসের সঙ্গে। বৈঠকখানা একটি, সেখানে বিমস ছাড়াও তাঁর স্ত্রী ও অন্যান্য মহিলারা ছিলেন। ঝামেলাটা হলো পইবই পুরোপুরি উলঙ্গ। তাকে লাল একটি কম্বল দেয়া হলো গায়ে জড়ানোর জন্য। তিনি নেবেন না। ফলে, একটি সমঝোতা করতে হলো। যতক্ষণ ভানটেইয়া একটি চেয়ার পর্যন্ত না পৌঁছলেন ততক্ষণ দু'জন তার সামনে কম্বলটি ধরে রাখলো। ভানটেইয়া চেয়ারে বসলে তার সামনে কম্বল ধরে রাখা হলো শুধু তার মাথা আর হাত বাইরে রইলো। সে ভাবে ভানটেইয়া কথা বলে হাটতে লাগলেন আর দোভাষী তা অনুবাদ করতে লাগলেন। এরিমধ্যে তাকে এক গ্লাস নিট ব্রান্ডি দেয়া হলো এক চুমুকে তিনি গিলে ফেলে গ্লাসটি বাড়িয়ে দিলেন। তবে, গর্ডন আর মদ দিলেন না। আলোচনা শেষ হলে ভানটেইয়া দরজার দিকে রওয়ানা দিলেন। এবার কম্বলটি তার পিছে ধরা হলো। তিনি তা পরলেন না বটে তবে উপহার হিসেবে তা গ্রহণ করলেন। যাবার সময় বড়সড় একটা কাচের পানপাত্র পছন্দ হলে সেটিও তুলে নিলেন। বিমস তার প্রশংসা করে লিখেছেন (তবে বর্বর হিসেবে বিবেচনা করেই) "He was a splendid animal- tall, muscular and active, with a keen, bright eye and a lordly demeanour."

চাঁটগায় ফেরার পর ভিন্ন এক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হলো। চাঁটগা বন্দরে ঢোকার মুখে চড়ায় তুলে দেয়া হয়েছে একটি ব্রিটিশ জাহাজ, নাম আসেনবেলে। বিমস জানলেন তাকে এর বিচার করতে হবে। পার্লামেন্টের এক আইনের বলে তিনি কোর্ট অব এডমিরালিটিরও বিচারক। কারণ পদাধিকারবলে 'চিফ কাস্টমস অথরিটিজও। এ ব্যাপারে বিমস বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন যা টেকনিকালিটিতে ভরা। শেষ কথা হলো, সবার কাছ থেকে শুনেটুনে পরামর্শ নিয়ে ক্যাপ্টেনের লাইসেন্স তিনি ছয়মাসের জন্য বাতিল করলেন তার অদক্ষতার জন্য।

চাঁটগাতো বিমসের পছন্দ না। এর আবহাওয়া, সরকারি কর্মচারি কিছুই পছন্দ ছিল না বিমসের। তাঁর মতে, চট্টগ্রাম পরিচিত পিনাল স্টেশন হিসেবে। বিমস লিখেছেন, তিনি পরে তাঁর বন্ধুদের কাছে শুনেছেন যে, তারা অবাক হয়েছেন বিমসের মতো একজন ভালো অফিসারকে চাঁটগায় বদলি করায়। সবাইর মতে, ব্যক্তিগত প্রতিশোধের কারণে ইডেন এমনটি করেছিলেন। সরকারি কর্মচারি ছাড়াও চট্টগ্রামে ছিল কিছু ব্যবসায়ী, চাকর। অসংস্কৃত একদল ব্যাচেলর ভদ্রসমাজের জন্য অবাঞ্ছিত। যাহোক, অসেনবেলর মামলা শেষ হতেই বিমস ঠিক করলেন কক্সবাজার যাবেন।

নভেম্বর, ১৮৭৮ সালে বন্ধু ইলিয়টকে কক্সবাজার সম্পর্কে একটি বর্ণনা পাঠিয়েছিলেন বিমস। বর্ণনা মতে, চট্টগ্রামের প্রায় ১২০ মাইল দক্ষিণে কক্সবাজার। চট্টগ্রামের একটি মহকুমা। ১৭৯৩ সালের দিকে বর্মীদের সঙ্গে ব্রিটিশদের যুদ্ধ চলছিলো তখন জনৈক ক্যাপ্টেন কক্স এর পত্তন করেছিলেন।

আরাকানীদের অত্যাচারে মগরা পালাচ্ছিলো আর তাদের বসতির জন্য কক্সের কাছে এটিই ভালো জায়গা মনে হয়েছিলো। দুর্গন্ধময় আবর্জনা ভরা এক খালের পাশে তখন এক জলাভূমি কক্সবাজার। উঁচু বালির তীর সমুদ্র থেকে তাকে আড়াল করে রেখেছে। যাক, জায়গাটি গড়ে উঠলো। চার বছর ধরে, বিমসের ছোট ভাই হ্যারি কাজ করেন চট্টগ্রামের এসডিও হিসেবে। মাঝে মাঝে তার সঙ্গে ফায়ারফ্লাইয়ে সাগর ভ্রমণ করে নিজেকে সে বাঁচিয়ে রেখেছিলো। কক্সবাজারের তুলনায় চট্টগ্রামে নোংরা, আত্মাহরণকারি দুর্গন্ধ কিছুই না। বাঁশের মাচায় এরা বাস করে। নিচে যাবতীয় আবর্জনা। প্রধান খাওয়া মাছ পচিয়ে তারা খায়। তাদের কাছে এই সুস্বাদু খাবার নাপ্পি নামে পরিচিত। এক মাইল দূর থেকে এর গন্ধে যে কোনো মগকে চিহ্নিত করা যায়। তবে, মগরা খুব প্রাণোচ্ছল সব সময় হাসিখুশি, মুখে এক গজ লম্বা চুরুট। দৃশ্যত তারা কোনো কাজ করে না। নোংরা, ক্ষুদ্র বিজ্ঞ বাঙালিরা তাদের কাজকর্ম করে। ভালোভাবে তাদের ঠকায়। মগরা যদি কখনও কিছু করে তা হলো মাছ ধরা।

মাথায় মগরা বাঁধে এমারেল্ড সবুজে লাল ফুলের। কমলায় বেগুনি ফুলের ছাপ দেয়া সিল্কের রুমাল যা ম্যাঞ্চেস্টারে তৈরি। রঙিন ধুতির ওপর চড়ায় উজ্জ্বল নীল, হলুদ অথবা লাল রংয়ের কোট। মেয়েরা পরে আটোসাটো বডিজ আর উজ্জ্বল রংয়ের পেটিকোট। চুলে কখনও কখনও ঝোপঝাড় থেকে ফুল তুলে গুজে। দৃশ্য সব ছবির মতো। সমুদ্রের কাছাকাছি হ্যারির বাসা। সেখানে থেকে দেখা যায় লম্বা ঝকঝকে বালুতীর। হঠাৎ নিচু পাহাড়ের সারি গাছে ঢাকা। "আরো দক্ষিণে একটি দীর্ঘ নীল বিন্দু (এলিফ্যান্ট পয়েন্ট) মিশেছে গিয়ে সাগরে। উত্তরে বৃক্ষশোভিত কিছু দ্বীপ, উপকূল আর এরি মাঝ দিয়ে গেছে চট্টগ্রামে আমাদের ফিরে যাওয়ার পথ।"

এরিমধ্যে ক্রিসমাস এলো। আশপাশের চা-বাগান থেকে কিছু সংস্কৃত ইংরেজ, স্কট আর আইরিশ চা-কর এলো। সারাদিন ক্রিকেট খেলে, ভালোভাবে নৈশভোজ খেলো এবং প্রচুর মদ্যপান করে গান গাইলো। পরদিন সকালে প্রবল মাথাব্যাথা নিয়ে নিজ নিজ জঙ্গলের দিকে রওয়ানা হলো তবে বারবার বলতে ভুললো না যে, চমৎকার সময় কাটিয়েছে তারা।

১৮১৯ সালের নববর্ষে বিমস চাঁটগার এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কিছু কবিতা পেলেন উপহার হিসেবে। ভদ্রলোকের নাম রাম কিনু দত্ত। চট্টগ্রামের কবি হিসেবে পরিচিতি। তাঁর বন্ধুরা কবি হিসেবে তার ভক্ত, অনেকে এমন ভক্ত যে, তাঁকে 'বাংলার বায়রণ' ডাকতেও দ্বিধা করে না। রামকিনুর নিজের ক্ষমতার ওপর আস্থা প্রবল এবং প্রায়ই তিনি ভাইসরয় ও অন্যান্য উচ্চ পদাধিকারীদের কবিতা পাঠান। ভদ্রতার খাতিরে তাঁরা তাঁকে জানাতেন যে তাঁর সুন্দর কবিতাবলী পেয়েছেন। এতে রামকিনুর আত্মবিশ্বাস আরো দৃঢ় হতো। অধস্তন মেডিকেল সার্ভিসের সদস্য ছিলেন

তিনি। সার্ভিস সম্পর্কে বিমসের অবজ্ঞা বোঝা যায় এ মন্তব্যে "a very useful class of men who are placed in charge of hospital in various places."

দীর্ঘদিন চাকুরি করার পর অবসর নিয়ে চট্টগ্রামের সবচেয়ে ম্যালেরিয়া বেস্টিত জায়গায় বসে রামকিনু আনন্দের সঙ্গে কাব্য রচনা করছেন যা তাঁর মতে ইংরেজি কবিতা। বিমসকে যে কবিতা তিনি পাঠিয়েছেন তা চমৎকার হাতের লেখা, কাগজের চারদিকে রঙ্গিন বর্ডার করা যা করতে দীর্ঘ সময় লেগেছে। বিমস ঠাট্টা করে লিখেছেন, তাঁর অমর কবিতার কিছু উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আমি এখানে শুধু একটি উদ্ধৃত করছি–

Old year!
Sir (me-not the old year).
Our friend old year gasping his last
Neither he tastes supper nor break-fast,
Not inclines sago, not a drop of tea,
Never feels well even in the land or sea;
His declining health now never gives him hopes,
Shudders at the face, and senselessly mopes.

[তারপর ১০০ লাইন শেষে উপসংহার]

He is sorry for a look about cabul prepotency
In to assume the beauty of a decadency- Adieu!
R.K.D

শেষবার তখন বিমসের সঙ্গে রাম কিনুর দেখা হয় তখন তিনি ফ্রাংকো-প্রাশিয়ান যুদ্ধ সম্পর্কে ১০০০ লাইনের একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। বিমসকে তা পড়ার অনুরোধও করেছিলেন। বিমসের সময় হয়নি। তাঁর ভাষায়, "Unfortunately I had not leisure for such a stupendous task."

১৮৭৮-৭৯ সালের শীতে বিমস টুর ওয়ার্কে বেরিয়েছিলেন। স্টিমারেই তিনি ভ্রমণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, পূর্ববঙ্গে পায়ে হেটে চলাচল করা কষ্টকর। পুরো এলাকাটিই নদী, নালা, জলাভূমিতে ভরা। নৌকা চলাচলের একমাত্র উপায় বিশেষ ডোঙ্গা। নদীতে কুমিরও আছে। পাহাড়ি এলাকায় ভ্রমণ আরামদায়ক নয়, এমনকী নৌকায়ও। পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবানের উল্লেখ করেছেন তিনি। কিছু জঙ্গল পরিষ্কার করে কিছু কুটির তৈরি করে কিছু মানুষ বসবাস করছে। পাহাড়ের নিচ দিয়ে বয়ে চলছে সাঙ্গু নদী। নদীপথেই একমাত্র বান্দরবান যাওয়া যেতো। লুসাইরা উপত্যকা দিয়ে এসে প্রায়ই এই ঘাঁটি আক্রমণ করতো। কিছু গুর্খা সৈন্য

নিয়ে একজন ইংরেজ অফিসার সেখানে ছিলেন। জঙ্গলে কোনো খাওয়া পাওয়া যেতো না। সমস্ত খাবার-দাবার আসতো ৬০/৭০ মাইল দূরে চট্টগ্রাম থেকে, নদীপথে। ঐ নিরানন্দ জায়গায় ছিলেন এক তরুণ লেফটেন্যান্ট কারনাক। নিয়ত নিসঙ্গতা, খারাপ খাবার এবং তারপর ঐ এলাকার প্রবল জ্বর। কাবু হয়ে পড়েছিলেন কারনাক। ছোট ডোঙ্গায় করে ঐ অবস্থায় তাঁকে নিয়ে আসা হয় চাঁটগায়। বিমসের বাসায় তোলা হয় তাঁকে। বিমসের স্ত্রী সেবা-শশ্রূষা করে তাকে খানিকটা সুস্থ করে তোলেন। প্রথম স্টিমারেই বিমস তাকে কলকাতা পাঠিয়ে দেন। যথাযথ চিকিৎসার পর কারনাক প্রাণে বেঁচে যান। বিমস সরকার থেকে আগাম একটি আদেশ আনিয়ে নিয়েছিলেন। তার কোনো কর্মচারী এ ধরনের রোগে আক্রান্ত হলে তাকে তিনি চাঁটগা থেকে পাঠিয়ে দিতে পারবেন সরকারি আদেশের অপেক্ষা না করে।

বিমস লিখেছেন, তাঁর সৌভাগ্য যে এসব জায়গা পরিদর্শনে তাকে যেতে হয়নি। তবে, বিচারক হিসেবে প্রতিবছর মুনসেফ কোর্ট পরিদর্শন করতে যেতে হতো। এবং মুনসেফরা সঠিকভাবে তাদের কর্তব্য পালন করছে কিনা সে বিষয়ে প্রতিবেদন পাঠাতে হতো হাইকোর্টে। এর দায়িত্ব বিমস অতিরিক্ত বিচারককেই দিতেন। তিনি ছিলেন 'নেটিভ'। তবে মাঝে মাঝে তাকে মুনসেফ কোর্ট পরিদর্শনে যেতে হতো। এসব পরিদর্শনকে তিনি তামাসা বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ, পরিদর্শনের দিন আগে থেকে জানিয়ে দেয়া হতো। মুনসেফ যে কোনো একটি মামলার রিহার্সাল দিয়ে রাখতেন। এরকম একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন বিমস। তিনি পরিদর্শনে যাবার পর মামলার কার্যক্রম শুরু হলো। দু'পক্ষের উকিলের সওয়াল-জওয়াব, কোর্টের রীতি-পদ্ধতি, মুনসেফের কোর্ট পরিচালনা সব নিখুঁত। শুধু তাই নয়, কয়েক ঘণ্টার এই মামলার তর্ক-বিতর্ক, মুনসেফের রায় এত চমৎকার ও উচ্চমানের যে দেখে মুগ্ধ হতে হয় এবং মনে হতে পারে মামলাটির মূল্য কয়েক হাজার টাকার। আসলে মামলাটির মূল্য ছিল দুই টাকা চার আনার।

অবশ্য, এই পরিদর্শন উপলক্ষে চাঁটগার বদনাম করতে ছাড়েননি বিমস। তিনি লিখেছেন, প্রতিটি জেলায় এ ধরনের চার পাঁচটি কোর্ট থাকে, উদ্দেশ্য, ঐ জনগণের দরজায় বিচার ব্যবস্থা পৌঁছে দেয়া– এটি এ অঞ্চলের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক কারণ এখানে মামলা হলো সব মানুষের প্রধান বিনোদন ও আনন্দ। এবং সারা বাংলার চাঁটগা পরিচিত সবচেয়ে বেশি মামলাবাজ শহর হিসেবে (বিমস উল্লেখ করেছেন 'par excellence') যেখানে কোর্টের সংখ্যা ১২টি।

এরপর বিমস আরেকটি মামলা যার সঙ্গে জড়িত ছিল পর্তুগিজ, ইংরেজ ও কিছু 'নেটিভ' যার দীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন যা আমাদের আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক না বলে বাদ দিলাম। এরপর বিমসের বিবরণ হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেছে।

১৫
কোই হ্যায়?

ড্যাশের বাবা ছিলেন ডাকঘরের জুনিয়র সার্ভেয়ার। আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভালো ছিলো না। ড্যাশের বয়স যখন নয় আর বোন হিল্ডার বয়স সাত তখন মারা যান তিনি। সংসারের দায় বর্তালো ড্যাশের মায়ের ওপর। প্রভাবশালী আত্মীয়-স্বজনদের ধরপাকড়ের ফলে চাকরি পেলেন তিনি উরচেস্টারশায়ারের পেরশোরে পোস্ট মিসট্রেস হিসেবে। ডাকঘর হিসেবে গুরুত্বহীন, বেতনও তেমন। ড্যাশের বাবাকে দত্তক নিয়েছিলেন তাঁর সৎ বোনের স্বামী জেমস গ্যালাওয়ে। তিনি ছিলেন পার্লামেন্টের সদস্য। ড্যাশের বাবা মারা গেলে তাঁর মনে হলো পরিবারটির জন্য কিছু করা উচিত। তখন তিনি ড্যাশ ও তার বোন হিল্ডার জন্য সাতশ' পাউন্ড করে দুটি ট্রাস্ট করে দেন।

ড্যাশের মা চেয়েছিলেন ছেলে শিক্ষিত হোক। এ জন্য সংসারের সব দুঃখ-কষ্ট স্বীকারে ছিলেন তিনি প্রস্তুত। ড্যাশ নিজেও ছিলেন মনোযোগী। বৃত্তি নিয়ে একটির পর একটি ধাপ পেরিয়ে পৌঁছলেন তিনি অক্সফোর্ড পর্যন্ত। অক্সফোর্ডে ভর্তি হলেন অংকে এবং লাভ করলেন অনার্স ডিগ্রি। ডিগ্রি পেয়েই ঠিক করলেন "বিশ্বের সেরা চাকরি" অর্থাৎ ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস বা আইসিএস হওয়ার জন্য পরীক্ষা দেবেন। তখন বাইশ থেকে চব্বিশ বছর বয়সের মধ্যে পরীক্ষা দিতে হতো।

অক্সফোর্ড থেকে ডিগ্রি নিয়ে যখন ড্যাশ ছুটি কাটাচ্ছেন লন্ডনে তখনই তাঁর মা মারা যান। একদিকে অর্থসঙ্কট, অন্যদিকে শোক– তবুও এরই মাঝে প্রস্তুতি নিলেন পরীক্ষা দেয়ার জন্য। আইসিএস পরীক্ষার্থীদের জন্য তখন লন্ডনে অনেক 'কোচিং স্কুল' ছিলো। যেগুলোকে বলা হতো "ক্র্যাম স্কুল"। এসব স্কুলে পরীক্ষার্থীদের নানা টিপস দিয়ে তৈরি করা দেয়া হতো পরীক্ষার জন্য। পরীক্ষা ছিলো ছয় হাজার নাম্বারের। ড্যাশ যেসব বিষয় জানেন তাতে চব্বিশ শ' নাম্বার পর্যন্ত পরীক্ষা দিতে পারতেন।

লন্ডনে টেইলর নামে এক ভদ্রলোকের একটি 'ক্রাম স্কুল' ছিলো। ড্যাশ আলাপ করলেন তাঁর সঙ্গে। টেইলর জানালেন, বাকি চৌত্রিশ শ' নাম্বার তিনি কভার করে দেবেন। তবে, ক্র্যাম স্কুলে এক বছর কষ্ট করতে হবে এবং ফিস আড়াই শ' পাউন্ড। মনে মনে হিসাব করলেন ড্যাশ, তাঁর জন্য ট্রাস্ট ফান্ডে যে সাত শ' পাউন্ড জমা আছে তা থেকে যদি আড়াই শ' পাউন্ড দেন তবে থাকে আর মাত্র সাড়ে চার শ' পাউন্ড। এ টাকা দিয়ে কি লন্ডনে এক বছর খরচ চালাতে পারবেন? উপায় নেই। লন্ডনে কোনোরকমে থাকার ব্যবস্থা করে ভর্তি হয়ে গেলেন ক্র্যাম স্কুলে।

পরীক্ষা হলো যথাসময়ে এবং টানা বিশ দিন। ফল বের হলে দেখা গেল ড্যাশের স্থান অনেক নীচে কিন্তু ভাগ্যজোরে নির্বাচিত হয়ে গেছেন। অন্যদিকে, তাঁর বন্ধু ইউজিন মস মাত্র দেড় মাস ক্র্যাম স্কুলে পড়ে পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তাঁর ফলাফল এতো ভালো হলো যে, তিনি হোম সিভিল সার্ভিস পেয়ে গেলেন।

ড্যাশ ছিলেন রুডিয়ার্ড কিপলিংয়ের ভক্ত। তাই তিনি চেয়েছিলেন পাঞ্জাব ক্যাডার। পেলেন না। কারণ, পাঞ্জাব ক্যাডারের প্রার্থী অনেক। তিনি পেলেন নতুন গঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম ক্যাডার যা ছিল তাঁর চতুর্থ পছন্দ।

আইসিএস পাস করার পর শিক্ষানবিসী ছাত্র হয়ে থাকতে হয় এক বছর। তাই ড্যাশকে আবার প্রবেশনার হিসেবে আইন ও ভাষা শিক্ষার জন্য আসতে হলো অক্সফোর্ড। ঘোড়ায় চড়া শেখাও ছিল একটি বিষয় এবং বেশ সিরিয়াসলি নেয়া হতো বিষয়টিকে। সব বিষয়ে ভালোভাবে পাস করার পরও যদি কেউ ঘোড়ায় চড়া পরীক্ষায় ফেল হতো, তাহলে ফেল। এক বছর পর পরীক্ষা হলো। ফল ভালো হলো না। দুই ধাপ নিচে চলে গেল তাঁর নাম। ফলে তাঁর জ্যেষ্ঠতায় ক্ষতি হয়েছিলো।

এবার ভারত যাবার পালা। নতুন আইসিএসদের পৌঁছে দেয়ার বন্দোবস্ত করতো তিনটি কোম্পানি। তিনটির মধ্যে ড্যাশ গ্রিন্ডলেজকেই বাছলেন। সাঁইত্রিশ পাউন্ড বিশ শিলিং দিয়ে গ্রিন্ডলেজ ড্যাশকে প্রথম শ্রেণীর টিকেট কেটে দিলো। ড্যাশের কাছে সেই সাড়ে চার শ' পাউন্ডের আর কিছুই প্রায় ছিলো না, তবুও মনটা ছিলো দুশ্চিন্তামুক্ত। দুনিয়ার সেরা চাকরি পেয়েছেন একবার পরীক্ষা দিয়েই, নিজের দেখাশোনা এবার নিজেই করতে পারবেন।

১৯১০ সালে, ড্যাশসহ পনেরো জন আইসিএস ও চারজন আইপিএস [ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস] নিয়ে 'সিসিলিয়া' রওয়ানা হলো ভারতবর্ষের দিকে।

॥ ২ ॥

তরুণ আইসিএসদের জাহাজ যখন গার্ডেন রিচের কাছে তখন তাঁদের হাতে এল

একটি সরকারি চিঠি। সবার জন্য ঐ একটিই চিঠি। চিঠির মাধ্যমে বাংলা সরকারের পলিটিক্যাল অ্যান্ড এপয়ন্টমেন্টস ডিপার্টমেন্টের আন্ডার সেক্রেটারি জানাচ্ছেন যে, নব্য আইসিএসদের থাকার বন্দোবস্ত করা হয়েছে বেঙ্গল ইউনাইটেড সার্ভিস ক্লাবে। এবং কলকাতায় পৌঁছে 'নিম্নস্বাক্ষরকারীর' সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ করতে হবে পোস্টিং অর্ডার জানতে।

কলকাতায় নেমে গেলেন তাঁরা বেঙ্গল ক্লাবে। এলিট ও অভিজাতদের ক্লাব বলতে তখন বোঝাতো বেঙ্গল ক্লাবকেই। সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ার আগে আইসিএসরা এখানেই থাকতেন। ড্যাশ ও তাঁর বন্ধুবান্ধবরা ক্লাবে মালপত্র রেখে, খানিকটা থিতু হয়ে দল বেঁধে গেলেন রাইটার্স বিল্ডিংয়ে। দেখা করলেন আন্ডার সেক্রেটারির সঙ্গে। আন্ডার সেক্রেটারি খুব কৃপাভরে প্রত্যেকের নাম ডাকলেন, রেজিস্টার চেক করলেন। তারপর যারা বাংলা ক্যাডারের তাদের আলাদা করলেন। এবং মেপে মেপে বললেন, দুপুর দেড়টায় গভর্নমেন্ট হাউসে গভর্নর বাংলা ক্যাডারের আইসিএসদের সঙ্গে লাঞ্চ করবেন। তখন তাঁরা কে কোথায় পোস্টিং পেয়েছেন জানিয়ে দেয়া হবে।

এরপর আন্ডার সেক্রেটারি অবহেলাভরে তাকালেন পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের ক্যাডারদের দিকে। তাচ্ছিল্যভরে জানালেন, তাঁদের পোস্টিং সম্পর্কে রাইটার্সের কোনো মাথাব্যাথা নেই। তাঁরা যেন নিজ নিজ খরচে পূর্ববঙ্গ সরকারকে টেলিগ্রাম করে জেনে নেন তাঁদের পোস্টিং সম্পর্কে। ব্যাস, ইন্টারভিউ শেষ! লাঞ্চ দূরের কথা, কোথায় তাঁরা যাবেন তাও জানানো হলো না। একটু যে মনে লাগেনি তা নয়। কিন্তু কি আর করা। পূর্ববঙ্গ ও আসামের হতভাগ্য ক্যাডাররা রাইটার্স ছেড়ে বেরিয়ে এলেন।

যেন ভেড়া থেকে ছাগল আলাদা করা হলো– এমনিই মনে হলো নিজেদের। মনমরা ভাব কাটানোর জন্য তাঁরা পেলেটির রেস্টুরেন্টের দিকে রওয়ানা হলেন। এর নাম ডাক তাঁরা আগেই শুনেছিলেন। দলবেঁধে পেলেটিতে খেয়েদেয়ে গেলেন হোয়াইট ওয়ে লেডলে। সেখান থেকে কাপড় চোপড় এবং দরকারি জিনিসপত্র কিনে হেঁটেই রওয়ানা দিলেন ক্লাবের দিকে। ঠিকা গাড়ির ভাড়া জানেন না। কতো না কতো দিতে হয়– তার চেয়ে হেঁটে যাওয়াই ভালো। তাঁরা অবশ্য তখনও জানতেন না যে আইসিএসদের তিনশ' কদমও হেঁটে যেতে নেই।

ফুটপাত ভর্তি মানুষ। ড্যাশ ও তাঁর বন্ধুবান্ধবরা পাশাপাশি হেঁটে চলছেন, উৎসাহভরে গল্পগুজব করছেন। ক্লাবে আসার পর হঠাৎ তাদের খেয়াল হলো ফুটপাত ভর্তি ছিল মানুষ, কিন্তু তারা হেঁটে এসেছেন পাশাপাশি। কারো সঙ্গে একটু ধাক্কাও লাগেনি। হাঁটার গতিও শ্লথ হয়নি। এতো নিরিবিলি হেঁটে আসা সম্ভব হলো কিভাবে? তার মানে, সবাই পথ ছেড়ে তাদের জায়গা করে দিচ্ছিল। না, ব্রিটিশ

সাম্রাজ্য এখনও চলছে। এবং তা খারাপ না– মনে হলো ড্যাশের।

পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের ক্যাডারদের আরো তিন দিন অপেক্ষা করতে হলো পোস্টিং অর্ডারের জন্য। গাঁটের পয়সা খরচ করে প্রত্যেকে টেলিগ্রাম পাঠালেন ঢাকায় আর শিলংয়ে। ড্যাশ জানলেন, তাঁকে যেতে হবে চট্টগ্রাম।

চট্টগ্রাম? বা চিটাগাং? কোথায় সেটা? ম্যাপ খুলে খুঁজেপেতে বের করলেন চট্টগ্রাম। কিন্তু যাবেন কিভাবে? খানিকটা ক্যাজুয়ালি ক্লাব সেক্রেটারিকে জিজ্ঞাসা করলেন। সেক্রেটারি আরো ক্যাজুয়ালি বললেন, সকাল সাতটায় শিয়ালদা থেকে চিটাগাং মেইল ছাড়ে। কিন্তু তারপর? সেক্রেটারি এ বিষয়ে আর উচ্চবাচ্য করলেন না। ড্যাশের চিন্তা, এতো মালপত্র নিয়ে সকাল ছ'টায় শিয়ালদা পৌঁছবেন কিভাবে? দুপুরে লাঞ্চের সময় দু'একজন পরিচিতের কাছেও ব্যাপারটা বিশদভাবে জানতে চাইলেন। বিশদভাবে কেউই কিছু বলতে পারলো না। ভাসা ভাসা যেটুকু জানলেন, তা হলো সকালে শিয়ালদা থেকে রওয়ানা হলে দুপুর বারোটা নাগাদ গোয়লন্দ পৌঁছবেন। তারপর আধ মাইল বালুময় তীর পেরিয়ে উঠতে হবে স্টিমারে। সে স্টিমার যাবে চাঁদপুর। রাত সাড়ে আটটার দিকে চাঁদপুর থেকে আবার উঠতে হবে ট্রেনে। সাড়ে এগারোটার দিকে রওয়ানা হবে ট্রেন। চাটগাঁয় পৌঁছবে তা পরদিন ভোর সাতটায়। এসব শুনেটুনে ড্যাশের মাথা খারাপ হবার যোগাড়। হঠাৎ তাঁর মনে হলো লন্ডন থেকে তাঁর কলকাতায় আসার সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল গ্রিন্ডলেজ। তাদের কাছেই না হয় যাওয়া যাক।

ড্যাশ গেলেন গ্রিন্ডলেজ কোম্পানিতে। সব শুনেটুনে গ্রিন্ডলেজের ছোকড়া সাহেব বললেন, হ্যাঁ, যাওয়ার হাঙ্গামাতো আছেই। তবে, একটানা জাহাজেও যাওয়া যায়। একথা শুনে আশ্বস্ত হলেন ড্যাশ। কারণ, জাহাজে তিনি ভ্রমণে অভ্যস্ত। ট্রেনে নয়। ছোকড়া জানালো, পরদিন 'এসএস মিয়ানাচি' রওয়ানা হবে চাটগাঁর দিকে। ড্যাশ কি যেতে রাজি? এক কথায় রাজি। তখনই ক্লাবে গিয়ে মালপত্র নিয়ে এলেন, গ্রিন্ডলেজই মালপত্র সব হাওলা করে দিলো জাহাজে।

পরদিন 'এসএস মিয়ানাচি' দেখে ড্যাশ খানিকটা ঘাবড়েই গেলেন। প্রায় ভাঙ্গাচোরা একটি মালবাহী জাহাজ। ড্যাশই একমাত্র যাত্রী। শুধু তাই নয় এ জাহাজের এটিই শেষ যাত্রা। চাটগাঁ থেকে 'মিয়ানাচি' যাবে জাপান এবং সেখানে তাকে ভাঙ্গা হবে। না, জাহাজে কোনো বিপদ হয়নি। পরদিন সকালে জাহাজ পৌঁছলো চট্টগ্রাম।

॥ ৩ ॥

জাহাজ বন্দরে ভিড়তেই জমকালো পোশাক পরা এক চাপড়াশি সালাম জানাতে জানাতে এল ড্যাশের কাছে। তারপর বিনীতভাবে ড্যাশের হাতে একটি চিঠি দিয়ে

জানালো, ফিলিমোর সাবের চিঠি। জন ফিলিমোর চট্টগ্রামের জেলা এবং সেশন জজ। চাটগাঁয় তাঁর বাসায়ই আপাতত থাকবেন ড্যাশ। ফিলিমোর সাহেব তাই জানিয়েছেন ড্যাশকে। টমটমে চড়ে প্রায় দু'মাইল পেরিয়ে পৌঁছলেন জজ সাহেবের কুঠিতে। জজ সাহেবের বাংলো পাহাড় চূড়োয়। সাতানব্বইটা সিঁড়ি ভেঙ্গে 'কোঠিতে' পৌঁছলেন ড্যাশ।

ফিলিমোর তখন রওয়ানা হচ্ছেন অফিসে। ড্যাশকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে এক চাকরের হাতে ড্যাশের ভার দিয়ে রওয়ানা হলেন অফিসের দিকে। চটপট নাস্তা খেয়ে ড্যাশও তৈরি হয়ে নিলেন। তারপর টমটমে করে রওয়ানা হলেন অফিসের পথে, চট্টগ্রামের সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেকটর হিসাবে দায়িত্ব বুঝে নিতে। অফিসে যোগ দেয়ার পরপরই তাঁর বেঞ্চ ক্লার্ক আরশাদ হোসেন জানালেন, তাঁকে থার্ড ক্লাশ ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এবং ইতোমধ্যে একটি মামলা তাঁর কোর্টে এসেছে।

প্রথম দিনেই ঝামেলা। আদালতে গিয়ে বসলেন ড্যাশ। কিন্তু যে ভাষায় সওয়াল জবাব হচ্ছে তার কিছুই বোঝেন না। অনুবাদ করে তাঁকে আবার শুনতে হয়। মামলাটি হলো একজনের ছাগল আরেকজনের ধান খেয়ে ফেলেছে। এই নিয়ে মারামারি এবং তারপর মামলা। সারাদিনেও শুনানি শেষ করা গেল না। পরদিনের জন্য শুনানি মুলতবি রেখে রওয়ানা হলেন তিনি বাসার দিকে। ৯৭টা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে একেবারে শ্রান্ত হয়ে বসে পড়লেন বারান্দায়। তাঁর চাকর খবরের কাগজ আর চা নিয়ে এল। এই ভৃত্য ফিলিমোরই ঠিক করে রেখেছিলেন।

মিনিট বিশেক পর জজ সাহেবও ফিরলেন। বারান্দায় ড্যাশের পাশে বসে ড্যাশের খবরের কাগজটা নিয়ে পড়া শুরু করলেন। তাঁর ভৃত্য তাঁর জন্য চা নিয়ে এল। ড্যাশ তাঁর প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা জানালেন। চা খেতে খেতে নীরবে তা শুনে ফিলিমোর উপদেশ দিয়ে বললেন, চাটগাঁইয়া ভাষা নিয়ে না ভাবতে বরং স্টান্ডার্ড বাংলাটা শিখে নিতে– যা সবাই বোঝে। ভাষা না জানলে প্রমোশন ট্রমোশন হবে না। বেতনও বাড়বে না। কোনো কাজও হবে না। বললেন ফিলিমোর "তোমার চা খাওয়া হয়েছে? [বিরতি] ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস সম্পর্কে তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। আইসিএসদের সবকিছু ভালোভাবে জানতে হবে এবং অকুতোভয়ে যে কোনো দায়িত্ব বুঝে নিতে হবে। মাস্টার ইন অল ট্রেডস বাট সার্টেনলি জ্যাক ইন নান। সরকারি কাজ থেকে সামাজিক কর্মকাণ্ড ও খেলাধুলা– সব বিষয়েই এটি প্রযোজ্য। হ্যাঁ, এখন আমি পোলো আর টেনিস নিয়ে ব্যস্ত"– একটানা বলে যেতে লাগলেন ফিলিমোর, "ক্লাবে টেনিসের স্ট্যান্ডার্ড খুব উঁচু। আমার টাট্টুগুলি ফিট থাকলে চারচক্কর দিই। ঘোড়া চড়োতো? ওহ্ তোমার তো আবার ঘোড়া নেই। না, এর একটা বিহিত করতে হয়।"

তারপর চিৎকার করে "কোই হ্যায়? স্টেটসম্যান কাগজ লে আও। দেখি কি আছে কাগজে? হু হু হুম...লোরনা...ওয়েলার...হু ভালোই। ওয়ালমসলি বিক্রি করছে। চারশো টাকা। হাই কোর্টে আছে, ওকে আমি চিনি। ওয়ালমসলিকে চিঠি লিখে একটা চেক পাঠালে কেমন হয়? তোমার জায়গায় হলে আমি তাই করতাম।"

ড্যাশ চিঠি লিখলেন, চেক সই করলেন তারপর স্নান সারলেন। ড্রইংরুমে ফিরে দেখেন, ফিলিমোর হাত মোচড়াতে মোচড়াতে আপন মনে পায়চারি করছেন তার বিড়বিড় করে বলছেন, ড্যাশ মাই বাটনস, ড্যাশ মাই বাটনস... দশমিনিট এরকম চলার পর থামলেন তারপর চিৎকার করে গোসলের বন্দোবস্ত করতে বলে বাথরুমে ঢুকলেন।

স্নান সেরে ড্যাশকে নিয়ে নিজের টমটমে ফিলিমোর রওয়ানা হলেন ক্লাবের দিকে। সেখানে পরিচয় হলো তাঁর বস ক্লেটনের সঙ্গে যিনি বসে ব্রিজ খেলছিলেন।

ক্লাব থেকে বাসায় ফেরার পথে ফিলিমোর জানালেন, "ক্লেটনের টাট্টু আছে চারটি। কানে খাটো। সাড়ে ছয়টার পর কেউ কিছু শুধালে উত্তর দেন, 'হ্যাঁ, ধন্যবাদ। আমি একটা এলসি মে নেবো। এলসি মে হচ্ছে জিন যার ওপরে স্বচ্ছন্দে ভাসে এক টুকরো লেবু।"

বাসায় ফিরে সাড়ে আটটায় চারকোর্সের ডিনার। স্যুপ, মাছ, মাংস আর মাদেরা। তারপর কফি। এবং বিছানা। পরদিন নাস্তা করতে করতে ফিলিমোর জানালেন, ফিলিমোর যেসব জেলায় ছিলেন তার প্রতিটিতে একটি করে টাট্টু রেখে এসেছেন এবং টাট্টুর সেবার জন্য একজন করে সহিস। প্রতিমাসে তাদের খরচ পাঠানো হয়। ক্লেটনও এভাবে চার পাঁচটি টাট্টু আর সহিস পালছেন। ফিলিমোর আর ক্লেটন আমাকে অবাক করেছে, লিখেছেন ড্যাশ এরকম একসেন্ট্রিক আমি আগে কখনো দেখিনি। এবং আশ্চর্য, সবাই এটাকে স্বাভাবিকভাবে নিচ্ছে।

ড্যাশের জন্য রাখা হয়েছে একজন বেয়ারা। নাম দুর্গা, বাড়ি উড়িষ্যায়। প্রতিদিন দু'বার স্নান করেন ড্যাশ। স্নান সেরে বিরাট তোয়ালে জড়িয়ে বেডরুমে চেয়ারে বসে পা বাড়িয়ে দেন। দুর্গা আরেকটি তোয়ালে দিয়ে পা মুছে মোজা পরিয়ে দেয়। তারপর শার্ট গলিয়ে দেয়। সাহেব শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতেই দুর্গা কাফলিং লাগানোর কাজ সারে। তার পর ট্রাউজার। সেটিও পরিয়ে দেয় দুর্গা। সাহেব তখন এগিয়ে যান ড্রেসিং টেবিলের দিকে। সেখানে টাই ও কলার সাজানো। সেখান থেকে সাহেব বেছে একটা পরেন। ততোক্ষণে দুর্গা জুতা পরিয়ে ফিতা বাঁধে এবং অতঃপর সেলাম। সাহেব তারপর বেরোন বেডরুম থেকে। একদিন সন্ধ্যায় ক্লাবে, ক্লেটন ড্যাশকে আমন্ত্রণ জানালেন ডিনার খেতে। ড্যাশ বিনীতভাবে সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন কারণ, তাঁর কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট

পাঠাবেন ক্লেটন। ক্লাবে কয়েক রাউন্ড এলসি মেরির পর টমটমে চড়ে রওয়ানা হলেন দু'জন। খানিকপর নিজেই রাস হাতে নিলেন ক্লেটন। টমটমের গতি বেড়ে গেল এবং বাড়ির কাছে এসে এমন একটা টার্ন নিলেন যে, গাড়ি ওলটালো না বটে কিন্তু থেমে গেল। তারপর সিঁড়ি ভেঙ্গে ক্লেটনের বাড়ি। ডিনারের পর টমটম ভাড়া করে ফিরলেন ড্যাশ। চাটগাঁয় তখন ইউরোপিয় প্রায় সব অফিস পাহাড়ের ওপর। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের দপ্তর, সার্কিট হাউস, ক্লাব, চিটাগাং কলেজ, অন্যান্য অনেক স্কুল সব পাহাড়ের চূড়োয়। শুধু পোর্ট, রেলওয়ে স্টেশন আর রেলওয়ে পাওয়ার হাউস সমতলভূমিতে। প্রতিটি বাড়িই আলাদা আলাদা পাহাড়ে এবং বেশ বড় জায়গা নিয়ে। যেমন, জজ সাহেবের বাড়ি একশো ফুট উঁচু পাহাড়ে যেখানে ৯৭টি সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠতে হয়।

চাটগাঁ স্টেশনের বাসিন্দাদের জীবনের কেন্দ্র চিটাগাং ক্লাব। নিজের জমিতেই ক্লাবঘর। এছাড়া আছে ব্যাচেলাদের জন্য ছয়টি রুম যেখানে আছে তিনটি টেবিল, আসবাবপত্রে সজ্জিত একটি লাউঞ্জ। পাহাড়ের সামনে ও নিচে নাইন হোল গলফ কোর্স এবং পাঁচটি টেনিস কোর্ট। গলফ কোর্সটিকে ঘিরে রেখেছে ছোট ছোট কয়েকটি পাহাড়। পাহাড়গুলোতে আছে ক্লাবের কয়েকজন সদস্যের বাংলো।

শহরের বাইরে না থাকলে বা অসুস্থ না হলে, প্রতিদিন বিকালে এলিট সমাজের নারী-পুরুষ অবশ্যই হাজির হন ক্লাবে। খেলাধুলার পর অনেকে ক্লাবেই স্নান সেরে চেঞ্জ করে নেন, অনেকে আবার বাসায় যান চেঞ্জ করতে; কিন্তু তারপর অবশ্যই আবার ফিরে আসেন ক্লাবে। আপ-কান্ট্রিতে সেরা ক্লাব হচ্ছে চিটাগাং ক্লাব। চাটগাঁয় আরেকটি ক্লাব আছে– রেলওয়ে ইনস্টিটিউট। কিন্তু তা' হলো অধস্তন অশ্বেতাঙ্গ, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ও পর্তুগিজদের জন্য। চিটাগাং ক্লাবে কোনো ভারতীয় বা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সদস্য নেই। ড্যাশ জানিয়েছেন, ঐ সময় চাটগাঁর প্রায় সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতো আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে। যেমন, চিটাগাং ক্লাব নিয়ন্ত্রণ করে কে? আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে। জোটগুলোর মালিক তারা, সুতরাং সে সূত্র পোর্ট কমিশনারও তারা নিয়ন্ত্রণ করে। চাটগাঁয় মাল ও যাত্রী পরিবহনে রেলওয়েই প্রধান। চাটগাঁর বিদ্যুৎ উৎপাদনও করে তারা। এবং বিতরণের জন্য মিউনিসিপালিটিকে তারাই দেয়। চাটগাঁর সবচেয়ে ভালো জমিগুলো তাদের দখলে। এমনকি আড়াই শ' মাইল দূরে হাফলংয়ে তাদের একটি পাহাড়ি নিবাসও আছে। আর এখানকার মানুষজন বা শ্রমিকদের প্রধান নিয়োগকর্তা হচ্ছে রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, পোর্ট কমিশনার ও পাওয়ার হাউস। সুতরাং রেলওয়ের কর্তা ও তাদের বউদের সমীহ না করে উপায় নেই।

রেলওয়ের এ আধিপত্য ভারি অপছন্দ জেমস ফিনলে অ্যান্ডে কোম্পানির।

এ রেষারেষি একেবারে স্থায়ী। সিলেট এবং চট্টগ্রামে প্রথম চা বাগান করে ফিনলেই। তাদের শিপিং লাইন যার নাম 'দি ক্ল্যান লাইন' গত পঞ্চাশ বছর বন্দরকে বাঁচিয়ে রেখেছে বা বন্দরকে তৈরি করেছে। কারণ, নিয়মিত তারাই একমাত্র বন্দর ব্যবহার করতো। ফিনলের কর্মকর্তাদের মতে, চট্টগ্রাম শহর তারাই আবাদ করছে। তাদের কারণেই বা কোম্পানির আমদানি-রফতানির সুবিধার জন্যই আনা হয়েছিল রেলওয়েকে। রেলওয়ে তাদের মতে "ট্রেটারাস ইন্টারলোপার"।

তবে, সরকারি কর্মচারিদের এ রেষারেষি নিয়ে না ভাবলেও চলে। কারণ, যখন লে. গভর্নর আসেন তখন সামাজিক বা পাবলিক ফাংশনে রেলওয়ে এজেন্টকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানে থাকতে হয়। প্রথমে থাকেন কমিশনার ফিশার, তারপর জজ ফিলিমোর এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ক্লেটন। তারা এগুলো নিয়ে মাথা ঘামান না এবং তিনজনেই ব্যাচেলর। তাঁদের চলন ফিরনও একই রকম। প্রতিদিন বিকেলে ফিলিমোরের পায়চারি করতে করতে 'ড্যাশ মাই বাটন' 'ড্যাশ মাই বাটন' শুনতে শুনতে এক সময় ড্যাশেরও মনে হয়েছিল তাঁরও বোধ হয় এ ধরনের কোনো অভ্যাস গড়ে উঠছে এবং তিনিও হয়ত এক সময় এ ধরনের পাগলাটে হয়ে যাবেন।

ড্যাশ লিখেছেন, কমিশনার ফিশার আমার কাছে এক ধরনের স্বর্গীয় মূর্তির মতো যাঁর সঙ্গে আমার প্রায় কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁর সঙ্গে আমি নৈশাহার করেছি বটে কিন্তু ধারে কাছে ঘেঁষিনি। সম্পর্ক নেই আমার সঙ্গে সম্মানীয় মিঃ ভেরনন উডসের সঙ্গে যিনি রেলওয়ে কোম্পানির এজেন্ট। তিনি লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের নমিনেটেড মেম্বার, সে কারণে একজন অনারেবল। তাঁর মোটাসোটা বউ আবার তা দেখাতে ভোলেন না। শহরে এলিটদের কেউ এলে তাঁর ডাকবাক্সে নিজের কার্ড ফেলে আসতে হয়।" এই কার্ড ফেলে আসা নিয়েই এক কাণ্ড হলো।

ড্যাশ তাঁর কার্ড ফেলে আসার দায়িত্বটি দিয়েছিলেন যাকে সম্ভবত সে তা পালন করেনি। এর ফলও পাওয়া গেল রাতারাতি। লে. গভর্নর পরিদর্শনে এসেছেন। তিনি শহরে এলেই গার্ডেন পার্টি দেন রেলওয়ে এজেন্ট। সেবারও তাই হলো। শহরের সব এলিটরা নিমন্ত্রণ পেলেন ড্যাশ ছাড়া। ড্যাশ অবশ্য তা গায়ে না মেখেই পার্টিতে গেলেন। কর্তা গিন্নী কিন্তু একবারও এমনভাবে দেখালেন না যে তিনি অনামন্ত্রিত।

এসব এলিটদের মধ্যে ড্যাশ সবচেয়ে জুনিয়র। তাঁর এক বছরের সিনিয়র পেক। পেক সব সময় থাকেন ক্লেটনের সঙ্গে। আর পেকের সঙ্গেই ড্যাশের যা বন্ধুত্ব।

জেমস ফিনলের কর্তা লেইসম্যানের কথা ধরা যাক। তিনি যে কতোদিন ধরে

জেমস ফিনলের কর্তা তা অনেকেই ভুলে গেছেন। একটা চরিত্র বটে লেইসম্যান। বিয়ে করার জন্য যে কতোবার কতোজনকে প্রস্তাব করে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। বলা যেতে পারে এ ক্ষেত্রে লেইসম্যান বিশ্বরেকর্ড করেছেন। এখন বুড়ো হয়ে গেছেন। তবে, এখনও তিনি শুধু যে জেমস ফিনলের কর্তা তা' নয়, পোর্ট কমিশনার ও প্রাদেশিক আইন কাউন্সিলেরও সদস্য। এবং সুযোগ পেলেই এসব বিষয়ে জাঁক করতে ছাড়েন না। রেলওয়ে কোম্পানির বিপক্ষ দলের নেতা মনে করেন নিজেকে। তাঁর বাড়িটি নোংরা ও অগোছালো। কিন্তু রোববার রোববার ফিস্টি হয় সেখানে বিয়ার আর কারির। এবং নোংরা সত্ত্বেও তা বেশ জনপ্রিয়।

লেইসম্যান মাঝে গেলেন ছুটিতে। তাঁর সহকারি মানি ভার পেলেন ফিনলের। স্বভাব চরিত্রে তিনি ছিলেন তাঁর কর্তার বিপরীত। ফিনলের কর্তা হিসাবে মানি আবার চিলিরও ভারপ্রাপ্ত ভাইস কনসাল। সুতরাং, একদিন ফিনলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান ও চিলির ভারপ্রাপ্ত ভাইস কনসাল হিসাবে মানি এক জাঁকালো পার্টি দিলেন যেখানে হুল্লোড় কম হলো না।

আইসিএস ছাড়াও আরো কিছু সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন চট্টগ্রামে। পুলিশ, রেলওয়ে, পুলিশের কর্তা, ফরেস্ট, পাবলিক ওয়ার্কসের ইঞ্জিনিয়ার, চট্টগ্রাম কলেজের প্রিন্সিপাল টার্নার, স্কুলসমূহের ইন্সপেক্টর প্রভৃতি। এছাড়াও যাদের কথা উল্লেখ করতে হয় তারা হলেন চা-কর। এদের সংখ্যা পাঁচ; মদ্যপ এবং নিয়মিত পোকার খেলোয়াড়।

চা-করদের মধ্যে নামকরা হলেন হিগিনস যিনি ঈশ্বর ও মানুষ কাউকেই ভয় করেন না। পটিয়ায় তার চা-বাগানের সামনে দিয়ে কোনো ভারতীয় ছাতা মাথায় যেতে পারে না। ঐ চা-বাগানের চারপাশে সরকারি বন। ঐ বাগানে কেউ কাঠ কাটতে গেলে আট আনা দিতে হয়। সেখান থেকে কাঠ কেটে কেউ যদি চা-বাগানের মধ্যে দিয়ে পেরোয় তা হলে তাকে আরো চার আনা লেভি দিতে হয় হিগিনসকে। সরকারি কর্তারা ব্যাপারটি জানেন কিন্তু, দেখেও না দেখার ভান করেন। হিগিনসের দুই জামাই। একজন পার্বত্য চট্টগ্রামের ডেপুটি কমিশনার স্লেড হাচিনসন, অন্যজন প্রিন্সিপাল টার্নার। চাঁদপুরেও চা-বাগান আছে। এই চা-কররা পেক ও ড্যাশকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। দু'জনই স্নাইপ আর বনমোরগ শিকারে গিয়েছিলেন চা-বাগানে। কক্সবাজারের এসডিওর আমন্ত্রণে একবার কক্সবাজারও ঘুরে এসেছেন ড্যাশ। রুটিন কাজে দিন কাটে ড্যাশের। প্রতিদিন বিকেলে ফিলমোরের রুটিন। 'স্টেটসম্যান লে আও' ও 'ড্যাশ মাই বাটন...ড্যাশ মাই বাটন' শুনতে শুনতে ভাবেন পাগল হয়ে যাবেন কিনা। তারপর হঠাৎ করে একদিন রুটিন ভাঙ্গলো। চা ও স্টেটসম্যান পর্ব শেষ হলে এক বিকেলে ফিলিমোর বললেন, "ড্যাশ, আমি ঠিক করেছি পোলো আর টেনিস ছেড়ে দেবো। আমি এখন নাচ আর

গাছ কাটা ধরবো। একটা গ্রামোফোন আর নাচের কিছু রেকর্ড কিনেছি। প্রতি সপ্তাহে এখানে নাচের আসর বসবে। এ জন্য আমি আমার একটা ঘোড়াও বিক্রি করে দিয়েছি। তুমিতো জানোই একজন আইসিএসকে সব কিছুই জানতে হয়।

কুড়োল যোগাড় করা হলো এবং শুরু হলো বৃক্ষ কর্তন। গাছগুলো বেশ ঘন করে লাগানো এবং শক্ত সমর্থ। ইতোমধ্যে হাতে পায়ে ফোসকা যা পড়ার পড়লো কিন্তু ফিলিমোরের উৎসাহ কমে না। নাচের আসরে পার্টনারের পায়ে এলোমেলো লাথি দেয়া ছাড়া ড্যাশ নাচের আসরে খুব একটা সুবিধা করতে পারলেন না। মহিলারা কিন্তু তাতেও খুশি। ড্যাশ তখন তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন, নাচটা না হয় সহ্য করা গেল। কিন্তু গাছ কাটা? যেভাবে গাছ কাটছি তাতে পাহাড়ের উত্তর দিকটা হয়ত সাফ করে ফেলতে পারবো কিন্তু ততোদিন বেঁচে থাকলে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাবো।

নিজেকে সুস্থ রাখার জন্য ড্যাশ সওয়ার হন লোরনার পিঠে। ড্যাশের চেক পেয়ে ওয়ালমসলি লোরনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন কিন্তু বিজ্ঞাপনে তিনি বোধহয় লিখতে ভুলে গিয়েছিলেন যে, ঘোড়াটির একটি চোখ কানা এবং সে ছুটতে ভালোবাসে। দু'টিই ড্যাশের প্রতিকূলে। কিন্তু কি আর করা। ড্যাশ লোরনার জন্য একজন সহিস রেখেছেন, মাসে বেতন তের টাকা, একজন ঘেষুরে, বেতন সাত টাকা, খাবার ও অন্যান্য খরচ বারো টাকা। সব মিলিয়ে দুই পাউন্ড দশ শিলিং। ড্যাশের মতে বেজায় সস্তা।

ড্যাশের দৈনন্দিন সরকারি কাজ হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কাজ করা। একবার পুলিশ এক মামলা আনলো তাঁর এজলাসে। আসামি পক্ষের উকিল এটাই প্রমাণ করতে চাইলেন যে, মামলাটা সাজানো। পুলিশ ঘুষ খেয়ে তাঁর মক্কেলকে আসামি করেছে। উকিল জানালেন, সবাই এটা জানে যে, এফআইআর করতে গেলে একবার ঘুষ দিতে হয়। তদন্তে গেলে আরেকবার। এ ছাড়া আদর আপ্যায়নতো আছেই। ড্যাশ একবার জানতে চাইলেন, এটা ছাড়া আর কোনো পয়েন্ট আছে কিনা? উকিল তাঁকে নাবালক বিচারক ভেবে বারবার একই কথা বলতে লাগলেন। ড্যাশ তখন বিরক্ত হয়ে তাকে এজলাস থেকে বের করে দিলেন। এ ঘটনার পর বারের অন্য উকিলরা প্রতিবাদস্বরূপ ড্যাশের এজলাস বয়কট করতে লাগলেন। তাদের একটাই দাবি, ড্যাশকে সরাতে হবে। কয়েকদিন পর কয়েকজন উকিল ধর্মঘটীদের অগ্রাহ্য করে ড্যাশের এজলাসে একচেটিয়া মামলা করতে শুরু করলেন। বয়কট শেষ পর্যন্ত আর টিঁকলো না।

কালেকটরেটের রেকর্ড রুমের দায়িত্বও ড্যাশের উপর। হেস্টিংসের আমল থেকে নথিপত্র সাজানো আছে রেকর্ড রুমে। একদিন ড্যাশ গেলেন রেকর্ড রুম পরিদর্শনে। জনাকয়েক নকলনবিশ বসে সেখানে। রেকর্ড রুমের দায়িত্বে একজন

কেরানি। তারপর ড্যাশের ভাষায়– ইয়োর অনার, গত চার বছর ধরে আমিই এর কিপার। ঐ রেকর্ড রুম নকলনবিশরা (কপিস্ট) এখানে বসে। আমার বসার জায়গা দরজার বাইরে।

এ দু'জন স্থায়ী কপিস্ট। বেতন মাসে বিশ টাকা। বাকি তিনজন অস্থায়ী। তাদের রোজগার মাসে দশ থেকে পনেরো টাকা। শব্দ অনুযায়ী তারা কমিশন পায়। না স্যার, কমিশন নিয়ে ঝামেলা নেই এ পোস্টের জন্য লম্বা লাইন। হ্যাঁ স্যার, রেকর্ড রুমটা অন্ধকার। না, না, ইয়োর অনারের ভেতরে ঢোকার দরকার নেই। অবশ্যই স্যার ইচ্ছে করলে যেতে পারেন মাথাটা একটু বাঁচিয়ে। হ্যাঁ, র‍্যাকগুলোর মাঝে জায়গা নেই।...না স্যার, এগুলো মনে হয় বাদুরের পায়খানা। হ্যাঁ, ইয়োর অনার এর ফলে অনেক রেকর্ড নষ্ট হয়েছে। বাদুরগুলো নিশ্চয় র‍্যাক থেকে ঝোলে। না ইয়োর অনার, ১৯০৭ সালে আমি যেদিন থেকে ভার নিয়েছি সেদিন থেকেই এ অবস্থা। হ্যাঁ, এগুলো তাড়ানো খুবই মুশকিল, খুবই খারাপ প্রকৃতির। কিন্তু কি করা, ঈশ্বরের সৃষ্টি। হয়ত, ইয়োর অনার গুলি করে মারতে পারেন। না, ইয়োর অনার ঠিকই বলেছেন, গুলিতে সিলিংয়ের ক্ষতি হতে পারে। জী স্যার, মনে হয় সাঁওতালদের এ কাজে লাগানো যেতে পারে। তারা তীরধনুক দিয়ে শিকার করে এবং বাদুর খায়। কোনো ক্ষতি হবে না, সাঁওতালদের হেডম্যানকে অবশ্যই আমি আগামীকাল ইয়োর অনারের বাসায় যেতে বলবো।"

রাস্তাঘাট পরিষ্কারের জন্য মিউনিসিপালিটির হয়ে দুশো সাঁওতাল কাজ করে। পরের দিন সকাল আটটায় হেডম্যান গিয়ে হাজির জজ সাহেবের বাসায়। ইয়োর অনার আমার নাম দুর্গা মণ্ডল। মিউনিসিপালিটির সাঁওতালদের আমিই হেডম্যান। বাদুর আর থাকবে না।কতো? পারবো স্যার, ছয়জন লাগবে। রোববার সকালে আমাদের ডিউটি নেই কারণ আমরা খ্রিস্টান। আটটার দিকে আসবো। নমস্কার।"

রোববারে রেকর্ড কীপার জানালো বাদুরগুলো কোথায় গেল বুঝতে পারছি না। মাফ করবেন। গতকাল বিকেলে রেকর্ড রুমে ঢুকলাম সব দেখার জন্য। কারণ, ইয়োর অনার রোববার আসবেন পরিদর্শনে। কিন্তু কোনো বাদুর চোখে পড়লো না। দরজা দিয়েও তো বেরুবার কথা না। বইয়ের সেলফ দেখার জন্য মই বেয়ে ওপরে উঠলাম। দেখলাম স্কাইলাইট খোলা। ওটা দিয়েই বোধহয় বাদুরগুলো বেরিয়ে গেছে। আমার দোষটা হচ্ছে, রুম বন্ধ করার আগে স্কাইলাইটটি আমি বন্ধ করে দিয়েছিলাম।

না স্যার, আমার আমলে স্কাইলাইটটি কখনেও পরিষ্কার করা হয়নি। বোধহয় বহু বছর ধরেই তা খোলা। যদি স্কাইলাইটটা বন্ধ না করতাম তা'হলে বাদুরগুলো ফিরে আসতো। না স্যার, হ্যাঁ স্যার আপনার কথাই ঠিক।

হুজুর অনুমতি দিলে রেকর্ড রুমের কনটেনজেন্সি ফান্ড থেকে সাঁওতালদের কিছু দিয়ে দিতে পারি।...যদি বাদুররা আবার ফিরে আসে তা'হলে তো সাঁওতালদের আবার ডাকতে হবে। হুজুরের যা ইচ্ছে। সুইপারকে অবশ্যই ফাইন করতে হবে এতো বছর স্কাইলাইট পরিষ্কার না করার জন্য।

রেকর্ড রুম নিয়ে ড্যাশের কোনো আগ্রহ নেই। কিছু রেকর্ডপত্র শুধু নেড়ে চেড়ে দেখলেন। তবে, বেশ মজার মজার তথ্য আছে, যেমন–

"১। ১৭৭০ সালের ২৭ জানুয়ারি চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত প্রভিনসিয়াল কাউন্সিলের বৈঠকের কার্য বিবরণী।

২। ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত কাপড়ের গুদাম মেরামতের জন্য তিন টাকা চার আনার প্রস্তাবিত ব্যয় অনুমোদন করা হলো।

৩। সল্টগোলার বরকন্দাজ রামকিংকর রায়কে বিনা বেতনে দু'মাসের ছুটি মঞ্জুর করা হলো; এবং তার স্থলে ঐ সময়ের জন্য গোপালচন্দ্র রায়কে নিযুক্ত করা গেল।"

"এ সময় বাইরে হৈ চৈয়ের জন্য বৈঠক স্থগিত হলে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, বেয়ারারা তাদের বেতন দেড় টাকা থেকে পৌনে দুই টাকা করার দাবি জানাচ্ছে। প্রতিজন বেয়ারাকে বারোটি করে বেত মারার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। ভবিষ্যতে কেউ এ রকম করলে একই রকম শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্তও নেয়া হলো।...

৬। সিদ্ধান্ত হলো পরবর্তী বৈঠক হবে ২৩ ফেব্রুয়ারি সুধারামে।"

এরি মধ্যে শুল্ক বিভাগের সহকারী কালেকটর ছুটিতে গেলেন। ড্যাশকে অতিরিক্ত সে পদেও দায়িত্ব দেয়া হলো।

ইতোমধ্যে শুরু হলো বর্ষা। দিন আর কাটে না। একদিন একঘেঁয়েমী কাটাবার জন্য পেক আর ড্যাশ বৃষ্টির মধ্যে প্রায় মাইল দশেক হাঁটলেন। বর্ষা শেষে ড্যাশ ঢাকা গেলেন বিভাগীয় পরীক্ষা দিতে। পাস করলেন। বেতন বাড়লো ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা পেলেন। এবং জানলেন, চার মাসের জন্য তাঁকে ময়মনসিংহ যেতে হবে সেটেলমেন্ট ট্রেনিংয়ের জন্য। পেক এরি মধ্যে একটি মহকুমার দায়িত্ব পেলেন।

ময়মনসিংহের বাইগুনবাড়িতে সেটেলমেন্ট ক্যাম্প (ভূমি জরিপ) বসবে। ড্যাশের কাছে নির্দেশ এল সেখানে যাওয়ার। ভূমি জরিপ শাখাটা ছিল তখন আইসিএসদের প্রশিক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাইগুনবাড়িতে একমাস যৌথ ক্যাম্প হবে যেখানে থাকবেন আঠারো জন নবীন অফিসার। একমাস পর আঠারো জনকে দু'তিনজন করে কয়েকটি দলে ভাগ করে দেওয়া হবে। প্রথম একমাস খাওয়া-দাওয়া হবে একই সঙ্গে। একজন অফিসার সঙ্গে একজন ব্যক্তিগত ভৃত্য ও ঘোড়াসহ একজন সহিস নিতে পারবেন। যাতায়াত আর খাবারদাবারের

বন্দোবস্ত নিজেদেরই করতে হবে।

পাচক ও খাবারদাবারের কি হবে জানতে চেয়ে ড্যাশ সেটেলমেন্ট অফিসারের কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন। কোনো কিছু ভেবেচিন্তে নয়, নিছক কৌতূহলের বসেই লিখেছিলেন। ত্বরিৎ উত্তর এল সেটেলমেন্ট অফিসারের কাছ থেকে। তিনি শুনেছেন, চাটগাঁর মগ পাচকরা নাকি বিখ্যাত। সুতরাং ড্যাশ যদি পাচক ও খাবারদাবারের ভারটা নেন তাহলে খুবই ভালো হয়। উটকো ঝামেলা। মনে হলো ড্যাশের। এ থেকে বাঁচার জন্য তিনি বাকি সতোরো জনকে লিখলেন, খাবারদাবারের জন্য কমপক্ষে অগ্রিম ত্রিশ টাকা করে না পেলে কাজ শুরু করা মুশকিল। পরের সপ্তাহে দেখা গেল, সবাই তাঁকে ত্রিশ টাকা করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তবে ড্যাশ ছিলেন আনাড়ি। কারণ পরে ক্যাম্প শেষে দেখা গেল টিনজাত বিস্তর খাবার বেঁচে গেছে। তখন নিলাম করা হলো। প্রায় কিছুই বিক্রি হলো না। বরং হিসাব মেলাবার জন্য ড্যাশের নিজেকে আট ডজন বিয়ার ও দুই বক্স টিনের খাবার কিনতে হলো। শুধু তাই নয়, এগুলো বহন করার জন্য ভাড়া করতে হলো আবার দুটো গরুর গাড়ি। তখন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার পথে ড্যাশের বন্ধু হেনরি টুইনাম, নিকোলাস ব্ল্যান্ডি ও মাঝে মাঝে অন্যান্য বন্ধু যোগ দিয়ে খাবার ও বিয়ারের সদ্ব্যবহার করে যেতেন।

ময়মনসিংহ ছিল তখন ভারতের সবচেয়ে বড় জেলা। আয়তন ৬৩০০ বর্গমাইল আর লোকসংখ্যা ৪,৩০০.০০ জন। সেটেলমেন্ট অফিসার ছিলেন ফ্লেডারিক সাচে (Sachse)। ময়মনসিংহ জেলা জরিপ করতে সাচের লেগেছিল দশ বছর। তাঁর অধীনে তখন কাজ করেছেন ১২০০ আমিন, ৪০ জন কানুনগো এবং ১৫ জন রেভিনিউ.ও জুডিশিয়াল অফিসার। এই আঠারো জন অফিসারও তাঁর সঙ্গে ছিলেন কিছুদিন। সাচে এবং তাঁর স্ত্রী হিল্ডাই এদের দেখাশোনা করতেন। ড্যাশ লিখেছেন, আঠারো জন তরুণের উদ্দাম ব্যবহারে বিপর্যস্ত হওয়ার কথা হলেও সাচে এবং তাঁর স্ত্রী বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। সেটেলমেন্টের কাজ করার জন্য সাচে প্রতিদিন ষাট থেকে আশি মাইল ঘোড়ায় চড়ে ভ্রমণ করতেন। ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়লে সাইকেলে, সাইকেল না পেলে হেঁটে, সাঁতরে নদী পার হয়ে সাচে অফিসারদেরকে কাজ দেখতে যেতেন। নবীন অফিসাররা তাঁর এই তুলনাহীন নিষ্ঠা দেখে অভিভূত হয়েছিলেন।

ক্রিসমাসের ছুটিতে ড্যাশরা এলেন রাজধানী আর তখনই ঘোষণা করা হলো বঙ্গ বিভাগ করা হয়েছে। ড্যাশের অনেক সহযোগী তখন আসাম বদলি হবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কারণ পূর্ববঙ্গের মতো অস্বাস্থ্যকর ও কাজবহুল এলাকায় অনেকেই থাকতে চাইছিলেন না।

আইসিএসদের তখন একটি দেশীয় ভাষা বাধ্যতামূলকভাবে শিখতে হতো

এবং তা পাসের জন্য বিভাগীয় একটি পরীক্ষা দিতে হতো। ঢাকায় ছুটি কাটানোর সময় নর্থ ব্রুক হলে বাংলা ভাষার বিভাগীয় পরীক্ষা দিলেন ড্যাশ। লিখিত পরীক্ষা ছাড়া মৌখিক পরীক্ষাও ছিল। কমিশনার ছিলেন পরীক্ষক। অর্থাৎ কমিশনারের সঙ্গে বাংলা কথোপকথনই ছিল বাংলা পরীক্ষা। ফলে পরীক্ষায় পাস করলেন তিনি এবং বেতন বাড়লো পঞ্চাশ টাকা।

মাস শেষে টুইনহাম, ব্ল্যান্ডি ও ড্যাশকে নিয়ে একটি দল করে টাঙ্গাইল যেতে বলা হলো, নিজেদের জিনিসপত্র ও খাবার-দাবার বহনের জন্য গরুর গাড়ি ভাড়া করতে হলো কয়েকটা। দিন হিসেবে একেকটি গাড়ির ভাড়া ছিল তিন টাকা।

ময়মনসিংহের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ড্যাশ ফিরলেন চাটগাঁয়। ড্যাশ লিখেছেন, জরিপের কাজ যে তিনি খুব একটা শিখেছিলেন তা নয়, তবে ক্যাম্প জীবন তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। মানুষজনের সঙ্গে মিশে ঔদ্ধত্য কমেছিলো। ঔদ্ধত্য না বলে নাক উঁচু ভাবও বলা যেতে পারে। ড্যাশ লিখেছেন, "গ্রামে প্রচুর ভালো মানুষের সংস্পর্শে এসেছি। এদের কাছ থেকে শিখেছি? পাশ্চাত্য ধারায় মসনদ থেকে নয় বরং তাদের মতো করে দেখতে শিখেছি।"

চট্টগ্রামে ফেরার কয়েকদিন পর ড্যাশের প্রমোশন হলো। তাঁকে মহকুমা অফিসার বা এসডিও করে পাঠানো হলো রামপুরহাট– বিহার সীমান্তে। তবে রামপুরহাটে তাঁকে বেশিদিন রাখা হয়নি। সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার হিসেবে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বদলি হলেন ঢাকায়।

॥ ৪ ॥

১৯১১ সালের মধ্যগ্রীষ্মে ও ক্রিসমাসের সময় বিভাগীয় পরীক্ষা দিতে ড্যাশ এসেছিলেন ঢাকায়। পরীক্ষা দু'টিতেই পাস করেছিলেন, ফলে বেতন বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঢাকায় দু'বার এসেছিলেন বটে, কিন্তু কিছুই দেখা হয়নি। বদলি হবার পরও যখন ঢাকায় পৌঁছলেন তখন ছুটির সময় হওয়া সত্ত্বেও রাজকর্মচারীরা বিষণ্ন। কারণ বঙ্গভঙ্গ হওয়ার আগ পর্যন্তও ঢাকা ছিল 'ডার্লিং চাইল্ড অব টপ পলিটিক্যাল প্ল্যানার্স'। এরা লাল ইটে গাঁথা একটি রাজধানীর স্বপ্ন দেখছিলেন। আর নিসর্গ পরিকল্পনাবিদরা ভাবছিলেন, কিভাবে তাঁরা এই প্রাদেশিক রাজধানীটিকে ভরিয়ে তুলবেন বৃক্ষে।

রমনা ছিলো পরিকল্পনাবিদদের ইচ্ছা পুরণের জায়গা। এক হাজার একরের এই মাঠটিকে একোয়ার করা হয়েছিল যার মধ্যে অন্তর্গত ছিল একটি রেসকোর্স ও একটি ক্লাব, আরো ছিল, একটি পোলো গ্রাউন্ড, ক্রিকেট মাঠ এবং বারো হোলের গলফ কোর্স, দু'টি হিন্দু মন্দিরও অন্তর্গত এই মাঠে। রেসকোর্সটিকে ঘিরে একটি রাস্তা। রাস্তা ঘিরে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজকর্মচারীদের জন্য

বাসস্থান। যার পদ যত উঁচু তাঁকে ততো ভালো জায়গায় বাড়ি দেওয়া হয়েছে। যেমন, লে. গবর্নর, হাই কোর্টের বিচারক, কাউন্সিলের সদস্যদের বাড়ি এমন জায়গায় যেখান থেকে অবশ্যই রেসকোর্সের উইনিং পোস্ট দেখা যাবে এবং বিনা আয়াসে পৌঁছা যাবে গলফ কোর্সে। সরকারের সচিব ও বিভাগীয় কর্মকর্তাদের বাড়ি একটু দূরে। ক্লাবে বা গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডে যেতে হলে তাদের গাড়ি ব্যবহার করতে হবে। এক প্রান্তে স্থানীয় কর্মকর্তা, কমিশনার, কালেক্টর, সেশন জজ, উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারীদের বাসা। নওয়াবপুরে অফিসে যাওয়াটা যেমন তাদের জন্য ঝামেলার ও দূরের, ক্লাবে বা গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডে যাওয়ার ব্যাপারটাও তাই। ১৯১১ সালে যখন বঙ্গভঙ্গ রদ হয় তখনও পরিকল্পিত রাজধানীর কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। অনেক অট্টালিকা তখনও অসমাপ্ত, রাস্তাঘাটও। এদিক সেদিক তাকালেই চোখে পড়ে স্তূপ করে রাখা ইট, নার্সারি। কিছু রাস্তার পাশে লাগানো হয়েছে গাছ। এই আশায় যে, সেগুলো একদিন ফুলে ফুলে শোভিত হবে এবং হয়েওছিল পরে।

১৯১১ সালের ক্রিসমাসের পর ঢাকার যাত্রা শুরু হলো উল্টোপথে। ১৯১২ সালের অক্টোবরে ড্যাশ যখন ঢাকায় পৌঁছলেন সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার হিসেবে তখন পরিকল্পকরা সব ত্যাগ করেছেন ঢাকা। শহরটি তখন কলকাতার মুখাপেক্ষী, কমিশনারের সদর দপ্তর মাত্র।

বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর ড্যাশের ক্যাডারের অনেকে নানারকম চেষ্টা তদবির করে চলে গেলেন আসাম ক্যাডারে এই আশায় যে, সেখানে পুরনো কলোনিয়ান ধরনের জীবনযাপন করা যাবে। কাজের চাপ থাকবে কম, এন্তার সময় থাকবে পোলো খেলার ও শিকারের। চারপাশে থাকবে আদি মানুষ। যারা আসাম যেতে পারলেন না তাদের অনেকে গেলেন বিহার। বাকিদের থাকতে হলো পূর্ববঙ্গে। আইসিএস ও আইপিএস অফিসারদের মতে, বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় তাদের ক্ষতিই হয়েছিল সবচেয়ে বেশি (যাঁরা ছিলেন পূর্ববঙ্গও আসাম ক্যাডারে)।

প্রকৌশলী, পরিকল্পক, নিসর্গবিদরা গেলেন দিল্লী। শিক্ষা ও কৃষি বিভাগের অফিসাররা খুশি মনেই রয়ে গেলেন পূর্ববঙ্গে। কারণ, সুযোগ-সুবিধা অক্ষুণ্ন থাকবে, কিন্তু তাদের আর ঘোরাঘুরি করতে হবে না। বঙ্গভঙ্গ রদের ক্ষতিপূরণ হিসেবেই যেন বলা হলো, কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণাগারের একটি হবে ঢাকায়। তেজগাঁয় স্থাপন করা হলো তা, (এখন যা পরিচিত খামার বাড়ি নামে)। অন্য ক্ষতিপূরণটি হলো, ঢাকা কলেজকে উন্নীত করা হবে বিশ্ববিদ্যালয়ে (পরে অবশ্য ঢাকা কলেজকে উন্নীত করে নয়, আলাদাভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)। ঢাকার নবাব পরিবার ও মুসলমানদের কোনো ক্ষতিপূরণের কথা ভাবা হলো না।

ড্যাশ যখন ঢাকায় এলেন (১৯১২) তখনও নদীর ধারে আরামপ্রদ

বাড়িগুলোতে থাকতেন কমিশনার, কালেক্টর, সিভিল সার্জন, ঢাকা নবাব এস্টেটের ম্যানেজার ও উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তারা। নদীর ধারেই নবাবদের বাড়ি আহসান মঞ্জিল, কাছেই মিটফোর্ড হাসপাতাল, ক্লাব, ব্যাংক অব বেঙ্গল এবং গির্জা। গির্জার উল্টোদিকে নওয়াবপুর রোডে আদালত ও সরকারি দপ্তর।

রমনার উত্তরে ত্রিশ একর পার্কে পুলিশ লাইন। আগে সরকারি খেদা বিভাগ ছিল সেখানে। এর নাম পীলখানা। পীলখানার উত্তরে একই আয়তনের কৃষি ফার্ম। রেলওয়ে ও পীলখানার কাছে কেন্দ্রীয় জেল ও ক্রিমিনাল লুনাটিক অ্যাসাইলাম।

রাজধানীর মর্যাদা হারানোর ফলে শহরের অনেক অট্টালিকা খালি হয়ে গেল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল তাই ঢাকা কলেজের অনেকে রমনার বাড়িগুলো পেলেন। শুধু তাই নয়, সিদ্ধান্ত নেয়া হলো কমিশনার, কালেক্টর, সেশন জজ ও পুলিশ অফিসাররাও রমনার কিছু অট্টালিকায় উঠে যাবেন। ক্লাবও সরিয়ে নেয়া হলো। ভাবা হয়েছিল রমনা হয়ে উঠবে একটি অভিজাত এলাকা। তবে, কাজের সুবিধা সেখানে ছিল না। বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে সরকারের যেসব যুক্তি ছিল, ড্যাশও তাই উল্লেখ করেছেন। কিছু একটা করার সদিচ্ছা ও উৎসাহ ব্রিটিশ কর্মচারীদের ছিল, উল্লেখ করেছেন ড্যাশ। কিন্তু জয় হলো তাঁর মতে, 'হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও ব্রিটিশ ব্যবসায়ী স্বার্থের'। রদ হলো বঙ্গভঙ্গ। এ কারণে সরকারের অনেক দপ্তর হয়তো হতোদ্যম হয়ে পড়েছিল, ক্ষতিও হয়েছিল কোনো কোনো বিভাগের, শুধু সেটেলমেন্ট বা জরিপ বিভাগ ছাড়া। নিরুপদ্রবে কাজ করেছিল তারা এবং সে কাজের পরিমাণও কম নয়। একটি উদাহরণ দিয়েছেন ড্যাশ। ১৯১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ঢাকা জেলার আয়তন ছিল ২,৮৩২ বর্গমাইল আর লোকসংখ্যা ২,৯৬০,৪০২ জন। জরিপ করা হয়েছিল ১৬ ইঞ্চিতে মাইল ধরে। ম্যাপে দেখানো হয়েছে ৩,৩০০.০০০ প্লট। প্রতিটি ম্যাপশিটে এক বর্গমাইলের চারভাগের একভাগ কভার করা হয়েছিল ফলে, জেলার ম্যাপ সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল দশ হাজারে। এ জেলায় ১১,৭০০ এস্টেট সরাসরি সরকারের রাজস্ব যোগায়, ২০৪,৫৮২ জন খাজনা দেয় জমিদারকে। ৯৩৬,৯৩৩ জন রায়ত ও ৩৩,৭৩১ জন অধস্তন রায়ত খাজনা দেয় মধ্যস্বত্বভোগীদের। জমিতে ১,২০০,০০০ জনের অধিকার রক্ষার্থে প্রত্যেককে একটি করে খতিয়ান দেয়া হয়েছে। চার বছর লেগেছে জরিপ শেষ হতে। খরচ হয়েছিল ২,৪০০,০০০ টাকা, যার মধ্যে জমিদার ও বর্গাদাররা দিয়েছিল ১,৮০০,০০০ টাকা।

ঢাকায় এসে ড্যাশ উঠেছিলেন ক্লাবে। পূজার ছুটির জন্য তখন সেটেলমেন্ট অফিস বন্ধ। অফিস খোলার পর গিয়ে দেখেন তাঁর জয়েনিং ঠিকমতো হয়নি। এ কারণে তাঁর চাকরিতে ব্রেক হয়ে যেতে পারে যার অর্থ তাঁর সিনিয়ারিটি ও বেতনের ক্ষতি হবে। অনেক লেখালেখির পর এ ভুল সংশোধন করা হয়েছিল। সেটেলমেন্ট

অফিসার হিসেবে তিনি বাড়তি পেতেন একশ' টাকা ও পরিদর্শনে গেলে দিনে ভাতা পেতেন পাঁচ টাকা।

ড্যাশের দায়িত্বে দেয়া হয়েছিল কাপাসিয়া, মনোহরদী, রায়পুরা ও নরসিংদী। মাঠ পর্যায়ে কাজের সময় এপ্রিল থেকে অক্টোবর। জেলায় নেই কোনো ডাকবাংলো। সুতরাং থাকতে হবে তাঁবুতে। অনেকে তাঁকে পরামর্শ দিলেন একটি গ্রিনবোট ভাড়া করে নিতে।

গ্রিনবোট দেখার জন্য ড্যাশ একদিন গেলেন বাকল্যান্ড বাঁধে। শ'খানেক গ্রিনবোট সার বেঁধে নোঙ্গর করা। অনেক দেখেটেখে বেশ বড়সড় একটি গ্রিনবোট ভাড়া করলেন ড্যাশ। ভাড়া মাসে ১০০ টাকা। এর মধ্যে মাঝি-মাল্লার ভাড়াও ধরা হলো। জরিপে বেরুবার আগে ড্যাশ তাই বললেন, গ্রিনবোটটি ভালোভাবে রং করে নিতে। রং শুকোতে শুকোতে তিনি জিনিসপত্র গুজিয়ে প্রস্তুত হয়ে নেবেন।

ঢাকা ছেড়ে বেরুবার আগে, তাঁর অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে তেমন একটা দেখা হয়নি। কারণ, তিনি থাকতেন পুরনো ঢাকায়, অধিকাংশ রমনায়। তাঁর বন্ধু জন বটমলির সঙ্গে একদিন খেলেন। অক্সফোর্ডে তাঁরা একসঙ্গে ছিলেন। বটমলি তখন ঢাকা কলেজে অধ্যাপনা করেন। একদিন নৈশভোজ করলেন তাঁর ওপরঅলা সেটলমেন্ট অফিসার এ্যাশলির সঙ্গে। এ্যাশলিকে দেখে ড্যাশের মনে হয়েছে তাঁর পূর্বপুরুষ খুব সম্ভব ইতালিয় এবং ইহুদি। অফিসার হিসেবে তিনি দক্ষ। তবে, তাঁর স্ত্রীকে ড্যাশের স্থূল মনে হয়েছে।

ড্যাশ আসলে সঙ্গ চাচ্ছিলেন তাঁর দুই বন্ধু ব্ল্যান্ডি ও বার্টলের। কিন্তু ব্ল্যান্ডি তখন মুন্সিগঞ্জের এসডিও এবং বার্টলে নারায়ণগঞ্জের।

ড্যাশ পরিদর্শনের প্রথম পর্যায়ে যাবেন লাখপুর। একদিন ভোরে রওনা হলেন গ্রীনবোটে করে। তাঁর ঘোড়া লোরনাকে নিয়ে সহিসও রওনা হলো। লাখপুরে মিলবে সে সাহেবের সঙ্গে।

লাখপুরে নেমে কাজ শুরু করার আগে প্রথম একটি জায়গা বাছলেন যেখানে তাঁবু গাড়বেন। গ্রিনবোটে থাকতো মূল জিনিসপত্র। রান্না বান্নাও হতো। জায়গাটি মধুপুরের কাছাকাছি; লাকড়ির অভাব ছিল না। সস্তায় পাওয়া গেল দুধ ও চাল। মাছও পাওয়া যেতো, তবে ভালো জাতের নয়। ফলের অবস্থাও সে রকম। সবজির দেখা পাওয়া ভার।

ড্যাশের ক্যাম্পজীবন ছিল এরকম– বিকেলে তাঁবুর সামনে আরামকেদারায় বসে সোডাসহ হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিতেন। পাশে থাকতো গ্রামোফোন। গ্রামোফোনের চারপাশে গ্রামবাসীরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। ড্যাশের মনে হয়েছিল গ্রামের মানুষজন চেলো ও বেহালার সুরটা পছন্দ করতেন। চা পানের পর তিনি শিকারে বেরুতেন। শিকার থেকে ফিরে আগুন জ্বালাতেন। রাতের খাবারের

আগে স্নান সেরে বাজনা শুনতেন। সঙ্গে কিছু বইপত্তর এনেছিলেন ড্যাশ পড়ার জন্য, কিন্তু পড়া হতো না। তেলের আলো জ্বালাবার সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করতো মশার দল। তখন মশারির ভিতর যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। অবশ্য, সারাদিনের খাটুনির পর পড়ায়ও মন বসতো না। জরিপের কাজটি ছিল অবশ্য সোজা। তাঁর অধীনে ছিল ৫০/৬০টি হলকা, প্রত্যেকটি নিয়ন্ত্রণ করতো একজন কানুনগো, যার অধীনে ছিল ডজনখানেক আমিন। ড্যাশ এবং একজন রাজস্ব অফিসার তদারক করে দেখলেন ম্যাপ ঠিকমতো হচ্ছে কিনা। আমিনরা সুযোগ পেলেই কাজে ফাঁকি দিতো। আমগাছের ছায়ায় শুয়ে থাকতো। চেনম্যান এসে যে রিপোর্ট দিতো তার ভিত্তিতেই হয়তো ম্যাপ আঁকতো। তাদের তটস্থ রাখার উপায় ছিল আমগাছের নিচে বা খেতের পাশে ছায়ায় গিয়ে হাজির হওয়া। তবে, ড্যাশ স্বীকার করেছেন, তাঁর আমিনরা কাজে খুব একটা ফাঁকি দিতেন না। দশদিন পর পর ঢাকা থেকে নির্দেশ পেতেন ড্যাশ। এবং সে অনুযায়ী কাজ নিয়ে এগুতেন।

হ্যাঁ, জীবন খানিকটা নিঃসঙ্গ ছিল বটে। তবে বয়স ছিল কম, দিন কাটতো খোলা আবহাওয়ায়। তেমন খারাপ লাগতো না। সারাদিন কাজ করার পর রাতে নিদ্রি নিদ্রা। মাসের শেষে ঢাকা গিয়ে বেতন তুলতেন। লোরনা ও নিজের জন্য রসদ ও পর্যাপ্ত হুইস্কি ও সোডা নিয়ে ফিরতেন।

ড্যাশের বন্ধু নিকোলাস ব্ল্যান্ডি তখন মুন্সিগঞ্জের এসডিও। ড্যাশ একদিন ঠিক করলেন দেখা করতে যাবেন তাঁর সঙ্গে। ইদ্রাকপুর দুর্গে থাকেন এসডিও। দুর্গের ঘাটে নেমে ড্যাশ ছেড়ে দিলেন নিজের গ্রিন বোট। মাঝিকে নির্দেশ দিলেন নরসিংদীর রায়পুরা যেতে। লোরনাও লাখপুর থেকে রায়পুরা যাবে। ব্ল্যান্ডি আর ড্যাশ ঠিক করলেন ডিনারটা দু'বন্ধু সারবেন নারায়ণগঞ্জে। কারণ সেখানে বেশ ক'জন স্কটিশ পাট ব্যবসায়ী আছেন। গল্পসল্প করা যাবে।

তখন রীতি ছিলো, ডিনার খেতে গেলে, কালো টাই, ডিনার জ্যাকেট পরে মাথায় দিতে হবে কালো ট্রিলবি হ্যাট। এই সাজে সজ্জিত হয়ে দু'বন্ধু নৌকায় চড়ে রওয়ানা হলেন নারায়ণগঞ্জের দিকে। পৌনে এক ঘণ্টা লাগলো পৌঁছতে। দীর্ঘক্ষণ পাট ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পানাহারের পর রাত পৌনে দু'টায় ফিরলেন দুর্গের ঘাটে। আধো মাতাল অবস্থায় বারান্দায় এসে টুপিতে হাত দিলেন ড্যাশ, সঙ্গে সঙ্গে এক ভৃত্য চা নিয়ে দরজার কাছে হ্যাটস্ট্যান্ডে রেখে সালাম বাজিয়ে চলে গেল। একইভাবে আরেকজন নিয়ে গেল ব্ল্যান্ডির হ্যাট। দু'জনের কেউই তা খেয়াল করলেন না। নিজ নিজ রুমে গিয়ে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন। ওদিকে বেয়ারা দু'জন সারাক্ষণ বারান্দায় অপেক্ষা করতে লাগলো। কে জানে সাহেবরা কখন বারান্দায় ফিরবেন। ব্ল্যান্ডি ও ড্যাশ ভুলে গিয়েছিলেন ভৃত্যদের বলতে যে, তাদের আর রাতের জন্য প্রয়োজন নেই।

পরদিন ড্যাশ চলে গেলেন রায়পুরা। নরসিংদীতে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলো সেনবার্গের। সরকারের সহকারী প্রকৌশলী। টঙ্গী থেকে ভৈরব বাজার পর্যন্ত রেল লাইন নির্মিত হচ্ছে। তার দেখাশোনার দায়িত্বে আছেন সেনবার্গ। কাছাকাছি একটি পুল তৈরি হচ্ছে। সেই পুল বা ব্রিজের কাঠামোর নিচে থাকেন সেনবার্গ। এই ব্রিজের কাঠামোর একটি স্তম্ভ বসানো নিয়ে খানিকটা ঝামেলা হয়েছিল। কর্তৃপক্ষকে তা জানাননি সেনবার্গ। বরং ড্যাশকে বলেছিলেন যে, তিনি নিজেই তা ঠিক করবেন। ড্যাশ লিখেছেন, 'পরবর্তীকালে এই ব্রিজ পার হওয়ার সময় সে কথা মনে হলে বেশ ভয়ে ভয়ে থাকতাম।'

সেনবার্গের থাকার জায়গাটা ছিল অদ্ভুত। ব্রিজের কাঠামোর নিচে ১০×১০ ফুট একটি ঘর। ভেতরে প্যাকিং বক্স পাশাপাশি রেখে তৈরি করা হয়েছে বিছানা। আরেকটি প্যাকিং বক্স হচ্ছে তার টেবিল। বিছানার ওপর ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে বিয়ার ভর্তি একটি পিপে। পিপে থেকে বেরিয়ে আছে স্টপকর্ক লাগানো একটি নল। প্রয়োজনে শুয়ে শুয়ে স্টপকর্ক খুলে নল দিয়ে বিয়ার পান করতে পারেন সেনবার্গ।

ড্যাশের মনে হয়েছে, নিঃসঙ্গ জীবনযাপনের কারণে সেনবার্গ একসেনট্রিক হয়ে উঠছেন। তার ঘরেই একদিন আলাপ হলো নারায়ণগঞ্জের এএসপি কিটি বেলায়ার্স-এর সঙ্গে। ড্যাশ এবং সেনবার্গ দু'জনেই মনে করতেন, বেলায়ার্স হচ্ছেন একসেনট্রিক। অনবরত কথা বলতেন বেলায়ার্স। একদিনের ঘটনার উল্লেখ করেছেন ড্যাশ।

শুয়ে শুয়ে স্টপকর্ক খুলে বিয়ার পান করছেন সেনবার্গ। এমন সময় একজন এসে খবর দিলো কাঠামো ঠেকা দেয়ার জন্য একশো ফুট লম্বা দুটি বিম তৈরি। সেনবার্গ সময় বাঁচানোর জন্য ঠিক করলেন নৌকা না নিয়ে একটি বিম থেকে আরেকটি বিমে তিনি যে বাঁশ বিছানো আছে তার ওপর দিয়েই হেঁটে যাবেন। সেনবার্গ ড্যাশকে জিজ্ঞেস করলেন তিনিও সঙ্গে যাবেন কি না। ড্যাশ রাজি হলেন না। সেনবার্গ দিব্যি বাঁশের ওপর দিয়ে একটি বিম থেকে আরেকটি বিমে গেলেন এবং কাজ সেরে ফিরেও এলেন। তারপর ড্যাশকে বললেন, একদিন বেলায়ার্স আড্ডা দিতে এসেছেন। দু'জনে কথা বলতে বলতে সিঁড়ি ভেঙ্গে কাঠামোয় উঠেছেন। তারপর বাঁশের ওপর দিয়ে হেঁটে এক বিম থেকে আরেক বিমে যাওয়ার জন্য চলাও শুরু করেছেন। কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ বেলায়ার্স দেখেন যে তিনি শূন্যে হেঁটে চলছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাঁশের ওপর বসে পড়লেন এবং ওভাবেই আস্ত আস্তে সিঁড়ির কাছে ফিরে এলেন।

এরমধ্যে প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের মৌলভী তমিজউদ্দিন খানকে ডেপুটেশনে ড্যাশের সঙ্গে কাজ করার জন্য পাঠানো হলো। তিনিও ভাতা হিসেবে

বাড়তি একশো টাকা পেতেন তবে ছিলেন ড্যাশের অধীনে। একদিন দু'জনে ঠিক করলেন, সকাল দশটায় একত্রে পরিদর্শনে যাবেন। ড্যাশ অপেক্ষা করছেন। তমিউদ্দিন এলেন বিশ মিনিট পর। কিন্তু এ দেরির কোনো ব্যাখ্যা দিলেন না বা কোনো দুঃখও প্রকাশ করলেন না। পরিদর্শন শেষে সোয়া বারোটার দিকে ড্যাশ জিজ্ঞেস করলেন তমিজউদ্দিনকে, আপনার কাছে কি ঘড়ি আছে? দেখা গেল দু'জনের ঘড়ি একই সময় দিচ্ছে। 'আপনি কি জানেন যে আপনি আজ বিশ মিনিট লেট ছিলেন?'

"জি, স্যার।"

"যদি জানেনই তবে এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করা বা ব্যাখ্যা দেয়া কি উচিত ছিল না?"

"জি, এর জন্য আমি দুঃখিত আমার বেরুতে দেরি হয়েছিল।"

"দেখুন", বললেন ড্যাশ, "আপনি আমাকে মুশকিলে ফেলেছেন। আর কোনো অধীনস্থ অফিসারের জন্য বিশ মিনিট অপেক্ষা করা আমার ধাতে নেই এবং তাও যদি হয় ব্যাখ্যা এবং দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া। আমি আজ বিকেলে ঘটনাটি ঢাকায় জানাবো।"

চারদিনের মাথায় বদলি করা হলো তমিজউদ্দিনকে।

ইতোমধ্যেই ড্যাশ বাংলাটা বেশ রপ্ত করে ফেলেছেন। প্রতিমাসে কয়েকদিনের জন্য যেতেন ঢাকায়। সেখানে ইউরোপিয় অন্যান্য শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে ঢাকায় অবস্থানরত সরকারি চাকুরে শ্বেতাঙ্গদের তেমন একটা যোগাযোগ ছিল না। তবুও "সভ্যতায়" ফিরে স্বস্তি পেতেন ড্যাশ।

ক্রিসমাসটা কাটালেন ড্যাশ স্পেনসার দম্পতির সঙ্গে। স্পেনসার প্রকৌশলী। থাকেন ঘোড়াশাল। লক্ষ্যা নদীর ওপর যে ব্রিজ তৈরি হচ্ছে তিনি ছিলেন সেটির দায়িত্বে। বেশ অতিথিপরায়ণ দম্পতি। সময় পেলেই ড্যাশ ঘোড়াশাল যেতেন এবং স্পেনসারদের কাছে চাটগাঁর স্মৃতির কথা বলতেন।

ক্রিসমাসের দিন দুপুর স্পেনসারদের সঙ্গে লাঞ্চ করার জন্য দু'জন রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীও এসেছিলেন। তারা দু'জন থাকতেন সেনবার্গের মতোই একটি কুটিরে। স্পেনসার যে ব্রিজটি তৈরি করছেন কুটিরটি তার থেকে দু' মাইল দূরে। ড্যাশ গিয়েছিলেন তাদের আনতে এবং কুটিরের অবস্থা দেখে তিনি হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কুটিরের ভেতর কোনো বিছানাপত্র, কাপড়চোপড়, তৈজসপত্র, আসবাব কিছুই নেই। পাদ্রী দু'জন অবশ্য ড্যাশকে একগ্লাস ওয়াইন খেতে দিয়েছিলেন।

স্পেনসারদের বাড়িটিও বাঁশের খুঁটির ওপর বসানো বাংলো। বাংলোটি বাঁশেরই তৈরি তবে আকারে বড়। লাঞ্চের সময় গিয়ে ড্যাশ দেখেন বাংলোর

বারান্দা উপঢৌকনে ভর্তি। ব্রিজ নির্মাণের সঙ্গে যেসব ঠিকাদার জড়িত তারা সব 'ডালা' পাঠিয়েছে। স্পেনসার তাদের চটাতে চান না দেখে 'ডালা' গুলি গ্রহণ করেছেন। কারণ তারা ঝামেলা বাধালে ব্রিজের কাজ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। কি ধরনের উপঢৌকন ছিল 'ডালা'য়। বারান্দায় এক ধার থেকে অন্য ধার পর্যন্ত সাজানো আশি-নব্বইটি ফুলকপি। স্কচ, জিন ও ভারমুথের ছাব্বিশটি বোতল, পঁচিশটি ক্রিসমাস কেক ও পনেরো বাক্স বাজী। একপাশে কলা, কমলা ও অন্যান্য ফলের স্তূপ। পঁয়ত্রিশ জার ভর্তি ফল ও জ্যাম। অসংখ্য চকলেট। দেড় ডজন ভয়াবহ রংয়ের নোট পেপার ও খাম। ছয়টি মুরগি, দুইটি টার্কি, তিনটি হাঁস।

মহানন্দে লাঞ্চ সারলেন পাদ্রীরা। এ অঞ্চলে আসার পর এত সুস্বাদু ভরপেট খাওয়া তারা খেয়েছে কি না সন্দেহ। ড্যাশ তাদের নতুন একটা তাসের খেলা শেখালেন। সব মিলিয়ে ড্যাশ লিখেছেন, মহানন্দেই সময়টা কাটলো।

নববর্ষ উদযাপন করতে ড্যাশ এলেন ঢাকায়। এ সময় সামাজিকতায়ও যোগ দিলেন। সাত গম্বুজ মসজিদে একদিন দলবেঁধে গেলেন পিকনিকে। মহিলা-পুরুষের একটি দল হ্যাম স্যান্ডউইচ খেতে খেতে মসজিদ চত্বরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। উপস্থিত মুসল্লিরা নীরবে তা সহ্য করলেন। আরেকদিন, ক্লাবে অনুষ্ঠিত হলো এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। অনুষ্ঠানে নাচলেন শিলংয়ের গুর্খা রেজিমেন্টের কমান্ডার কর্নেলের মেয়ে মউড। ড্যাশের বন্ধু বটমলি পরে তাকে বিয়ে করেন। পরিচয় হলো ঢাকার এডিশনাল এসপি ডগি ম্যাকলুইরের সঙ্গে। ডগি জানালেন, পরেরবার ঢাকায় এলে ড্যাশ যেন রমনায় তার বাসায় ওঠেন।

ছুটি শেষে আবার মাঠে ফিরলেন ড্যাশ। তাঁবু গাড়লেন চরসিন্দুরে। সেখান থেকে বিল বেলাইয়ের জরিপ করতে গিয়ে মহাঝামেলায় পড়লেন। এরি মধ্যে গরম পড়তে লাগলো। গ্রীষ্মের সঙ্গে সঙ্গে কালবোশেখী। জরিপ করাই প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠলো। একবার তো কালবোশেখী তার বজরা ভাসিয়ে নিয়ে গেল। কোনো রকমে প্রাণে বাঁচলেন। মাঠের কাজ শেষ হলে ফিরলেন ঢাকায়। মাঠে কাজ না থাকলে অফিসে তেমন কাজ থাকে না। বন্ধু হেনরির সঙ্গে গলফ খেলে সময় কাটাতেন। এরি মধ্যে হেনরিকে আলীপুর ডুয়ার্সের এসডিও হিসেবে পাঠানো হলো আর ড্যাশকে নিযুক্ত করা হলো হুগলী জেলার ত্রাণকাজে। হুগলীতে কাজ সেরে ছুটি কাটাতে ড্যাশ গেলেন ডুয়ার্সে।

মাঠে কাজের মৌসুম শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় ফিরলেন ড্যাশ। ব্রিটিশ রাজের ঝাণ্ডা উঁচু রাখার জন্য আবার শুরু করলেন সেই নিঃসঙ্গ ক্যাম্প জীবন। তবে, ঐ মৌসুমে খানিকটা উত্তেজনার স্বাদও পেলেন। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন শুরু হয়েছে। সরকার জেলায় জেলায় সেনা সমাবেশ করছে। শীতকালে এদের বেশকিছু দল উত্তর-পশ্চিম থেকে মার্চ করে ঢাকা

পৌঁছাতো। এরকম কয়েকটি দলের অফিসারদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ড্যাশের। কয়েকটি দিন এদের সঙ্গে বেশ আনন্দেই কাটলো। এখানেই একদিন এক কাবুলিঅলার দেখা পেলেন ড্যাশ। ড্যাশ লিখেছেন, 'প্রতি শীতে এরা বাংলার গ্রামাঞ্চলে এসে গত বছরের টাকা ও সুদের জন্য ত্রাস সৃষ্টি করে।'

সৈন্যদের দলগুলো চলে গেলে আবার নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন ড্যাশ। এই নিঃসঙ্গতা তাঁর মেজাজ মর্জিও যেনো বদলে দিলো। একদিন সকালে সহিসকে পেটাবার জন্যে দৌড়লেন। ঘোড়াটার উপর যথেষ্ট অত্যাচার চালালেন কয়েকদিন। আরেকদিন কয়েকজন সঙ্গীসহ গেলেন শিকারে। বেজায় তৃষ্ণা পাওয়ায় এক সময় গিয়ে উঠলেন এক গৃহস্থ বাড়িতে। বললেন, ডাব খাওয়াতে। এতোজন সাহেবকে আচমকা দেখে গৃহস্থ বেচারা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ড্যাশ ঘুশি মরলেন গৃহস্থকে, বাড়ির কয়েকজনকে চড়টড়ও মারলেন। তাড়াতাড়ি ডাব পেড়ে খাওয়ানো হলো সাহেবদের। তবে, ড্যাশের সাথীরা ব্যাপারটি পছন্দ করেননি এবং ঢাকা গিয়ে তারা বোধহয় রিপোর্ট করেছিলেন কারণ এরপর ঢাকায় ফিরে ড্যাশ ছয়মাসের ছুটি চাইতেই তা মঞ্জুর করা হলো। তারপর তাঁকে আর সেটেলমেন্ট বিভাগে পাঠানো হয়নি। সেটেলমেন্ট রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার পর দেখা গেল যারা এ কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল তাদের দীর্ঘ তালিকাও দেয়া হয়েছে এবং সেখানে তাঁর নামও আছে। কিন্তু আলাদাভাবে তাঁর কাজের স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি।

সব মিলেটিলে মন খারাপ। ঠিক করলেন, ছুটি কাটাতে যাবে লন্ডন। গ্রিন্ডলেজকে বললেন তাঁর টিকেট বুক করতে।

লন্ডনে কিছুদিন ছুটি কাটালেন। ছুটি শেষ হওয়ার আগেই যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ফলে ছুটি ফুরোবার আগেই তাঁকে ফিরতে হলো। কলকাতায় নেমে শুনলেন, তাঁকে বর্ধমানের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট করা হয়েছে। সেখানে তাঁর উপরঅলা ছিলেন আরো একসেনট্রিক চাটগাঁর ফিলিমোর থেকেও বেশি। এর কিছু দিন পর এসডিও হিসেবে তাঁকে বদলি করা হয় নাটোর।

॥ ৫ ॥

বর্ধমান থাকতেই ড্যাশ দু'বার আক্রান্ত হয়েছিলেন ম্যালিগন্যাট ম্যালেরিয়ায়। নাটোরে যাবার আগে শুনলেন, বাংলায় নাটোরই হচ্ছে ম্যালেরিয়ার পীঠস্থান।

নাটোর গুরুত্বপূর্ণ মহকুমা, কারণ তখন গঙ্গার ওপর সারা ব্রিজ নির্মাণ করা হচ্ছে যা আসাম ও কলকাতাকে রেলওয়ের মাধ্যমে যুক্ত করবে। গঙ্গার উত্তর পাড়ে অর্থাৎ নাটোরে কাজ শুরু হয়েছে যা রাজশাহী জেলায়। রাজশাহীর সদর তখন রামপুর বোয়ালিয়া যা রেলওয়ের ত্রিশ মাইল পশ্চিমে।

নাটোরে সব সময় শ্বেতাঙ্গ আইসিএস নিযুক্ত করা হয়েছে। ড্যাশের মতে,

এর একটা কারণ ছিল হয়ত, এখানে নীলকর ছিলেন অনেক এবং প্রশাসন ভেবেছিল, শ্বেতাঙ্গ মহকুমা প্রশাসকের পক্ষেই এদের নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। এখন আর নীল নেই, নীলকরও নেই। যে ক'জন শ্বেতাঙ্গ তখনও রয়ে গেছেন নাটোরে, তারা ব্যস্ত পিগস্টিকিং অথবা ইক্ষু উৎপাদনে নতুবা খাজনা আদায়ে। সারা ব্রিজের ব্যয় ঐ আমলেই ধরা হয়েছিল চল্লিশ লাখ পাউণ্ড আর সে কারণেই বোধহয় সরকার ভেবেছিল সেখানে একজন শ্বেতাঙ্গ মহকুমা প্রশাসক নিযুক্ত করাই বাঞ্ছনীয়।

নাটোর যাওয়ার জন্য বর্ধমান থেকে কলকাতায় এলেন ড্যাশ। শুনলেন, তাঁর পূর্বসূরি অসুস্থ অবস্থায় প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালে আছেন। তাঁর নাম ব্লুমফিল্ড। লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান যুবক। ড্যাশ হাসপাতালে গিয়ে দেখেন, সারা গায়ে ফোড়া নিয়ে ব্লুমফিল্ড শুয়ে। ব্লুমফিল্ড জানালেন, তাঁর পূর্বসূরি বিংম্যান ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মেডিক্যাল লিভে আছেন এবং এখনও সুস্থ হননি। ব্লুমফিল্ডের অবস্থার একটু উন্নতি হলে তাঁকে পাঠিয়ে দেয়া হয় ইংল্যান্ডে।

চাকরি চাকরিই। ড্যাশ তৈরি হলেন নাটোর যেতে। ব্রিজ তৈরির সময় কলকাতা থেকে যারা দার্জিলিং ও আসাম যেতেন তারা ব্রডগেজ লাইন থেকে নামতেন দক্ষিণ পাড়ে সারাতে। তারপর উঠতেন ফেরি স্টিমারে। উত্তর পাড়ে দামুকদিয়ায় থাকতো ট্রেন, যা ছাড়তো রাত সাড়ে এগারোটায়। যাত্রায় কোনো তাড়াহুড়ো ছিল না। কারণ, ভোরের আগে শিলিগুড়িতে ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জারদের ঘুম ভাঙ্গানোর মানে হয় না।

ড্যাশ লিখেছেন, নিজেকে তিনি ভাগ্যবান মনে করেছেণ এ কারণে যে, এ রকম গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনটিকে থামানো গেল নাটোরে। অবশ্য, গার্ডকে আগেই জানিয়ে রাখা হয়েছিল। এর কারণ, রামপুর বোয়ালিয়ার স্টেশন ছিল নাটোর। রাত সাড়ে বারোটায় ড্যাশ তাঁর মোটর বাইক ও সামান্য কিছু পার্থিব জিনিসপত্র নিয়ে নামলেন। এসব পার্থিব জিনিসপত্র কিনেছিলেন রামপুরহাট থেকে মাত্র পঞ্চাশ টাকায়।

ড্যাশের নাজির ডাকবাংলোয় তাঁর জন্য একটি রুম ঠিক করে রেখেছিলেন। সকালে ডাকবাংলোর বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে নিজের বাসস্থান দেখলেন ড্যাশ। একটি কুটির, এক সারিতে তিনটি ঘর। খানিক দূরে আলাদা একটি শেডে রান্নাঘর। আরেকটি শেডে ভৃত্য ও ঘোড়াদের থাকার জায়গা। চারদিকে কোনো ঘেরাও নেই। বাড়ির চারদিকে ৮০+৮০ গজ এক টুকরো জমি; তার পর রাস্তা, রাস্তার পাশে বাজার, দোকানপাট, ঘরবাড়ি।

প্রতিটি ঘরের দরজা অবশ্য সেগুন কাঠের, ভিনেশিয়ান ব্লাইণ্ডের ধাঁচের। কিন্তু কোনো ঘরেই কাচের দরজা নেই। সুতরাং ঠাণ্ডা বা গরম বাতাস কোনোটিই

ঠেকাবার উপায় নেই। বাইরে থেকে হুড়কো খুলে যদি কেউ ঢুকতে চায় তাকে ঠেকাবারও কোনো উপায় নেই।

এসডিও'র মোকামে যাবার পর ড্যাশ লিখেছেন, আসলে ঘরটির কোনো প্রাইভেসি নেই। প্রতিদিন তাঁর নৈশাহার শেষ হলে পেছনে বারান্দায় নেড়ি কুত্তাদের চিৎকার ও যুদ্ধ শুরু হয় খাবারের উচ্ছিষ্ট নিয়ে। রাতে, যে কোনো সময় শোনা যায় বারান্দা থেকে চিৎকার করছে নেড়ি কুত্তা।

ড্যাশ নাটোর পৌঁছলেন নভেম্বরের গোড়ায় যখন উত্তর-পূর্ব থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। দরজার অজস্র ফাঁক দিয়ে সে বাতাস ঢুকতো। ভেতরে ছিল না কোনো ফায়ার প্লেস। ফলে, রাতের খাবারের পর ওভারকোট পরে বিছানায় যাওয়ার আগে শরীর গরম করার জন্য পায়চারী করতেন ঘরের ভিতর। ঠাণ্ডার জন্য বই পড়া বা গান শোনাও সম্ভব ছিল না। তেলের বাতি জ্বালালেও ঘর উষ্ণ হতো না, বরং ঝাঁকে ঝাঁকে মশা তা ঘিরে ধরতো।

দিন তিনেক এভাবে কাটার পর তৃতীয়বার আক্রান্ত হলেন তিনি ম্যালেরিয়ায়। সুস্থ হওয়ার সময় জেলা গেজেটিয়ার পড়ে জানলেন, মহকুমার দক্ষিণসীমা গঙ্গা এবং মহকুমাটি অস্বাস্থ্যকর হিসাবে খ্যাত। চলন বিল নন্দীগ্রাম পুলিশ-থানাকে মহকুমা থেকে আলাদা করে রেখেছে। নন্দীগ্রাম যেতে হলে যেতে হবে বগুড়া এবং তারপর আরো পনেরো মাইলের ধাক্কা।

ড্যাশের পূর্বসূরি হঠাৎ করে চলে যাওয়াতে অনেক ফৌজদারী মামলা জমে গিয়েছিল। মহকুমার ভার নেয়ার পর প্রথম কয়েক সপ্তাহ ড্যাশ সেগুলো নিষ্পত্তিতে ব্যস্ত রইলেন। এরই মধ্যে তাঁকে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতায়ও দেয়া হয়েছে। কয়েকদিন পর ড্যাশ একটি সার্কুলার পেলেন। ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট ও কমিশনারের মাধ্যমে এসেছে সার্কুলারটি।

মূল বক্তব্য, বিচারকার্য চালানোর সময় আদালতে ধূমপান নিন্দনীয়। ড্যাশের হঠাৎ রাগ হলো। পুরনো কাগজপত্র খুঁজে তিনি বার্মা চুরুটের একটি বিজ্ঞাপন বের করলেন। রেঙ্গুনের ঠিকানায় চুরুটের দোকানে নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন– তাঁকে যেন এক শ'টি চুরুট পাঠিয়ে দেয়া হয়, যার মূল্য ছিল পৌনে চার টাকা। চুরুট এলে, প্রতিদিন আদালত চলাকালে একটি চুরুট রাখতেন মুখে। কাজটা নেহাৎ ছেলেমানুষী। লিখেছেন ড্যাশ, কিন্তু একজন এসডিওকে এ ধরনের সার্কুলার পাঠানো হবে, সে সময় তা মানতেও তিনি রাজি ছিলেন না। অফিসের কাজকর্ম পরীক্ষা করতে গিয়ে একদিন দেখেন ৭৩ জনের একটি মামলার প্রাথমিক অর্ডার দেয়া হয়েছে কিন্তু কেরানি তা গুঁজে রেখেছে একটি কাপবোর্ডের মধ্যে। কাগজপত্র পরীক্ষা করে একটি আদেশ দিলেন এবং তারপর আবার মালেরিয়ায় আক্রান্ত হলেন।

এই ৭৩ জনের মামলা সম্পর্কে খানিকটা আলোকপাত করতে হয়।

নাটোর থেকে তিন মাইল দূরে দিঘাপাতিয়া গ্রামে নাটোর রাজের প্রাসাদ। বর্তমান রাজা প্রায় সময়ই থাকতেন কলকাতা বা দার্জিলিংয়ে। ড্যাশের সঙ্গে তাঁর কখনও দেখা হয়নি। মাঝে মাঝে মহারাজ যখন নাটোর এসেছেন তখন ড্যাশ থাকতেন অসুস্থ। নায়েব জমিদারির দেখাশোনা করতেন এবং এই দেখাশোনার প্রক্রিয়ায় জমিদারির খানিকটা হস্তগত করেছিলেন। নয় আনা হিস্যায় নায়েবের জমিতে ঐ ৭৩ জন পতিতা বাস করতেন।

ড্যাশ সুস্থ হয়ে ১৯১৩ সালের ইস্টার্ন বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম প্রসটিটিউট অ্যাক্ট অনুযায়ী এই ৭৩ জনকে বললেন তিন মাসের মধ্যে উঠে যেতে। কিন্তু কোথায় তার কোনো নির্দেশ দিলেন না। স্থানীয় লোকজন এই নির্দেশ পছন্দ করেনি। কারণ তাদের মতে, এসডিও অযথা হস্তক্ষেপ করছেন। নায়েব তো খুশি হনইনি। কারণ অর্থ ছাড়াও তিনি অন্যান্য অনেক সুবিধা পেতেন। ড্যাশ অবাক হয়ে লিখেছেন, চার হাজার লোকের জন্য এতোজন পতিতা।

নায়েব এসডিও'র সঙ্গে দরবার করলেন। ড্যাশ অটল। পতিতাদের পুরনো জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হলো।

একবার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর এলএসএস ও'ম্যালি এলেন নাটোর। এর অর্থ পিগ স্টিকিং। ও'ম্যালি এলেন গাড়িতে। অবশ্য তিনি ভালো ঘোড়সওয়ারও। ড্যাশের মনে হয়েছিল, ও'ম্যালির মধ্যে সব সময় একটা লোক দেখানো ভাব আছে। আসলে ও'ম্যালি ছিলেন 'ক্যালকাটা-দার্জিলিং ফ্যান' যাকে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে মফস্বলে। ড্যাশ তখনও জানতেন না যে, ও'ম্যালি হচ্ছেন মধ্য পর্যায়ের সেই আইসিএস চক্রের সদস্য যারা 'নেট ওয়ার্কিং'-এর মাধ্যমে রাইটার্সের পদগুলো নিজেদের জন্য সংরক্ষণ করে। এবং এভাবে তারা তুলে ধরে যে, তারা অপরিহার্য প্রশাসনের জন্য। শুধু তাই নয়। এই 'নেট ওয়ার্কিং' নিশ্চিত করার জন্য একে অপরের কন্যা বা বোনকেও বিয়ে করেন। ও'ম্যালি জেলার কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়াই লিখেছেন 'ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার'। ড্যাশের মতে অর্থ উপার্জনের এটি ছিল চমৎকার এক ব্যবসা। কলকাতায় থাকতেন ও'ম্যালি আর জেলার পদের অভিজ্ঞতা ছিল তাদের বিভিন্ন বিষয়ে রিপোর্ট পাঠাতে বলতেন। তারপর তিনি তা সংকলন করে নিজের নামে প্রকাশ করতেন। প্রতিখণ্ডের জন্য পেতেন এক হাজার টাকা। কেন যে তাঁকে রাজশাহীতে নির্বাসন দেয়া হয়েছিল তার কারণ ড্যাশ খুঁজে বের করতে পারেননি। তবে, ড্যাশের মনে হয়েছে, ও'ম্যালি সব সময় এক ধরনের বিরক্তি চেপে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করতেন। তরুণ আইসিএসরা প্রশিক্ষণ সময়ে কিভাবে সিনিয়র আইসিএসদের বিরক্ত করে তোলেন তার উদাহরণও দিয়েছেন ড্যাশ। একবার রামপুর-বোয়ালিয়ার ডিস্ট্রিক্ট

বোর্ডের মিটিংয়ে গেছেন। সকালে নাস্তার টেবিলে দেখা মার্টিন নামে এক তরুণ আইসিএসের সঙ্গে। পরিজ দেয়া হলো টেবিলে। এক চামচ মুখে দিয়ে মার্টিন চামচ নামিয়ে রাখলেন এবং তারপর কিভাবে পরিজ তৈরি করতে হয় সে সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন।

আর একবার ড্যাশ রামপুর-বোয়ালিয়া গেছেন। সেখানে কমিশনার বোনহাম কার্টারও ছিলেন। ড্যাশ তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, কমিশনারদের কাজ কি?" মিসেস কার্টার শীতল কণ্ঠে বললেন, "তারা গোপনে তরুণ অফিসারদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত হন এবং এ ব্যাপারে তারা নির্ভর করেন স্ত্রীদের ওপর" বলে, পিছন ফিরে চলে গেলেন।

এরি মাঝে ড্যাশ আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কয়েক দিন জ্বরে ভুগে সুস্থ হওয়ার পর সাত আনির নায়েব জানালেন, সিংগারা এবং চলনবিল হয়ে বগুড়ার দিকে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের যে রাস্তা চলে গেছে সেখানে তার খানিকটা জমি আছে। ঐ ৭৩ জন পতিতা সেখানে থাকতে পারে। শহরে ৭৩ জন থাকলে যুবকদের আর চরিত্র বলে কিছু থাকবে না। নায়েব যে এলাকার কথা বলছেন তা সহজে অধিগম্য নয়। পতিতারা কোথায় থাকবে না থাকবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার কোনো ক্ষমতা যে এসডিও'র নেই তা ড্যাশ জানতেন। তাই নায়েবের প্রস্তাবে তিনি সম্মত হলেন।

একবার ও'ম্যালি জানালেন, সিংগারা হয়ে চলনবিল পর্যন্ত যে রাস্তাটি গেছে সেটি তিনি পরিদর্শন করবেন। এবং সিংগারা পরিদর্শন বাংলোতে ড্যাশকে লাঞ্চ খাওয়াবেন। খবর পেয়েই সাইকেলে চেপে ড্যাশ রওয়ানা হয়ে গেলেন সিংগারা ডাকবাংলোর অবস্থা দেখতে।

রাস্তা থেকে দূরে, একটি নালার পাশে ডাকবাংলো খুবই নাজুক অবস্থায় দাঁড়িয়ে। নালার গভীরতা দেড়ফুট। বর্ষায় বাংলোটির চারদিকে পানি জমে যায়। বাংলোর ভিত্তি ছয়ফুটের মতো উঁচু। পাশেই চৌকিদারের কুঁড়ে। বাংলোর রুমটি ১০×সাড়ে ৭ ফুটের। দক্ষিণে দু'ফুট বারান্দা। ৪×৪ ফুট বাথরুম। রুমে দু'টি চেয়ার, একটি টেবিল, একটি কাঠের চৌকি, একটি সেলফ, ওপরে ল্যাম্প এবং একটি ভিজিটর বুক। একশো ফুট দূরের নালাটি পানির উৎস। বাথরুমে আছে একটি বাথটাব। সেখানে যাবতীয় কাজের জন্য পানি রাখা হয়। বাথরুমে বাথটাব রাখলে কমোডটা এনে চৌকির ওপর রাখা হয়।

ড্যাশ আরো দেখলেন, চেয়ার এবং টেবিলের একটি করে পায়া ভাঙ্গা। ভালো চেয়ারটিতে বসে কমোডের পাশে সেলফ থেকে ভিজিটর বুকটি নিলেন এবং দেখলেন লেখা আছে–

ভিজিটরস বুক

দি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড অফ রাজশাহী

সিংগারা ইন্সপেকশন বাংলো (ক্লাস-সি)

[নোট : গেজেটেড অফিসারের পদমর্যাদার নিচে কেউ এই বাংলো ব্যবহার করতে পারবেন না। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ওভারসিয়াররা যেন এই বাংলো ব্যবহার না করেন]।

পাতা ওল্টালেন ড্যাশ

আগমন ও স্থান ত্যাগের তারিখ	অফিসারদের নাম ও পদমর্যাদা	মন্তব্য
২২-৪-১৮৯৯	নির্মাণ সম্পূর্ণ ও ব্যবহারের উপযুক্ত। আসবাবের তালিকার জন্য এক নম্বর পৃষ্ঠা দেখুন এ.কে.বি জেলা ইঞ্জিনিয়ার	
২২-১০-১৮৯৯	এ. ক্লার্ক এস.ডি.ও	নিদ্রাহীন রাত : বারান্দার ছাদের বাদুড়টি হয় তাড়াতে হবে নয় মেরে ফেলতে হবে। চৌকিদারকে এ ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
১৪-১-১৯০০	এ. ক্লার্ক এস.ডি.ও	আমার আগমনের সময় চৌকিদার উপস্থিত ছিল না। সে এল সন্ধ্যা পেরিয়ে মাতাল হয়ে। একজোড়া কামাতুর বাদুড়ের কারণে আরেকটি নিদ্রাহীন রাত। বাংলোটি পরিচ্ছন্ন ও বারান্দা বাদুড়মুক্ত রাখার সাধারণ কাজটি চৌকিদারের বদলে একজন উপযুক্ত লোককে দায়িত্ব দেওয়ার জন্য নাজিরকে নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে।
২২-৪-১৯০০	এইচ.আর	
২৩-৪-১৯০০	রিচার্ডসন এস.ডি.ও	আমার পূর্বসূরির নির্দেশ মানা হয়নি। চৌকিদারকে খুঁজে পাওয়া গেল না। জানালা ভেঙ্গে ঢুকলাম। নিদ্রাহীন রাত। সকালে বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটলো। কারণ ভাঙ্গা জানালা গলিয়ে এক পাগল আমার মাথায় হাত বুলাচ্ছিল। নাজিরকে রিপোর্ট করতে বলা হচ্ছে।

[ইয়োর অনার, বাদুড় তাড়াবার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। দুটি পুরনো ও নতুন বাসা (বাদুড়ের) ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। ওয়্যার নেটিং দেয়া হয়েছে যাতে বাদুড় আর বাসা করতে না পারে। জানালা মেরামত করা হয়েছে। এ.কে.সি.]

২৬-৬-১৯০০	এইচ.আর.রিচার্ডসন	
২৭-৬-১৯০০	এস.ডি.ও	আমি এখন বদলির নির্দেশে আছি তবুও

বলে যেতে চাই সিংগারায় আরেকটি নিদ্রাহীন রাত কাটলো বাদুড়ের জন্য। আমার উত্তরসূরি এটিকে হত্যা করে বারান্দায় ঝুলিয়ে রাখার চেষ্টা করতে পারেন।

২-১০-১৯০০ এ.পি. কার্টরাইট

৪-১০-১৯০০ এস.ডি.ও নিদ্রাহীন রাত– সকালে পূর্বসূরিদের মন্ত ব্যগুলো পড়লাম। দিনে বাদুড়ের দেখা নেই। আরেক রাত এখানে কাটাবার জন্য প্রোগ্রামের বদল করলাম। সাড়ে নটায় বাদুড়টিকে গুলি করলাম। বারান্দার ছাদ ফুটো হয়ে গেল। আরামে ঘুমালাম। নতুন বাদুড় আসার আগে নাজির চৌকিদার বদল করে বারান্দার ছাদ মেরামত করতে হবে।

৬-৬-১৯০৮ এইচ.এইচ. ব্যাটটাই

৭-৬-১৯০৮ এস.ডি.ও চৌকিদার খুব মনোযোগী। সকালে বারান্দায় দেখলাম মরা বাদুড়। বয়সের কারণে মারা গেছে। চারদিকে মদের গন্ধ।

১৪-২-১৯১০ এ.পি.স্কট

১৫-২-১৯১০ এস.ডি.ও আগামী সপ্তাহে কমিশনার আসবেন তাই পরিবর্শন বাংলো দেখতে এলাম। ঘরের ভিতর বাদুড় পরিবারের কারণে নিদ্রাহীন রাত কাটাতে হলো। কমিশনার আসার আগে জানালা সারাতে হবে, বাদুড় দূর করতে হবে। নাজিরকে এ ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া গেল।

২৮-২-১৯১০ এফ. ক্রুইকশ্যাংক

১-৩-১৯১০ এস.ডি.ও নিদ্রাহীন রাত। বাংলো পুণঃনির্মাণে যে আদেশ দেয়া হয়েছে তার অগ্রগতিতে আমি সন্তুষ্ট নই। কমিশনারের পরিদর্শনের পর পূর্বসূরি বদলির আগে এ ব্যাপারে কড়া নোট রেখে গেছেন বলে মনে পড়ছে। ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তা সদরে পাঠাতে হবে।

(আমাদের জন্য ১-৮-১৯১১ তারিখে নতুন বাংলো খুলে দেওয়া হয়েছে।)

১০-১০-১৯১১ সকাল ৮-৩০

আর.বি.ভগ আর.বি.ভগ পূর্বতন চৌকিদারে বিরুদ্ধে আগুন লাগাবার মামলা

সকাল ১০-৩০ টেকেনি। আশা করি নতুন চৌকিদার ও নতুন বাংলো সবার

১০-১০-১৯১১ এস.ডি.ও মন যোগাবে।

১১-১১-১৯১১ আর.বি.ভগ

১২-১১-১৯১১ এস.ডি.ও বারান্দায় নৈশ ভোজ। ইঁদুরের একটি পা ছাদ থেকে পড়লো স্যুপে। বাদুড়ের কারণে নিদ্রাহীন রাত।

১-২-১৯১২ এন.এফ. ওয়ার্কম্যান

২-২-১৯১২ এস.ডি.ও 'বার্ডস অফ অ্যান ইন্ডিয়ান গার্ডেন' নামে

বইটি উপহার দিলাম ও তা শেলফে রাখা হলো।

ড্যাশ দেখলেন, বিংম্যান ও ব্লুমফিল্ড এসডিও থাকাকালীন সিংগারা পরিদর্শন করেননি। শুধু তাই নয়, পূর্বতন এসডিওরা তখনই বদলির আদেশ পেয়েছেন যখন তাদের কমিশনার একটি রাত কাটিয়ে গেছেন সিংগারায়। ড্যাশ মনে মনে বললেন, 'ও'ম্যালি আসার আগে যেভাবেই হোক একটা বন্দোবস্ত করতে হবে।'।

ও'ম্যালি আসার আগেই সব মেরামত করে সাজাতে হবে, ভাবলেন ড্যাশ এবং কি কি কাজ সারতে হবে তার একটি হিসাব কষলেন। কমোডটি বাথরুমে নিতে হবে, তার মানে বাথটাবটি বাথরুমের বাইরে রাখতে হবে, দরকার হলে পানিশুদ্ধ। চেয়ার আর টেবিলের ভাঙ্গা পায়া মেরামত করতে হবে। সাইকেলে চড়ে নাজিরকে খুঁজে বের করে বললেন, মিস্ত্রি ডেকে যেন সবকিছু মেরামত করে রাখে।

নির্দিষ্ট সময়ে লোরনাকে নিয়ে ডাকবাংলোর সামনে হাজির রইলেন ড্যাশ। ও'ম্যালিকে নিয়ে তারপর রওয়ানা হলেন সিংগারার দিকে। পথে পড়ল ছয়আনি নায়েবের সেই 'গার্ডেন সার্কাস'। ৭৩ জন পতিতার আবাসস্থল। সেখানে পৌঁছতেই দেখা গেল, পরিষ্কার কাপড়চোপড় পরে ছয় লাইনে ৭৩ জন দাঁড়িয়ে আর তাদের নেত্রীর হাতে একটি দরখাস্ত। কালেক্টর ও এসডিও কাছে আসতেই সমস্বরে নমস্কার জানানো হলো। অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে কালেক্টর এসডিওর কাছে জানতে চাইলেন এই 'ডোমোনেস্ট্রেশনের' কারণ কি? তারপর হাত বাড়িয়ে দরখাস্তটা নিয়ে প্রথম কয়েক লাইন পড়ে ড্যাশের হাতে দিলেন। প্রথম কয়েক লাইন ছিল এ রকম– "To the Incarnation of Justice and the Benign Governor of the District of Rajshahi who has shed the radiance of His presence on the humble town of Natore. Wherein henceforth will blossom the tree of prosperity and sprinkle it for ever over its fortunate citizens..." দরখাস্তের মূল কথা, শহরের কেন্দ্রে কোনোরকম ঝামেলা না করে তারা পাবলিকের ডিমান্ড মেটাচ্ছিল। কিন্তু এখন তাদের শহরের বাইরে থাকতে হচ্ছে, বর্ষায় চলাফেরাই দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তাটা যেন পাকা করে দেয়া হয় ও তাদের পাড়ায় ঢোকার রাস্তাটা যেন ছয় আনার নায়েব পাকা করে দেন।

ড্যাশ বললেন, এ ব্যাপারে তিনি তাদের পরে জানাবেন। লাঞ্চ খাওয়ার পর ও'ম্যালি সিংগারা বাংলোর ভিজিটরস বুক দেখলেন, তারপর ড্যাশকে বললেন, এরপর থেকে যেন বাংলোটির ভার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ওপরই দেয়া হয় এবং তারাই এর রক্ষণাবেক্ষণ করবে। তারপর নাটোর ডাকবাংলোয় ফিরে তিনি গাড়ি করে চলে গেলেন আর তার সহিস ত্রিশ মাইল দূরে রামপুর-বোয়ালিয়া পর্যন্ত তার ঘোড়াটি হাঁটিয়ে নিয়ে গেল।

ও'ম্যালি চলে যাওয়ার পর পরই ড্যাশ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলেন এবং খানিকটা সুস্থ হতেই খবর পেলেন তাকে সদরে বদলি করা হয়েছে। সদরে দায়িত্ব বুঝে নেয়ার পর আবার ম্যালেরিয়ায় ধরল তাকে। তবে, সদরে কাজকর্ম তেমন নেই দেখে সামলে উঠলেন। সদরের এসডিও হিসাবে নাইনকোর্সের গলফকোর্স দেখাশোনাটাই যেন ছিল মূল দায়িত্ব।

সদরে এসেও রেহাই পেলেন না। তাঁকে বদলি করা হলো বাংলার বাইরে, পোস্টাল সেন্সর অফিসে। সেখানে কাজ করার সময় অবশ্য খানিকটা সুস্থ ছিলেন। রামপুর-বোয়ালিয়া ছেড়ে যাবার সময় ড্যাশ ঘোড়া, আসবাবপত্র কিছুই সঙ্গে নিয়ে যাননি। লোরনা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ফলে তাকে মেরে ফেলতে হলো। ঠিক করেছিলেন বইপত্র, কাপড়চোপড় পরে নিয়ে যাবেন। পরে যখন তা নেয়ার বন্দোবস্ত করলেন তখন দেখা গেল উইপোকা সব ধ্বংস করে ফেলেছে। ড্যাশের ডাকটিকিট সংগ্রহ ছিল। ২৪০০ ডাকটিকিটের মধ্যে রক্ষা পেয়েছিল মাত্র ৪৫৭টি।

ড্যাশ যখন রামপুর-বোয়ালিয়ায় তখনই উদ্বোধন হলো সারা ব্রিজের। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ড্যাশ কোনো আমন্ত্রণ পাননি। অবশ্য পেলেও কোনো লাভ হতো না। কারণ, ম্যালেরিয়ায় তখন তিনি শয্যাশায়ী। তবে এ উপলক্ষে চার লাইনের একটি কবিতা রচনা করেছিলেন তিনি–

"But let, with laughter nad with tears,
The story still be told
How much it cost to build a bridge
In the Brave days of old."

ড্যাশ লিখেছেন নাটোরে তিনিই শেষ আইসিএস অফিসার। তারপর থেকে প্রাদেশিক সার্ভিসের বাঙালিরাই এই মহকুমার দায়িত্ব পেয়েছেন।

॥ ৬ ॥

নাটোর থেকে বোম্বে। তখন যুদ্ধ চলছে। অনেকের মতো ড্যাশও যুদ্ধে নাম লেখালেন এবং সেনাবাহিনীর সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর প্রভৃতি অঞ্চল ঘুরে বেড়াবার পর যুদ্ধ শেষে নির্দেশ পেলেন তাকে নোয়াখালির ডিএম বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা হয়েছে। সেনাবাহিনী থেকে দেনা-পাওনা শোধের পর এক পাঞ্জাবি ভৃত্য নিয়ে রওয়ানা হলেন কলকাতা। সেখান থেকে যাবেন নোয়াখালী।

নোয়াখালির খ্যাতি ছিল নিঃসঙ্গ এবং অপাংক্তেয় জেলা হিসাবে। ঐ অঞ্চলের ডিএম নিযুক্ত হয়ে খুব যে একটা খুশি হলেন ড্যাশ তা নয়। তার ক্যাডারের বন্ধুরা যারা যুদ্ধের সময় বাংলা প্রদেশে ছিল তারা থিতু হয়ে বসে ইতোমধ্যে ভালো ভালো

চাকরি হাতিয়ে নিয়েছে। তবে ড্যাশ আশ্বস্ত হলেন শুনে যে, নোয়াখালি স্বাস্থ্যপ্রদ এলাকা। ইতোমধ্যে ম্যালেরিয়া থেকে তিনি মুক্ত হয়েছেন কিন্তু কুইনিন ও আর্সেনিক তাঁকে আরো কিছুদিন খেতে হবে। তাছাড়া আরো যেসব রোগে তিনি ভুগছিলেন, সেগুলো হলো– ইনসোমনিয়া, বদহজম, রক্তশূন্যতা ও লামবাগো। যা হোক, ১৯১৯ সালে নতুন বছরের ঠিক শুরুতে ড্যাশ পৌঁছলেন নোয়াখালি।

নতুন ডিএম আসছেন– এ কথা নোয়াখালির ডিএম অফিসে আগেই জানিয়ে দেয়া হয়েছিল। রাজকীয় অভ্যর্থনার পর ঠিকা গাড়িতে পৌঁছলেন সার্কিট হাউস। সেখানে চা, ডিম, টোস্ট সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। মালপত্র পৌঁছাবার আগে চা, টোস্ট শেষ করে ডিএমের বাড়িটা দেখে নিলেন ড্যাশ।

বাড়িটি তৈরি করা হয়েছে প্রায় ছয় একর জমির ওপর। কোনো ঘেরাও নেই। জায়গাটা এত বড় যে, ঘেরাওর দরকারও নেই। জমির কিনারে পুকুর বা ঢালু জায়গা বর্ষায় যা হয়ে ওঠে টইটম্বুর। উত্তর-দক্ষিণ দিক দিয়ে চলে গেছে মিউনিসপ্যাল রোড। সে রাস্তা থেকে দেড়শ' গজ এলে তাঁর বাড়ি। সীমানার ভেতর একটি পুকুর। বাড়ির কাছে দক্ষিণে অবশ্য আছে ঘেরাও দেয়া একটি লন ও সবজি বাগান।

ষাট বছর আগে নোয়াখালির সিভিল সার্জন এই বাড়িটি তৈরি করেছিলেন। ঐ সময় মজুরি ও জিনিসপত্র ছিল সস্তা, তাই নোয়াখালির মতো ধাপধরা গোবিন্দপুরে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে এরকম বিশাল অট্টালিকা তৈরি করা সম্ভব ছিল। বাড়ির দক্ষিণে পোর্চ। দক্ষিণের ঘরগুলোতে পাখার দরকার নেই। ঘরের ছাদ আঠারো ফুট উঁচু, রুমগুলো বিশাল। একেকটি দৈর্ঘ্যে কমপক্ষে ষাট ফিট। প্রস্থেও তাই। বারান্দার ছাদটি করিনথিয়ান পিলারের ওপর।

বাড়িটি এতবড় যে, এর দোতলা বরাদ্দ ছিল ডিএম'র সরকারি বাসভবন হিসাবে। একতলা সার্কিট হাউস, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের জন্য। একতলা থেকে দোতলায় ওঠার সিঁড়িটি কাঠের।

ড্যাশ নোয়াখালি পৌঁছার আগেই নাজির সার্কিট হাউসের কিছু ফার্নিচার এনে তাঁর ঘর সাজিয়ে রেখেছিলেন। ড্যাশের পরিদর্শন শেষ হতে হতে মালপত্র এসে পৌঁছল। তার মনে হলো এবার তিনি থিতু হতে পারেন।

কাজে যোগ দেয়ার আগে কয়েকদিন ছুটি ছিল। প্রতিদিন দুপুরের আগে ডাক আসত আর আসতেন দর্শনার্থীরা। প্রথমে অফিসের কেরানিরা, তারপর ডিএম'র অধীনস্থরা, এরপর এলেন এসপি। আরো পরে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কর্মচারী ও অন্যরা। ড্যাশ একদিন নিজে গিয়ে দেখা করে এলেন বাঙালি ডিস্ট্রিক্ট ও সেশন জজের সঙ্গে। ইনি ড্যাশের অধীনস্থ ছিলেন না।

অফিস খুলল দোসরা জানুয়ারি। বাড়ি থেকে কয়েক কদম এগোতেই

দেখলেন তাঁর একশ' বারো জন কেরানি সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে। তাদের অভিবাদন গ্রহণ করে অফিসে ঢুকে সরকারিভাবে কাজে যোগ দিলেন। তারপর প্রায় ছয় ঘণ্টা ধরে ট্রেজারির টাকা গোনার বিরক্তিকর কাজটি শেষ করলেন।

ডিএমে'র বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় বসলে পুকুর পেরিয়ে দৃষ্টি যেতো পূর্ব-পশ্চিমের রাস্তায়। আরো দক্ষিণে একটি রেসকোর্স। এরই মাঝে দু'টি কবর ১৮২৭ ও ১৮৫৯ সালের। আরো কিছু কবর আছে যার অধিকাংশ তরুণ সৈনিকদের। রেসকোর্স পেরিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে আরেকটি রাস্তা চলে গেছে। ঐ রাস্তার দক্ষিণে বা ড্যাশের বাড়ির আটশ' গজ দক্ষিণে মেঘনার উত্তর তাঁর। উত্তর তীরের পূর্বে পৌনে দুই মাইল দূরে মিলেছে নোয়াখালি খাল। নদীর দিকে তাকালে চোখে পড়ে অনন্ত জলরাশি, মাঝে মাঝে ছোট ছোট দ্বীপ। এ অঞ্চলটি আগে পরিচিত ছিল সুধারাম নামে।

কালেকটরের বাড়ির উত্তরে একশ' গজ দূরে দুটি বাড়ি, যার পাশে গাছগাছালি, বাগান, ঝোপ কিছুই নেই। একটি ক্লাব, সেখানে আছে একটি বিলিয়ার্ড টেবিল, যেখানে কখনও কেউ বিলিয়ার্ড খেলেনি। নোয়াখালিতে ড্যাশই তখন একমাত্র ইউরোপিয় অফিসার। অবশ্য, আরেকজন ইউরোপিয় ছিলেন, ফরাসি এক ভ্যাগাবন্ড। তার একমাত্র কাজ ছিল বিভিন্নজনের কাছ থেকে ধার নেয়া ও পাওনাদারদের এড়িয়ে চলা। আরেকজন ক্যাথলিক পাদ্রী ছিলেন যিনি ব্যস্ত থাকতেন পর্তুগিজ ও ইউরোপিয় খ্রিষ্টানদের নিয়ে।

তার একমাত্র কাজ ছিল বিভিন্নজনের কাছ থেকে ধার নেয়া ও পাওনাদারদের এড়িয়ে চলা। আরেকজন ক্যাথলিক পাদ্রী ছিলেন যিনি ব্যস্ত থাকতেন পর্তুগীজ ও ইউরোপিয় খ্রিষ্টানদের নিয়ে।

উচ্চপদস্থ বাঙালি অফিসাররা ছিলেন ক্লাবের সদস্য। ক্লাবের সদস্য হওয়া ছিল ট্রাডিশান। তাই তারা সদস্য হয়ে নিয়মিত চাঁদা দিতেন। প্রতিমাসে ক্লাবের কেরানি বাড়ি বাড়ি ঘুরে সে চাঁদা আদায় করত। চাঁদার একদফা চলে যেতে কেরানি ও দু'জন পিয়নের বেতনে, যাদের কোনো কাজ ছিল না। বাকি টাকায় ইংরেজি পত্রপত্রিকা কেনা হতো, যা বাঙালি সদস্যরা পড়তেন না। পাঠক ছিলেন একজন ড্যাশ-ই। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মন্তব্য করেছিলেন– "In the result, the club was a system of taxing Bengali officers to keep three compatriot from total starvation and providing the British collector with some English periodials below cost. Like the race course. and the two cemetries which also had not been used for years, the club was a monument of past glories."

উত্তর-পূর্বে আরেকটি কদাকার বিল্ডিং হচ্ছে ডাকবাংলো। সার্কিট হাউসে

থাকার পদমর্যাদা যাদের নেই তারা থাকবেন ডাকবাংলোতে। উত্তর-পূর্বেই কালেকটরের বাসা থেকে খানকিটা দূরে সেশন জজ ও এসপির বাংলো। দুটি বাংলোই বড় এবং কুৎসিত। বিল্ডিংগুলোর পশ্চিমে বড় একটি দিঘী, নাম বড় দিঘী, যা থেকে শহরের খাবার পানি সরবরাহ করা হয়। দিঘিটি অনেক পুরনো কিন্তু পানি চমৎকার। এর দক্ষিণে ক্ষেত, রাস্তা, তারপর মেঘনা ও বঙ্গোপসাগর। পশ্চিমে ও উত্তরে নোয়াখালী সদর, বাজার, শহর। জেলাটি ১৬৩৩ বর্গমাইল। লোক সংখ্যা ১,৫০০,০০০। পদস্থ বাঙালি কর্মচারীরা সাধারণত তেমন মেলামেশা করতেন না। ফলে ড্যাশ হয়ে উঠলেন আরো নিঃসঙ্গ।

নোয়াখালির নৈঃসঙ্গ তাঁকে আরো ক্ষেপাটে করে তুলেছিল। পিতলের পুরনো জিনিসপত্র সংগ্রহ করে পার্শেলে লন্ডন পাঠাতেন তিনি। ডাকটিকিট জমাতেন। এবং সে সংগ্রহটিও ছিল বিশাল। কাপড়চোপড় ছিলো সামান্য। যোগ-ব্যায়াম করতেন আর অর্ধনগ্ন হয়ে সংস্কৃত পণ্ডিতদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দর্শনচর্চা করতেন। তার ধারণা ছিল অফিসের কাজের চেয়ে প্রার্থনা বেশি শক্তিশালী এবং যতটুকু না করলেই নয় ততটুকুই অফিসের কাজ করতেন। তারপর মানুষজন নিয়ে প্রকাশ্য প্রার্থনা শুরু করতেন। নদী ভাঙ্গন রোধে সঙ্কীর্ত্তনে বেরুতেন। আঞ্চলিক ভাষা বলতে পারতেন সহজে। ফলে পথেঘাটে, বাসায়, এমনকি গোসলখানা পর্যন্ত স্থানীয় লোকদের ছিলো অবাধ যাওয়া আসা। বেশ জনপ্রিয় ছিলেন এডি। তবে ড্যাশের ভাষায় তাঁর আমল ছিলো– "genial, imprecise and weak"

এডি জনপ্রিয় ছিলেন বেশি হিন্দুদের মধ্যে এবং প্রশাসনের ৮৫% জন ছিলো হিন্দু।

মুসলমানরা তাঁকে তেমন পছন্দ করতেন না। যুদ্ধের সময় অর্থনৈতিক সঙ্কট মুসলমানদের অবস্থা আরো খারাপ করে তুলল। ফলে, এক সময় ক্ষিপ্ত মুসলমানরা দাঙ্গা শুরু করল। লুট করল বাজার-হাট। যে কোনো স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার আগে এডি যা করতেন এখানেও তাই করলেন। ক্লাবে একটি বিলিয়ার্ড টেবিল দান করে লম্বা ছুটি নিলেন। এডির জায়গায় পাঠানো হলো বিখ্যাত সেটেলমেন্ট অফিসার সাচে-কে। তিনি শক্ত হাতে সব নিয়ন্ত্রণে আনলেন। তাঁকে সাহায্য করল হিন্দু কর্মচারী, মহাজন ও জমিদাররা। ডিসেম্বরে সাচে ত্যাগ করলেন নোয়াখালী। ড্যাশ লিখেছেন "তিনি আমাকে উপহার দিয়ে গেলেন– সবজি ভরা একটি বাগান, বিক্রির জন্য একটি ল' সোয়ার, জেলভর্তি মুসলমান আসামি এবং সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামামুক্ত শান্ত একটি জেলা।" [২]

ইতোমধ্যে মেঘনার ভাঙ্গন শুক্ত হলো। সদর মাইজদীতে সরিয়ে নেয়া যায় কিনা তা নিয়ে চিন্তা-ভবানা হতে লাগল। কমিশনের কেসি দে প্রস্তাব করলেন, তিন মাইল দূরে সোনাপুরে ধীরে ধীরে সদর স্থানান্তর করা হোক। তিনি ভেবেছিলেন,

সেখানে জমি একোয়ার করলে হিন্দু জমিদাররা লাভবান হবে। এ নিয়ে চিঠি চালাচালি চলল। প্রশাসনিক টেনশন শুরু হলো। কমিশনার জানালেন, তিনি নোয়াখালি পরিদর্শনে আসবেন। তাঁর পরিবারের জন্য যেন সার্কিট হাউস রিজার্ভ করে রাখা হয়।

কেসি দে [চাটগাঁয় তাঁর নামে একটি রাস্তা আছে] সম্পর্কে ড্যাশ সদয় মন্তব্য করেননি। তাঁর সঙ্গে দে'র সম্পর্ক খারাপ ছিল। এ কারণেই বিরূপ মন্তব্য করেছেন কিনা কে জানে। ড্যাশ লিখেছেন, "এদেশে সবচেয়ে অপছন্দনীয় বাঙালি অফিসার হলেন কমিশনার কেসি দে। দেখতে ছোটখাটো এবং কুৎসিত। দু'টি পায়ের ওপর গোলগাল ভারি ভুড়ি ও নিতম্ব। এর ওপর অংশ আবার সরু। মাথাও যেন সরু। একজন বাঙালির তুলনায়ও কৃষ্ণবর্ণ... আর আচার-ব্যবহার অসহনীয়।"

এসব কারণে ড্যাশ সার্কিট হাউসের আসবাব দিয়ে সাজানো তার ঘরের সব আসবাবপত্র নিচে পাঠিয়ে দিলেন। কেসি দে ও তাঁর স্ত্রী ভালো ব্রিজ খেলতেন। ফলে বাধ্য হয়ে ড্যাশ ও নির্বাহী প্রকৌশলী স্টেইনকে তাদের সঙ্গে ব্রিজ খেলতে হতো। দে দম্পতি ভালো খেলতেন এবং ড্যাশ প্রতিদিন হারতেন।

কেসি দে'র সঙ্গ ড্যাশের কখনও বনিবনা হয়নি। ড্যাশের মতে, ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের একটি ঐতিহ্য ছিল বিনা বাক্যব্যয়ে দায়িত্ব স্বীকার করে নেয়া, আইনে তা থাকুক আর না-ই থাকুক। হয়ত এটি ছিল আত্মতৃপ্তির ব্যাপার। কিন্তু তা মাঝে মাঝে অ্যারোগেন্সের পর্যায়ে চলে যেতো। তবে আইন অনুযায়ী অর্পিত কোনো দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার কোনো ঐতিহ্য ছিল না এই সার্ভিসের। এ মন্তব্য করেছেন তিনি কেসি দে'র পরিপ্রেক্ষিতে। কারণ, হিন্দু জমিদারদের সুবিধা দেয়ার জন্য কেসি দে সদর সোনাপুরে স্থানান্তর করবেনই। ড্যাশ তাতে রাজি নন। ফলে তাদের বিবাদ চরমে উঠলো।

বর্ষা এল নোয়াখালীতে। ড্যাশের ব্যক্তিগত ভৃত্যের সংখ্যা ছিল ছয়জন। এতবড় বাড়ি, ক্ষমতা তারপরও তাঁর শরীর খারাপ হতে লাগল। কাজের চাপও ছিলো বেশ। সবচেয়ে বড় ব্যাপার কমিশনারের সঙ্গে মনোমালিন্য ও নিঃসঙ্গতা তাঁকে অস্থির করে তুলছিলো। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বন্ধু-বান্ধবদের চিঠিপত্র লিখে খানিকটা সময় কাটাতেন। আর ভাবতেন, কবে মুক্তি পাবেন নোয়াখালি থেকে? এক সময় ছুটি চাইলেন। মঞ্জুর হলো, চলে গেলেন কাশ্মীর।

পূজার ছুটির আগে উপকূলে আঘাত হানলো সাইক্লোন। নোয়াখালিতে অবশ্য ঝড় হয়নি। কিন্তু ড্যাশ টেলিগ্রাফ পেলেন, তাঁকে খুলনা যেতে হবে ত্রাণ কাজ পরিচালনার জন্য। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে ড্যাশ খুলনা

গেলেন অস্থায়ী কালেকটর হিসাবে।

খুলনার কমিশনার ল্যাঙ্গ প্রায় অথর্ব। সারাদিন তিনি স্টক মার্কেট নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। সুতরাং ড্যাশ তাঁর সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করতেন না। সব বিষয়ে নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে পরে তাঁকে অবহিত করতেন। ল্যাঙ্গকে হঠাৎ বদলি করা হলো। তার বদলে কমিশনার হয়ে এলেন ময়নিহান। প্রথম দিন ড্যাশের সঙ্গে দেখা হতেই কমিশনারের স্ত্রী ড্যাশকে হুকুমের সুরে বললেন, তাকে যেন এক ডজন বাঘের চামড়া পৌঁছে দেয়া হয়।

কমিশনারের স্ত্রী মীনাবাজার করবেন। সেখানে বিক্রি করা হবে বাঘের চামড়া। ড্যাশ বললেন, অবশ্যই– অবশ্যই। কিন্তু কমিশনারের স্ত্রীর হুকুমের স্বরটি তাঁর ভালো লাগেনি। ফলে বাঘের চামড়াও আর পৌঁছে দেয়া হয়নি মীনা বাজারের জন্য। যদিও সুন্দরবনে তখন বাঘ ছিল প্রচুর।

ড্যাশ লিখেছেন, সুন্দরবনের খালগুলো কুমির ও মাছে ভর্তি। লঞ্চে করে ড্যাশ মাঝে মাঝে দু'একজন বন্ধু নিয়ে শিকারে যেতেন। প্রথমবার শিকারে গিয়ে তিনি একটি হরিণ ও তিনটি কুমির মেরেছিলেন। তবে, সব সময় তিনি ভয়ে থাকতেন, এই না তাঁকে নোয়াখালী ফিরে যেতে হয়। নোয়াখালীতে যাতে ফিরতে না হয় সে কারণে তিনি 'ফার্লো' চাইলেন। মঞ্জুর হলো ছুটি। চলে গেলেন লন্ডন।

ত্রি-সমাসের সময় লন্ডনে তিনি বিয়ের জন্য বাগদান করলেন। ১৯২১ সালের জানুয়ারি ছুটি ফুরোতে আবার রওয়ানা হলেন বাংলার দিকে। বাগদত্তাকে লন্ডনে রেখে গেলেন সব গোছগাছের জন্য। বাংলা সরকারের রিপোর্ট করার পর জানতে পারলেন তাঁকে আবার নোয়াখালীর ডিএম করা হয়েছে।

হতাশায় প্রায় ভেঙ্গে পড়লেন ড্যাশ। শীতের আগে বিয়ে হবে না। এ সময়টুকু নোয়াখালিতে তিনি কাটাবেন কিভাবে? লিখেছেন তিনি, আমি এমন কি করেছি যার জন্য এই পোস্টিং? আমাকে কি নোয়াখালি বিশেষজ্ঞ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে, নাকি এটি খুলনার কাজের জন্য পুরস্কার?

নোয়াখালিতে যোগ দিলেন বটে কিন্তু কাজকর্মে তেমন উৎসাহ ছিল না। কুমিল্লা, চাটগাঁ গেলেন বন্ধুদের কাছে বেড়াতে। লন্ডনের চিঠিপত্রে মনে হলো বিয়ে ভেঙ্গে যেতে পারে। চরম হতাশায় ভুগতে লাগলেন। তিনি যখন খুলনায় তখন মেঘনা গিলে ফেলেছে তাঁর পুরনো বাড়িটি। সোনাপুরে একটি বাঁশের বাংলোতে থাকতেন। এসব তাঁকে আরো বিষণ্ন করে দিলো। এ সময় দেখি, তিনি প্রায়ই সমপর্যায়ের বা নিম্নপদস্থ বাঙালি কর্মচারীদের খুঁত ধরে বেড়াচ্ছেন।

নোয়াখালি থেকে বাঁচার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করলেন যে, তিনি বিচারবিভাগে যেতে চান। সেখানে পঞ্চাশ টাকা বাড়তি ভাতা পাওয়া যেতো। ভাবছিলেন, বিয়ে হলে টাকাটা কাজে লাগবে। কয়েকদিন পর জানলেন, তাঁর

আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে এবং ফরিদপুরের অতিরিক্ত জেলা ও সেশনস জজ হিসেবে নিযুক্তি পেয়েছেন।

॥ ৭ ॥

১৯২১ সালে ড্যাশ ফরিদপুরের প্রথম অ্যাডিশনাল ও ডিস্ট্রিকট সেশনস জজ হিসেবে যোগ দিলেন। ফরিদপুর সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য, অঞ্চলটি সম্পদশালী এবং অস্বাস্থ্যকর নয়। চারদিক পানিতে ঘেরা। মাছ ধরা ও নৌচালনার সঙ্গে অনেকের জীবনধারা জড়িত। ফরিদপুরের অধিকাংশ বিশেষ করে পূর্বাংশের ওপর প্রকৃতির হামলা প্রায়ই বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। শীতে যে নদী প্রস্থে দু'তিন মাইল, বর্ষায় হয়ে যায় তা বিশ মাইলে। মাছের ব্যবসাটা ফরিদপুরে খুবই ভালো। প্রায় সারা বছর মাছ ধরা হয়। বিশেষ করে ইলিশ আর ভেটকী এবং বরফে ঢেকে তা চালান দেয়া হয় কলকাতায়।

ড্যাশ লিখেছেন, বাংলার নদীগুলোর নাম অদ্ভুতভাবে বদলে যায়। তিব্বতে ব্রহ্মপুত্রের নাম সাংপো। হিমালয় গিরিখাত পেরুবার সময় এর নাম ধিয়াং। আসামে তা ব্রহ্মপুত্র। বাংলায় পৌঁছে গঙ্গার সঙ্গে মেশার পর এর নাম যমুনা। অন্যদিকে এ জেলার উত্তরে পদ্মা এবং মিশেছে তা আড়িয়ালখাঁর মতো নদীর সঙ্গে। একেবারে উত্তর-পূর্ব কোণে মেঘনা মিশেছে পদ্মার সঙ্গে এবং জেলার পুবে তা মেঘনা নামে পরিচিত।

ড্যাশ নদী প্রসঙ্গ নিয়ে কেন বিস্তারিত আলোচনা করেছেন? কারণ তাঁর মতে, নদীর ব্যবহার এখানে জমিজমা-সংক্রান্ত নানা রকম মামলা ও অপরাধের উৎস যা একজন বিচারককে সারা বছর ব্যস্ত রাখে। অনেকের মতে, এ দেশের ঘোড়দৌড় সাধারণের জন্য যেমন বিনোদন তেমনি এখানকার অপরাধ, মামলা-মকদ্দমা ও লোকজনের জন্য বিনোদনের সৃষ্টি করে। অনেকে আবার কৃষি ও মাছ ধরার পর ব্যবসা হিসেবে মামলা-মকদ্দমার স্থান দিয়েছেন। ড্যাশ লিখেছেন, নভেম্বর থেকে সিরিয়াস দাঙ্গার মৌসুম। কারণ তখনই বিভিন্ন জায়গায় চর জেগে ওঠে।

ফরিদপুরকে মোটামুটি শ্বেতাঙ্গদের স্টেশন হিসেবেই গড়ে তোলা হচ্ছিল বা বাংলা সরকারের সচিব হয়ত ড্যাশের নিঃসঙ্গতা বুঝেছিলেন। তাই তাঁর আবেদন গ্রাহ্য করে ফরিদপুর পাঠিয়েছেন।

ড্যাশ এসে উঠলেন সার্কিট হাউসে যা তাঁর মতে কদাকার। সার্কিট হাউসের এক অংশে থাকতেন জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট নববিবাহিত কুইনটন। কানে খাটো। এসপি লেসলি ছিলেন একসেনট্রিক। শোনা যায়, একবার এক মহকুমার বাজারে গভীর রাতে তিনি নগ্ন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ঐ মহকুমায় তিনিই ছিলেন একমাত্র শ্বেতাঙ্গ অফিসার। নিঃসঙ্গতার বোধ তাঁকে বোধ হয় আরো ক্ষ্যাপাটে করে

তুলেছিল। এখন অবশ্য বিয়ে ও দু'টি সন্তান হওয়ার পর লেসলি খানিকটা শান্ত।

ফরিদপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনের প্রধান ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার বারবার। তিনি কাউকেই ধর্মান্তরিত করতে পারেননি। কিন্তু কাঠের কাজ ভালো জানতেন এবং একটি টেকনিক্যাল স্কুল খুলেছিলেন যেখানে কাঠের কাজ শেখানো হতো। স্থানীয় অধিবাসীরা এ কারণে তাঁকে পছন্দ করতেন। স্কটিশ গিলবার্ট হগ ছিলেন ডিএমও কালেক্টর। স্যাঙ্গি ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট ও সেশনস জজ। ডিসপেপসিয়ায় ভুগতেন কিন্তু ছিলেন দক্ষ ও মানুষ হিসেবে ভালো কিন্তু সবার ধারণা ছিল হাইকোর্ট পর্যায়ে তিনি পৌঁছাবেন না।

ড্যাশ বেশ মনোযোগের সঙ্গে মামলা-মকদ্দমার শুনানি শুরু করলেন। একটি মামলার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। জনৈকা অমিয়া সেনগুপ্তা ছিলেন সুন্দরী এবং বিদুষী। যৌতুকের অভাবে তাকে বিয়ে দেয়া হয় এক লোলচর্ম বৃদ্ধের সঙ্গে, যাকে অমিয়া ঘৃণা করতো। ঘাট থেকে একদিন স্নান সেরে ফেরার সময় তার সঙ্গে দেখা হলো সুঠাম এক মুসলমান যুবকের। বিকেলেও ঘাটে যাবার সময় অমিয়া দেখলো যুবকটি দাঁড়িয়ে যেন তার অপেক্ষা করছে। কয়েকদিন এভাবে চলার পর পরিচয় হলো দু'জনের। দু'জন সঙ্গীসহ যুবকটি বেড়িয়েছে ধান কাটতে। এখন ধান কাটার মজুরি টজুরি বুঝে পেয়েছে। সঙ্গীসহ ফিরবে বাড়িতে।

অমিয়া যুবকটির সঙ্গে নৌকায় ভেসে পড়লো। চাল না ফুরানো পর্যন্ত তারা নদীতে নদীতে ভেসে বেড়ালো। তিন বন্ধুই আপোষে তার সঙ্গে শয্যা ভাগ করে নিতো। অমিয়ার তাতে আপত্তি ছিল না। যুবকদের জন্য সে রান্নাবান্না করতো।

নৌকা এসে থামে অবশেষে লৌহজঙ্গে। সুঠাম যুবকটি অমিয়াকে পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করে দেয় লৌহজঙ্গের এক মাসির কাছে। এদিকে স্থানীয় জমিদার খবর পেলেন এক হিন্দু রমণীকে অপহরণ করেছে মুসলমানরা। পাইক পাঠিয়ে তিনি ঐ তিন যুবককে ধরলেন। উদ্ধার করা হলো অমিয়াকে। থানায় সোপর্দ করা হলো যুবকদের।

শুরু হলো মামলা। নিম্ন আদালতের বিচারক ছিলেন মুসলমান। মেয়েটি সাবালক এবং নিজের ইচ্ছায় যুবকদের সঙ্গে বেড়িয়েছে– এ যুক্তিতে অভিযুক্তদের খালাস দিলেন। আপিল হলো। মামলা এল ড্যাশের এজলাসে। ড্যাশের মনে হলো, কোনো না কোনো পর্যায়ে মেয়েটি আপত্তি করেছিল এ পর্যন্ত নামতে। অভিযুক্তদের তিন বছরে কারাদণ্ড দিলেন ড্যাশ। কিন্তু পরে দেখেছিলেন এবং জেনেছিলেন, বেশ্যাবৃত্তিতে আপত্তি ছিল না অমিয়ার।

ড্যাশ লিখেছেন, মামলা চলাকালীন ভাষাগত অসুবিধা সত্ত্বেও স্থানীয় বার মনে করতো শ্বেতাঙ্গ জজ 'নেটিভদে'র থেকে দক্ষ। ড্যাশের মনে হয়েছে, এ ধারণার কারণ বোধ হয় শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে এক ধরনের ডিটাচমেন্ট ছিল যা

অশ্বেতাঙ্গদের ছিল না। তাঁর ভাষায় : "They were unpunctual and deficient in dignity, short tempered."

এরই মাঝে খবর পেলেন তাঁর ফিঁয়াসে গ্রেটা বোম্বেতে তাঁর খালু আরেক আইসিএসের কাছে আসতে সম্মত হয়েছে। হাফ ছেড়ে বাঁচলেন ড্যাশ। তড়িঘড়ি ছুটি নিয়ে ছুটলেন বোম্বাই। বিয়ে করলেন গ্রেটাকে। তারপর ফিরলেন ফরিদপুর। গ্রেটা কিন্তু বেশ মানিয়ে নিলেন। মাঝে মাঝে ড্যাশ তখন স্টিমারে চাঁদপুর যেতেন। স্টিমার থেকে নামতেন না। সেই স্টিমারেই আবার ফেরত আসতেন। শিকারে যেতেন কখনও কখনও। কুচবিহার, দার্জিলিং, যেখানে যেখানে তার বন্ধু আছে সেখানে সেখানে বৌ নিয়ে বেড়িয়ে এলেন। কিন্তু জজিয়তি আর তাঁর ভালো লাগছিল না। ভাগ্য ভালো, এরি মধ্যে সরকার জানতে চাইল ড্যাশ কি বিচারবিভাগে থাকতে চান না নির্বাহী বিভাগে ফিরতে চান? ড্যাশ জানালেন, তিনি নির্বাহী বিভাগে ফিরতে চান। এরপর ছুটি নিলেন ছয় মাসের।

ছুটি শেষে শুনলেন তাঁকে ত্রিপুরার ডিএমও কালেক্টর করা হয়েছে, যার সদর কুমিল্লা।

॥ ৮ ॥

কুমিল্লায় কোনো রাস্তাঘাট ছিল না। প্রধান পথ ছিল জলপথ।। শহরটিও পরিচ্ছন্ন ছিল না। কিন্তু কুমিল্লায় যোগদানের পর বহুদিন পর মনে হলো তার জীবনে যেন শান্তি ফিরে এসেছে।

সরকারি কর্মচারীদের প্রধান মিলন কেন্দ্র ছিল কুমিল্লা ক্লাব। জমিদার ডিলুলির বাগানের দক্ষিণে ছিল ক্লাবটি। সড়কের উল্টোদিকে গির্জা ও সার্কিট হাউস। সার্কিট হাউসের দক্ষিণে এসপি ও এডিশনাল এসপি'র বাড়ি। ক্লাব ঘরটি বেশ বড়সড়, বাঁশের তৈরি শেড। চারদিকে ঘেরাও করা কম্পাউন্ড। ভেতরে আছে দু'টি টেনিস কোর্ট ও একটি পুকুর।

ক্লাবে খেলা হতো টেনিস, বিলিয়ার্ড ও ব্রিজ। সোডা ওয়াটার তৈরি করে বিক্রি করা হতো, সঙ্গে টিনজাত খাবার। গলফ খেলতে হতো লালমাই পাহাড়ে। পরস্পরের সঙ্গে আদান-প্রদান বৃদ্ধির জন্য ডিনারও হতো। তবে ড্যাশ লিখেছেন, পরিস্থিতি বদলে যেতে থাকে। ক্লাবের পরিচালনা পরিষদ অশ্বেতাঙ্গরা অধিকহারে নির্বাচিত হতে থাকেন। ইউরোপিয়ানদের কাছে ক্লাবলাইফের আকর্ষণ কমে যেতে থাকে।

ড্যাশ কুমিল্লার নওয়াবদের কথা উল্লেখ করেছেন, যাদের অবস্থা তখন ছিল পড়ন্ত। জমিদারি ছিল তখন কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের অধীনে। তরুণ ফারুকী প্রায়ই ড্যাশকে চাপ দিতেন তাঁর ভাতা বাড়াবার জন্য। পরে ফারুকী রাজনীতিতে যোগ

দিয়ে মন্ত্রী হন। ড্যাশ ফারুকী ও তাঁর দুই চাচা ময়মনসিংহের জমিদার গজনভীদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন ফারুকী মন্ত্রী হয়েছিলেন– " By chicanery and bribary became a minister. He was infact of the less creditable protegees of the British Raj in the transition period. He was nephew to the two Ghuznavis of the Mymensingh District. These hearty uncles both took up politics with success. They were unscrupuplous barons full of admiration for the British Raj as long as it's conduct seemed absolute and confirmed to their baronial deportment."

ড্যাশের সঙ্গে অশ্বেতাঙ্গ অফিসারদের মেলামেশা ছিলো কিন্তু সবসময় একটা দূরত্ব থেকে যেতো। কাকে বাসায় চা'য়ে আমন্ত্রণ জানানো হবে বা সরকারি চা'য়ের আমন্ত্রণে কাকে বলতে হবে এসব ক্ষেত্রে অলিখিত নিয়ম মেনে চলা হতো। এটা ঠিক ক্রমেই বাইরে দু'পক্ষের মেলামেশা বাড়ছিলো। কিন্তু মন থেকে দূরত্ব যায়নি। ড্যাশ সময় কাটাতেন শ্বেতাঙ্গ সহকর্মী বুকের সঙ্গে তাস খেলে, যিনি ছিলেন একসেনট্রিক।

ড্যাশ লিখেছেন, সে সময় কুমিল্লার সেরা উকিল ছিলেন কামিনী কুমার দত্ত। কংগ্রেস করতেন তিনি। এতো ব্যস্ত থাকতেন যে ড্যাশের এজলাসেও আসতেন না। একবার বোধ হয় এসেছিলেন কিন্তু ড্যাশ তাঁকে পছন্দ করেননি। কারণ তার ভাষায়– "He raised my antipathy by a contemptuous competence and brevity."

কুমিল্লার নামকরা জমিদার ডিলুলির কথা উল্লেখ করেছেন। আরো অনেক ভাগ্যান্বেষীর মতো ডিলুলিও ফ্রান্স থেকে এসেছিলেন এবং তারপর জাঁকিয়ে বসেছিলেন কুমিল্লায়। জমিজমা ছিল। মহাজনী কারবার করতেন। মদ্যপান করতেন মাছের মতো। কিন্তু হাতের নিশানাটা ছিলো অব্যর্থ। তার দুই ছেলে জল ও ফিলকে পড়িয়েছিলেন ইংল্যান্ডে, রোমান ক্যাথলিক স্কুলে। তারা ফিরে এসেছিল। পিতা-পুত্ররা অনায়াসে বাংলা বলতেন।

ড্যাশ কুমিল্লা এসেছিলেন ১৯২২ সালের শীতের শুরুতে। পরের বছর গ্রেটা গেলেন ইংল্যান্ডে। সেখানে ড্যাশের প্রথম কন্যা বেটির জন্ম হলো ১৯২৪ সালের মে মাসে।

জেলা প্রশাসকদের কাজের ধারা আলোচনা করেছেন ড্যাশ এ পর্যায়ে। জেলার সব কাজের সমন্বয়ের ভার চাপিয়ে দেয়া হয় ডি এমের ওপর। ডি এমের খাস কামরায় একটি রিভলবিং শেলফ আছে। ঐ শেলফে আছে ৮৪টি বিভাগীয় ম্যানুয়েল। ওজনে ভারী এ ম্যানুয়েলগুলো সবসময় ঘাটতে হয়।

আরেকটি স্পর্শকাতর বিষয় হলো এসপির সঙ্গে সম্পর্ক। এসপি তাঁর অধীনে বটে কিন্তু ড্যাশ নিশ্চিত ছিলেন না এসপির ক্ষেত্রে তাঁর কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা কতটুকু এবং কিভাবে তা প্রয়োগ করবেন। আইসিএসরা আইপিদের নিয়ন্ত্রণ করবে এটি মনপুত ছিলো না আইপিদের।

কুমিল্লায় যাঁরা চাকরি করেছেন তাঁরা অনেকেই নিহত হয়েছিলেন। কুমিল্লায় রক্ষিত একটি স্মারক থেকে উদ্ধৃত করেছেন ড্যাশ। আমি মূলটি তুলে দিচ্ছি–

R.R. Garlick of Indian civil Service one time District and Session Judge of Tipperah-later shot in Alipore while trying a Session case. Killed.

L. Durno ICS. SDO Brahmanbaria. Shot in the street in Dacca. Wounded with the loss of the sight of one eye.

E. Hodson I.P. S.P. of Tipperah. Shot in the street of Dacca and wounded in the thigh and the wrist.

R. Ellison IP. Addl. S.P. of Tipperah. Shot in the stomach while on duty in Tipperah. Died the following day on Dacca. Buried in Dacca.

C.G.B. Stevens ICS. District Officer in Charge of Tipperah. Shot in his own garden and out side his private office room by two girls of the Faizunnessa Girls High School, the Headmistress of which was Miss Chanda. Died at once. Buried in Comilla.

কুমিল্লায় দীর্ঘদিন ছিলেন ড্যাশ। ১৯২৭ সালে বদলি হলেন তিন মাসের জন্য দার্জিলিংয়ে মেডিকেল, পাবলিক হেলথ ও লোকাল সেলফ গভর্নমেন্টের সচিব হিসেবে। গ্রেটাকে পাঠিয়ে দিলেন ইংল্যান্ড। তিন মাস শেষে নিজেও ছুটিতে গেলেন। ছুটি শেষে নিযুক্তি পেলেন শিক্ষা সচিব হিসেবে।

॥ ৯ ॥

১৯৩২ সালের এপ্রিল থেকে টানা সাড়ে তিন বছর সচিবালয়ে কাজ করার পর এক বছরের ফার্লো বা দেশে যাওয়ার ছুটি পেলেন। চলে গেলেন লন্ডন। কিন্তু সেখানে থাকতেই টেলিগ্রাম পেলেন ছুটি সংক্ষিপ্ত করে তাঁকে চট্টগ্রামের কমিশনার হিসেবে যোগ দিতে হবে। এটি ছিল প্রমোশন।

তাঁর চাকরিজীবনের শুরু চট্টগ্রামে। সুতরাং চট্টগ্রাম সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা ছিলো। তাঁর প্রথম জীবনে চট্টগ্রামে ইউরোপিয়দের যে সামাজিক জীবন ছিলো। তাঁর অনেকটা বদল হয়েছে। লেইসম্যানদের বদলে এসেছে নতুন জেনারেশন। পুরনোদের স্ত্রীরা তখন প্রাচীন গিন্নীবান্নী।

চাটগাঁর অধীনে ছিলো তখন চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, নোয়াখালি আর পার্বত্য

চট্টগ্রাম। ড্যাশ প্রথম তিনটি জেলায়ই চাকরি করেছেন।

১৯০৫ সালে যখন পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হয়েছিল তখন লে. গভর্নরের জন্য যে বাড়িটি নির্মিত হয়েছিল তাই পরে পরিণত হয় সার্কিট হাউসে (১৯১০ সালে)। কমিশনারের বাড়িটি ছিলো চাকমা রাজার। কমিশনার বাড়ি ভাড়া দিতেন না, তবে বাড়িটির দেখাশোনা করতেন। কমিশনারের সমস্ত রুটিন কাজ ও হিসাবপত্র দেখাশোনা করতেন পার্সোনাল অ্যাসিসট্যান্ট।

ড্যাশ এসে পুরনোদের মধ্যে জেমস ফিনলের লেইসম্যানকেই পেলেন। ডিস্ট্রিক্ট জজ আইসিএস বিলকে সবাই ডাকতেন বিয়ারি বিল নামে। কারণ যতোক্ষণ তিনি জেগে থাকতেন ততক্ষণ তিনি পান করতেন। আদালতে কোনোদিন চারটের আগে যেতেন না। নাস্তা করার অভ্যেস ছিলো না, তবে লাঞ্চে অন্য কিছুর বদলে শুধু বিয়ার ও জিন পান করতেন। রাত এগারোটার পর রাতের খাবার খেতেন। প্রায়ই যেতেন রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে হৃষ্টপুষ্ট মিসেস লিলির জন্য। মহিলা ছিলেন রেলওয়ের এক অধস্তন ইউরেশিয়ান অফিসারের স্ত্রী। বিলের স্ত্রী ছিলেন ছোটখাটো, অদ্ভুত অদ্ভুত পোশাক পরতেন এবং সোনালী চুলের এসপি টলসনের সঙ্গে ফ্লার্ট করার চেষ্টা করতেন। সূর্য সেনের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের পর ড্যাশ চট্টগ্রামের কমিশনার পদে যোগ দিয়েছিলেন। ফলে, চট্টগ্রামের ইউরোপিয়দের জন্য তখন সময়টা বড় অস্বাভাবিক। সবাই দিন কাটাতেন ভয়ে ভয়ে। সবার সঙ্গেই থাকতো প্রহরী। ইংরেজ অফিসারদের মনোবল ভেঙ্গে পড়েছে। তবুও গলফ বা টেনিস খেলে তারা মনোবল চাঙ্গা করার চেষ্টা করতেন। রোববার পাহাড়তলির বিশাল দিঘীর পাড়ে যেতেন পিকনিক করতে। ইলেকট্রিক জেনারেটিং সিস্টেম শীতল করার জন্য দিঘীটি খনন করা হয়েছিলো। মাঝে মাঝে পার্টির আয়োজন করা হতো। কমিশনারের স্টিমারে করে মাঝে মাঝে ড্যাশ বেড়াতে যেতেন কক্সবাজার। শিকারের জন্য একবার চাঁদপুর চা বাগানেও গিয়েছিলেন। ড্যাশ কমিশনার হিসেবে থাকার সময়ই সূর্য সেন, লোকনাথ বল প্রমুখ বিদ্রোহীদের গ্রেফতার করা হলো। এ কারণে ড্যাশ তাঁর অধস্তন দু'জন অফিসারের নাম সিআইই উপাধির জন্য সুপারিশ করে পাঠালেন। সে দু'জন সিআইই পেলেন। ড্যাশ কিন্তু পুলিশের ডিআইজি গর্ডনের নাম উপাধির জন্য সুপারিশ করেননি। কারণ, ড্যাশের মতে, এ ব্যাপারে গর্ডনের কোনো কৃতিত্ব ছিলো না। সরকার কিন্তু এক সপ্তাহ পর গর্ডনকেও সিআইই উপাধি দিলেন, নয়ত পুলিশ ক্যাডার অসন্তুষ্ট হতো। ইতোমধ্যে গ্রেটা ও মেয়েকে তিনি লন্ডন পাঠিয়ে দিলেন।

এদিকে সূর্য সেনের বিচার শুরু হয়েছে। ড্যাশের মনে হলো ট্রাইব্যুনালের কাজ চলছে বেশ ধীরেসুস্থে। ব্যাপারটি তাঁর পছন্দ হচ্ছিলো না। তাই সরকারকে

একটি গোপন টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জানালেন যে বিচার সামারি কোর্ট বা সংক্ষিপ্ত আদালতে হওয়া উচিত। কয়েকদিনের মধ্যেই চিফ সেক্রেটারি কমিশনারকে জানালেন যে, এতো অস্থির হলে চলে না। ড্যাশ তখন বুঝলেন যে ভুল করে ফেলেছেন। এবং এর মাশুলও তাঁকে দিতে হলো। কয়েকদিনের মধ্যেই জানলেন যে তাঁকে চট্টগ্রামের কমিশনারের পদ থেকে সরিয়ে ভারতীয় আইন সভার সরকারি সদস্য মনোনীত করা হয়েছে। আইন সভায় সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী ভোট দেয়া ছাড়া তাঁর আর করার কিছুই ছিলো না।

আইন সভার সদস্য থাকাকালীনই তিনি লন্ডন গেলেন ছুটি কাটাতে। আর সে সময়ই চিফ সেক্রেটারি মি. হগের কাছ থেকে ব্যক্তিগত একটি চিঠি পেলেন। চিঠির মূল কথা হলো, ছুটি শেষে ফিরে এলেও সরকার তাঁকে আর কমিশনার পদে নিয়োগ করবে না, কারণ সরকার তাঁকে কমিশনার পদে উপযুক্ত মনে করছে না। তবে তাঁকে বাখেরগঞ্জের ডিএম নিয়োগ করা হবে। এর অর্থ পদাবনতি। শুধু তাই নয়, কমিশনারও ছিলেন তাঁর জুনিয়র। ড্যাশকে এই পদাবনতি মেনে নিতে হয়েছিলো। তিনি লিখেছেন, চট্টগ্রামের আরো কয়েকজন সরকারি কর্মচারীর এই দশা হয়েছিলো যাকে তিনি "চিটাগাং ক্যাজুয়িলিটি" বলে উল্লেখ করেছেন।

একটি টেলিগ্রামই তাঁর ভাগ্য বিপর্যয় ডেকে আনলো। দুঃখ করে তিনি লিখেছেন– "I too was arrogant for I held that I was in my way efficient. The decision to pass me over for promotion affronted my self esteem and filled me with almost unbearable resentment." কিন্তু উপায় নেই। চাকরি করলে সরকারি সিদ্ধান্ত মেনে নিতেই হবে। স্ত্রী গ্রেটা ও মেয়ে বেটিকে রেখে তিনি আবার রওয়ানা হলেন বাংলার দিকে। লিখেছেন, "কলকাতা পেরুলাম মুখ ঢেকে। আমার বন্ধুদের কাছে মুখ দেখানোর সাহস ছিল না। প্রায় চোরের মতো পালিয়ে এলাম বরিশাল। প্রমোশনের ক্ষেত্রে কেউ কাউকে ডিঙিয়ে গেলে কেমন লাগে তা হাড়ে হাড়ে বুঝছিলাম।"

॥ ১০ ॥

বরিশাল জেলা যে খুব উন্নত ছিলো তা নয়। সারা জেলার মধ্যে খালি বরিশালেই ছিলো তিন মাইল পাকা রাস্তা। আর জেলাটি বিখ্যাত ছিল খুনখারাবির জন্য। ড্যাশ এ পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববঙ্গের গ্রামীণ সমাজের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, পাশ্চাত্যের যে কেউ এ সমাজ পর্যবেক্ষণ করলে এ ধারণায় উপনীত হবেন যে গ্রামীণ সমাজে পাবলিক স্পিরিট, নৈতিকতা, বিবেকবোধ এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে, বলার নয়। পাশ্চাত্যে ধনবান ব্যক্তির মধ্যে পাবলিক স্পিরিট লক্ষণীয় এবং যতই তিনি ধনবান ও প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন ততই জনগণের মঙ্গলের জন্য সময়

ও শক্তি ব্যয় করেন।

পূর্ববঙ্গে এর বিপরীত অবশ্যই স্বাভাবিক। নিজের ছাড়া মানুষের মঙ্গলের জন্য কিছু করা এখানে কেউ স্বাভাবিক মনে করে না। পাশ্চাত্যে যা সমাজ বিরোধী এখানে তা প্রশংসনীয়। এ ক্ষেত্রে, ড্যাশের মতামত অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ কর্মচারিদের থেকে ভিন্ন কিছু নয়। ড্যাশ তীব্র ভাষায় মন্তব্য করেছেন–

"The public in such communities are a set of very inferior human being degraded far below the standard of those who wield power in rural community. Those who have the power, find it easy to argue that an application of ``Public spirit'' would merely transfer power from those who use it to keep society in order to those who misuse it and disorganise society."

ড্যাশ এ পর্যায়ে প্রমোশন ব্যাপারে নানা চিন্তাভাবনার কথা লিখেছেন। সরকারি নীতির কথাও লিখেছেন। সরকার জানিয়েছিল, একজন কর্মচারীর অতীত কার্যাবলীর ওপর ভিত্তি করেই শুধু প্রমোশন হতে পারে না। যে পদে তাকে প্রমোশন দেয়া হবে সে পদে তার উপযুক্ততাও দেখতে হবে। তবে সিলেকশন পোস্টে প্রমোশনের বেলায় চাকরির জ্যেষ্ঠতা যাতে ক্ষুণ্ন না হয় তাও বিবেচনা করা উচিত। সবকিছু যাচাই করে, ভারসাম্য দেখে প্রমোশন দেয়া উচিত।

বরিশালে স্বাভাবিকভাবেই ড্যাশ কাজে মন বসাতে পারছিলেন না। এ সময় তাঁর বন্ধু নিকোলাস ব্ল্যান্ডি চিফ সেক্রেটারি। ড্যাশ আইসিএসদের নেটওয়ার্কিং কাজে লাগালেন। দুঃখ জানিয়ে ব্ল্যান্ডিকে চিঠি লিখলেন। ব্ল্যান্ডি জানালেন, তিনি যথাসাধ্য করবেন। এবং ঠিকই করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই ড্যাশকে প্রেসিডেন্সী বিভাগের অস্থায়ী কমিশনার নিযুক্ত করা হলো। সে মেয়াদ শেষ হতে তাঁকে নিয়োগ করা হলো বর্ধমানের কমিশনার হিসাবে এবং সবশেষে রাজশাহীর কমিশনার হিসাবে নিযুক্তি পেলেন।

॥ ১১ ॥

তিস্তার পুরনো খাতের তীরে বিরাট এলাকা জুড়ে কমিশনারের বাড়ি। বাড়িটি প্রায় সাড়ে চার একর জমির ওপর। প্রথমে সিভিল সার্জনের বাড়ি, তারপর কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার। পিছে বিভাগীয় বন অফিসারের বাংলো। সিভিল সার্জনের বাসার উত্তর-পশ্চিমে জলপাইগুড়ি মেডিকেল স্কুল ও হাসপাতাল। শহর থেকে এ বাড়িগুলোকে আলাদা করে রেখেছে একটি খাল। খালের অন্য পাড়ে পুলিশ লাইন, পিডব্লিউডি ইত্যাদি। আগে বাড়িগুলোর বাগানের ধার ঘেঁষেই বইতো তিস্তা। এখন তা সরে গেছে প্রায় দু'মাইল। তবে কমিশনারের বাড়ি থেকেই ড্যাশ নদী দেখতে

পেতেন। শীতে বিশ-পঁচিশ মাইল দূরে হিমালয়ের পাদদেশের ঠাণ্ডা বাতাস বইতো।

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোর যা বর্ণনা দিয়েছেন ড্যাশ তাতে এ জনপদগুলোর অবর্ণনীয় অবস্থায়ই ফুটে উঠেছে। লিখেছেন তিনি, রাজশাহীতে আছে ত্রিশ মাইল রাস্তা, যা নাটোরকে যুক্ত করেছে রাজশাহীর সঙ্গে। দিনাজপুরে ছিল ৭ মাইল রাস্তা। সারা বিভাগে রাস্তাঘাটের অবস্থা এমন ছিল যে, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পৌঁছাই ছিল প্রায় অসম্ভব।

কৃষি উৎপাদন ও উর্বরতার দিক থেকে রংপুর ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার মিলিত ধারার মাঝে পাবনা। জেলাটি অস্বাস্থ্যকর। গরমের সময় প্রচণ্ড গরম, বর্ষায় আবার সব ডুবে যায়। বগুড়া নামে একটি জেলা আছে এ কথা অনেক সময় মনেই থাকে না। আইসিএস হয়ে সেখানে পোস্টিং পাওয়ার অর্থ হচ্ছে যে, সরকার তাকে একশ' ভাগ মনে রাখবে। তবে ড্যাশের মনে হয়েছে জায়গাটি মোটামুটি স্বাস্থ্যকর। পয়ঃনিষ্কাশন ও জল সরবরাহ ব্যবস্থা ভালো। তবে বগুড়ায় কখনই মারাত্মক কিছু ঘটে না।

রাজশাহীর কমিশনার থাকতেই ড্যাশ সিআইই উপাধি পেলেন। সরকারি সনদে জানানো হলো, তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ কর্মজীবনের স্বীকৃতি হিসাবে সরকার উপাধিটি প্রদান করেছে।

ভারতজুড়ে রাজনীতির যে উত্তপ্ত আবহাওয়া বইছিল রাজশাহীতেও তার আঁচ লেগেছিলো। জনাব তমিজউদ্দিন সেখানে মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তুলছিলেন হিন্দুদের বিরুদ্ধে। এসডিও ছিলেন হিন্দু। তিনি তমিজউদ্দিনের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ইনজাংশান জারি করলেন। মুসলমানরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে নাজিমুদ্দিন সরকার এসডিওকে প্রত্যাহার করে পানাউল্লাহ নামে একজনকে দিনাজপুর থেকে বদলি করে আনেন। পানাউল্লাহ ছিলেন হিন্দু বিদ্বেষী। এসডিও হয়ে ভার গ্রহণ করার কয়েকদিন পরই কোনো এক কারণে বচসার পর ফুটপাথের এক দোকানদারকে লাথি মারেন। এতে হিন্দুরা ক্ষিপ্ত হয়ে মামলা করে। পরে ড্যাশের হস্তক্ষেপে মিটমাট হয়।

কমিশনার থাকার সময় ড্যাশ প্রায়ই জেলায় জেলায় ট্যুর করে বেরিয়েছেন। জলপাইগুড়িতে শিকার করতে গেছেন। দার্জিলিংয়ে বিশ্রাম নিতে।

দিনাজপুরের কথা উল্লেখ করেছেন ড্যাশ। ড্যাশের মতে, বাংলার সবচেয়ে আন-ইন্টারেস্টিং ও অস্বাস্থ্যকর জায়গা হচ্ছে দিনাজপুর। আবার দিনাজপুরের সবচেয়ে আন-ইন্টারেস্টিং ও অস্বাস্থ্যকর জায়গা হচ্ছে ঠাকুরগাঁও। দিনাজপুরে সবসময় এমন সব অফিসারকে পাঠানো হয় যাদের কর্মদক্ষ হিসাবে কোনো খ্যাতি নেই, যাদের প্রমোশনের কোনো আশা নেই বা যাদের বিরুদ্ধে কঠোর কোনো

ব্যবস্থা নেয়ারও উপায় নেই।

ইংরেজ আইসিএসদের বিভিন্ন গুজবের বর্ণনা দিয়েছেন ড্যাশ। মন্তব্য করেছেন, অনেক আইসিএসের বউ চলে গেছে। মনে হচ্ছে, আইসিএস দেখলে তাদের বিতৃষ্ণা জাগছে; অন্যদিকে স্বামী ছেড়ে যাওয়া এই রমণীদের দিকে অন্যরা তীব্রভাবে আকর্ষিত হচ্ছে।

১৯৩৯ সালে আবার ছুটি কাটাতে লন্ডন গেলেন ড্যাশ। মেয়ের পড়াশোনা ও থাকার সব বন্দোবস্ত করে ফিরলেন। মাঝখানে মাস দুয়েক অস্থায়ী চীফ সেক্রেটারি হিসাবেও দায়িত্ব পালন করলেন।

ড্যাশ দু'জন মুসলমান অফিসার সম্পর্কে খানিকটা বিস্তারিত লিখেছেন। এঁদের একজন হলেন টিআইএম নূরুননবী চৌধুরী ও আজিজ আহমদ। এখানে উল্লেখ্য যে অশ্বেতাঙ্গ অফিসার বা রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে ড্যাশ কখনই অনুকূল মন্তব্য করেননি।

ড্যাশ যখন রাজশাহীর কমিশনার, তখন বগুড়ার ডিএম নূরুননবী চৌধুরী। মুসলমান জনমতকে তোষণ করার জন্য চৌধুরীকে আইসিএস মনোনয়ন দেয়া হয়। তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করতেন। তাঁর শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল সীমিত। গ্রামোন্নয়ন (সরকারি পরিভাষায় পল্লী পুনর্গঠন) নিয়ে ছিলো তাঁর অপ্রয়োজনীয় উৎসাহ। (ড্যাশের ভাষায় 'আনহেলথি')। চৌধুরী ছিলেন দেখতে ছোটখাটো, তাই সহকর্মীরা তাঁকে ডাকত 'টাইনি টিম' বলে। হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন তিনি। রুটিনওয়ার্কও ঠিকঠাক মতো করতেন না।

রাজশাহীতে ডিস্টিক্ট অফিসার নিযুক্ত ছিলেন আজিজ আহমদ। পাঞ্জাবের এক অনভিজাত পরিবারে জন্ম। ড্যাশ লিখেছেন, "ঐ সময় আমরা তাঁর পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে তেমন কিছু জানতাম না। শুধু শুনেছিলাম সে একজন তরুণ, দক্ষ অফিসার যার মধ্যে সংহত কিন্তু সুনির্দিষ্ট হিন্দু বিদ্বেষ বিদ্যমান। তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিলো পল্লী পুনর্গঠনে যা ছিলো তখনকার প্রশাসনের 'টরিক্যাল ক্রেজ'। আজিজ আমাকে জানিয়েছিল এ ধরনের একটি বিশেষ প্রকল্প সে গ্রহণ করেছে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো এ বিষয়ে কমিশনারের যে ফান্ড আছে সে থেকে কিছুটা সাহায্য পাওয়া।"

ড্যাশ আজিজ আহমদের প্রকল্প পরিদর্শন করেছিলেন। লিখেছেন তিনি, পরিদর্শন শেষে যখন তিনি একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন তখন দু'তিন জন স্বেচ্ছাসেবী এসে তাঁর কাছে জানতে চাইলো তাদের কত মজুরি দেয়া হবে?

ড্যাশ যখন রাজশাহীর কমিশনার তখন বাংলা সরকারের শ্রম, বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী এলেন রামপুর-বোয়ালিয়ায়। মন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী সম্পর্কে তিনি এমন সব মন্তব্য করেছেন যাতে মনে হয় এর অনেকই ছিলো বিদ্বেষমূলক।

ড্যাশ লিখেছেন–

"This well connected womaniser was a blackguard and a polttical gangster. He was also an acute and successful lawyer and this success with susceptible ladies made him acceptadle in quite exalted social circles. He was very sensitive to any display of white racial superiority and unless he was from suspicion of this, he was aggressive in displaying his own racial resentment. But he was at all times devoid of good manners and I found him totally unpleasant."

সোহরাওয়ার্দী সম্পর্কে তিনি যাই ভাবুন না, তাঁকে স্টেশনে যেতে হলো মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানাতে। বিপুলভাবে জনতা তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো (ড্যাশের ভাষায়, অধিকাংশই মুসলমান)। সার্কিট হাউসের প্রায় অর্ধেক জুড়ে লোকজনে ভর্তি হয়ে গেল। স্লোগানমুখরিত হয়ে উঠলো সার্কিট হাউস। ড্যাশ মন্তব্য করেছেন, অপারাহ্নটি ছিল 'আনপ্লেজেন্ট'। এমনকি মুসলিম লীগ ভক্ত রাজশাহীর ডিএম আজিজ আহমদও অসন্তোষ প্রকাশ করছিলেন মন্ত্রী ও তাঁর চেলাচামুণ্ডাদের ব্যবহারে।

সোহরাওয়ার্দী সম্পর্কে যখনই সম্ভব তখনই কটুক্তি করেছেন, স্বীকার করেছেন, সোহরাওয়ার্দীর ব্যক্তিগত ক্যারিশমা ছিল প্রচন্ড। ড্যাশের ভাষায়, "মহিলা দেখলেই তিনি অতি আগ্রহ হয়ে উঠতেন। সুইডিশ রাস্ট্রদূতের স্ত্রী তার নিতম্বে প্রধান (মুখ্য) মন্ত্রীর চিমটি কাটা হয়ত উপভোগ করতেন। কিন্তু এই চিমটি এমন পর্যায়ে উঠে যাচ্ছিলো যে, মহিলা তার স্বামীকে জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন। স্বামী পড়েছিলেন মহা বিপাকে। সোহরাওয়ার্দীর মনোবাঞ্ছা এতো প্রবল হয়ে উঠেছিলো যে তিনি আলাদা একটি স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র পর্যন্ত গঠন করতে চাইছিলেন। ড্যাশের ভাষায়, কিছু 'immature Hindu congresmen' তাঁর কথায় নাচছিলেন। ড্যাশ, এতোই ক্ষুব্ধ ছিলেন যে, তিনি লিখেছেন, যে "শহীদের সঙ্গে প্রথম সংস্পর্শে আসার পরই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে তার মতো লোকের অধীনে চাকরি করবো না যে gather support from criminals and base man and woman."

এ-কে ফজলুল হক সম্পর্কেও তিনি এমন সব মন্তব্য করেছেন যা অন্য কারো লেখায় চোখে পড়েনি। ড্যাশের ভাষায়, "তাঁর ব্যক্তিগত অভ্যাস ছিল নোংরা, দাড়ি কামাতেন না, হাতমুখও বোধহয় ধুতেন না। শোনা গেছে একবার এক নৈশভোজের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেও তিনি যাননি, কারণ তাঁর সকল দাঁত এক বন্ধুকে ধার দিয়েছিলেন, হিন্দুদের কাছে তিনি ঋণী ছিলেন এবং তারা তাকে ব্যবহার করতেন। এবং আশ্চর্য তাঁর মুসলমান সমর্থকরা এতে বিন্দুমাত্র বিচলিত ছিল না। হিন্দু মুসলমান দ্বন্দ্বের সময় আবার হিন্দুদের বলতেন, তাঁর স্বজাতির

স্বার্থের বিরুদ্ধে তিনি যেতে পারবেন না। আবার মুসলমানদের সামনে হিন্দুদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতেন, ড্যাশের ভাষায়, "Fazlal Haq was the most notable and the most abominably successful exploiter of the weakness of the Moslem members; he gave us most trouble because influence and insidious personality... He combined a tremendous personal magnetism with a phenomenal amoral agility. He was confident, carefree and very skillful in surmounting all moral obstacles."

ফজলুল হক সম্পর্কে আরো অনেক গল্পগাথার উল্লেখ তিনি করেছেন। ফজুলুল হক মন্ত্রি থাকাকালে তিনি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের আমলা। আবার ড্যাশ যখন প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার তখন তার আদালতে মামলা পরিচালনা করতে গেছেন ফজলুল হক। ফের ড্যাশ যখন জলপাইগুড়ির কমিশনার তখন মুখ্যমন্ত্রি হিসেবে ফজলুল হককে অভ্যর্থনা জানাতে ড্যাশকে ছুটতে হয়েছে স্টেশনে। সকালে ড্যাশ তাঁকে নিজের বাসায় এনে স্নান ও নাস্তার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর ভাষায়, "I dont remember meeting anyone at the breakfast table who was so unshaven and so dirty even after his bath, and yet so charming." ফজলুল হক যখন আবার পূর্বপাকিস্তানের গভর্ণর তখন ড্যাশ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান।

ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দী সম্পর্কে উস্মা প্রকাশের কারণ আছে। একে তাঁরা দেশি এবং প্রভাবশালী মন্ত্রি। এঁদের অধীনে আই সি এস তাও আবার শ্বেতাঙ্গদের কাজ করতে হচ্ছে। কিন্তু তার চেয়েও ক্রোধের কারণ, এরা আমলাদের তিনি আই সি এস হন আর যেই হোন খুব একটা পাত্তা দিতেন না। সত্যিকার অর্থে জনপ্রতিনিধি হওয়ায় তাঁদের তার দরকারও ছিলো না। শুধু তাই নয়, আই সি এস থেকে বিদ্যা বুদ্ধিতেও ছিলেন তারা ওপরে। আবার যারা দেশি মন্ত্রি কিন্তু আমলাদের সমীহ করতেন তাদের প্রতি এরা ছিলেন নমনীয় যেমন নাজিমুদ্দিন। ড্যাশের লেখা তার প্রমাণ।

ড্যাশ ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দীর যে বর্ণনা দিয়েছেন আমরা জানি তাঁরা তা ছিলেন না। কিন্তু ড্যাশের উদ্ধৃতিগুলি দিলাম এ কারণে যে তাহলে বুঝতে সহজ হবে আইসিএসসের মনোভাব কেমন ছিল তাদের 'প্রজাদের' প্রতি। এতোসব বিষোদগার সত্ত্বেও ড্যাশকে কিন্তু স্বীকার করতে হয়েছে এরা ছিলেন 'ক্যারিশমেটিক' এবং প্রভাবশালী।

১৯৪২ সালে বাংলা সরকার ড্যাশকে জানালো যে, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান নিকোলাস ব্ল্যান্ডি ক্যানসারে আক্রান্ত এবং ছুটিতে যাচ্ছেন। ড্যাশ কি ঐ পদ গ্রহণ করবেন?

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের পদ ছিল অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন। ১৯৩৫ সালের ইন্ডিয়া এ্যাক্টে বলা আছে, একবার কেউ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান হলে ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য বা চেয়ারম্যান বা প্রাদেশিক পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান বাতীত ভারত সরকারের অধীনে অন্য কোনো পদ গ্রহণ করতে পারবেন না। ঐ বছরই ড্যাশের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ব্ল্যান্ডি মারা গেলেন। সরকার ড্যাশকে জানালো, ড্যাশ যদি ঐ পদ গ্রহণ করেন তবে তাঁকে আইসিএস ক্যাডার থেকে পদত্যাগ করতে হবে এবং পরবর্তীকালে কোনো সরকারি চাকরি তিনি গ্রহণ করতে পারবেন না। ভেবেচিন্তে ড্যাশ সম্মত হলেন এবং ১৯৪২ সালে আইসিএস ক্যাডার থেকে পদত্যাগ করে বাংলা প্রদেশের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন।

॥ ১২ ॥

১৯৪২ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত ড্যাশ বাংলা প্রদেশের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। ঐ সময়কালের নানা ঘটনা তিনি বর্ণনা করেছেন, যা এই বিবরণের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক নয়। তবে প্রশাসন ও দেশীয় মন্ত্রীদের সম্পর্কে তাঁর কিছু মন্তব্য আছে যা গুরুত্বপূর্ণ। এই মন্তব্য শুধু ড্যাশের মনে করলে ভুল হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গ আইসিএসদির মনোভঙ্গিও ছিলো একই রকম। এ মন্তব্য আমাদের বুঝতে সহায়তা করবে ব্রিটিশ আইসিএস অফিসাররা কি দৃষ্টিতে ভারতীয়দের বিচার করতেন যা আগেও অনেকবার উল্লেখ করেছি।

ড্যাশ লিখেছেন, ১৯৩৭ সালে ডিএম থাকার সময়ই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, দরকার হলে কমিশনার হিসাবেই অবসর নেবেন কিন্তু দেশীয় কোনো অসাধু ব্যক্তির অধীনে চাকরি করবেন না। যারা করতে ইচ্ছুক তারা করবে, তিনি কমিশনার হিসাবে শুধু তাদের তত্ত্বাবধায়ন করবেন। "যৌবনে কিপলিংয়ের প্রভাবে লালিত হয়েছি এবং ত্রিশ বছর সাম্রাজ্যবাদ চর্চা করে আমি দেশীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার 'ইনফিরিয়র মরালিটি' সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলাম। বয়সের কারণে সেই ঔদ্ধত্য খানিকটা নমিত হয়ে এলেও অভিজ্ঞতার কারণে নৈর্ব্যক্তিকভাবে ঐ শ্রেষ্ঠত্ববোধের যৌক্তিক ভিত্তি দিতে পারতাম।"

ড্যাশ লিখেছেন, "সবক্ষেত্রে পাশ্চাত্য খ্রিস্টান সভ্যতার ওপর গড়ে ওঠা আমার নৈতিকতার শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারতাম না। দাবি করা সম্ভব ছিল না বর্ণ ও জাতিগত পক্ষপাতিত্ব থেকে মুক্ত ছিলাম। এবং পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দেশীয় নৈতিকভাবে অনেক দিক ছিল প্রশংসনীয়– এটি মানতেই হতো...।"

বাংলায় চাকরিরত ব্রিটিশ অফিসাররা ছিলেন নিঃসঙ্গ। তারপর অধঃস্তন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার সুযোগ নেয়ার প্রলোভন ছিল কিন্তু তাকে সংযত

থাকতে হতো এবং সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করার ব্যাপারে সাবধান থাকতে হতো। দেশীয়দের সম্পর্কে অবজ্ঞাবোধ থাকলেও তা আড়াল করে রাখতে হতো কারণ অভিজ্ঞতার দেখা গেছে, নৈতিকতায় শ্রেষ্ঠ না হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রচুর ভারতীয় শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারে।

'নেটিভ' মন্ত্রী হিসাবে নাজিমুদ্দিনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন ড্যাশ। লিখেছেন তিনি, "বিভিন্ন পদে আমি নাজিমুদ্দিনের অধীনে কাজ করেছি। অধঃস্তন ব্রিটিশ অফিসারদের সঙ্গে তাঁর কাজকর্মের ধরন ছিল সরাসরি ও সহজ। তাঁর ব্যক্তিগত ইনটিগ্রিটি শুধু দু'টি কারণে ক্ষুণ্ন হয়েছিল। নিরপেক্ষ ব্রিটিশ অফিসারদের ধারণা হয়েছিল মুসলমানদের প্রতি তাঁর বিশেষ পক্ষপাতিত্ব এবং এ ব্যাপারে তিনি সচেতন ছিলেন না। গলদ হচ্ছে তিনি কখনও কোনো নির্বাচনে জিততে পারেননি। সুতরাং তাঁর মন্ত্রীত্ব নির্ভর করত তাঁদের পর যাঁরা নির্বাচনে জিতে আসতেন। এর অর্থ তাঁকে এমন সব কাজ করতে হতো যাতে তাঁর সায় ছিল না। এ কারণে তাঁর অধীনস্থ ব্রিটিশ অফিসাররা অস্বস্তিতে ভুগতেন। তবে রাজনৈতিক নোংরা কাজ করার জন্য নাজিমুদ্দিন কখনও কোনো ব্রিটিশ অফিসারকে বলতেন না যা অনেক রাজনীতিবিদ বলতেন।"

॥ ১৩ ॥

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হলো। ড্যাশ এক সময় ছিলেন বাংলা ক্যাডারের। সে ক্যাডার আর নেই। তাছাড়া ড্যাশ তো সেই ক্যাডার থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। এক হিসাবে তখন তাঁর অবস্থা ছিল না ঘরকা না ঘাটকা।

বাংলা বিভাগের আগে থেকেই ড্যাশের চাকরির কি হবে এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলছিলো। একটি বিকল্প ছিল। নতুন পূর্ববঙ্গ সরকার যদি তাদের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান পদে তাঁকে নিযুক্ত করেন। খাজা নাজিমুদ্দিনের কাছে এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাব গেল। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট ড্যাশ জানলেন, খাজা নাজিমুদ্দিন রাজি হয়েছেন তাঁকে ইস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিসের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করতে।

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হলে ড্যাশ কলকাতা থেকে প্লেনে পৌঁছলেন ঢাকা। ঠিক হলো ঢাকার কমিশনার মাইক ষ্ট্রয়ার্টের বাসায় থাকবেন তিনি পেয়িংগেস্ট হিসাবে। ড্যাশের স্ত্রী তখন লন্ডনে। আর মেয়েরও বিয়ে হয়ে গেছে। ঢাকায় থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করে এবং চাকরিতে যোগ দিয়ে তিনি আবার গেলেন কলকাতায় মালপত্র আনতে।

আত্মজীবনীর এ অধ্যায়ে ড্যাশ বর্ণনা করেছেন ঢাকায় মোহাজেরদের আগমন, বাসস্থানের সঙ্কট ও প্রশাসনের প্রাথমিক বিশৃঙ্খলা অবস্থা। সরকারের

কিছু আমলা সম্পর্কেও মন্তব্য করেছেন। এখানে আজিজ আহমদ সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণ শুধু তুলে ধরছি।

আজিজ আহমদ চিফ সেক্রেটারি হিসাবে তৎকালীন পূর্ববঙ্গের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে ছড়ি-ঘুরিয়ে গেছেন। চাকরিতে অনেক জুনিয়র হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে চিফ সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয়েছিলো। তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন নিয়াজ মোহাম্মদ খান। তিনি আজিজ আহমদের অনেক সিনিয়র ছিলেন। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি হেরে যান। ড্যাশের সঙ্গেও তাঁর বিরোধ হয়েছিলো। কিন্তু নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে ড্যাশের সম্পর্ক ভালো থাকায় আজিজ আহমদ সুবিধা করতে পারেননি। ড্যাশের মতে, তিনি শিক্ষা সচিব থাকার সময় শিক্ষা বিল পাস করাবার ব্যবস্থা করেছিলেন, যার ফলে মন্ত্রী হিসাবে নাজিমুদ্দিনের ভিত পাকা হয়েছিলো। আজিজ আহমদ সম্পর্কে ড্যাশ লিখেছেন–

'প্রথম দিকে খুশিই হয়েছিলাম কারণ আজিজ আমাকে যথাযথ সম্মানই প্রদর্শন করত। কারণ এক সময় আমি তাঁর কমিশনার ছিলাম। কিন্তু খুব শীঘ্রই সে তাঁর ঐ হ্যাংওভার ঝেড়ে ফেলল... আমি যখন রাজশাহীর কমিশনার তখন সে ছিল রাজশাহীর ডিএম। বেশ কর্মদক্ষ এবং সীমিত অর্থে কুশলী অফিসার ছিলো সে। তার স্ত্রী ছিল খুব সম্ভব অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। সামাজিকভাবে তাদের মধ্যে এক ধরনের হীনমন্যতা বোধের জন্ম হয়েছিলো যে কারণে রাজশাহীর অন্যান্য অফিসারের সঙ্গে তাদের বনিবনা ছিলো না এবং কথাবার্তাও হতো না। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই সামাজিকভাবে যে তারা অগ্রগণ্য [ডিএম ও ডিএম পত্নী হিসাবে] একথা প্রমাণ করতে কুণ্ঠিত ছিলো না যা আবার অন্যরা সহ্য করতো না। এছাড়া আজিজ ছিলো হিন্দু বিদ্বেষী কিন্তু ভাবভঙ্গিতে সে তা প্রকাশ করতো না।

ঢাকায় পৌঁছার পর আজিজের প্রভূত ক্ষমতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হলাম। এটা ঠিক একজন গভর্নর ছিলেন– স্যার ফ্রেডারিক বোর্ন কিন্তু তিনি ছিলেন নামে মাত্র প্রদেশপ্রধান যিনি সরকারি কর্মকাণ্ডের একটি সামাজিক অবয়ব প্রদান করেছিলেন মাত্র। এটা ঠিক যে একজন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন– ঢাকার নবাব পরিবারের খাজা নাজিমুদ্দিন। কিন্তু তিনি ছিলেন অলস এবং দায়-দায়িত্ব অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দিতে ভালোবাসতেন। এটা ঠিক যে, ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা ছিলেন। কিন্তু, তাঁরা ছিলেন মাঝারি মেধার সব লোকজন যাঁরা ব্যস্ত ছিলেন নিজের ও বন্ধুদের জন্য বাড়ি বা বাড়ির নির্মাণসামগ্রী দখলে। আজিজের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন নিয়াজ মোহাম্মদ খান। যিনি ছিলেন তাঁর সিনিয়র, হৃদয়বান, হাসিখুশি, দক্ষ তবে অনাড়ম্বর নয়। আজিজকেই বেছে নেয়া হলো। তাঁর নিচে ছিল অসংখ্য অফিসার। যাদের অনেকে ছিল কর্মদক্ষ, কুশলী, সৎ কিন্তু সবাই ছিল ক্যারিয়ারিস্ট এবং নিজ স্বার্থ তুলে ধরতে আগ্রহী।'

ড্যাশ আরো লিখেছেন, এদের ওপর বসেছিল আজিজ, দিনরাত কাজে ব্যস্ত এবং যে ছিল–

'Morose, inflexible, incorruptible, dyspeptic, joyless. He alone fougth pettiness, dishonesty and laziness with a white flame of patriotism- coordinating, contriving, imposing. He created a province out of void. He was East Bengal.'

'ঢাকাতে পা দেয়ার কিছুদিনের মধ্যেই আমি বিষয়টি বুঝতে পারলাম।' লিখেছেন ড্যাশ, আরো পরে জানতে পারলাম তার আরো দুটি ভাই আছে, একজন গোয়েন্দা বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে আরেকজন অর্থ মন্ত্রণালয়ে। দু'জনেই করাচীর কেন্দ্রীয় সরকারে। পাঞ্জাবের এক সাধারণ পরিবারে তাদের জন্ম কিন্তু পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণ করেছিলো যে ছোট একটি গোষ্ঠী তার অন্যতম ছিল তারা।'

ড্যাশ উল্লেখ করেছেন, পাকিস্তান হওয়ার পর বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিলো। আমলাতন্ত্রের অনেকেই দুর্নীতিতে মেতে উঠেছিলেন বিশেষ করে প্রকৌশলীদের ক্ষেত্রে তা চোখে পড়ছিলো। পূর্ববঙ্গ সরকারে তখন নিয়োগ পেয়েছিলেন সাতজন প্রকৌশলী। প্রধান প্রকৌশলী ছিলেন একজন চলচ্চিত্রাভিনেত্রীর স্বামী অবাঙালি নাম সুলেমান। বাকিরা এসেছিলেন কলকাতা থেকে। তখন চারদিকে ইমারত তৈরি হুল্লোড় অথচ নির্মাণ সামগ্রীর অভাব। ফলে ঐ সাতজন প্রকৌশলীকেই ভালো কমিশন দিতে হতো। এরাই পরামর্শ করে "অল পাকিস্তান ইঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশন" গঠন করে রমনার খানিকটা দখল করে নেয় যা খোলা রাখা ছিল বাঞ্ছনীয়।

খাজা নাজিমুদ্দিনকে এই সাতজন বুঝিয়েছিলেন করাচী প্রতাপ খর্ব করার জন্য এবং নতুন এ দেশের গুরুত্ব সংহত করার জন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। ইতোমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানীদের ব্যবহারে এখানকার লোকজন বিরক্ত হচ্ছে। তবে, প্রতিষ্ঠানের পরবর্তী ধাপ সম্পর্কে তাঁরা নাজিমুদ্দিনকে আর কিছু জানাননি।

এই সাতজনের পর কনিষ্ঠতম আরো একজন প্রকৌশলী ছিলেন, বাঙালি কফিলউদ্দিন। তাঁকে সংস্থার সাধারণ সম্পাদক করা হলো। তারপর একদিন চমৎকার সকালে দেখা গেল, রমনার একটা অংশ পূর্ত বিভাগের লোকজন এসে ঘেরাও করে দিলো। জানা গেল অল পাকিস্তান ইঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশনের অস্থায়ী দপ্তর হবে এখানে।

বিভাগীয় মন্ত্রী হাসান আলী নিশ্চুপ রইলেন। তাঁর তখন চিন্তা কিভাবে নিজের বাড়ির নির্মাণ সামগ্রী যোগাড় করবেন। অনেকে ভাবছিলো, প্রধানমন্ত্রী হয়ত হস্ত ক্ষেপ করতে পারেন কিন্তু তিনিও নিশ্চুপ রইলেন। মহম্মদ আলী জিন্নাহর তখন

ঢাকা সফর করার সময়। জানানো হলো তিনি সংস্থার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। এ ঘোষণায় মানা করবে কে? কিন্তু আজিজ আহমদ প্রোগ্রাম থেকে তা বাদ দিলেন। তিনি জানতেন না কিভাবে বিষয়টি ঢুকে গেছে প্রোগ্রামে। আট প্রকৌশলী তখন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলো যেখানে লেখা হলো– 'Laid on the occasion of the first visit to Dacca of Qaid-i-Azam and in honour of the same.'

এভাবে বেআইনী জায়গা দখল করে যে ইমারত স্থাপিত হয় তা আমাদের কাছে এখন পরিচিত ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট হিসাবে। ভবনটি বিনে পয়সায় নির্মাণ করে দেয় ঠিকাদাররা যারা গণপূর্ত বিভাগে ঠিকাদারী করতো।

বিমান চালনায়ও উৎসাহী ছিলেন ড্যাশ। তাঁর উৎসাহে ও সাহায্যে ঢাকা ফ্লাইং ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ আছে আত্মজীবনীর এ অধ্যায়ে।

পাকিস্তান হওয়ার পর, পূর্ববঙ্গের ব্রিটিশ অফিসারদের অবস্থাও ছিল অনেকটা উদ্বাস্তুর মতো। কারণ বাড়ির পর বাড়ি তাদের বদলাতে হতো। বিশেষ করে কমিশনারের অবস্থা ছিল কাহিল। নিজের টু সিটার অস্টিন গাড়ি নিয়ে কমিশনার স্টুয়ার্টকে প্রায়ই বিমানবন্দরে যেতে হতো ভিআইপিদের আনতে। তাদের খাওয়াদাওয়া এমনকি থাকার জায়গা না থাকলেও তাঁর বাড়িতে থাকার ব্যবস্থাও করতে হতো। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত ড্যাশ ছিলেন ঢাকায়। বাড়িটাড়ি নিয়ে গুছিয়ে বসেছিলেন। তাঁর একমাত্র বোন হিল্ডা ঢাকায় তাঁর কাছে বেড়াতে এসে মারা যান। তাঁকে কবর দেয়া হয় নারিন্দার খ্রিস্টান গোরস্থানে।

ড্যাশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কাজ গোছানোর চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আজিজ আহমদের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছিল না। আজিজ আহমদ চিফ সেক্রেটারি হিসাবে তাঁর ওপর ছড়ি ঘোরাতে চাচ্ছিলেন যা ড্যাশের পছন্দ হবার কথা নয়। কারণ তিনি শ্বেতাঙ্গ এবং আজিজ আহমদ তাঁর অধীনে চাকরি করেছেন।

সুতরাং ১৯৫৪ সালে তিনি একেবারের জন্য অবসর গ্রহণ করলেন। সবকিছু গুছিয়ে গেলেন কলকাতা। লন্ডন রওয়ানা হওয়ার আগের দিন শেষবারের মতো চৌরঙ্গীতে হেঁটে বেড়ালেন। এর পঞ্চাশ বছর আগে রাইটার্সে রিপোর্ট করে এই চৌরঙ্গীতেই হেঁটে বেড়িয়ে ছিলেন। তখন ছিলেন শাসক আর ভারতীয়রা প্রজা। আজ তিনি সাধারণ একজন বিদেশী আর ভারতীয়রা স্বাধীন।

॥ ১৪ ॥

ঢাকা ক্লাব সম্পর্কে বিস্তারিত এক অধ্যায় লিখেছেন ড্যাশ। ঢাকা ক্লাবে কারা আসতেন, কর্মকাণ্ড, আয়ের উৎস সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যাবে সে অধ্যায়ে। আমি সে অধ্যায়ের বিস্তারিত বিবরণে না গিয়ে একটি সংক্ষিপ্তসার শুধু তুলে ধরলাম।

ঢাকা ক্লাবকে অনেকে মফস্বল ক্লাব বলতেন বটে কিন্তু বাংলার সেরা ক্লাব ছিলো ঢাকা ক্লাব। চারদিকের পরিবেশও ছিলো এর মনোরম আর কোষাগারটি ছিলো পূর্ণ। বঙ্গভঙ্গের পর রমনায় নতুন শহর গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে ঢাকা ক্লাবও। প্রধানত ইউরোপিয়রাই ছিলো এর সদস্য, তবে প্রভাবশালী দু'একজন ভারতীয়কেও সদস্য করা হয়েছিলো। আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে ঢাকার নবাব ও তাঁর পরিবারের কম কুখ্যাত কয়েকজন আত্মীয়কেই করা হয়েছিলো সদস্য।

পুরনো ঢাকা কয়েক জেনারেশন ধরেই নবাবদের নিয়ন্ত্রণে। ১৯০৬ সালে নতুন প্রদেশ হওয়ার পরও প্রশাসনিক দপ্তর, ক্লাব গীর্জা– সবই ছিল পুরনো শহরে। নবাব সলিমুল্লাহ উল্লসিত হয়েছিলেন নতুন প্রদেশ গঠনে আর ব্রিটিশ অফিসাররা সচেষ্ট ছিলেন কিভাবে এর সম্মান বাড়ানো যায় তা নিয়ে। ড্যাশ লিখেছেন, ব্রিটিশ অফিসাররা বুদ্ধিমানের মতো রাজধানী নতুন ঢাকায় সরিয়ে এনেছিলেন, কারণ আসল শহরটি ছিল দুর্গন্ধময় অস্বাস্থ্যকর এক বস্তিবিশেষ যা প্রধানত নিয়ন্ত্রণ করতো 'খারাপ মানুষরা'।

পুরনো ঢাকাতেই ছিল আহসান মঞ্জিল, নবাবদের প্রাসাদ, যেন প্রচুর খরগোসের খোপের সমাহার। প্রাসাদ ভর্তি বর্তমান ও প্রাক্তন নবাবের অজস্র ভাই-বেরাদার, ভাতিজা-ভাগ্নে, খালা, ফুপু ইত্যাদি নিয়ে।

এটিকে ইন্দ্রিয় পরায়ণতার আধারও বলা যায়। আহসান মঞ্জিল থেকে বেরিয়ে এসে যারা শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তারাই জনজীবনে খানিকটা প্রভাবশালী ভূমিকা রাখতে পেরেছিলেন। শহরে একটি পৌরসভা ছিল, নবাব পরিবারের অনেকে এর প্রধানও ছিলেন কিন্তু শহর নিয়ন্ত্রণ করতো আহসান মঞ্জিল পঞ্চায়েতের বিভিন্ন সর্দারের মাধ্যমে। ড্যাশ আরো মন্তব্য করেছেন, শুধু সর্দার নয়, এই নিয়ন্ত্রণের জন্য গুণ্ডা-পাণ্ডা ও বারবণিতারাও ব্যবহৃত হতো।

ফিরে আসি আবার ঢাকা ক্লাব প্রসঙ্গে। বাংলার অন্য যে কোনো ক্লাব থেকে ঢাকা ক্লাব ছিল ধনী বা সম্পদশালী, এমনকি জলপাইগুড়ি ও চিটাগাং ক্লাব থেকেও। যদিও সেখানে ধনী চা-কর, ব্যবসায়ী ও রেলওয়ে অফিসারদের সংখ্যা ছিল বেশি। ঢাকা ক্লাবের সম্পদের উৎস ছিল ঘোড়দৌড়। ঢাকা ক্লাবই একমাত্র সংস্থা যা প্রায় চল্লিশ বছর ধরে ঘোড়দৌড় চালিয়ে সম্পদের পরিমাণ শুধু বৃদ্ধিই করেছে।

রেস কোর্সের লিজ ঢাকা ক্লাব নিয়েছিলো ৯৯ বছরের জন্য। এর অন্তর্গত ছিল ক্রিকেট ও পোলো গ্রাউন্ড এবং গলফ কোর্স। ঘোড়াদৌড়ের টাকায় এসবের উত্তরোত্তর উন্নতি হয়েছিলো।

সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ, গ্র্যান্ড স্ট্যান্ড, সেগুন কাঠের রেলিং, ফার্লং পোস্ট সব নিখুঁত পরিচ্ছন্ন, সাদা রং করা। গ্র্যান্ড স্ট্যান্ডের চারদিকে ফুলের বাগান, সাজানো

ঝোপ-ঝাড়। রেসের দিন সেখানে ব্যান্ড বাজে আর স্ট্যান্ডে সদস্যদের বিনে পয়সায় চা সরবরাহ করা হয়। ঘোড়দৌড় থেকে যে আয় তা শুধু ক্লাবের উন্নয়নেই নয়, শহরের বিভিন্ন হাসপাতাল ও দাতব্যালয়েও দান করা হতো। ক্লাবের ভেতরে ছিল সুইমিং পুল এবং পানি বিশুদ্ধকরণের ব্যবস্থা। এতোসব খরচ সত্ত্বেও লাভের অংক শুধু বৃদ্ধিই পেতে লাগলো এবং এক পর্যায়ে সদস্যরা চাঁদার হার হ্রাস ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ভর্তুকি প্রদানের দাবি জানালো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু পর্যন্ত ঢাকা ক্লাব ছিল চমৎকার এক মফস্বল ক্লাব। পোলো আর তখন খেলা হতো না; কিন্তু ব্যায়ামের কারণে অনেকে ঘোড়ায় চড়তেন, গলফ ও টেনিসের মান ছিল বেশ উঁচু। শীতে নিয়মিত ক্রিকেট খেলা হতো যদিও তা তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। ক্লাবে ব্যান্ড বাজতো, ব্রিজ চলতো, নাচ হতো, আর ডাইভিং ও সাঁতার কাটা তো ছিলই। মদ্যপান অন্য দশ-পাঁচটা ব্রিটিশ ক্লাবে যেমন হতো, এখানেও তেমন ছিল। ড্যাশ লিখেছেন– "...it was certainly not a world of culture or intellectual activity. The general effect might have been held to a little suburban, not profound yet not very shallow. No shoddiness and all in the pattern of a well run British club in India."

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সব বদলে গেল। ঢাকায় বড় বড় বেস হসপিটাল ও বিমান অবতরণ ক্ষেত্র নির্মিত হলো। ব্রিটিশ ও মার্কিন সৈন্যে সব ভরে গেল। রেসিং এবং টেনিস অব্যাহত থাকলো কিন্তু গলফ কোর্স ও ক্রিকেট ফিল্ড উধাও হয়ে গেল সাময়িকভাবে নির্মিত ইমারত ও তাঁবুর কারণে। ক্লাবের যা প্রাইভেসি ছিল তাও গেল উবে। ঢাকা ক্লাব হয়ে উঠলো রেলওয়ে স্টেশনের রিফ্রেশমেন্ট রুমের মতো। হ্যাঁ, স্টান্ডার্ড নেমে গেল বটে কিন্তু লাভের হার আরও বৃদ্ধি পেলো। এর মূল কারণ বহিরাগত সৈনিকরা নয়, মূল কারণ সেই ঘোড়দৌড়। এ প্রসঙ্গে ঘোড়দৌড়, জকি ও তাদের আঁতাত ইত্যাদি সম্পর্কে ড্যাশ অনেক তথ্য দিয়েছেন যা আর উল্লেখ করলাম না। ১৯৪৭ অব্দি এ ভাবেই চলছিলো ঢাকা ক্লাব, পরিবেশও ছিল ঐ রকম। '৪৭ সালে ভারত বিভাগ হলে আবার পরিবর্তনের ঢেউ লাগলো শুধু ঢাকা ক্লাবেই নয়, ঢাকা শহরেও।

রাতারাতি ঢাকা হয়ে গেল নতুন রাষ্ট্রের নতুন প্রদেশের রাজধানী। নতুন প্রদেশের রাজধানীর সরকারি দপ্তর সঙ্কট দেখা দিলো। বাস্তুহারায় শহর ভরে গেল কিন্তু তাদের জায়গা দেয়ার মতো ঘরবাড়ি ছিলো না। অফিস আদালতের ফার্নিচার পর্যন্ত ছিলো না। সরকারি অনেক কর্মচারী পাকিস্তানের পক্ষে অপশন দিয়েছিলেন কিন্তু ঢাকায় এসে দেখেন থাকার জায়গা দূরে থাকুক তাদের চাকরির ঠিক ঠিকানাও নেই। তার ওপর ভারতে দাঙ্গা হলে এর প্রতিক্রিয়াও হতো। হয়ত সকালে

গলফকোর্সের সবুজ ঘাসে চোখে পড়লো কোনো বৃদ্ধার লাশ। আরেকদিন সকাল আটটার সময় নবাবপুর রেলক্রসিংয়ের সামনে গাড়িতে হয়ত বসে আছেন। ট্রেন থেমে গেল। একদল পুরো ট্রেন ঘুরে ঘুরে আটাশ জন হিন্দুর গলা কেটে ফেললো।

আগে ঢাকায় সব জিনিসপত্র আসতো কলকাতা দিয়ে। এখন সে পথ বন্ধ হয়ে গেল। ফলে, আমদানিকৃত সব পণ্যের পথ হলো চট্টগ্রাম বন্দর। বন্দরে ছিল পাঁচটি জেটি। ফলে, কর্ণফুলী থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত সৃষ্টি হলো জাহাজ ঘাটের। অনেক সময় কোনো কোনো জাহাজকে মাল খালাসের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে প্রায় এক বছর।

চাটগাঁ বন্দরে বিশৃঙ্খলা অবস্থা শুধু প্রদেশেরই নয় ঢাকা ক্লাবের সদস্যদের রুটিনও ওলটপালট করে দিলো। অবশ্য, শনিবারের রেসিং অব্যাহত ছিল। অবাক হলেও সত্য যে, ভারত বিভাগের চারমাস ধরে ঢাকায় রুটি বা ময়দা ছিলো না কিন্তু চাটগাঁ বন্দরে প্রথম যে দুটি জাহাজের মাল খালাস হলো তাতে ছিল শুধুমাত্র স্কচ হুইস্কি, গর্ডনস জিন এবং বিয়ার। ভাগ্য ভালো যে, ঢাকায় স্থানীয়ভাবে শাক-সবজি উৎপাদিত হতো। মাছ-মাংস-দুধ পাওয়া যেতো। তবে, গৃহনির্মাণ সামগ্রী, হার্ডওয়ার ও ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের সঙ্কট ছিলো তীব্র।

সরকারি প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা ছিলো অভাবনীয়। প্রথম ছ'মাস তো রুটিন কাজও করা যায়নি, স্কুল-কলেজে পড়াশোনা বন্ধ ছিলো কারণ হিন্দু শিক্ষকরা (যাঁরা ছিল ৮০%) শহর ত্যাগ করেছিলেন। মন্ত্রী ও রাজনীতিবিদদের দুর্নীতি ছিলো সীমাহীন বিশেষ করে গৃহনির্মাণ সামগ্রী আত্মসাতের ক্ষেত্রে। একবার তো ক্রুদ্ধ জনতা সচিবালয়ে ঢুকে একজন মন্ত্রীর দাড়ি চেপে ধরেছিলো। মাসিক বেতনে দেরি হওয়ায় একবার তো পুলিশরা বিদ্রোহ করলো।

ঢাকা ক্লাবের রুটিন ছিলো আগের মতোই। তবে, এখন ইংরেজ সদস্য থেকে পাকিস্তানী সদস্যের সংখ্যা বেশি হয়ে গেলো। নতুন গভর্নর, স্যার ফ্রেডারিক বোর্ন নিয়মিত গলফ ও টেনিস খেলতে আসতেন। প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন যিনি ছিলেন মাদ্রাজী, তাঁর স্ত্রীসহ ক্লাবে আসতেন মাঝে মাঝে। হাইকোর্টের বিচারপতি টম এলিস প্রায়ই আসতেন গলফ খেলতে। হাইকোর্টের অরমন্ড, আমিনুল্লাহ খানও আসতেন। ইংরেজ ও পাকিস্তানী– দু'পক্ষের সঙ্গেই সদ্ভাব ছিলো ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ও ঢাকার কমিশনার মাইক স্টুয়ার্টের। তাই প্রেসিডেন্ট হিসাবে তার টার্ম শেষ হলে দেখা গেলো আবার তাঁকে নির্বাচিত করা হয়েছে। পিলখানার কর্নেল বোয়ার্স ("বোঞ্জো") ও তাঁর স্ত্রী ডুলসি ছিলেন জনপ্রিয়। ঘোড়দৌড়টা বোঞ্জোই তত্ত্বাবধান করতেন। ক্লাবের সচিব সিরিল ডেভিস ও তাঁর স্ত্রী উভয়ই ছিলেন মদ্যপ।

স্বাধীনতার প্রথম দিকে, যেসব ব্রিটিশ ফার্ম নতুন রাষ্ট্রে ব্যবসা চালাতে

ইচ্ছুক ছিল তারা নতুন লোক পাঠালো। এর সঙ্গে বেশকিছু এডভেঞ্চারারও এলেন। পুরনো কিছু ইংরেজ অফিসার চাকরির মেয়াদ ফুরালে চলে গেলেন। এতে ক্লাবের খানিকটা ক্ষতি হলেও করাচী থেকে আসা পাকিস্তানী অফিসারদের উপস্থিতি দেখা যেতে লাগলো। এদের অনেকে নিজ স্বার্থে ক্লাব ব্যবহারও করতেন। এরকম অনেক প্রবাসী পাকিস্তানী ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্যও এসেছিলেন। তাদের কয়েকজনের বিবরণ দিয়েছেন ড্যাশ। রাষ্ট্রের কর্ণধারদের মধ্যে খাজা নাজিমুদ্দিন ও আজিজ আহমদ মাঝে মাঝে আসতেন ক্লাবে।

বরং নাজিমুদ্দিনের কাজিন, ঢাকার প্রথম নাগরিক, আহসান মঞ্জিলের নবাব ঘন ঘন আসতেন ক্লাবে। কলকাতায় এক সময় তিনি মন্ত্রী ছিলেন কিন্তু তাঁর অকর্মন্যতা ও দুর্নীতি ছিল সর্বজনবিদিত, যে কারণে নতুন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায়ও তাঁর স্থান হয়নি। শহরের গুণ্ডাপাণ্ডা ও ঘোড়দৌড়ের জকিদের ওপরই তাঁর যা খানিকটা প্রভাব ছিলো। তাঁর ছেলে আসকারি ছিলো গভর্নরের এডিসি। বিমানবন্দরে কাউকে সরকারিভাবে অভ্যর্থনা জানাতে হলে নবাবের দরকার হতো, কারণ তখন তিনি যে শুধু নবাব পরিবারের প্রধানই নন, প্রধানমন্ত্রীর ভাইও (কাজিন) বটে।

আসকারি ছিল ভালো লাগার মতো তরুণ। প্রায়ই ক্লাবে আসতো। টেনিস ও ক্রিকেট খেলতো।

নবাবের বেগম প্রায় ক্লাবেই থাকতেন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন হিন্দু নর্তকী এবং অজানা কিন্তু কুখ্যাত জায়গা থেকে নবাব তাকে তুলে এনেছিলেন। পাকিস্তান হওয়ার পরপরই স্থানীয় সামরিক কমান্ডার জেনারেল আইয়ুব খানকে তিনি ধরে বসলেন তাঁকে ইস্ট পাকিস্তান উইমেন্স ডিফেন্স ক্রপস-এর অফিসার কমান্ডিং করার জন্য। এ বাহিনীর মহিলারা রমনায় নিয়মিত ড্রিল করতেন এবং স্মলরেঞ্জের রাইফেলে গুলি ছোঁড়া শিখতেন। ক্রপসের মহিলারা ছিলেন উচ্চবর্গের পাকিস্তানী মহিলা, এদের অনেকেই ছিলেন অবিবাহিত আর যারা বিবাহিত তারা ছিলেন অ-গর্ভবতী। প্রত্যেকের মনে মনে দাউ দাউ করে জ্বলছিলো ভারতের প্রতি ঘৃণা ও পাকিস্তানের প্রতি দেশপ্রেম। প্রথম দিকের রিক্রুটদের মধ্যে ছিলেন মিসেস আজিজ আহমদ।

ক্রপসের রীতিনীতির সঙ্গে বেগম সাহেবার কোনো মিল ছিল না। তাঁর নিজস্ব একটি জিপ ছিল। কোত্থেকে তিনি যোগাড় করেছিলেন খোদাই মালুম। জিপে সব সময় মজুদ থাকতো ক্লাব থেকে নেয়া আধডজন বিয়ারের বোতল। ক্লাবের পেট্রোল পাম্প থেকে সবসময় তিনি পেট্রোল নিতেন কিন্তু কখনও ক্লাবের কোনো বিল দিয়েছেন বলে শোনা যায়নি। তাঁর জানা পরকীয়া সম্পর্কের ঘটনাগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ডেভিড পাওয়ারের ঘটনা। পাওয়ার ছিলেন

আই.সি.এস এবং তিনি পাকিস্তানের পক্ষে অপশন দিয়েছিলেন। সচিবালয়ে তিনিই একমাত্র যিনি কোনো চিঠির ড্রাফট ঠিকটাক মতো করতে পারতেন। পাওয়ার আগে ছিলেন কলকাতায় এবং বিবাহিত ছিলেন এক 'সেক্স' এবং 'ড্রিংক এডিক্টে'র সঙ্গে। ফলে, ঢাকায় এসে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাসই ফেলেছিলেন। ঢাকায় এসে তিনি মুসলমান হলেন এবং আগের বউকে ডিভোর্স দিয়ে কৃষ্ণাঙ্গ এবং মোটামুটি দেখতে কুৎসিত এক পাকিস্তানীকে বিয়ে করলেন। কলকাতায় থেকে ঢাকায় আসার পর পাওয়ার নিতান্ত অসুস্থ ছিলেন এবং অন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। তখনই মহিলা তাঁকে যথেষ্ট সেবা শুশ্রূষা করেন। বেগমের সঙ্গে পাওয়ারের এরপর সম্পর্ক গড়ে উঠলো। দাড়ি রাখলেন পাওয়ার দিন-রাত বেগমের সঙ্গে ক্লাবেই পড়ে থাকতেন, ঘরে ফিরতেন কিনা সন্দেহ। পরে, বেগম তাঁকে ত্যাগ করলে পাওয়ার বলতে লাগলেন যে, বেগম হচ্ছেন কপট স্বৈরিণী। তবে, তার সত্যতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ, বছরখানেক পর বেগম এক জারজ সন্তানকে প্রদর্শন করলেন যার পিতা ছিলেন নবাব।

মিসেস আজিজ আহমদ, ইংরেজদের থেকে বেগম সাহেবের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে অবশ্যই বেশি জানতেন এবং খুব শীঘ্রই ঢাকার প্রথম নাগরিকের স্ত্রীর সঙ্গে সরকারের প্রথম কর্মচারীর স্ত্রীর যুদ্ধ শুরু হলো। যুদ্ধের শুরুতেই বেগম সাহেব কৌশলগত এক জয়লাভ করলেন। আজিজ আহমদ ক্লাবের সদস্য হতে চাইলেন। কিন্তু আজিজ আহমদদের কেউ পছন্দ করতো না তাদের ভাবভঙ্গি ও ব্যবহারের জন্য। ক্লাবে তো বেগম সাহেবার বয় ফ্রেন্ডের অভাব ছিল না। তাছাড়া ছিল আহসান মঞ্জিল বাহিনী-যারা ক্লাবের সদস্য ছিলেন কিন্তু চাঁদা দিতেন না। ক্লাবে আসতেন না তবে রেসকোর্সে উপস্থিত থাকতেন। ভোটের দিন দেখা গেল আজিজ আহমদকে ব্ল্যাক বল করা হয়েছে।

মাইক ষ্টুয়ার্ট আজিজ আহমদকে পছন্দ করতেন না। কিন্তু এখন তিনি বিপাকে পড়লেন। তিনি ঢাকার কমিশনার এবং ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। আজিজ আহমদ চীফ সেক্রেটারী। সুতরাং তাঁকে সদস্য করে নেয়াটা যেন কর্তব্য হয়ে দাঁড়ালো। কমিটি মিটিং টিটিং করে মাইক নির্বাচন পদ্ধতিতে ত্রুটি আবিষ্কার করে নতুনভাবে ভোট নিলেন। এবং মাইক সজাগ রইলেন যাতে কেউ ব্ল্যাক বলড না করে।

বেগমের জীবনযাপনই পরিষ্কার করে তুলছিলো যে তিনি আর বেশি দিন ক্রপসের প্রধান থাকবেন না। তবুও বেশ কিছুদিন তিনি ঐ পদে ছিলেন।

পাকিস্তানী আমলের প্রথম দিকে ক্লাবের রুটিন জীবনের দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন ড্যাশ। লিখেছেন মদের কথা, যা ছিল ক্লাব জীবনের অন্যতম উপাদান। মদ আর আগের মতো আমদানি হতো না। ক্লাবে মদ প্রায় রেশন করা হলো। আর এই সময়ই ক্লাবের সভাপতি হলেন বিচারপতি আমিনুল্লাহ খান। প্রেসিডেন্ট হয়েই ক্লাব

সম্পাদক সিরিল ডেভিসকে প্রথম নির্দেশ দিলেন খান-তা হলো ক্লাবের সেলারে যে কয় বোতল হুইস্কি আছে তা যেন তাঁর বাসায় পৌঁছে দেয়া হয়। জজ সাহবেকে এক ডজন হুইস্কি পাঠানো হলো। কিন্তু জজ সাহেব সেই হুইস্কির বিল আর শোধ করেননি।

এক সময় ঘোড়দৌড় বন্ধ হয়ে গেল। মদ বিক্রিও। ক্লাবের আয় কমতে লাগলো। এর মধ্যে নতুন গভর্নর নুনের স্ত্রীর ইচ্ছানুসারে বিমান বাহিনীর প্রাক্তন অফিসার জনৈক জামানকে করা হলো ক্লাব সম্পাদক। নুনের স্ত্রী ছিলেন হাঙ্গেরিয়ান এবং গ্ল্যামারস। আর তাঁর সচিব ছিলেন জামানের ব্রিটিশ স্ত্রী যিনি ছিলেন আরো বেশি গ্ল্যামারস ও সেক্সি। এক ব্রিটিশ ব্যবসায়ীর সঙ্গে তখন তিনি এক ঝড়ো অ্যাফেয়ারে মত্ত। পরে প্রধান বিচারপতি টম এলিসের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী একদিন আলোচনায় বসলেন। এবং বোধ হয় এলিসের পরামর্শেই ব্যবসায়ী লুসকম্বকে ত্যাগ করলেন।

ড্যাশ লিখেছেন, এভাবে ক্লাবের মান আগের থেকে খারাপ হতে লাগলো। তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন, ব্রিটিশ আমলে যে শৃঙ্খলা ও ভব্যতা ছিল নতুন সদস্যদের মধ্যে তা ছিলো না। যেমন আগে কখনও শোনা যায়নি ক্লাবের প্রেসিডেন্ট এক ডজন হুইস্কির বোতল নিয়ে গেছেন অথচ দাম দেননি। সবচেয়ে বড় কথা, ঢাকার জীবনযাত্রাই বদলে যাচ্ছিলো। তাঁর লেখা এই অনুচ্ছেদে, ভারতবর্ষে সিভিরিয়ানদের শেষ পর্ব, ঔপনিবেশিক শাসনের অবলুপ্তি, এর প্রতিক্রিয়া, ১৯০ বছরের অন্যরকম এক জীবনের পরিণতি সবকিছুই বিধৃত হয়েছে। লিখেছেন, তিনি ছাড়া অনেকেই হয়ত ঢাকার জীবন যাপনে ত্রুটি খুঁজে পেয়েছিলেন। তাদের কেউ ক্লাবের সদস্য, অধিকাংশই নয়। "Not honorable Ministers, not high officials, not rich busines men, not Nawabs or Begums, not jokeys or owners of race horses, not eaters of cucumber randwiches. But refugees from India, living on roadside lands in Dacca streets in squalor and under leaking roofs, unable for months to get enough to eat. Maye they had been lucky to escape massacre but many of their close relatives had been left behind and had not all been for fortunate." তারা স্বপ্নের পাকিস্তানে পৌঁছেছিলেন, 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগানে হয়ত তাদের মন ভরে যেতো কিন্তু দু'টি বছর কেউ তাদের মঙ্গলের জন্য আগ্রহ দেখায় নি। 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দিয়ে যারা ভারত ত্যাগ করেছিলো তারা তখনও পথে ঘাটে শুয়ে থাকে, ক্ষুধার্ত। "সেখানে এক বৃদ্ধ ইংরেজ ঢাকা ক্লাবের মান হ্রাস-বৃদ্ধি নিয়ে কী ভাবলো না ভাবলো তাতে কী আসে যায়!"

১৬
ক্রীড়া, রাজনীতি ও বন্যা

১৯২০ সালের অক্টোবরে রিড-কে রাজশাহীর ডি.এম বা ডিস্ট্রিকট ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হলো। এর আগে, ১৯১৬ সালে অল্প কয়েকদিনের জন্য রাজশাহীতে নিযুক্তি পেয়েছিলেন। তারপর চলে যান যুদ্ধে। রিড এতে খুশি। লিখেছেন তিনি, "কোনো জেলায় এই প্রথম তৃপ্তি ভরে কাজ করতে পারলাম। একটানা তিনবছর।"

উত্তর বঙ্গের টিপিক্যাল জেলা রাজশাহী। আয়তন ৫০০০ বর্গ মাইল। প্রান্তে দু'টি মহকুমা যার চার্জে আছেন দু'জন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট (প্রাদেশিক সার্ভিসের ভারতীয় সদস্য)। ডি.এম যেমন জেলার সার্বিক দেখভালের দায়িত্বে তেমন তারাও মহকুমার দেখভালের দায়িত্বে। জেলার দক্ষিণ সীমান্ত গঙ্গা বা পদ্মা। জেলায় মেটালড রাস্তা একটি। ২৩ মাইল লম্বা যা উত্তর-দক্ষিণে নাটোরে রেল লাইনে গিয়ে পৌঁছেছে। বাকি সব মেটে রাস্তা যা রক্ষণাবেক্ষণ করে জেলা বোর্ড। এর ওপর ভারি গরুর গাড়ি চলে চলে রাস্তার দফারফা করে দেয়। তারা না থাকলে নানা রকম গতিহীন নদী-খাল দিয়ে ভ্রমণ করা যায় বওলিয়া বা হাউসবোটে। কালেকটর হিসেবে এর একটির মালিক ছিলেন রিড। বা ভ্রমণ করা যায় দ্রুতগামী নৌকায়। তবে, রিড লিখেছেন, তিনি ভালোবাসতেন ঘোড়ায় চড়ে ভ্রমণ।

পদ্মার তীরে সদর স্টেশন। পদ্মার তীর মাটি ফেলে বাঁধ দেয়া স্টেশনে কালেক্টর ছাড়াও আছেন অন্যান্য পরিপূর্ণ সিভিলিয়ান যেমন জেলা জজ যিনি নিজেও একজন আই সি এস। একজন সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ, প্রায় সময়ই সহকারি বিহীন: একজন সিভিল সার্জন সাধারণত আই এম এসের সদস্য। সদরে যিনি সিভিল হাসপাতাল এবং সদরের বাইরে সব হাসপাতাল ও ডিসপেনসারি এবং কেন্দ্রীয় কারাগারের ১০০০ হাজতির দায়িত্বে। এ ছাড়াও আছেন একজন নির্বাহী প্রকৌশলী গণপূর্ত বিভাগের সদস্য।

স্টেশনটি খোলামেলা। এবং বাংলার পুরনো অনেক জেলার মতো এরও ছিল একটি রেসকোর্স। ঐ সময়ের তুলনায় বাড়িঘর ভালোই ছিলো। অবশ্য বিদ্যুত ছিল

না; প্রেশার ল্যাম্প তখন চালু হচ্ছে তবে নতুন অনেক জিনিষের মতো তাও ছিলো ঝামেলার। গরমের সময় নির্ভর হাতে টানা পাখার ওপর। পানির জন্য ছিল কুয়ো। কিছু দূরে পদ্মার তীরে সারদায় পুলিশ প্রশিক্ষণ স্কুল। রেশম শিল্প যখন চালু ছিলো তখন এই শহরটি ছিলো কেন্দ্র যেন একটি বৃহৎ রেশম কারখানা। বেশ কিছু ইমারত ছিল যা প্রশিক্ষকদের জন্য ছিল পর্যাপ্ত। এই স্কুলে যে সব পুলিশ অফিসার প্রশিক্ষণের জন্য আসতেন তাদের অনেকের সঙ্গে রিডের দেখা সাক্ষাৎ হতো।

অবকাশে শিকারের ছিল অফুরন্ত সুযোগ। শীতে হাঁস ও স্নাইপ, শুকনো মৌসুমে বরাহ শিকার বা পিগ স্টিকিং। রিডের ভাষায়, "দ্যা ফাইনেষ্ট স্পোর্ট ইন দা ওয়ার্ল্ড।" পিগ স্টিকিংয়ের কিছু বর্ণনা দিয়েছেন রিড অনাবশ্যক হেতু এখানে তা আর উল্লেখ করলাম না, তবে এ বিষয়ে তিনি এফ. বি. সিমসনের 'স্পোর্ট ইন ইস্টার্ন বেঙ্গল' শীর্ষক বইয়ের উল্লেখ করেছেন। সিমসন ১৮৩০ সাল থেকে পূর্ব বঙ্গে কাজ করেছেন। পিগ-স্টিকিং সম্পর্কে তিনি চারটি নিয়মের কথা (গোল্ডেন রুল) উল্লেখ করেছিলেন যা রিড লিখেছেন অতিমাত্রায় সঠিক। সেগুলি হলো বরাহ-র দিকে দ্রুত ছুটে যাওয়া, কৌণিক দিক থেকে তার আক্রমণ নেয়া, বর্শাটা আগ বাড়িয়ে গেঁথে দেয়া; বর্শার ধারালো ফলা একবার গেঁথে যাওয়ার পর না বেরুলে তা নিয়ে টানাটানি না করা। রিড লিখেছেন, তিনি এ নিয়মগুলি মানতেন দেখে কখনও বিপদে পাড়েন নি। একবার একজনকে তিনি দেখেছেন ভয়ানক ভাবে জখম হতে কারণ, সে এক নম্বর নিয়ম মানে নি। বরাহর শিং ক্ষুরের মতো ধারালো। জানুয়ারি ১৯২২ সালের একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন রিড। সঙ্গীসাথী নিয়ে গেছেন বরাহ শিকারে। তিনি একটি বরাহকে জখম করে তার পিছে ছুটছিলেন। সামনে পড়লো এক রাখাল বালক। সে শুয়েছিলো মহিষের পিঠে। মহিষ বরাহ দেখে ছেলেটিকে ফেলে সরে দাঁড়ালো। ভাগ্যিস ছেলেটি উপুর হয়ে মাটিতে পড়েছিলো। বরাহটি তাকে ক্ষতবিক্ষত করলো। রিড ও তার বন্ধুরা শিকার বাদ দিয়ে নিজেদের কাছে রাখা ওষুধ, ব্যান্ডেজ প্রভৃতি দিয়ে কোনো রকমে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। বরাহ শিকারে যাওয়ার সময় তারা ওষুধপত্র ব্যান্ডেজ সঙ্গে রাখতেন। ডাক্তারকে ২২টি সেলাই দিতে হয়েছিলো, ছেলেটি পরে সেরে উঠেছিলো। ডাক্তার রিপোর্টে ঘটনাটিকে 'শূকরের কামড় দেয়া কেস' (পিগ-বাইট কেস) হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন।

১৯১৯ সালের মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার অনুসারে আইন-পরিষদের যে নির্বাচন হলো রাজশাহীতে রিড-কে তা তত্ত্বাবধান করতে হলো। ডায়ার্কি বা দ্বৈত শাসনের ভিত ছিল এটি। এ ব্যবস্থায়, প্রাদেশিক কিছু বিভাগ, নির্বাচিত মন্ত্রীদের হাতে ছেড়ে দেয়া হতো, বাকি সব থাকতো সরকারি ভাবে মনোনীত নির্বাহী কাউন্সিলের হাতে যার প্রধান ছিলেন গভর্নর। সে সময় গভর্নর ছিলেন লর্ড

রোনাল্ডসে। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলেন যৌথসভা করে দু'পক্ষই সব বিষয় ঠিক করে কাজ করবে যাতে অন্তিমে যার যার দায়িত্ব তার তার ওপরেই থাকে। এ ভাবে তিনি একক কেবিনেটও করেছিলেন। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত এ ব্যবস্থা চালু ছিল। ১৯৩৫ সালের আইনে তা বাতিল হয়ে প্রাদেশিক মন্ত্রীদের কাছেই সম্পূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়।

এখানে পাঠকদের মন্টেগু চেমসকোর্ড সংস্কার সম্পর্কে অবহিত করতে হয়। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হলে, ভারতীয়দের স্বরাজ দাবির কিছুটা মেনে নেয়ার উদ্দেশ্যে ভারত সচিব মন্টেগু ও ভাইসরয় চেমসফোর্ড একটি রিপোর্ট তৈরি করেন যা ১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯১৯ সালে তা কার্যকর হয়। এটি সংক্ষেপে মন্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কার নামেও পরিচিত। এই আইন অনুসারে গভর্ণর জেনারেল এবং কাউন্সিল অব স্টেট ও লেজিসলেটিভ এসেমব্লি এ দু'টি নিয়ে গঠিত হয় কেন্দ্রীয় আইন সভা। প্রাদেশিক আইন সভাগুলির ক্ষেত্রে বলা হয়েছিলো ২০ ভাগের বেশি সরকারি সদস্য থাকতে পারবে না।

রিড লিখেছেন, ১৯২১ সালে যখন এই সংস্কারগুলি কার্যকর হচ্ছে তখন দেশ জুড়ে চলছে রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিদেশী কাপড়ে বহ্নুৎসব ও মাঝেমাঝে হরতালের মাধ্যমে গান্ধীর অসযোগ আন্দোলন একেবারে তুঙ্গে। স্কুল ছাত্ররা হয়ে উঠলো বিশৃঙ্খল। "আমরা কর্মকর্তারা আমাদের ভবিষ্যত নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়লাম। অধস্তনদের মনে চিন্তা এসব দমনে কঠোর ব্যবস্থা নিলে তাদের ভাগ্য কী হবে কারণ এই রাজনীতিবিদরাই যদি তাদের প্রভু হন। কলকাতা বা দার্জিলিং গেলে বুঝতে পারতো চাকরির ভবিষ্যৎ নিয়ে বিষন্ন আলোচনা চলছে। এবং এই প্রথমবারের মতো অবসর নেয়ার বিষয়টি আলোচনায় এলো। একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য স্যার হেনরি হুইলারের সঙ্গে, মনে পড়লো এক আলোচনায় তিনি বলেছিলেন, পারলে চলে যাও প্রত্যন্ত অঞ্চলে, এসব বিষয় ছিল অনেক দূরে, তবে মনে পড়ে, আমার বন্ধু জজকে একবার বলেছিলাম, এখন চলে যাওয়ার সময়। কিন্তু আমরা যাই নি, গেলে হয়ত বেকার থাকতাম।"

রিড উল্লেখ করেছেন, এরপরতো অনেক ঝড়ঝাপটা এবং অন্তিমে ১৯৪৭ সালে হ্যারিকেন বয়ে গেলো। ১৯২১ সালে চালু হলো তুলনামূলক পেনসন। অধিকাংশ এই নিয়ম চালু হওয়ার পর কর্মত্যাগের প্রক্রিয়া শুরু করেন। এবং নিজেদের সরকারি অবলুপ্তির (অফিসিয়াল ডিমাইজ) মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নেন।

রাজশাহীতে, রিডের ভাষায় 'হরতালের নুইসেন্স' এবং স্বাভাবিক জীবন ও কাজে বাধা পাওয়া ছাড়া ১৯২১ সালে দু'টি ঘটনায় শত্রুতার রেশ অনুভব করা গিয়েছিলো। একটি হলো দক্ষিণে বিলমোরিয়ায় চাষীদের খাজনা না দেয়া। এটি ছিলো মেদেনীপুর কোম্পানীর। তাঁর মতে, বাইরের প্ররোচনায় এঘটনা ঘটেছিলো

এবং তাদের দমিয়ে, অবস্থা স্বাভাবিক করতে খানিকটা সময় লেগেছিলো। রিডের নিজস্থ অভিমত, "এ ঘটনায় ম্যানেজার মেজর টেইলর দায়ি নয়। তবে, তার অধস্ত নরা হয়তো অত্যাচারি ছিলো যে কারণে চাষিদের উসকে দেয়া সহজ ছিল।"

অন্য ঘটনাটি আরো খারাপ। মার্চ মাসে, কেন্দ্রীয় জেলে প্রায় ৭০০ বন্দী, মূল ফটকের উল্টোদিকে ফাঁকা চত্বরে মিলিত হয়ে সুপারিনটেনডেন্ট ও ওয়ার্ডেনদের সরিয়ে বেরিয়ে এলো। এর আগে রটেছিলো যে নতুন 'রাজ' প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এবং বন্দীরা মুক্তি পাবে। সুতরাং, "অনাগত স্বর্ণযুগে যোগ দেয়ার জন্য এই ব্যবস্থা। তারা শহরের রাজপথ দিয়ে যাওয়ার সময় বন্দীদের দেয়া পোষাক ছুড়ে ফেলে সাধারণের পোষাক পড়ছিলো।" এখানে রিড 'পারসিউশেন অর ফোর্স' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, আসলে মনে হয় সাধারণরাই তাদের জামা-কাপড় দিচ্ছিলো। কিন্তু সেটি লিখলে, বোঝা যাবে, সাধারণের প্রতি তাদের সহানুভূতি আছে, সে জন্য শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন।

রিড প্রথমে সারদা গিয়ে ফোর্স সংগ্রহ করে তাদের কয়েদীদের ধরার কাজে লাগিয়ে দিলেন। তারপর রাজশাহী ফিরে বিভিন্ন গুজবের অবসান ঘটানোর চেষ্টা করলেন। দেখলেন, পুলিশের এস,পি ম্যাকডওয়েল, এবং জেলা জজ গ্রাহাম কয়েদীদের ধরার জন্য দুপুর দুটো থেকে চেষ্টা চালাচ্ছেন। রিড লিখেছেন, গ্রাহামের আসলে আদালতে অপেক্ষা করাই শোভন ছিলো। গ্রাহামের এই আচরণের কারণে পরে হাইকোর্ট কৈফিয়ত তলব করেছিলো।

কয়েদীরা কোথাও না থেমে যার যার গন্তব্যে চলে যাচ্ছিলো। কারো ক্ষতি তারা করে নি। তবে, পালাবার সময় গুলিতে দু'জন আহত হয়েছিলো। অসাবধনতা বশত একজন গ্রামবাসীও গুলিতে আহত হয়েছিলো। পরে, কয়েদীদের কেউ কেউ ধরা পড়েছে, কিছু নিজে থেকে ফিরে এসে বসলো, পলাতক জীবন থেকে জেল জীবন ভালো। দু'মাসের মধ্যে ৬৬৯ জনের মধ্যে ৪৮০ জনকেই বিচারের সম্মুখীন করা সম্ভব হয়েছিলো। রিড অবশ্য বারবার স্বীকার করেছেন তারা কোনো ঝামেলা করেনি।

রিড এবং তার স্ত্রী রাজশাহী ঘুরে বেড়িয়েছিলেন নৌকা, গাড়ি এবং ঘোড়ায় চড়ে। রিডের স্ত্রী 'স্টেশন'টাকে খানিকটা আনন্দময় করে তুলেছিলেন। শীতে ঘোড়াদৌড়ের বন্দোবস্ত করেছিলেন। সে দিন সারদা এবং আশেপাশের ইউরোপিয়ানরা এসেছিলো এবং ক্লাবে নাচ ও নৈশভোজ দিয়ে আন্দময় দিনটি শেষ হয়েছিলো।

১৯২৩ সালের জানুয়ারিতে রিড জেলায় তাঁর শেষ দীর্ঘ ট্যুরটি করেন, কিন্তু একটি দুর্ঘটনায় পড়েন। পিগ-ষ্টিকিং-এ গিয়ে তিনি আহত হন। বরাহটি তিনি শিকার করেছিলেন বটে কিন্তু বছর খানেকপর বুঝেছিলেন তাঁর পাঁজরে গুরুতর

আঘাত পেয়েছেন। মাসখানেক প্লাস্টার করে তাঁকে শুয়ে থাকতে হয়েছিলো।

১৯২২ সালেও রাজনৈতিক ঝুট-ঝামেলা শেষ হয়নি। কংগ্রেস সদস্যরা জেলায় সফর করে সমস্যার সৃষ্টি করছিলো। রিডের ভাষায়, "১২ মার্চ গান্ধী গ্রেফতার হওয়ায় স্বস্তি পেলাম"। কারণ মাঠে তারা কাজ করেন। সমস্যাটা তাদেরই হয়। জুলাই মাসের শেষে বন্যা আঘাত হানলো। আগস্টে পানি বাঁধ ছাপিয়ে গেলো। বজরায় করে রিড তখন কাজ পরিদর্শন করেছেন। লর্ড লিটনও রোহটাসে করে সফরে এসেছিলেন।

সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে নওগাঁয় আবার বন্যা শুরু হলো। রিডকে ফের যেতে হলো নওগাঁয়। যে ডাকবাংলোয় উঠেছিলেন তার চারদিকেও পানি। এক সপ্তাহ সেখানে থেকে তিনি ত্রাণ তৎপরতা চালান। এ সময় সাতবছর আগে লেখা জেলার কালেক্টর আলেকজান্ডার ক্যাসেলসের একটি রিপোর্ট তাঁর খুব কাজে লেগেছিলো। ক্যাসেলসের সময়ও এধরনের বন্যা হয়েছিলো। ক্যাসেলস কী কী উপায় অবলম্বন করেছিলেন বিপদ মোকাবেলার জন্য তা লিখে গিয়েছিলেন। রিড বলেছেন, "অনেকে এ ধরনের রিপোর্ট দেখে হাসতে পারেন কিন্তু উত্তরাধিকারীদের জন্য তা অনেক সময় বিশেষ মূল্যবান হয়ে দাঁড়ায়।"

এ সময়, রিড লিখেছেন, তারা বেশ ভালো প্রচার পেয়েছিলেন। এর একটি কারণ, বন্যা। অপরটি হলো, স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায়ের আগমন, রিডের ভাষায় "দি ভেটারন কংগ্রেস এজিটেটর, নাউ মিনিস্টার অফ লোকাল সেল্ফ গভর্নমেন্ট।" একজন দেশীকে যে মন্ত্রি হিসেবে মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে তা বোঝাই যাচ্ছে। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেকেই এসেছিলেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবকরাও এসেছিলেন। রিড তাদের এলাকা ভাগ করে দিয়েছিলেন কাজ করার। কিন্তু, রিডের ভাষায়, খবর থেকে বন্যা না হয়ে গেলে তারাও মিলিয়ে গেলেন।

১৯২৩ সালের আগস্টে তিনি ছুটি পেলেন এবং জানালেন যে পিগ-স্টিকিং এর সময় ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিলেন তার ফলে মেরুদন্ডে ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে, রিডকে দু'ই বছর ছুটিতে থাকতে হয়েছে।

এর পরেও রিড আরো অল্পদিনের জন্য রাজশাহীর কমিশনার হয়েছিলেন, চাঁটগায়ও ছিলেন কিছুদিন। পরে চলে যান মূখ্য সচিব হয়ে কলকাতায়।

১৭
পূর্ববঙ্গে পুলিশি জীবন

১৯২৪ সালের ৫ ডিসেম্বর ফিনিরা বোম্বে পৌঁছলেন। .জাহাজ কলম্বো রওয়ানা হয়ে যাবে রাতেই, সুতরাং ব্যস্ত সমস্ত হয়ে মালপত্র নিয়ে নামলেন। সাড়ে ১৯ বছর বয়সে ১৪ নভেম্বর রওয়ানা হয়েছেন লন্ডন থেকে। আই.পি. হিসেবে যারা নিযুক্তি পেয়েছিলেন তারা সবাই এক সঙ্গেই রওয়ানা হয়েছিলেন। মালপত্র নিয়ে কাছেই, তখনকার সবচেয়ে ভালো হোটেল তাজমহলে উঠলেন। দুপুরে দেখা করলেন মুম্বাইয়ের পুলিশ প্রধানের সঙ্গে। দেখা করাটা জরুরি, কারণ, সেদিন থেকেই তাদের চাকুরির শুরু।

কলকাতার ট্রেন সাড়ে সাতটায়। তারা চারজন আলবান আলি, বিল কোটাম, গিল এবং ফিনি বাংলায় যাবেন। আলি আসাম প্রদেশে। স্টেশনে মানুষের ভিড়, ছুটোছুটি ফিনিকে অবাক করেছিলো। কুলিকে দেয়ার কথা ছিল ২ আনা। দিয়েছিলেন ১ রুপি। এতে কুলিদের মনে হলো, এরা পাগল। সুতরাং, তারা তাদের ঘিরে ধরে পয়সা চাইতে লাগলো। পরে এঁক কনস্টেবল তাদের কুলিদের ব্যূহ থেকে রক্ষা করে।

কলকাতা পর্যন্ত ট্রেন ভ্রমণ ছিলো আরামদায়ক। স্টেশনে দেখেন সহকারি মহাপুলিশ পরিদর্শক এক চাপরাশি পাঠিয়েছেন চিঠি দিয়ে। তাদের অনুরোধ করেছেন চৌরঙ্গির ইউনাইটেড সার্ভিসেস ক্লাবে যেতে। সেখানে তাদের জন্য রুম বুক করা আছে।

পরদিন তারা বিভিন্ন জনের দেখা করলেন। অবশ্য, প্রথমে রিপোর্ট করতে হলো মহাপুলিশ পরিদর্শক মি. সিম্পসনের সঙ্গে। তিনি তাদের লাঞ্চ খাওয়ালেন। পরদিন তারা রওয়ানা হলেন মধ্যবাংলার রাজশাহী জেলার সারদা পুলিশ ট্রেনিং কলেজের উদ্দেশে। কলকাতা থেকে রাতে ট্রেনে উঠে পৌঁছলেন লালগোলা ঘাট, ভোরে। বেশ ঠান্ডা। সেখান থেকে স্টিমারে সারদা।

স্টিমার ঘাটে প্রচণ্ড হুড়োহুড়ি। ফিনিকে যে বিষয়টি অবাক করলো, তা হচ্ছে

২ আনার বিনিময়ে বিশাল বিশাল বোঝা মাথায় নিয়ে কুলিরা চলাচল করছে। স্টিমার ভ্রমণটা ছিলো খুবই আনন্দদায়ক। সারদার পথে স্টিমার থামলো রাজশাহী ঘাটে, সেখানেও বেশ কিছু লোকজন ওঠানামা করলো।

দুপুরে তারা পৌঁছলেন সারদা, তাদের অভ্যর্থনা জানালেন অধ্যক্ষ জে.মি. ফারমার। কলেজটি আগে ছিলো নীলকুঠি। ১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রহিত হওয়ার পর বাংলা সরকার এটি কিনে নেয়। মূল ইমারতের সামনে এক বিশাল ময়দান, নদী তীরে অধ্যক্ষের বাংলো, অফিসার্স মেস।

তাদের প্রত্যেককে একজন বেয়ারা দেয়া হলো। ফিনির বেয়ারা জয়লাল। বিকেলে খবর দেয়া হলো তারা ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে আসবেন কিনা, কলেজের টাট্টুতে চড়ে অধ্যক্ষের সঙ্গে তারা হাওয়া খেতে বের হলেন। তাদের ধারণা ছিলো যেহেতু তারা ঘোড়ায় চড়া পরীক্ষা পাশ করেছেন সুতরাং তারা ঘোড়ায় চড়াটা ভালো জানেন। কিন্তু, দেখা গেলো, এখানকার টাট্টু কিছুক্ষণ পর মেজাজ মর্জিমতে চলা শুরু করলো। এবং কিছুক্ষণ পর দেখা গেলো অধ্যক্ষ ছাড়া সবাই ঘোড়াচ্যুত হয়েছেন। তখন এই শিক্ষাটা লাভ করলেন যে, তাদের শেখার এখনও অনেক বাকি বিশেষ করে ভারতীয় ঘোড়া সম্পর্কে।

ফিনির চাচা তাঁকে আগে সাবধান করে দিয়েছিলেন এ বলে যে, ভারতীয় চাকুরির ভারতীয়করণ করা হয়েছে। সুতরাং, সিনিয়র অনেক ভারতীয় থাকতে পারে। ফিনি লিখেছেন, মেসে আমাদের সঙ্গে ছিলেন তিনজন ভারতীয় দু'জন বাংলা ও একজন আসাম ক্যাডারের। "১৮ মাস আমরা এক সঙ্গে ছিলাম, কখনও আমাদের জাতিদ্বেষের কথা মনে হয়নি। আমরা যেমন, তারাও তেমন সেক্রেটারি অব স্টেটের চাকুরি করছে। আমাদের কোনো সমস্যাই হয়নি।"

ফিনিদের শেখানো হতো আইন ও বাংলা ভাষা, পরে কথা চালানো যায় এমন হিন্দুস্তানী, অবহাওয়া ছিল চমৎকার। ১৫ জুন থেকে ঝড়ের মাধ্যমে শুরু হলো বর্ষা, গ্রীষ্মের দাবদাহ কমে এলো। চারদিক শীতল, কিন্তু দু'সপ্তাহ পর তারা অস্থির হয়ে গেলেন। চারদিক স্যাঁতস্যাঁতে, কাপড় জামা, বুটে ফাংগাস। তবে, সারদা অস্বাস্থ্যকর ছিল না, তারা অসুখে পড়েননি।

তাদের অধ্যক্ষ পরে যিনি পুলিশ মহাপরিদর্শক হয়েছিলেন সেই ফারমার তাদের সবসময় শিকারে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করতেন। সারদা পৌঁছার কয়েক দিনপর খবর পেলেন কাছের এক গ্রামে এক চিতা আসা যাওয়া করছে। ইতোমধ্যে একটা ছাগল নিয়ে গেছে। তারা চারজন কাছের জঙ্গলে গেলেন চিতা খুঁজতে। হঠাৎ শব্দ পেলেন পেছনে, দেখেন সেই চিতাই বটে, লাফ দিয়ে উঠে গেলো এক গাছে, তারপর আরেক গাছে। প্রথম চিতা শিকারের এই হলো কাহিনী। তবে, তারপর শিকার রপ্ত করেছেন। কিছুদিন পর, ফিনির ভাষায়, "আশেপাশের আদি

মানুষ নিয়ে আমি শিকারে যেতাম। কলেজ থেকে ১০ মাইল দূরে ছিল জঙ্গল। আদিবাসী ট্রাইবটির নাম মনে নেই। তারা ছিলো এনিমিলিস্ট এবং অদ্ভুত সব জিনিষকে পূজা করতো, তারা দেখতে অনেকটা অস্ট্রেলিয়ান আদিবাসীদের মতো। কৃষ্ণবর্ণ এবং প্রাণোচ্ছল। কাঠবেড়াল, লিজার্ড, ইঁদুর খেতো। তাদের আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছিলো, কারণ এরকম মানুষ আমি দেখিনি। জঙ্গলে এরা বাস করতো, খানিকটা চাষাবাদও করতো।" ফিনি খুব সম্ভব সাঁওতালদের কথা বলেছেন।

ফিনি এরপর নিয়মিত শিকারে যেতেন সাঁওতালদের সঙ্গে। চিতা শিকারও করেছিলেন। একবার মহাপরিদর্শক এসেছিলেন পরিদর্শনে। ফিনির ওপর ভার ছিল তাঁর জন্য শিকারের আয়োজন করা। সাঁওতালদের নিয়ে তিনি তা করেছিলেন। সেদিন দুটিচিতা মেরেছিলেন। সরকার প্রত্যেক ক্যাডেটকে ৬০০ রুপি দিতো ঘোড়া কেনার জন্য। সে টাকা দিয়ে ফিনি একটি ঘোড়া কিনেছিলেন তার সিনিয়র সহকর্মির কাছ থেকে যিনি ট্রেনিং শেষে আসাম যাচ্ছিলেন। এর নাম রেখেছিলেন ফিনি ওয়েন্ডি। আব্বাস নামে একজন শিকারিও রেখেছিলেন ফিনি।

এরপর ফিনি বিস্তারিত ভাবে পিগ স্টিকিংয়ের বিবরণ দিয়েছেন। এর আগে বারবার যা উল্লিখিত হয়েছে। সে জন্য এখানে সে বিবরণ দিলাম না। তাঁর অধ্যক্ষ হয়ে এসেছিলেন ডগি স্টুয়ার্ট। তিনি পিগ-স্টিকিংয়ে উৎসাহ যোগাতেন। এই শিকার করতে গিয়ে শরিরের অনেক হাড়গোড় ভেঙ্গেছেন, তবুও উৎসাহের কমতি ছিল না। তখন তিনি পিগ স্টিকিংয়ে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারতেন না কিন্তু পরামর্শ দিতেন। সারদার আশেপাশে তখন জঙ্গল, গ্রামগুলিও জঙ্গলময়, এদিক সেদিক দামে পরিপূর্ণ দিঘী, দিঘীর চারপাশে ঘন আগাছা ফলে বরাহ পাওয়া যেতো প্রচুর।

ফিনিদের রুটিন ছিল প্রশিক্ষণ আর শিকার। এর মাঝে জরিপ কাজেও যেতে হয়েছে। ফিনি লিখেছেন, গরিব পরিবার থেকে এসেছেন তাই টাকাপয়সা বেশ খরচ করতেন। প্রশিক্ষণ শেষে দেখেন প্রায় ১০০০ রুপি দেনা হয়ে গেছে, তবে, কলেজ ছেড়ে যাওয়ায় আগে দেনা শোধ করেছিলেন। তাঁর মতে বেতন তখন ভালোই ছিল। দু'বছর প্রশিক্ষণের পর তার বেতন দাঁড়িয়েছেলো মাসে ৪৫০ রুপি আর ওভারসিস অ্যালাউন্স ১৫ পাউন্ড। একজন ভৃত্যকে দিতে হতো মাসে ১৫ রুপি, সহিস ১২ আর ঘেঁষোড়েকে ৫ রুপি। সুতরাং, ঐ বেতনে ভালোভাবেই চলে যেতো।

প্রশিক্ষণের শেষ পর্যায়ে দু:খজনক ঘটনা ঘটেছিলো। ঘোড়া দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন তাঁর সহকর্মি গিল। তিনিও ছিলেন গরিব পরিবারে। প্রশিক্ষণ পরীক্ষায় ভালোভাবে উতরে গেলেন ফিনি। তাঁকে নিয়োগ দেয়া হলো নদীয়ায়। ১৯৩৪

সালে ফিনি নিযুক্তি পেলেন ময়মনসিংহের অতিরিক্ত এসপি হিসেবে। এসপি ছিলেন এস.জি. টেইলর। তিনি ও তাঁর স্ত্রী কোরালি তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন তাদের সঙ্গে থাকার জন্য। ফিনি আপত্তি করলেন না। কারণ তাঁর নির্ধারিত বাসায় তখন বাস করছেন ভারতীয় একজন অতিরিক্ত এসপি।

ময়মনসিংহে স্পেশাল ব্রাঞ্চ সদর দফতর ও সশস্ত্র পুলিশের দায়িত্বে ছিলেন। এস বি-তে (গোয়েন্দা বিভাগ) কাজ তেমন ছিলো না। সামরিক গোয়েন্দা অফিসার ডগি লিওনার্দ-ই সেটি সম্পন্ন করছেন। ১৯৩৩ সালে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেলে, জেলায় সামরিক গোয়েন্দা নিযুক্ত করা হয়েছিলো, ফিনি যখন ময়মনসিংহে তখন সেখানে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ তেমন ছিলো না।

ফিনি লিখেছেন, ময়মনসিংহের স্টেশনটি ছিল তখন আনন্দদায়ক। সবার সঙ্গে সবার সদ্ভাব ছিল, জেলার সকল অফিসাররা ছিলেন ক্লাবের সদস্য। বর্ণগত কোনো সমস্যা ছিল না। সেশন জজ সেনের কথা উল্লেখ করেছেন যিনি কেমব্রিজে ডাবল ফার্স্ট এবং তাঁর বছরের আইসিএসদের মধ্যে ছিলেন সেরা। হাসিখুশি সেন ভালো ব্রিজ খেলতেন। আই এম এস ক্যাডারের ডাকতার মেজর নাগ ছিলেন একজন এফআরসিএস। ভালো টেনিস খেলতেন।

ময়মনসিংহের আয়তন ছিলো বেশ বড়। পুলিশের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৮০০। তার মধ্যে সশস্ত্র পুলিশ ছিলো প্রায় ৩০০। তিনটি কোম্পানিতে তা বিভক্ত ছিলো। প্রত্যেকটির প্রধান ছিলো একজন সুবাদার। একটি কোম্পানি ছিলো বিহারি ও যুক্ত প্রদেশের একটি ছিল গুর্খাদের অন্যটি পাঞ্জাবিদের, শেষোক্তটিতে কিছু শিখ ছিলো কিন্তু বেশির ভাগই ছিল পাঞ্জাব রেজিমেন্টের পেনসন ভোগি বা রিজার্ভিস্ট। তাদের সবাই ছিলো মুসলমান [শিখা ব্যতিত]। সুবাদার ছিল ঘোড়সওয়ার বাহিনীর প্রাক্তন সদস্য।

ওই তিনকোম্পানির কাজে ছিলো একজন ইউরোপিয় পরিদর্শক, নাম স্মিথ, সাহসিকতার জন্য পেয়েছিলো কিংস পোলিশ মেডাল, খুবই কর্মদক্ষ।

ফিনি লিখেছেন, "ময়মনসিংহে আমি চমৎকার সময় কাটিয়েছি। ময়মনসিংহের কাছাকাছি স্নাইপ শিকারের জায়গাগুলি খুঁজে বের করেছি। মাঝে মাঝে ববি টেইলর ও ডগি লিওনার্দের সঙ্গে ঢাকা জেলার উত্তরে যেতাম সেখানে হাঁস পাওয়া যেতো। ঢাকার এস. পি. থেকে লঞ্চ ধার নিয়ে খালিয়াজুড়ি যেতাম। সেখানে ঢাকার ডিআইজি রাইট সহ আরো কয়েকজনকে নিয়ে বিরাট এলাকা বেড় দিয়ে হাঁস শিকার করতাম।

প্রতিদিন সকালে সদর দফতরে সব কনস্টেবল ও আর্মড পুলিশকে নিয়ে ফুল ড্রেস প্যারেড হতো। আমার সেরা ইউনিফর্ম পড়ে সেখানে যেতাম। একদিনের কথা মনে আছে। স্মিথের কাছ থেকে প্যারেডের ভার নিয়ে একটা

অর্ডার দিলাম, ভালোভাবে তা পালিত না হওয়ায় জোরে চিৎকার করে উঠলাম আর সঙ্গে সঙ্গে লন্ডনে বাঁধানো আলগা দু'টি দাঁত ছিটকে পড়লো মাটিতে। বৃষ্টি হওয়াতে মাটি ছিল কর্দমাক্ত। দক্ষ স্মিথ ব্যাপারটি বুঝে সঙ্গে সঙ্গে প্যারেডের চার্জ নিয়ে নিলো।"

১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন শুরুর আগে ময়মনসিংহে বেশ ভালো একটি স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন ছিল। সংস্থা ফুটবল প্রতিযোগিতা, ফুটবল লিগ, ক্রিকেট এবং অ্যাথলেটিকসের আয়োজন করতো। ফিনির উদ্যোগে তা আবার পুনর্গঠিত হলো। ফিনিকে চোয়রম্যানও নির্বাচন করা হলো। এবং ১৯৩৬ পর্যন্ত এই সংস্থা নিয়ে তিনি মেতে ছিলেন। ভালো একটি ফুটবল টিম গড়ে তুলেছিলেন।

১৯৩৫ সালে ববি টেইলর বদলি হয়ে গেলে তার বদলে এসপি হলেন খান বাহাদুর মো. খালেক। "এই প্রথম একজন ভারতীয়ের অধীনে আমাকে চাকুরি করতে হলো।" লিখেছেন ফিনি, "তিনি ছিলেন বাঙালি মুসলিম, সাব ইন্সপেক্টর হয়ে চাকুরিতে ঢুকেছিলেন। কঠোর শৃংখলানুবর্তী ছিলেন এবং পুলিশের কাজে এ থেকে জেড পর্যন্ত সব জানতেন। সেন্স অব হিউমারও ছিলো প্রখর।" ফিনির মতে, "আমার তাঁকে ভালো লেগে গেলো। একসঙ্গে কাজ করতে অসুবিধা হয়নি। তিনি আমাকে বিশ্বাস করতেন, কাজে হস্তক্ষেপ করতেন না এবং আমিও প্রয়োজন বোধে তাঁর পরামর্শ নিতাম।"

ফিনি লিখেছেন, "OBE পাওয়ার পর আমার মাথা খানিকটা মোটা হয়ে গিয়েছিলো। আমার কর্মচারিদের হয়ে একটি কাজ করেছিলাম যা ছিলো ট্যাকটলেস। ১৯৩০ সালে অনেক পাঞ্জাবিকে আর্মড পুলিশে রিক্রুট করা হয় এ দেখে যে এদের বিশ্বাস করা যাবে এবং কংগ্রেসের ভাবাদর্শে তারা প্রভাবিত হবে না। আমি এই মুসলমানদের ভক্ত ছিলাম। এদের সাময়িক ভাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিলো এবং ৫ বছর পর্যন্ত স্থায়ী করা হয়নি। এর অর্থ চাকুরি চলে গেলে তারা পেনসন ভাতা কিছুই পাবে না। অন্যদিকে স্থায়ী পদগুলিতে বাঙালি ও বিহারিদের নেয়া হচ্ছিলো। তিনি আই জিকে সব জানিয়ে চিঠি লিখলেন যার মূল কথা ছিল- "that either the sanctioned strength of the police force should be increased, and they made permanent, or they should be allowed to fill permanent vacancies as they occurred." ববি টেইলরের ভ্রু কুচঁকে গেলো কিন্তু বললো, "এটি আমি পাঠিয়ে দেব। কারণ তুমিও সুপারিটেনডেন্ট। কিন্তু ডি আই জি এবং আইজি ব্যাপারটি সহজভাবে নেননি, যদিও বছর খানেকের মধ্যে এদের স্থায়ী করার কাজ শুরু হলো।"

১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে তিনি দীর্ঘ ছুটি নিয়ে সিমলা গেলেন এবং ভয়ংকর পেটের অসুখ বাঁধিয়ে এলেন। এর এক বছর পর মেজর নাগ সঠিক অষুধ

দিয়ে তাঁকে সারিয়ে তোলেন।

১৯৩৬ সালে ফিনিকে বদলি করা হলো রংপুরের। সেখানে ডি. এম ছিলেন ঘোষ নামে একজন ভারতীয় ক্রিস্টান, দক্ষ আই সি এস। ফিনির ভাষায়, তাঁর সঙ্গে কাজ করতে কোনো অসুবিধা হয় নি।

ফিনি রংপুরে থাকার সময় দু'টি বড় ঘটনা ঘটেছিলো। একবার এক গ্রামে পুলিশের সঙ্গে গ্রামবাসীর দাঙ্গা হয়। কনস্টেবলের রাইফেলও চুরি যায়। ফিনি এটি জানতে পেরে একজন ইন্সপেক্টর ও ৬ জন কনস্টেবল পাঠালেন সেই গ্রামে দাঙ্গার হোতাদের ধরতে। তারা গ্রামে গিয়ে দেখে গ্রামে কেউ নেই। অপরাধী হিসেবে ১২ জনকে শনাক্ত করা হয়েছিলো। ফিনি তারপর তাদের অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট ও সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ নিয়ে দু'বাস ভর্তি পুলিশ ও ১২ টি গরুর গাড়ি নিয়ে রওয়ানা হলেন। গ্রামে গিয়ে দেখেন মহিলা ও শিশু ছাড়া কেউ নেই। এরকমটি হবে ফিনি জানতেন। তিনি ১২ জনের বাড়ির মালপত্র সব ক্রোক করে গরুর গাড়িতে তুলে রওয়ানা হলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখেন মহিলারা দৌঁড়ে এসে আবেদন জানাচ্ছে, দোষীরা আত্মসমর্পণ করবে। তারা অপেক্ষা করতে লাগলেন। দোষীরা আত্মসমর্পন করলো। ফিনিও তাদের মালপত্র ফেরত দিলেন। এরপর রংপুরে আর কোনো ঝামেলা হয়নি।

ঐ সময়ই গভর্নর স্যার জন এন্ডারসন রংপুর সফরে এলেন। এর আগে তাঁর ওপর দু'বার সন্ত্রাসী হামলা হয়ে গেছে। সুতরাং, আশেপাশের জেলা থেকেও পুলিশ এনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছিলো। এন্ডারসন ছিলেন স্কটিশ, তাঁকে একটি বিটিং দি রিট্রিট শোনাবার জন্য ফিনি স্কটিশ পাইপের একটি ব্যান্ড গঠন করেন। আশেপাশের জেলার এস.পি.রা তাকে বাদ্য যন্ত্র দিয়ে সহয়তা করে। বলাই বাহুল্য, এন্ডারসেন এতে খুব খুশি হয়েছিলেন।

গভর্নরের সফরের পর ফিনি কলকাতায় গেলেন অ্যাপেনডিক্স অপারেশনের জন্য। এরিমধ্যে চিঠি পেলেন তাঁকে বরিশালের ভারপ্রাপ্ত এস.পি করা হয়েছে। ভারতে আসার ১২ বছর পর তিনি উচ্চপদে গেলেন।

বরিশাল অনেক বড় জেলা, খুন-খারাবি লেগেই আছে। সেখানে কোন রেল লাইন নেই। পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য ২ মাইল। নৌকা ছাড়া যাতায়াতের পথ নেই। কলকাতা থেকে খুলনা যেতে হয় ট্রেনে। সেখান থেকে স্টিমারে। রাতে আরামদায়ক সফরের পর ভোর ৪টায় পৌঁছে যায় বরিশাল। ফিনি লিখেছেন, "এই ভ্রমণটা আমি ভুলবো না।"

বরিশালে তখন খুব সম্ভব ৩৫টি পুলিশ স্টেশন। এস পির ছিল বড়সড় একটি লঞ্চ। ফিনি ঠিক করেছিলেন সবগুলি স্টেশন তিনি সফর করবেন। একটি ছাড়া সবগুলি করেছিলেনও। থানার স্থাপনার অবস্থা খুবই খারাপ। ইটের তৈরি

পুলিশ স্টেশন প্রায় নেই। সব মাটি আর বেড়ার। ফিনি লিখেছেন, "পুরো অবস্থা দেখে খুবই লজ্জা পেলাম। পাঁচ বছরব্যাপী একটি পরিকল্পনা নিলাম আধি কাঠামো উন্নত করার। ডি আই জি ছিলেন মানুচ। তাকে প্রস্তাব পাঠালেন। মানুচ ছিলেন আগে আমার অধ্যক্ষ। তিনি পুরো স্কিম পাশ করে আই জি অফিসে পাঠালেন। পরে কী হয়েছিলো জানি না।"

বরিশালে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বেশ জোরদার ছিল। প্রধান দু'টি সংগঠন যুগান্তর ও অনুশীলন কর্ম তৎপর ছিল। তবে, ফিনি যখন বরিশাল তখন তাদের কর্মতৎপরতা স্তিমিত হয়ে গেছে। ফিনির সময় তেমন কোনো ঝামেলা হয়নি। ফিনি লিখেছেন, "সেখানে থাকার সময় রায় নামে এক বাঙালি জমিদার পরিবারের সঙ্গে চেনাজানা হয় যারা সদরের কাছেই বসবাস করতেন। এ পরিবারের দু'জন ছিলেন যারা ১৯১৪ সালে যুদ্ধের সময় রয়েল ফ্লাইং করপসে [বর্তমান বৃটেনের রয়েল এয়ার ফোর্স] যোগ দিয়েছিলেন। প্রথম জন নিহত হন এবং ডিএফসি [ডিসটিংগিউশভ ফ্লাইং করপস] পান। দ্বিতীয় জনের নাম পিটার তিনিও ডিএফসি পান। তাঁর সঙ্গেই দেখা হলো। তিনি ছিলেন ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়ের ট্রাফিক সুপারিনটেনডেন্ট, কলকাতায় পোস্টেড। "চমৎকার মানুষ, আমরা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। তাঁর আগ্রহ ছিলো বক্সিংয়ে। পরে জেনেছিলাম ১৯১৯ সালে পুরো সাম্রাজ্যে যুদ্ধ শেষের আনন্দোৎসবের অংশ হিসেবে যে বক্সিং প্রতিযোগিতা হয় সেখানে অ্যামেচার হিসেবে একমাত্র পি.এল-রায় ফ্লাইওয়েটে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জিনি ওয়াইল্ডকে নক আউটে পর্যদুস্ত করেন। ১৯৩৮ সালে কলকাতায় আমরা বেঙ্গল অ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশন শুরু করি। তিনি হন সভাপতি, আমি সহ-সভাপতি। কৌতুকপ্রিয় ছিলেন, প্রজারাও তাঁকে ভালোবাসতো। আর এফ সি স্কুলের অনেক গল্প শোনাতেন। তাঁর মতো আরো অনেকে নিশ্চয় বাংলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। হতাশার বিষয় যে, তারা কেউ রাজনীতিতে এলেন না। অবশ্য সেরাদের অনেকে গেছেন আই সি এসে যেমন বি. আর. সেন বা এস. এন. রায়।"

ফিনি যাদের কথা বলেছেন তারা বরিশালের একসময়ের জমিদার পরিবার প্রখ্যাত ঐতিহাসিক তপন রায় চৌধুরীর পরিবারের। তাঁর আত্মকথায়ও এদের উল্লেখ আছে।

ফিনির বরাবরের ঝোঁক ছিল খেলাধুলার দিকে। বরিশালেও তিনি হকি দল গড়ে তুলেছিলেন এবং সে দল নিয়ে চট্টগ্রামে খেলতেও গিয়েছিলেন।

"বরিশালে খুন-খারাবির সংখ্যা বেশি", লিখেছেন ফিনি, "বিশেষ করে খুন। ১৯৩৬ সালের হিসাবে দেখলাম পুরো জেলায় ৩৫০ টি খুনের ঘটনার রিপোর্ট করা হয়েছে। রিপোর্ট করা হয়নি এমন সংখ্যাও কম নয়। খুন করে লাশ জঙ্গলে ফেলে দেয়া হয়। শেয়াল একরাতে তা খেয়ে ফেলে কংকাল ছাড়া, ফলে, লাশ চেনার

উপায় থাকে না। শাস্তি প্রদানের সংখ্যা খুব কম। বেশিরভাগ মামলা জমি সংক্রান্ত। পারিবারিক বিরোধের কারণ।"

"একটি ইন্টারেসটিং কেসের কথা মনে আছে। একজন অপরাধিকে ধরা হলো খুনের দায়ে। সে অভিযোগ অস্বীকার করেনি বরং এর যৌক্তিকতা তুলে ধরে। তার মতে, ক-কে খুন করার জন্য তাকে নিযুক্ত করে। সে সময় এ ধরন খুন করার রেট ছিল ১০ রুপি। সে ক-কে খুন করে। এবং পাওনা টাকার জন্য খ-য়ের কাছে মাস ছয়সাতেক ঘোরাফেরা করে। পরে টাকা না পেয়ে এক কোপে খয়ের মাথা উড়িয়ে দেয়।" ফিনি লিখেছেন, "তিনি বদলি হয়ে যাওয়ায় মামলার শেষটুকু আর জানেন না।"

ফিনি তাঁর ৫ বছরের পরিকল্পনা যখন কার্যকরের উদ্যোগ নিচ্ছেন তখন চিঠি পেলেন রাজা ষষ্ঠ জর্জের অভিষেক অনুষ্ঠানে ভারতীয় পুলিশ দলের নেতৃত্ব তাঁকেই দিতে হবে। এটি ছিলো তার জন্য বিরাট সম্মান। অনুষ্ঠান হওয়ার কথা মে ১২, ১৯৩৭ সালে, তার আগেই চার্জ বুঝিয়ে এপ্রিল ১৯৩৭ সালে রওয়ানা হলেন বোম্বের দিকে, গন্তব্য লন্ডন।

১৮
একজন কমিউনিস্ট আইসিএস

টাঙ্গাইলকে টাউন বলা যাবেনা। তবে, এখানে আছে একটি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট এবং প্রশাসনিক দফতর, একটি পুলিশ স্টেশন, একটি হাইস্কুল; একটি বার এসোসিয়েসন এবং সভ্যতার আরো কিছু উপাদান। সেখানে স্বইচ্ছায়, একরকম তদবির করেই ক্যারিট এলেন। তিনি চেয়েছিলেন, প্রত্যন্ত প্রান্তে একটি বড় জেলা যেখানে কোনো ইউরোপিয় নেই এবং যা বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন। তিনি আসল ভারতের স্বাদ পেতে চাচ্ছিলেন।

ক্যারিট যখন এসডিও হয়ে এলেন তখন বছরে সাড়ে চারমাস নৌকা ছাড়া টাঙ্গাইলে ঢোকার কোনো উপায় নেই। বাকি সময় ঠিকা গাড়ি বা গরুর গাড়ি। তাও ঠিকঠাকমতো চলে না। সারা জেলার ২০ মাইল রাস্তা প্রায় নষ্ট গত বন্যায়। আগামী বন্যার আগে তা সারাবার উপায় নেই। আসানসোল থেকে টাঙ্গাইল। বৈপীরত্যটা ছিল চোখে পড়ার মতো।

"প্রথমত: এখানে কোনো সামাজিক জীবন নেই; একটি ক্লাব নেই", লিখেছেন ক্যারিট "আমার একমাত্র সঙ্গি জ্যাক, তরুণ সহকারি পুলিশ সুপারিনটেনড্যান্ট যে ইংলিশ পাবলিক স্কুল থেকে সরাসরি এখানে এসে পা ফেলেছে। নি:সঙ্গতা ও যৌন হতাশা তাকে ঠেলে দিয়েছে মদের দিকে।"

সদর দফতর ময়মনসিংহ ৪০ মাইল দূরে। সেখানে ডিস্ট্রিকট অফিসার (ডি.এম) টমি ডাও, পুলিশ প্রধান টেইলর ও তার খান্ডারনি স্ত্রী থাকেন। তাদের দু'জনের কেউ-ই পরিদর্শনের জন্যও টাঙ্গাইল আসেন নি।

দ্বিতীয়: ১৯৩২/৩৩ সালে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিচ্ছিলো তা থেকে আসানসোল মোটামুটি মুক্ত ছিলো। কিন্তু টাঙ্গাইলে একধরণের "নাশকতার গন্ধ" পাওয়া যেতো।

ক্যারিট লিখেছেন, "আমি টাঙ্গাইল থাকার সময় নাটকীয় কিছু ঘটেনি তবে ভয়, শত্রুতা এবং সন্দেহের কুয়াশা আমাদের ঘিরে ধরেছিলো। আমার পুলিশ ছিল

নার্ভাস এবং অতি শকড এবং ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিরাপত্তার জন্য প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের প্রয়োজনে আমার ডাক পড়তো।"

তৃতীয়: ছিল আবহাওয়া ও ভৌগোলিক বৈপরীত্য।

ক্যারিট লিখেছেন, "বেশির ভাগ ইউরোপিয় পুরুষ ও মহিলা বিশেষ করে যারা বসবাস করতেন কলকাতায় গ্রীষ্ম ছিলো তাদের কাছে নরকের মতো। বিশেষ করে গ্রীষ্মের শেষে বর্ষাও। যাদের উপায় ছিল তারা দার্জিলিং ছুটতেন। কিন্তু, বাংলা বদ্বীপের দেশিয়দের জন্য ছিল তা অন্যরকম। বর্ষা তার জন্য ছিল আয়েশ, অবসর। নৌকোয় করে উপহারের সামগ্রি নিয়ে বেরিয়ে পড়া কুটুম্বদের সঙ্গে দেখা করার জন্য, শিশুদের হাসি, মহিলাদের নিবিড় অলস আড্ডা।" এর এক কাব্যিক বর্ণনা দিয়েছেন ক্যারিট। তারপর লিখেছেন, "আমিও ভ্রমণ (পরিদর্শন) বেছে নিলাম। আমার বাইসাইকেল, ঘোড়া ও গরুর গাড়ি ত্যাগ করে সরকার বাহাদুরের হাউসবোটে আশ্রয় নিলাম। জীর্ণ শীর্ণ অবস্থা। একটি কেবিন। দু'দিকে বসার জায়গা যা শোয়ার জায়গা হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। জ্যাক কুক প্রায়ই তার হুইস্কির ব্যাগ নিয়ে আমার সঙ্গি হতো। আমাদের দু'জনের শোবার ব্যবস্থা সেখানেই হতো। মাল্লারা সামনের ডেকে বা ছাদে থাকতো। পেছনে ছিল রান্নার ও আমার সশস্ত্র প্রহরির থাকার জায়গা।

হাউসবোট চলতো শ্লথ গতিতে। এজন্য তা ছিলো আরো আরামদায়ক। "মাঝে মাঝে পানিতে সাঁতারের জন্য লাফ দিয়ে পড়তাম। মাল্লারা আতংকিত হতো। কারণ, তাদের ধারণা নদীতে কুমির আছে। জ্যাকও এরকমটি পছন্দ করতো না, কারণ তার ধারণা এরকম নগ্নতা প্রদর্শন শ্বেতাঙ্গদের খাটো করে।"

'দাগুর মামলা' নামে একটি মামলার দীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন ক্যারিট। তিনি দেখাতে চেয়েছেন, পুলিশ কীভাবে আইনের অপব্যবহার করে। ১১০ ধারায় পুলিশ 'সন্দেহভাজনদের' গ্রেফতার করতো এবং আসামীকে রিমান্ডে নিতে চাইতো। দাগু নামে এক যুবককে (ভদ্রলোকই বলা যেতে পারে) এ ভাবে পুলিশ চালান দেয়। তাদের ধারণা সেও সন্দেহজনক এবং সাম্রাজ্যের ক্ষতি করতে পারে। ক্যারিট রিমান্ডে না দিয়ে মামলাটা কয়েকদিনের জন্য স্থগিত করলেন।

মামলা শুরু হলে দেখা গেলো বারের সভাপতি যোগেন বাবু দাগুর পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। এতে ক্যারিট অবাক হন। কারণ, দাগুর টাকা পয়সার দেয়ার ক্ষমতা নেই। আর যোগেন বাবু এ ধরনের মামলা করেন না, পুলিশ রিপোর্টে অবশ্য সবসময় যোগেন বাবুকে সন্দেহভাজন হিসেবে আখ্যা দেয়া হতো। অর্থাৎ কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে। যোগেন বাবু সাহসী দারোগাকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়লেন। ক্যারিট দাগুকে খালাস দিলেন। যোগেন বাবুর সঙ্গে তাঁর এক ধরনের অলিখিত আঁতাত গড়ে উঠলো। ইন্সপেক্টর এরপর এ ধরনের যত মামলাই

আনতে লাগলো যোগেনবাবু তার বিপক্ষে লড়তে লাগলেন ও আসামীরা ছাড়া পেতে লাগলো। পুলিশের ভাষায় তিনি 'অসহযোগি ম্যাজিস্ট্রেট।'

ক্যারিট লিখেছেন, যোগেন বাবুর সঙ্গে প্রকাশ্যে তাঁর মেলামেশার উপায় ছিলো না। এক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হয়েছিলো। "আমি যখন প্রথম পা দিই কলকাতার তখন ইউনাইটেড সার্ভিসেস ক্লাবে এক বয়স্ক সিভিলিয়ান আমাকে পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন, কখনও ভারতীয় ভদ্রলোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো না। সমস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নির্ভর করেছে non-fraternization এর ওপর। তার মতে, স্কুল মাস্টার ও আইনজীবীদের থেকে সবসময় দূরে থাকা শ্রেয়। তবে জমিদার, অনুগত প্রভৃতির সঙ্গে খাতির রাখা চলবে। কেনো? চিন্তা জেগেছিলো কিন্তু জিজ্ঞেস করেনি।" তবে এ সিস্টেম ক্যারিটের ভালো লাগেনি।

বাংলার অভ্যন্তরে ৬ ভাবে ভ্রমণ করা যায়, জানিয়েছেন ক্যারিট। এগুলি হলো, রেল, বাস, নৌকো, সাইকেল, গরুর গাড়ি এবং টিককা গাড়ি।

প্রথমত: রেল স্টেশন অধিকাংশ ভারতীয় যারা রেলে ভ্রমণ করে তারা একদিন আগে প্ল্যাটফরমে এসে আশ্রয় নেয়। তারপর প্রতিদিন নেমে চলাফেরা করে, চা খায়, ভ্রমণ ইনফর্মাল এবং মজার।

দ্বিতীয়: বাস। প্রতি মাসে একবার ক্যারিটকে টাঙ্গাইল যেতে হতো। দু'টি মাত্র লক্কর ঝক্কর বাস ছিল। ড্রাইভার একজন থাকতো বটে। তবে, একজন হ্যান্ড ব্রেক দেখতো, একজন হর্ন; ড্রাইভার সিগারেট ধরালে, আরেকজন স্টিয়ারিং ধরে থাকতো। আর পাদানি, ছাদে লোক গিসগিস করতো। বাসটি টাঙ্গাইল থেকে ময়মনসিংহ যাওয়ার পথে অবশ্যই দু'একবার বিকল হতো। ক্যারিট এই বাস যাত্রা খুব পছন্দ করতেন। কারণ, এটি ছিলো কৌতুককর।

তৃতীয়: নৌকা যার কথা ক্যারিট আগেই উল্লেখ করেছেন। চতুর্থত: সাইকেল অধিকাংশ রাস্তা ছিল বাঁধ। বন্যা আর পানিতে অনেক সময় তা হয়ে উঠতো অগম্য। গ্রীষ্মের এক সকালে ক্যারিট টাঙ্গাইলের উত্তরে যাচ্ছেন পরিদর্শনে সাইকেল চেপে। তাঁর বেয়ারা আগেই ক্যাম্পের জিনিষপত্র নিয়ে চলে গেছে। দেখলেন এক আনাড়ি যুবক সাইকেল চালিয়ে আসছে। সে প্রায়ই পড়ে যাচ্ছে এবং শেষমেশ ক্যারিটের সাইকেলের সঙ্গে সংঘর্ষ। ক্যারিট ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "তুমি যাচ্ছ কোথায়?" যুবকটি ক্রোধ বোঝে নি। সে ভেবেছিলো সাহবে তাকে জিজ্ঞেস করছেন কোথায় যাবে। সে সাইকেল উঠিয়ে ক্যারিটের পাশে চালাতে চালাতে (সেই আনাড়ি ভাবে) তার জীবন, সুখ দু:খ, আশা আকাঙ্খার কথা বলতে লাগলো। ক্যারিট লিখেছেন-

"My heart melted. And I began to despise myself for my arrogant British pomposity in face of his warmth and generosity of spirit."

পঞ্চম: গরুর গড়ি। এমনভাবে চলে যে মনে হতে অলস লোকের জন্য আদর্শ

পরিবহন, তবে, হাড়মাস কীভাবে এক হয়ে যায় তার বর্ণনা দিয়েছেন ক্যারিট।

ষষ্ঠ: টিক্কা গাড়ি যেখানে উঠলেই ঘোড়ার মলের গন্ধ পাওয়া যাবে ও দেখা যাবে চারদিকে মাছি। ক্যারিটের মতে, শরীর ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জন্য টিক্কা গাড়ি হুমকি; এটি শ্লথ এবং আরামদায়ক নয়।

ঘাটাইল পরিদর্শন কালে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন তিনি। ঘাটাইল গ্রামে গেছেন, সেখানে ক্ষুদ্র ও জীর্ণ একটি পুলিশ স্টেশন আছে। থাকার জন্য কোনো ডাকবাংলো নেই। রাতে, তিনি থানার বারান্দায়ই খাট পেতে শুলেন। তার সেন্ট্রি সামনে সিঁড়িতে। রাত তিনটায় চিৎকার, হাঁকডাক শুনে উঠলেন, চারদিকে খালি সাপ সাপ রাজ সাপ বলে চিৎকার। ক্যারিটের সেন্ট্রি ঘুমিয়ে পড়েছিলো এবং একটি রাজ গোখরা তার হাঁটুর ওপর ছোবল মেরেছে। সবাই তাকে ঘিরে বসে আছে আর সেন্ট্রি ভয়ে, ব্যাথায় আধমরা, আশে পাশে ডাক্তার নেই। খবর নিয়ে স্থানীয় ডাক্তার বলে যাকে আনা হলো সে আসলে কম্পাউন্ডার। কারো কিছু করার নেই। সবাই ঘিরে আছে লোকটিকে, বিষ ছড়িয়ে পড়ছে তার শরীরে। সে নির্জিব হয়ে পড়ছে। তখন স্থানীয় ডাক্তার বললো, সাহেব পারমিশান দিলে ওঝা ডাকা যেতে পারে। ডাকা হলো ওঝা। লোকটি আরো নির্জিব হয়ে পড়ছে। ওঝা এসে ছয়টি মুরগির বাচ্চা চাইলো। আনা হলো তা। সেন্ট্রির মাথার মাঝখানে কামিয়ে যে একটি আঁচর দিলো ব্লেড দিয়ে যাতে রক্ত বেরোয়। সে রক্তের সঙ্গে একেকটি মুগির বাচ্চার ছানা কেটে রক্ত মেশাতে লাগলো আর অঙ্গভঙ্গি করে মন্ত্র পড়তে লাগলো।

সবাই নিশ্চুপ, এই বুঝি কিছু ঘটবে, এ সুযোগে ওঝা সবার কাছে তার টিনের পাত্র তুলে ধরছে। সবাই কিছু না কিছু দিচ্ছে। কিন্তু কিছুই ঘটলো না। লোকটি মারা গেলো। আড় চোখে তা দেখে ওঝা মিলিয়ে গেলো। পরদিন অবশ্য গোখরাটিকে খুঁজে বের করা হয়। বারান্দার এক গর্তেই ছিলো। শেয়ালের কথাও লিখেছেন ক্যারিট। বিশেষ করে রাতে তাদের প্রবল নিনাদ তার মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতো। উড়ো বাদুর, 'উড়ো ব্যাঙ' গান্ধি পোকারও উল্লেখ আছে। তাঁর উপসংহার "From all such, and from all reptiles, may lord presesve us."

১৯৩৪ সালে ছুটিতে গেলেন ক্যারিট। তিনি লিখেছেন, টাঙ্গাইলেই তিনি জীবন ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং ভারতের সমস্যাগুলি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। "যখন আমি টাঙ্গাইল ত্যাগ করছি, তখন মিশ্র অনুভূতি নিয়েই ছাড়লাম; শরতের নরম আলো শেষে শীতের পদধ্বনি 'নদীর পানি কমছে, চারদিকে সুবজের সমারোহ। চতুর্দিকে সৌন্দর্যের প্রবল আয়োজন। আমার মনে হলো, এখন এই চমৎকার দেশের মানুষগুলির কাছেই আমার প্রথম কমিটমেন্ট। এবং এ ধরনের কমিটমেন্টের সঙ্গে হয়ত সরকারি কর্মচারির দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হবে। তবে, এ নিয়ে তখন আর ভাবি নি।"

তথ্য নির্দেশ

১. অরবিন্দ পোদ্দার, 'শস্যের ভিতরে রৌদ্রঃ অন্বিষ্টের সন্ধানে সমাজ মানস', স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত, *উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ১৪।

২. *ঐ*।

৩. Ghosal, Akshoy Kumar, *Civil Service in India*, Calcutta, 1944, pp 13-14.

৪. ল্যাম্ব লিখেছিলেন– "the labyrinthine passages and light excluding pent-up offices, where candles for one half of the year supplied the place of the sun's light."

উদ্ধৃত, Philips, C. H., *The East India Company*, Manchester, 1961 P.I. আরো দেখুন, Lawson, Philip, *the East India Company*, New York, 1993.

৫. Choudhuri, Susil, *Trade and Commercial Organization in Bengal*, Calcutta, 1975, pp.20-24.

৬. বয়ানের অনুবাদ, সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাসঃ ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো*, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ.৫।

৭. বিস্তারিত বিবরণের জন্য সিরাজুল ইসলাম ও সুশীল চৌধুরীর, *প্রাগুক্তগ্রন্থ*।

৮. আদি কলকাতার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ নিয়ে অনেক প্রবন্ধ ও বই লেখা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য- রাধারমণ মিত্র, *কলিকাতা দর্পণ*, প্রথম পর্ব, কলকাতা, ১৯৮২; দ্বিতীয় পর্ব, কলকাতা, ২০০৩।

পূর্ণেন্দু পত্রী, *পুরনো কলকাতার কথাচিত্র*, কলকাতা, ১৯৭৯।

বিনয় ঘোষ, *কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত*, কলকাতা, ১৯৭৫।

উনিশ শতকে কলকাতা নিয়ে রূপচাঁদ পক্ষী গান বেঁধেছিলেন–

"ধন্য ধন্য কলিকাতা শহর।
স্বর্গের জ্যেষ্ঠ সহোদর॥
পশ্চিমে জাহ্নবী দেবী
দক্ষিণে গঙ্গা সাগর।
পূর্বে বাদা চিংড়ি হাটা
পদ্মানদী তদুত্তর॥
হেস্টিংস ব্রীজ বাগবাজার,

এই আয়তন তার
সারকিউলার রোড, পারমিট ধার
চতুঃ সীমা সার।
সমুদ্র গুপ্ত, *শহর কলকাতার আদিপর্ব*, কলকাতা, ১৩৬৮।

৯. পলাশীর যুদ্ধ, রবার্ট ক্লাইভের ভূমিকা, পরিণতি নিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য–
Gupta, Brijen K., *Sirajuddaulah and the East India Company 1756-57*, Leiden, 1962.
Chaudhury, Sushil, *The Prelude to Empire*, Dhaka, 2000.
তপন মোহন চট্টোপাধ্যায়, *পলাশীর যুদ্ধ*, কলকাতা, ১৯৫৬।
মৃণাল চক্রবর্তী, *সিরাজ উদদৌলা*, কলকাতা, ১৯৮১।
সুশীল চৌধুরী, *পলাশির যুদ্ধ, অজানা কাহিনী*, কলকাতা, ২০০৪।
রজতকান্ত রায়, *পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ*, কলকাতা, ১৯৯৪।
পলাশীর যুদ্ধ সম্পর্কে গ্রাম্য কবির এক রচনা উদ্ধৃত করেছেন রজতকান্ত। মোক্ষদা রঞ্জন ভট্টাচার্যের লেখা কবিতাটির একটি স্তবক–
"ছোট ছোট তেলেঙ্গাগুলি লাল কূর্তি গায়।
হাঁটু গেড়ে মারে তীর সদনের গায়।
নবাব কান্দে সিপাই কান্দে আর কান্দে হাতী।
কলকাতায় বসে কান্দে মোহনলালে' পুতি।
দুধে ধোয়া কোম্পানির উড়িল নিশান।
মীরজাফরের দাগাবাজিতে গেল নবাবের প্রাণ।"
Spear, Percival, *Clive and His India*, London, 1975.

১০. Bhattacharya, Sachidananda, *A Dictionary of Indian History*, Calcutta, 1972. pp 255-226.

১১. ফিলিপসের *প্রাগুক্ত গ্রন্থে* এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ আছে।

১২. Ghosh, Suresh Chandra, *The Social Condition of the British Community in Bengal*, Leiden 1970, p. 9.

১৩. পূর্ণেন্দু পত্রী, *পুরনো কলকাতার কথাচিত্র*, কলকাতা, ১৯৭৯, পৃ. ৩৪৬।

১৪. উদ্ধৃত, *ঐ*।

১৫. Spear, Percival, *The Nababs*, Calcutta, 1991.

১৬. অক্ষয়কুমার ঘোষালের *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*, পৃ. ১৬-১৮। এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ফস্টারের 'জন কোম্পানি' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন– "The development of the 'Honourable Company's Civil Service known by that title some time before Government employees in

England ever thought of calling themselves "the civil service" was gradual and some what haphazard."

১৭. বিস্তারিত বিবরণের জন্য, Woodruff, Philip. *The Men who Ruled India*, London, 1971.

১৮. "One of the most wicked places in the universe, corruption, licentiousness and a want of principle seem to have possessed the minds of all the civil servants by frequent bad examples they have grown callous, rapacious and luxurious beyond conception, and the incapacity and iniquity of some and the youth of others...."

উদ্ধৃত, মুনতাসীর মামুন, *সিভিলিয়ানদের চোখে ঢাকা*, ঢাকা, ২০০৩।

১৯. কোম্পানির প্রস্তাবটি ছিলো এরকম–

"That in every province or district, a gentleman in the service be appointed, with or without assistance, in proportion to the extent of the district. Whose office or department is to be subordinate to the Resident of the Durbar and managed as in expressly set forth and defined in the following letter of Instructions."

এদের বলা হয়েছিলো অঞ্চলের শাসক, প্রজা ও এলাকা সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য আহরণ যার ভিত্তিতে কোম্পানির প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। তাদের ম্যান্ডেটের মধ্যে ছিলো–

"3. The amount of the revenues, the cesses or arbitrary taxes, and all demands whatever made on the ryot, by the Government or the zamindar, with the manner of collecting them, and the general rise of every new impost.

4. The regulation of commerce, the illicit gains of Pycars (wholesale Dealers), Dallols (broker), etc., in the shape of Nazzaranas, brokerage, discount on rupees, etc.

5. Whatever might tend to obtain a knowledge of the abuses reform of the administration of justice. বিস্তারিত বিবরণের জন্য ঘোষালের *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*, পৃ. ১১৩-১১৪।

২০. অ্যাক্টের বিস্তারিত বিবরণের জন্য, ঘোষাল *ঐ*, পৃ. ৪৫৮-৪৬৪। ও সিরাজুল ইসলামের *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*, পৃ. ৯২।

২১. কর্ণওয়ালিস কোডের জন্য ঘোষালের *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*, পৃ. ৪৬৫-৬৮।

২২. সিরাজুল ইসলামের *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*, দশম অধ্যায়।

২৩. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আমার বাল্য কথা*, কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ৭৬।

২৪. কভেনাটেড সিভিল সার্ভিসের সংক্ষিপ্ত বিবরণের জন্য দেখুন,

Bhattacharya, S, *Dictionary of Indian History*, Calcutta, 1972, pp 271-273.

২৫. সুরেশ চন্দ্র ঘোষের *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*, পৃ. ১।

২৬. *ঐ*, পৃ. ২-৩।

২৭. *ঐ*, পৃ. ১৬।

২৮. *ঐ*, পৃ. ২৮।

২৯. উদ্ধৃত, [অনুবাদ লেখকের], *ঐ*, পৃ. ৩০।

৩০. *ঐ*, পৃ. ৩১।

৩১. *ঐ*, পৃ. ৩২।

৩২. Birt, F.B. Bradley, *'Sylhet' Thackery*, London, 1911. তিনি লিখেছিলেন– "... The fortunate youth with a nomination in his pocket saw open out before him an assured position of affluence and dignity with by no means remote possibilities of immense wealth and great distinction." p. 12.

৩৩. সরকারি নথিতে উল্লেখ করা হয়েছিলো যে– "That Ruogoo Mullick has increased and extorted from them a much more considerable revenue then was allowed by their Pottahs. That this was effected with such Rigor and cruelty as to leave them destitute and unable to pay the government's Revenue which has been the cause of the country being depopulated and the inhabitants leaving it for safety- that Rugoo Mullick forces salt half mixed with sand and damaged tobacco upon them at a most extravagant and almost double the rate..."

Bengal Revenue Consultations, 8.2. 1775, No 43, উদ্ধৃত, Ahmad, Zakiuddin, *Unpublished Thesis*.

৩৪. বিস্তারিত বিবরণেল জন্য সুরেশ চন্দ্রের *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*।

৩৫. *ঐ*।

৩৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য– Christie, W. H. J., *Memoirs of Indian Civil Service* [unpublished] Mss. Eur. F. 180/9 India office library [British Library].

৩৭. কটন লিখেছিলেন– "I represent, therefore, a practically continous service in the country of five generations, a record probably unique. For more than a century the interest of my family have been wrapped up in India, and I may well write of myself, as I have done in the pages of my 'New India'....."

বিস্তারিত বিবরণের জন্য-Cotton, H. *Indian and Home Memories*.

London. 1911.

৩৮. দেখুন, ফিলিপসের *প্রাগুক্ত গ্রন্থ* Appendix I, pp 307-335.

৩৯. Kaye J. W. তাঁর Lives of Indian officers এ লিখেছিলেন– "The 'nepotism of the East India company' had it uses. It was said to be a monstrous thing that the services of the East India company were, to a great extent hereditary services, and that the whole families should be saddled upon India, generation after generation we only discovered the good of this after we had lost it. That enthusiasm which is so often spoken of in these volumes as the essential element of success in India was nourished greatly by these family traditions. The men who went out to India in the old days of the East India company did not regard themselves merely as strangers and sojourners in the land. They looked to India as a Home, and to Indian service as a career..." উদ্ধৃত, সুরেশ চন্দ্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬।

৪০. "your servants are nominated to the highest stations of civil government, without any test of their possessing the requisite qualifications for the discharge of the functions of their offices. No such test could now indeed be required, none having been prescribed, and no means having been afforded to individuals of requiring the necessary qualifications for public stations." কোর্ট কে ওয়েলেসলির চিঠি, উদ্ধৃত, ঘোষাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪০।

৪১. নবীন চন্দ্র সে দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন বেশ সরস ভাবে- "পিতার তখন দোর্দন্ড প্রতাপ। প্রাতঃ কালে তিনি পূজাতে বসিয়াছেন; বৈঠকখানা লোকারণ্য। কাপড়ের বস্তা সম্মুখে হিন্দুস্থানী কাপড়ওয়ালারা; খাতা হস্তে দোকানদারগণ; ক্ষুধিত উমেদারপাল; অর্থী প্রত্যর্থী; আত্মীয় কুটুম্ব; যাত্রার দলের অধিকারী ও দীর্ঘ কেশধারী বালকগণ; বহুদূর হইতে সমাগত ব্রাহ্মণগণ; দুই একজন সদর আলা মুনসেফ আমীন, সদর আমীন প্রভৃতি দ্বারা বৈঠকখানা পরিপূর্ণ এবং বহুতর তাম্রকূট যন্ত্রে শব্দায়িত। আমার আদরের আবদারের সীমা নাই। অঙ্কে অঙ্কে বিরাজ করিতেছি। কাপড়ওয়ালারা নানা কাপড় দিতেছে, দোকানদারেরা নানাবিধ খেলনা ও খাদ্য সামগ্রী আনিয়াছে; মুনসফ ও সদর আমীন মহাশয়েরা আমাকে কোলে লইয়া মুষ্টি মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা "নজর" দিতেছেন, কেহ ময়ুর, কেহ হরিণ, কেহ খরগোশ, কেহ পাখী আনিয়াছেন। ৯টার সময় পিতা পূজা শেষ করিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। আমার রূপের গুণের ও তেজস্বিতার

প্রশংসার ঝটিকা বহিতে লাগল।"

বিস্তারিত বিবরণের জন্য, নবীন চন্দ্র সেন, 'আমার জীবন', প্রথম ভাগ, *নবীন চন্দ্র রচনাবলী*, প্রথম খন্ড, সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, কলকাতা, ১৩৬৬।

৪২. ওয়েলেসলি এ পরিপ্রেক্ষিতে যে নোটিস জারি করেছিলেন তা হলো–
"from after the 1st January, 1801, no servant shall be deemed eligible to any of the offices herein after mentioned, unless he shall have passed an examination (the nature of which will be hereafter determined), in the laws and regulations and in the languages, a knowledge of which is hereby declared to be an indispensable qualification." ঘোষাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৫।

৪৩. *ঐ*।

৪৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, Carey, W. H., *The Good old Days of Honorable John Company*, (reprint) Kolkata, 1964. তিনি লিখেছিলেন–
"The scheme of the Calcutta college was conceived in wisdom, admirably calculated to awaken the energies of the young servant of the company, who were to diffuse the blessings of British rule over the vast and populous provinces of Hindustan and to imbue their minds with sound and extensive knowledge, as well in the languages of the people they were to govern as in the laws they were called to administer."

৪৫. ভট্টাচার্য্য এরপর যে বাক্যটি লিখেছেন তা মেনে নেয়া অবশ্য কষ্টকর। লিখেছেন তিনি "It also promoted the sense of honesty and integrity amongst its members and went a long way in creating healthy traditions which none of is product could violate without ringing dishonour to the whole batch." p. 418.
দেখুন, Bhattacharya, S, *Dictionary of Indian History*, আরো দেখুন, Danvers, F.C. 'Origin of the East India Company's Civil Service and of Hailbury College', *Memorials of Old Haileybury College*, London, 1893.

৪৬. কোনো একটি ঘটনায় হেইলিবাড়ি সম্পর্কে সমালোচনা হওয়ায় হেইলিবারির পক্ষে একজন প্রাক্তন সিভিলিয়ান একটি পুস্তিকা লিখেছিলেন–
A Civilian, *Letter to East India Company on Hailebury*, London, 1883.

৪৭. Banerjea. Sir Surendranath, *A Natian in Making*. London. 1925. p. 22.

৪৮. অন্নদাশঙ্কর রায়, *জীবন যৌবন*, কলকাতা ১৯৯৯, পৃ. ৫৭।

৫৯. শৈবাল কুমার গুপ্ত, *কিছু স্মৃতি কিছু কথা*, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৩৪-৩৫।

৫০. দেখুন, অশোক মিত্র, *তিনকুড়ি দশ*, কলকাতা, ১৯৯০।

৫১. Dash, Arthur, *Memoirs* (unpublished Mss) British Library.

৫২. J. E. D. Notes for officers proceeding to India. উদ্ধৃত, Allen, Charles. A *Scrapbook of British India 1877-1947*. London. 1977. J. E. D. লিখেছিলেন- "At this port you can only land from a trooper in uniform and with a revolver. Be very careful of men who want to sell or show you 'French photographs". P. 21.

৫৩. *ঐ*।

৫৪. Woodruff. Philip, *The Men who Ruled India*, vol. I. London, 1973. P. 151.

৫৫. বিনয় ঘোষ, 'এলিজা ফের চিঠিপত্র', *কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত*, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ১৮৩।

৫৬. বিনয় ঘোষ, 'হিকির স্মৃতিকথা', *কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ১৯-২০

৫৭. উডরাফ, *প্রাগুক্ত*, ১ খন্ড, পৃ. ১৫৬।

৫৮. 'হিকির স্মৃতিকথা', *ঐ*, পৃ. ২৭।

৫৯. *ঐ*. পৃ. ৫১।

৬০. "Most gentlemen and ladies in Bengal live both, splendidly and pleasantly, the forenoons being dedicated to business, and after dinner to rest, and in the evening to recreate themselves in chairs or palanquins in the fields, or to gardens, or by water in their budgeroes, which is a convenient boat that goes swiftly with the force of oars..."
'Account of Capt. Hamilton' Wheeler, J. Talbeys. *A History of English Settlements in India*. Calcutta. 1878. P.192.

৬১. Mackintosh, James. Travels in Europe, Asia and Africa. 1771-81. Vol. 2. Letter 55 (Calcutta. 23 December. 1778). উদ্ধৃত ঘোষাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৬-১৮৭।

৬২. Darton, F. J. H (ed), 'The Life and Times of Mrs. Sherwood'. ঘোষাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৮।

৬৩. বিনয় ঘোষ, 'এলিজা ফে'র চিঠিপত্র', *কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ১৯৮-১৯৯।

৬৪. বিস্তারিত দেখুন, ঘোষাল ও স্পিয়ারের *পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ*।
৬৫. বিনয় ঘোষ, 'হিকির স্মৃতিকথা', *কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ৩১।
৬৬. বিনয় ঘোষ, 'চিঠিপত্র; এলিজাকে', *ঐ*, পৃ. ১৯৮।
৬৭. বিনয় ঘোষ, 'হিকির স্মৃতিকথা' *ঐ*, পৃ. ৩২।
৬৮. *ঐ*. পৃ. ৩৩।
৬৯. বিস্তারিত বিবরণের বিনয় ঘোষ, 'ডুয়েল', *ঐ*।
৭০. 'এলিজার চিঠিপত্র', *ঐ*, পৃ. ১৮৭।
৭১. 'ভ্রমণ বৃত্তান্ত। ফ্যানিপার্কস', *ঐ* পৃ. ৭৭-৭৮।
৭৩. বিস্তারিত বিবরণের জন্য, *ঐ*।
৭৪. 'টাউন কলকাতার কড়চা', *ঐ*, পৃ. ৪৭৯।
৭৫। *হবসন জবসনে* ১৭৮৮ সালের স্টকডেলের 'ইন্ডিয়ান ভেকোবেলারি' থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন এ ভাবে– "A Gentoo servant employed in the management of commercial affairs. Every English gentleman at Bengal has a Banyan who either acts of himself or as the substitute of some great man or black merchant."
বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, Yule and H. Burnell, A, *Hobson-Jobson*, London, 1903, pp 63-65.
৭৬. *ঐ*, পৃ. ৮৪১।
৭৭. 'টাউন কলকাতার কড়চা', *ঐ*, পৃ. ৫৬৩।
৭৮. *ঐ*, পৃ. ৫৬৪।
৭৯. *ঐ*, পৃ. ৫৬৩
৮০. ভৃত্যদের বেতন-

১৭৫৯	১৭৮৫
খানসামা-৫ টাকা	১০/২৫ টাকা
প্রধান পাচক-৫ টাকা	১৫/৩০ টাকা
কোচওয়ান-৫ টাকা	১০/২০ টাকা
জমাদার-৪ টাকা	৮/১৫ টাকা
খিৎমদগার- ৩ টাকা	৬/৮ টাকা
সর্দার বেয়ারা- ৩ টাকা	৬/১০ টাকা
হরকরা- ২.৫০ টাকা	৪/৬ টাকা
বেয়ারা- ২.৫০ টাকা	৪ টাকা
ধোপা- ৩ টাকা	১৫/২০ টাকা
সহিস- ২ টাকা	৫/৬ টাকা

মশালচি-২ টাকা	৪ টাকা
পরামানিক- ১ টাকা	২/৪ টাকা
হেয়ার ড্রেসার-১.৫০ টাকা	৬/১ ৬ টাকা।

এরা একজন আরেক জনের কাজ করতো না। বিস্তারিত বিবরণের জন্য, *ঐ*।

৮১. ভ্রমণ বৃত্তান্ত। 'ফ্যানি পার্কস', *ঐ*, পৃ. ২৪১।

৮২. 'টাউন কলকাতার কড়চা', *ঐ*, পৃ. ৪৬৫-৪৬৬।

৮৩. স্পিয়ারের *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*। 'এডভেঞ্চারারদের' সম্পর্কে স্পিয়ার লিখেছেন, "... adventurers were men of all nationalities who took service with the various princes of India, both north and south and who tried to carve out fortunes for themselves in the growing political anarchy. p. 82.

৮৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য, Williamson, Capt. Thomas, (preface) to the Europeans in India; *From a Collection of Drawings by Charles D'oyley*, London.

৮৫. চার্লস অ্যালেনের *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*। ডাইভার আরো মন্তব্য করেছেন, "... That insidious tendency to fatalism which lurks in the very air they breathe... an astonishingly rapid waste of nerve tissue, due to the climate and the artificial shifting about life that she leads." p.81.

৮৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য, *The First Years of a Little Girl in Bengal*, London, 1829.

এধরনের একঘেঁয়ে জীবনের বর্ণনা অনেক বইতে পাওয়া যাবে। ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত একটি বইতেও দেখি জীবনযাত্রার খুব একটা হেরফের হয়নি। দেখুন, Wife of a Bengal Civilian, *The Rose and the Lotus or House in England and Home in India*, London, 1853.

৮৭. Cotton, Henry, *Indian and Home Memories*, London, 1911 p. 76.

৮৮. *ঐ*। পৃ. ৭৭।

৮৯. Beveridge, Lord, *India Called Them*, London, 1947, pp. 232-263.

৯০. তিনি লিখেছিলেন "My stay at Mulnath is drawing to a close, and with it I have reason to believe, with regret, the last of my truly gratifying trips to its happy abode-its healthful atmosphere-it picturesque scenery-its agreeable life and interesting doings;- trips which the kindest and most friendly attentions were sufficient and without aid from the natural charms of the place, to render very delightful."

Grant, Coleswarthy, *Rural Life in Bengal*, London, MDCCCLX, P. 201.

৯১. বিভারিজের, *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*, পৃ. ১৯৯।

৯২. কটনের, *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*, পৃ. ৯৯।

৯৩. Dash, A. J. *Unpublished Memoirs*, IOL.

৯৪. Eur. E. 341 *Papers of Tyson, J. D.* IOL.

৯৫. অশোক মিত্র, *তিনকুড়ি দশ*, দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৪।

৯৬. শৈবাল মিত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০৭।

৯৭. অন্নদা শঙ্কর রায়, *যুক্তবঙ্গের স্মৃতি*, কলকাতা, ১৩৯৭, পৃ. ১-২।

৯৮. অশোক মিত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫।

৯৯। *ঐ*, পৃ. ১৫।

১০০. বিস্তারিত, Woodruff. P, *op. cit*, vol. II.

১০১. অশোক মিত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩।

১০২. শৈবালগুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১।

১০৩. Mss Eur. F 180/8, Bell, F.O, *Memoirs of Official Life in India: Bengal 1930-1947*, IOL.

১০৪. বিস্তারিত অশোক মিত্র, *প্রাগুক্ত*।

১০৫. লিখেছেন তিনি– As SDO, it was my experience that superior officers were only too happy to support anything that was proposed and carried out. What I do not remember was any thing in the way of policies, schemes, plans or what have you being initiated, or laid down from above- at district level. Thus the conference in Kushtia and development of health lectures throughout the subdivision of Kalimpong had to be thought out and worked out locally- with the support and assistance of outside authority, but not as the result of their initiative."
Mss. Eur. F 180/13, *Memoirs of Martyn, P.D.* IOL.

১০৬. আসবাবপত্র এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেয়ার খরচ সরকার অবশ্য দিতো কিন্তু তাতে পোষাতো না। Griffith, Sir Percival, *The Raj*, Telephone Transcript, 1972, IOL.

১০৭. "He would have learnt the groundwork of his profession and whatever else might he would be tempted by some meretricious offer to forfeit experience that could never be replaced, and then he would have to make each mistake at least once more." Woodruff. P, *Op. cit*, vol. 11. p-87.

১০৮. *Letter from F.W. Ward to Rev. T. H. Wyndham*, 15. 9. 1903, IOL.

১০৯. "He seems to have just arrived from out of the firmament of

green fields and mango groves that encircles the little station where he lives; or he seems just about to pass away into it again. The shooting howdahs are lying in the veranda, the elephant of a neighboring land holder is swinging his hind foot to and fro under a tree or switching up straw and leaves on his back, a dozen camels are lying down in a circle making bubbling noises... The veranda is full of fat men in clean linen waiting for interviews. They are bankers, shopkeepers and landholders, who have come to "pay their respects", with ever so little a petition as a corolary... Brass dishes filled with pistachio nuts and candied sugar are ostentatiously displayed here and there; the are the ablutions of the would-be visitors. ..they represent in the profuse East the visiting cards of the meager west." বিস্তারিত বিবরণের জন্য Mackay, George, Aberigh, *Twenty one Days in India, being the tour of Sir Ali Baba*, K.C.B, Bangkok, 1998 (first printed in 1896). কালেক্টর অধ্যায়।

১১০. Ex-civilian, *Life in the Mufussil*, vol. I, London, 1878, p. 65.

১১১. ম্যাকের বই ছাড়াও দেখুন, Atkinson, George F, *Curry and Rice*, Kolkata, 2001 (Reprint).

১১২. উডরাফের, *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*, ৭. ৯৫.

১১৩. বেলের *প্রাগুক্ত পান্ডুলিপি*।

১১৪. এই পুরো উপ-অধ্যায়টি মওনিয়ের গ্রন্থের ভিত্তিতে রচিত। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, Maunier, Rene, *The Sociology of Colonies* (ed and trans by Lorimer, E.O), London, Vol. I, 1949.

১১৫. বাবুর নামায় লিখেছিলেন বাবুর-
"Hindustan is a country of few charms. Its people have no good looks; of social intercourse, paying and receiving visits there is none; of genius and capacity none; of manners none..."
Palling, Bruce, *A Literary Companion: India*, London, 1992, p. 11.

১১৬. "But lest this remote country should seem like an earthly paradise without any discommodities; I must need take notice there of many lions, tigers, Wolves, Jackals (which same to he wild Dogs) and many other harmfull beasts... and in their great cities, there are such abundance of bigger hungry Rattes, that they often bite a man as he lyeth an his bed." *ঐ*, পৃ. ১৩।

১১৭. "They were all small slender men, extremely black, but well made, with good countenances and fine features, certainly a handsome race.." *ঐ*, পৃ. ১৫।

১১৮. "Extreme beauty of Bombay harbour!... violent and amazing at the wonderful variety of life and dress here. Exquisite novelties, flowers, trees... the way thither left me nearly mad from sheer beauty and wonder of foliage! O new palms! O flowers! O creatures! O beasts! any thing more overpoweringly amazing cannot be conceived..." *ঐ*, পৃ. ১৭।

১১৯. *ঐ*, পৃ. ১৮।

১২০. উদ্ধৃত, সব্যসাচী ভট্টাচার্য্য, *ব্রিটিশ রাজ্যের অর্থ ব্যবস্থার ভিত্তি*, কলকাতা, পৃ. Lx

১২১. *ঐ*, পৃ. Lxiii.

১২২. Bruce Palling, *ঐ*, পৃ. ৯১।

১২৩. Guha, Ranajit. 'On some Aspect of the Historiography of Colonial India', Guha, Ranajit (ed), *Subaltern Studies I*, Delhi, 1982, p. 9.

১২৪. মীর মশাররফ হোসেন, *মশাররফ রচনা সম্ভার*, প্রথম খন্ড, (সম্পাদনা, কাজী আবদুল মান্নান), ঢাকা, ১৯৭৬। এ খন্ডে উপন্যাস দু'টি সংকলিত হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য এই খন্ডটি দেখুন। উক্তিগুলির জন্য, পৃ. ২০১-২০২।

১২৫. *ঐ*, ৫৬০

১২৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ভারতের শিল্প বিপ্লব ও রামমোহন*, কলকাতা, ১৩৭০।

১২৭. *ঐ*, পৃ. ২০।

১২৮. বইটির নাম-
Description of the character, manners and custom of the people of India, and of their Institutions, Religious and Civil.
উদ্ধৃত, পালিং, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫।

১২৯. Buckland, C.T., *Sketches of the Social Life in India*, London, 1884, p.4.

১৩০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য, Moor, J.C., *Chota Sahib*,

১৩১. উডরাফের *প্রাগুক্ত গ্রন্থের* দ্বিতীয় খন্ড দেখুন বিস্তারিত বিবরণের জন্য।

১৩২. অশোক মিত্র, *প্রাগুক্ত*, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১০-১১।

১৩৩. "1689- "Thus the distracted husband in his *Indian* English confest, *English fashion*, sab, best fashion, have one wife best for one husband, *Ovington*, 326."
বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, *Hobson Jobson*, P. 782.

১৩৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন রহমতুল্লার স্মৃতি চিত্র- Mss Eur F 180/13, *Memoirs of Rahmatullah*, vol. 2, London.

১৩৫. বিস্তারতি বিবরণের জন্য পালিংয়ের *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*।

১৩৬. Ex-civilian, *Life in the Mofussil*, vol. I, London, 1878.

১৩৭. মার্টিয়েনের জন্ম ১৯০৪ সালে, ১৯২৬-২৭ সালে আই সি এস হন, অনেকের মতো, তিনিও ভেবেছিলেন চাকুরির জন্য পাঞ্জাব বেছে নেবেন কিন্তু পরে নেননি।
"accepted Bengal.. an the only right and proper Presidency and the Bangalis as the only people worth knowing." For details, Mss Eur F. 180/13, *Memoirs P.D. of Martyn*, IOL, London.

১৩৮. বিস্তারিত বিবরণের জন্য, Carritt, Michael, *A Mole in the Crown*, Kolkata, 1986.

১৩৯. পালিংয়ের *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*, পৃ. ৩২।

১৪০. Cohn, Bernard S., Cloth, *Clothes and Colonialism: India in the 19th Century*, New York, (Mimeo), 1993 (not for publication).

১৪১. *ঐ*।

১৪২. ড. জুলিয়াস জেফরিস শোলাটুপির আবিষ্কারক। ইডেন এর উত্তরে লিখেছিলেন–
"If any change in rules is to be made it should not in the Lieutenant -Governors opinion, take the shape of further relaxation of existing customs. Indeed, the Lieutenant-Governor thinks that the chief change required, is that some of the native gentlemen, especially native officials, who attend levees and durbars should pay greater attention than heretofore to their customs, and should in this way imitate the European custom of showing respect by not appearing on such occasions in the ordinary clothes in which they have just left their desks or court houses. The new prevailing laxity in this matter may possibly have some bearing on the want of cordiality in the relations between Europeans and Natives, of which such frequent complain is made by those who remember a different state of things. Attention to costume was a form of respect in which the

forefathers of present generations were never deficient. In giving up customs of appearing with head covered on public occasions. Native gentlemen are adopting neither the customs of West nor of the East, and the movement is one which the Lieutenant-Governor deprecates and which he is certainly in no way prepared to encourage."

Choudhuri, N. C, *Culture in a Vanity Bag*, Bombay, 1976, pp. 59-60.

১৪৩. স্যার জোসেফ ফেরার ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থ 'ইউরাপিয়ান চাইল্ড লাইফ ইন বেঙ্গলে' মন্তব্য করেছিলেন- "The chid must be sent back to England or will deteriorate physically and morally-physically, because it grows up slight, weedy, and delicate, over-precious it maybe, and with a general constitutional feebleness not perhaps so easily defined as recognised, a some thing expressed not only in appearance, but in the very intonation of the voice; morally because he learns from his surroundings much that is undesirable, and has a tendency to become deceitful and vain, indisposed to study... in short, with a tendency to deterioration, which... can only be avoided by removal to the more bracing and healthy (moral and physical) atmosphere of Europe."

এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, Harrison, Mark, *Climates and Constitutions*, New Delhi, 1999.

১৪৪. "Clothes, whatever their function and meaning to the British in the 19th century India, were a protective desire against the manifest danger of foul air emanating from marshes, swamps, rice fields, and the onion exhalations of humans."

কোহন, *প্রাগুক্ত*; অ্যালেন, *প্রাগুক্ত*।

১৪৫. "The European station is laid out in large rectangles formed by side roads. The native city is an aggregate of houses perforated by tortuous paths... The Europeans live in detached houses, each surrounded by walls enclosing large gardens, lawns, out offices. The natives live packed in squeezed up tenements, kept from falling to pieces by mutual pressure. The handful of Europeans occupy four times the space of the city which contains tens of thousands of Hindus and Mussulmen." উদ্ধৃত King, Anthony D., *Colonial Urban Development: Culture, Social power and*

Environment, London, 1976. p.124.

১৪৬. Cantonment "has become almost appropriated as Anglo Indian, being so constantly used in India and so little used elsewhere. It is applied to military stations in India built usually on a plan which in originally that of a standing camp or cantonment." বিস্তারিত *Hobson Jobson*.

১৪৭. *ঐ*।

১৪৮. বিস্তারিত বিবরণের জন্য, মুনতাসীর মামুন, *সিভিলিয়ানদের চোখে ঢাকা*, ঢাকা, ২০০৩।

১৪৯. বিস্তারিত বিবরণের জন্য কিংয়ের *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*।

১৫০. উদ্ধৃত, *ঐ*, পৃ. ১৬২।

১৫১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য, বিনয় ঘোষের *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*।

১৫২. *Memoirs of Rahmatullah*.

১৫৩. Mss Eur F 180. 166 *Memoirs of G.P. Woodford*, IOL.

১৫৪. বিস্তারিত বিবরণের জন্য, Bellow, S. S. *Paternal Government*, Lahore, 1899.

১৫৫. "It is enabling to a man's character to feel that (his maintenance provided for) he is working, not for himself, but for the good of large numbers of subject to his administration not withstanding red tape, the personal powers of civilians for good or evil is very great indeed. I can honestly say that, with one or two exceptions, from the highest to the lowest, all the members of my service whom I have known have felt this deeply, and acted accordingly." Ex-civilian, *Life in the Mofussil*, vol. II, London, 1878, p. 281.

১৫৬. Lunt, James, 'Introduction', Kinciad, Dennis, *British Social Life in India 1608-1937*. London, 1973, (2nd ed).

১৫৭. Atkinson, George F. *Curry and Rice: the Ingredients of Social Life at our Station in India*, Hyderabad, 2001 (reprint)

১৫৮. বিস্তারিত দেখুন, Fraser, Lieutenant F. J., *The Station Cat: A Sketch of Mofusil Life in One Act*, Calcutta, 1893.

১৫৯. বিস্তারিত দেখুন, এক্স সিভিলিয়ানের *প্রাগুক্ত গ্রন্থের* দ্বিতীয় খন্ড।

১৬০. ড্যাশের উল্লিখিত *স্মৃতিকাহিনীর পান্ডুলিপি*।

১৬১. উদ্ধৃত, পেলিং, *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*, পৃ. ৮৮-৮৯।

১৬২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, জওহরলাল নেহেরু, *আত্মচরিত* [সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার অনুদিত] কলকাতা, ১৩৫৫।

১৬৩. স্পিয়ারের *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*, অষ্টম অধ্যায়।

১৬৪. টাইসনের *প্রাগুক্ত পান্ডুলিপি*।

১৬৫. বিস্তারিত, A Retired Bengal Civilian, *A Glance at the East*, London, 1857.

১৬৬. বিভারিজ আরো লিখেছিলেন– "It certainly seems to me that those who wanted to keep natives out of the civil service, and for that purpose lowered the age of admission were at least logical in their procedure, for it is only on the supposition that the interests of empire require the civil service, with an insignificant exception or two, to be composed of English men, that the competitive examination in England can be defended." বিস্তারিত দেখুন, বিভারিজের *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*। আরো দেখুন, Pratt, Hodgon, 'The Indian Civil service', *A Second Selection of Articles and Letters on Indian Question*, London, 1857.

১৬৭. "It is impossible to conceive of more brutalizing procedure and it is with shame and sorrow I record that I was addicted to it." দেখুন কটনের *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*।

১৬৮. Mss Eur. F. 180/11, *Personal Papers of Mc-Inerny, E. F.* IOL.

১৬৯. Fraser, Lovat, *India under Curzon and After*, London, 1912, pp. 267-268.

১৭০. ড্যাশের পূর্বোল্লিখিত *আত্মস্মৃতির পান্ডুলিপি*।

১৭১. ফ্রেজারের *প্রাগুক্ত গ্রন্থ*।

১৭২. সিভিলিয়ানদের পার্টির একটি মেনু দেখা যাক, তাহলে বোঝা যাবে কেনো পার্টির জন্য সবাই অপেক্ষা করতো, এই মেনুটি পুনার। অন্যান্য খানে হয়তো পদ খানিকটা কম হতো কিন্তু জাঁকালো ভাবটা ছিলোই–
Olives Farcies, Soup Clear Turtle; Fish, Salman sauce Tartare; Entrees-Guinea-Fowl a la Neapolitaine, Lamb cutlets, Joints, Roast saddle of Mutton, Cold Roast Turkey. Second Course: Braized Ham, Pudding, Byculla soufflé; Savoury: Angels on Toast, Strawberry Ice. Desert.
Menu for the Indian Civil Service Dinner held at Poona on 3 September 1904. The menu is decorated with sketches depicting variety of duties undertaken by Indian Civil Servant. From the *Papers of Rea Martin, James* ICS 1900-1932, IOL.

১৭৩. Ex-Civilian, *op. cit*, p.171.

১৭৪. যেমন, Williamson, Capt. T. *Oriental Field Sports*, London,

1807; Gouldsbury, C.E, *Tigerland*, London, 1913, Baker, Edward B, *Sports in Bengal and How When and Where to Seek it*, London, 1886; Ladseer, P.C. Trench, *Tiger Hunting or a Day sport in the East*, London, 1836; Simson, Frank. B, *Letters on Sport in Lower Bengal*, London, 1896.

১৭৫. হবসন জবসনে দেখছি, ১৮৪৮ সালে 'পিগ-স্টিকিং, শব্দটি পাওয়া যাচ্ছে। 'ভ্যানিটি ফেয়ার' থেকে তিনি উদ্ধৃত করেছেন। ১৮৪৮ সালের একটি বিবরণ– "Swankey of the Body-Guard himself, that dangerous youth, and the greatest buck of all the Indian army now on leave, was one day discovered by Major Dobbin, tete-a-tete with Amelia and describing the sport of Pigsticking to her with great humour and eloquence..." *Hobsan-Jobson*.

১৭৬. ড্যাশের অপ্রকাশিত *আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপি*।

১৭৭. Archer, Mildred, *British Drawings in the India Office Library*, vol. I and II, London, 1969; Archer, Mildred, *Company Drawings in the India Office Library*, London, 1972; Kattenhorn, Patricia, *British Drawings in the India Office Library*, vol. III, London, 1994.

১৭৮. বিস্তারিত বিবরণের জন্য, উপরোল্লিখিত আর্চারের *গ্রন্থের দুটি খন্ড* দেখুন।

১৭৯. এক্স সিভিলিয়ানের *প্রাগুক্ত* গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৮২।

১৮০. পেলিংয়ের *প্রাগুক্ত* গ্রন্থে উদ্ধৃত।

১৮১. বিস্তারিত বিবরণের জন্য, ভেলাম ভান সেন্দেল, 'ভূমিকা', *দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় ফ্রান্সিস বুখানন (১৭৯৮)*, ঢাকা, ১৯৯৪।

১৮২. ফ্রানসিস বুখাননের প্রকাশনার একটি তালিকা দিচ্ছি উপর্যুক্ত গ্রন্থ থেকে– 'A Comparative Vocabulary of some of the Languages spoken in the Burman Empire, *Asiatick Researches* (Calcutta), Vol. 5 (180), 219-240:-' On the religion and literature of the Burmas', *Asiatick Researches*. (Calcutta), Vol. 6 (1801), 163-308.

তাঁর রিপোর্টের পাণ্ডুলিপি 'Extracts and Observation Respecting the Dominions of Ava' লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে (IOR MSS. Eur. D. 106), অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকে। এটা তাঁর পরবর্তী 'Draught of the Burmah Territories and Eastern Countries' নামক পাণ্ডুলিপির তথ্যসূত্ররূপে ব্যবহৃত হয়।

Francis Buchanan, *A Journey from Madras through the Countries of Mysore, Canara and Malaber performed under the orders of the Most Noble the Marquis of Wellesley....*, (London,

1807), 3 Vols.
-, *Journey through the northern parts of Kanara.... in the year 1801 between 18th February and 17th March....; introduced by S. Silva* (Karwar: Kanara Renascence Series No. 1, 1956).
Francis Buchanan, *An Account of the Kingdom of Nepal, and of the territories annexed to its dominion by the House of Gorkha* (Edinburgh: Constable, 1819); a reprint, with an introduction by Marc Gaborieau, was published by Manjusri in New Dehli in 1971;
- *Prodromus florae Nepalensis; sive, Enumeratio vegetablium quae in itinere per Nepaliam proppie dictated regiones counterminas, ann. 1802-1803, detexit atque legit, D. D. Franciscus Hemilton, olim Buchanan: accedunt Plantaea D. Wallich nuperius missae secundum methodi naturalis normam disposuit atque descipsit David Don* (Londini: Veneunt apud J. Gale, 1825).
সম্পূর্ণ রেকর্ডপত্র রক্ষিত আছে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতেঃ (IOR MSS. Eur, D. 75). নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো প্রকাশিতঃ
Francis Buchanan, *A geographical, statistical and historical description of the district, or Zila, of Dinajpur in the province, or Soubah, of Bengal* (Calcutta: Baptist Mission Press, 1833);
(Robert) Montgomery Martin, *The history, antiquities, topography and statistics of Eastern India; comprising the districts of Behar, Shahabad, Bhagulpoor, Gorukpoor, Dinajepoor, Puraniya, Ronggopour, and Assam....* collected from the original documents at the E. I. House London, 1838). 3 Vols. Reprint by Cosmo Publications in Delhi in 1976);
Francis Buchanan (afterwards Hamilton), *An Account of the district of Purnea in 1809-1810*; edited from the Buchanan MSS in the India office Library...., edited by V. H. Jackson (Patna: Bihar and Orissa Research Society, 1928).
-, *An Account of the district of Shahabad in 1809-1810....* printed from the Buchanan MSS in the India office Library, with the permission of the secretary of state for India in Council, edited by A. Bangerji-Sastri (Patna: Bihar and Orissa Research Society, 1939).
-, *An Account of the districts of Bihar and Patna in 1811-12*; printed from the Buchanan MSS in the India Office Library....

(Patna: Bihar and Orissa Research Society, 192-), 2 Vols.

-, *An Account of Assam with some notices concerning the neighboring territories; first compiled in 1807-1814* by Francis Buchanan, M.D. F.R.S., edited by S.K. Bhuyan (Gauhati: Government of Assam, Department of Historical and Antiquarian Studies/Narayani Handique Historical Institute, 1940);

Journal of Francis Buchanan, afterwards Hamilton, Kept during the Survey of the District of Shahabad in 1812-1813, edited with notes and introduction C.E.A.W. Oldham (Patna: Superintendent, Government printing, Bihar and Orissa, 1926);

Journal of Francis Buchanan, afterwards Hamilton, Kept during the Survey of the District of Bhagalpur in 1810-1811, edited with notes and introduction by C.E.A.W. Oldham (patna: Superintendent, Government Printing, Bihar and Orissa, 1930).

ফ্রান্সিস হ্যামিলটন, *Genealogical tables of the deities, princes, heroes, and remarkable personages of the Hindus extracted from the sacred writings of that people* (Edinburgh: W. Aitken, 1819), 2 Vols;

-, *An Account of the fishes found in the river Ganges, and its branches* (Edinburgh, 1822), 2 Vols.

১৮৩. টেইলরের পক্ষে পাটনার খ্রিস্টানরা লিখেছিলেন– "From the entire body of the non-official christin resident of Patna.

Sept 10th, 1857

When whole of Patna was nearly shipwrecked, at the moment when the rebels rose to Dinapore, and before that, when the mischievous machinations of Peer Ali and his accomplices had endangered not only our own city, but nearly the whole province, who opposed and braved the storm? Whose were there wise, far seeing and statesman life plans which saved us then? and who so kindly and considerately threw open his house to receive the certain populace at the hour of the greatest peril? With one voice, we answer it was you....

দেখুন, *Extracts of Letters in the case of Mr William Tayler, late Commissioner of Patna*, From 1857 to 1877, London. 1878 (?)

১৮৪. Peter Penner, 'Introduction', Beames, John, *Memoirs of a Bengal Civilian*, Delhi, 1984 (reprint).

১৮৫. Bevan, H, *Thirty years in India*, London, 1839, pp. 84-85.

পরিশিষ্ট- ১

ভাগ্যবান এক ইংরেজের আত্মকাহিনী

পূর্ব কথা

আত্মজীবনীর প্রতি আগ্রহ আমার অনেক দিনের। তাই, লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে পুরনো নথিপত্র ঘাঁটার সময় পুরনো কোনো আত্মজীবনী পাওয়া যায় কিনা তার খোঁজ করছিলাম। একদিন, এক আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপি পেলাম। হাতে লেখা পাণ্ডুলিপিটি গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়নি। উল্টেপাল্টে দেখা গেল, লেখক ক্লাইভের নেতৃত্বে সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে পলাশীর যুদ্ধে লড়েছিলেন। তখনই পাণ্ডুলিপিটি পড়া শুরু করি এবং বলা যায় এক নিঃশ্বাসে শেষ করে ফেলি। অবিশ্বাস্য সব ঘটনাবলীর বর্ণনা আছে পাণ্ডুলিপিটিতে। পড়তে পড়তে এক সময় মনে হয় আসলেই কি এটি আত্মজীবনী না নিছক কাহিনী।

পাণ্ডুলিপিটি ক্যাটালগ নং ঈ ২৪৮, নাম 'দি ফরচুনেট ইংলিশম্যান' বা 'ভাগ্যবান ইংরেজ'। লেখক মি. হার্ভে। পাণ্ডুলিপিটিতে কোনো সন তারিখ নেই। তাই ঠিক কবে হার্ভে আত্মজীবনীটি লিখেছেন তা বলা যাচ্ছে না। তবে, কাগজের ওয়াটার মার্ক পরীক্ষা করে দেখা গেছে সেটি ১৮০০ সালের। সুতরাং ধরে নেয়া যেতে পারে ঐ সময় হার্ভে তাঁর জীবন কাহিনী লিখেছেন। পাণ্ডুলিপিটি ইন্ডিয়া অফিস কিনেছে ১৯৭১ সালে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আর কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

পরিচ্ছন্ন ইংরেজি হাতের লেখা হার্ভের। পুরনো ধাঁচের আলঙ্কারিক ইংরেজি নয়। মাঝে মাঝে পেন্সিলে কিছু সম্পাদনার চিহ্ন আছে। এবং পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ। তাহলে কি লেখার সময়ই হার্ভে কাউকে দিয়েছিলেন সম্পাদনার জন্যে [অবশ্য পরেও তা হতে পারে] এবং তারপর পরলোকগমন করেছিলেন? ফলে, অসম্পূর্ণ থেকে যায় পাণ্ডুলিপিটি। এবং যিনি ইন্ডিয়া অফিসকে বিক্রি করেছেন পাণ্ডুলিপিটি তিনি হয়তো উত্তরাধিকার সূত্রে পুরনো কাগজপত্রের মধ্যে এটি খুঁজে পেয়েছিলেন।

নবাব সিরাজউদ্দৌলার বা পলাশীর যুদ্ধের ইতিহাসের ওপর যেসব লেখা প্রকাশিত হয়েছে সেখানে উৎস হিসেবে কোথাও এটি ব্যবহৃত হয়নি। কারণ অবশ্য

অনুমান করা যায়। পাণ্ডুলিপিটিতে সিরাজউদ্দৌলা বা পলাশীর যুদ্ধ সম্পর্কে তেমন নতুন কোনো তথ্য নেই। অষ্টাদশ শতকের বাংলার সমাজের ওপর লেখা কোনো বইয়ে এটি ব্যবহৃত হয়েছে কিনা তা আমার জানা নেই। না হওয়ারই কথা। কারণ, হার্ভে যেসব কাহিনীর বর্ণনা করেছেন সেগুলি অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য কিনা সন্দেহ হতে পারে। কারণ, ঐ সময়ের বাংলার সমাজ ইতিহাসের যে চিত্র আমরা পাই হার্ভে বর্ণিত ঘটনাবলী বহুলাংশে তার বিপরীত।

তাহলে হার্ভে কি নিছক একটি কাহিনী লিখতে চেয়েছিলেন? কিন্তু পাণ্ডুলিপিটি শুরু থেকে পড়লে তো তা মনে হয় না। বরং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকরি বা তৎকালীন কর্মস্থলের যে অবস্থা হার্ভে বর্ণনা করেছেন তার সঙ্গে মিল আছে গবেষক/ঐতিহাসিকের লেখায়। যেমন, রাইটাররা তখন ব্যক্তিগত ব্যবসা করতেন, হার্ভেও টাকা দাদন দিতেন তাঁতীদের। হিন্দু ধর্ম বা দেশীয়দের ধর্মকর্ম সম্পর্কে অবজ্ঞা ছিল তাদের। হার্ভেরও সেই উন্নাসিক ভাব ছিল। কিন্তু এরপর যে সব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তার অনেকগুলি অতিরঞ্জন মনে হতে পারে। যেমন হার্ভের বন্ধু লুইসের ব্রাহ্মণ কন্যা বিবাহ। এটা ঠিক, অনেক ইংরেজ দেশীয় কন্যা বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কন্যা একজন ইংরেজ তনয় বিয়ে করেছেন এরকম তথ্য বিরল। বিশেষ করে পুরোহিতের ঘরে যে পাশ্চাত্য উদার আবহাওয়ার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, তৎকালীন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তা বিশ্বাস্য নয়। আবার অন্যদিকে রাজদরবারের যে রাজনীতির বর্ণনা পাই সেটা বিশ্বাসযোগ্য। তাহলে কি হার্ভের আত্মজীবনীটিতে কল্পনার পর্যাপ্ত মিশেল আছে? কে জানে? সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটি পেলে হয়তো এসব প্রশ্নের মীমাংসা করা যেতো। তবে, কট্টর গবেষকরা ইতিহাসের উপাদান হিসেবে হার্ভের আত্মজীবনীর না হয় কোনো মূল্য নাই দিলেন কিন্তু আমরা সাধারণ পাঠকরা তো নিছক কাহিনী হিসেবেও আত্মজীবনীটি উপভোগ করতে পারি। সে জন্যই হার্ভের আত্মকাহিনী ভিত্তি করে রচিত হয়েছে নিবন্ধটি।

পাণ্ডুলিপির প্রথম ৫২ পৃষ্ঠার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে শুরুতে। এরপর থেকে শেষ পর্যন্ত (৯৪ পৃষ্ঠা), যেখানে বাংলার ঘটনাবলীই মুখ্য সে অংশের ওপর গুরুত্বারোপ করেছি বেশি। উদ্ধৃতি চিহ্নের অন্তর্ভুক্ত অংশসমূহ সরাসরি অনুবাদ এবং সে ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীনতা নেয়া হয়েছে।

হার্ভের ছেলেবেলা ও কলকাতা আগমন

হার্ভের জন্ম প্লাইমাউথের এক অখ্যাত গ্রামে। তার বাবা ছিলেন গ্রামের গির্জার সাধারণ পুরোহিত। বেতন ছিল বছরে পঁয়তাল্লিশ পাউন্ড মাত্র। সাধারণ পুরোহিত থেকে পরে তিনি উন্নীত হয়েছিলেন গির্জার প্রধান পুরোহিতে। বেতনও বৃদ্ধি

পেলো। বছরে পেতেন তখন তিনি একশো ত্রিশ পাউণ্ড। অবস্থার একটু উন্নতি হলে বিয়ে করলেন তিনি এক কৃষক কন্যাকে। এ বিয়ের জন্য তাঁকে আবার একশো পাউণ্ড যৌতুক দিতে হয়েছিলো। দুই ছেলে দুই মেয়ের জনক ছিলেন তিনি। হার্ভের বাবার বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খরচও বাড়লো এবং এক সময় দেখা গেল ঋণভারে তিনি জর্জরিত। এরি মধ্যে রোগে ভুগে মারা গেলেন হার্ভের মা। হার্ভের বোনের বয়স ছিল পনেরো। সংসারের ভার সেই বোনই তুলে নিলো। হার্ভের বাবা হার্ভেকে ল্যাটিন শিখিয়েছিলেন। স্কুলের মাস্টার শিখিয়েছিলেন অংক। সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে নিজে পড়েই হার্ভে যা জেনেছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সামর্থ্য হার্ভের ছিল না। পরিবারের সবাই মিলে তখন ঠিক করলো, হার্ভের জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চাকরিই উত্তম। হার্ভের চাকরির জন্য আবেদন করা হলো চার্চের পক্ষ থেকে এবং কোম্পানি সাড়াও দিলো সে আবেদনে। রাইটার হিসেবে নিয়োগ পেলেন হার্ভে। লন্ডনের গাওয়ার স্ট্রিটে এক কেন্দ্রে বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ নিলো হার্ভে। তাকে পরামর্শ দেয়া হলো 'ফ্রেঞ্চ ও ফেনসিং' বা ফরাসি ভাষা ও তরবারি চালনা শিক্ষা নিতে। এর জন্যে অর্থ দরকার। এবং হার্ভের পরিবার প্রায় সর্বস্ব বিক্রি করে তাকে একাডেমিতে পাঠালো প্রয়োজনীয় সব শিক্ষা নিতে। সব শেষ হলে, এক সুন্দর সকালে হার্ভে জাহাজে চপে রওয়ানা হলে ভারতবর্ষের দিকে।

এ পর্যন্ত হার্ভে যা লিখেছেন তাতে কোনো অতিরঞ্জন নেই। আরো অনেক ইংরেজ সিভিলিয়ানের জীবনী বা আত্মজীবনী পড়ে দেখেছি, অজ্ঞাত অখ্যাত গরিব গ্রামে থাকতেন তারা। বাবা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুক্ত ছিলেন গির্জার সঙ্গে। এবং ভদ্র উপার্জনের জন্য তারা রাইটারের চাকরির স্বপ্ন দেখতেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালনা বোর্ডের সঙ্গে গির্জার সম্পর্ক ও প্রভাব ছিলো। এবং গির্জার সঙ্গে যারা জড়িত ছিলেন তাদের ছেলেমেয়েদের চাকরি যোগাড় করে দেয়ার তদবির গির্জার কর্তা ব্যক্তিরাই করতেন। রাইটারদের প্রশিক্ষণের জন্য কিছু স্কুলও ছিলো। এবং প্রায় ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ, যাবার প্রস্তুতি, ভাড়া সব মিলিয়ে সে আমলে খরচ কম ছিল না। তবুও সম্পত্তি বিক্রি করে অনেকে সে খরচ দিতেন। কারণ স্বপ্ন দেখতেন, রাইটার হয়ে একবার ফেরত এলে সব ফেরত আসবে। যেমন, আজকের বাংলাদেশে সর্বস্ব বিক্রি করে অনেকে ছেলেকে পাঠান মধ্যপ্রাচ্যে।

যাক, আবার ফিরে আসি হার্ভের প্রসঙ্গে। জাহাজে উঠে হার্ভের মনে হলো, তার মেধা ও কর্মশক্তির তুলনা নেই। সবার এখন উচিত তার দিকে লক্ষ্য রাখা। তবে, তার ভাষায়, 'ভাগ্যিস, এরপরই কিছু শিক্ষা হলো যা নমিত করলো আমার অহংবোধকে।'

জাহাজের অন্য যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন একজন বয়স্ক মহিলা ও তার তরুণী

ভাইঝি। যাচ্ছেন তারা মুসলিপট্টম। হার্ভের ধর্মীয় পটভূমি আকৃষ্ট করলো মহিলাকে কিন্তু হার্ভের পছন্দ ভাইঝিকে। তরুণী দহরম মহরম শুরু করলো হার্ভের মতোই একজন তরুণ রাইটারের সঙ্গে। নাম তার লুইস। একদিন কেবিনে ধর্মবিষয়ক আলোচনার সময় হার্ভে অপমান করলো লুইসকে। কেবিন ছেড়ে তখনি বেরিয়ে গেলো লুইস। হার্ভে খোলা তলোয়ার নিয়ে ধাওয়া করতে চাইলে লুইসকে। জাহাজের ক্যাপ্টেন তখন জড়িয়ে ধরলেন হার্ভেকে এবং তারপর দু'জনকেই আটকের আদেশ দিলেন। সন্ধ্যায় অবশ্য দু'জনকে ডেকে আবার সব মিটমাট করে দিলেন।

এরপর, একদিন হার্ভে গল্প করছেন সেই মহিলার সঙ্গে। আচমকা জাহাজ দিক বদল করলো। তাল সামলাতে না পেরে মহিলা পড়ে গেলেন ডেকে, আর হার্ভে তার ওপর। মহিলার পোশাক আলুথালু। দু'জনেই আবেগে খানিকটা উদ্বেলিত। এমন সময় ভাইঝি এসে উপস্থিত সেখানে। সে শুধু বললো, 'হা ঈশ্বর!' মহিলা সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে চিৎকার করতে লাগলেন। তিনি যা বলছিলেন তার মূল কথা হলো, হার্ভে তাকে ধর্মের নামে ভাওতা দিয়েছে; শুধু তাই নয়, এখন চাইছে তাকে ধর্ষণ করতে। আশপাশের নাবিকরা মহিলাকে চাইছে সামাল দিতে আর বলছে, দোষটা হার্ভের নয়। ডাক পড়লো ক্যাপ্টেনের। সব শুনে তিনি হাসলেন। কিন্তু এর ফলে হার্ভের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেলো লুইসের। জাহাজ থামলো উত্তমাশা অন্তরীপে। ভালোই কাটলো সেখানে। তারপর আর কোনো ঝামেলা হয়নি। হার্ভেদের জাহাজ পৌঁছলো মাদ্রাজ। সময় তখন আনুমানিক ১৭৫৩ সাল।

রাইটারদের মধ্যে ক্লাইভ তখন বিখ্যাত। হার্ভের ভাষায়, ক্লাইভ তখন তাঁর 'ব্রিলিয়ান্ট ক্যারিয়ার' শুরু করেছেন। হার্ভের ইচ্ছে ছিলো ক্লাইভের সঙ্গে কাজ করার। কিন্তু অনুমতি মিললো না। মাদ্রাজে থাকতে হলো কিছুদিন। তারপর তাকে বদলি করা হলো কলকাতায়।

কলকাতায় এসে ফের লুইসের সঙ্গে দেখা। জমে গেলো দু'জন। তারা দু'জন নিজেদের সামান্য পুঁজি একত্র করে খাটাতে লাগলেন যা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সব রাইটাররাই করতো। কারণ, তাদের বেতন ছিল খুবই কম। তবে, হার্ভে মনোযোগ দিয়ে কাজও করতে লাগলেন। পুঁজি খাটিয়ে বাড়তি যে আয় হতে লাগলো তা দিয়ে রাখলো কৃষ্ণ ভৃত্য এবং পালকি। পানাহার আর প্রেমে হয়ে উঠলো মত্ত।

কলকাতার এক গ্রামে একদিন

হার্ভে আর লুইস একদিন গেল কলকাতার কাছে এক গ্রামে। গ্রামের নাম অবশ্য হার্ভে উল্লেখ করেনি। তবে তার বিবরণ দেখে মনে হয়, গ্রামটি ছিল তাঁতীদের।

অর্থাৎ তারা দু'জন দাদন দিতো হয়তো তাঁতীদের বা সহজ কথায় বাংলার রমরমা বস্ত্র ব্যবসায় তারা টাকা খাটাচ্ছিলো। অনুমান করে নিতে পারি অন্য রাইটারদের মতো হার্ভে আর লুইস ভাঙা ভাঙা বাংলা বা হিন্দুস্থানী বলতে পারতো।

ব্যবসার কাজকর্ম সেরে দু'জনে প্রধান তাঁতীর সঙ্গে আরক খেতে খেতে ধর্মালোচনা শুরুর করলো। হার্ভে এক পর্যায়ে যাচ্ছেতাই বলে গালিগালাজ করলো হিন্দু ধর্মকে। প্রধান তাঁতী এবং আশপাশে যারা ছিল তারা কেউ কিছু বললো না। তারপর দু'জন হাঁটতে বেরুলো এক জায়গায়। দেখলো, অনেকে এক মূর্তিকে প্রণাম করছে। হার্ভে হাতের ছড়ি দিয়ে দু'ঘা দিলো মূর্তিটিকে, সঙ্গে থুতু দিতেও ভুললো না। তারপর হঠাৎ কিছু বোঝার আগেই দেখা গেল লোকজন তাকে ঘিরে ফেলেছে এবং পাঁজাকোলা করে নিয়ে যাচ্ছে গঙ্গারদিকে ডুবিয়ে মারতে। উত্তেজিত লোকজন হার্ভেকে ছুড়ে ফেলে দিলো গঙ্গায়।

হার্ভে ভাসতে ভাসতে গঙ্গার অপর তীরের কাছাকাছি পৌঁছলো। দেখলো এক তরুণী গঙ্গার তীরের কমলা বাগানে বসে বই পড়ছে। হার্ভে চিৎকার করে আবেদন জানালো সাহায্যের। তরুণীটি হার্ভেকে দেখে দ্রুত চলে গেল ঘরের ভেতর, ফিরলো দু'জন চাকর নিয়ে। তারা গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে উদ্ধার করলো হার্ভেকে। তরুণীটি নির্দেশ দিলো হার্ভেকে ঘরে নিয়ে যেতে। এবং তরুণী তারপর নিজেই শুশ্রূষা করলো হার্ভের।

অন্যদিকে লুইস হার্ভেকে খুঁজতে খুঁজতে এসে পৌঁছলো তরুণীটির বাড়িতে। দেখা হলো দুই বন্ধুর। লুইস জানালো, তার কর্মকাণ্ড সবই জানানো হয়েছে তরুণীটিকে। চাকর দু'জন তখন হার্ভের কাপড় ধুচ্ছিলো। এ কথা শুনে তারা হার্ভের কাপড় ফেলে দিয়েছে গঙ্গায় আর নিজেরা স্নান করে পবিত্র হয়েছে। লুইস আরো জানালো, তরুণীটি ভালো হিন্দুস্তানি এবং ফরাসি জানে।

হার্ভে সুস্থ হলে তরুণীটি হার্ভেকে নিয়ে গেল তার বাবার কাছে। লুইসও ছিল সঙ্গে। জানা গেল, যে মন্দিরে হার্ভে কাণ্ডটি করে এসেছে তিনি সেই মন্দিরের পুরোহিত। তিনি বললেন হার্ভেকে--

'যুবক আমি তোমার আর আমার দেশবাসী, উভয়ের জন্যেই দুঃখিত। ঈশ্বর সম্পর্কে তোমাদের দু'পক্ষের ধারণা একই রকম। যা হোক আর যেন এ রকম না হয়। ক্ষমা করে দাও পরস্পর পরস্পরকে। .... দেখি মেয়ে জলদি খাবার দাও।'

খাবার আসর বসলো। প্রথম পুরোহিত আমন্ত্রণ জানালো তাদের মদ খেতে। খাবার খেতে খেতে শুরু হলো খোলামেলা আলোচনা। ধর্ম নিয়ে শুরু হলো তুমুল আলোচনা। তরুণীটির সঙ্গে বেশ জমে গেল লুইসের।

এরপর প্রায় তাদের সঙ্গে দেখা হতো। তরুণী ও মন্দিরের পুরোহিতের সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিলো তাদের মধ্যে। কয়েক বছর পর লুইস বিয়ে করলো

মেয়েটিকে। হার্ভেকে ইতোমধ্যে পাঠানো হলো সুরাট ও পোগোতে। সুরাটে এক বছর ছিলো হার্ভে।

কলকাতার পথে আবার

'আমি যখন বাংলায় ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছি', হার্ভে লিখেছে, 'তখন খবর এল সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। সিরাজ দখল করে নিয়েছেন কলকাতা এবং ভয়ানক অন্ধকূপ হত্যা ঘটেছে। লুইসের চিঠি এসব খবর কনফার্ম করলো। লুইস আরো জানালো, সেখানে আরো কয়েকজন দুর্ভাগার সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে আমাদের বন্ধু সোরেলের। আর সে নিজে সেই গ্রামে তার প্রিয়তমা আরাত্তির [আরতি?] সঙ্গে দু'একদিন বেশি থাকাতে এড়াতে পেরেছে এ দুর্ঘটনা। এ ঘটনায় আমাদের যে পুঁজি নজরে পড়ার মতো ফেঁপে উঠেছিলো তা মিলিয়ে গেল বুদবুদের মতো।'

এখানে উল্লেখ্য যে, সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করেন জুন, ১৭৫৬ সালে। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের পতন ঘটে ২০ জুন ১৭৫৬ সালে। দুর্গের গভর্নর ছিলেন তখন হলওয়েল। নবাব ইংরেজদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেননি বরং বেশকিছু ইংরেজ নবাবের সৈন্যদের প্রহরায় দুর্গেই থেকে যায়।

ড্রেকের বিবরণ থেকে জানা যায়, দুর্গের পতনের পরদিন রাতে, দুর্গের ভেতর মদ খেয়ে মাতাল হয়ে কিছু ইংরেজ উচ্ছৃঙ্খল আচরণ শুরু করে, অভদ্র ব্যবহার করে প্রহরীদের সঙ্গে। নবাব ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের একটি ঘরে আটকে রাখার নির্দেশ দেন। যে ঘরটিতে উচ্ছৃঙ্খল ইংরেজদের আটকে রাখা হয়েছিল দৈর্ঘ্যে তা ছিল আঠার ফুট এবং প্রস্থে চৌদ্দ ফুট দশ ইঞ্চি। ঘরটির নাম ছিল 'ব্ল্যাকহোল' বা 'অন্ধকূপ'। এবং ইংরেজরাই তাদের উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যদের শাস্তি দেয়ার জন্য ঘরটি ব্যবহার করতো। হলওয়েলকেও আটকে রাখা হয়েছিলো সেখানে। পরদিন মুক্তি পেল বন্দিরা। এ ঘটনা অবলম্বন করে হলওয়েল রটালেন যে, অন্ধকূপে আটকে রাখা হয়েছিল ১৪৬ জনকে এবং পরদিন বেঁচে ছিল মাত্র ২৩ জন। ইংরেজদের মধ্যে 'অন্ধকূপ হত্যা' প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলো। এখানে বলে রাখা ভালো, জে. জেড হলওয়েল ছিলেন ইংরেজ জমিদার। সিরাজউদ্দৌলা যেদিন ফোর্ট উইলিয়াম আক্রমণ করেন তার আগের দিন হলওয়েল কলকাতার গভর্নর ও সামরিক প্রধানের পদ লাভ করেন। হলওয়েলের কাহিনী থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি দেয়া যাক–

'....সর্বপ্রথম (রাত্রি আটটার সময়) যারা (অন্ধকূপে) প্রবেশ করে আমি, বেইলি ও জনকুক তাদের মধ্যেই ছিলাম, যুদ্ধের কার্যে অবিরত ব্যস্ত থাকার জন্য ক্লান্তিতে মিষ্টার কুক একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে প্রচণ্ড চাপে আমি

মুমূর্ষু হয়ে পড়ি... আমার সমস্ত গতি বন্ধ হয়ে যায়। (তথাপি) অত্যন্ত অসুবিধা সহ্য করেও মৃত ব্যক্তিদের দেহের উপর দিয়ে আমি অগ্রসর হই...তৃষ্ণায় আক্রান্ত হয়ে আমি অসহ্য কষ্ট পেতে থাকি, আমার প্রস্রাব আমি পান করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ঐ প্রস্রাবের স্বাদ অত্যন্ত তিক্ত বলে দ্বিতীয়বার তা পান করা একেবারেই সহ্যশক্তির বাইরে ছিলো।

রাত্রি সাড়ে এগারোটার পর থেকে প্রায় ভোরবেলা পর্যন্ত একজন মোটাসোটা লোকের সম্পূর্ণ ভার আমি সহ্য করতে বাধ্য হই, তার দুটো হাঁটুই আমার পিঠের উপর ছিল এবং তার সমস্ত দেহটা আমার মাথার নিচে, আমার বাঁ কাঁধের উপর একজন ওলন্দাজ সার্জেন্ট এবং একজন টোপাজ (ভারতীয় পর্তুগিজ সৈন্য) আমার ডান কাঁধের উপর ভর করে ছিলো।' [মৃণাল চক্রবর্তী ঃ *সিরাজউদ্দৌলা*, কলকাতা, ১৯৮১]।

অন্ধকূপে উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য কিছু ইংরেজকে বন্দি করে রাখা হয়েছিলো কিন্তু হলওয়েল-এর রটনার ফলে মৃতের সংখ্যা যতো বলে জানা গেছে তা বিতর্ক সাপেক্ষ। এই বিতর্ক তীব্র হয়ে উঠেছিল লর্ড কার্জনের সময় যখন তিনি হলওয়েলের বর্ণনাকে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। হলওয়েল প্রথমে জানিয়েছিলেন ১৬০ জনকে বন্দি করা হয়েছিলো এবং তার মধ্যে মারা গিয়েছিলো ১৪০ জন (ফোর্ট সেন্ট জর্জের কাছে সাইকসের চিঠি, ১৮ জুলাই, ১৭৫৬)। দ্বিতীয়বার তিনি জানিয়েছিলেন ১৬৫ থেকে ১৭০ জনকে আটক করা হয়েছিলো এবং এর মধ্যে ১৬ জন ছাড়া বাকি সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলো (ফোর্ট সেন্ট জর্জ কাউন্সিলের কাছে হলওয়েলের চিঠি, ১৭ জুলাই, ১৭৫৬)। কাউন্সিলের কাছে সর্বশেষ ৩ আগস্ট ১৭৫৬ সালে হলওয়েল চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন যে মোট ১৪৬ জনকে বন্দি করা হয়েছিলো এর মধ্যে মারা গিয়েছিলেন ১২০ জনই। পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকরা হলওয়েলের সর্বশেষ তথ্যটিকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। মুর্শিদাবাদ ইংরেজি হাইস্কুলের হেড মাস্টার মি. জে. এইচ লিটল প্রথম প্রশ্ন তুলেছিলেন এ ঘটনার সত্যতা নিয়ে। তার মতে, এই ঘটনা একটি বড় রকমের ভাঁওতা ছাড়া আর কিছু নয়। বর্তমানে পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকেরা হলওয়েলের বর্ণনাকে সত্য বলে ধরে নিয়েছেন। অন্যদিকে ভারতীয় ঐতিহাসিকরা মেনে নিয়েছেন যদুনাথ সরকারের যুক্তি।

যদুনাথ সরকার স্বীকৃতি দিয়েছেন লিটলের যুক্তিকে। লিটলের মতে, কলকাতা দখলের পর এতোজন সিরাজের হাতে বন্দি হবে এ কথা সত্য বলে বিশ্বাস করা যায় না। অন্তত সরকারি কাগজপত্র তা বলে না।

দ্বিতীয়, ২৬৭ বর্গফুট জায়গায় ১৪৬ জন ইংরেজকে কোনোভাবেই রাখা সম্ভব নয়। শারীরিকভাবে তা অসম্ভব এবং ভোলানাথ চন্দ্র একথা প্রমাণ

করেছিলেন। তিনি একবার ২৬৭ বর্গফুট জায়গা ঘিরে সেখানে ১৪৬ জনকে রাখা যায় কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, এতোজন লোককে সেখানে রাখা সম্ভব হয়নি। যদুনাথ সরকারের মতে, অন্ধকূপ-এ খুব বেশি হলে ষাটজনকে বন্দি করে রাখা হয়েছিলো।

ব্রিজেন কে গুপ্তও [*সিরাজউদ্দৌলা অ্যান্ড দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি*] অংক কষে প্রায় একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। তাঁর মতে, যুদ্ধ হওয়ার সময় কলকাতায় ইউরোপিয়ানদের সংখ্যা ছিলো ২৩০ থেকে ২৫৫ জন। ঐতিহাসিক মিল এবং হলওয়েলের তথ্য অনুযায়ী অন্ধকূপ থেকে বেঁচেছিলো ২২ জন। এছাড়া এর সঙ্গে আরো ১৩৮ জন যোগ করা যাক। তাহলে সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫৯। গুপ্তের মতে, তিনি দলিলপত্রে ১৫৯ জনের মধ্যে ১৪২ জনের নাম খুঁজে পেয়েছেন। বাকি ৭ জন তার মতে দলত্যাগী।

যদি ১৫৯ জন বেঁচে থাকে তবে বাকিরা হয় যুদ্ধে নয় অন্ধকূপে মারা গেছে। তা'হলে ঐ সংখ্য হবে ৭১ (যদি আমরা ড্রেকের তথ্য অনুযায়ী এই সংখ্যা ২০৫ ধরি)। গুপ্ত হিসাবে দিয়ে দেখিয়েছেন যুদ্ধে এর মধ্যে নিহত হয়েছিলো ৫৩ জন। সুতরাং ইউরোপিয়ানের সর্বমোট সংখ্যা হচ্ছে ১৫৯+৫৩= ২১২ জন। সুতরাং অন্ধকূপে প্রাণ হারিয়েছিলো এমন ইউরোপিয়ানরা সংখ্যা ২৩০-২১২= ১৮, ড্রেক প্রদত্ত সংখ্যা মেনে নিলে। ২৫৫-২১২= ৪৩, প্রথম প্রদত্ত সংখ্যা মেনে নিলে।

সুতরাং অন্ধকূপে রাখা হয়েছিলো ১৮+২১= ৩৯ অথবা ৪৩+২১= ৬৪ জন।

সবশেষে 'সিয়ার উল মুতাক্ষেরিণ' এর অনুবাদক রেমন্ডসের মন্তব্য দিয়ে শেষ করছি এ প্রসঙ্গ।–

'সুনিশ্চিতভাবে একথা বলা যায়, ঘটনাটি বাংলাদেশে অজ্ঞাতই ছিল, এমনকি কলকাতা শহরেও যে চার হাজার লোক বসবাস করতো তার একজন লোকও এই ঘটনাকে কোনোরূপ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেনি, এ সম্পর্কে কোনো কিছু জানে এমন একজন ভারতবাসীর সাক্ষাৎ পাওয়াও ছিলো অন্তত বেশ কঠিন ব্যাপার।' [মৃণাল চক্রবর্তী, *প্রাগুক্ত*]।

ফিরে আসি ফের পুরনো প্রসঙ্গে। কলকাতার পতনের পর সেখানে যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও হার্ভে যেতে পারলো না। তিন মাস কেটে গেল শুধু অসুখে ভুগে। একটু সেরে উঠে হার্ভে ঠিক করলো রওয়ানা হবে কলকাতা। কোম্পানির সঙ্গে আঁতাত সত্ত্বেও হার্ভে জানাতো গ্রামাঞ্চলে মারাঠারা তাকে একা পেলে লুটপাট করবে। তাই কোম্পানির সব মালপত্র সে পাঠিয়ে দিলো জাহাজে। নিজের জিনিসপত্র বিক্রি করে যে টাকা পেল তা রূপান্তর করে নিল ছোট ছোট হীরায়। একটা কাপড়ের বেল্টে হীরেগুলি লুকিয়ে হার্ভে যাত্রা করল কলকাতার দিকে।

ভ্রমণের দ্বিতীয় দিনে একদল লুটেরা ঘিরে ধরলে হার্ভেকে। হার্ভে চিৎকার করে জানতে চাইলো ফরাসি জানে এমন কেউ সেখানে আছে কিনা? [এ প্রশ্ন হার্ভে কেন করলো তার কোনো সদুত্তর নেই। হয়তো তখন প্রচলিত ধারণা ছিলো মারাঠি লুটেরাদের সঙ্গে যোগ আছে ফরাসিদের] যা হোক, হার্ভের প্রশ্ন শুনে ছোটখাটো একজন এগিয়ে এল সামনে, জানালো সে ফরাসি। 'তুমি তোমার দেশের লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছো?' জিজ্ঞেস করলো হার্ভে। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর ফরাসি জানালো, ফরাসি বা ইংরেজ যেই হোক না কেন, হার্ভের কোনো উপায় নেই। হীরে ছাড়া হার্ভে সঙ্গে যা ছিলো তা তারা লুঠ করে নিয়ে গেল। হার্ভে অর্ধেক হীরে বিক্রি করে যে টাকা পেলো তা দিয়ে ঘোড়া ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র কিনে ফের রওয়ানা হলো কলকাতার দিকে।

ব্রহ্মপুরের কাছে এসে পৌঁছল হার্ভে। এলাকাটির চারদিকে বন, নির্জন, নিঝুম। এগিয়ে চলছে হার্ভে। হঠাৎ এক মহিলার আর্তচিৎকার শুনে থমকে দাঁড়ালো হার্ভে। চিৎকারের উৎস সন্ধান করতে চাইলো হার্ভে। কিন্তু তার ভৃত্য [হার্ভের সঙ্গে ছিল তার এক দেশী ভৃত্য] বললো, সেদিকে কান না দিয়ে এগিয়ে যেতে। হার্ভের আঁতে লাগলো। একজন মহিলা করুণ স্বরে চিৎকার করছে আর একজন ইংরেজ যুবক তা শুনে চলে যাবে? এ হয় না। এদিকে সেদিক খোঁজ করে চিৎকারের উৎস খুঁজে পেল হার্ভে। ছ'টি গাছে, পাঁচজন লোক ও একজন মহিলাকে অর্ধনগ্ন করে বেঁধে রাখা হয়েছে। হয়তো কোনো দস্যুদলের কাজ। হার্ভে ও তার ভৃত্য তাদের বাঁধন খুলে একে একে মুক্ত করলো। এমন সময় হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন আঘাত করলো হার্ভে আর তার ভৃত্যকে। যখন জ্ঞান ফিরল তখন দু'জন আবিষ্কার করলো তাদের বেঁধে রাখা হয়েছে গাছের সঙ্গে। আর তাদের ঘোড়া, কাপড়-চোপড় সব হাওয়া। শুধু হীরেগুলির খোঁজ তারা পায়নি।

গাছের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায়ই তাদের থাকতে হলো অনেকক্ষণ। সন্ধ্যের দিকে একদল ফকির যাচ্ছিল ঐ পথ দিয়ে। হার্ভে আর তার ভৃত্যকে ফকিররা উদ্ধার করে পৌঁছে দিলো ব্রহ্মপুর। একটি ঘর ঠিক করে তারা হার্ভের খুব যত্নআত্তিও করলো। খুব খুশি হার্ভে। কাপড়ে লুকানো থলে থেকে কয়েকটা হীরা বের করে হার্ভে তাদের দিয়ে বললো :

'এ সব পার্থিব জিনিসের হয়তো তোমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু তবুও রাখো এগুলি। কারো যদি দরকার হয় তাহলে দান করে দিয়ো তাকে।'

নির্লিপ্তভাবে ফকিররা হীরের টুকরো কটি নিলো। খাবার আনল হার্ভের জন্যে, সঙ্গে মদ। ভুঁরিভোজনের পর নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লো হার্ভে।

সকালে উঠে হার্ভে ঠিক করলো, শহরে গিয়ে বাকি হীরেগুলি বিক্রি করে যা পাওয়া যাবে তা দিয়ে আবার ঘোড়াটোড়া কিনে রওয়ানা হবে। কিন্তু হা ঈশ্বর!

হীরের থলেটি নেই। আতিপাঁতি করে খুঁজলো হার্ভে। না, কোথাও নেই হীরের থলি। হাওয়া হয়ে গেছে সেটি। এবং সঙ্গে ফকিররাও।

হতাশ হয়ে বসে পড়ল হার্ভে। ভৃত্য আশ্বাস দিয়ে বললো প্রভুকে, হতাশ হওয়ার কিছু নেই। চার পাঁচশ' মাইল হেঁটেই চলে যাওয়া যায়। যাক, এক সময় প্রভু আর ভৃত্য হেঁটেই যাত্রা করল। সারাটা পথে প্রাচুর্য ছিল বুনোফলের। ফলে, খাবারের অভাব হয়নি। হেঁটে, বুনোফল খেয়ে এবং আরো কিছু অ্যাডভেঞ্চারের পর এক সময় প্রভু-ভৃত্য এসে পৌঁছলো কলকাতায়।

নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে লড়াই

কলকাতায় ফিরে ফ্যাক্টরিতে যোগ দিলো হার্ভে। কিন্তু ফ্যাক্টরিতে মন বসলো না। কেন? হার্ভের ভাষায়, 'একজন অসফল জেনারেলের পিছু নেয়া যে অসম্মান, ফ্যাক্টরিতে কাজ করার সময় আমারও সেরকম বোধ হলো। আর সে জন্যই কর্নেল ক্লাইভের অধীনে গ্রহণ করলাম লেফটেন্যান্টের পদ। বর্তমানে করণিক থেকে বেশি প্রয়োজন সৈনিকের এবং মহান উদ্দেশ্য হলো বাংলার নবাবকে নাস্তানাবুদ করা। বিশেষ করে কলকাতার সেই কালো ঘটনার [ব্ল্যাকহোল] প্রতিশোধ নিতে প্রতিজ্ঞা করলো সবাই। প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ পর্যায়ে উপনীত হওয়ার আগে জয় করা হলো চন্দননগর, প্রদর্শিত হলো অনেক বীরত্ব।'

'অবশেষে নবাব মকসুদাবাদের [মুর্শিদাবাদ] কাছে মুখোমুখি হলেন আমাদের। সেনা অনুপাত ছিলো সেখানে কুড়ি বনাম এক। আমাদের দিকে ছিলো সাহস, সামরিক শৃঙ্খলা এবং এদু'টি উপাদান থেকে শ্রেষ্ঠ আরেকটি উপাদান নবাবের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বিশ্বাসঘাতকতা। আমরা জয়ী হলাম, ফলাফল ছিলো সুদূরপ্রসারী কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের ব্যাপারটা ছিলো হাস্যকর।' হার্ভের মতে, যদি পলায়নকারীরা শুধু দু'পা ব্যবহার করে না পালাতো তাহলে হয়তো এ যুদ্ধকে বলা হতো 'অশ্বতাড়নীর যুদ্ধ' [ব্যাটল অফ স্পারস']।

যুদ্ধের বর্ণনা হার্ভে এটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন যেহেতু বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তাই একে সম্পূর্ণতা দেয়ার জন্য সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য দিচ্ছি।

কলকাতা জয়ের পর মহা আড়ম্বরে মুর্শিদাবাদ ফিরে আসেন সিরাজউদ্দৌলা। ইতোমধ্যে পূর্ণিয়ায় সৌকত জংয়ের সঙ্গে সংঘর্ষের সূত্রপাত হওয়ায় সিরাজ আক্রমণ করেন পূর্ণিয়া। পরাজিত হন সৌকত জং। উৎফুল্ল সিরাজ 'স্বর্ণখচিত জলযানে' ফেরেন মুর্শিদাবাদ। পর পর দু'দুটি জয়ের পর সিরাজ তখন সাফল্যের তুঙ্গে। দু'কোটি আড়াই লাখ টাকা ব্যয়ে দিল্লি থেকে ফরমান আনিয়ে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব হলেন আইনসম্মতভাবে।

পরাজিত ইংরেজদের সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করার কথা সিরাজউদ্দৌলার

কখনোই মনে হয়নি। মনে হয়, ধর্তব্যের মধ্যেই আনেন নি তিনি ইংরেজদের। এদিকে মাদ্রাজ কাউন্সিলের কর্মচারী রবার্ট ক্লাইভকে দায়িত্ব দেয়া হয় নবাবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের। অচিরেই ক্লাইভ, নৌ সেনাপতি ওয়াটসনের সাহায্যে দখল করেন কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম। এরপরই বোধ হয় হার্ভে এসে যোগ দেন কলকাতার ফ্যাক্টরিতে।

ক্লাইভের ফোর্ট উইলিয়াম দখল থেকে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত নানা ঘটনা ঘটেছে যার বিবরণ এখানে দেয়ার দরকার নেই। ২২ জুন ১৭৫৭; মুর্শিদাবাদ দখলের উদ্দেশ্যে রবার্ট ক্লাইভ তার সেনাবাহিনী নিয়ে এসে পৌঁছান পলাশীর প্রান্তরে। শিবির স্থাপন করেন প্রাচীরঘেরা লালবাগ আমবাগানে যার দৈর্ঘ্য ছিল আটশো গজ এবং প্রস্থ তিনশো গজ। এর দেড়শত গজ উত্তর-পশ্চিমে ভাগীরথী। আরো এগারোশ গজ দূরে পলাশী গ্রাম। আমবাগানের দুশো গজ দূরে ভাগীরথী তীরে নবাবের শিকার গৃহ, কৌশলগত দিক থেকে যা ছিলো গুরুত্বপূর্ণ। ক্লাইভ প্রথমে তাই দখল করেন।

২৩ জুন শুরু হয় যুদ্ধ। নওয়াবের ছিল বিশাল বাহিনী। কামানই ছিল ৫৩টি। তবে তার সেনাবাহিনী ছিলো বিশৃঙ্খল এবং আগের দিনের প্রবল বৃষ্টিতে গোলাবারুদ গিয়েছিলো ভিজে। ফলে, যা হবার তাই হলো। ২৪ জুন নবাব মুর্শিদাবাদ ছেড়ে পালান। ৩০ জুন পৌঁছলেন রাজমহল। সেখান থেকে গ্রেফতার করে তাঁকে পাঠানো হয় মুর্শিদাবাদ এবং সেখানেই তাঁকে হত্যা করা হয়।

ইংরেজদের জয়ের কারণ সম্পর্কে স্ক্র্যাপটন লিখেছেন– 'দেশের শাসকের প্রতি আনুগত্য অথবা স্বদেশ প্রেম যেখানে সৈন্যদের অন্তর অনুপ্রাণিত করে তুলতে ব্যর্থ, সেখানে সকল প্রকার জাঁকজমক এবং আড়ম্বর মূল্যহীন।' আর ক্লাইভ লিখেছেন– 'সৈন্যদের প্রতি সিরাজউদ্দৌলার কোনো প্রকার বিশ্বাস ছিল না, তার প্রতি সৈন্যদেরও কোনো প্রকার বিশ্বাস ছিল না, সুতরাং যুদ্ধের সময় তারাও কোনো কর্তব্য পালন করেননি।'

সবশেষে মুর্শিদাবাদ জয়ের পর ক্লাইভের দুটি মন্তব্য দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করছি–

প্রথম, মীরজাফরের সিংহাসনারোহণ দেখার জন্য যে কৌতূহলী জনতা প্রাসাদের সামনের ভিড় জমিয়েছিলো তারা শুধু লাঠি আর পাথর দিয়েই ইংরেজ ও তার সহযোগীদের নিকেশ করে দিতে পারতো। কিন্তু তারা তা করেনি।

দ্বিতীয়, 'একবার বিবেচনা করে দেখুন পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর আমি কিরূপ স্থান অধিকার করার সুযোগ পাই। একজন শক্তিশালী শাসক আমার অনুগ্রহপ্রার্থী, একটি ঐশ্বর্যমণ্ডিত নগরী আমার দয়ার ওপর নির্ভরশীল, রাজ্যের সর্বাপেক্ষা বিত্তশালী শেঠগণ আমার হাসিমুখ দেখার সৌভাগ্য অর্জনের জন্য

পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী; নবাবের কোষাগার একমাত্র আমার কাছেই উন্মুক্ত হলো-ভূগর্ভস্থ কোষাগারের উভয় পার্শ্বস্থ স্তূপীকৃত স্বর্ণপিণ্ড ও অন্যান্য মণিমুক্তার মধ্য দিয়ে আমি পায়চারী করে বেরিয়ে এলাম... মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আমার সে সময়ের সংযমের কথা ভেবে এখনও আমি বিস্মিত বোধ করছি।' [মৃণাল চক্রবর্তী, *প্রাগুক্ত*]

নবাব সিরাজউদ্দৌলার খোঁজে

যুদ্ধ জয়ের পর হার্ভে লিখেছে 'আমরা মার্চ করলাম মকসুদাবাদের দিকে নতুন এক নবাব তৈরি করতে। এবং সত্যি বলতে কি খুব ভালো দামেই বিক্রি হলো তার সম্মান [মসনদ]।' হার্ভে দাম উল্লেখ করেনি। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে তা উল্লেখ করছি। নতুন নবাব মীরজাফর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দিয়েছিলেন দু'কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা। পদস্থ কর্মচারীদের উপহার দেয়া হয় পাঁচ লক্ষ সাতাশি হাজার টাকা। ১৭৫৯ সালে ক্লাইভ উপহারস্বরূপ পান এক বিশাল জমিদারি। '১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৩ জুলাই তারিখে সামরিক বাদ্যসহকারে শোভাযাত্রা করে প্রথম কিস্তির টাকা ও অন্যান্য উপহার দু'শ খানা নৌকায় বোঝাই করে ইংরেজগণ কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করে। ঐ দিনই হতভাগ্য নবাব সিরাজউদ্দৌলার শবদেহ হস্তীপৃষ্ঠে স্থাপন করে আর একদল লোক শোভাযাত্রা সহকারে মুর্শিদাবাদ নগরী প্রদক্ষিণ করে।' [মৃণাল চক্রবর্তী, *প্রাগুক্ত*]

হার্ভের ভাষ্য অনুযায়ী মুর্শিদাবাদ প্রবেশের পর বিভিন্ন দিকে অনুসন্ধানী দল পাঠানো হলো নবাবকে জীবিত অথবা মৃত ধরে আনার জন্যে। হার্ভেকে পাঠানো হলো এরকম একটি দলের নেতা করে। এ দলে ছিলো ৪০ জন ঘোড়সওয়ার। হার্ভে লিখেছে, 'কিন্তু ভাগ্য ভালো যে আমি তাকে খুঁজে পেলাম না। দু' কারণে এ কথা বললাম। কারণ, আমি অন্ধকারে হত্যা পছন্দ করি না। এবং দ্বিতীয়, আমি এমন এক অ্যাডভেঞ্চারের সম্মুখীন হলাম যা পরবর্তীকালে আমাকে আরো বেশি আনন্দ দিয়েছে, শত শত [হত্যার] চেয়ে।'

ভোর হওয়ার দু'ঘণ্টা আগে, ধলপহরের দিকে হার্ভে তার বাহিনী নিয়ে খোঁজ শুরু করলো সিরাজউদ্দৌলার। পূর্ণ চাঁদ আকাশে। দিল্লির দিকে বিশাল সড়ক ছেড়ে ছোট একটি অব্যবহৃত পথে অগ্রসর হলো হার্ভে। খানিকটা এগোনোর পর পাওয়া গেল একটি বাড়ি। এমনভাবে বাড়িটি তৈরি যে দেখে মনে হয় লুকোনোর জন্যই এটি তৈরি করা হয়েছে, চারদিক নিস্তব্ধ। হার্ভের মনে হলো, লুকিয়ে থাকার জন্য এটিই যথপোযুক্ত জায়গা। হার্ভে ঢুকতে যাবে সেই বাড়িতে এমন সময় দেখা গেল বোঝার ভারে টলতে টলতে বেরুলো দু'জন লোক। ভেতরে না ঢুকে হার্ভের অনুচররা কিছুদূর অনুসরণ করলো দু'জনকে। তারপর পাকড়াও করলো তাদের

এবং মৃত্যুর হুমকি দিয়ে তাদের কাছ থেকে একটি স্বীকারোক্তি আদায় করল।

পরাজিত বাহিনীর ১২ জন সিপাহীর একটি দলের সদস্য হচ্ছে এ দুজন। বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে থাকার পর গত বিকেলে তারা খুঁজে পেয়েছে এ বাড়িটি। মাঝরাতে তারা ঠিক করেছিলো বাড়িটি লুট করবে। কিন্তু খুব ক্ষুধার্ত থাকায় বাড়িতে ঢুকে লুট করার আগে দু'তিন ঘণ্টা যাবত তারা পেটপুরে খেয়েছে। পান করেছে। তাদের বিশ্বাস বাড়িটিতে খুনখারাবি বোধহয় হয়েছে কারণ তারা আর্তচিৎকার আর গোঙ্গানির শব্দ শুনেছে। অন্যদের খবর বা এ ব্যাপারে তারা কিছু জানে না। লুট করার জন্য তারা কিছু প্লেট পেয়েছে এবং তাই বস্তায় করে রওয়ানা হয়েছে। সাথীদের সঙ্গে মেলার জন্য তাদের যে জায়গা ঠিক করা আছে, তারা যাচ্ছে সেখানেই।

এ খবর জেনে হার্ভে অনুচরদের অর্ধেককে নির্দেশ দিলো বাড়িটি ঘিরে ফেলার জন্য। বাকি অর্ধেককে নিয়ে নিজেই ভেতরে ঢুকলো তল্লাশি করাতে। ভেতরটা অন্ধকার, আসবাবপত্র ছাড়ানো ছিটানো। এসব আসবাবপত্রের সঙ্গে ধাক্কা লাগছে। পেরুতে হলো দুটি মৃতদেহ। তারপর এক সময় এক ঘরে ঢুকে আবছা আলোয় হার্ভে দেখলো দু'জন সিপাহী মদ খেয়ে ঘোর মাতাল হয়ে পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া করছে। তাদের আটকানো হলো। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় হার্ভের কানে এল গোঙ্গানির শব্দ। হার্ভে সে শব্দ অনুসরণ করে ঢুকলো এক শোবার ঘরে। দেখলো বিছানায় বেঁধে রাখা হয়েছে এক বৃদ্ধকে। মুখে তার কাপড় গোঁজা।

তাকে দেখে মনে হলো তিনি মৃত্যুর অপেক্ষা করছেন। বাঁধন খুলে যত্ন নেয়ার পর তিনি বিশ্বাস করলেন যে হার্ভে এবং তার অনুচররা তাকে হত্যা করবে না। আবেগে চিৎকার করে তিনি তখন তার মেয়েকে ডাকলেন।

এরপর ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। হার্ভে খোঁজা শুরু করলো মেয়েকে। এবং এক ঘরে গিয়ে দেখল দু'জন সিপাহী দু'টি মেয়েকে ধর্ষণ করতে উদ্যত। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে হার্ভে তখনই সিপাহী দু'জনকে হত্যা করলো এবং তাদের মৃতদেহ ঘরের বাইরে ছুড়ে ফেললো। মেয়ে দুটির রাতের পোশাক প্রায় ছিন্নভিন্ন এবং মনে হচ্ছিলো তারা মৃত। হার্ভে মেঝ থেকে নিঃশ্বাসহীন দেহ দুটি উঠিয়ে রাখলো বিছানায়। কাপড় নিয়ে ঢেকে দিলো তাদের শরীর। হার্ভে লিখেছে, 'আমার হৃদয় যেন শরবিদ্ধ; অসহায় পিতার মুখোমুখি হওয়ার শক্তি হারিয়ে আমি আর কি ঘটছে তার খোঁজ করতে লাগলাম। হঠাৎ উপর তলা থেকে ভেসে এল আর্তচিৎকার। খোলা তলোয়ার হাতে ছুটলাম ওপরে। দু'জন সিপাহী কৃষ্ণ দুই মহিলার পা ধরে টানাটানি করছে, মহিলাদের শরীর এক কোণায় আসবাবের আড়ালে।' বোঝা যাচ্ছে তারা সেখানে লুকিয়েছিলো। হার্ভের তলোয়ারের ফলা বিদ্ধ করলো দু'জনকে। হার্ভের ইচ্ছে করছিলো সিপাহী দু'জনকে টুকরো টুকরো করে ফেলে।

হার্ভে তার বাহিনীর দেশী সিপাহীদের ডেকে আসবাবপত্র সরিয়ে মহিলা দু'জনকে আশ্বস্ত করতে বললো। কারণ, তারা আশ্বস্ত হলে হার্ভে তাদের নিয়ে এলো জেনানামহলে এবং দেখলো আগে সেই দু'জন মহিলার দেহ।

দেহ দুটি দেখে কৃষ্ণ দু'মহিলা এমনভাবে হৃদয়বিদায়ক চিৎকার করে উঠলো যা বর্ণনার বাইরে। দোভাষীও তাদের এ সময় শান্ত করতে পারছিলো না। হার্ভে লিখেছে, 'ফলে যা ভেবেছিলাম তাই হলো। [চিৎকারের শব্দ শুনে] বৃদ্ধ লোকটি ঘরে ঢুকলেন। তার পরের দৃশ্য বর্ণনাতীত। এর ফলে যুদ্ধ ক্ষেত্রে কামানের মুখোমুখি হতে বললে আমি তা সানন্দে মেনে নিতাম। কোনো সান্ত্বনাই স্পর্শ করলো না বৃদ্ধকে। দু'টি বয়স্ক হাতের বাঁধন থেকে কন্যার দেহ ছাড়ানো গেল না।'

অসম্ভব হলো সম্ভব

ভোরের আলো ফুটছে। মোমবাতির সাহায্য ছাড়াই জিনিসপত্র চেনা যাচ্ছে। বিমূঢ় হয়ে হার্ভে, মহিলার নিথর দেহের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ তার মনে হলো– মহিলার পাণ্ডুর গালে যেন একটু রংয়ের ছোপ লেগেছে। হার্ভের মনে হলো ভুল দেখছে। দেহে যে প্রাণ ফিরে আসছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল খানিক পরে শ্বাস ফেলার শব্দে, কয়েক সেকেন্ড পর দ্রুত শ্বাস নেয়ার শব্দ। হার্ভে অপর মহিলার দিকে তাকালো। দেখলো, তার দেহে প্রাণ ফিরে আসার চিহ্ন আরো স্পষ্ট। এমন কি প্রায় স্বাভাবিকভাবে সে নিশ্বাস নিচ্ছে; কিন্তু বৃদ্ধ ভদ্রলোকের নজরে এসব কিছুই পড়ছে না। বল প্রয়োগ করে হার্ভে ও তার অনুচররা বৃদ্ধের হাতের বাঁধন থেকে মেয়েকে ছাড়িয়ে নিলো। তাকে আরেক ঘরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলো হার্ভে। মহিলা দু'জন স্বাভাবিক হয়ে আসছে। তবে একেবারে শরীর মন স্বাভাবিক হয়ে আসতে সময় লাগলো। হার্ভের ভাষায়, 'তারপর বাবাকে নিয়ে আসতে বললাম তার মেয়েকে দেখতে। এবং এরপর যে দৃশ্যের অবতারণা হলো তা আদর এবং দুঃখ, আনন্দ ও বেদনা, অভিনন্দন এবং শোকে ভরা যার কোনো বর্ণনা ভাষায় দেয়া অসম্ভব যদিও আমি সে বিষয়ে দক্ষ।'

হার্ভে পিতা-পুত্রীকে একলা রেখে নিচে নেমে এলো সৈন্যদের কাছে। সৈন্যরা জানালো তারা এইমাত্র খবর পেয়েছে যে, নবাবকে বন্দি করা হয়েছে। হার্ভের ভাষায়, 'সুতরাং আমাদের আর কিছুই করার রইলো না, মকসুদাবাদ ফেরা ছাড়া। সেখানে ফিরি বন্দি 'ভিলেন'দের আইনের হাতে সোপর্দ করতে হবে। আমি এ খবরটি এবং আমার উদ্দেশ্য জানাতে গেলাম বৃদ্ধকে। এ কথা শুনে তিনি আমার পায়ের ওপর পড়ে গেলেন এবং আবেগমাখা গলায় জানালেন, দেশ এবং তার ঘরে শান্তি-শৃঙ্খলা ফেরার আগে যেন আমি তাকে ছেড়ে না যাই। বৃদ্ধের মেয়েও

একইভাবে কান্না জড়ানো কণ্ঠে আবেদন জানালো এবং বললো, 'বাবা, দেখো এই ভদ্রলোকের সৈন্যদের যেন ভালোভাবে পুরস্কৃত করা হয়।'

'তা আর বলতে বাছা,' বললেন বৃদ্ধ, 'মহাশয়! এখানে আসুন।'

এ বলে বৃদ্ধ হার্ভেকে নিয়ে গেল একটি ঘরে। সেখানে রাখা আছে তার নগদ টাকা ও রুপোর বাট। বৃদ্ধ হার্ভেকে অনুরোধ করলেন তার সৈন্য ও নিজের জন্য যা খুশি সেখান থেকে নিতে পারে। হার্ভে বোঝালো বৃদ্ধকে যে, সৈন্যদের এভাবে পুরস্কৃত করলে বিপদ আছে। ভবিষ্যতে এরাই হয়তো আবার লুট করতে আসবে। তারচেয়ে ভালো, এদের কিছু খাবার ও মদ খেতে দেয়া এবং বলা যে ফ্যাক্টরিতে গেলে তাদের বিশ পাউণ্ড করে দান করা হবে।

এরপর হার্ভে সৈন্যদের বিদায় করে দিলো। তারপর কর্নেল ক্লাইভকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে একটি চিঠি লিখে, নিজের ভৃত্যকে দিয়ে তা পাঠিয়ে দিলো। ক্লাইভের কাছে কয়েকদিনের ছুটির আবেদনও জানালো হার্ভে। বিশ্বাসী অপর ভৃত্যকে নিজের কাছে রেখে দিলো হার্ভে। মৃতদেহগুলি সরিয়ে ফেলে, ঘরদোরে একটু শৃঙ্খলা আসার পর হার্ভের সঙ্গে বৃদ্ধ ও তার মেয়ের আলাপ স্বাভাবিক হয়ে এলো। হার্ভের ভাষায়, 'বৃদ্ধ দুর্ভেদ্র এবং তার মেয়ের পরম ভাগ্য যে আমি একজন ইংরেজ। শুধু তাই নয় তারা আমাদের ভাষায় কথা বলতে পারে এবং আমাদের দেশের প্রতি দুর্বল। এমন কি কারালিয়ার (মেয়েটির নাম) পরিচারিকা, সখী এবং শয্যাসঙ্গীও একজন ইংরেজ রমণী। দুর্ভেদ্র একজন বিত্তশালী ব্যবসায়ী; এবং তার ব্যবসা প্রধানত ইংরেজদের সঙ্গে। তার কাহিনী হয়তো আমার কাহিনীরই একটি অংশ।'

ভাগ্যবান ইংরেজ

উপরের বিবরণ দেখে মনে হতে পার কারালিয়া এবং তার পরিচারিকাকে উদ্ধারের পরই তারা সুস্থ হয়ে উঠেছিলো। আদতে তা নয়। কারণ, তার বাবা তাকে ঐ নামেই ডাকতেন। পরপর চারদিন হিস্টিরিয়ায় ভুগেছে। তার পরিচারিকার শরীরে ছিলো নানা আঘাতের চিহ্ন; এর মধ্যে একটি ডান উরুতে তীক্ষ্ণ ছুরির দু'ইঞ্চির ক্ষত।

হার্ভের মনে হয়েছে, সিরাজউদ্দৌলার পলাতক সিপাহীদের দেখেই জ্ঞান হারিয়েছিলো কারা। পরিচারিকা ছিলো কারা থেকে স্বাস্থ্যবতী। প্রতিরোধের চেষ্টা করে আহত হয়েছে সে, যার মধ্যে ছুরির ক্ষত হলো একটি। অতিরিক্ত রক্তপাতের ফলে বোধহয় সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলো এবং জ্ঞান হারাবার সঙ্গে সঙ্গে হয়তো রক্ত পড়াও বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। কারণ, সে জ্ঞান ফিরে পেতেই আবার শুরু হলো রক্তপড়া এবং প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে জীবন তার সূক্ষ্ম সুতায় ঝুলছিলো।

কারা সুস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হার্ভের সঙ্গেও তার মৃদু আলাপ শুরু হলো। বৃদ্ধ, কারা এবং হার্ভের সম্পর্ক হয়ে এলো সুন্দর, স্বাভাবিক, ঘনিষ্ঠ। তারপর হার্ভের ভাষায়–

'সপ্তম দিনে আমি নির্দেশ পেলাম আমার ওপরঅলা থেকে বাহিনীতে যোগ দেয়ার। চিঠিটা পড়েই মুখ আমার ম্লান হয়ে গেল। আমার এই ভাবান্তর লক্ষ্য করলো কারা এবং তার গালেও পাণ্ডুর ছোপ লাগলো। দুর্ভেদ্র আমাদের দু'জনের মুখের মলিন ভাব দেখে চিৎকার করে বললো, 'বাছা, তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসো, বাছা, তাহলে তোমরা ভালোবাসো পরস্পরকে। আহ্, এতে আমি সুখী হবো।'

পিতার এই চিৎকারে কারা যেন সংবিত ফিরে পেলো। রক্তিম হয়ে উঠলো তার গাল। আর আমি হয়ে গেলাম বিমূঢ়। 'আমি কি জানতে পারি', জিজ্ঞেস করলেন, 'ঐ চিঠিতে কি লেখা আছে?'

'অবশ্যই এটি আমার সেনাবাহিনীতে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ।'

'কারা, তোমার পরিচারিকাকে তো আজ সকালে দেখতে যাওনি...

হ্যা, হার্ভে, এখন একজন বন্ধু এবং একজন সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে বলো তো আমার মেয়েকে কি তুমি ভালোবাসো?'

'আপনার অনুমতি নিয়ে বলছি, আজ সকালে যখন আমার চলে যাওয়ার নির্দেশ এলো তখন আমি টের পেলাম যে আমি ভালোবাসি।'

'হার্ভে, তুমি ভালোবাসো আমার মেয়েকে? তুমি কি আবার বলবে ঐ কথা আমাকে সুখী করার জন্যে?'

'আমি আবারও বলছি, আমি জানি আমি তাকে ভালোবাসি। কিন্তু আপনি কিভাবে একজন আগুন্তুক যাকে দেখছেন মাত্র কয়েকদিন তার হাতে তুলে দেবেন তাকে?'

'ঠিক নয়, ঠিক নয়, ছ'দিন আমি লক্ষ্য করেছি তাকে।' এরপর আবেগময় ভাষায় বৃদ্ধ হার্ভেকে যা বললেন তার মূল কথা হলো হার্ভের মতো মানুষ বিরল। তারপর বললেন তিনি হার্ভেকে, 'তোমাকে তো তোমার ওপরঅলার নির্দেশ মানতেই হবে নয়ত চাকরি ছাড়তে হবে। তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ, তার চেয়েও বড় কথা আমার মেয়ের প্রাণ বাঁচিয়েছ। তোমাকে আমি ছাড়তে পারবো না। এক বছর থাকো আমার সঙ্গে। .... আমার ইচ্ছা, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, 'ভদ্রলোকের সম্মানের কসম খেয়ে বলছি, দশ বছর দাসত্ব করে তুমি যা না রোজগার করবে 'আমি তার চেয়ে তোমাকে ধনী করে দেবো।'

হার্ভে অভিভূত হয়ে দুর্ভেদ্রর হাত জড়িয়ে ধরে বুকে চেপে ধরলো, তারপর মাথা নিচু করে সম্মান জানিয়ে বেরিয়ে এলো।

যখন আবার ফিরে এলো হার্ভে ভিতরে, দেখলো পিতাপুত্রী গভীর আবেগে জড়িয়ে ধরে আছে পরস্পরকে। হার্ভেকে দেখে বললো বৃদ্ধ 'ঐ মুখটার দিকে চেয়ে দেখোতো কারা। এই মুখে কি মিথ্যার ছাপ থাকতে পারে? ওর মুখ কি বলছে?'

'ঐ মুখে শুধু গভীর কৃতজ্ঞতার এবং আপনার সমস্ত ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করার ছাপ; সিনর দুর্ভেদ্র, অবশ্য আমার সমস্ত অনুভূতি যদি তা প্রকাশ করে।'

'তা'হলে সে মুখের দিকে তাকানোর সাহস আমার নেই। মুখটি পুরুষালী রোদে পোড়া, তবে হৃদয়টি কোমল, কারা, ঐ হৃদয় পেতে তুমি কি দেবে?'

'ক্রীত হৃদয়ের,' বললো হার্ভে, 'কোনো মূল্য নেই মহাশয়।'

'তাহলে তা ভিক্ষে চাও কারা। তা যদি না পারো তাহলে চুরি করো। এর জন্যে যে পাপ তা আমার হবে।'

'আমার এবং আপনার জীবন বাঁচানোর জন্য আমরা মিস্টার হার্ভের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ,' বললো কারা, 'আমি তাকে আমার ভাইয়ের মতো ভালোবাসতে পারতাম; আমার জন্যে যে সম্পদ রেখে যাচ্ছেন তা থেকে ভাইয়ের পাওনা অনায়াসে দিয়ে দিতে পারতাম। এর পরে মহাশয় যদি কিছু করার থাকে তবে তা সহৃদয় বিবেচনার।'

কারা এরপর থেমে থাকেনি। দীর্ঘ এক বক্তৃতা দিয়েছে। তার মতে, হৃদয়ের মিল থাকলেও দু'টি ভিন্ন দেশের রীতিনীতি অভ্যাসের সমঝোতা হওয়া কঠিন। ধর্মও একটি বাঁধা। তা'ছাড়া হার্ভে, কারার জীবন বাঁচালেও তার সম্ভ্রম বাঁচাতে পারেনি। হার্ভে এর প্রতিবাদ জানালো। কারা তখন ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের উদাহরণ টেনে বললো, যতোগুলি ইংরেজি বই সে পড়েছে তাতে দেখেছে যে সব মহিলার ভাগ্যে এই বিপর্যয় হয়েছে তাদের হয় এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে হয়েছে না হয় সারাটা জীবন দগ্ধে দগ্ধে কেটেছে। সব অপরাধের মাফ আছে, শুধু মাফ নেই এই পাপের। কোনো লেখকই এ ধরনের কোনো মহিলাকে বিয়ে করে বেঁচে থাকার সুযোগ দেননি। হার্ভে এ কথা মানতে রাজি নয়। তার মতে, এ ধরনের বক্তব্য বইতেই মানায় বাস্তব জীবনে নয়। এই প্রসঙ্গ হয়তো আরো চলতো কিন্তু বৃদ্ধ অস্থির হয়ে উঠছিলেন। তখনই তিনি হার্ভের ভৃত্যের হাতে হার্ভের পদত্যাগপত্র পাঠাতে চাচ্ছিলেন। হার্ভে কর্নেল ক্লাইভকে সব বিস্তারিত লিখে জানালো। ক্লাইভ সহৃদয়তার সঙ্গে হার্ভের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করলেন। শুধু তাই নয়। হার্ভেকে জানালেন, হার্ভের প্রতি তার বন্ধুত্ব অটুট থাকবে এবং যখনই প্রয়োজন হবে তখনই তিনি এই বন্ধুত্বের ডাকে সাড়া দেবেন।

কমলা বাগানে আলাপ

দুর্ভেদ্রর বাগানে বেশকিছু কমলা গাছ দিয়ে ঘেরা ছোট একটি কুঞ্জবনের মতো

জায়গা আছে। কারা এই কমলা গাছের ছায়ায় তৈরি করেছে সুন্দর ছোট এক প্যাভিলিয়ন। সূর্যের প্রখর আলো থেকে গাঁ বাঁচিয়ে সেখানে বিশ্রাম নেয়া যায়। যেদিন সেনাবাহিনী ছেড়ে দিলো হার্ভে সেদিন বিকেলে সেই বাগানে বসে ইংরেজি রীতিতে বসালো কফির আসর। প্রথমে কারা আর হার্ভে বসে কফি পান করছিলো। এমন সময় অধৈর্য হয়ে দুর্ভেদ্র এলেন সেখানে। বললেন কারাকে যে সকালে তিনি ভুল করে ফেলেছেন। কারাকে জিজ্ঞেস করেই তিনি হার্ভের কাছে বিয়ে দিতে চেয়েছেন। এখন এই ভুলের সংশোধন করতে চান তিনি। কারা কি রাজি হার্ভেকে বিয়ে করতে?

"আপনাকে ধন্যবাদ, কিন্তু আমি তাকে বিয়ে করতে পারবো না।' বললো কারা।

'কেন?'

'আমার দোষত্রুটির সঙ্গে সে এখনও পরিচিত নয়।'

'ঠিক, কিন্তু স্বামীই হচ্ছে একমাত্র প্রাণী যে এসব খুঁজে বের করতে পারে।'

'হ্যাঁ, এবং পারে তিলকে তাল করতে।' কারা জানালো, হার্ভের মতো বিবেচক একজন ভদ্রলোকের কারাকে বিয়ে করা উচিত হবে না কারণ তাতে অনেক ঝুঁকি। তাছাড়া যে পরিবারে সে বিয়ে করতে যাচ্ছে যে পরিবার সম্পর্কেও সে কিছু জানে না। বললো কারা, বিয়ের পর যদি হার্ভে জানে যে, যে পরিবারে সে বিয়ে করেছে, পৃথিবীতে সে ধর্মমতের কোনো সম্প্রদায় নেই।

'হা ঈশ্বর!' অজান্তেই উচ্চারণ করলো হার্ভে।

'ঐ তো, ঠিক বললাম, না?' বললো কারা।

'ঠিক কারা,' এবার ধীরস্থির হয়ে বললো বৃদ্ধ, 'তোমার কথা সম্পূর্ণ ঠিক, তোমাকে তার বিয়ে করা সাজে না।' তারপর বৃদ্ধ হার্ভেকে জানালো, সবার আগে বৃদ্ধের জীবন কাহিনী জানা উচিত হার্ভের। জানা উচিত তিনি যে সম্পদের মালিক হয়েছেন তা কি নিজের নৈতিকতা হারিয়ে? জানা উচিত ধর্ম নেই কথাটার অর্থ কি? জানা উচিত কেন মেয়ে নিয়ে নির্জনে তিনি বাস করেন, সামাজিকতা বাদ দিয়ে? সব শুনে হার্ভে সিদ্ধান্ত নিলেই ভালো। তাহলে পরে ফলাফলের জন্য কেউ কাউকে দোষারোপ করবে না।

দুর্ভেদ্রর কাহিনী

আমি পারস্যের অধিবাসী, বাড়ি ইসপাহান। আমার বাবা ছিলেন একজন ধনী ব্যবসায়ীর ছেলে। তিনি ছিলেন রাজদরবারের একজন অলঙ্কার বিক্রেতাও। অন্যান্য ধনী মুসলমানের মতো তারও ছিলো অনেক স্ত্রী এবং উপপত্নী ও অজস্র সন্তান। অবশ্য নিজের এবং আরো দুই ভাইয়ের কথাই শুনেছি। কুড়ি বছর বয়সে

আমাকে বাণিজ্য করতে পাঠানো হলো। একটি কাঁরাভার সঙ্গে আমি রওয়ানা হলাম দিল্লি। সেখানে পৌঁছে প্রথম যে সংবাদটি আমি শুনলাম তা হলো নাদির শাহ [শাহ নাদির হিসেবে উল্লিখিত] কর্তৃক সফল পারস্য অভিযান। এর ফলে আমার বাবা প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন। তার সব কিছুই বাজেয়াপ্ত করে নেয়া হলো। এ সংবাদ শোনার পর আমার আর করার কিছুই ছিলো না সর্বশক্তিমান আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওপর ভরসা রাখা ছাড়া। তবে আমার ভাগ্য ভালো যে আমার সঙ্গে ছিলেন বাবার পুরনো কর্মচারী কাদুব। ব্যবসা যে ভালো বুঝতো। কিন্তু মালপত্র বিক্রি শুরু করতেই খবর পেলাম কৌলিখান হিন্দুস্তান অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

এর ফলে আমাদের বাজার খারাপ হয়ে গেলো এবং আমরা রওয়ানা হলাম বাংলার দিকে। বেশকিছু শহর ঘোরার পর মকসুদাবাদ পৌঁছে দেখলাম ব্যবসার জন্য জায়গাটি ভালো। মালপত্রও তাড়াতাড়ি বিক্রি হয়। এই বড়ো ও জনবহুল শহরে ব্যবসায়ীদের আকৃষ্ট করার মতো প্রচুর জিনিস আছে। এখানে এমন অনেকে আছেন যাদের ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ বিশ্বাসের বাইরে।

মকসুদাবাদ দুর্ভেদ্রর পছন্দ হলে এখানেই তিনি বসবাস করার সিদ্ধান্ত নিলেন। বাসা করলেন। আর কাদুবকে বেতন না দিয়ে মোট মুনাফার এক-চতুর্থাংশ দিলেন। তারপর কাদুবের হাতে ব্যবসার ভার ছেড়ে দিয়ে বেরুলেন দেশ ভ্রমণে। বিশেষ করে বিদেশী বণিকদের ফ্যাক্টরিগুলো পরিদর্শনে আগ্রহ ছিলো তার বেশি। বাটাভিয়া গেছেন তিনি, আরো গেছেন গোয়ায়। মোটামুটি সব ইউরোপিয় ফ্যাক্টরিগুলোই তিনি পরিদর্শন করেছেন। গুণী লোকজনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়েছে। কিন্তু তিনি সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছেন ইংরেজদের সঙ্গে মেলামেশা করে। ইংরেজি ভাষা শিখেছেন তিনি, পড়েছেন ইংরেজদের ইতিহাস, আইন।

এরিমধ্যে মারা গেল কাদুব। ফলে দুর্ভেদ্রকে দেশভ্রমণ ত্যাগ করতে হলো। মকসুদাবাদেই থাকতে লাগলেন তিনি এবং ভালোই লাগলো তার। কারণ, জনবহুল ও বিলাসী এই শহরে অন্যান্য তরুণদের মতো দুর্ভেদ্রও জীবন উপভোগ করতে লাগলেন।

এভাবে কাটালেন দুর্ভেদ্র নিজের পঁয়তাল্লিশ বছর। মহিলাদের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কে তৈরি হয়নি। প্রয়োজনে শুধু তাদের ব্যবহার করেছেন। তেমন পুরুষ বন্ধুও তার ছিলো না। বন্ধুত্ব তৈরি হয়েছিলো সব ব্যবসায়ের স্বার্থে। তবে হ্যাঁ, এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলো একটি। একজন বন্ধু অবশ্য ছিলো তার, নাম মোসেস কোত্রা। কোত্রা ছিলেন আর্মেনি ইহুদি। দু'জনে একই ভাবে মহাজনী কারবার ও একচেটিয়া কিছু ব্যবসার কারণে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন।

কোত্রার স্ত্রী মারা গেছেন কিছুদিন আগে। তার মেয়ে আছে দু'টি যে কারণে সে আর বিয়ে করেনি। দুর্ভেদ্র একমাত্র কোত্রার পরিবারিক পরিবেশে গিয়েই

খানিকটা শান্তি পেতেন। যদিও তাদের ধর্মীয় পার্থক্য ছিলো প্রবল।

এমনিই কেটে যাচ্ছিলো দিন। হঠাৎ একদিন সকালে এক বার্তাবাহক ত্রস্ত ভাবে এসে দুর্ভেদ্রকে একটি চিরকুট দিলো। চিরকুটটি পাঠিয়েছে কোত্রার বড় মেয়ে রুথ। এর আগের দিন রাতে দুর্ভেদ্র তাদের বাসায়ই কাটিয়েছেন গল্পগুজব করে। তাই রুথের চিরকুট পেয়ে ও পড়ে অবাক হলেন। কারণ তাতে লেখা– 'নবাবের কর্মচারীরা আমরা বাবাকে প্রাসাদে ধরে নিয়ে গেছে। তাঁকে এবং আমাদের উদ্ধারে দ্রুত আসুন।'

দুর্ভেদ্র প্রায় উড়ে গেলেন কোত্রার বাসায়। দেখলেন দরবারের কর্মচারীরা কোত্রার কাগজপত্র সব বাক্সবন্দি করছে। দুর্ভেদ্র ছুটলেন প্রাসাদে। সেখানে তার বেশ যোগাযোগ ছিলো। সেখানে গিয়ে তিনি দেখা করতে চাইলেন কোত্রার সঙ্গে। কিন্তু না, দেখা করা যায় না। কারণ কোত্রাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে দেশদ্রোহিতার জন্য। এবং এ অভিযোগে যারা অভিযুক্ত তাদের সঙ্গে কারো সাক্ষাতের অনুমতি দেয়া হয় না।

দুর্ভেদ্র লিখেছেন– কোত্রাকে আমি বহুদিন থেকে চিনি, তার অনেক ব্যক্তিগত বিষয়ও জানি। সুতরাং এ অভিযোগ যে ভিত্তিহীন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু, রাজদরবারে প্রতিশোধ নেয়ার প্রবল স্পৃহার কথাও আমার অজানা ছিলো না। ন্যায় বিচারের প্রতি যে তাদের আস্থা সামান্য তাও জানতাম। আর অভিযুক্ত যদি ধনী হন তাহলে তো কথা নাই। সুতরাং রাজদরবারের পরিচিত প্রধান কয়েকজন আমাত্যের কাছে আবেদন জানিয়ে বললাম, আমার বন্ধু সম্পর্কে আমি ঘনিষ্ঠভাবে জানি এবং সে জানা থেকে বলছি যে সে নির্দোষ। আমাত্যদের একজন আমাকে বললেন, কোত্রা যে আমার ঘনিষ্ঠ দরবারের লোকজন তা না জানলে বরং ভালো। অন্যরাও আকারে ইঙ্গিত তাই বললো। তারা আরো জানালো, বিকেলেই প্রিভি কাউন্সিল [আদালত] এর অধিবেশন হবে। সেখানে কোত্রার বিরুদ্ধে প্রমাণাদি পেশা করা হবে এবং আমি নিশ্চিত থাকতে পারি যে সেখানে যথাযথ বিচার হবে। রুথ ও রেবেকার [রুথের ছোট বোন] কাছে ফিরে এলাম। বিষণ্নভাবেই কাটলো আমাদের বিকেলটা।

পরদিন জানা গেল যে কোত্রার দোষ প্রমাণিত হয়েছে এবং একজন বিশ্বাসঘাতক হিসেবে তার প্রাণদণ্ড হয়েছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কার্যকরও করা হয়েছে। প্রমাণস্বরূপ তারা কোত্রার হাতের লেখা একটি চিঠি দিলো দুর্ভেদ্রকে যাতে লেখা ছিলো–

'তোমার আগ্রহ এবং যে বিষয়ে লিখেছ দুটোই আমার হৃদয়ের কাছাকাছি। মনে হচ্ছে, সব কাজ ফেলে তোমার সাহায্যে উড়ে যাই। নিশ্চিত থাকো, তোমার শত্রুদের বিরুদ্ধে আমার স্বার্থ দৃঢ়। এ বিষয়েই আবুফেদ এবং তার প্রভু কাজাসী

কুহদা উদ্বিগ্ন। সে মুহূর্তে থেকে ভয়ের কিছু নেই। আমার কাছে রাজা নানা কারণে নির্ভরশীল এবং এ মুহূর্তে আমার সাহায্য ছাড়া তার পক্ষে সফল হওয়া সম্ভব নয়। তোমার প্রয়োজন লাগতে পারে ভেবে তিনশত টাকার একটি বিল অফ এক্সচেঞ্জ পাঠালাম। আমার হৃদয়ে তারা হয়ে থেকো। তোমার গুণমুগ্ধ

মোসেস কোত্রা

সুরাট

হিজরী ১১১৮।'

অনুমান করা যেতে পারে এ চিঠি লেখার একবছরের মধ্যেই রাজা কাজাসী বিদ্রোহ করছিলেন। বাংলার এক অগম্য প্রদেশে রাজার [জমিদার] বেশ জমি ছিলো নবাব যা নিয়ে নিয়েছিলেন। দু'বছর ধরে চেষ্টা চালিয়েও রাজা এ জমি উদ্ধার করতে পারেননি। ফলে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেছিলেন। মারাঠাদের সঙ্গে জোট বেঁধে তিনি লড়াইতে জয়লাভ করেছিলেন। কিন্তু একটি যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর মারাঠারা তাকে শুধু ত্যাগই করেনি, তাকে তুলেও দিয়েছিলো নবাবের হাতে। এর পরিণতি কি সবার জানা এবং এ সূত্রেই হয়তো তারা খোঁজ পেয়েছিলো কোত্রার। তবে শুধু এ চিঠিই নয়, ঋণ দেয়ার উল্লেখও আছে সেখানে, এসব প্রমাণের ফলে কোত্রাকে দোষী সাব্যস্ত করে তখনই প্রাণবধের আদেশ দেয়া হয়। বাজেয়াপ্ত করা হয় তার সম্পত্তি, মাটিতে গুঁড়িয়ে দেয়া হয় তার বসতবাড়ি।

দুর্ভেদ্রর ভাষায়, 'আমার বন্ধুর মেয়েরা এভাবে হয়ে গেলো কপর্দকহীন। আমি তাদের নিয়ে গেলাম আমার বাসায়। শোকসাগরে ডুবে ছিলাম অনেকদিন তবে পারস্পরিক লেনদেন আমাদের সম্পর্ক এতোটা প্রবল করে তুললো যা সাধারণ বন্ধুত্ব বা ভালোবাসার ঊর্ধ্বে।

রাজদরবারের প্রতি বহুদিন থেকেই ছিলাম আমি বিরক্ত। এখন শুধু, দরবার নয়, দুনিয়া থেকেই মন উঠে গেছে। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই আমার ব্যবসার সম্পর্ক এত বেশি ছিলো যে তখনই সব ত্যাগ করা সম্ভব ছিলো না। আমার আর কোনো উচ্চাশাও ছিলো না। আর সম্পদ বৃদ্ধি অসহ্য মনে হচ্ছিলো আমার কাছে। আমার বর্তমান নীতি কোনোরকম চলা আর জাঁকজমক কমিয়ে আনা।

দুর্ভেদ্র যখন এভাবে জীবন যাপন করছেন তখন একদিন এক ইংরেজ এসে তার কাছে এক হাজার টাকা ধার চাইলেন, তার ছেলের ব্যবসা দাঁড় করাবার জন্য। এই সাহেব ছিলেন নবাবের প্রধান অমাত্যের সচিব। দুর্ভেদ্র কোনো রকম সিকিউরিটি এবং সুদ ছাড়াই টাকাটা ধরে দিলেন ইংরেজকে। লোকটির কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল। দুর্ভেদ্রর সঙ্গে সে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলো। মাঝে মাঝে দুর্ভেদ্রকে দরবারের গোপন খবরাখবরও দিতেন সেই সাহেব যার ফলে দুর্ভেদ্র দরবারে দেয়া তার ঋণ আদায়ে কৌশল অবলম্বন করতে পারতেন।

একদিন এক সরাইখানায় সেই ইংরেজ আর দুর্ভেদ্র খানাপিনা করছেন। এক পর্যায়ে দুর্ভেদ্র বন্ধুত্বের চিহ্ন হিসেবে সাহেবের ঋণপত্রটি ছিঁড়ে ফেললেন। পানাহার চলতে লাগলো। সুরা ও বন্ধুত্বের প্রভাবে সাহেব দরবারের গোপন খবরাখবর বলতে লাগলেন। একবার ইঙ্গিত দিলেন দুর্ভেদ্রর বন্ধু কোত্রাকে প্রাণ দিতে হয়েছে সাহেবের প্রভুর প্রতিরোধের কারণে।

দুর্ভেদ্র সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে আরো খবর জানতে চাইলেন। বাইরে কিছু প্রকাশ না করে তিনি আরো সরাব আনালেন। এবং ইংরেজকে এমন অবস্থায় আনলেন যে দু'একটি প্রশ্নের পর সে গড় গড় করে সব বলতে থাকলো। এসব গোপন খবর যে দেয়ালের বাইরে যাবার নয় সে বোধ আর তার ছিলো না। সেই ইংরেজ যা বলেছিলেন তাহলো–

সরকারি কাজের জন্য প্রধান আমাত্য কোত্রার কাছে বেশ বড় পরিমাণের ঋণ চেয়েছিলো। কোত্রা জানিয়েছিলো, তার কাছে অতো টাকা নেই। আমাত্য তখন সিকিউটি ও সুদের পরিমাণ দ্বিগুণ করে দেবে জানালো। কোত্রার তাতে মনে হলো, নিশ্চয় এর মধ্যে ঝামেলা আছে, ফলে সে আর তার কথা থেকে নড়লো না।

আমাত্য তার পরিষদের সামনে এ নিয়ে ক্রোধ প্রকাশ করেছিলো। এ পরিষদের মধ্যে ছিলো একজন জেন্টু। সে ছিলো কোত্রার প্রিয় এক রক্ষিতার প্রেমিক। সেই রক্ষিতা তখন রাজা কাজাসী কুহদার বিরুদ্ধে মামলা করেছিলো কিছু জমির ব্যাপার নিয়ে। এ জমিগুলো ছিলো ঐ রাজার রাজ্যে। জেন্টু এই মামলায় কোত্রার রক্ষিতাকে পরামর্শ দিতো। কোত্রা তখন সুরাটে এবং জেন্টু জানতো যে কোত্রার সঙ্গে তার প্রেমিকা রক্ষিতার নিয়মিত চিঠিপত্র বিনিময় হচ্ছে। এবং জমি উদ্ধারের ব্যাপারে কোত্রাও তার প্রভাব বিস্তার করবে বলে এক চিঠিতে সেই রমণীতে জানিয়েছে।

অন্যদিকে নবাবের সঙ্গে কুহদার যে ঝামেলা চলছিলো তার নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছিলো বছর তিনেক আগেই এবং অনেকে তা ভুলেও গিয়েছিলো। জেন্টু তার প্রভুর মনোরঞ্জনার্থে পুরো বিষয়টি জটিল করে কোত্রাকে এর মধ্যে জড়াতে চাইলো।

জেন্টুর সঙ্গে কোত্রার রক্ষিতারও যে খানিকটা প্রেম ছিলো না এমন নয়। সে এখন ব্যবহার করতে চাইল তাকে। একদিন মুধমাখা নানা কথার পর জেন্টু বললো তাকে, 'তুমি পেয়েছ আমার অভিন্ন হৃদয়। কিন্তু তোমার হৃদয় আমাকে ভাগ করে নিতে হয় অন্যের সঙ্গে।'

'তোমার প্রতি আমার টান,' বললো রক্ষিতা, 'প্রকৃতির নিয়মের মতো যা আমার সাধ্য ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে। তা খুবই কোমল ও শক্তিশালী। কোত্রার জন্য আছে আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। তার কাছে আমি এতো ঋণী যে সে যখন যা বলবে তা

করতে আমি বাধ্য।'

এ ধরনের কথাবার্তা বলে জেন্টু সেই রমণীকে ক্রুদ্ধ করে তুললো। এবং এক পর্যায়ে সে সুরাট থেকে লেখা কোত্রার কয়েকটি চিঠি দেখিয়ে বললো, তোমার তো নর্তন কুর্দনই সার। আর কোত্রার এ চিঠি দেখালেই আমি টাকা পাই। জেন্টু কোত্রার মহানুভবতা স্বীকার করে বললো, ঠিক আছে, কিন্তু ঐ রাজার সঙ্গে কোত্রার কি সম্পর্ক? রমণী বললো, তা তার জানা নেই তবে অর্থ সংক্রান্ত কিছু হতে পারে। জেন্টু তখন ইঙ্গিত করলো, আসলে তা নয়, রাজার বিদ্রোহে কোত্রা অর্থ যোগাচ্ছিলো। রমণী দৃঢ়স্বরে বললো, তা হতে পারেই না। ঋণ নেয়া দেয়া ছাড়া আর কোনো বিষয়েই তাদের কথা হয়নি।

কিন্তু জেন্টু তার যুক্তিতে অনড়। শুধু তাই সে বললো, নবাবের কর্মচারী হিসেবে তার কর্তব্য এ গুলি কোত্রার বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ হিসেবে দাখিল করা। রমণী ক্ষুব্ধ হয়ে বললো, 'তুমি এতো নীচ, শঠ, মাটি যেন দুফাঁক হয়ে তোমাকে গিলে নেয়।'

'তখন আমি', বললো জেন্টু, 'আমার শুকতারার কোলে ছুড়ে দেব আধ লাখ টাকা তখন সে অন্য কথা বলবে।'

'এ কথা', দুর্ভেদ্রকে বললো ইংরেজ 'আমাকে গর্ব করে বলেছে সে জেন্টু। কারণ, এ চাল চেলে সে অবশেষে সেই রমণীকে একাই করায়ত্ত করতে পেরেছিলো।'

এর পরের ঘটনা সবার জানা। বিচারের সময় কোত্রা সভাসদদের জানিয়েছিল, প্রথমবার যখন রাজাকে বন্দি করা হয়েছিলো তখন এই সভাসদদের উপহার দেয়ার জন্যই তিনি ধার নিয়েছিলেন কোত্রার কাছ থেকে। কিন্তু রাজা মুক্তি পেলেও যারা উপঢৌকন নিয়েছিলেন তারা তার সমস্যার মীমাংসা করে দেননি। যে কারণে, রাজা নিজ বাসভূমে ফিরে বিদ্রোহ করেছিলেন।

কিন্তু দরবারের কুচক্রীরা কোত্রাকে হাতে পেয়েছে। তারা এখন তার সম্পদ লুট করে নিতে চাইছে। এবং সে কারণে কোত্রার মৃত্যু ছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না। আর সেই হিন্দু জেন্টু এ ষড়যন্ত্র সফল করতে পারায় বেশকিছু অর্থ পেয়েছিলো যা দিয়ে সে সহজেই একা করায়ত্ত করে নিতে পেরেছিলো কোত্রার রক্ষিতা প্রেমিকাকে।

উপসংহার :

হার্ভের কাহিনীর শেষ এখানেই। প্রশ্ন থেকে যায়, হার্ভে কেন নিজেকে আখ্যায়িত করেছে 'ভাগ্যবান ইংরেজ' বলে। এ পরিপ্রেক্ষিতে দুটি অনুমান বা কাহিনী কিভাবে শেষ হতে পারতো তা উল্লেখ করছি সংক্ষিপ্তভাবে।

অনুমান : এক

হার্ভে বিয়ে করতে চায় কারাকে, কারাও হার্ভেকে। কিন্তু কারার মনে সংশয়। কারণ, হার্ভে জানে না তাদের পারিবারিক ইতিহাস এবং তাদের ধর্মও ভিন্ন। বিশেষ করে, শেষোক্ত বাধাটিই প্রবল। কারণ, হার্ভে একজন ভক্ত খ্রিস্টান।

এ পরিপ্রেক্ষিতে দুর্ভেদ্রর কাহিনীর শুরু। কাহিনীর শেষটুকু আমরা জানি না। তবে কাহিনীটি হয়তো এভাবে শেষ হতো–

সেই ইংরেজ কর্মচারীর সম্পূর্ণ বিবরণ শুনে দুর্ভেদ্র বোঝে যে তার বন্ধু নির্দোষ। প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের কারণেই তার মৃত্যু হয়েছে এবং এর কারণ সেই জেন্টু দুর্ভেদ্র তখন জেন্টুর ওপর প্রতিশোধ নেয়। সে প্রতিশোধ হতে পারে, জেন্টুর প্রেমিকাকে আরো অর্থ ও আরো প্রলোভন দেখিয়ে ছিনিয়ে নিয়েছিলো এবং তারপর ফেলে দিয়েছিলো ছুড়ে, অথবা হতে পারে, সেই রক্ষিতার সাহায্যেই দুর্ভেদ্র আরেকটি ষড়যন্ত্র করেছিলো যার ফলে জেন্টুকে পরপারে চলে যেতে হয়। এরপর শান্ত হয় দুর্ভেদ্র'র প্রতিশোধ স্পৃহা। রাজকর্মচারীদের বিরুদ্ধে অবশ্য বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি দুর্ভেদ্র। কারণ, তাহলে সেই হয়তো বিপাকে পড়তো।

প্রতিশোধ স্পৃহা শান্ত হলে দুর্ভেদ্র মনোযোগ দেয় রুথের দিকে। বাবার মৃত্যুর পর রুথ দুর্ভেদ্র'র বাসায়ই থাকতো এবং পিতার বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও সে কাছাকাছি চলে এসেছিলো দুর্ভেদ্র'র। সুতরাং তারা বিয়ে করে। এখানে বলে রাখা ভালো, রুথ যে শুধু দুর্ভেদ্র'র বন্ধু কন্যা তাই নয়, সে ইহুদিও বটে। দুর্ভেদ্র নামটি যদিও মুসলমান নয় কিন্তু দুর্ভেদ্র বলছেন তিনি মুসলমান। দুর্ভেদ্র'র অগ্নি উপাসক হওয়াই স্বাভাবিক। যাহোক, তৎকালীন সময়ে একজন মুসলমানের ইহুদি মেয়ে [তার ওপর বন্ধু কন্যা] বিয়ে করায় ছি ছি পড়ে যায়। এক ঘরে হয়ে পড়ে দুর্ভেদ্র। তাই শহর ছাড়িয়ে নিরিবিলি নির্জনে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেয় দুর্ভেদ্র। সমাজ থেকে গুটিয়েও নেন নিজেকে। কারা রুথ ও দুর্ভেদ্রর কন্যা। তার নির্দিষ্ট কোনো ধর্ম নেই। বাবা-মা দু'জনকেই সে প্রচণ্ড ভালোবাসে, সুতরাং ধর্ম নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে সে এমনিই বেড়ে ওঠে। লক্ষ্যণীয় যে, কারা নামটিও মুসলমানী নাম নয়। যাক, রুথ ও দুর্ভেদ্র সুখী ছিল। কিন্তু রুথ আকস্মিকভাবে পরলোক গমন করলে দুর্ভেদ্র বাইরে যাওয়াই ছেড়ে দেয়। মেয়েকে আগলে নিয়ে বেড়ায়। যেহেতু সে ধনবান এবং টাকা টাকা আনে সুতরাং ভালোভাবে জীবন যাপনে তার কোনো ঝামেলা হচ্ছিলো না। কিন্তু মেয়েকে নিয়ে এক ঘরে হয়ে যাওয়ার কারণে হয়তো সে এক ধরনের অপরাধবোধেও ভোগে।

দুর্ভেদ্রর জীবনকাহিনী শোনার পরও হার্ভে অটল থাকে। ফলে কারা ও হার্ভে পরস্পরকে বিয়ে করে। এরপর পরই দুর্ভেদ্র শান্তিতে পরলোক গমন করে। কারা এতে ভেঙে পড়েছিলো। এবং কিছুদিন পর সেও পাড়ি জমায় পরপারে। হার্ভে অল্প

বয়সেই মালিক হয়ে পড়ে বিশাল সম্পত্তির। কিন্তু সে তখন একলা, ফিরে যেতে মন চায় প্লাইমাউথের সেই গ্রামে। মুর্শিদাবাদের স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি বিক্রি করে প্রচুর অর্থ নিয়ে সে ফিরে দেশে। এবং বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেয় নির্ঝঞ্ঝাটে কোনো কিছু না করেই।

এই যে জীবনের এত ঘাত-প্রতিঘাত, অ্যাডভেঞ্চার এবং তারপরও আয়াসে জীবনযাপন এ কারণেই হয়তো হার্ভের নিজেকে মনে হয়েছে 'ভাগ্যবান ইংরেজ'।

অনুমান : দ্বিতীয়

দুর্ভেদ্রর পুরো কাহিনী শোনার পর আরেকবার চিন্তা করে হার্ভে। কারাকে বিয়ে করলে তাকে এখানেই থাকতে হবে। হয়তো এখানকার সমাজও তাকে গ্রহণ করবে না। ইংল্যান্ডে ফিরে গেলেও ফলাফল একই হতে পারে। আর এখানকার সমাজ তাকে গ্রহণ করলেও আজীবন কি সে কাটিয়ে দিতে পারবে এখানে? কিন্তু, কারা তার প্রথম প্রেম। তাকে ছেড়ে থাকাও তো অসম্ভব। হার্ভের দোদুল্যমানতা দেখে বুদ্ধিমতী কারা পুরনো কথার ওপর জোর দেয় যে, পরস্পরকে ভালোবাসলেও তাদের মিলন সম্ভব নয়। তবে, হার্ভে মুর্শিদাবাদ থাকুক। এ বিশৃঙ্খল সময় সে থাকলে কারাও ভরসা পাবে। আর টাকার তো কোনো অভাব নেই। হার্ভের আত্মসম্মানে লাগলে সে টাকা ধার নিক তার বাবার কাছ থেকে। সব মিলিয়ে এ ব্যবস্থাই ভালো। তারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে থাকবে। দুর্ভেদ্রও এ প্রস্তাব মেনে নিতে অনুরোধ করে। সম্মত হয় হার্ভে।

তারপর হার্ভে আরো ক'বছর কাটিয়ে দেয় মুর্শিদাবাদে। যেহেতু নতুন শাসকদের সেও একজন সুতরাং তার ব্যবসায় শনৈ শনৈ উন্নতি হতে থাকে। যথেষ্ট ধনবান হলে একদিন সে বিদায় নেয়। এবং ইংল্যান্ডে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেয় নবাবের মতো এবং তখন বিয়ে করতে এবং পরে সন্তানের জনক হতে ভুল করেনি।

এই যে এতো উত্থান-পতন, ভিনদেশী মেয়ের প্রেমে পড়া, তারপর ধনবান হয়ে স্বদেশে ফিরে নিজের মতো জীবনযাপন করতে পারায় নিজেকে ভাগ্যবান মনে হয়েছে হার্ভের। এবং সে কারণেই এ আত্মজীবনীর নাম, 'একজন ভাগ্যবান ইংরেজের আত্মকাহিনী।'

তথ্য সূত্র

Eur. Mss B 248. *An Autobiography*, undated but watermarked 1800, entitled 'The Fortunate Englishman', by a Mr. Harvey, East India Company.

হার্ভের রচনার নমুনার জন্য পাণ্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠাটি উদ্ধৃত করছি–

"..... I have often been his creditors for small sums, he applied to me at this critical instant for a large one which I have the greatest reason to believe was designed for presents to some of the officers of the Court. He offered me high interest, and my avarice got the better of my prudence. I have securites now in my profession. Which though useless for recovery of the loss, will be a sufficient proof, of what I now advance. Why the Rajah did not succeed, in well known to many of the lords here present. He returued to his lands and soon often rebelled. From that have I neither saw nor heard of him more, but by the public accounts. `It is owings' continued sail, `to a total want of proof that cotras execution immediately followed the rising of the council. Had there been real proof, his trial and punished would have both been public. I know too, said he `the exact proportion on in which they all agreed to share the spoil; but run for that. The gentoo I promise you had the last share, but what..."

পরিশিষ্ট- ২

সিভিলিয়ান সম্পর্কিত বই

[সিভিলিয়ানদের সম্পর্কে ও সিভিলিয়ানদের নিজের লেখা, ভারতে বেড়াতে আসা সিভিলিয়ানদের আত্মীয়-স্বজন ও ভ্রমণকারিদের গ্রন্থের একটি তালিকা]

1. A Retired Bengal Civilian. *A Glance at the East*. London. 1857.
2. A. Traveller. *The English in India*. Longman. 1835. London.
3. Abbe J. A. Dubois. *Letters on the State of Christianity in India : in which the Conversion of the Hindoos is Considered as Impracticable*. London. 1823.
4. Acland. The Rev. Charles. *A Popular Account of the Manners and Customs of India*, new edn., London. 1879.
5. Aliph. Cheem. *Lays of Ind*. Thacker Spink. Calcutta. 1883.
6. Allen. Charles. *A Soldier of the Company*. Army Museum. London 1988.
7. Allen. Charles. *RAJ: A Scrapbook of British India 1877-1947*. Penguin. London. 1976.
8. Archer. Major Edward Caulfield. *Tours in Upper India. and in Parts of the Himalaya Mountains; with Account of the Courts of the Native Princes*. 2 vols., London. 1833.
9. Arnold. William Delafield. *Oakfield, or Fellowship in the East*. 2 vols.. London. 1853.
10. Ashby. Lillian L. & Roger Whately. *My India*. Michael Joseph. 1938. London.
11. Asiaticus (P. D. Stanhope). *Genuine Memories of Asiaticus* (ed. by W. K. Firminger). Calcutta. 1909.
12. Baker. Edward B.. *Sprat in Bengal & How when & where to seek it*. London. 1886.
13. Battye. Evelyn. *Costumes and Characters of the British Raj*. Introduction by M. M. Kaye. Illustrated by Cecil Elgee. Webb & Bower. London. 1982.
14. Bazalgette. Jack. *The Captains and the Kings Depart*. The Amate Press Ltd. London. 1984.
15. Beames. John. *Memoirs of a Bengal Civilian*. Chatto & Windus. London.1961.
16. Bellew & Captain Illustrations. *Memoirs of a Griffin*. W. H.

Allen. 1943. London.
17. Bernays. Robert. *Naked Fakir; Diary of his five-month visit to India in 1930*. Victor Gollancz. London. 1932.
18. Blackston. Major J. *Twelve Years of Military Adventures in Hindustan*. 1802-14. London. 1829.
19. Blunt. Edward. Sir. *The I.C.S.: The Indian Civil Service*. Faber & Faber. 1937. London.
20. Bolton. Angela. *The Maturing Sun. An Army Nurse in Bengal and Assam. 1942-45*. Imperial War Museum. London. 1986.
21. Boulnois. Helen Mary. *Mystic India*. Methuen. London. 1935.
22. Brendon. Vyven. *Children of the Raj*. W. & Nicolson. 2005.
23. Brouchton. Thomas Duer. *Letters Written in a Mahratta Camp during the year 1809, Descriptive of the Character; Manners, Domestic Habits and Religious Ceremonies of the Mahrattas*. London. 1892.
24. Brown. H. editor. *The Sahibs*. London. 1948.
25. Brown. Hilton. ed.. *The Sahibs: The Life and Way of the British in India as Recorded by Themselves*. London. 1948.
26. Buckland. C. T. *Sketches of Social Life in India*. London. 1884.
27. Burnes. Alexander. *A Voyage on the Indus*. Historical Reprint by O.U.P.. London.
28. Burton Sir Richard Francis. *Falconry in the Valley of the Indus*. London. 1852.
29. Burton. Sir Richard Francis. *Goa. and the Blue Mountains; or Six Months of Sick Leave*. London. 1851.
30. Cameron. James. *An Indian Summer*. Penguin. London. 1979.
31. Cameron. Roderick. *Time of the Mango Flowers*. Heinemann. London. 1958.
32. Campbell. Joseph. *Baksheesh and Brahman*. Harper Collins. 1995.
33. Campbell-Martin. Monica. *Out in the Midday Sun*. Travel Book Club. London. 1948.
34. Carritt. Michael. *A Mole in the Crown*. Private. London 1958.
35. Carstairs. R.. *The Little World of an Indian District Officer*. London.
36. Cartwright. Jill. *The Garlands of Rampur*. Pentland Press. London. 1998.
37. Chenevix Trench. Charles. *Victory's Agent*. 1987 Jonathan Cape.
38. Claude Brown. A.. *The Ordinary Man's India*. Palmer. London.

1927.
39. Coles worthy Grant, *Rural Life in Bengal.*
40. Compton. Herbert. *Indian Life in Town & Country*. G. Newnes. London.
41. Cooper. J., editor. *Original Papers Relating to the Establishment of a Society in Bengal*. London. 1784.
42. Corbett, Jim. *My India*. O.U.P. London. 1952.
43. Crawford. D. G., editor. *Roll of the Indian Medical Service, 1615-1930*. London, 1930.
44. Crewe. Quentin. *Letters from India*. Long Barn Book. London. 1998.
45. Crofton. Denis Hayes. *Souvenirs of a Competition Wallah*. Volturna Press, London, 1994.
46. Cunningham, D. D, *Plague & Pleasures of Life in Bengal*, London, 1907.
47. D. Oyly. Charles. *Costume of Modern India*. London. 1813.
48. D. Oyly. Charles. *The Europeans in India*. London. 1813.
49. D. Oyly. *Charles, Tom Raw, the Griffin, London*, 1828.
50. Daniell. Thomas. *Oriental Scenery*. 3 vols. London. 1795-7.
51. Danvers. F. C. etal. *Memorials of Old Haileybury College*. London. 1894.
52. Dawson. Capt. Lionel (R. N.). *Squires and Sepoys: 1857-1958*. Hollis & Carter. London.
53. Dewar. D., *Bygone Days in India*. London, 1922.
54. Dewar. Douglas. *In the Days of the Company*. Thacker Spink. 1920. London.
55. Dewey. Clive. *Anglo-Indian Attitudes*. Hambledon Press. 1993. London.
56. Dodwell. E., and Miles. J. C., *Alphabetical List of the Hon. East India Company's Bombay Civil Servants, 1780-1839*. London. 1839.
57. Dodwell. E., and Miles. J. C., *Alphabetical List of the Hon. East India Company's Madras Civil Servants, 1780-1839*. London. 1839.
58. Dodwell. E., and Miles. J. C., *Alphabetical List of the Officers of the Indian Army*. London. 1838.
59. Dodwell. E., and Miles. J. C., editors. *Alphabetical List of the Hon. East India Company's Bengal Civil Servants, 1780-1838*. London. 1839.

60. Eden Emily. *Letters From India*, Vols I & II, Putni. London.
61. Eden. Emily. *Up the Country, OUP*, Milford, 1930.
62. Edwardes. Michael, *Glorious Sahibs: 1799-1838*. Eyre 1968. London.
63. Edwards William. *Reminiscences of a Bengal civilian*. London, 1866.
64. EHA. *Behind The Bungalow*. Macrae, London. 1989.
65. Elers. Capt. G., *Memories of George Elers, 1777-1842*. London, 1903.
66. Elwin. Verrier. ed., *India's North-East Frontier in the Nineteenth Century*. Bombay. 1959.
67. Elwood Anne Katharine. *Memoirs of the Literary Ladies of England from the Commencement of the Last Century*. 2 vols., London. 1843.
68. Emily Eden. 'Up the Country'. *Letters Written to her Sister from the Upper Provinces of India*. 2 vols., London. 1866.
69. Emily Eden. *Letters from India. ed. by her niece*. 2 vols., London. 1872.
70. Evans, Thomas, *A Welshman in India*. James Clarke. London, 1908.
71. Ex Civilian. *Life in the Mofussil or the Civilian in Lower Bengal*, vol. I &II London, 1878.
72. Fay Eliza. *Original Letters from India*, Calcutta, 1908.
73. Fleming, Laurence, *Last Children of The Raj*. Vol. I. Radcliffe, London. 2004.
74. Forbes, J., *Oriental Memories*, 4 vols. London, 1813.
75. Forster George, *A Journey from Bengal to England, through the Northern Part of India, Kashmire, Afghanistan, And Persia, and into Russia*, 2 vols. London. 1798.
76. Forster George. *Sketches of the Mythology and Customs of the Hindoos*. London, 1785.
77. Fothergill. Robert A., *Private Chronicles, A Study of English Diaries*. London etc., 1974.
78. Fraser James Baillie. *Journal of a Tour through Part of the Snowy Range of the Himaly Mountains, and to the Source of the Rivers Jumuna and Ganges*. London. 1820.
79. George, Viscount Valentia. *Voyages and Travels to India, Ceylon, the Red Sea, Abyssinia, and Egypt, in the years 1802, 1803, 1804, 1805 and 1806*. 3 vols. London, 1809.

80. Ghosh, Suresh Chandra, *The Social Condition of the British Community in Bengal, 1757-1800*, Leiden, 1970.
81. Godden Jan & Rumer, *Shiva's Pigeons: An experience of India*, C. & Windus, 1972, London.
82. Godden, Jan & Rumer, *Two Under The Indian Sun*, Macmillan, 1966, London.
83. Godfrey, Thomas Vigne, *Travels in Kashmir, Ladak, Iskardo, the Countries adjoining the Mountain-Cross of the Indus, and the Himalaya*, 2 vols., London, 1844.
84. Gouldsbury, C. E., *Tigerland*, London, 1913.
85. Graham, Maria, *Journal of a Residence in India, 1809-11*, Deinburgh, 1812.
86. Grand, George Francis, *The Narrative of the Life of a Gentleman long resident in India*, Calcutta, 1910.
87. Grandpre, L. De, *A Voyage in the Indian Ocean and to Bengal, 1789-90*, 2 vols, 1803.
88. Grant, C., *Anglo-India Domestic Sketch*, London, 1849.
89. Grant, C., *Rural Life in Bengal*, London, 1860.
90. Halliday, James, *A Special India*, C & Windus, 1968, London.
91. Hamilton, Capt. A., *A New Account of the East Indies*, 2 vols. Edinburgh, 1727.
92. Hare, E. C, *Memoirs of Edward Hare CS*.
93. Hart William, *Every day life is Bengal*, London, 1906.
94. Hearsey, Sir J. B., *Autobiography of Sir J. B. Hearsey in the Hearseys* (ed. by Col. H. Pearre), London, 1905.
95. Heber Reginald, *Bishop Heber in Northern India, Selections from Heber's Journal*, Cambridge, 1971.
96. Heber, Rev. R., *Narrative of a Journey through the Upper Provinces of India*, 2 vols. London, 1828.
97. HGBS, *The Diary of Lady Elisabeth Bruce*, Vols. I, II & III, Putni, London.
98. Hill, S. C., editor, *Bengal in 1756-7*, 3 vols. London, 1905.
99. Hill, S. C., *List of Europeans and others in the English Factories in Bengal at the time of the siege of Calcutta in the year 1756*, Calcutta, 1902.
100. Hodges, W., *Travels in India during the years 1780-2*, London, 1793.
101. Hodges, William, *Travels in India, during the years 1780, 1781, 1782 &1783*, London, 1793.

102. Hodson, Major V. C. P., editor, *List of the Officers of the Bengal Army, 1758-1834*, 4 vols. London
103. Holland, Henry, *Frontier Doctor*, Hodder & Stoughton, 1959, London.
104. Holmes & Co., editor, *The Bengal Obituary*, London, 1851.
105. Holmes, Richard, Sahib, Parper Collins, 2005.
106. Hooker, Joseph Dalton, *Himalayan Journals; or Notes of a Naturalist in Bengal, the Sikkim and Nepal Himalayas, the Khasia Mountains*, 2 vols., London, 1854.
107. Huggins William, *Sketches in India, treating on Subjects connected with the Government; Civil and Military Establishments; Characters of the European and Customs of the Native Inhabitants*, London, 1824.
108. Hulme, Conroy, *Dawn Behind The Tamarisks*, Prentice-Anderson, 1950, London.
109. Hunter, Sir William, *The Thackerays in India*, Henry Frwde, 1899.
110. Ives, Capt. E., *A Voyage to India in 1754*, London, 1773.
111. Johnson, J., *The Oriental Voyger*, London, 1807.
112. Kincaid, Dennis, *British Social Life in India*, George Routledge, 1938, London.
113. Kisch, H. M., *A Young Victorian in India*.
114. Knighton, William, *Tropical Sketches; or Reminiscences of an India Journalist*, London, 1855.
115. Landseer, P. C. Trench, *Tiger Hunting of Day! Sport in the East*, London, 1836.
116. Law, Ursula, *Fifty years with John Company*.
117. Lawrence, Lady, *Indian Embers*, Trakless Sands, USA, 1991.
118. Lewin Capt T. H., *The Hill Tract and its & the Dwellers there in*.
119. Lieutenant Henry, *Travels in Beloochistan and Sinde: Accompanied by a Pottinger Geographical and Historical Account of those Countries*, London, 1816.
120. *Lives of Indian Officers*, London 1873.
121. Lushington, Charles, *Narrative of a Journey from Calcutta to Europe*, London, 1829.
122. Macmillan, Margaret, *Women of The Raj*, Thames & Hudson, London, 1988.
123. MacMunn, Sir George, *The Living Indian Official*, G. Bell, London, 1934.

124. Maitland, *Letters from Madras*, Putni, London.
125. Major Hervert Benjamin Edwardes, *A Year on the Punjab Frontier in 1848-49*, 2 vols. London, 1851.
126. Malcolm, Sir John, *A Memoir of Central India, including Malwa, and Adjoining Province*, 2 vols., London, 1823.
127. Malim, Michael, *The Pagoda Tree*, k. Mason, 1963, London.
128. Malleson, Lt-Col G. B., *Recreations of An Indian Official*, Longmans Green, 1872.
129. Mannin, Ethel, *Jungle Journey*, Jarrolds, 1950, London.
130. Marchioness of Bute, *The Private Journal of The Marquess of Hastings*, S& Otey, 1858.
131. Maria, Lady Nugent, *A Journal from the year 1811 till the year 1815*, 2 vols. London, 1839.
132. Martyn The Rev. Henry, *Journals and Letters of the Rev. Henry Martyn*, B.D., 2vols. London, 1837.
133. Mason, Philip, *A Shaft of Sunlight*, Scribners, 1978, London.
134. Mason, Philip, *The Men Who Ruled India*, Putni, London.
135. *Memoirs of William Hicky*, Hurst & Blackett, 1950, London.
136. Metcalfe, Emily, Thomas, Sir., *The Golden Calm: An English Lady's Life in Mughul Delhi*, Weebb & Bower, 1980, London.
137. Michael, Edwards, *Glorious Sahibs, the Romantic as Empire-builder*, 1799-18, London, 1967.
138. Morris, James, *Heaven's Command*, H. B. Jovanovich, London, 1973.
139. Mundy, Captain Godfrey Charles, *Pen and Pencil Sketches, Being the Journal of a Tour in India*, 2 vols., London, 1832.
140. Murray's, A *Handbook for Travellers in India, Burma and Ceylon, including all British India*, London, and Calcutta, 1929.
141. N. L. Hallward, *William Bolts: A Dutch Adventurer Under John Company*, Cambridge U. P. London, 1920.
142. Nassau Less, *V. A Memorandum* ..... Calcutta, 1866.
143. Nigam, Dr. Raj K., *Memoirs of Old Mandarins Of India*, Document Centre for Policy Research, 1985, London.
144. Norah, Vivian, *Letters of The Babalog*, Putni, London.
145. Nugent, Lady Maria, *A Journal from the year 1811 till the year 1815 including a Voyage to and Residence in India*, 2 vols, London, 1839.
146. O. Malley, LSS, *The Indian Civil Service*, London, 1931.
147. O' Meara, Patrick, *Indian Tales*, Self-published, USA, 1999.

148. Officer, an. *Sketches of India*, London, 1825 [1821]
149. Ovington, F., *A Voyage to Surat in the Year 1689*, London, 1696.
150. Parks, Fanny, *Asiatic Gallery, Baker Street Bazar; Grand moving diorama of Hindostan*, Portman Square, London, 1851.
151. Parks, Fanny, *Wanderings of a Pilgrim*, 2 vols., London, 1850.
152. Parsons, Sir Michael, *Room to Swing A Cat*, Memoir Club, 2003, London.
153. Pester, John, *War and Sport in India*, 1802-6, 1913.
154. Philips, C. H., editor, *The Correspondence of David Scott*, 2 vols, London, 1951.
155. Pickering, Carol, *Goodbye India*, P. Skelton, London.
156. Pinn, Fred, *Mandelli, Darjeeling Tea Planter & Ornithologist*, Putni, London.
157. Postans T., *Personal Observations on Sindh; the Manners and Customs of its Inhabitants; and its Productive Capabilities: with a Sketch of its History*, London, 1843.
158. Postans, Marianne, *Cutch; or, Random Sketches, taken during a Residence in one of the Northern Provinces of Western India; interspersed with Legends and Traditions*, London, 1839.
159. Prendergast, John, *Prender's Progress*, Cassell, 1979, London.
160. Prinsep C. C., editor, *Record of Service of the Hon. East India Company's Servants in the Madras Establishment*, 1741-1858, London, 1885.
161. Pryme, G, *Autobiographical Recollections of George Pryme*, Cambridge, 1870.
162. Raikes, Charles, *The Englishman in India*, London, 1867.
163. Ramsden, A. R. *Assam Planter*, J. Gifford, 1945, London.
164. Rivett-Carnac, J. H., *Many Memories of Life in India, At Home, and Abroad*, Wm Blackwood, 1910, London.
165. Robert, Jones, *Three Quarters of a Footprint*, Bantam press 1994, London.
166. Roberts Emma, *Oriental Scenes, Dramatic Sketches and Tales, with other Poems*, Calcutta, 1830.
167. Roberts Emma, *Scenes and Characteristics of Hindostan, with Sketches of Anglo-Indian Society, of the Red Sea*, 2 vols., London, 1832.
168. Roberts, Field Marshal Lord, *Forty-One Years in India from Subaltern to Commander-in-Chief*, Richard Bentley & Son, 1897, London.

169. Robinson, Phil. *Under The Punkah*, Rivington, 1881, London.
170. Rogers, T. E., *Great Game: Grand Game*, Duckworth, 1991, London.
171. Rohn, Ryley (1791-1820), *Personal Life in Bengal*.
172. Rolt, Francis, *On The Brink In Bengal*, J. Murray, 1991, London.
173. Saines, James R., *Country Born*, Croscombe Press, 1986, London.
174. Salatore, B. A., editor, *Fort William–India House Correspondence*, 1782-5, vol. 9, Delhi 1959.
175. Saumarez Smith, W. H. A. *Young man's Country*, Putni, London.
176. Sharp, Sir Henry, *Goodbye India*, O.U.P., 1946, London.
177. Sherer, J. W., *Sketches of India*, Longman, 1826, London.
178. Sherwwod, Capt. and Mrs, *The Life and Times of Mrs, Sherwood*, 1775-1851, London, 1910.
179. Sinha, M. K. *In Father's Footsteps*, Vanity Books, 1981, London.
180. Sinha, N. K., editor, *Fort William – India House Correspondence, 1967-69*, Vol. 5, Delhi, 1949.
181. Sleeman, Maj-Gen Sir W. H., *Rambles & Recollections of an Indian*, official Vols. I & II.
182. Sleeman, Sir William Henry, *Diary of a Tour through Oude, in December 1849*, & January & February, 1850, 2 vols., Lucknow, 1852.
183. Stacton, David, *A Ride on A Tiger*, Meusum Pr., London, 1954.
184. Stanford, J. K. (Ed.), *Ladies in The Sun*, Galley Press, London, 1962.
185. Tennant, Rev. William, *Indian Recreations*, 3 vols. London, 1804.
186. The Indian Rebellion: Its Causes & Results, J. Nisbet, 1858, London.
187. The Marquesss of Hastings, *The Private Journal of the Marquess of Hastings*, 2 vols., London, 1858.
188. *The Route of The Overland Mail To India*, from Southampton to Calcutta,
189. Thomson, Lt.-Col S. J. *The Silent India*, Blackwood, London, 1913.
190. Thornton, *Left - Light and Shade in By Gone India*, London, 1927.
191. Trevelyan, Humphery, *The India We Left*, Macmillan, London, 1972.
192. Turnbull, F. G., *Remember Me To Everybody*, West Meadow, Canada, 1998.

193. Twining, T. *Travels in India: A Hundred years ago*, London, 1893.
194. Valentia, Viscount G., *Voyages and Travels to India, Ceylon, the Red Sea, Abyssinia, and Egypt in the Years 1802-6*, 3 vols. London. 1811.
195. Vansittart, Jane (ed.) *From Minnine, With Love*, Putni, London.
196. Wallace, Lt. R. J. *Fifteen Years in India*, 1802-16, London, 1823.
197. Wallace-Dunlop Madeline and Rosalind, *The Timely Retreat; or, A Year in Bengal before the Mutinies*, 2 vols. London, 1858.
198. Wardrop, A. E., *Modern Pig-Sticking*, Purneah, Tent Clubs, 1914,
199. Watts, William, *Memoirs of the Revolution in Bengal*, 1757, Calcutta Council, 1988.
200. Wide, *A Bengal Civilian*, London, 1859.
201. William Hickey, *Memories of William Hickey*, 1749-1809, 4 vols. London, 1925.
202. Williamson, Captain Thomas, *Oriental Field Sports; Being A Complete, Detailed and Accurate Description of the Wild Sports of the East; and exhibiting*, 2 vols., London, 1858.
203. Williamson, Captain Thomas, *The East India Vade-Mecum*; or, *Complete Guide to Gentlemen intended for the Civil, Military, or Naval Service of the Hon. East India Company*, 2 vols., London, 1810.
204. Williamson, Captain Thomas, *The European in India*, London, 1813.
205. Williamson, Capt-T., *Oriental Field Sports*, London, 1807.
206. Wilson, C. R., editor, *Early Annals of the English in Bengal*, 3 vols, Calcutta, 1895-1917.
207. Wilson, C. R., editor, *List of Inscriptions on Tombs or Monuments in Bengal*, Calcutta, 1896.
208. Wilson, C. R., editor, *Old Fort William in Bengal*, 2 vols. London, 1906.
209. Woodruff [Mason], Philip, *The Founders*, Putni, London.
210. Woodruff [Mason], Philip, *The Guardians*, (Vol. 2), Putni, London.
211. Yalland Zoe, *Boxwallahs*, Putni, London.
212. Young, Desmond, *Fountain of The Elephants*, Putni, London.

গ্রন্থপঞ্জি

১. অপ্রকাশিত নথিপত্র

Ahmed, Zakiuddin, *Unpublished Thesis.*

Bell, F.O., *Memoirs of Officials Life in India: Bengal 1930-1947.*

Christie, W.H.J., *Memoirs of Indian Civil Service.*

Dash, Arthur, *Memoirs.*

Griffith, Pereival Sir, *The Raj*, Telephone Transcript, 1972.

Kisch, H. M., *Personal Papers.*

Letter from F.W. Ward to Rev T. H. Wyndham, 15.9. 1903.

Martin, James Rea, *Personal Papers.*

Martyn. P. D., *Memoirs.*

Mc-Inerny. E. F., *Personal Papers.*

Rahmatullah, *Memoirs.*

Tyson, J.D. *Papers.*

Woodford, G.P. *Memoirs.*

[এসব পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে ব্রিটিশ লাইব্রেরির 'ইন্ডিয়ান অ্যান্ড অরিয়েন্টাল লাইব্রেরি' শাখায়।]

২. প্রকাশিত ইংরেজি গ্রন্থ

A Civilian, *Letter to East India Company on Hailebury*, London, 1883.

Ahmad, S. U., *Dacca*, London, 1986.

Allen, Charles, *Scrapbook of British India*, 1877-1947, London, 1977.

Archer, Mildred, *British Drawings in the India office Library*, Vol I and II, London, 1969.

Archer, Mildred, *Company Drawing in the India Office Library*, London, 1972.

A Retired Bengal Civilian, *A Glance at the East*, London, 1857.

Atkinson, George F., *Curry and Rice: The Ingredients of Social Life at our Station in India*, (Reprint) Hyderabad, 2001.

Baker, Edward B., *Sprots in Bengal and How & When and Where to Seek it*, London, 1886.

Banerjea, Surendranth, *A Nation in Making*, London, 1925.

Beames, John, *Memoirs of a Bengal Civilian*, (Reprint), Delhi,

1984.

Bevan, H., *Thirty Years in India*, London, 1839.

Bhattacharya, Sachidananda, *A Dictionary of Indian History*, Calcutta, 1972.

Birt, F.B. Bradley, *Sylhet Thakery*, London, 1911.

Bellow, S.S., *Paternal Government*, Lahore, 1899.

Beveridge, Lord, *India Called Them*, London, 1947.

Buckland, C.T., *Sketches of the Social Life in India*, London, 1884.

Carry, W. H., *The Good Old Days of Honorable John Company*, (Reprint) Kolkata, 1964.

Choudhuri, N.C., *Culture in a Vanity Bag*, Bombay, 1976.

Choudhuri, Susil, *Trade and Commercial Organizational in Bengal*, Calcutta, 1975.

Choudhury, Susil, *The Prelude to Empire*, Dhaka, 2000.

Cotton, H., *Indian and Home Memories*.

Dani, A. H., *Dacca*, Dacca, 1957.

Dyson, Ketaki Kushari, *A Various Universe*, New Delhi, 2002. (2nd edition)

Ex-Civilian, *Life in the Mufussil*, London, 1878.

Extracts of Letters in the Case of Mr. William Tyler, London 1878.

Fraser, Lieutenant, F.J., *The Station Cat: A Sketch of Mofusil Life in One Act*, Calcutta, 1893.

Fraser, Lovat, *India, under Curzon and After*, London, 1912.

Ghosh, Suresh Chandra, *The Social Condition of the British Community in Bengal*, Leiden, 1970.

Ghosal, Akshoy Kumar, *Civil Service in India*, Calcutta, 194[illegible].

Grant, Coleswarthy, *Rural Life in Bengal*, London, MDCCCLX, p. 201.

Gouldsbury, C.E., *Tigerland*, London, 1913.

Gupta, Brijen K., *Sirajuddaulah and the East India Company*, Leiden, 1962.

Harrison, Mark, *Climates and Constitutions*, New Delhi, 1991.

Karim, Abdul, *Dacca : The Mughal Capital*, Dacca, 1964.

Kattenhorn, Patricia, *British Drawings in the India Office Library*, Vol. II, London, 1994.

King, Anthony, D., *Colonial Urban Development: Culture, Social Power and Environment*, London, 1976.

Ladseer, P.C. Trench, *Tiger Hunting or a Day Sport in the East*, London, 1836.

Lawson, Philip, *The East India Company*, New York, 1993.

Mackay, George Aberigh, *Twenty one Days in India being the tour of Sir Ali Baba*, Bangkok, 1999. (reprint)

Maunier, Rene, *The Sociology of Colonies* (ed. & trans. Lorimer, F.O.), London, Vol. I and II, 1949.

Memorials of old Hailebury College, London, 1893.

Moor, J.C., *Chota Sahib*.

Palling, Bruce, *A Literary Companion: India*, London, 1992.

Philips, C.S., *The East India Company*, Manchester, 1961.

Pratt, Hodgson, *The Indian Civil Service A Second Selection of Articles and Letters on Indian Question*. London, 1857.

Simson, Frank. B., *Letters on Sport in Lower Bengal*, London, 1896.

Spear, Percival, *The Nababs*, Calcutta, 1991.

Spear, Percival, *Clive and his India*, London, 1975.

Talbeys. J., *Travels in Europe, Asia and Africa*, Calcutta, 1878.

Taylor, James, *A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca*, Calcutta, 1840.

Taylor, William, *Thirty-Eight years in India*, Vol. II London, 1882.

The First years of a Little Girl in Bengal, London, 1829.

Wife of a Bengal Civilian, *The Rose and Lotus or House in England and Home in India*, London, 1853.

Williamson, Capt. T., *Oriental Field Sport*, London, 1807.

Wise, James, *Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal*, London (Not Published).

Woodruff, Philip, *The Men who Ruled India*, Vol. I & II, London, 1973.

Yule H. and Burnell, A., *Hobson-Jobson*, London, 1903.

৩. বাংলা বই

অন্নদাশঙ্কর রায়, *জীবন যৌবন*, কলকাতা, ১৯৯৯।

অশোক মিত্র, *তিনকুড়ি দশ*, কলকাতা, ১৯৯০।

আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস* (মোগল আমল), রাজশাহী, ১৯৯২।

আবদুল হক চৌধুরী, *বন্দর শহর চট্টগ্রাম*, ঢাকা, ১৯৯৪।

ওহীদুল আলম, *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, চট্টগ্রাম, ১৩৯৬।

চার্লস ড'য়লী, *ঢাকার প্রাচীন নিদর্শন* (হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত), ঢাকা, ১৯৯১

জওহরলাল নেহেরু, *আত্মচরিত*, [সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার অনূদিত] কলকাতা, ১৩৫৫।

তপন মোহন চট্টোপাধ্যায়, *পলাশীর যুদ্ধ*, কলকাতা, ১৯৬৫।

নবীন চন্দ্র সেন, *নবীনচন্দ্র রচনাবলী*, ১ম খণ্ড [সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত], কলকাতা, ১৩৬৬।

পূর্ণেন্দু পত্রী, *পুরনো কলকাতার কথাচিত্র*, কলকাতা, ১৯৭৯।

ফ্রান্সিস বুখানন, *দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় ফ্রান্সিস বুখানন*, ঢাকা, ১৯৯৪।

বিনয় ঘোষ, *কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত*, কলকাতা, ১৯৭৫।

মীর মশাররফ হোসেন, *মশাররফ রচনা সম্ভার* [কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত], ঢাকা, ১৯৭৬।

মুনতাসীর মামুন, *হৃদয়নাথের ঢাকা শহর*, ঢাকা, ১৯৮৫।

মুনতাসীর মামুন, *ঢাকার টুকিটাকি*, ঢাকা, ২০০০।

মুনতাসীর মামুন, *সিভিলিয়ানদের চোখে ঢাকা*, ঢাকা, ২০০৩।

মুনশী রহমান আলী তায়েশ, *তাওয়ারিখে ঢাকা* [আ. স. ম. শরফুদ্দীন আহমদ অনূদিত], ঢাকা, ১৯৮৫।

রজতকান্ত রায়, *পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ*, কলকাতা, ১৯৯৪।

রাধারমণ মিত্র, *কলিকাতা দর্পন*, দুই খণ্ড, কলকাতা, ১৯৮২, ২০০৩।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আমার বাল্যকথা*, কলকাতা, ১৯৮৩।

সব্যসাচী ভট্টাচার্য্য, *ব্রিটিশ রাজ্যের অর্থ ব্যবস্থার ভিত্তি*, কলকাতা, ১৯।

সমুদ্র গুপ্ত, *শহর কলকাতার আদিপর্ব*, কলকাতা, ১৩৬৮।

সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো*, ঢাকা, ১৯৮৪।

সুশীল চৌধুরী, *পলাশির যুদ্ধ: অজানা কাহিনী*, কলকাতা, ২০০৪।

সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ভারতের শিল্প বিপ্লব ও রামমোহন*, কলকাতা, ১৩৭৩।

শৈবাল কুমার গুপ্ত, *কিছু স্মৃতি কিছু কথা*, কলকাতা, ১৯৯৪।

৪. ইংরেজি প্রবন্ধ

Cohn Bernard, *Cloth, Clothes and Colonialism: India in the 19th Century*, (Mimeo) New Work, 1993. (not for publication)

Guha, Ranajit, 'On some Aspect of the Historiography of Colonial India', Guha, Ranajit (ed.) *Subaltern Studies I*, Delhi, 1982.

Hodgon. Pratt, 'The Indian Civil Service', *A Second Selection of Articles and Letters on Indian Question*, London, 1857.

Lunt, James, 'Introduction', Kinciad, Dennis, *British Social Life in India (1608-1937)*, London, 1973.

Penner, Peter, 'Introduction', Beames, John, *Memoirs of a Bengal Civilian*, Delhi, 1984. (Reprint)

Williamson, Themas, 'Prface' to the Europeans in India', *From a Collection of Drawing by Charles D'Oyley*, London.

৫. বাংলা প্রবন্ধ

অরবিন্দ পোদ্দার, 'শস্যের ভিতরে রৌদ্র: অম্বিস্টের সন্ধানে সমাজ মানস', স্বপন বসু ও ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত, *উনিশ শতকে বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি*, কলকাতা, ২০০৩।

ভেলাম ভান সেন্দেল, 'ভূমিকা', *দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় ফ্রান্সিস বুখানন (১৭৯৮)*, ঢাকা, ১৯৯৪।

শব্দসূচি

অ

অক্সফোর্ড ৩২, ৩৩, ১২৭, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৬৮
অন্নদা শংকর রায় ৩৩, ৫২, ৫৫
অরবিন্দ, শ্রী ৩৩
অল পাকিস্তান ইঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশন ৪০২
অডালেন ২৬৮
অমিয়া সেনগুপ্তা ৩৮৮
অরিয়েন্টাল মিসসেলানিস ৯৬
অমৃতসর ৭৫, ৩০৫
অস্ট্রেলিয়া ৩৮৮
অশোক মিত্র ৩৩, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৬৭, ৬৮, ৮১

আ

আইয়ুব খান ১১৫
আউটলাইন অফ ইন্ডিয়ান ফিলোলজি ১২৩
আওরঙ্গবাদ ২২৬
আগরতলা ৩৩৪
আন্দরকিল্লা ২২৪
আলমগীর, দ্বিতীয় ২২৪
আবদুর রশীদ ২১৯
আবদুর রাজ্জাক ১০২, ২০৯
আবদুল আলী, মৌলভী ৩২
আবদুল করীম ১০৮, ২২১, ২২২
আবদুল হক ২১৬, ২২৩
আবদুস সোবহান ২২৪
আরশাদ হোসেন ৩৫৬
আলজিরিয়া ৫৮
আলগী ২৫২
আর্ল, জেমস ১৩৫
আলমোড়া ৭৫
আসকারি ৪০৭
আহসানউল্লাহ ৩০৭
আহসান মঞ্জিল ৪০৪, ৪০৭
আগ্রা ৭৫, ২২৬
আর্চার, মিলড্রেড ৯২, ৯৩
আব্বাস ৪১৭
আম্বালা ১২১
আরা ১১৮
আরাকান ১০১, ১৭৯
আসাম ৮২, ৮৩, ৮৮, ১২৪, ১৪২, ২৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৭৩, ৩৯২, ৪১৭
আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ৩৫৮
আসানসোল ১২৭
আয়ারল্যান্ড ১০৩, ১২৯, ২১৪
আকিয়াব ৩৪৪
আজিজ আহমদ ৩৯৬, ৩৯৭, ৪০১-৪০৩
আদিসকম্ব ১০৫
আফ্রিকা ৭৪
আমিরউদ্দিন ২২৩
আমিরগঞ্জ ১৭৩, ১৭৪
আমিনুল্লাহ খান ৪০৮
আলিপুর ১১৮, ৩৯১
আলিপুর চিড়িয়াখানা ১০১
আলীপুর ডুয়ার্স ৩৭২
আড়িয়াল খাঁ ৩৮৭
আনেৎ ৪৯

আমেরিকা ৫৯
আর্মেনিটোলা ২৩৪

ই

ইউনাইটেড সার্ভিস ক্লাব ৩৫৪, ৪১৫
ইউনিভার্সিটি কলেজ ৩৪
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১০১, ১০৩, ১০৫, ১২১, ১৩৭, ১৪৬, ১৬২, ১৭৩, ২৩৪
ইকবাল আথার আলি ৫২
ইলবার্ট বিল ১২২
ইসলামাবাদ ২২২
ইটালিয়ান ৭৬
ইস্টার্ন বেঙ্গল অ্যান্ড আসাম প্রসটিটিউট অ্যাক্ট ৩৭৬
ইন্দ্রাকপুর দুর্গ ৩০৪, ৩৬৯
ইয়ার্স অফ ডেঞ্জার ১২৫
ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি ৯২, ৯৩
ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ২০
ইন্ডিয়া হাউস ১০৩
ইন্ডিয়া বিল ৫৪
ইন্ডিয়ান হিস্টোরিকাল রেকর্ডস কমিশন ৯৮
ইলিয়ট ৩৩৯, ৩৪৭
ইডেন, অ্যাসলি ৭১, ৩৩৭, ৩৪১
ইয়ং ডিক্টোরিয়ান ইন ইন্ডিয়া ১১৯
ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৩
ইংলিশ, হিউ ২৮
ইংল্যান্ড ১৯, ২৭, ৩১, ৩২, ৩৩, ৪৪, ৫০, ৮৬, ৯৩, ৯৭, ১০১, ১১২, ১১৬, ১১৮, ১২৫, ১২৬, ১২৯, ১৩৬, ১৪২, ১৯৬, ১৯৮, ১৯৯, ২০৫, ২০৭, ২১১, ২১৪, ২১৮, ২৪৫, ২৮২, ৩১০

ঈ

ঈদগাও ১৮০

উ

উইলস ৯৭
উইলকিনসন ২৯৩
উইলকিনসন, চার্লস ৩২
উইলিয়াম ১৩৬
উইলিয়াম, থমাস ৪৫
উইলিয়াম, মনিয়ের ৩২
উইলিয়ামসন ২৫৫
উইলিয়াম, চতুর্থ ১২১
উইলিয়াম হকিন্স ১৩
উডরাফ, ফিলিপ ১৮, ১৯, ৩৪, ৫৫, ৬৭
উডফোর্ড ৭৭
উডস, ভেরনন ৩৫৯
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ১২১, ৩৮১
উত্তর প্রদেশ ২৯
উত্তর ভারত ৯৩
উত্তমাশা অন্তরীপ ১৩৬
উদয়পুর ৩২৮
উলউইচ ৩৩
উদাসীন পথিকের মনের কথা ৬৪
উবায়েদ উল্লাহ ২২৩
উলিপুর ১০৪
উড়িষ্যা ১৪, ১৫, ১২২, ৩৩৭

এ

এটকিনসন ৭৭
অ্যান, রানী ৩৪
অ্যান, লিকি ২৫

এমনিয়াজ, আগা ২৩৩
এলছেড়া ২৫২
এ্যাশলি ৩৬৮
এমা রবার্টস ৪৩
এলারকার, মিসেস ২২৫
এন্ডারসন, জন ৪২০
এলাহাবাদ ৪৮, ৭৫ ১০৩
এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় ১০১
এ ফিউ নোটস অন দি ডিস্টিক্ট অব ময়মনসিংহ ১০৩
এমিলি শেক্সপিয়র ২৮
এলিসন, আর ৩৯১
এলিস, টম ৪০৯
এলিয়ট ১০৮
এলিজ্যা ফে ৩৯, ৪০
এলিজাবেথ ৩৫
এলিজাবেথ, প্রথম ১৪
এশিয়াটিক সোসাইটি ৯২, ২২২
এ কে ফজলুল হক ৩৯৭
অ্যামেলিয়া ২৭

ও

ওসমানী উদ্যান ২৩৪
ওয়াই, গর্ডন ২৯০
ওয়াইজ ১১৭, ২৪২
ওয়াইজ, জেমস ২৩৮, ২৩৯
ওয়ার্কম্যান, এন, এফ ৩৭৯
ওয়াটস ১৭
ওয়ার্ড, এফ, ডব্লিউ ৫৫
ওয়ালমসলি ৩৬১
ওয়ালটার্স ১১৬, ২২৯, ২৩৮, ২৩৯
ওয়াদির আলী ১৬২
ওয়ালি বেগ খান ২২৫
ওহীদুল আলম ২২৪
ও' ম্যালি ৯২, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৮০, ৩৮১
ওয়ে ৫৩
ওয়ের, এডওয়ার্ড ২৭
ওয়ের, জন রিচমন্ড ২৭
ওয়েলস ৭৫
ওয়েলেসলি, লর্ড ৩০, ২১

ক

কটক ৩৩৭
কটন ৪৮, ৪৯, ৮২
কটন, হেনরি ২৯
কটন, যোশেফ ২৯
ক্রইক শ্যাংক, এফ ৩৭৯
ক্রফট ১৫১
ক্রফটিয়াস, চার্লস ২২৫
কক্সবাজার ১৮০, ৩২৩, ৩২৪, ৩৪৫, ৩৪৮, ৩৬০
কক্স, ক্যাপ্টেন ৩৪৭
কর্ণওয়ালিস ১৮, ২২, ৪০, ৯৬-৯৮
কর্ণফুলী ১৭৬, ২১৬, ২৮৮
কলকাতা ১৫, ১৬, ২০, ২১, ২৪, ৩৪-৩৬, ৪৫-৪৮, ৫১, ৭৫, ৭৬, ৮৯, ৯২, ৯৫, ৯৭, ৯৯-১০১, ১০৪-১০৬, ১০৯-১১৪, ১১৮, ১১৯, ১২৪, ১২৬, ১২৮, ১৩৫-১৩৮, ১৫০, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৭, ২০৪, ২১০, ২১৬, ২২০, ২২৫, ২২৭, ২৩৫, ২৫৭, ২৮২, ৩১৬, ৩৩০, ৩৩২, ৩৩৭, ৩৫৪, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৬, ৩৮১, ৪০২, ৪০৬, ৪০৮, ৪১৪, ৪১৫, ৪২০
কলফিল্ড ১৭২

কলভিন, জন ৩২
কলম্বো ৪১৫
কম্পারেটিভ গ্রামার ১২৩
করাচী ৭৫, ৪০২
কফিলউদ্দিন ৪০২
কলিন ৯৭
কল্লিফেরাস ২৮৬
করুণাকুমার হাজরা ৫২
করেরহাট ১৯২
স্ক্রাইন, ফ্রানসিস ১২০, ১২১, ৩১২-৩১৫
ক্লাইভ, রবার্ট ১৩, ১৫, ১৭, ১৯, ৫৭
ক্রাউচ ৩৪০, ৩৪৭
কাউং-লা-পরু ১৭৭
কাউং-হলা-ইপুরা ১৭৭
ক্লার্ক, চার্লস ২৬
কার্জন, লর্ড ৬৩
কার্জন ৭৯, ৮০
কার্টরাইট, এ পি ৩৭৯
কানপুর ৭৫, ১০৪
কারষ্টায়ার্স, আর ১১৭, ১১৮, ১৬০, ৩৩৪-৩৩৬
কায়রো ৩৪
কার্টার, বোনহাম ৩৭৭
কাতালগঞ্জ ২১৭
কাপ্তাই ১৮৭, ১৮৮
কাপাসিয়া ৩১০, ৩৬৮
কামারউদদৌলা ২৩১
কামাল লোহানী ৭১
কাসালং ২৯৩, ৩২০
কাথালং নদী ১৮৯, ১৯০
কার্টিস ২৮৬
কাদিজ ১৩৫, ১৪৪
কামিনীকুমার দত্ত ৩৯০
কাপিং, ক্যাপ্টেন ১৭১
কারি অ্যান্ড রাইস ৭৮
কালিকট ১৩
কালিপুরা ৩০৫, ৩০৬
কাশিমবাজার ১৫
কাশ্মীর ৩৮১, ৩৮৫
কালীনারায়ণ রায় ১১৫, ২৭৭-২৭৯
কাসৌলি ৭৫
কিং ৭৪, ৮১
কিংস কলেজ ৩৩
কিপলিং, রুডিয়ার্ড ৩৫৩
কিলপ্যাট্রিক, মেজর ১৭
কিশ্চ, হারম্যান মাইকেল ১১৯, ১২০
ক্রিস্টি, ডব্লিউ ২৯, ২৯
ক্রিস্টি, থমাস ২৮, ২৯
কুক, জ্যাক ৪২৪
কুচবিহার ৩৮৯
কুষ্টিয়া ৫৫, ১১৯, ৩৩১, ৩৩৫
কুমিরা খাল ২২৫
কুমিল্লা ৮৬, ৮৭, ৯০, ১১২, ১১৭, ১৯২, ১৯৩, ২৫০, ২৫৩, ২৮৯, ২৯৩-২৯৮, ৩০৩, ৩২৪,-৩৩০, ৩৮৬, ৩৮৯-৩৯১
কুমিল্লা ক্লাব ৩৮৯
কুতুবদিয়া ১৮২, ৩২৩
কৃষ্ণনগর ৫২
কেন্ট ৭৫
ক্যান্টন ৩১
ক্লে ৯৪
ক্লে, আর্থার লয়েড ৮৯-৯১, ১১১-১১৭, ২৮৮-৩১১
ক্লেটন ৩৫৮, ৩৫৯

ক্যাটচিক, আগা মিনাস ২৩৩
ক্যাম্পবেল, জর্গ ৩১৩
ক্যাম্পবেল, চার্লস ২৫৬
স্কেচ অফ দি টপোগ্রাফি ১০৫
ক্যাপটেন পোগসনস ন্যারেটিভ ১০৪
কেমব্রিজ ৩২
ক্যালকাটা ম্যাগাজিন ২১৮
ক্যালডিক্ট, টমাস ২২২
কেশবপুর ২১৫
ক্যানিং ২৬৬
ক্যানিংহাম ১৭
কেরি ৩১
ক্যারিট, মাইকেল ৬৯, ১২৭-১২৯, ৪২৩-৪২৬
কে সি দে ৩৮৫
কোলব্রুক ৩১
কোটালিপাড়া ৯০, ৩০১
কোম্পানির হাট ১৭৭, ১৭৮
কোয়ি, জন ১৪১, ১৪৯
কংগ্রেস ৬৪
স্কট ৪৪
স্কটল্যান্ড ১০১, ১২৯, ১৩৫

খ

খাজা আবদুল গনি ১১৫
খুলনা ৩৮৫, ৩৮৬
খুরুশখালি ১৮১

গ

গর্ডন ৩২৯
গর্ডন, ইভানস ৩৪০, ৩৪৪, ৩৪৬, ৩৪৮
গফর গাঁ ২৮৪
গঙ্গা ১৩৭, ১৩৮, ১৫৯, ৩৭৫, ৩৯৫
গণি মিয়া ৯১, ১১৭, ৩০৭
গ্রান্ট, কোলসওয়ার্দি ৪৯, ৯৪
গ্ল্যাডউইন ৩২
গ্লাস ২৩৩
গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় ১০১
গ্রামার ফর দি বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ ১২৩
গ্রাহাম ১৩০, ২৬৭-২৮৭
গ্রাহাম, জজ ১১০, ১১১
গাজিউদ্দিন হায়দার ২৩০, ২৩১
গার্লিক, আর আর ৩৯১
গান্ধী ৪১২, ৪১৪
গার্ডেন রিচ ৩৩৭, ৩৫৩
গারো পাহাড় ৯২
গিলক্রাইষ্ট, জন ৩০-৩১
গিলপিন ২৮৮, ২৯১
গ্রিফিথ, পার্সিভাল ৫৫
গ্রীনউইচ ১২১
গুডউইল ৫২
গুজরাট ১২১
গ্রেগ ৩০৭
গ্রেট ইস্টার্ণ ১১২
গ্রেটা ৩৮৯
গ্রেহাম, হ্যারল্ড ৫২
গোয়া ১৩
গোমতী ২৯৪, ২৯৮, ৩২৪
গোলাম হায়দার, মুন্সী ৩২
গোয়ালন্দ ৮৮ ১১৮, ২৫৪, ২৫৫, ৩৩২, ৩৩৪-৩৩৬
গোবিন্দরাম ১৬৯
গোবিন্দপুর ১৫
গৌরনদী ৯০, ৩০১
গৌরহরি সিং ১৪৭

ঘ
ঘাটাইল ৪২৬
ঘোষাল ৩৯

চ
চকবাজার ২২৮, ২২৯
চকরিয়া ১৭৯, ১৮৪
চরসিন্দুর ৩৭২
চরমুকুন্দিয়া ৯১
চলনবিল ৩৭৫, ৩৭৭
চন্দননগর ১৪
চন্দ্রনাথ মন্দির ১৭৫
চন্দ্রঘোনা ২৯১
চট্টগ্রাম (চাঁটগা) ৫০, ৮৬-৯০, ১০০, ১০১, ১০৪-১০৬, ১১২, ১১৭-১১৯, ১২৩-১২৫, ১২৯, ১৪৮, ১৭৪-১৭৭, ১৮৬, ১৮৭, ১৯২, ২০৫, ২১৪-২২৫, ২২৭, ২৪২, ২৫০, ২৫৩, ২৮৮, ২৯৩, ৩১০, ৩১১, ৩১৬-৩২৬, ৩৩৭-৩৫১, ৩৫৫-৩৬৫, ৩৭৩, ৩৮৬, ৩৯১-৩৯৩
চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ২১৯
চব্বিশ পরগনা ৪৮, ১১১
চাঁটগা বন্দর ৪০৬
চাঁদপুর ১৭২, ১৭৬, ৩৩৪, ৩৬০, ৩৮৯, ৩৯২
চাম্পারান ১২২
চিনসুরা ১১৯
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ৯৭, ২৪৭
চিটাগাং ক্লাব ৩৫৮, ৪০৪
চিচেস্টার ৭৫
চীন ৩১, ৩২, ৬৩, ৯৫, ১৩৬, ১৫৩, ১৬০
চুয়াডাঙ্গা ৪৮
চুনুতী ১৭৮
চেরাপুঞ্জি ২৩৪
চৈ সিং ১৬২
চৌদ্দগ্রাম ১৯২

ছ
ছোট নাগপুর ৩৩৩
ছোট ফেনী নদী ১৭৩, ১৭৪

জ
জগন্নাথ রায় চৌধুরী ১১৫
জজ, ষষ্ঠ ১২৬, ৪২২
জর্জ স্পার্কস ২২৫
জনসন, জর্জ ৪৩
জব চার্ণক ১৫
জলপাইগুড়ি ১২৪, ৩৯৫, ৩৯৮, ৪০৪
জলপাইগুড়ি মেডিকেল স্কুল ৩৯৪
জয়নারায়ণ ৩৪৫
জমিদার দর্পণ ৬৪
জাস্ট মাই লাক ১২৬
জাফরাবাদ ১৭৬, ২২২, ২২৮
জারবো ৩৪০
জাপান ৩৫৫
জার্মান ৭৬
জামালপুর ৮৮, ২৫৪
জিভর্গ, অক্টোভাট সেতুর ২৩৩
জিমখানা ক্লাব ৮৪
জিয়াউর রহমান ৭১
জ্যাকসন ১৭২, ১৭৩
জেন ২৮
জেমস ফিনলে ৩৯২
জেমস ফিনলে অ্যান্ড কোম্পানি ৩৫৮,

৩৫৯
জ্যামাইকা ১৯০
জেনিভা ৭৫
জেঙ্কিন্স, এল. এইচ ৬২
জোনস, উইলিয়াম ২০৮, ২২২, ২৫৯
জোবরাঘাট ৩৩৭
জোহানা ২২৬
জোয়ারিয়া নদী ১৮০

ট
টমাস, কাপ্তান ১৫৯
স্টার্কি ২৭৪
টলি, জন ২২৫
টঙ্গী ৮৮, ৯১, ১৪২, ২৫৪, ২৭৯, ২৮০, ৩১০, ৩৭০
টঙ্গী ব্রিজ ১১৬
স্টলকার্ট ৩৩৭
টাইসন ৫০, ৭১, ৮১
টাঙ্গন ২৫২, ২৫৫
স্ট্যাটফোর্ড ৩০৭
টার্ণব্রিজ ৭৫
টারমেস, সদ্য ৩৩৯, ৩৪১, ৩৪২
টাঙ্গাইল ১২৭, ১২৮, ৩৬৫, ৪২৩, ৪২৬
টার্ণার ৩৬০
স্টার্কি ২৮৪
স্টিফান, ইয়ান ১২৫
স্ট্রিমাস একাডেমি ১২১
স্টিভেনস, সি ৩৯১
টুইনাম, এইচ.টি ৯৯
টুইনাম, হেনরি ৩৬৪, ৩৬৫
স্টুয়ার্ট ৪০৩
স্টুয়ার্ট, ডগি ৪১৭
স্টুয়ার্ট, মাইক ৪০৮
টেইলর ৯৪, ২২৬, ২২৯, ২৩৩, ২৩৫, ২৩৮, ২৩৯, ৩৫৬-২৬৬
টেইলর, উইলিয়াম ১০৭-১১০
টেইলর, ক্যাপ্টেন ১৬০
টেইলর, জেমস ১০৫
টেইলর, ববি ৪১৯
স্টেইন ৩৮৫
টেমস ২৬৭
টেম্পল, রিচার্ড ৩২
স্টেটসম্যান ৩৫৭, ৩৬০
স্টেপলটন ২৯
ট্রেভিলিয়ান, জি.ও ৫৬, ২২৯

ঠ
ঠাকুরগাঁ ৩৯৫

ড
ড'স, চার্লস ২২৯, ২৩৪, ২৩৫
ডয়লি ৯৪, ১৩৯, ১৪০, ২২৮
ডয়লি, হ্যাডলি ২৬
ডানস্টোন ২৭৫
ডাফ, আলেকজান্ডার ১০৯
ডাফ, জেমস ১৩৫
ডারথ মাউণ ৭৫
ডালরিমপল, উইলিয়াম ১৩৫
ডায়মন্ড হারবার ১৯৪
ডায়েরি অফ ট্রাভেলস অ্যান্ড এডভেঞ্চারস ১০৬
ডিলুলি ৩৯০
ডুর্ণো, এল ৩৯১
ড্রেক, গভর্নর ১৭
ডেভনসায়ার ৫৬

ডে, ম্যাথু ১৩৯
ড্যাশ, আর্থার ৩৪, ৫০, ৭৩, ৭৯, ৮৩, ৮৪, ৯২, ১২৩, ১২৪, ৩৫২, ৪০৯
ডেলাভাল, জোসেফ ২৯৬
ডেভিড ব্রাউন, রেভারেন্ড ৩১
ডেভিডসন, কর্নেল ২২৬-২৪৩
ডেভিডসন, সি জে সি ১০৫, ১০৬
ডেভিস ২৭৮-২৮০

ঢ

ঢাকা ১৫, ১৯, ২৭, ২৮, ৪৭, ৪৮, ৫১, ৫৩, ৭২, ৭৩, ৮০, ৮৩, ৮৭, ৯১, ১০৫-১০৭, ১১০, ১১১-১১৯, ১২৬, ১৩৬-১৪৬, ১৯৭, ২১১, ২১৬-২৪৩, ২৪৫, ২৫০-২৫৩, ২৫৬, ২৬৭-২৮৩, ৩০৩, ৩০৭, ৩১৪, ২২০, ৩৬৫-৩৬৮, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৯১, ৪০০-৪০৯, ৪১৮
ঢাকা নগর জাদুঘর ১১৩
ঢাকা কমিটি ২৪৩
ঢাকা কলেজ ১১৩, ১১৪, ৩০৯
ঢাকা কাউন্সিল ২৭
ঢাকা ক্লাব ৫১, ৭৩, ১১৫, ৪০৩-৪০৯
ঢাকা ফ্লাইং ক্লাব ৪০৩
ঢাকা নিউজ ১১৪
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১০২
ঢাকা জেল ১১৭
ঢাকা পৌরসভা ১১৭

ত

তপন রায় চৌধুরী ৪২১
তমিজউদ্দিন ৩৯৫
তমিজউদ্দিন খান ৩৭০, ৩৭১
তাওরিখ-ই-ইসলামাবাদ ২২৪
তাতিবন্দ ৩৩২
তাপ্তি ১৩
তারিখ ই আলমগিরি ২২৫
তাভেরনিয়ার ২২৭, ২৩৮
তায়েশ ১৩৭
তিব্বত ৩৮৭
ত্রিপুরা ৮৬-৮৮, ১১৮, ১২৩, ২৪২, ২৪৯-২৫১, ২৫৩, ৩১০, ৩১৯, ৩২৮, ৩৩৪, ৩৮৯, ৩৯১
ত্রিহুত ১১৯
তেজগাঁ ২২৯, ২৩২

থ

থ্যাকারে, এডওয়ার্ড ট্যালবট ২৮
থ্যাকারে, ফ্রানসিস ২৮
থ্যাকারে, ডা. থমাস ২৭
থ্যাকারে, উইলিয়াম ম্যাকনিস ২৭, ২৮, ৯৭
থ্যাকারে, রিচমন্ড ২৮
থার্টি এইট ইয়ার্স ইন ইন্ডিয়া ১০৭

দ

দমন ১৩
দক্ষিণ ভারত ৯৩, ১০১
দক্ষিণ শাহবাজপুর ২৫২
দাউদকান্দি ৮৬-৮৮, ২৫০, ২৫২, ২৫৩, ৩০০, ৩০৫, ৩৩০
দ্বারকানাথ ঠাকুর ৬৫
দালালহাট ১৭২
দার্জিলিং ৩৭৪, ৩৭৬, ৩৮৯, ৩৯৫
দামুকদিয়া ৩৭৪

দিউ ১৩
দিওয়ানগঞ্জ ৩২৫
দি কলেজ অব ফোর্ট উইলিয়াম ৩১
দি ঢাকা নিউজ ২৭২, ২৭৩
দিনাজপুর ৫৪, ৮৭, ৮৯, ১০১, ১০৫, ১৩৮, ২৫১, ২৫২, ২৫৫, ৩৯৫
দি লিটল ওয়ার্ল্ড অব অ্যান ১১৮
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ৪০৫
দিল্লী ২৯, ৫১, ৭৫, ১২৬, ১৫৪, ৩০০, ৩০৫
দি স্টেশন ক্যাট ৫৮, ৮৪
দি সোশ্যলজি অব কলোনিজ ৫৭
দীনবন্ধু মিত্র ৩১৪
দুলা হাজারি ১৮০
দুব্যে, আবে ৬৬
দেউলি জেল ১২৬
দেবেন্দ্র চন্দ্র দাস ২২৭
দেলোয়ার হোসেন ৯২
দোলাইখাল ১১৫, ১১৬, ২৪০
দো দোস্তিখালের হাট ১৭৯, ১৮০

ধ
ধলেশ্বরী ২২৬, ২৮২
ধিনয়ং ৩৮৭

ন
নওগাঁ ৫৫, ৪১৪
নওয়াবপুর ৩৬৬
নলছিটি ২১৫
নয়াবাদ ৩৪৫
নদীয়া ১২৬, ৪১৭
নবীনচন্দ্র সেন ৩০
নাগ, মেজর ৪১৮
নাফ নদী ১৮১
নারায়ণ, আর, কে ৬৮
নারায়ণগঞ্জ ৮৬, ১১৬, ২৪০, ২৫০, ৩০৪, ৩০৬, ৩৩০, ৩৬৯, ৩৭০
নাজিমুদ্দিন ৩৯৫, ৩৯৮-৪০২, ৪৪৭
নাসিরাবাদ ২২২, ২৫৬, ২৬৯, ২৯৫
নাটোর ৩৭০-৩৭৭, ৩৮১, ৩৯৫
নিয়াজ মোহাম্মদ খান ৪০১
নিয়াসল্যান্ড ১২৬
নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ১৪৮
নীলদর্পণ ৩১৪
নূরুননবী চৌধুরী ৩৯৬
ন্যাশনাল আর্ট লাইব্রেরি ৯৩
নেপাল ১০১
নেভিল ৩০০, ৩০৩
নেহেরু ৮০
নৈনিতাল ৭৫
নোয়াখালি ৮২, ৮৬, ৮৭, ১০৭, ১৭৩, ২৪৯-২৫১, ২৫৫, ২৫৯, ৩১০, ৩২৭-৩৩১, ৩৮১-৩৮৬
নোয়াখালি খাল ৩৮৩

প
পট ৪২
পনড়ুয়া ১৫৩
পল্টন ২২৯, ২৩০
পদ্মা ৯১, ১০৫, ৩৮৭, ৪১০, ৪১১
পলাশীর যুদ্ধ ১৫, ১৭
পণ্ডিচেরি ১৪
পশ্চিমবঙ্গ ৩১৫
পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ৯৫, ১০১
পটিয়া ৩৬০
পগোজ, মার্কার ২৩৩

পাওয়ার, ডি.কে ৪০৭, ৪০৮
পাগলাপুল ২২৭, ২৪০
পাঁচ টিকরি বিল ৮৭, ২৫০
পাঞ্চ ২৫৯
পাটনা ১৯, ৯৩, ১১৯, ১৩৭-১০৯, ১৯৭, ২১১, ২৫৫, ২৫৬, ২৬৫
পাথরঘাটা ১৮৭
পাবনা ৮৯, ২৫২, ২৫৫, ৩৩১-৩৩৩
পার্বত্য চট্টগ্রাম ২৯, ২৮৮, ২৮৯, ৩২৫, ৩২৭, ৩৪১, ৩৫০
পার্বত্য ত্রিপুরা ৮৬
পাতাহাট ১৭২
পাঞ্জাব ২৯, ১২১, ১২৬, ৩০০, ৩৫৩, ৪০২
পানাউল্লাহ ৩৯৫
পারাসনিস, ডিবি ৯৯
পাহাড়তলি ৩৯২
পাকিস্তান ১২৩, ২১৭, ৪০০, ৪০২, ৪০৯
পানিয়াটি, আলেকজান্ডার ১৪৫
পি.এল. রায় ৪২১
পিট ২৯৪, ২৯৫, ২৯৮, ২৯৯
পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট ২০
পির পোহাম্মদ ২৮১
পিলখানা ২৪২
Principal Heads of the History ১১৭
পীর বদরের মাজার ২২৩
পীলখানা ৩৬৭
পুনা ৯৮
পূর্ব পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশন ১২৩
পূর্ণিমা ১২২, ২৫৫
পেক ৩৫৯, ৩৬৩
প্ল্যাট ৮৮
স্পেন ৯৫, ১৩৫
স্পেনসার ৩৭১, ৩৭২
প্রেম নারায়ণ বসু ১৪৭
প্যারিস ১৩, ৩৪১
প্রেসিডেন্সি কলেজ ১১৪
প্যারী ২৩
পোগসন ১২৯, ২১৪, ২২৫
পোর্ট সাঈদ ৩৪
পৌরসভা, চট্টগ্রাম ৩২১, ৩২২
পৌরসভা, ঢাকা ২৭২, ২৭৩

ফ

ফওজুল করিম ১১৩
ফলতা ৩৩৭
ফস্টার, ই. এ ৪২
ফরাস্টার, এ. এম ৬১, ৬২
ফরাশগঞ্জ ২২৭
ফকিরহাট ১৮৭
ফরিদপুর ৪৯, ৮১, ৯১, ১১৮, ২৫২, ২৫৩, ২৫৬, ৩৮৭-৩৮৯
ফলি, উইলিয়াম ১১৪
ফ্রান্স ৫৯, ৭৬
ফ্রানসিস, ফিলিপস ৪০
ফ্রাংকো-প্রাশিয়ান যুদ্ধ ৩৫০
ফারমার, জে.সি ৪১৬
ফারলং, জেমস ৪৯
ফারুকী ৩৮৯, ৩৯০
ফিল্ড স্পোর্টস ইন ইন্ডিয়া ২৫৫
ফিনি ৪১৫-৪২২
ফিনি, এফ.এ.এস ১২৫, ১২৬
ফিনিক্স পার্ক ২৩৩, ২৩৪

ফিলিপস ২৯
ফিলিমোর ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৬০, ৩৭৩
ফুলবাড়িয়া স্টেশন ২৩৪
ফ্রেজার ৭৮, ৮২
ফেঞ্জা গাজী ৯০, ২৯৭
ফ্যানি পার্কস ৪১, ৪৪
ফেনী ১৭৪, ১৯২
ফেনী নদী ১৯২, ২৫১, ২৯৪
ফোর্ট উইলিয়াম ১৩৬

ব
বঙ্গভঙ্গ ৩৬৬, ৩৬৭
বগুড়া ৩৭৭, ৩৯৫
বটমলি ৩৬৮
ব্রডস্টেয়ারস ৭৫
বর্ধমান ৪৮, ১১৮, ১৩৮, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৯৪
ব্রহ্মপুত্র ৮৮, ১৪৬, ১৫৯, ১৯৮, ২০৫, ২৪৪, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৬২, ৩০৫, ৩৮৭, ৩৯৫
বরকল ১৯০, ৩২০
বলরাম পাল ২৭০
বসন্তী নদী ১৯০
বড় কাটরা ১৩৯, ২২৮
বহরমপুর ৫২
বক্সা ডুয়ার্স ক্যাম্প ১২৩
বক্সা জেল ৪৪
বল্লাল সেন ২৩৮
বরিশাল ৯০, ৯১, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৪২০, ৪২১
বর্মী ৩১০
বংশী নদী ৮৮, ৮৯, ২৫২-২৫৪
বঙ্গোপসাগর ১৪৮, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৪১, ৩৪২, ৩৮৪
বাইগুনবাড়ি ৩৬৩
ব্রাইটন ৭৫
ব্রাউন ১৭৩
ব্রাউন, ফ্রানসিস ইয়েটস ৯৫
বাকখালি নদী ১৮১
বাকল্যান্ড ৬৬, ৬৭
বাকল্যান্ড বাঁধ ৭৯, ১১৫, ২৬৭, ২৬৮, ৩৬৮
বাকল্যান্ড, সি.টি ১১৫, ১১৭
বাখরগঞ্জ ৮২, ২৫১, ২৫৩, ৩০০, ৩৯৩
বার্টলে ৩৬৮
বার্ডস অফ অ্যান ইন্ডিয়ান গার্ডেন ৩৭৯
ব্রাডলি, বেল ১২৭, ১২৮
বাথ ৭৫
বান্দরবান ১৮৮
বারবার ৩৮৮
ব্রাহ্মণবাড়িয়া ১১২, ১১৭, ২৯৭-২৯৯
বাঁশখালি ১৭৬, ১৭৭
বাঁশবেড়িয়া ১৯২
বাড়বকুন্ড ১৭৫
বার্মা ১০১, ৩৩৭
বারাসাত ২৫৬
বালাসোর ১২২
বাংলা ১৫, ২৯, ৯৩, ৯৪, ৯৭, ১১২, ১১৯, ১২০, ১২৭-১২৬, ১৯৩, ১৯৪, ২০৬, ২১০, ২৫৬, ২৬৬, ২৮৯, ৩১২, ৩৯৩, ৩৯৮-৪০০
বাংলা প্রেসিডেন্সী ২০
বাঁকিপুর ৪৯
ব্লান্ডি ৩৬৮, ৩৬৯

ব্ল্যান্ডি, নিকোলাস ৫২, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৯৪, ৩৯৮
বাবুর ৬১
বারুনী মেলা ২৮২, ৩০৫
বায়েজিদ বোস্তামী ৩১৮
বিউচ্যাম্প ২৭৯
বিক্রমপুর ২৩৮
বিমস জন ৮৩, ১১৭, ১২১-১২৩, ৩৩৭-৩৫১
বিলটিকরি ৮৯
বিলমোরিয়া ৩১২, ৪১৩
বিচার, এ ৭৫
বিচার, জন হারমান ২৮
বিহার ১৫, ১৯, ১০১, ১০৭, ১১৯, ১২২, ২৬৫, ৩৩০, ৩৬৫
বিহারীলাল গুপ্ত ৩৩
ব্রিটিশ লাইব্রেরি ৯২, ১০৩, ১১০, ১২৩
বিবি মরিয়ম ২২৯
বিবিরহাট ৯০
বুলবুল ললিতকলা একাডেমী ১১৭
বুখানন, জন ৩১, ১০৫
বুখানন, ফ্রানসিস ১০০-১০৩, ১৭২-১৯৩
বুড়িগঙ্গা ১১৪, ১৩৭, ১৪৬, ২২৬, ২২৮, ২৩৪
বুড়িরহাট ৯১
ব্যাংক অব বেঙ্গল ২৯৭
বেঙ্গল ক্লাব ৩৫৪
বেঙ্গল পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট ১০৬, ১২১
বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশন ১২৩
বেগুনবাড়ি ৭৯
ব্যাটটাই, এইচ ৩৭৯
বেনবো ৯১
বেল ৫৭
বেল, এফ, ও ৫৪
বেলফোর্ট ২৯০
ব্রেনান্ড ১১৩, ১১৪, ৩০৯
বেনারস ১০৫, ১৬২, ২১১
বেভারিজ, হেনরি ৪৯, ৮১, ৮২
ব্যারাকপুর ১২৪, ১২৬, ২১৪
বেলায়ার্স, কিটি ৩৭০
বেন্টিং ১৮, ২২
বেন্টিংক, উইলিয়াম ৩১৩
বেন্টিং লর্ড ৭৬
বেরিলি ৯৫
বোর্ড অব ট্রেড ২১২
বোর্ড অব রেভেনিউ ২৮, ২১২
বোটানিক্যাল গার্ডেন ১০১, ১০২
বোম্বে ৬১, ১১৮, ৩৮৯, ৪১৫, ৪২২

ভ

ভগ,আর,বি ৩৭৯
ভলনি ৫৯
ভট্টাচার্য, এম ৩২
ভাওয়াল ৮৭, ৮৯, ২৭৬-২৮০
ভাওয়াল জঙ্গল ২৫০, ২৫৩
ভাগলপুর ১১৮
ভাস্কো দা গামা ১৩
ভিক্টোরিয়া আলবার্ট মিউজিয়াম ৯৩
ভিক্টোরিয়া ২২
ভিক্টোরিয়া, রানী ৭৯, ১২১, ৩১৫
ভীনটেইয়া ৩৪৭, ৩৪৮
ভুলুয়া ১৭২
ভেরলেস্ত, গভর্নর ১৯

ভেনিস ২৬৭, ৩০৩, ৩৩৭

ম

মউড ৩৭২
মউড ডাইবার ৪৭
মওলা সায়েদ ২২৫
মওনিয়ে, রেনি ৫৭-৬৬
মঘঘাট ২১৬
মন্টপেলিয়ার ২২৩
মনসন, কর্নেল ১৩৯
মহম্মদ আলী জিন্নাহ ৪০২, ৪০৩
মহম্মদ ইয়াসিন ২২৪
মশলা দ্বীপ ১৩, ১৪
মস, ইউজিন ৩৫৩
মসলিপট্টম ১৬
ময়মনসিংহ ৫৩, ৬২, ৮৭, ৮৮, ৯২-১০০, ১০৩, ১০৭-১১, ১১৫, ১৯৭-২১৩, ২৪৪-২৪৮, ২৫০-২৬৬, ২৮৩-২৮৭, ৩০৭, ৩৬৩-৩৬৫, ৪১৮-৪১৯, ৪২৩, ৪২৫
ময়নামতি ১৯৩, ২৯৫, ২৯৭
ময়নামতি পাহাড় ৯০
ময়নিহান ৩৮৬
মরিস, জন ৬৩
মনিপুর ১১৯, ২২৭
মহিশূর ১৫, ৯৩, ১০১
মধুবনী ১১৯
মধুপুর ৯১, ৩০৭
মন্টেগু চেমসফোর্ড ১২৫
মন্টেগুচেসফোর্ড সংস্কার ৪১৯, ৪১২
মহেশখালি ১০২, ১৮১
মনোমোহন ২৩
স্মাইল হেনরি কারমাইকেল ২৮
মারকট সাহেবের পাহাড় ২২৩
মালদহ ১৫, ২৫১, ২৫৫
মালদ্বীপ ১৪৮, ২১৮
মালভূম ৩১১, ৩৩৩
মাহমুদ আলী ১৯২
মাস্টার, গিলবার্ট কভেন্ট্রি ২৩৩, ২৩৪
মাতামুহুরী ১৭৯, ১৮৪
মাদাগাস্কার ১৩
মাদ্রাজ ১৫, ১৬, ২৯, ৯৩, ৩১৫
মাদারীপুর ৯০, ১১২, ২৮৮, ২৯৮-৩০৩
মালাস্কা ১৬০
মালাবার ১০১
মার্টিইন ৫৫
মার্টিন ৩৭৭
মার্টিয়েন ৬৯
মানি ৩৬০
মানিকগঞ্জ ১০৬, ২৭৬, ৩০৮
মানিকপুর ১৮৪
মার্কুয়ার্ড ১৭২, ১৭৩
মার্চেন্ট টেইলর ১২১
মিটফোর্ড হাসপাতাল ২৭০, ২৭৩
স্মিথ ২৯৪, ২৯৭, ৩০০
মিয়ানমার ১০১, ১০২
মিজোরাম ১০১
মীর ইয়াহিয়া ২২৫
মীর মশাররফ হোসেন ৬৪
মীর জুমলা ২৪০, ৩০৪
মীরের সরাই ১৭৪
মীর গোলাম আলী ২৩১
মুকহানপুর ২২১
মুর, জন ২৭
মুর, জে.সি ৬৭

মুসলিম হাইস্কুল ২২৩
মুক্তাগাছা ২৮৫, ২৮৬
মুজাফ্‌ফরপুর ১১১, ১২৪
মুম্বাই ১৩, ১৫, ১৬, ৫১, ৭৫
মুর্শিদাবাদ ১৯, ৪২, ৫৭, ১৩৮, ২১১, ২২৪, ২২৮, ২৫৫
মুন্সিগঞ্জ ৯১, ১১২, ১১৭, ৩০৩-৩০৭, ৩৬৮, ৩৬৯
মুহুরী ১৯২
মুঙ্গের ১০৫
ম্যাকইনার্নি, ইফ ৮২
মেকলে, লর্ড ২১
ম্যাকলুই, ডগি ৩৭২
মেংগলস, রস ২৯৪
মেঘনা ৮৬, ৮৭, ২৪৯-২৫২, ২৫৬, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৬, ৩৮৭
ম্যালথাস, টি.আর ৩২
মির্জা খলিল, মৌলবী ৩২
ম্যাকার্টনি ৪০
ম্যাডার্ন ১৭৫
ম্যাকিনটোস ৪২
ম্যাকিনটস, জেমস ৩৭
মেরিন বোর্ড ২১২
ম্যাথু ১৩৯
ম্যাকে, অ্যারেরি ৫৬
ম্যাকে, জন ৮৫
মেদেনীপুর ৪৮, ১১৮, ১২৪, ১২৭
Memorndum on the Material Condition ১২০
মেমোয়ার্স অফ এ বেঙ্গল সিভিলিয়ন ১২৩
মেয়ো, লর্ড ৮৯, ২৫৫
মোল ইন দা ক্রাউন ১২৮
মোঃ খালেক ৪১৯
মোজার্ট ৭৬
মোহাম্মদ ইয়াহিয়া ২২০
মোহিনীমোহন দাস ১১৫

য

যমুনা ২৮৭
যোগদিয়া ১৭৩

র

রমনা ২৩৫, ২৪৩, ৩৬৫, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৭২
রহমতুল্লাহ ৬৮, ৮০
রবার্ট ফ্যারন ১১৩
রবারদিউ হেনরী ৪৮, ৯৮-১০০, ১০৩, ১১১, ১৩০, ১৩১, ১৯৪-২১৩
রবিনসন, রেভারেন্ড ২৩৬
রসিনি ৭৬
রমেশচন্দ্র দত্ত ৩৩
রমেশচন্দ্র মিত্র ২৪
রয়েল ফ্লাইং করপস ৪২১
রাইন ৩২০
রাইটার্স বিল্ডিং ৩৫৪
রাজবল্লভ ২৩৯
রাজমহল ৩২৮
রাজশাহী ৮৭, ১০৫, ১২৪, ২৫০-২৫২, ২৫৫, ৩৭৩, ৩৯৪-৩৯৬, ৪১০-৪১৪
রামকিনু ৩৪৯, ২৫০
রামপুরহাট ৩৬৫
রামপুর রোয়ালিয়া ৮৯, ১০৫, ১১৯, ৩৭৭, ৩৮১, ৩৯৬
রামপুরা ৩৬৯, ৩৭০

রামমোহন রায় ৬৪
রাঙ্গামাটি ১৮৯-১৯১, ৩১৯, ৩২০, ৩৪০
রাজাগঞ্জ ১৮৭, ১৯১
রাজারাম রায় ২৩৮
রাঁচি ১২৪
রামু নদী ১৮২, ১৮৩
রাবেয়া, বিবি ২২৪
রাসেল, ডাক্তার ২২২
রিকটস, হেনরী ৩৪৫
রিড ৪১০-৪১৪
হৃদয়নাথ মজুমদার ২২৭
রিচার্ডসন ৩৭৮
রীড, রবার্ট ১২০
রেলওয়ে ইন্সটিটিউট ৩৫৮
রেবতী মোহন ২২৭
রেসফোর্স ২৩৪, ২৩৫, ২৪১
রেডিং ৭৫
রেঙ্গুন ৩৪৪
রেগুলেটিং, অ্যাক্ট ১৮, ২০, ২১, ১৩৭
রেপেল ২৭, ১৮৯, ১৯৩, ২২৮
রেপেল, জেমস ১৩৯, ১৪০
রেভেনিউ রোর্ড ২১
রোজারিও ৩৪০
রো, থমাস ৬১
রৌস ১৩৯, ১৪৫
রংপুর ৪৯, ৮৯, ২৪৫, ২৫১, ২৫২, ২৫৫, ৩৯৫, ৪২০
রংপুর ও বরিশাল ১২৬

ল

লখনৌ ৭৫
লন্ডন ১৪, ২০, ৩৩, ৩৪, ৪২, ৭৫, ৯৭, ১০৩, ১০৬, ১১১, ১১৮-১২৮, ১৯৪, ২৫৭, ২৬৬, ২৬৭, ৩১২, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৭৩, ৩৮৪, ৩৮৬, ৩৯০-৩৯৩, ৩৯৫, ৪০৩, ৪১৯, ৪২২
লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ৯২
লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স ৩৩
লন্ডন স্কুল ফর ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ ৩৩
লয়াল, চার্লস ৪৮
লরিমার, ই.ও ৫৭, ৬৬
লক্ষ্মীপুর ১৭২, ১৫৯, ১৯২, ২৫১
লরেন্স, জম ৩২
লাইফ ইন দি মফস্কিল ১১০
লাকসাম ৩২৭
লাখপুর ৩৬৮, ৩৬৯
লালবাগ দুর্গ ১৩৯
লাহোর ৭৫
লিওন ৩০৭
লিওনার্দ, ডগি ৪১৮
ল্কিপার ২৪১
লিন্ডসে, রবার্টস ২৬, ৮৪, ৮৬, ৯৫, ৯৮, ১২৯, ১৩০, ১৩৫, ১৭১
লিভজ ফ্রম এ ডায়েরি ১১২
লিয়ার, এডোয়ার্ড ৬১
লুন্ট ৭৭
লিলি, মিসেস ৩৯২
লিল্যান্ড ২৬৭, ২৭১
লুসান ৭৫
লুবিয়ানা ১২১
লেইসম্যান ৩৫৫, ৩৬০, ৩৯২
ল্যাঙ্গ ৩৮৬
ল্যাম্ব, চার্লস ১৪
ল্যান্স, চার্লস ২৬৫

লেটারস অন ইস্টার্ন বেঙ্গল ১০৭
ল্য মেসুরিয়ার ৯৯, ১০০
লোকনাথ বল ৩৯২
লোহারপুল ১১৬, ২৪০
লোহিত সাগর ১৩
লোপেজ ১৫১, ১৫২
লং ৩১৩, ৩১৫

শ

শঙ্খ ১৭৬, ১৭৭
শঙ্খ নদী ১৯০
শরিফউদ্দিন ১১৪
শামস উদদৌলা ১৩২
শাহ আলম ২২৪
শাহ জালাল, হজরত ১৪৭
শাহবাদ ১২২
শাহ সুজা ২২৮
শাঁখারি বাজার ২৩৮, ২৩৯
শাহাবুদ্দিন ৪০৬
শিয়ালদাহ ৩৫৪
শায়েস্তা খাঁ ২২২
শিঙ্গী নদী ১৮৯, ১৯০
শীতলক্ষ্যা ৩১০
শ্রীরঙ্গপত্তম ১৫৪
শ্রীরামপুর ১০৪, ১১৮, ২১৯, ৩৩৬
শেখ আরাম উল্লাহ ২২৪
শেখ মহবত উল্লাহ ২২৪
শেক্সপিয়র, জন ২৮, ১৩৯, ১৪৫
শেক্সপিয়র, ট্যালবট ২৮
শেরউড, মিসেস ৩৮
শৈবালগুপ্ত ৩৩, ৫৪
শোর, জন ৪০, ৭০

স

স্মল ১৬৭
সলসবারি ৭৯
সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র ১০২
সম্বাদ ভাস্কর ১১৩
সরিষাবাড়ি ৭৯
সলিমুল্লাহ, নবাব ৪০৪
সন্দ্বীপ ১৭৩, ২১৬
সব্যসাচী ভট্টাচার্য ৬২
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩১২
সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ২৩
সাঁওতাল পরগনা ১১৮
সাগরদ্বীপ ৩৫
সাতকানিয়া ১৭৮
সারদা ৪১১, ৪১৩, ৪১৬
সারদা পুলিশ প্রশিক্ষণ কলেজ ১২৬
সাংপো ৩৮৭
সাঁতারা ৯৯
সাদারল্যান্ড ৩০৩
সাভার ৮৮, ২৫৩
সারা ব্রিজ ৩৭৩, ৩৮১
সালাউদ্দিন আয়ুব ১০২
সার্কিস ২৩২, ২৩৩
সাচে ৩৬৪
স্লিক, ড ৩৪৩
সিমসন, ফ্রাংক বি ৮৪-৮৯, ৯১, ১০৬-১০৭, ১১৫, ২৪৯-২৫৫, ৪১৫
সিমলা ৭৫
সিরকো ২৩২
সিংগারা ৩৭৭-৩৮০
সিরাজগঞ্জ ২৪৫
সিরাজুল ইসলাম ২১
স্পিয়ার, পার্সিভাল ১৭, ৩৯, ৪৫, ৮১

সিকিম যুদ্ধ ১১৯
সিদ্দি ২৫১
সিলেট ২৭, ৮৫, ৮৮, ৯৫, ৯৭, ৯৮, ১১৬, ২২৬, ২২৭, ২৫৩, ২৯২, ৩০৫
সিলোন ২৮৮
সীতাঘাট ১৮৭
সীতাকুণ্ড ১৭৫, ১৯২, ৩২৫
সুন্দরবন ১২৯, ১৩৭, ২১৪, ২১৫, ৩৩৮, ৩৮৬
সুরমা ১৪৬
সুল্‌রু ১৭৮
সুলতান বায়েজিদ ২২০, ২২১
সুসং ৮৮, ২৮৬
সুসং পাহাড় ২৫৪
সুতানুটি ১৫
সুধারাম ২৪৯
সুরাট ১৪-১৬
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১২২
সুশীল দে ৫২
সুশীল চৌধুরী ১৪
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪, ৩৩, ৪১৪
সুরেশচন্দ্র রায় ৯
সুলেমান ৪০২
সুয়েজ ক্যানাল ৩২৯
সুয়েজ খাল ৩৪
সূর্য সেন ৩৯২
সেনবার্গ ৩৭০, ৩৭২
স্যান্ডহার্স্ট ৯৫, ১২৫
স্যান্ডার্স ২৬৭, ২৬৯, ২৭৪, ২৮০, ২৮১
স্যামুয়েল ১০৭
সেন্দেল, ভেনাম ভান ১০২
সৈয়দ আবদুল গনি ২১৯
সৈয়দউল্লাহ ১৬৭, ১৬৯
সৈয়দ সদরউদ্দিন রাজু ২১৭
সোমনার ৯৭
সোহরাওয়ার্দী ৩৯৬-৩৯৮
সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ২৩৪
সোনাপুর ৩৮৫, ৩৮৬
সোয়ারিঘাট ২২৯

হ

হগ ৩৯৩
হজরত মুহাম্মদ (দঃ) ২২৩
হওসন, ই ৩৯১
হরিহরপুর ১৪
হরিশচন্দ্র ৩৪৪
হল্যান্ড ৯৭, ১৪৩-১৪৫, ১৪৭, ১৪৯
হাওড়া ১১১, ৩৩৭
হাফলং ৩৫৮
হালদা নদী ১৭৪
হায়দ্রাবাদ ১৫, ১৫৪
হান্টার ২৭, ৩১, ৩৩২, ৩৩৩
হান্টার, উইলিয়াম ১০১
হান্টার, উইলসন ৯২
হান্টার, ডব্লিউ ৩১৯
হাসান আলী ৪০২
হাকিমুল্লাহ ২২৩
হাচিনসন, স্লেড ৩৬০
হাতিয়া ২১৫, ২৫২
হামিদুল্লা খাঁ ২২৪
হিন্ডম্যান ৯১
হিল্ডা ৪০৩
হিমালয় ৭৫, ৩৩৫
হিকি, উইলিয়াম ৩৫, ৩৬, ৪০, ৪২

হিগিনস ৩৬০
হিঙ্গুটিয়া ২৪৯
হিন্দু কলেজ ১১৩
হুগলি ১১৩, ১১৯, ৩১৬, ৩৭২
হুইলার, হেনরি ৪১২
হুসেনী দালান ২৩১
হেইস, প্যাডি ২২৫
হেইলিবাড়ি ৯৩, ২৯০
হেইলিবাড়ি কলেজ ৩১, ৩২, ১২১
হেনরি ৩৭২
হেনরিয়েটা ২৭
হেবার, বিশপ ৬১, ২৩২
হেস্টিংস ১৮, ২১, ৪০, ৪১, ১৬২, ৩৬১
হেস্টিংস, ওয়ারেন ১৩৮
হেস্টিংস, লর্ড ১৫, ৩৪৫
হ্যামিলটন, ক্যাপ্টেন ৩৭
হ্যামিলটন, ফ্রানসিস ১০২
হ্যামিলটন, রবার্ট ১৬৬
হ্যারি ৩৪৫
হ্যারিস ১৭৩
হ্যারিংটন ৩২
হ্যালিডে ১০৮, ২৬৬
হোটেল তাজমহল ৪১৫